রবীন্দ্রজীবনী

তৃতীয় খণ্ড

১৩২৫-১৩৪১ ॥ ১৯১৯-১৯৩৪

রবীন্দ্রজীবনী

ও

রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা

শ্রীসুধাময়ী দেবীকে

২ জুলাই ১৯৫২

বর্তমান সংস্করণের ভূমিকা

রবীন্দ্রজীবনী তৃতীয় খণ্ড ১৩৫৯ সালে প্রকাশিত হয়; তার পর দশ বৎসর পরে ইহার নূতন সংস্করণ প্রস্তুত হইয়া বাহির হইল।

এই সংস্করণে বহু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত এবং নূতন তথ্য ও তত্ত্ব সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এই সংস্করণের কাজে শ্রীঅজয় হোম আমাকে সহায়তা করায় তাঁহার নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। এই গ্রন্থের নির্দেশিকা প্রস্তুত করিয়াছেন শ্রীমান জয়কুমার চট্টোপাধ্যায় ও তদীয় পত্নী শ্রীমতী নীলা দেবী; তজ্জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আর যাঁহার নিত্য সহায় ছাড়া আমার কোনো কাজ অগ্রসর হয় না, তাঁহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন থাকিল। এ ছাড়া সহায়তা করিয়াছেন জয়ন্তী রায়চৌধুরী, সুনন্দা ঘোষ ও সুস্মিতা মজুমদার। মুদ্রণকর্মে শ্রীসুশীল রায় ও শ্রীসুবিমল লাহিড়ীর সহায়তা লাভ করিয়াছি।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

ভুবননগর, বোলপুর
২রা জুলাই, ১৯৬১

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

রবীন্দ্রজীবনীর তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডে ১৯১৯ হইতে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত কালের আলোচনা আছে। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয় ১৯১৮ সালের শেষভাগে। এই সময়ে দেশে নূতনশাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের আয়োজন চলিতেছে— ১৯২১-এর প্রথম দিক হইতে সে ব্যবস্থা কার্যকরী হয়। পনেরো বৎসর পরে ভারতশাসন ব্যবস্থায় নূতন আর এক দফা আইন চালু হয়। আমরা যেখানে আসিয়া এই গ্রন্থ শেষ করিয়াছি, তাহা নূতন শাসন-ব্যবস্থা শুরু হইবার প্রায় সমসাময়িক। আমাদের এই আলোচ্য পর্বটি দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকাল— এক মহাযুদ্ধের শেষ ও আর এক মহাযুদ্ধের সম্ভাবনার পর্ব।

দেশের ও বিদেশের বিচিত্র ঘটনাবলীর সঙ্গে কবির জীবনেতিহাস এই পর্বে বিশেষভাবে যুক্ত ছিল। এই পর্বে বিশ্বভারতী আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপিত হয়; এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁহার যোগ যে কী নিবিড় ছিল, তাহা এই গ্রন্থ সাক্ষ্য বহন করিতেছে। বহির্বিশ্বের সঙ্গেও কবি যোগসূত্রে আবদ্ধ হন নানাভাবে; য়ুরোপ, আমেরিকা, চীন, জাপান, মালয় দ্বীপময় ভারত, পারস্য, ইরাক প্রভৃতি দেশভ্রমণ এই পর্বের ঘটনা। ভারতের মধ্যেও আসাম হইতে সিন্ধুদেশ ও পঞ্জাব হইতে সিংহল পর্যন্ত কখনো বক্তৃতা দিবার জন্য, কখনো শান্তিনিকেতনের দল লইয়া অভিনয়ের জন্য গিয়াছেন। অসংখ্য সমস্যা সম্বন্ধে কখনো লোকের তাগিদে মত দিয়াছেন, কখনো দুর্বলের পক্ষে ও প্রবলের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছেন; কোনো সমস্যাকে পাশ কাটাইয়া যাওয়া তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ ধর্ম।

এই পর্বে কবির দুইটি পরিচয় নূতন -- একটি তাঁহার দার্শনিক রূপ ও অপরটি তাঁহার শিল্পী রূপ। ভারতের দার্শনিকরা তাঁহাদের সম্মেলনের প্রথম সভাপতি করেন কবিকে; আর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে হিবার্ট লেকচার দিবার জন্য প্রথম ভারতীয় দার্শনিকরূপে তাঁহারই আহ্বান আসে—যদিও তিনি অসুস্থতার জন্য সেবার যাইতে পারেন নাই। চিত্রকররূপেও রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা নূতন; কবির চিত্র সম্বন্ধে এখনো সম্যক আলোচনা হয় নাই। আশা করা যায় একদিন কোনো যথার্থ গুণী এই বিষয়ের প্রতি যথাযথ মনঃসংযোগ করিবেন।

সংগীতের মুক্তির জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে দেশ কতখানি ঋণী, তাহা বাঙালিমাত্রই জানেন; তেমনই নৃত্যের মুক্তি বাঙালি সমাজে তিনিই আনিলেন। আজ বাঙালি নৃত্যকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিতেছে না; ইহার পথিকৃৎ রবীন্দ্রনাথ। এই পর্বে নৃত্যকলার বহু পরীক্ষা হয়।

বিশ্বভারতীর অপরিহার্য অংশরূপে শ্রীনিকেতনের গ্রাম-উদ্যোগ এই কালের ঘটনা; 'ফিরে চল মাটির টানে' এ বাণী উদ্‌গীত হয় তাঁহারই কণ্ঠ হইতে। সেই বাণীকে রূপ দান করা ছিল তাঁহার জীবনের অন্যতম কর্ম; কবি যে ভাববিলাসী নহেন তাহার প্রমাণ এইখানে। এই সকল বিচিত্র বিষয় সমসাময়িক ঘটনার পরিপ্রেক্ষণীতে আলোচনা করিতে হইয়াছে।

এ গ্রন্থ প্রণয়নে গতবার যাঁহারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, এবারও তাঁহারা অকুণ্ঠচিত্তে সহায়তা করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদের নাম এখানে পুনরুল্লেখ করিলাম না। রবীন্দ্রভবন হইতে এবারও বহু উপকরণ পাইয়াছি। এ বিষয়ে সহায়তা করিয়াছেন শ্রীপৃথ্বীশ নিয়োগী, শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমোহিতকুমার

মজুমদার ও শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব। শ্রীঅমল হোম যে-সব তথ্য সরবরাহ করিয়াছেন, তাহা না পাইলে অনেক বিষয়ই অস্পষ্ট থাকিত; সেজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। পরিশেষে বিশেষভাবে উল্লেখ করিতেছি গোসাঁইজির [নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী] নাম। ভারতীয় সংস্কৃতির পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনি কিছু লিখিলেন না; কিন্তু তিনি কাছে বসিয়া যখন আলোচনায় মগ্ন হন, তখন বুঝিতে পারি রসের ও জ্ঞানের কী সমন্বয় হইয়াছে তাঁহার মধ্যে।

সমসাময়িক সাহিত্যিকবর্গ নানা দৃষ্টিভঙ্গী হইতে কবিকে দেখিতেছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনেক কিছু পাইয়াছি— যাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলা কঠিন; সকলকে আমার নমস্কার জানাইতেছি।

শান্তিনিকেতন
১১ শ্রাবণ, ১৩৫৯

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

বিষয়সূচী

রবীন্দ্রজীবনী

রূপহীন, বর্ণহীন, চিরস্তব্ধ, নাই শব্দ সুর,
মহাতৃষ্ণা মরুতলে মেলিয়াছে আসন মৃত্যুর ;
সে মহানৈঃশব্দ-মাঝে বেজে ওঠে মানবের বাণী
বাধা নাহি মানি।

আস্ফালিছে লক্ষ লোল ফেনজিহ্বা নিষ্ঠুর নীলিমা—
তরঙ্গতাণ্ডবী মৃত্যু, কোথা তার নাহি হেরি সীমা ;
সে রুদ্র সমুদ্রতটে ধ্বনিতেছে মানবের বাণী
বাধা নাহি মানি।

আদিতম যুগ হতে অন্তহীন অন্ধকার পথে
আবর্তিছে বহ্নিচক্র কোটি কোটি নক্ষত্রের রথে ;
দুর্গম রহস্য ভেদি সেথা উঠে মানবের বাণী
বাধা নাহি মানি।

অণুতম অণুকণা আকাশে আকাশে নিত্যকাল
বর্ষিয়া বিদ্যুৎ বিন্দু রচিছে রূপের ইন্দ্রজাল।
নিরুদ্ধ প্রবেশদ্বারে উঠে সেথা মানবের বাণী
বাধা নাহি মানি।

চিত্তের গহনে যেথা দুরন্ত কামনা লোভ ক্রোধ
আত্মঘাতী মত্ততায় করিছে মুক্তির দ্বার রোধ ;
অন্ধতার অন্ধকারে উঠে সেথা মানবের বাণী
বাধা নাহি মানি।

প্রথম মহাযুদ্ধান্তে

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হইয়াছে। ১৯১৮ অব্দের ১১ নভেম্বর যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হইল।

চারিবৎসরের উপর য়ুরোপের নানাস্থানে, এশিয়ার পূর্বে ও পশ্চিমে, আফ্রিকার উত্তরে ও দক্ষিণে, সমুদ্রের উপরে ও জলগর্ভে, আকাশের পথে পথে— মানব-গৃধ্নুতা ও হিংসার যে কুৎসিত রূপ মূর্ত হয়— তাহার অবসান হইল— মধ্যয়ুরোপের শক্তিপুঞ্জের পরাজয়ে। এই কয়েক বৎসর যুদ্ধের মধ্যে ভারতে ও পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে যেসব যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটিয়া যায়, তাহার ব্যাপকতা ও গভীরতা রাষ্ট্রনৈতিক জয়-পরাজয় ও অর্থনৈতিক লাভালাভের মাপকাটিতে ধরা কঠিন। এই মহাযুদ্ধের প্রলয়োচ্ছ্বাসে প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলির ভিত্তি গেল শিথিল হইয়া। বহু সাম্রাজ্য ধ্বংস হইল। রাশিয়ার মধ্যযুগীয় সাম্রাজ্যতন্ত্রবাদের ধ্বংসাবশেষের উপর গড়িয়া উঠিল সোবিয়েত সমাজ-তন্ত্রবাদের নূতন আদর্শবাদ। পৃথিবীর সর্বত্র ধনতন্ত্রবাদীরা তাহাদের টলটলায়মান আর্থিক সাম্রাজ্যসৌধকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল।

যুদ্ধান্তে প্যারিসে শক্তি বৈঠক বসিয়াছে। মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তি জয়ী; মিত্রশক্তি বলিতে বুঝায় ইংরেজ, ফরাসী, বেলজিয়ান, ইতালিয়ান, রুশ, আমেরিকান, জাপানী, চীনা প্রভৃতি জাতি। আর পরাজিত শত্রুপক্ষে ছিল— জারমেনি, অস্ট্রিয়া, হাংগেরি, তুর্কী ও বুলগেরিয়া। যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইংরেজপ্রমুখ মিত্রশক্তি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ক্ষুদ্র দুর্বল জাতিসমূহের ন্যায্য দাবি ও অস্তিত্ব রক্ষাই তাঁহাদের অস্ত্রধারণের অন্যতম কারণ; Self determination শব্দটি তখনকারদিনের জপমন্ত্র। সমস্ত নিপীড়িত জাতি স্বাধীন হইবে— এই ঘোষণায় সকলের মন গভীর আন্দোলনে উদ্বেলিত। অস্ট্রিয়ার অধীন বহু জাতি, তুর্কীর অধীন বহু দেশ— সকলেই আত্মকর্তৃত্ব লাভের জন্য উৎসুক। এই ভাব-তরঙ্গ য়ুরোপের সীমান্ত মধ্যে সীমিত থাকে নাই। ভারতবর্ষ বহুকাল হইতে 'স্বরাজ' লাভের জন্য সংগ্রামরত; কিন্তু তৎসত্বেও ভারত সরকার ও ভারতীয় জনসাধারণ মিত্রশক্তির জয়কামনা করিয়া ধনে প্রাণে সাধ্যমত সহায়তা দান করিতে কৃপণতা করে নাই। ভারতীয় নেতারা যুদ্ধের জন্য সৈন্যসংগ্রহে ব্রতী হন; গান্ধীজিও দক্ষিণ আফ্রিকায় বাসকালে ও পরে ভারতে আসিয়া (১৯১৫) গবর্মেণ্টের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিয়াছিলেন। সকলেরই বিশ্বাস যে, যুদ্ধান্তে মিত্রশক্তি জয়ী হইলে ব্রিটিশ সরকারের নিকট হইতে ভারত তাহার ন্যায্য অধিকার লাভ করিবে। যুদ্ধের সময়ে তৎকালীন ভারত-সচিব (Secretary of State for India) মি. মণ্টেগু ঘোষণা করেন (১৯১৭ অগস্ট) যে, ভারতকে স্বায়ত্তশাসনের পথে ধাপে ধাপে লইয়া যাওয়াই ব্রিটিশ রাজনীতির চরম সার্থকতা (the progressive realisation of responsible self-government in India as an integral part of the British Empire)। যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে— সকলেরই আশা ভারত দায়িত্বপূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার হইতে আর বঞ্চিত থাকিবে না।

যুদ্ধবিরতির চারিমাস পূর্বে (১২ জুলাই ১৯১৮) ভারতসচিব মণ্টেগুর ভারত-শাসন সম্বন্ধে পরিকল্পনার প্রতিবেদন প্রকাশিত হইয়াছিল। এই রিপোর্ট পাঠ করিয়া কাহারও মনে হইল ইংরাজ ভারতকে 'স্বরাজ' দিতেছে— কাহারও মনে হইল রাষ্ট্রনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার বিষবীজ বপন করিয়া চতুর ইংরেজ যে স্বাধীনতা ভারতকে দিবে, তাহা অধীনতা হইতেও ভয়ংকর। কেহ বলিলেন বর্জন করো, কেহ বলিলেন গ্রহণ করো, অধিকাংশ ভাবিল— দেখাই

যাক্‌না। যুদ্ধ শেষে ভারতের সমস্যা জটিল হইয়া উঠিল মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে কেন্দ্র করিয়া। য়ুরোপীয় যুদ্ধে তুর্কীর সুলতান তথা ইসলামের খলিফার পরাজয় ঘটনা ভারতে নূতন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করিল। অখণ্ড ভারতে তখন নয় কোটির উপর মুসলমানের বাস; এই মুসলমান সমাজের ধর্মগুরু খলিফার ভবিষ্যত কী হইবে তাহাই হইল ভারতীয় মুসলমানদের প্রধান উদ্বেগের কারণ। সন্ধিশর্ত প্রকাশিত হইবার এখনো অনেক দেরি। সেইজন্য মুসলমান সমাজের আন্তরিক ক্ষুব্ধতা এখনো মুখর হয় নাই সত্য—কিন্তু আশু অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাহারা স্তব্ধ।

দেশের এই বিচিত্র ভাবনা ও উদ্বেগের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মানস-লোকে দেশ সম্বন্ধে যে পরিকল্পনা করিতেছেন, তাহা রাজনীতিক নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। মহাদেশ তুল্য ভারত— বহু ভাষাভাষী জাতির বাস— বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকের সমাবেশ এখানে; নানা স্তরের সভ্যতা অত্যন্ত কাছাকাছি সংলগ্ন। এই বিচিত্রকে এই সংখ্যাহীন বিশেষকে একান্ত শক্তিতে পরিণত করিতে হইলে কেবল রাজনৈতিক 'বুদ্ধি'তে চলিবে না; মানুষের শুভবুদ্ধি তাহার ধর্মবুদ্ধিকে উদ্বোধিত করিতে হইবে। তজ্জন্য পরস্পরকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে জানার প্রয়োজন (know thyself and know thy neighbour) সর্বাগ্রে। পরস্পরের মধ্যে অজ্ঞতাই ভেদের কারণ। দেশকে জানা অর্থে, তাহার মানুষকে জানা— বিশেষ একক (Unit) সমূহের সংস্কৃতিকে জানা— প্রতিবেশীর ধর্ম, সাহিত্য, শিল্পকলা, সংগীত, ইতিহাস জানা। এককথায় যে আমা-হইতে বিভিন্ন, তাহাকে সর্বতোভাবে জানার দ্বারা আমাদের বহুকালের বংশগতিক মূঢ় সংস্কারের শোধন হয়— আমাদের মন মুক্ত হয়— নিত্য নব প্রকাশমান সত্যের উপলব্ধি হয়। ইহারই নাম সংস্কৃতি, মনের মুক্তি।

ধর্মের অন্ধতা, ভূগোলের প্রাদেশিকতা, বর্ণগত উন্নাসিকতা প্রভৃতি সামাজিক পাপ কী নিদারুণ রূপ পরিগ্রহ করিয়া ভারতবাসীদের পরস্পরকে কেবল যে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতেছে তাহা নহে, পরস্পরকে বিরোধী করিয়া তুলিতেছে। ভারতের লোকবলের অভাব নাই, তাহার প্রকৃতিদত্ত ঐশ্বর্য সুপর্যাপ্ত, এতো জনবল ও ঐশ্বর্য-সম্পদের অধিকারী হইয়াও ভারত কেন যে দুর্বল ও পরপদানত এই জটিল প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যায় নাই। রবীন্দ্রনাথের জিজ্ঞাসা— কী করিয়া 'এই ছিন্নভিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত'কে মহাজাতি-সংসদে সসম্মানে আসন গ্রহণের অধিকারী করা যায়; তাঁহার প্রশ্ন এই অধিকার কি রাজনীতিক কুটিল চক্রপথে সঞ্চারণ করিয়া মিলিবে? অথবা বৈশ্যবৃত্তিক গৃধ্নুতার পথ অনুসরণ করিয়া মিলিবে, অথবা ভারতের চিরন্তন মৈত্রীর বাণী বহন করিয়া সে আপনার শাশ্বত স্থান অধিকার করিবে?

বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের দিনে রাষ্ট্রনীতিকেরা 'জাতীয়তা' নামে এক অপদেবতার মূর্তি গড়িয়া তাহার পদতলে নিজ নিজ দেশের যৌবনকে বলিদান দিয়াছেন। প্রতিবেশীকে হত্যা করা মহৎ কর্ম বলিয়া দেবতার বেদি হইতে বাণী ঘোষণা করিতে ধর্মধ্বজীদের বিবেকে রেখাপাত করে নাই। চারিদিকে উন্মত্ত জাতিপ্রেমের তাণ্ডব—সেই উন্মত্তার বিরুদ্ধে যে মুষ্টিমেয় মনীষী প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারা ক্ষুব্ধ জনমতের নিকট সেদিন লাঞ্ছিত, ভর্ৎসিত বা উপেক্ষিত—অনেকে কারারুদ্ধ বা স্বদেশ হইতে নির্বাসিত, অথবা বিতাড়িত হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জাতিপ্রেমের বহ্নি-উৎসবে ইন্ধন জোগান নাই বলিয়া তিনি যে নিজ দেশে ও বিদেশে কী নিন্দাভাগী হন— তাহা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি—এই পর্বেও তাহার পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাইব। কিন্তু সমালোচনা ও তিরস্কার করিয়া রবীন্দ্রনাথ কোনো দিনই নিজ কর্তব্য ও দায়িত্বকে পাশ কাটাইয়া যান নাই: সমস্যা নিরাকরণের জন্য পথনির্দেশ দিয়া স্বয়ং পথ উন্মোচনের জন্য পথিক হইয়াছেন। তাই প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে ভারতের নবজাগ্রত

জাতীয়তাবোধের অরুণোদয়ে তিনি ভাবী-ভারতের সমষ্টিগত মুক্তির জন্য যে পথের ইঙ্গিত করিলেন— তাহা বাহ্যিক ঐক্যের পথ নহে, তাহা আত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যানুসন্ধানী-পথে পদযাত্রা। এই ঐক্যমন্ত্রের বাণী বহন করিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রচারে বাহির হইলেন; সেইটি বিশ্বভারতীর বাণী।

প্রথম মহাযুদ্ধ বিরতির (১১ নভেম্বর ১৯১৮) মাসেক কালের মধ্যে শান্তিনিকেতনের নিভৃতে মুষ্টিমেয় সমদরদী লোকদের লইয়া শান্তিবাদের ও বিশ্ব-মৈত্রীর প্রতীক্ বিশ্বভারতীর ভিত্তি প্রোথিত হয় (২৩ ডিসেম্বর ১৯১৮; ৮ পৌষ ১৩২৫)।

দক্ষিণ-ভারত সফর

১৯১৯ সালের জানুয়ারি মাস। বহুকাল শান্তিনিকেতনের কর্মের মধ্যে কবি আবদ্ধ। দীর্ঘকাল একস্থানে বাস ও একই ধরণের কাজের পুনরাবৃত্তি— কবি কখনই প্রসন্নচিত্তে স্বীকার করিতে পারেন নাই। গত বৎসরের একটানা জীবন কবির সাহিত্যসৃষ্টিতে বড়ো রকম বালুর চর; তাই পরিবর্তনের জন্য মন ভিতরে ভিতরে ব্যাকুল।

এমন সময়ে আহ্বান আসিল সুদূর দক্ষিণ-ভারতের মৈসুর দেশীয় রাজ্য হইতে। সেখানে তখন দেওয়ান জ্ঞানশরণ চক্রবর্তী, কলিকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক সত্যশরণ চক্রবর্তীর ভ্রাতা। দেওয়ান জ্ঞানশরণের ব্যবস্থায় বঙ্গলুর (Bangalore) নাট্যনিকেতন হইতে কবির আমন্ত্রণ। কবি রানুকে লিখিতেছেন, "পরশু চললাম মৈসুরে, মাদ্রাজে, মাদুরায় এবং মদনাপল্লীতে। ফিরতে বোধ হয় জানুয়ারি কাবার হয়ে ফেব্রুয়ারি শুরু হবে।"[১]

মৈসুর যাত্রার সঙ্গী এবার তরুণ-শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর। সুরেন্দ্রনাথ (১৮৯৪) নন্দলাল বসুর জ্ঞাতি-ভ্রাতা, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পীশিষ্য, ১৯১৮ সালে আশ্রম বিদ্যালয়ের চিত্রশিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন; এই অল্প সময়ের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার বুদ্ধি-প্রাখর্যে ও চরিত্র-মাধুর্যে কবির ও আশ্রমবাসী সকলেরই প্রিয় হইয়াছেন। ইঁহাকে লইয়া কবি বঙ্গলুর চলিলেন— দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা এই প্রথম— গত বৎসর অন্ধ্রদেশের পিঠাপুরম (কোকনদ) পর্যন্ত আসিয়াছিলেন— তদ্দক্ষিণে যাওয়া হয় নাই।

বঙ্গলুরে চারুশিল্পের উৎসব ১২ জানুয়ারি— কবিই উদ্বোধক। কানাড়ী শিল্পসংঘ বাংলার কবির যথোচিত সমাদর করিলেন; কবি বক্তৃতা করিতে উঠিলে মাথার উপর বিজলির সাহায্যে গোলাপের কুঁড়ির ন্যায় আলো জ্বলিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে উপর হইতে পুষ্পবৃষ্টি। সভায় কবিকে যে রৌপ্যাধারে মানপত্র প্রদত্ত হইল, তাহা দক্ষিণী কারুশিল্পের একটি উৎকৃষ্ট নমুনা। রবীন্দ্রনাথ সভায় *The Message of the Forest*[২] শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন; কয়েক বৎসর পূর্বে— 'তপোবন' প্রবন্ধে (প্রবাসী ১৩১৬ পৌষ) কবি ভারতীয় শিক্ষা-আদর্শ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, এই ভাষণটি তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া রচিত।

পরদিন সন্ধ্যায় ঐ উৎসব মণ্ডপে এক জনসভায় ভাষণের বিষয় 'প্রাচ্যবিদ্যালয়ের আদর্শ'— বিশ্বভারতী সম্বন্ধে তাঁহার মনে যেসব ভাবনার উদয় হইতেছে— তাহারই প্রথম আভাস।

কিন্তু বঙ্গলুরের ছাত্রসমাজ কবিকে তাহাদের মধ্যে চাহে; তাই পরদিন সকল শ্রেণীর বিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্ররা সম্মিলিতভাবে কবি-সম্বর্ধনা করিল।

১ ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৩১; ৩ জানুয়ারী ১৯১৯, ১৩২৫ পৌষ ১৯।

২ The Message of the Forest, Modern Review 1919 May.

বঙ্গলুর আধুনিক শহর— রাজ্যের রাজধানী ও কানাড়ী সংস্কৃতি ও শিল্পের কেন্দ্র মৈসুর। দুই বৎসর পূর্বে সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে (১৯১৬)। মৈসুরে উপস্থিত হইলে সেখানকার ছাত্রসমাজ কবিকে সম্মানিত করিল এবং তাহাদের মধ্য হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া কবির হস্তে পাঁচশত টাকা দান করিল; বিশ্বভারতীর জন্য সাধারণের নিকট হইতে দান গ্রহণ এই বোধ হয় প্রথম। মৈসুর বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া সন্ধ্যার সময়ে কবি ছাত্রদের নিকট 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'র[১] অপ্রকাশিত ইংরেজি তর্জমা পাঠ করেন।

কবির দিন কাটে অত্যন্ত ব্যস্ততার মাঝে; নানা প্রতিষ্ঠান হইতে বক্তৃতার আহ্বান। একখানি পত্রে লেখককে কবি লিখিয়াছিলেন, "বক্তৃতার ঘুর্ণীর মধ্যে পড়েচি। আসর খুব জমে উঠেচে। কিন্তু আরো বক্তৃতা লিখতে হবে। তার জন্য বই চাই।"[২] কবি কী শ্রেণীর বই পড়েন, তার আভাস পাওয়া যায় পত্রখানি হইতে। তিনি লিখিতেছেন, "পত্রপাঠ আমাকে লাইব্রেরী থেকে মহাযান বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় বই..পাঠিয়ে দেবে।" যেমন সুজুকি (Suzuke) The Awakening of Faith বা শ্রদ্ধোৎপাদ শাস্ত্র[৩]; বৌদ্ধ অ্যাবট-এর উপদেশমালা (Sermons of an Abbot), আর Proceedings of Concordia যাহাতে অধ্যাপক আনাসাকির একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ আছে। এই সামান্য পত্র হইতে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে কবির অধ্যয়ন ও অনুরাগের আভাস পাই। পাঠকের স্মরণ আছে তিনিই পণ্ডিত বিধুশেখরকে পালি বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত করেন এবং তাঁহারই নির্দেশে বালক রথীন্দ্রনাথ বিধুশেখরের নিকট অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত পাঠ করেন ও বাংলায় অনুবাদ করেন।[৪]

মৈসুর বাসকালে কবির স্থানীয় স্থাপত্য শিল্পাদি দেখিবার সবিশেষ সুযোগ হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ করও দাক্ষিণাত্যের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য প্রথম দেখিলেন। তাঁহার তরুণ মনে গভীর রেখাপাত নিশ্চয়ই করিয়াছিল; কারণ উত্তর কালে স্থাপত্য শিল্প রচনায় সুরেন্দ্রনাথের যে প্রতিভা বিকশিত হয়, তাহার ভূমিকা প্রস্তুত হইল এই সময়ে।

মৈসুর সম্বন্ধে কবি লিখিতেছেন, "বাঙ্গালোর শহরে এবং মৈসুর রাজধানীতে কিছুকাল কাটাইয়া মনে একটি তৃপ্তি পাইয়াছি। আমার তৃপ্তির প্রধান কারণ এই যে সেখানে আমাদের ভারতবর্ষের চিরদিনের যে একটি আকৃতি সেটা একেবারে লুপ্ত হয় নাই। অথচ সেই ভারতীয়তা বর্তমানকালের সংস্পর্শকে দূরে ঠেকাইয়া কৃপণের গর্ভনিহিত ধনের মত নিজেকে ব্যর্থ করিয়া রাখে নাই।· · মৈসুর পরকে লইতে গিয়া আপনাকে লোপ করিয়া দেয় নাই অথবা আপনাকে রাখিতে গিয়া পরকে নির্বাসিত করিয়া দেয় নাই। সেখানে য়ুরোপের সম্পদকে গ্রহণ করা হইতেছে, অথচ যে গ্রহণ করিতেছে সে স্বয়ং ভারতবর্ষই।

"আমাদের দেশে বর্তমানে দুই রকমের ভীরুতা দেখা যায়। কাহারও ভীরুতা দেশী প্রকৃতিকে রক্ষা করিতে, কাহারও ভীরুতা য়ুরোপীয় শিক্ষা গ্রহণ করিতে। যাঁহারা এই দুই ভীরুতাকেই অতিক্রম করিয়াছেন তাঁহারাই ভারতবর্ষকে বাঁচাইবেন। মৈসুরের রাজাসন এই দুই ভারতবর্ষকেই ছাড়াইয়া উঠিয়াছে।"[৫]

১ লক্ষ্মীর পরীক্ষা। The Trial; Modern Review 1920 July. ইহা কোনো গ্রন্থভুক্ত হয় নাই।

২ পত্রখানি জীবনীলেখককে লিখিত ২০ জানুয়ারি ১৯১৯।

৩ সুজুকি-কৃত গ্রন্থ অবলম্বনে কবি বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ শীর্ষক প্রবন্ধ লেখেন; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, শকাব্দ ১৮৩৩ [১৩১৮] পৌষ, পৃ. ১৯১-৯৭। অশ্বঘোষের এই গ্রন্থ আদৌ কোনো সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ কিনা সে-বিষয়ে পণ্ডিতদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। উহা মূলে চীনা ভাষায় রচিত হয় বলিয়া অনুমান। দ্র. মৎপ্রণীত Indian Literature in China and the Far East (1981). p. 160 ff.

৪ বহুবৎসর পরে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত বাংলায় প্রকাশিত হয়।

৫ মৈসুরের কথা, শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১ম বর্ষ ১ম খণ্ড, ১৩২৬ বৈশাখ।

কিন্তু নবপ্রতিষ্ঠিত মৈসুর বিশ্ববিদ্যালয় দেখিয়া কবি-মন তৃপ্ত হইতে পারিতেছে না। তাঁহার মনে হইতেছে ইহার মধ্যে আপনার বলিতে কিছু নাই, সবটাই পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণ মাত্র। তাঁহার আশা ছিল দেশীয় রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দেশীয়তা কিছু দেখিবেন। সমস্ত বিদ্যাচর্চার মধ্যে ভারতবর্ষ যেন নিতান্তই সংকুচিত ও প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। কবির মনে তখন ভারতের তপোবনে ভারতীয় সংস্কৃতির অনুশীলনের কথা জাগিতেছে; তিনি লিখিতেছেন, "বিদ্যাগারের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রতি এই আস্থার অভাব। এই সম্মানের অভাব যে কিরূপ গভীরভাবে আমাদের মনকে আত্ম-অবিশ্বাসের মধ্যে চিরদিনের মত মজ্জিত করিয়া দিতেছে সে কথা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিবার পর্যন্ত শক্তি আমরা হারাইয়াছি।" (মৈসুরের কথা)।

বঙ্গলুর ও মৈসুরে দিন দশ কাটাইয়া বিশ্রামের জন্য কবি উটি পাহাড়ে চলিলেন— সেখানে প্রায় পক্ষকাল ছিলেন (২১ জানুয়ারি - ৫ ফেব্রুয়ারি)।

উটি হইতে কবি কোয়াম্বটুর আসিলেন, সেখানে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন গোয়া হইতে এন্‌ড্রুজ ও হায়দরাবাদ হইতে তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি। এন্‌ড্রুজ আসিয়া কবির দক্ষিণ-ভারতে বক্তৃতা-সফরের প্রোগ্রাম প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন।

কোয়াম্বটুর হইতে কবি ও তাঁহার সঙ্গীদের গন্তব্যস্থল পালঘাট—মালাবারের সংস্কৃতিকেন্দ্র—নীলগিরি পর্বতমালার গিরিসংকট মুখে অবস্থিত বলিয়া ত্রিবঙ্কুড় রাজ্যের (কেরল) অন্যতম বিশিষ্ট বাণিজ্যকেন্দ্র। ওলবকোট রেলজংশন হইতে স্থানীয় স্কাউটদল কবিকে স্বাগত করিয়া তিনমাইল দূরে পালঘাটে মহাসমারোহ সহকারে লইয়া চলিল। সর্বত্রই বক্তৃতা। পরদিন বাসেল (Basle) সুইসদের খ্রীষ্টীয় মিশন হলে পালঘাটের ছাত্রদের দ্বারা তিনি অভিনন্দিত হইলেন। সেইদিন প্রাতে কলপথি নামক স্থানে সংস্কৃত বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

এবার কবির গম্যস্থান সালেম—মাদ্রাজ প্রদেশের বিশিষ্ট শিল্পকেন্দ্র। এখানে পাবলিক হলে ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্র (Centre of Indian Culture) নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেখানে স্থানীয় ছাত্রসভা ও সাহিত্যসভা মিলিয়া কবিকে একটি রৌপ্যমণ্ডিত আধারে মানপত্র দান করেন। সভাশেষে কবি সালেমের সাহিত্য সভায় উপস্থিত হন ও 'কর্ণকুন্তী-সংবাদ'-এর[১] ইংরেজি তর্জমা পাঠ করেন।

সেই রাত্রেই সালেম ত্যাগ করিয়া পরদিন প্রাতে তিরুচিনপল্লী (Trichinapoly) উপস্থিত হইলেন। সন্ধ্যার সময়ে কবি-সম্বর্ধনা ও কবির বক্তৃতা। এইখান হইতে শ্রীরঙ্গমের বিখ্যাত নৌকা-উৎসব দেখিয়া আসিলেন। শ্রীরঙ্গম তিরুচিনপল্লী হইতে আট মাইল দূরে কাবেরী নদী তীরে অবস্থিত—বিশাল শিবমন্দিরের স্থাপত্য-সৌন্দর্যের জন্য ইহার বিশ্বখ্যাতি।

পরদিন (১১ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯) যান কুম্ভকোনম—মাদ্রাজ প্রদেশের তাঞ্জোর জেলার শহর—কাবেরী নদীর বদ্বীপে অবস্থিত; এই শহর সংস্কৃত শিক্ষার বিশিষ্ট কেন্দ্র হইলেও, কবির আহ্বান আসিল স্থানীয় কলেজ হইতে; কবি সেখানে The Spirituality in the Popular Religions in India সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

কুম্ভকোনম হইতে তাঞ্জোরের পথে একটি স্টেশনে গ্রামের লোকে কবিকে মানপত্র দেয় ও বৈদিক রীতি অনুসারে পূর্ণকুম্ভ দান করে। কত বিচিত্র অভিজ্ঞতাই কবির হইতেছে।

১ কর্ণকুন্তী-সংবাদ। Karna-Kunti, Modern Review 1920 April. দ্র. The Fugitive (1921) ইংরেজ কবি Sturge-Moore ইহা কবিতায় রচনা করেন। The Foundling Hero— Collected Works 1931.

তাঞ্জোর দক্ষিণ-ভারতের প্রসিদ্ধ নগর—বহু প্রাচীন ও আধুনিক প্রতিষ্ঠান ও দেবালয়াদি পূর্ণ; কবি উঠিয়াছেন রাওবাহাদুর বর্দ্যায়-এর বাসায়। স্থানীয় সরকারী শিক্ষক-শিক্ষণ বা ট্রেনিং কলেজে কবি 'মেসেজ্ অব্ দি ফরেস্ট' পাঠ করিয়া শোনাইলেন। ছাত্রেরা কবির রচিত 'চিত্রা'র কয়েকটি দৃশ্য ও 'শকুন্তলা' অভিনয় করিল। স্থানীয় মহিলাদের সহিত বেসাণ্ট-লজে কবি মিলিত হন। একদিনের পক্ষে প্রোগ্রাম বেশ ঠাসাই বলিতে হইবে।

পরদিন (১৩ ফেব্রুয়ারি) কবি সদলে তিরুচিনপল্লীতে ফিরিয়া, সেই সন্ধ্যায় বক্তৃতা দিয়া, রাত্রেই মাদুরা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মাদুরায় দেওয়ান গণপতের গৃহে কবি অতিথি। সেদিন সন্ধ্যায় স্থানীয় আমেরিকান মিশনারীদের কলেজ-হলে বিরাট জনসভায় বক্তৃতা। কিন্তু এতো শ্রম সহ্য হইল না—সেই রাত্রেই জ্বর দেখা দিল। এক সপ্তাহ কোনো সভাসমিতিতে যোগদান না করিয়া বিশ্রাম করিতে বাধ্য হইলেন। সুস্থ হইয়া উঠিয়াই পূর্বের ন্যায় বক্তৃতা শুরু হইল—পর পর দুই দিন (২১-২২ ফেব্রুয়ারি) *The Spirit of Popular Religion in India* এবং *Education in India* নামে ভাষণ পাঠ করেন। শেষোক্ত বক্তৃতায় কবি তাঁহার বিদ্যা-সমবায়ের পরিকল্পনার আভাস দিলেন; এই দুই সভায় দ্বার-টিকিট বিক্রয় করিয়া ১৫৭৫৲ টাকা উঠিয়াছিল।

মাদুরা হইতে কবি ও এন্‌ড্রুজ মেল্-বোট যোগে মদনাপল্লী আসিলেন; মদনাপল্লী থিওজফিস্টদের অন্যতম কেন্দ্র— সেখানকার অলকট বাংলোয় কবির থাকিবার ব্যবস্থা হয়। এখানে কবি সপ্তাহখানেক থাকিয়া স্থানীয় স্কুল কলেজ ও নানা প্রতিষ্ঠানগুলিকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখেন। দিনগুলি আনন্দেই কাটে।

মদনাপল্লী হইতে মাদ্রাজ হইয়া আদৈরে যাইবার কথা। কিন্তু সে সংকল্প ত্যাগ করিয়া কবি বঙ্গলুরে ফিরিয়া গেলেন; কবির এই ভ্রমণ ব্যবস্থার পরিবর্তন কারণ ছিল সমসাময়িক কতকগুলি ঘটনা।

আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি (১৯১৯) তখন দেশময় নানা রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক আন্দোলন চলিতেছে; প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে ভারতীয়রা আশা করিয়া আছে যে দেশের শাসনব্যবস্থায় ভারতীয়দের অধিকতর ক্ষমতা সমর্পিত হইবে, দায়িত্বপূর্ণ 'স্বরাজ' তাহারা লাভ করিবে। তাহা না হইয়া দিল্লি-সিমলার রাজপুরুষ মহলে রৌলট বিল পাশ করাইয়া ভারতীয়দের বন্ধনশৃঙ্খল দৃঢ়তর ও শাসনব্যবস্থা রূঢ়তর করিবার আয়োজন চলিতেছে। মাদ্রাজের বিভিন্নদলের রাজনীতিকদের মধ্যে এই সব ব্যাপার লইয়া যথেষ্ট মতভেদ—রবীন্দ্রনাথ এই সব দলের কোন্ কোঠায় পড়েন তাহা লইয়া যথেষ্ট গবেষণা চলিতেছে। কবির রাজনৈতিক ও সামাজিক মত লইয়াও সাময়িক পত্রিকাগুলি মুখর। তাঁহার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ-শাসিত তামিলনাডের বিরুদ্ধতার মূল কারণ কবির সামাজিক মতামত। এই সময়ে উত্তর-ভারতে বড়লাটের সভার সদস্য বিটলভাই জে. পাটেলের অন্তর্বর্ণ বিবাহ বিল্ লইয়া জোর আন্দোলন চলিতেছে। রবীন্দ্রনাথ অন্তর্বর্ণ বিবাহের সমর্থন করিয়া এক পত্র লেখেন। তাহা মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় ১৯১৯ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় আংশিকভাবে প্রকাশিত হয়।[১] রবীন্দ্রনাথের হিন্দুসমাজ-বিরুদ্ধ

১ Modern Review, 1919 Feb : প্রবাসী ১৩২৮ মাঘ, বিবিধ প্রসঙ্গ। শ্রীযুক্ত পাটেলের বিল সম্বন্ধে রবিবাবুর মন্তব্য, পৃ. ৩৮০-৮১। কবি মাদ্রাজ যাত্রার পূর্বে (১৯ ডিসেম্বর ১৯১৮) এক পত্রে লেখেন...the Hon'ble Mr. Patel's Bill has my heartiest suppoit. It is humiliating that some of our countrymen are opposing this Bill under the notion that it will injure Hindu Society if it is passed. ...To say that Hindu society cannot exist, unless it has victims who are forcibly compelled to live the life of falsehood and cowardice, is tantamtount to saying that it should not exist at all,...such an implication is a libel against the spirit of Hinduism.

এই মত মাদ্রাজের ব্রাহ্মণদের পক্ষে স্বীকার করিয়া লওয়া সম্ভব নহে। আমাদের আলোচ্যপর্বে মাদ্রাজে ব্রাহ্মণদের অসীম আধিপত্য। রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহাদের যে বুদ্ধিপ্রাখর্য প্রকাশ পাইত, সমাজ তথা ধর্মনীতি ক্ষেত্রে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করিবার মধ্যে যে কোনোরূপ অসঙ্গতি আছে সে বিষয়ে তাঁহারা বর্ণ-অন্ধ। ইঁহাদের এই মনোভাবের প্রতিক্রিয়ায় দক্ষিণ-ভারতে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের মধ্যে বিরোধের চিহ্ন দেখা দিতেছে। রবীন্দ্রনাথকে এই দ্রাবিড় ব্রাহ্মণরা অন্তর্বর্ণ বিবাহের সমর্থক জানিতে পারিয়া তাঁহার প্রতি বিমুখ। মদনাপল্লীতে বাসকালে কবি দেশের এই তপ্ত আবহাওয়ার আভাস পাইয়া, তখনই মাদ্রাজযাত্রা মুলতুবী করিয়া দিলেন।

বঙ্গলুরে আসিয়া কবি তাঁহার বক্তব্য পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া সংবাদপত্রে পাঠাইয়া দিলেন (৪ মার্চ ১৯১৯)। তিনি বলিলেন, "আমি কোনো রাজনৈতিকদলের লোক নই। দেশবাসীর কাছে আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা আজিকার রাজনীতির কথা নহে। আমি কখনো অনিচ্ছুক হাতের কাছ হইতে দানভিক্ষার পক্ষপাতী নই। দাতার নিকট হইতে ভিক্ষা পাইব কি পাইব না এই অনিশ্চয়তার দোলায় আমাদের মনুষ্যত্ব খর্ব হয়। সেইজন্য আমি বরাবর নিজের চেষ্টায় যে সামান্য কাজ হয় তাহাই গড়িয়া তুলিবার পক্ষপাতী।"[১]

বঙ্গলুরে বাসকালে একদিন (৮ মার্চ) কবি মৈসুর মিথিক সোসাইটির (Mysore Mythic Society) সম্মুখে *Folk Religion of India* বা বিশেষভাবে বাংলাদেশের বাউলদের সম্বন্ধে ভাষণ দান করেন। এই সভায় মৈসুর যুবরাজ সভাপতি ছিলেন। তিনি বক্তৃতা শেষে বলেন "আজকের বক্তৃতা হইতে দুইটি জিনিস শিখিলাম; প্রথমটি এই যে, আমরা দেশ সম্বন্ধে অত্যন্ত অজ্ঞ। আমাদের লোকসাহিত্যের আলোচনার প্রয়োজন। দ্বিতীয়টি কোনো 'জাত' বা সম্প্রদায় নীচ নহে।"

কবির এই সফরে মৈসুর সরকার হইতে তাঁহাদের দ্বারা প্রকাশিত বহু মূল্যবান গ্রন্থ উপঢৌকন ছাড়া কোনো আর্থিক সাহায্য পান নাই। মৈসুর হইতে পরেও কখনো পান নাই। অর্থের দিক হইতে যাহা হইয়াছিল, তাহার মূল্য সামান্য কিন্তু কবির তৃপ্তি এই যে তিনি তাঁহার 'বিশ্বভারতী'র কথা স্পষ্ট করিয়া দক্ষিণ-ভারতবাসীর কর্ণগোচর করিয়া আসিলেন।

বঙ্গলুর হইতে মাদ্রাজ আসিয়া হাইকোর্টের উকিল রঙ্গস্বামী আয়ারের গৃহে কবি উঠিলেন; মাদ্রাজে আসিবার উদ্দেশ্য আদেয়ারে বেসান্ট প্রতিষ্ঠিত (১৯১৭) ন্যাশনাল য়ুনিভার্সিটির চান্সেলার (আচার্য) রূপে তাঁহার বক্তৃতা দান। এই জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার জর্জ অরুনডেল-এর ব্যবস্থায় কবি আদেয়ারে তিনটি বক্তৃতা দিলেন (১০-১২ মার্চ)—

১ "I take this opportunity of making it clear to all that I do not belong to any political party whatever, and that what I have to say to my countrymen is not of the present moment or of the prevailing political unrest I have never felt any attraction for devising means to build the machinery for extracting favours from unwilling hand thus perpetuating the cult of moral servitude and making our people live in the most unhealthy mental atmosphere of continual alteration of hope and despair. It has ever been my endeavour to find out how to develop the power in ourselves by which we can truly earn the gratitude of all mankind and win our place as those who give out of their abundance and do not solely rely upon the doles of half-hearted charity."

1. The Centre of Indian Culture[১]
2. The Message of the Forest[২]
3. The Spirit of Popular Religion in India.

অতঃপর ১৩ মার্চ আর্যগণসভায় ‘ললিতঙ্গী’ নামে ভক্তিমূলক তামিল নাটকের অভিনয় দেখেন; সেখানে কবি সম্বর্ধনা হয়। এ ছাড়া কলেজের ছাত্রদের সম্মুখে তিনি তাঁহার ইংরেজি অনুবাদ পড়িয়া শোনান, ইহার মধ্যে অপ্রকাশিত *Mother's Prayer*[৩] (গান্ধারীর আবেদন) অন্যতম।

স্থির ছিল কবি মাদ্রাজে কয়েকদিন থাকিবেন; কিন্তু শরীর হঠাৎ খারাপ হওয়ায়, তাঁহার সমস্ত কার্যসূচী বন্ধ করিয়া দিয়া তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন (১৪ মার্চ ১৯১৯)।

কবি দক্ষিণ-ভারত যাত্রা করেন ৮ জানুয়ারি ও মাদ্রাজ ত্যাগ করিলেন ১৪ মার্চ—অর্থাৎ দুই মাস ছয় দিন। এই সময়ের মধ্যে কবি কী পরিমাণ ঘোরাঘুরি করেন, তাহার তালিকামাত্র আমরা উপরে দিলাম—কবির শ্রমশক্তি কী অপরিসীম ছিল—তাহাই দেখাইবার জন্য; বিস্তারিত বিবরণ বলিতে গেলে গ্রন্থের অনেকখানি স্থান আরও জুড়িত।

বিশ্বভারতী

দুই মাসের উপর দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণ করিয়া কবি কলিকাতায় ফিরিলেন মার্চ মাসের মাঝামাঝি (১৯১৯ মার্চ)। কবির মনে বিশ্বভারতীর কথাই এখন প্রবল; তাই কলিকাতায় আসিয়া এমপায়ার থিয়েটারে *Centre of Indian Culture* সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন (২৭ মার্চ ১৯১৯ ॥ ১৩ চৈত্র ১৩২৫) কলিকাতায় বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা সম্বন্ধে ইহাই কবির প্রথম বক্তৃতা, এবং ইহাই বোধ হয় এদেশে কবির প্রথম ইংরেজি বক্তৃতা। এছাড়াও আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল; এবার শ্রোতাদের বক্তৃতা শুনিবার জন্য ‘দর্শনী’ দিতে হইয়াছিল; অর্থাৎ টিকিট বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়। ইতিপূর্বে মাদ্রাজে এই ব্যবস্থাতেই বক্তৃতা হয়। বলা বাহুল্য এই টিকিট বেচিয়া বক্তৃতা দিবার প্রথা আমেরিকার।

এক সপ্তাহ পরে ‘বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে’ *Message of the Forest* শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই দুইটি প্রবন্ধের সারার্থ কবি স্বয়ং যাহা লিখিয়া দিয়াছেন, তাহা আমরা নিম্নে উদ্‌ধৃত করিলাম।

“আমাদের দেশে শিক্ষার আদর্শ কী হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে আমার প্রবন্ধ আমি কলিকাতায় এবং অন্য অনেক শহরে পাঠ করিয়াছি। সংক্ষেপে তাহার মর্মটুকু এখানে বলি।

“মানব-সংসারে জ্ঞানালোকের দিয়ালী-উৎসব চলিতেছে। প্রত্যেক জাতি আপনার আলোটিকে বড়ো করিয়া জ্বালাইলে তবে সকলে মিলিয়া এই উৎসব সমাধা হইবে। কোনো জাতির নিজের বিশেষ প্রদীপখানি যদি ভাঙিয়া দেওয়া যায়, অথবা তাহার অস্তিত্ব ভুলাইয়া দেওয়া যায় তবে তাহাতে সমস্ত জগতের ক্ষতি করা হয়।

১ The Centre of Indian Culture, by Rabindranath Tagore, with vignettes by Nandalal Bose. The Society for the promotion of National Education, Adyar, Madras 1919. Printed at Vasanta Press, Adyar, Madras. ঐ অনুবাদ— ভারতের শিক্ষার আদর্শ— অনুবাদক অমূল্যরতন প্রামাণিক। সবুজ পত্র ১৩২৮ (৪ সংখ্যায় মুদ্রিত)।

২ The Message of the Forest, Modern Review, 1919 May.

৩ গান্ধারীর আবেদন (১৮৯৭)। Mother's Prayer, Modern Review, 1919 June. দ্র. The Fugitive (1921).

"এ কথা প্রমাণ হইয়া গেছে যে, ভারতবর্ষ নিজেরই মানসশক্তি দিয়া বিশ্বসমস্যা গভীর ভাবে চিন্তা করিয়াছে এবং আপন বুদ্ধিতে তাহার সমাধানের চেষ্টা পাইয়াছে। সেই শিক্ষাই আমাদের দেশের পক্ষে সত্য শিক্ষা, যাহাতে করিয়া পুনরাবৃত্তি করিবার শিক্ষা, মনের শিক্ষা নহে, তাহা কলের দ্বারা ঘটিতে পারে।

"ভারতবর্ষ যখন নিজের শক্তিতে মনন করিয়াছে তখন তাহার মনের ঐক্য ছিল—এখন সেই মন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে। এখন তাহার মনের বড়ো বড়ো শাখাগুলি একটি কাণ্ডের মধ্যে নিজেদের বৃহৎ যোগ অনুভব করিতে ভুলিয়া গেছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে এক চেতনাসূত্রের বিচ্ছেদই সমস্ত দেহের পক্ষে সাংঘাতিক। সেইরূপ ভারতবর্ষের যে-মন আজ হিন্দু বৌদ্ধ জৈন শিখ মুসলমান খ্রীষ্টানদের মধ্যে বিভক্ত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া আছে সে-মন আপনার করিয়া কিছু গ্রহণ করিতে বা আপনার করিয়া কিছু দান করিতে পারিতেছে না। দশ আঙুলকে যুক্ত করিয়া অঞ্জলি বাঁধিতে হয়— নেবার বেলাও তাহার প্রয়োজন, দেবার বেলাও। অতএব ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈদিক পৌরাণিক বৌদ্ধ জৈন মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত চিত্তকে সম্মিলিত ও চিত্ত-সম্পদকে সংগৃহীত করিতে হইবে ; এই নানা ধারা দিয়া ভারতবর্ষের মন কেমন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে তাহা জানিতে হইবে। এইরূপ উপায়েই ভারতবর্ষ আপনার নানা বিভাগের মধ্য দিয়া আপনার সমগ্রতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। তেমনি করিয়া আপনাকে বিস্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট করিয়া না জানিলে যে শিক্ষা সে গ্রহণ করিবে তাহা ভিক্ষার মতো গ্রহণ করিবে। সেরূপ ভিক্ষা-জীবিতায় কখনো কোনো জাতি সম্পদশালী হইতে পারে না।

"দ্বিতীয় কথা এই যে, শিক্ষার প্রকৃত ক্ষেত্র সেখানেই যেখানে বিদ্যার উদ্ভাবনা চলিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন, তাহার গৌণ কাজ সেই বিদ্যাকে দান করা। বিদ্যার ক্ষেত্রে সেই সকল মনীষীদিগকে আহ্বান করিতে হইবে যাঁহারা নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা অনুসন্ধান আবিষ্কার ও সৃষ্টির কার্যে নিবিষ্ট আছেন। তাঁহারা যেখানেই নিজের কাজে একত্র মিলিত হইবেন সেইখানে স্বভাবতই জ্ঞানের উৎস উৎসারিত হইবে, সেই উৎসধারার নির্ঝরিণীতটেই দেশের সত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইবে। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের নকল হইবে না।

"তৃতীয় কথা এই যে, সকল দেশেই শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রার যোগ আছে। আমাদের দেশে কেবলমাত্র কেরাণীগিরি ওকালতী ডাক্তারি ডেপুটিগিরি দারোগাগিরি মুন্সেফি প্রভৃতি ভদ্রসমাজে প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসায়ের সঙ্গেই আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষযোগ। যেখানে চাষ হইতেছে, কলুরঘানি কুমারের চাক-ঘুরিতেছে সেখানে এ শিক্ষার কোনো স্পর্শও পৌঁছায় নাই। অন্য কোনো শিক্ষিত দেশে এমন দুর্যোগ ঘটিতে দেখা যায় না। তাহার কারণ আমাদের নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের মাটির উপরে নাই, তাহা পরগাছার মতো পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে। ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র তাহার কৃষিতত্ত্ব তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠা-স্থানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গো-পালন করিবে, কাপড় বুনিবে, এবং নিজের আর্থিক সম্বললাভের জন্য সমবায় প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র শিক্ষক ও চারিদিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে।

"এইরূপ আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি 'বিশ্বভারতী' নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি।"[১]

১ বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩২৬ বৈশাখ। দ্র. বিশ্বভারতী, ১৩৫৮ পৌষ ৭, পৃ. ৭-১০।

বাতায়নিকের পত্র

১৩২৫ চৈত্রের শেষ দিকে কবি দক্ষিণ-ভারত সফর ও কলিকাতায় বক্তৃতাদি করিয়া শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন। এবার কবি দেহলিতে উঠিলেন না; দেহলির দক্ষিণে পিয়ার্সন একখানি একতলা বাড়ি নির্মাণ করিয়াছিলেন; তাহার উপর দ্বিতল উঠিয়াছে; নীচেরতলায় মীরাদেবী ছেলেমেয়ে লইয়া থাকেন— উপরে কবির স্থান হইয়াছে; দেহলিতে আসিয়াছেন দিনেন্দ্রনাথ সস্ত্রীক। এই সময়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সপরিবারে এখানে থাকেন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র প্রসাদের (মুলু) পড়াশুনার জন্য— প্রসাদ বিদ্যালয়ের ছাত্র। এই সময়ে কবির আশ্রমজীবনের অতি সুন্দর বর্ণনা সীতাদেবীর 'পুণ্যস্মৃতি'তে আছে (পৃ. ৪২৬ হইতে)।

চৈত্র মাসের শেষ দিকে কয়েকদিনের জন্য কবি কাশী গেলেন— অবশ্য কলিকাতা হইয়া। কাশী হইতে বোধ হয় ৮ এপ্রিল (মঙ্গলবার) ঘুরিয়া আসেন, শরীর খুব ক্লান্ত বলিয়া পরদিন মন্দিরে উপাসনা করিতে পারিলেন না। ৩০ চৈত্র (১৩ এপ্রিল) বর্ষশেষ— কবির শরীর খারাপ থাকা সত্ত্বেও সন্ধ্যায় উপাসনা এবং পরদিন প্রত্যুষে নববর্ষের (১৩২৬) মন্দিরের উপাসনাদি করিলেন।

আশ্রমে ফিরিয়া কবির মনে 'শান্তিনিকেতন' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লিখিলেন, "এই কাগজে আমরা যাহা কিছু বলিব, তাহা কেবলমাত্র আমাদের আশ্রমের ছাত্র ও আত্মীয়দিগকেই লক্ষ্য করিয়া বলিব।·· আমাদের আলাপ ঘরের আলাপ।" গত বৎসর (১৯১৮) শান্তিনিকেতনে একটি ছোটো ছাপাখানা স্থাপিত হয়, সুতরাং নিজেদের সুবিধামত পত্রিকা প্রকাশে বাধা কম। ১৩২৬এর বৈশাখ মাস হইতে 'শান্তিনিকেতন'[১] বাহির হইল। জগদানন্দ রায় এই পত্রিকার সম্পাদক হইলেও প্রথম সংখ্যার অধিকাংশ রচনাই কবির লেখনীপ্রসূত।

কবি শান্তিনিকেতনে দেহলিতে থাকেন। দেহলির দোতালায় একটি মাত্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ, চারিদিকে সংকীর্ণ বারান্দা; তাহার দুই দিক ঘেরা; একদিকে কাপড়চোপড় থাকে— আর একটিতে ছোট একটি টেবিল ও চেয়ার— সেইখানে বসিয়া কবি লেখাপড়া করেন। পশ্চিম দিকে তাঁহার পিঠ; শালকাঠের পাল্লার ফাঁক দিয়া রোদ ও রোদের ঝাঁঝ আসে; কবি যখন দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণে যান, তখন আমার উপর ঐ ঘরের ভার ছিল, তাই জানি ঘরের অবস্থা। মাঝের ঘরটিতে শুইবার ব্যবস্থা ও লিখিবার জন্য নিচু খাটের উপর চৌকি। পূর্বদিকে একটি বড় ছাদ— সন্ধ্যার পর সেইখানে বসেন— আশ্রমের লোকজন জমায়েত হন সেখানে। আমাদের কত রমণীয় সন্ধ্যা যে এই ছাদের উপর কবির সান্নিধ্যে কাটিয়াছে— তাহার স্মৃতি এখনো উজ্জ্বল।

চৈত্র মাসের দারুণ গরমে এইখানে কবি আছেন। আপন মনে পড়াশুনা করেন— শান্তিনিকেতন পত্রিকার জন্য লেখেন ও অন্যকে লিখিবার জন্য তাগিদ দেন। আর সবুজ পত্রের সম্পাদকের নিকট হইতে নূতন লেখার জন্য তাগিদ পান কিন্তু বড়ো কিছু লিখিবার মতো প্রেরণা নাই। তাই মনের ভাবনাগুলিকে পত্রের মধ্যে যদৃচ্ছক্রমে লিখিয়া যান। মৈসুর হইতে ফিরিয়া কবি আবার বিদ্যালয়ের নানা কাজের মধ্যে জড়াইয়া পড়িয়াছেন; বিশেষভাবে শিশুদের লইয়া খুব ব্যস্ত। প্রথম চৌধুরীকে লিখিতেছেন—"আমার পদোন্নতি হয়েচে।·· শিশুমহারাজের সভায়

১ Edited, printed & published by Jagadananda Roy, Santiniketan Press. P.O. Santiniketan, Dist. Birbhum. শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩২৬ বৈশাখ ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের রচনা— সূচনা, গান (পাখি আমার নীড়ের পাখি), নববর্ষ (১৩২৬), মৈসুরের কথা, তথাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী, ইংরেজী শিক্ষা। পৃ. ১-৪।

সখার পদ পেয়েচি।··যৌবন মধ্যাহ্ন পেরিয়ে আমার আয়ু চিরশ্যামল শিশুদিগন্তের দিকে নেমেচে।··আমার মনিব এসেচেন শিশু হয়ে, পুরস্কারও পাচ্চি। তাঁর কাজে শাস্তি অল্প, শান্তি যথেষ্ট, কিন্তু ছুটি একটুও নেই, সেইজন্য এখান থেকে আমি তোমাদের জয় কামনা করি, কিন্তু তোমাদের তালে তালে পা ফেলে তোমাদের অভিযানে চল্‌ব এখন আমার সে অবকাশ নেই। আগামী কালে যারা যুবক হবে আমি এখন তাদের সঙ্গ নিয়েছি।"[১]

পঁচিশে বৈশাখ (১৩২৬) শান্তির মধ্যে কবির ৫৯তম জন্মোৎসব শান্তিনিকেতনে সম্পন্ন হইল। জন্মদিনের ভাবনাটি ব্যক্ত হয় পূর্বদিনে রচিত একটি গানে—'আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় বারে বারে ডাক দিয়ে যায় নূতন পাতার দ্বারে দ্বারে'।[২]

এই কথাটি আরেক ভাবে ব্যক্ত করেন পূর্বোদ্ধৃত পত্র মধ্যে। তারুণ্য নূতন নূতন কালে নূতন নূতন রূপে নূতন নূতন পুষ্পপল্লবে নিজেকে বারে বারে প্রকাশ করে, 'ফাল্গুনী'র মর্মকথা।

বিদ্যালয় বন্ধ হইবার পূর্বে ১১ই মে, ২৮ বৈশাখ শিক্ষক ও ছাত্ররা মিলিয়া 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয় করিল। কবি কোনো ভূমিকা গ্রহণ না করিলেও রিহর্সল প্রভৃতিতে যথানিয়মে সহায়তা করিতেছেন।

বিদ্যালয় বন্ধ হইয়া গেলে আশ্রম প্রায় জনশূন্য; তখনো আশ্রমের ভিতরে ও বাহিরে লোকের ভিড় জমে নাই। গুরুপল্লীর খড়ের ঘরগুলি তখনো নির্মিত হয় নাই, পূর্বদিকে দিগন্তব্যাপী প্রান্তর—পূর্বপল্লীর শহরতলী তখনো বসে নাই।

সবুজ পত্রের সম্পাদককে কবি ৩০শে এপ্রিল (১৭ বৈশাখ) যে চিঠি লেখেন তাহা ঐ পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াই সম্পাদক নূতন লেখার জন্য তাগিদ দিতেছেন। তদুত্তরে ২রা জ্যৈষ্ঠ প্রমথ চৌধুরীকে লিখিতেছেন, তিনি যে লেখা পাঠাইবেন তাহা "বৈশাখের বালুতট বাহিনী। মন্দস্রোত ক্ষীণ ধারাটির মতো··।" এই লেখাগুলি হইতেছে বাতায়নিকের পত্র[৩] (৩-৮ জ্যৈষ্ঠের মধ্যে লেখা)।

বালিকা রাণুকে কবি লিখিতেছেন, "তুমি গেচ কাশী থেকে সোলনে,[৪] আমি এসেচি আমার লেখবার ডেস্ক থেকে আমার জানলার ধারের লম্বা কেদারায়। খুব বদল,··তোমার ভ্রমণে আমার ভ্রমণে একটি মূলগত প্রভেদ আছে, তুমি নিজে চলে চলে ভ্রমণ করচ কিন্তু আমি নিজে থাকি স্থির আর আমার সামনে যা-কিছু চলচে, তাদের চলায় আমার চলা। এই হচ্ছে রাজার উপযুক্ত ভ্রমণ—অর্থাৎ আমার হয়ে অন্যে ভ্রমণ করচে, চলবার জন্যে আমার নিজেকে চলতে হচ্চে না।"[৫] বাতায়নিকের পত্র চতুষ্টয় এই বাতায়ন-বিলাসী কবি-মনের ভ্রমণকাহিনী।

১ সবুজ পত্র, ১৩২৬ বৈশাখ। চিঠিপত্র ৫, পত্র ৭৩; ১৭ বৈশাখ ১৩২৬ (৩০ এপ্রিল ১৯১৯)।

২ গীতবিতান, পৃ. ৫৫৫।

৩ চিঠিপত্র ৫, ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬। "একটা লেখা আজ লিখে রেজেস্ট্রি করে পাঠালুম।" (পত্র ৭৬)। ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬। "তোমার কাগজের জন্য দুটো পত্র পরে পরে পাঠিয়েছি। আবার আজ আর একটা পাঠাচ্চি।" (পত্র ৭৭)। ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬। "Still they come. কিন্তু বাস্। ···চারটেতে মিলে চতুর্দোলার বেহারার মত একটা কথাকেই কাঁধে করে নিয়ে চলেছে।" (পত্র ৭৮)। কিন্তু বাতায়নিকের পত্র প্রকাশিত হয় প্রবাসীতে।

৪ সোলন (Solan) পূর্বপঞ্জাব রাজ্য অন্তর্গত, সিমলা জেলার পার্বত্য স্বাস্থ্যনিবাস; কালকা হইতে সিমলার পথে ২৯ মাইল। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৩২। ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬।

৫ বাতায়নিকের পত্র: তু. A. C. Benson (1862-1925) লিখিত From a College Window (1906)। এই সময়ে Benson-এর বইগুলি লাইব্রেরীতে আসিয়াছিল— পিয়ার্সনের ব্যক্তিগত লাইব্রেরীর সঙ্গে আসে বলিয়া মনে হয়।

কবি লিখিতেছেন, "অন্যের সঙ্গে কথা কওয়া এবং অন্যের সঙ্গে চিঠি লেখার ব্যবস্থা আছে সংসার জুড়ে। আর নিজের-সঙ্গের সেটা কেবল এই বাতায়নটুকুতেই।"

এই পত্রধারায় কবি যে কথাগুলি আলোচনা করিয়াছেন তাহার পটভূমিতে আছে উদ্ধত শক্তিমান সফলকাম পাশ্চাত্যজাতির সমসাময়িক দুর্নীতিমূলক রাজনীতির সমালোচনা। আলোচনাটা শুরু হইয়াছে শক্তির অভিব্যক্তি ও প্রীতির বিকাশ লইয়া। "যারা শক্তিকেই চরম বলে জানে তারা আয়তনে বড়ো হতে চায়। টাকার সংখ্যা, লোকের সংখ্যা, উপকরণের সংখ্যা, সমস্তকেই তারা কেবল বহুগুণিত করতে থাকে, এইজন্যেই সিদ্ধিলাভের কামনায় এরা অন্যের অর্থ, অন্যের প্রাণ, অন্যের অধিকারকে বলি দেয়। শক্তিপূজার প্রধান অঙ্গ বলিদান। সেই বলির রক্তে পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে।"[১] শক্তি বস্তু-আশ্রয়ী; বস্তুতন্ত্রের প্রধান লক্ষণ হইতেছে বাহ্যপ্রকাশের পরিমাপ্যতা অর্থাৎ তার সসীমতা। কিন্তু সেইটাকেই চরমতত্ত্ব ও পরমতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করা যায় না। শক্তিকেই যদি সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বিরোধকেই চরম ও চিরন্তন বলিয়া মানিতে হয়। উপমা দিয়া কবি বলিলেন যে, শব্দকে বাড়াইয়া চড়াইয়া যাহা হয়, তাহা হুংকার; আর শব্দকে সুর দিয়া লয় দিয়া সংযত সম্পূর্ণতা দান করিলে যাহা হয়, তাহা সংগীত; একটিতে মানুষ আতঙ্কিত, অপরটিতে আনন্দিত হয়। য়ুরোপে শক্তিধর্মের জয়গান হইতেছে, তাহার ধুয়া আমাদের দেশেও আসিয়াছে। বলশালী শক্তির পূজা করে— যাহা সে সংগ্রহ করিয়াছে, তাহাকে রক্ষার জন্য,— আর দুর্বল শক্তির পূজা করে—অন্যের যাহা আছে তাহাকে পাইবার জন্য; এক জায়গায় আছে বীর্য—অন্যস্থানে আছে লোলুপতা। ব্যক্তি যাহা বুদ্ধিবলে পাইয়াছে, জনতা তাহা শক্তি দিয়া জবরদস্তি করিয়া আত্মসাৎ করিবার জন্য লালায়িত। কবি বলিতেছেন, "এই বড়ো দুঃসময়ে কামনা করি, শক্তি-বীভৎসতাকে কিছুতেই আমরা ভয় করব না, ভক্তিও করব না— তাকে উপেক্ষা করব, তাকে অবজ্ঞা করব।"

কিন্তু আজ মানুষের মনের সমস্ত ফাঁকটুকু চারিদিকের রাজনৈতিক অনাসৃষ্টিতে আচ্ছন্ন। কবির মতে বাড়ির জমির সবটাই যদি ঘর হয় এবং উঠানের জায়গা না থাকে, সে-যেমন অসম্পূর্ণ গৃহ— জীবনের কাজের মধ্যে অবসর না-থাকাও তেমনি ভয়াবহ দুর্ভাগ্য। মনের মধ্যে বিশ্বশক্তিকে উপলব্ধি করিবার উদার অবকাশের প্রয়োজন— ধ্যানের জন্য নির্জন সময়ের আবশ্যকতা— এ কথা আমাদের দেশ চিরদিনই স্বীকার করিয়া আসিয়াছে; কিন্তু ভারতের সে অবকাশ নষ্ট হইতে চলিয়াছে।

সবলের সঙ্গে দুর্বলের বৈষম্য আজ বড়ই প্রবল; "আজকের দিনে দুর্বল যতো ভয়ংকর দুর্বল জগতের ইতিহাসে এমন আর কোনোদিনই ছিল না।" প্রথম মহাযুদ্ধের সময় (১৯১৪ অগস্ট - ১৯১৮ নভেম্বর) ধর্মাধর্মের বোধ যেরূপ ছিল, যুদ্ধান্তে তাহার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে ধর্মের দিক হইতে যেসব কথা শোনা গিয়াছিল তাহাতে লোকের মনে হয় যে, যুদ্ধের অগ্নিতে— কলিযুগের সমস্ত পাপ দগ্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু যুদ্ধান্তে আজ যখন য়ুরোপে পরাজিত জাতির বিচার ও তাহার রাজ্য সাম্রাজ্য লইয়া ভাগ-বাঁটোয়ারার জন্য শান্তি-বৈঠক বসিয়াছে, তখন সেখানে মানুষের মনের পরিবর্তনের কোনো চিহ্ন পাওয়া যাইতেছে না।[২] মাত্র ব্যবস্থা পরিবর্তনের দ্বারা

১ কালান্তর, ১৩৫৫ সংস্করণ, পৃ. ১২৬-২৭।

২ The Peace Conference was formally opened on January 18, 1919, at Paris, with 70 delegates representing 27 of the victorious powers. The Germans were excluded. The treaty was submitted to the German delegation on May 7. The Treaty of Versailles was signed on 28 June 1919 by the Germans: other treaties were separately accepted by Austria, Bulgaria, Hungary and Turkey.

পাশ্চাত্য জগতের রাজনীতির কোনো পরিবর্তন হইবার নহে। কবির প্রশ্ন—এত আগুনেও কলিযুগের অন্ত্যেষ্টি সৎকার হইল না কেন। তাহার কারণ আধুনিক সমাজ লোভের (acquisitiveness) উপর প্রতিষ্টিত, প্রবল কিছুতেই কিছু হারাইতে চাহে না, তাই প্রবলে প্রবলে চলে ডিপ্লোমেসি বা কুটনীতি বা মিথ্যার চাতুরী, শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ হয় অনিবার্য; আর দুর্বলের উপরে চলে ধর্মের স্তোকবাক্য ও অদৃশ্য শোষণনীতি; পরে চলে প্রচণ্ড শাসন।

প্রবল যখন সদর্পে দুর্বলকে শোষণ ও শাসন করে তখন তার প্রতিক্রিয়ায় উভয়ই নষ্ট হয়। বহুদিনের বণিক মনোবৃত্তি জাতিকে অধঃপতিত করে; আবার বহুদিনের দাসত্ব দুর্বলকে অমানুষ করিয়া ফেলে। ইংরেজের জীবনে একটি ও ভারতীয়দের জীবনে অপরটি ফলিয়াছে।

"ভারতবর্ষে আমরাও এ কাজ করেছি। শূদ্রকে ব্রাহ্মণ এত দুর্বল করেছিলো যে তার সম্বন্ধে ব্রাহ্মণের না ছিল লজ্জা, না ছিল ভয়। দেশজুড়ে তার যে ফল ফলেছে তা বোঝবার শক্তি পর্যন্ত চলে গেছে, দুর্গতি এত গভীর।" · · "ন্যায়পরতার আদর্শ যে নেমে চলেছে, বলদর্পে মানুষ সেটা বুঝতে পারে না।" · · "দুর্বলের সঙ্গে ব্যবহারে আমাদের বিচার-বুদ্ধি নষ্ট হয়, নিজেদের এক-আদর্শে বিচার করি, অন্যদের অন্য-আদর্শে।" এই কথা কবি অন্যভাবে বহুকাল পূর্বে বলেন 'ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত'[১] প্রবন্ধে।

সমসাময়িক অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বড়ো দুঃখেই কবি বলিতেছেন, "একদিকে ভয়, আর একদিকে কান্না, দুর্বলের এইটেই হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো লজ্জা।" · · "আর যাই করি ভয় আমরা করব না।" · · "নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করো, ঐ বীভৎস শক্তিমান মানুষটাকে যতো বড়ো দেখাচ্ছে সে কি সত্যই ততো বড়ো?"[২]

ভার্সাইতে শান্তি-বৈঠক বসিয়াছে—যুদ্ধের শেষে বিজয়ী আমেরিকান, ইংরেজ, ফরাসী মিলিয়া পরাজিত জারমান, অস্ট্রিয়ান, বুলগার ও তুর্কীর ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের জন্য সমবেত। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বলিলেন, য়ুরোপীয় জাতিসমূহের লোভ কোথাও বাধা পায় না বলিয়া শান্তিবৈঠকের পক্ষে জগতে শান্তি আনা অসাধ্য। "কলে অনেক জিনিস তৈরি হচ্ছে, কিন্তু কলে-তৈরি শান্তিকে বিশ্বাস করি না। কর্মিক, ধনিকের মধ্যে যে অশান্তি—তার কারণ লোভ। শেষকালে দাঁড়ায় এই, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।" বলা বাহুল্য, মানুষের এই অসংযত লোভের পাপ বার বার জগতে যুদ্ধ আনিতেছে।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কবি বলিলেন, "আমাদের জন্য একটা বড়ো পথ আছে, সে হচ্ছে দুঃখের উপরে যাবার পথ। রিপু আমাদের বাইরে থেকে আঘাত দিচ্ছে—দিক্, তাকে আমরা অন্তরে আশ্রয় দেবো না। যারা মারে তাদের চাইতে আমরা যখন বড়ো হতে পারব তখন আমাদের মার খাওয়া ধন্য হবে। সেই বড়ো হবার পথ—না-লড়াই করা, না-দরখাস্ত লেখা।" মহাত্মাজীর জীবনে এই কথাটি সার্থক হইয়াছে।

আজ জগতে সর্বত্র শিব বা মঙ্গলের সহিত শক্তির বিরোধ। উদ্ধত শক্তি মঙ্গলবোধকে অসাড় করিতে উদ্যত। শক্তির সহিত শিব বা মঙ্গলের লড়াই-এর কথা বাংলাদেশের মঙ্গল সাহিত্যের মধ্যে পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'শিব'কে সরাইয়া চণ্ডীর নাম লইয়া দুর্বলকে অভিভূত করা হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "শক্তির কাছে চাঁদসদাগরের পরাভবটা তেমন মারাত্মক নহে, যেমন অপমান শক্তির কাছে মাথা হেঁট করায়।

১ ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত, বঙ্গদর্শন ১৩১০ আশ্বিন। গদ্যগ্রন্থাবলী ১২। স্বদেশ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১১, পৃ. ৪৮৯।

২ 'ভয় হ'তে তব অভয় মাঝে, নূতন জনম দাও' বলিয়া রবীন্দ্রনাথ একদিন গান রচিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে আশ্রমে 'অভয়-ব্রতী' নামে সংঘ গঠিত হয় এই অভয়মন্ত্র লইয়া। প্রায়শ্চিত্তের ধনঞ্জয় বৈরাগীর বাণীতে ও জীবনে এই অভয়মন্ত্রের সাক্ষ্য বহন করে। গান্ধীজি নির্জীব ভারতীয়দেরও এই অভয়জীবন লাভের জন্য আহ্বান করিতেছেন।

যে-আত্মা অভয়, যে-আত্মা অমর সে আপন প্রতিষ্ঠা থেকে নেমে এসে ভয়কে মৃত্যুকে দেবতা ব'লে, আপনার চেয়ে বড়ো ব'লে মানলে। এইখানেই শক্তির সকলের চেয়ে বীভৎস পরিচয় পাওয়া গেল।" কবির দুঃখ যে ভারতবর্ষ আজ সেই মিথ্যা ন্যাশনালিজম্ দেবতাকে, সেই শক্তি-মত্ততাকে ধর্মরাজের আসন দিতে উদ্যত।

শেষ পত্রখানিতে কবি তাঁহার পুরাতন কথারই আলোচনা করিয়াছেন, মানুষের ধর্মবুদ্ধি ও সমাজবুদ্ধি যে একই যুক্তি মাত্রায় বাঁধা নয়, সেই কথাটাই। দাসত্বের সমস্ত বিধি সমাজের মধ্যে বিচিত্র আকারে প্রবল করিয়া রাখিব, আর বিদেশী প্রভুর নিকট হইতে তাহাদের ঔদার্যের দ্বারা প্রভুত্বের সমান অধিকার দাবী করিব—অর্থাৎ প্রভুশক্তির নিকট আমরা যে সাম্য অধিকার দাবী করিতেছি তাহা আপামর সাধারণের জন্য দিতে আমরা পরাঙ্মুখ।··"যে দেশে ধর্মবুদ্ধিতে এবং কর্মবুদ্ধিতে মানুষ নিজেকে দাসানুদাস করে রেখেছে, যে দেশে কর্তৃত্বের অধিকার চাইবার সত্যকার জোর মানুষের নিজের মধ্যে থাকতেই পারে না, সে-দেশে এই সকল অধিকারের জন্যে পরের বদান্যতার উপরে নির্ভর করতে হয়।"

পত্রগুলি[১] সম্বন্ধে কবি যে লিখিয়াছিলেন "তাহারা চতুর্দোলার বেহারার মতো একটা কথাকেই কাঁধে করে নিয়ে চলেচে" তাহা অতি সত্য; কবির এই নৈর্ব্যক্তিক পত্রধারার নির্গলিত অর্থ হইতেছে—ভিক্ষার দ্বারা বা কান্নার দ্বারা স্বাধীনতা পাওয়া যায় না; যে আত্মার শক্তিবলে পশুশক্তি পরাভূত হয় সেই আত্মশক্তির সাধনার দ্বারা স্বাধীনতা আসে। ১৯১৯ সালের কথা এসব।

বাতায়নিকের পত্র মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন বাংলাসাহিত্যে মঙ্গল কাব্যে শিব ও শক্তির দ্বন্দ্ব ও শিবের পরাজয় ও মনসা প্রভৃতি গ্রাম্য শক্তিদেবতার জয়ের কাহিনীকে লোকে যে 'মঙ্গল' কাব্য বলিয়া ঘোষণা করে, তাহা পরাভূত মনোভাবেরই পরিচায়ক।

কবির এই মতের প্রতিবাদ হয়; তখন কবি 'শক্তিপূজা' নামে আর-একটি প্রবন্ধ লিখিয়া (প্রবাসী ১৩২৬ কার্তিক) তাহার উত্তর ও শিব-শক্তির বিরোধের ইতিহাসটি ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা করেন।

বাতায়নিকের পত্র রচনার অনতিকাল পরেই কবির লেখায় ও চিন্তাধারায় প্রকাণ্ড একটা ছেদ পড়িল। পঞ্জাবের জালিনবালাবাগ ও তৎপরবর্তী অনাচারের কিছু কিছু সংবাদ এতদিন পরে এদেশে জানা গেল। এই সব অস্পষ্ট সংবাদে কবির মন উত্তেজিত, তিনি বাতায়নিকের পত্রধারার শেষ কিস্তি লিখিবার দিনই বালিকা রানুকে লিখিতেছেন (৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬), "তোমরা তো পাঞ্জাবে আছো, পাঞ্জাবের দুঃখের খবর বোধ হয় পাও। এই দুঃখের তাপ আমার বুকের পাঁজর পুড়িয়ে দিলে।"

সমস্ত ঘটনাটির পটভূমি না দিলে পাঠকদের নিকট বিষয়টি তেমন পরিস্ফুট না-ও হইতে পারে এই চিন্তা করিয়া সমসাময়িক ইতিহাস সংক্ষেপে পরবর্তী অধ্যায়ে প্রদত্ত হইল।

১ বাতায়নিকের পত্র— (৫ খানি) প্রবাসী ১৩২৬ আষাঢ়, পৃ. ২২১-২৩৫। কালান্তর ১৩৫৫-এর সংস্করণ, পৃ. ১২৩-১৫৭।

রৌলট অ্যাক্ট

ভারতে যুদ্ধোত্তর পর্বে শাসন-সংস্কার পরিকল্পনা প্রকাশিত হয় ১৯১৮ সালের ১২ জুলাই। ইহা মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট নামে সাধারণে পরিচিত— কারণ ভারতসচিব মণ্টেগু ও ভারতের বড়লাট চেম্‌সফোর্ডের যুক্ত সহিতে উহা প্রকাশিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের গতি তখন মিত্রশক্তির অনুকূলে ফিরিয়াছে; ইহার চারিমাস পরে ১১ নভেম্বর জারমেনি পরাজয় স্বীকার করিয়া যুদ্ধবিরতি প্রার্থনা করে।

মণ্টেগু যখন শাসন-সংস্কারের খসড়া প্রস্তুতে রত, ঠিক সেই সময়ে ভারত সরকার এতদ্দেশীয় বিপ্লবীদের কার্যকলাপ তদন্ত ও তাহা দমনের উপায় নির্দেশ করিবার জন্য এক কমিটি বসান (১০ ডিসেম্বর ১৯১৭)। এই কমিটির চেয়ারম্যান বিলাতের রৌলট নামে এক জজ— সেইজন্য এই কমিটি লোকমুখে 'রৌলট কমিটি' নামে পরিচিত— যদিও আসল নাম Sedition Committee। এই কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশিত হইল ৮ জুলাই ১৯১৮ অর্থাৎ মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড শাসন-সংস্কার-বিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশের চারিদিন পূর্বে। শোনা যায়, রৌলট কমিটির প্রতিবেদন বহু শত খণ্ড বিলাতে প্রেরিত হইয়াছিল। মুষ্টিমেয় যুবকের ব্যর্থ বিপ্লব-প্রচেষ্টার বিস্তারিত ইতিহাস যে-ভাবে চিত্রিত হইল, তাহাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ সাধারণ ইংরেজের মনে আতঙ্ক সৃষ্টিরই কথা। মণ্টেগু রিপোর্ট প্রকাশের প্রাক্কালে সিডিশন কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ অত্যন্ত অর্থপূর্ণ। দুনিয়ার লোককে ইংরেজ জানাইয়া দিতে চায় যে বিপ্লব ও সন্ত্রাসবাদের যে চিত্র পাওয়া যায়, তদ্দৃষ্টে ভারতে শাসন বিষয়ে ইহা অপেক্ষা উদারনীতি অবলম্বন করা যাইতে পারে না— কারণ ভারতকে ধাপে ধাপে দায়িত্বপূর্ণ স্বরাজ দিতে তাঁহারা প্রতিশ্রুত এবং এই বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতিতে অকস্মাৎ অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া কাহারও পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে না।

ব্রিটিশ কূটনীতির অর্থ ভারতীয়দের নিকট অস্পষ্ট থাকিল না। মণ্টেগু ১৯১৭ সালের শেষভাগে ভারত সফর করিয়া চলিয়া গেলে, রবীন্দ্রনাথ 'ছোট ও বড়' (প্রবাসী ১৩২৪ অগ্রহায়ণ) শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন যে, বড়ো ইংরেজ যাহা দিবে বলিয়া ভাবে, ছোটো ইংরেজ তাহার অনেকখানি নষ্ট করিয়া দেয়। ইংরেজের দানের ইতিহাসে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি মাত্র। এই সময়ে রচিত কবির একটি কথিকার মধ্যে রূপকস্থলে এই কথাটিই বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। "তুই পা-বাঁধা ঘোড়ার চাল দেখিয়া ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, ফিরে নিয়ে যাও আস্তাবলে।"[১]

বিপ্লবদমনের অজুহাতে রৌলট কমিটি ভারতীয় দণ্ডবিধির যেসব পরিবর্তন সুপারিশ করে, তাহা ভারতের ব্যবস্থাপক সভায় পাস হইলে ব্যক্তি স্বাধীনতা বিপর্যস্ত হইবে। এই আইন পাস যাহাতে না হয় তজ্জন্য দেশময় প্রতিবাদ শুরু হইল ১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে। দিল্লিতে যে কংগ্রেস বসে সেখানে এই বিলের প্রথম প্রতিবাদ জ্ঞাপিত হয়। কিন্তু অপরদিকে, গবর্মেণ্টেরও মুশকিল। কারণ ব্রিটিশ ভারতের বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতা বলে অর্ডিনান্স পাস করিয়া এতদিন শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হইতেছিল। কিন্তু আইনমতে যুদ্ধ শেষ হইবার ছয় মাস পরে অর্ডিনান্স আর কার্যকরী থাকিবে না; সেইজন্যই গবর্মেণ্টের পক্ষে ১৯১৯ সালের এপ্রিল হইতে দণ্ডবিধির পরিবর্তন করিতেই হইবে। নতুবা বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদীদের শাসনে রাখা যাইবে না।

ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিপ্লব দমনের জন্য রৌলট বিল্ উপস্থাপিত হইলে, ভারতীয় সদস্যগণ একযোগে বিরোধিতা করিলেন, কিন্তু তখন ব্যবস্থাপক সভায় ভারতীয় সদস্যের সংখ্যা নগণ্য; ২৩ মার্চ ১৯১৯ রৌলট বিল্ আইনে পরিণত হইল— ১ এপ্রিল হইতে উহা কার্যকরী হইবে।

১ মুক্তির ইতিহাস, সবুজ পত্র ১৩২৬ বৈশাখ (১৯১৯ এপ্রিল)। লিপিকা গ্রন্থে 'ঘোড়া' শিরোনামা। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬, পৃ. ১২৬।

গান্ধীজি বোম্বাই হইতে ঘোষণা করিলেন যে, ভারতীয়দের পক্ষে এই আইন মান্য করা অসম্ভব, এই আইন ভারতবাসীর ন্যায়সংগত ও মানুষের জন্মগত অধিকারের পরিপন্থী। তিনি এই আইনের প্রত্যাহার দাবী করিয়া বলিলেন যে অন্যথায় নিরুপদ্রব প্রতিরোধ (passive resistance) অবলম্বন করা অনিবার্য হইবে।

বিল্ পাস হইবার সাত দিন পরে (৩০ মার্চ) ভারতের সর্বত্র 'হরতাল' ঘোষিত হইল। হরতাল শব্দটি আজ যত সুপরিচিত ১৯১৯ সালে তাহা ছিল না। বলা বাহুল্য এই ধরণের আদেশ উপদেশ সকল শ্রেণীর জনতার পক্ষে শান্তভাবে পালন করা সম্ভব হয় না। অনিয়ন্ত্রিত অশিক্ষিত জনতা নানা উপদ্রব সৃষ্টি করিয়া সত্যাগ্রহের আদর্শ নষ্ট করিয়া দিল। দিল্লিতে জনতার সহিত পুলিশের সংঘর্ষে বহু লোক হতাহত হইল।

সাতদিন পরে ৬ই এপ্রিল গান্ধীজি পুনরায় হরতাল পালনের জন্য ফতোয়া দিলেন; কিন্তু জনতার উচ্ছৃঙ্খলতা ও পুলিশের গুণ্ডামি যুগপৎ চলিল। গান্ধীজি তখন বোম্বাইতে আছেন, দিল্লির উত্তেজনা শমিত করিবার জন্য বোম্বাই হইতে দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করিলে (৯ এপ্রিল) পথিমধ্যে তাঁহাকে পুলিশ আটকাইয়া ফেলে ও বোম্বাই-এ ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করে। দেশময় রাষ্ট্র হইল যে গান্ধীজি গ্রেপ্তার হইয়াছেন। এই মিথ্যা সংবাদ উত্তরভারতে প্রচারিত হইলে সর্বত্র বিক্ষোভ নানা ভাবে দেখা দিল। গান্ধীজির পরিকল্পিত সত্যাগ্রহ শান্ত, নিরুপদ্রব, সাত্ত্বিক, অহিংস— কিছুই থাকিল না; সর্বত্রই অসৎ-প্রকৃতির লোক এবং সরকারী চরের দৌরাত্ম্যে সত্যাগ্রহের আদর্শ চূর্ণ হইয়া গেল। অতঃপর ১০ এপ্রিল পঞ্জাব গবর্মেণ্ট ঐ প্রদেশে 'মার্শাল ল' বা ফৌজী আইন ঘোষণা করেন— সমস্ত শাসন ও বিচার-ব্যবস্থার ভার গিয়া বর্তাইল মিলিটারী বিভাগের উপর। অমৃতসরের ভার অর্পিত হয় জেনারেল ডায়ারের উপর ও লাহোরের ভার জেনারেল জনসনের উপর। মিলিটারীর উপর শাসনভার ন্যস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্জাবের সমস্ত সংবাদের উপর কালো পরদা পড়িয়া গেল— সভ্যজগত হইতে পঞ্জাব বিচ্ছিন্ন হইল।

দেশের সর্বত্র রাজনীতিক আন্দোলনের উত্তেজনায় মুখর— সকলেই যুদ্ধান্তে স্বাধীনতার স্পর্শলাভের জন্য উদগ্রীব, কিন্তু এ কী দুর্দৈব! পঞ্জাবের ইংরেজ প্রভু ও তাহাদের অন্নদাস ভারতীয় নরঘাতকদের দল এ কী তাণ্ডব শুরু করিল! অমৃতসরে প্রতিবৎসর বৈশাখী পূর্ণিমা উপলক্ষে কয়দিন জালিনবালাবাগে একটি মেলা হয়। মিলিটারী শাসনে আতঙ্কিত নগরবাসী মেলায় উপস্থিত হওয়া সম্বন্ধে দ্বিমনা। কিন্তু পুলিশের গুপ্তচর হংসরাজের প্ররোচনায় লোকে যথাপূর্ববৎ জালিনবালাবাগে সমবেত হয় (১৩ এপ্রিল ১৯১৯॥ ৩০ চৈত্র ১৩২৫ রবিবার, শুক্লা ত্রয়োদশী)। শহরের মিলিটারী শাসক ডায়ার[১] সেখানে ৯০ জন সৈন্য লইয়া উপস্থিত হন ও জনতার প্রতি কোনোপ্রকার সতর্কতার সংকেত না করিয়াই গুলিবর্ষণ করেন। ফলে ৩৭৯ জন লোক নিহত হয়— আহতের সংখ্যা আরও বেশি। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডেই পঞ্জাবের শাস্তির অবসান হইল না। শুরু হইল আঘাতের পর অপমান। মানুষকে উলঙ্গ করিয়া পথের চৌমাথায় চাবুক মারা, রাস্তার উপর পশুর মতো চারি-হাত-পায় চলিতে বাধ্য করা, ইংরেজমাত্রকেই 'সরকার সেলাম' অভিবাদন করা প্রভৃতি নানাবিধ নির্যাতন চলিল। এই পঞ্জাবেরই হিন্দু-মুসলমান-শিখরা কয়েক বৎসর পূর্বে প্রথম মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য লড়িয়াছিল। আজ স্বাধীনতাকামনার জন্য তাহারা ইংরেজের চোখে দুশমন।

রবীন্দ্রনাথ এই উত্তেজনার বাহিরে দাঁড়াইয়া দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেছেন প্রবাহের কোথায় কী আবর্ত! ১০ এপ্রিল পঞ্জাবে 'মার্শাল ল' ঘোষিত হইবার দুই দিন পর তিনি গান্ধীজির উদ্দেশে একখানি খোলা চিঠি লিখিলেন;

১ Reginald E. H. Dyer (1864-1927), British Soldier born in Punjab, was forced to resign after the Punjab affairs in March 1920.

উহা প্রকাশিত হইল ১৬ এপ্রিল কলিকাতার ইন্‌ডিয়ান ডেইলি নিউজ-এ ;—তখন পঞ্জাবের তাণ্ডব শুরু হইয়া গিয়াছে —কিন্তু তাহার কোনো সংবাদ কড়া মিলিটারী শাসনের জন্য বাহিরে প্রচারিত বা প্রকাশিত হইতে পারে নাই।

প্রিয় মহাত্মাজি—

শক্তি যে কোনো রূপেই নিজেকে প্রকাশ করুক-না কেন তার মধ্যে কোনো বিচার নেই, যুক্তি নেই। চোখে ঠুলি বাঁধা ঘোড়া যেমন অন্ধভাবে গাড়ি টেনে নিয়ে যায়—শক্তির গতিও সেই রকম। ঘোড়াকে চালনা করে যে মানুষ সেই তার গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে লক্ষ্যস্থলে নিয়ে যায়। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ এমন একটা শক্তি যাকে স্বভাবগুণে নৈতিক শক্তি বলা যায় না। এ শক্তি সত্যের পথে যেমন চালনা করতে পারে তেমনি পারে সত্যের বিরুদ্ধ পথেও। শক্তির প্রয়োগে বাঞ্ছিত ফললাভের সম্ভাবনা যখন দেখা যায় তখন তার অন্তর্নিহিত পাপ প্রকট হয় লোভের রূপ নিয়ে।

আপনার শিক্ষা এই যে মানুষ সত্যের দ্বারা কল্যাণের দ্বারা অন্যায় ও অমঙ্গল প্রতিহত করবে। কিন্তু এ সংগ্রাম বীরের সংগ্রাম। যারা প্রবৃত্তির তাড়নায় চালিত হয় এ-সংগ্রাম তাদের জন্য নয়। এক পক্ষের পাপ অন্য পক্ষের পাপকে ডেকে আনে, এক পক্ষের অবিচার ও অন্যায় লাঞ্ছনা অন্য পক্ষকে হিংসার পথে প্রবৃত্ত করে। দুঃখের কথা এই রকম এক অমঙ্গলের শক্তি উপস্থিত হয়েছে আমাদের দেশে। দেখতে পাচ্ছি ভয়ে হোক ক্রোধে হোক আমাদের শাসকসম্প্রদায়ের নখদন্ত আজ উদ্যত। এর ফলে আমাদের কেউ কেউ ব্যর্থ আক্রোশের চোরাগলিতে প্রতিহিংসার সুযোগ খুঁজতে বেরবে, কেউবা হতাশ হয়ে পথের মধ্যে বসে পড়বে। এই সংকট মুহূর্তে আপনি মহান্‌ জননেতারূপে দাঁড়িয়েছেন আমাদের মাঝখানে, প্রচার করেছেন ভারতের আদর্শের প্রতি আপনার অবিচল আস্থা। সেই আদর্শ বলে ভীরুর মতো অন্যায় সহ্য করা যেমন পাপ তেমনি কাপুরুষের মতো পিছন থেকে ছুরি মারাও পাপ। ভগবান বুদ্ধ তাঁর আপন যুগের জন্য এবং সর্বকালের জন্য যে বাণী রেখে গেছেন :

অক্‌কোধেন জিনে কোধং
অসাধুং সাধুনা জিনে—

সে বাণী আপনারও বাণী। এই কল্যাণশক্তি অন্তর্নিহিত অভয়মন্ত্রের দ্বারা আপন সত্যকে আপন বীর্যকে প্রকাশিত করুক। ভয় দেখিয়ে কার্যোদ্ধার করার সস্তা কৌশলকে এ যেন অস্বীকার করে। নিরস্ত্র জনতার উপর মারমন্ত্র নিক্ষেপ করার অগৌরবকে এ যেন ঘৃণা করে। মনে রাখতে হবে সত্যের জয় ন্যায়ের জয় কৃতকার্যতার উপর নির্ভরশীল নয়, হেরে গেলেও তার গৌরবহানি হয় না। অন্যায় যখন বিপুল আকার ধারণ করে প্রবল হয়ে আসে, তখন অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের মুখে সাহস করে দাঁড়ানোটাই আদর্শনিষ্ঠ পুরুষের আত্মিক জয়।

আমি বার বার বলেছি স্বাধীনতা এমন এক অমূল্য সম্পদ যা ভিক্ষা দ্বারা কিছুতেই লভ্য হতে পারে না। স্বাধীনতা পেতে হলে তাকে অর্জন করে নিতে হয়। ভারত স্বাধীনতা অর্জনের গৌরব তখনি লাভ করবে যখন সে বিশ্বের দরবারে প্রমাণ করতে পারবে যে যারা গায়ের জোরে দেশ শাসন করছে আত্মিক শক্তিতে ভারতবাসী তাদের চেয়ে বড়।

দুঃখের তপস্যা ভারতকে স্বীকার করে নিতে হবে, কারণ দুঃখই হলো মহতের মাথার কণ্টকমুকুট। ন্যায়নিষ্ঠার পুণ্য কবচ ধারণ করে তাকে কুণ্ঠাবিহীন ভাবে দাঁড়াতে হবে সেই তাদের সামনে, অবিনয়ের দ্বারা যারা আত্মার শক্তিকে লাঞ্ছিত করতে চায়।

মাতৃভূমির সেবার জন্য আপনি এমন একটি সময়ে আমাদের মধ্যে এসেছেন যখন দেশের দরকার আপনার মুখ থেকে ভারতের সেই শাশ্বত আদর্শের কথা শুনে নেওয়া। ধর্মবিজয়ের পথে দেশকে আপনি চালনা করুন। আজ

আমাদের রাষ্ট্রবুদ্ধিতে হীন দুর্বলতা প্রবেশ করেছে। আমরা ময়ূরপুচ্ছবায়সের মতো ভাবছি যে পশ্চিম থেকে ধারকরা কূটনীতির অপকৌশল আমাদের উদ্দেশ্যসাধনে সহায়তা করবে। এই হীনতা থেকে আপনি দেশকে উদ্ধার করুন।

আপনি অন্যায়ের প্রতিরোধে যে ব্যূহ রচনা করেছেন তার কোনো গোপন ছিদ্রপথ দিয়ে পাপ প্রবেশ করে যেন না আমাদের আত্মিক স্বাধীনতা দুর্বল করে দেয়—এই আমার একান্ত প্রার্থনা।

সত্যলাভের জন্য আপনি যে আত্মদান যজ্ঞে ব্রতী হয়েছেন, সে ব্রত যেন বৃথা বাগাড়ম্বরে পণ্ড না হয়, ধর্মের নামে আত্মপ্রবঞ্চনার মোহ যেন আমাদের গ্রাস না করে।[১]

পত্রশেষে 'নৈবেদ্য'র একটি কবিতা অনুবাদ ছিল।[২]

কবি শান্তিনিকেতনে আছেন, এন্‌ড্রুজও সেখানে। পঞ্জাবের ফৌজী শাসনের অনাচার কাহিনী অস্পষ্টভাবে কানে আসিতেছে, কিন্তু কিছুই জানা যাইতেছে না। এন্‌ড্রুজ অধীর হইয়া উঠিলেন, শান্তিনিকেতনে থাকিতে পারিলেন না, দিল্লি চলিয়া গেলেন (১৭ এপ্রিল)। দিল্লি পৌঁছিয়াও পঞ্জাবে কী ঘটিতেছে তাহার সঠিক খবর কিছুই সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। তবে জানিতে পারিলেন লাহোরের ট্রিবিউন কাগজের সম্পাদক কালীনাথ রায় রাজদ্রোহ অপরাধে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। কালীনাথ মডারেট দলের লোক অথচ তাঁহারই এই দশা; অন্যান্য সম্পাদকরা আতঙ্কিত। দিল্লির সম্পাদকগণ এন্‌ড্রুজের সাহায্য চাহিলে তিনি অবস্থা জানিবার জন্য অমৃতসর রওনা হইলেন। কিন্তু অমৃতসর স্টেশনে পৌঁছানো মাত্র তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া দিল্লী পাঠাইয়া দেওয়া হইল। কোথাও কোনো কূল না পাইয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ মনে এন্‌ড্রুজ শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন মে মাসের শেষাশেষি।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি পঞ্জাবের কোনো সংবাদ ফৌজী শাসনের নিষেধ-দুর্গ ভেদ করিয়া বাহিরে আসিতে পারে নাই; জনশ্রুতির মতো দুই একটি সংবাদ আসিতেছে— তাহার সত্যাসত্য নির্ধারণের কোনো ছিদ্র কোথাও নাই। মাসাধিক কাল মধ্যে যাহা কিছু জানা যাইতেছে তাহাতে কবির মন কী উদ্‌বিগ্ন ও কী উত্তেজিত তাহার আভাস পাই রানুকে লিখিত পত্রে (২২ মে); "আকাশের এই প্রতাপ আমি একরকম করে সইতে পারি কিন্তু মর্ত্যের প্রতাপ আর সহ্য হয় না। —পাঞ্জাবের · · দুঃখের তাপ আমার বুকের পাঁজর পুড়িয়ে দিলে।"[৩] আমাদের মনে হয় এন্‌ড্রুজ দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিয়া কবিকে জালিয়ানবালাবাগের সংবাদাদি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।[৪]

কবি শান্তিনিকেতনে স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না; ২৭ মে কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। কথা ছিল ২৯ মে শান্তিনিকেতনে আমাদের গৃহের কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে কবি পৌরোহিত্য করিবেন; সেইভাবে নিমন্ত্রণপত্র প্রকাশিত হয়। কিন্তু পঞ্জাবের সংবাদ পাইয়া সে সমস্ত ভুলিয়া গেলেন— কলিকাতায় চলিয়া গিয়া ২৮ মে প্রাতে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। তখন রামানন্দবাবু সপরিবারে বাস করেন কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের সংলগ্ন গলিতে।[৫] জীবনীলেখক সেদিন কলিকাতায়; রামানন্দবাবুর দ্বিতলের

১ এই পত্রটি শ্রীক্ষিতীশ রায় অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন; তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

২ 'তুমি সর্বাশ্রয়, এ কি শূন্যকথা', নৈবেদ্য ১৩০৮। রবীন্দ্র-রচনাবলী ৮, পৃ. ৪৫।

৩ ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৩৩। ৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬। [২২ মে ১৯১৯] পৃ. ৭৮।

৪ বহুকাল পরে কবি মংপুতে মৈত্রেয়ী দেবীকে বলেন বোধ হয় আশু চৌধুরীর ওখান থেকে খবর পান। কিন্তু তাহা ঠিক নয়। কারণ, রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এপ্রিলের গোড়ায়, তখন পঞ্জাবে কোনো হাঙ্গামা শুরু হয় নাই। দ্র. পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ ২য় সংস্করণ, পৃ. ৭৮ পাদটীকা।

৫ ২১০।৩।১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট; এখানেই প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ পত্রিকার আপিস ছিল।

সংকীর্ণ বারান্দায় উভয়কে কথা কহিতে দেখিয়াছিলাম— কবির কী গম্ভীর, কী স্তব্ধ মূর্তি। তখন আমরা জানিতাম না যে পঞ্জাবে কী ঘটিয়াছে এবং রামানন্দবাবুর সহিত কবি কী পরামর্শ করিতেছেন।

কবি কলিকাতায় আসিয়া পঞ্জাব অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা আহ্বানের প্রস্তাব করেন; কিন্তু কাহারও সাড়া পাওয়া গেল না। শেষে কবি নিজের কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন; ২৯ মে রাত্রে ভাইসরয় লর্ড চেম্‌সফোর্ডের উদ্দেশ্যে এক পত্র লিখিলেন। শুনিয়াছি শেষরাত্রে লেখা শেষ করিয়া শুইতে যান; পরদিন ঐ পত্র ভাইসরয়কে পাঠাইয়া দিয়া সংবাদপত্রে উহা প্রকাশের জন্য প্রেরণ করিলেন। তাঁহার এই পত্র সম্বন্ধে বাড়ির কাহাকেও এমনকি পুত্র রথীন্দ্রনাথকেও কিছু জানিতে দেন নাই; একমাত্র এন্‌ড্রুজ ছাড়া পত্রের কথা কেহ জানিতেন না। এই পত্রে কবি নাইটহুডের প্রতীক তাঁহার 'স্যর'[১] উপাধি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।[২]

বালিকা রাণুকে কবি ১ জুন লিখিলেন, "কলকাতায় এসে বড়োলাটকে চিঠি লিখেচি— আমার ঐ 'ছার' পদবীটা নিতে। · · আমি বলেচি, বুকের মধ্যে অনেক ব্যথা জমে উঠেছিল, · · তাই ভারের উপরে আমার ঐ উপাধির ভার আর বহন করতে পারচিনে; তাই ওটা মাথার উপর থেকে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করচি। যাক— এসব কথা আর বলতে ইচ্ছা করে না— আবার অন্য কথাও ভাবতে পারিনে।[৩]

দেশের এই পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ ভাইসরয়কে এই পত্র লিখিয়া যে কী দুঃসাহসিকতা করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। তখনো ভারত রক্ষা আইন (Defence of India Act) বলবৎ; রবীন্দ্রনাথ জানিতেন যে তিনি তাঁহার এই পত্রের জন্য ব্রিটিশ সরকারের নিকট হইতে চরম শাস্তিও পাইতে পারেন; কারণ ঠিক এই সময়ে পঞ্জাবে এর চেয়ে অনেক কম সরকার-বিরোধী কাজ বা কথার জন্য অনেকের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।

কলিকাতার ২ জুন তারিখের দৈনিকে রবীন্দ্রনাথের 'স্যর' পদবী ত্যাগপত্র মূল ও দৈনিক বসুমতীর অতিরিক্ত সংখ্যায় উহার অনুবাদ প্রকাশিত হইল।[৪] নিম্নে কবির পত্রের অনুবাদ প্রদত্ত হইতেছে—

১ স্যর উপাধি। ১৯১৫ সালে ৩ জুন সম্রাট ৫ম জর্জের জন্মদিনে কবিকে এই উপাধি প্রদত্ত হয়। সাহিত্যের জন্য কোনো ভারতীয় ইতিপূর্বে এই সম্মানে ভূষিত হন নাই। ঠিক চারিবৎসর পরে ১৯১৯, ২ জুন কবির স্যর উপাধি বর্জনের পত্র প্রকাশিত হয়।

২ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে পরে বলেন; খসড়াটি প্রশান্তচন্দ্রের নিকট আছে। দ্র. নির্মলকুমারী, 'কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে', পৃ. ৬৭; অমল হোম, পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৭৮ পাদটীকা।

৩ ভানুসিংহের পত্রাবলী [১৯৩০], পত্র ৩৪। কলিকাতা ১লা জুন ১৯১৯, পৃ. ৭৯।

৪ ভাইসরয়কে লিখিত পত্রের অনুবাদ প্রকাশিত হয় দৈনিক বসুমতী ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ শনিবার। ইংরেজি মূল কোনো কোনো কাগজে শনিবার ও বেশির ভাগ কাগজে সোমবার ২ জুন (১৯ জ্যৈষ্ঠ) প্রকাশিত হয়; তখনকার দিনে রবিবারে কোনো কাগজ প্রকাশিত হইত না। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখিত 'রবীন্দ্রনাথ' (বুক কোম্পানি) সম্বন্ধে পুস্তকটিতে (১৩৪৮) কবিকৃত এই অনুবাদটি প্রদত্ত হইয়াছিল।

অমল হোম, ১৯১৯-এর হাঙ্গামায় রবীন্দ্রনাথ; দেশ, শারদীয়া সংখ্যা ১৩৫৫। দ্র. তদীয়— পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ। ·· এখানে আর-একটি তথ্য আছে। গান্ধীজির ৭৫তম জন্মোৎসব উপলক্ষে যে গ্রন্থ মুদ্রিত হয়, তাহার জীবনপঞ্জীতে (p. 485) ছাপা হইয়াছে; 1920 August. On August 1, Gandhiji wrote to Viceroy surrendering Kaiser-I-Hind Gold Medal and Boer war Medal. Rabindranath Tagore returned Knighthood.

ইহা পাঠ করিয়া মনে হইতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি ১৯২০ অগস্ট ১ তারিখে সরকারী শিরোপা ত্যাগ করেন। বস্তুত গান্ধীজির পদবীত্যাগের একবৎসর দুইমাস পূর্বে রবীন্দ্রনাথ 'নাইট'পদবী বর্জন করিয়াছিলেন।

আরও একটি তথ্য আমাদের চোখে পড়িয়াছে: পট্টভি সীতারামাইয়া-র History of the Congress একখানি প্রামাণ্যগ্রন্থ; ইহাতে জালিনবালাবাগ হত্যাকাণ্ডের আলোচনা আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে তাঁহার স্যর উপাধি ত্যাগ করেন, তাহার উল্লেখমাত্র নাই।

"কয়েকটি স্থানীয় হাঙ্গামা শান্ত করিবার উপলক্ষে পঞ্জাব গবর্নমেণ্ট যে-সব উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার প্রচণ্ডতায় আজ আমাদের মন কঠিন আঘাত পাইয়া ভারতীয় প্রজাবৃন্দের নিরুপায় অবস্থার কথা স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছে। হতভাগ্য পঞ্জাবীদিগকে যে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে, তাহার অপরিমিত কঠোরতা ও সেই দণ্ডপ্রয়োগবিধির বিশেষত্ব, আমাদের মতে কয়েকটি আধুনিক ও পূর্বতন দৃষ্টান্ত বাদে সকল সভ্য শাসনতন্ত্রের ইতিহাসে তুলনাহীন। যে প্রজাদের প্রতি এইরূপ বিধান করা হইয়াছে, যখন চিন্তা করিয়া দেখা যায়, তাহারা কিরূপ নিরস্ত্র ও নিঃসম্বল, এবং যাহারা এইরূপ বিধান করিয়াছেন, তাঁহাদের লোকহনন-ব্যবস্থা কিরূপ নিদারুণ, নৈপুণ্যশালী, তখন একথা আমাদিগকে জোর করিয়াই বলিতে হইবে যে, এরূপ বিধান পোলিটিক্যাল প্রয়োজন বা ধর্মবিচারের দোহাই দিয়া নিজের সাফাই করিতে পারে না। পঞ্জাবী নেতারা যে অপমান ও দুঃখ ভোগ করিয়াছেন, নিষেধরুদ্ধ কঠোর বাধা ভেদ করিয়াও তাহার বিষয় ভারতবর্ষের দূরদূরান্তরে ব্যাপ্ত হইয়াছে। তদুপলক্ষে সর্বত্র জনসাধারণের মনে যে বেদনাপূর্ণ ধিক্কার জাগ্রত হইল আমাদের কর্তৃপক্ষ তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছেন, এবং সম্ভবতঃ এই কল্পনা করিয়া তাঁহারা আত্মশ্লাঘা বোধ করিতেছেন যে, ইহাতে আমাদিগের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হইল। এখানকার ইংরেজচালিত অধিকাংশ সংবাদপত্র এই নির্মমতার প্রশংসা করিয়াছে এবং কোনও কোনও কাগজে পাশব নৈষ্ঠুর্যের সহিত আমাদের দুঃখভোগ লইয়া পরিহাস করা হইয়াছে, অথচ আমাদের যে সকল শাসনকর্তা পীড়িত পক্ষের সংবাদপত্রে ব্যথিতের আর্তধ্বনি বা শাসননীতির ঔচিত্য আলোচনা বলপূর্বক অবরুদ্ধ করিবার জন্য নিদারুণ তৎপরতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারাই উক্ত ইংরেজচালিত সংবাদপত্রের কোনো চাঞ্চল্যকে কিছুমাত্র নিবারণ করেন নাই। যখন জানিলাম যে, আমাদের সকল দরবার ব্যর্থ হইল, যখন দেখা গেল প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তিতে আমাদের গবর্ণমেণ্টের রাজধর্মদৃষ্টি অন্ধ করিয়াছে, অথচ যখন নিশ্চয় জানি, নিজের প্রভূত বাহুবল ও চিরাগত ধর্ম-নিয়মের আনুযায়িক মহদাশয়তা অবলম্বন করা এই গবর্নমেণ্টের পক্ষে কত সহজ কার্য ছিল, তখন স্বদেশের কল্যাণ কামনায় আমি এইটুকু মাত্র করিবার সংকল্প করিয়াছি যে, আমাদের বহুকোটি যে ভারতীয় প্রজা অদ্য আকস্মিক আতঙ্কে নির্বাক হইয়াছে, তাহাদের আপত্তিকে বাণী দান করিবার সমস্ত দায়িত্ব এই পত্রযোগে আমি নিজে গ্রহণ করিব। অদ্যকার দিনে আমাদের ব্যক্তিগত সম্মানের পদবীগুলি চতুর্দিকবর্তী জাতিগত অবমাননার অসামঞ্জস্যের মধ্যে নিজের লজ্জাকেই স্পষ্টতর করিয়া প্রকাশ করিতেছে। অন্ততঃ আমি নিজের সম্বন্ধে এই কথা বলিতে পারি যে, আমার যে-সকল স্বদেশবাসী তাহাদের অকিঞ্চিৎকরতার লাঞ্ছনায় মনুষ্যের অযোগ্য অসম্মান সহ্য করিবার অধিকারী বলিয়া গণ্য হয়, নিজের সমস্ত বিশেষ সম্মান চিহ্ন বর্জন করিয়া আমি তাহাদেরই পার্শ্বে নামিয়া দাঁড়াইতে ইচ্ছা করি। রাজাধিরাজ ভারতেশ্বর আমাকে 'নাইট' উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন, সেই উপাধি পূর্বতন যে রাজপ্রতিনিধির হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাঁহার উদারচিত্ততার প্রতি চিরদিন আমার শ্রদ্ধা আছে। উপরে বিবৃত কারণবশতঃ বড় দুঃখেই আমি যথোচিত বিনয়ের সহিত শ্রীল শ্রীযুক্তের নিকট অদ্য এই উপরোধ উপস্থাপিত করিতে বাধ্য হইয়াছি যে, সেই 'নাইট' পদবী হইতে আমাকে নিষ্কৃতিদান করিবার ব্যবস্থা করা হয়।"

এইখানে প্রবাসী হইতে আমরা সমসাময়িক ঘটনার পটভূমিটুকু উদ্ধৃত করিতেছি—

"পঞ্জাবে 'ঠিক কি যে হইয়াছে' এবং কি কারণে হইয়াছে, তাহা বিস্তারিতভাবে জানিবার উপায় নাই। কারণ সরকারী সেন্সরের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনো খবর প্রকাশিত হইতে দেওয়া হয় নাই, কিন্তু ভিন্নপ্রদেশের এংলো-ইণ্ডিয়ান কোনো কোনো সংবাদদাতা পঞ্জাবে যাইতে পাইয়াছে; পঞ্জাবে সামরিক আইন অনুসারে যাহাদের বিচার হইয়াছে তাহারা অন্যপ্রদেশ হইতে নিজেদের আনীত উকিল-ব্যারিস্টার লইয়া যাইতে পারে নাই, পঞ্জাব

হইতে যাহারা বাহিরে আসিয়াছে, তাহারা কোনো চিঠিপত্র লইয়া যাইতেছে কিনা দেখিবার জন্য, কোনো কোনো রেলওয়ে স্টেশনে তাহাদের খানাতল্লাশি হইয়াছে; পঞ্জাব হইতে যাহাতে ডাকযোগে কেহ বাহিরের কোনো কাগজে খবর দিতে না পারে, তাহার চেষ্টাও হইয়াছে, যদিও তাহা সত্ত্বেও কিছু কিছু বেসরকারী সামান্য খবর যাহা বাহির হইয়াছে ও গুজব যাহা রটিয়াছে, তাহা হইতে পঞ্জাবে যে-সব কাণ্ড ঘটিয়াছে, তৎসম্বন্ধে লোকের মোটামুটি একটা ধারণা হইয়াছে। এবং তাহাতে জনসাধারণের মন সংক্ষুব্ধ, উত্তেজিত, সন্ত্রস্ত ও বিচলিত হইয়াছে। সরকারী ও সরকারের অনুমোদিত খবর ব্যতীত অন্য খবর যাহাতে বাহির না হয়, এবং বাহিরের কোনো লোক যাহাতে পঞ্জাবে অনুসন্ধান করিতে না যায়, পঞ্জাবের গবর্নমেণ্ট এই চেষ্টা করায় লোকের মনে এই সন্দেহও বদ্ধমূল হইয়াছে যে, পঞ্জাবে নিশ্চয়ই এমন অনেক ব্যাপার ঘটিয়াছে যাহা সরকারী কর্মচারীরা গোপন রাখিতে উৎসুক। তাহার উপর ক্রমে ক্রমে বিস্তর লোকের ফাঁসির, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের ও অন্যবিধ ভীষণ দণ্ডের খবর আসিতেছে। অথচ প্রেস আইন ও অন্যবিধ কঠোর আইন থাকায় এবং গবর্নমেণ্টের মেজাজ মহানুভব ফ্রেডারিকের মত না হওয়ায়, দেশের লোকদের মনের ভাব ঠিক প্রকাশিত হইতে পারিতেছে না। এই অবস্থায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ভারতের গবর্নর জেনারেল লর্ড চেম্‌সফোর্ডকে চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন।"—প্রবাসী ১৩২৬ আষাঢ় পৃ. ৩০০-৩০১। বিবিধ প্রসঙ্গ।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তখন কলিকাতায় মৃত্যুশয্যায়, শনিবারের দৈনিক বসুমতীতে প্রকাশিত কবির পত্রের অনুবাদ পাঠ করিয়া কবিকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। "রামেন্দ্রবাবু তাঁহার কনিষ্ঠকে দিয়া রবিবাবুকে বলিয়া পাঠান, 'আমি উত্থানশক্তিরহিত। আপনার পায়ের ধুলা চাই।' সোমবার প্রভাতে [২ জুন] রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রবাবুর শয্যাপার্শ্বে উপনীত হন। রামেন্দ্রবাবুর অনুরোধে রবিবাবু তাঁহার মূল পত্রখানি পড়িয়া শুনান। এ পৃথিবীতে রামেন্দ্রের এই শেষ শ্রবণ। রামেন্দ্রবাবু রবীন্দ্রনাথের পদধূলি গ্রহণ করেন। কিয়ৎকাল আলাপের পর রবীন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন; রামেন্দ্রসুন্দর তন্দ্রায় মগ্ন হইলেন। সেই তন্দ্রাই মহানিদ্রায় পরিণত হইল।"[১]

রবীন্দ্রনাথের পত্র প্রকাশিত হইলে চারিদিকে নানাপ্রকার সমালোচনা হইতে লাগিল; Englishman নামে সেযুগে একখানি ইংরেজদের দৈনিক ছিল; ঐ পত্রিকায় সম্পাদক লিখিলেন, 'It will not make ha'pworth worth of difference. As if it mattered a brass farthing whether Sir Rabindranath Tagore approved of the Government's policy or not! As if it mattered to the reputation, the honour and the security of British rule and justice whether this Bengalee poet remained a Knight or a plain Babu!'

ইন্‌ডিয়ান ডেইলি নিউজ নামে সান্ধ্য দৈনিক (৩ জুন) লিখিলেন যে রবীন্দ্রনাথের কাজ হঠকারিতাপূর্ণ; কিন্তু সম্পাদক লিখিলেন—'Rabindranath's abrogation of his Knighthood coupled with the challenge he has flung at the authorities, is a far more serious step than the surrender of his Knighthood by Dr. Subrahmaniya Iyer of Madras.' এলাহাবাদের ইন্‌ডিপেন্‌ডেন্ট (৩ জুন) লিখিলেন, 'Tagore's letter is remarkable in more ways than one, but perhaps is nothing more so than in its complete fidelity to the natural sentiment of all his fellow countrymen at the present hour.'

দেশীয় সংবাদপত্রগুলি কবির কাজে প্রশংসা করিলেন, কোনো পত্রিকা বলিলেন যে কবির পক্ষে এই উপাধি সম্রাটের নিকট হইতে আদৌ গ্রহণ করাই ভুল হইয়াছিল; এই মন্তব্য একেবারে উড়াইয়া দিবার মতো নহে—

১ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখিত প্রবন্ধ। দৈনিক বসুমতী [২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬]; দ্র. সাহিত্য।

কারণ তাঁহাদের জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারের স্বাজাত্যাভিমান যে প্রকার উগ্র ছিল, এবং কবির রাজনৈতিক মতামত যেভাবে তিনি স্বদেশীযুগে ব্যক্ত করিয়াছিলেন— তদ্দৃষ্টে এই উপাধি গ্রহণেই তাঁহার ভুল হইয়াছিল।[১] চারি বৎসর পরে কবি সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন— সাম্রাজ্যবাদীদের 'স্যর রবীন্দ্রনাথ' হইতে রবিবাবুকেই লোকে ফিরিয়া পাইল।

বিলাতের কাগজের মধ্যে 'ডেইলি হেরাল্ড'[২] লিখিলেন, 'রবীন্দ্রনাথ জারমান-প্রেমিক বা ব্রিটিশ-বিদ্বেষী নহেন; ভারতীয় নেতারা যে উপাধির খাতিরে তাহাদের জন্মগত অধিকার ত্যাগ করিবে না, তাহা রবীন্দ্রনাথের পত্র হইতে প্রতীয়মান হইতেছে।'

ম্যানচেস্টার গার্ডিয়েন কবির পত্র পাঠ করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়া লিখিলেন যে, 'কবি যেসব কথা বলিয়াছেন সে-সম্বন্ধে অবিলম্বে ভারত-সরকারের তদন্ত করা প্রয়োজন।' দি ঈস্ট অ্যাংগলিকান টাইমস এই কথাই লিখিলেন, 'আমরা যদি এখনি তাহা না করি, তবে We are a disgraced people.'

দেশীয়দের নিকট কবি অভিনন্দিত হইয়াছিলেন; পাটনার তদানীন্তন বিখ্যাত ব্যারিস্টার সার্ হাসান ইমাম ২ জুন পত্রটি পড়িয়াই কবিকে টেলিগ্রাম করিলেন— Have just read your letter to Viceroy. Country will be not merely qualified, but grateful for your noble protest in defence of her rights. Your action is as we expected. Please accept my most loving homage.

রবীন্দ্রনাথ 'নাইট' পদবী ত্যাগপত্র[৩] সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন না; লাহোরের ট্রিবিউন দৈনিকের সম্পাদক কালীনাথ রায় সাংবাদিকের কর্তব্য পালন করিতে গিয়া রাজরোষে পতিত হইয়া কারারুদ্ধ আছেন— তাঁহার মুক্তির জন্য রবীন্দ্রনাথ চেষ্টান্বিত হইলেন। অমল হোম তখন লাহোরে কালীনাথের সহকারী। অগস্ট মাসের শেষ দিকে অমল হোম পুনরায় ট্রিবিউন প্রকাশের ব্যবস্থা করিলে কবি তাঁহাকে লাহোরে এক পত্রে লেখেন (২৭ অগস্ট ১৯১৯) "আজকের কাগজে দেখলাম ট্রিবিউন আবার বেরিয়েছে— তোমার হাতে। খুশী হয়েছি কিন্তু শঙ্কা রয়েছে মনে। কর্তৃপক্ষের কুটিল ভ্রূকুটি কাটেনি এখনো। সন্তর্পণে তুমি এই ভার বহন কর— এই আমার কামনা। জেলে কালীনাথ রায়ের স্বাস্থ্যভঙ্গের সংবাদে উদ্‌বিগ্ন রয়েছি। তাঁর মুক্তি প্রার্থনা করে মণ্টেগু ও লর্ড সিংহ দুজনকেই লিখেছি, ফলাফলের অপেক্ষা, আর কি করবার আছে? ভরসা বেশি রেখো না।"

কবি শঙ্কর নায়ারকেও পত্র দেন। কালীনাথের উকিল সুধীর মুখোপাধ্যায় নায়ার-এর সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শের জন্য দেখা করিতে গেলে তিনি বলেন যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকেও পত্র দিয়াছেন, "তবে ভাগ্যে চেম্‌সফোর্ড জানেন না যে 'টেগোর' এ ব্যাপারে সুপারিশ করছেন।" অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ এই সব বিষয় লইয়া চেষ্টা করিতেছেন জানিতে পারিলে কালীনাথের কেস্ খারাপ হইয়া যাইবে— কারণ নাইট পদবীত্যাগী রবীন্দ্রনাথ ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট।

১ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারের ইতিপূর্বে কোনো ব্যক্তি সরকারী খেতাব পান নাই, যদিও পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরপরিবারের অনেকেই স্যর্, রাজা, মহারাজা, মহারাজ-বাহাদুর খেতাব লাভ করেন।

২ Daily Herald—a labour daily, now an Odhams' group paper.

৩ অমল হোম 'এনসাইক্লোপিডিয়ায় রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধে Enc. Britannica হইতে উদ্‌ধৃতি করিয়াছেন; He accepted a Knighthood in 1915 but in 1919 resigned as a protest against the methods adopted for the repression of disturbances in the Punjab. In later years, however, he offered no objection to the use of his title." (vol. 21, p. 754)। শ্রীহোম প্রকাশকদের নিকট প্রতিবাদ করিয়া পত্র দেন। তাঁহার জবাবে লেখেন "We have satisfied ourselves on the point." দ্র. চার-পাঁচ-ছয়, পৃ. ৩১-৩২।

বিশ্বভারতীর কার্যারম্ভ

কলিকাতার সমস্ত উত্তেজনা পিছনে ফেলিয়া কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন তিন সপ্তাহ পরে (২৭ মে-১৭ জুন)[১] আষাঢ়স্য (১৩২৬) তৃতীয় দিবসে (১৮ জুন) রাণুকে লিখিতেছেন-- "কাল ছিলুম কলকাতায়, আজ বোলপুর। · · বর্ষার আয়োজন সমস্তই রয়েচে কেবল আমি আসিনি বলেই বৃষ্টি আরম্ভ হয়নি।" গ্রীষ্মাবকাশের পর বিদ্যালয় খুলিলে (২২ জুন) ছাত্র-শিক্ষকদের জমায়েত হইতে দেখিয়া কবির মন তৃপ্ত।

কবির মনে গানের সুর নামিতেছে— তিনি আপনার মধ্যে আপনি ফিরিতেছেন। কিন্তু বাহির হইতে নানা লোকের নানা প্রকারের কী দাবীই কবিকে পূরণ করিতে হয়! নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর হইতে দেশী-বিদেশী অতিথির সংখ্যা, পত্রের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। সমস্ত পত্রের জবাব নিজেই দেন। কারণ তখন তাঁহার কোনো 'সেক্রেটারি' বিশ্বভারতী নিযুক্ত করেন নাই, আর নিজ ব্যক্তিগত আর্থিক অবস্থা ঐ শ্রেণীর লোক নিয়োগ করার পক্ষে অনুকূল ছিল না। বৎসর দেড় পূর্বে অতি দুঃখে প্রমথ চৌধুরীকে লিখিতেছিলেন (৫ নভেম্বর ১৯১৭), "এক-একবার ক্লান্ত হয়ে ভাবি একটা সেক্রেটারি রাখা যাক্, কিন্তু সে আমিরীটুকুও হিসাবে কুলয় না দেখতে পাই।"[২] ফলে কবিকে একাই সকল প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় চিঠির জবাব দিতে হয়।

আমাদের আলোচ্য পর্বে বিদেশী পত্র লেখকদের মধ্যে রমঁ্যা রলঁ্যার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। য়ুরোপের যে মুষ্টিমেয় মহাপ্রাণ মনীষী বিশ্বমানবের সমস্যা সমাধানের কথা বৃহত্তর আধ্যাত্মিক পটভূমি হইতে বিচারে রত, তাঁহাদের অন্যতম রলঁ্যা। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন জাপানে প্রদত্ত 'ন্যাশনালিজম্' সম্বন্ধে বক্তৃতা পাঠ করিয়া। প্রথম মহাযুদ্ধের পর রলঁ্যা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাবুকদের স্বাক্ষর যুক্ত Declaration of the Independence of the Spirit[৩] নামে এক পত্র প্রচার করেন; রবীন্দ্রনাথ এই ইস্তাহারে অন্যতম স্বাক্ষরী।[৪]

রবীন্দ্রনাথ রমঁ্যা রলঁ্যার যে ঘোষণায় স্বাক্ষর দেন তাহার শেষাংশের ইংরেজি অনুবাদ উদ্‌ধৃত হইল—

"Arise! Let us extricate the spirit from these compromises, these humiliating alliances, this secret slavery. The spirit is the servant of none: we have no other master . . We serve truth alone which is free, with no frontiers, with no limits, with no prejudices of race or caste. . . We shall work for (humanity) it, but for it *as a whole*. . . We do not recognise nations. We recognise the People—one and the people who suffer, who struggle, who fall and rise again, and who ever march forward on the rough road, drenched with their sweat and their blood,—the People comprising all men, all equally our brothers. And it is in order to make them, like ourselves, aware of this fraternity, that we raise above their blind battles the Arch of Alliance, of the Free Spirit, one and manifold, eternal."

১ ১১ই জুন বিচিত্রাসম্মিলনীর অধিবেশনে কবি উপস্থিত। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রনাথের উপাধিত্যাগ উপলক্ষ্যে রচিত একটি কবিতা পড়েন। রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি গদ্য কবিতা পড়িয়া শোনান অর্থাৎ লিপিকা। দ্র. সীতাদেবী, পুণ্যস্মৃতি; পৃ. ৪৫১-৫২।

২ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৬২; পৃ. ২৩১-৩৩। ১৯ কার্তিক ১৩২৪।

৩ Declaration pour l' Independence de Espirit. দ্র. Rolland and Tagore, pp. 19-20. Rolland's Letter, pp. 20-22: Declaration-এর অনুবাদ।

৪ আরেকজন মাত্র ভারতীয় ইহার স্বাক্ষরকারী ছিলেন— আনন্দ কুমারস্বামী।

এই পত্র পাইয়া কবি রলাঁকে লেখেন, "The truths that save us have always been attracted by the few and rejected by the many, and have triumphed through their failures."[১]

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় খুলিবার কয়েকদিন পরে ৩ জুলাই (১৯১৯— ১৮ আষাঢ় ১৩২৬) কার্য শুরু হইল। বিশ্বভারতী বলিতে তখন এই নূতন বিভাগকে বুঝাইত ; পরে এই অংশ উত্তর-বিভাগ ও স্কুল অংশ পূর্ব-বিভাগ নামে খ্যাত হয়।

কবি তখন মনে করিতেন বাহিরের সাময়িক ছাত্র দ্বারা স্থায়ী বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র গড়িতে পারা যাইবে না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল আশ্রমের শিক্ষক ও অন্যান্য আশ্রমবাসী ও আশ্রমবাসিনীদের মধ্যে জ্ঞানচেতনা উদ্বুদ্ধ করিতে পারিলে বিদ্যা স্থায়ী ফলপ্রসূ হইবে। আশ্রমের শিক্ষকদের কেবলমাত্র স্কুল মাস্টার হইলে চলিবে না, তাঁহারা জ্ঞানতপস্বী হইবেন— এই ছিল কবির ইচ্ছা। শান্তিনিকেতনের প্রত্যেকেই নিজ নিজ সাধ্যমত এক-একটি বিষয় নির্বাচন করিয়া অধ্যয়ন ও গবেষণা কার্যে ব্রতী হইবেন, এই ছিল আদি বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা। শান্তিনিকেতনে যে সামান্য উপকরণ ছিল, তাহা লইয়াই কার্য শুরু হইল। সাহিত্য ও সংস্কৃতি ছিল অধ্যয়ন ও অনুশীলনের বিষয়।

শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম তথা বিদ্যালয় চলিতেছে আজ আঠারো বৎসর। এতদিন পরে 'বিশ্বভারতী' নাম দিয়া একটি নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সহিত সংযুক্ত করিবার কী প্রয়োজন হইল, সে প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক, উত্তর কবি স্বয়ং দেন। সমস্ত ভারতবর্ষময় বর্তমান বিদ্যাশিক্ষা'র উপর লোকের যে একটা বীতরাগ আসিয়াছে, তাহার প্রমাণ চারিদিকে— নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টায় ও জাতীয় বিদ্যাশালা প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে। গত দুই বৎসরের মধ্যে পাটনা, মৈসুর, বানারস হিন্দু ও ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে ; আদৈরে ন্যাশনাল য়ুনিভার্সিটির সহিত কবি তো স্বয়ং যুক্ত। সকলেই নূতন আদর্শের সন্ধানে রত, শিক্ষাদানের নূতন পথ আবিষ্কারের জন্য ব্যগ্র। কিন্তু "বর্তমান শিক্ষা প্রণালীটাই যে আমাদের ব্যর্থতার কারণ,— অভ্যাসগত অন্ধ মমতার মোহে সেটা আমরা কিছুতেই মনে ভাবিতে পারি না। ঘুরিয়া ফিরিয়া নূতন বিশ্ববিদ্যালয় গড়িবার বেলাতেও প্রণালী বদল করিবার কথা মনেই আসে না ; তাই নূতনের ঢালাই করিতেছি সেই পুরাতনের ছাঁচে। নূতনের জন্য ইচ্ছা প্রবল অথচ ভরসা কিছুই হইতেছে না।"[২] সদ্য মৈসুর বিশ্ববিদ্যালয় দেখিয়া আসিয়া কবির মনে এই কথাটি আরও স্পষ্ট হইয়াছে।

এই-যে ভরসার অভাব, আত্মনির্ভরশূন্যতা ইহার কারণও কবি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলেন। তাঁহার মতে "এতকাল ধরিয়া আমরা যে বিদ্যা আহরণ করিয়াছি, তাহা বাহির হইতে পাইয়াছি, ভিতর হইতে কিছুই জাগে নাই। আমাদের শিক্ষাকে আমাদের বাহন করিলাম না, শিক্ষাকে বহন করিয়া চলিলাম।" কিন্তু আমাদের বুদ্ধিকৃশতা ও নির্জীবতা আমাদের প্রকৃতিগত নহে, তাহার প্রমাণ দেশের বর্তমান মনীষীরা ও প্রাচীনকালের স্রষ্টারা। দীর্ঘকাল ইংরেজিস্কুলে শিক্ষালাভ করিয়াও আমরা বর্তমানে কোনো বিষয়ে যে মৌলিক্য (originality) দেখাইতে পারিতেছি না তাহার কারণ "বিদ্যাটা যেখান হইতে ধার করা, বুদ্ধিটাও সেখান হইতে ধার করা। কাজেই নিজের বিচার খাটাইয়া এ বিদ্যা তেজের সঙ্গে ব্যবহার করিতে ভরসা পাই না। একজন ফরাসী বিদ্বান নির্ভয়ে ইংরেজি বিদ্যার বিচার করিতে

১ Modern Review, July 1919, p. 81.

২ অসন্তোষের কারণ, শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩২৬ জ্যৈষ্ঠ। দ্র. শিক্ষা, ১৩৫১ সংস্করণ, পৃ. ২২৯

পারে, তাহার কারণ যে ফরাসী-বিদ্যা তাহার নিজের সেই বিদ্যার মধ্যেই বিচারের শক্তি ও বিধি রহিয়াছে, এইজন্য নিজের হিসাব মতো সে মূল্য দেয় এবং কোনটা লইবে কোনটা ছাড়িবে সে সম্বন্ধে নিজের রুচি ও মতই তাহার কাছে প্রামাণ্য। কাজেই জ্ঞানের ও ভাবের কারবারে নিজের পরেই ইহাদের ভরসা। এই ভরসা না থাকিলে মৌলিন্য কিছুতেই থাকিতে পারে না।"[১]

আর-একটি প্রবন্ধে তিনি তাঁহার আদর্শকে ব্যবহারিকতার রূপ দিয়া লিখিলেন, "পৃথিবীর এখন বয়স হইয়াছে, জাতিগত বিদ্যা-স্বাতন্ত্রকে একান্তভাবে লালন করিবার দিন আজ আর নাই। আজ বিদ্যাসমবায়ের যুগ আসিয়াছে, সেই সমবায়ে যে-বিদ্যা যোগ দিবে না, যে-বিদ্যা কৌলিন্যের অভিমানে অনূঢ়া হইয়া থাকিবে, সে নিষ্ফল হইয়া মরিবে।

"অতএব আমাদের দেশে বিদ্যা-সমবায়ের একটি বড়ো ক্ষেত্র চাই, যেখানে বিদ্যার আদানপ্রদান ও তুলনা হইবে, যেখানে ভারতীয় বিদ্যাকে মানবের সকল বিদ্যার ক্রমবিকাশের মধ্যে রাখিয়া বিচার করিতে হইবেই।

"তাহা করিতে গেলে ভারতীয় বিদ্যাকে তাহার সমস্ত শাখা-উপশাখার যোগে সমগ্র করিয়া আনা চাই। ভারতীয় বিদ্যার সমগ্রতার জ্ঞানটিকে মনের মধ্যে পাইলে তাহার সঙ্গে বিশ্বের সমস্ত সম্বন্ধ নির্ণয় স্বাভাবিক প্রণালীতে হইতে পারে। কাছের জিনিসের বোধ দূরের জিনিসের বোধের সহজ ভিত্তি।

"বিদ্যার নদী আমাদের দেশে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন প্রধানতঃ এই চারি শাখায় প্রবাহিত। ভারত চিত্ত-গঙ্গোত্রীতে ইহার উদ্ভব।.. বাহির হইতে মুসলমান যে জ্ঞান ও ভাবের ধারা বহন করিয়া আনিয়াছে, সেই ধারা ভারতের চিত্তকে স্তরে স্তরে অভিষিক্ত করিয়াছে, তাহা আমাদের ভাষায় আচারে শিল্পে সাহিত্যে সংগীতে নানা আকারে প্রকাশমান। অবশেষে সম্প্রতি য়ুরোপীয় বিদ্যার বন্যা সকল বাঁধ ভাঙিয়া দেশকে প্লাবিত করিয়াছে; তাহাকে হাসিয়া উড়াইতেও পারি না, কাঁদিয়া ঠেকানোও সম্ভবপর নহে।

"অতএব, আমাদের বিদ্যায়তনে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন ও পার্সি [ইসলামীয়] বিদ্যার সমবেত চর্চায় আনুষঙ্গিকভাবে য়ুরোপীয় বিদ্যাকে স্থান দিতে হইবে।

"সমস্ত পৃথিবীকে বাদ দিয়া যাহারা ভারতকে একান্ত করিয়া দেখে তাহারা ভারতকে সত্য করিয়া দেখে না। তেমনি যাহারা ভারতের কেবল এক অংশকেই ভারতের সমগ্রতা হইতে খণ্ডিত করিয়া দেখে তাহারাও ভারতচিত্তকে নিজের চিত্তের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারে না।.. পৃথিবীর সকল ঐক্যের যাহা শাশ্বত ভিত্তি তাহাই সত্য ঐক্য। সে ঐক্য চিত্তের ঐক্য, আত্মার ঐক্য।"[২]

দুই বৎসর পূর্বে প্রমথ চৌধুরীকে (২৩ অক্টোবর ১৯১৭) যে পত্র লেখেন তাহাতেও শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট উচ্ছ্বাস প্রকাশ পায়। তিনি লেখেন, "শিক্ষাতত্ত্বটাকে নতুন করে আমাদের ভাবতে হবে।.. আমাদের দেশের ইস্কুলমাস্টার আমাদের শিখিয়েছেন যে মনের ধর্ম্ম মুখস্থ করা— আমাদের এমন দৃষ্টান্ত জরুর চাই যার থেকে বুঝতে পারি মনের ধর্ম্ম ভাবা।"[৩]

বিশ্বভারতীর অধ্যয়ন-অধ্যাপনা শুরু হইলে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সাহিত্য পড়াইতে লাগিলেন; ব্রাউনিং-এর বহু দুরূহ

১ বিদ্যার যাচাই, শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩২৬ আষাঢ়। দ্র. শিক্ষা, পৃ. ২২৩।

২ বিদ্যা সমবায়, শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩২৬ আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যা। দ্র. শিক্ষা, পৃ ২৩৬। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২ খণ্ডের শিক্ষা গ্রন্থে এই প্রবন্ধ নাই।

৩ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৫৯; পৃ. ২২৫-২৬।

কবিতা এই সময়ে তাঁহার কাছে আমাদের পড়া।[১] এনড্রুজ পড়াইতেন সমালোচনা সাহিত্য; ম্যাথু আর্নল্ডের প্রবন্ধাবলীকে কেন্দ্র করিয়া তিনি আলোচনা করিতেন ইংরেজি সাহিত্য। বিধুশেখর ভট্টাচার্য যাঁহার উদ্যোগে এই বিভাগ খোলা হয়, তিনি পড়ান হিন্দুদর্শন। শ্রীযুক্ত ধর্মাধার রাজগুরু মহাস্থবির নামক একজন সিংহলদেশীয় ভিক্ষু বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে উপদেশ দেন। রথীন্দ্রনাথ জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। মৈথিলী পণ্ডিত কপিলেশ্বর মিশ্র পাণিনির ব্যাকরণ পড়ান।

মহাস্থবিরের বক্তৃতায় প্রথম প্রথম আমরা সকলেই যাইতাম; কিন্তু দিন যতই যায় শ্রোতার সংখ্যা ততই হ্রাস পায়। কারণ প্রথমত বিষয় কঠিন— বৌদ্ধদর্শন; দ্বিতীয়ত তিনি যে ভাষায় উপদেশ দিতেন তাহা না-হিন্দী, না-বাংলা, না-পালি, না-সিংহলী— এক মিশ্রিত ভাষা। ইহার উপর মেয়েরা যেদিকে বসিতেন সেইদিকে পাখার আড়াল করিয়া কথা বলেন। মোট কথা, এই বক্তৃতা শুনিবার উৎসাহ প্রায় সকলেরই নিবিয়া আসিল। শেষ পর্যন্ত দেখিলাম শ্রোতাদের মধ্যে দুইজন টিকিয়া আছেন— একজন বিধুশেখর, অপরজন রবীন্দ্রনাথ। কবি নিশ্চল হইয়া ধর্মগুরুর জটিল তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

পাণিনির ব্যাকরণ অধ্যয়নের ফল আরো শোচনীয়। বাংলা ভাষা সম্বন্ধে কবির প্রীতি সর্বজনবিদিত। কিন্তু তিনি ইহাও জানিতেন যে সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণের বুনিয়াদ না হইলে ভারতীয় ভাষার উপর দখল হওয়া কঠিন। সেইজন্য তিনি বিশ্বভারতীর ছাত্রদের পক্ষে পাণিনির ব্যাকরণপাঠ প্রায় আবশ্যিক করিয়া তোলেন। কপিলেশ্বর মিশ্র পাণিনীর ব্যাকরণে মহাপণ্ডিত। তবে তাঁহার ভাষা আধা-বাংলা, আধা-মৈথিলী। তিনি সেই ভাষায় পাণিনি পড়ান। শিক্ষকদের অনেকেই যোগদান করিলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত টেঁকেন নাই একজনও। কবির বরাবরই ইচ্ছা ছিল যে বিদ্যালয়ের শেষ চারি বৎসর ছাত্রদের একখানা সংস্কৃত ব্যাকরণ যেমন লঘু- বা মধ্য-কৌমুদী মুখস্থ করাইয়া দিতে পারিলে চিরকালের মতো সংস্কৃতের বুনিয়াদ গাঁথা হইয়া যাইবে। বলা বাহুল্য কবির বহু সংকল্প যেভাবে ব্যর্থ হইয়াছে, এই শুভ সংকল্প তেমনি ভাবেই শ্রদ্ধাহীনদের নিষ্ঠার অভাবে কার্যকর হয় নাই। সংস্কৃত শিক্ষার জন্য বিশ্বভারতী বিশেষ কোনো খ্যাতি অর্জন করিতে পারে নাই। অথচ এইটি ছিল কবির অন্তরের অন্যতম বাসনা।

বিশ্বভারতীর অধ্যয়ন অধ্যাপনার কাজ আরম্ভ হইয়াছে আষাঢ় (১৩২৬) মাস হইতে। কবি জানেন জ্ঞানের সঙ্গে যদি রসের চর্চা বা art education-এর সমাবেশ না হয়, তবে মানুষের জ্ঞান হইবে বোঝার মতো। তাই বিশ্বভারতীতে জ্ঞানানুশীলনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কলাবিদ্যাচর্চার ব্যবস্থা হইল। শিক্ষায়তনে কলাচর্চা অর্থাৎ চিত্র ও সংগীত শিক্ষা যে বিদ্যার্থীর চিত্তবৃত্তির ও হৃদয়বৃত্তির অনুশীলনের জন্য একান্ত আবশ্যক একথা এদেশে তখনো স্বীকৃত হয় নাই। "মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি এমন একটা জিনিস জাতিবিশেষে যাহার তারতম্য আছে কিন্তু প্রকারভেদ নাই। যুক্তির নিয়ম সকল দেশেই সমান; যে-সকল পদার্থ প্রমাণের বিষয় তাহাদিগকে প্রমাণ করিবার প্রণালী সর্বত্র এক। ·· বুদ্ধিবৃত্তিমূলক যে শিক্ষা য়ুরোপ পৃথিবীকে দিতেছে, তাহা সর্বত্র এক হইবেই।

"কিন্তু হৃদয়বৃত্তির দ্বারা মানুষ আপন ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে। এই ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য থাকিবেই, আর থাকাই শ্রেয়। ··এই হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ কলাবিদ্যার সাহায্যে ঘটে। সভ্য অসভ্য সকল দেশেই এই সকল কলাবিদ্যার 'পরে দেশের লোকের দরদ আছেই। কেবল আমাদের বিদ্যাদানের ব্যবস্থায় এই কলাবিদ্যার কোনো স্থান

১ কবি ইংরেজি পড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাঞ্জল অনুবাদ বাংলায় করিয়া যাইতেন। ব্রাউনিং-এর তথাকথিত দুর্বোধ্য ভাষা বুঝিতে আমাদের কষ্ট হইত না। তাহার পর বাড়িতে আসিয়া কবিতাটি পুনরায় পড়িয়া লইতাম।

নাই।" কলাবিদ্যা শিক্ষার বিরুদ্ধে দেশের লোকের যুক্তি যে, ইহা জাতিকে দুর্বল করে। ইহা যে কত ভুল তাহাই উল্লেখ করিয়া কবি বলিলেন যে পাশ্চাত্য জাতিদের মধ্যে "ললিতকলা শিক্ষা দ্বারা তাহার পৌরুষ খর্ব হইতেছে এমন প্রমাণ হয় না।" কবি জার্মানদের সংগীতপ্রিয়তার কথা ও জাপানীদের চেরীফুলের ভালোবাসার কথা উদাহরণ স্বরূপ দেখাইয়া বলিলেন, "আনন্দপ্রকাশ জীবনীশক্তির প্রবলতারই প্রকাশ। এই আনন্দপ্রকাশের পথগুলিকে মারিয়া দিলে জাতির জীবনীশক্তিকেই ক্ষীণ করিয়া দেওয়া হয়।‥যে জাতি আনন্দ করিতে ভোলে সে জাতি কাজ করিতেও ভোলে।‥আমাদের দেশেই আনন্দকে বিজ্ঞলোক ভয় করে, সৌন্দর্যভোগকে তাহারা চাপল্য মনে করে এবং কলাবিদ্যাকে অপবিদ্যা ও কাজের বিঘ্নকর বলিয়া জানে।" তাই রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করিলেন, "বিশ্বভারতী যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ভারতীয় সংগীত ও চিত্রকলা শিক্ষা তাহার প্রধান অঙ্গ হইবে এই আমাদের সংকল্প হউক।"[১]

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনের সময় হইতেই সংগীত ড্রয়িং ও পরে ছবি শিখাইবার ব্যবস্থা হয়। ওঁকারানন্দ নামে একজন ড্রয়িং শিক্ষকের নিকট ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র মণীন্দ্র গুপ্ত, মুকুলচন্দ্র দে-র চিত্রবিদ্যার হাতেখড়ি হয়। ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে আসেন তরুণ শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর। সুরেন্দ্রনাথ আর্টস্কুলে পড়েন নাই; তিনি ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র, বিচিত্রার সহিত সংশ্লিষ্ট। বিচিত্রা উঠিয়া গেলে তিনি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের চিত্রবিদ্যার ভার লইয়া আসেন। অতঃপর বিশ্বভারতী স্থাপিত হইবার সঙ্গে অসিতকুমার হালদার আসিলেন (১৩২৬ আষাঢ়, ১৯১৯ জুন)। পূজাবকাশের পর আসেন নন্দলাল বসু; তিনিও বিচিত্রাভবনের সহিত যুক্ত ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ, অসিতকুমার ও নন্দলাল এই ত্রয়ীর যোগে কলাভবনের পত্তন হইল।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ছাত্ররা সংগীত শিখিত অজিতকুমার চক্রবর্তী ও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট। রবীন্দ্রনাথের গানই ছাত্ররা শিখিত। পরে হিন্দুস্থানী সংগীত শিখাইবার প্রয়োজন অনুভব করায় দুইজন হিন্দুস্থানী মুসলমান ওস্তাদ আনানো হয়। ইঁহারা বেশীদিন ছিলেন না। তবে সেই হইতেই মার্গ সংগীতের প্রবর্তনা। তারপর ১৯১৪ সালে আসেন মহারাষ্ট্রিয় যুবক ভীমরাও হস্তরকর; ইনি গবালিয়র গন্ধর্ব বিদ্যালয়ে শিক্ষিত, সংস্কৃতে সুপণ্ডিত, মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণের নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার মূর্তি। হিন্দুস্থানী সংগীতের উপর তিনি রবীন্দ্রসংগীত আয়ত্ত করিয়া লন। ইহার উপর পিঠাপুরম মহারাজার বীণকর সংগমেশ্বর শাস্ত্রীর নিকট হইতে দক্ষিণী রুদ্রবীণ শিক্ষা করেন। আমাদের আলোচ্য পর্বে আসিলেন নকুলেশ্বর গোস্বামী; ইনি কাশিমবাজার মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সভাসংগীতকার বিখ্যাত রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর ভ্রাতা। বাংলাদেশের বিষ্ণুপুরী ওস্তাদী গানের ধারা মিলিত হইল উত্তর ভারতের মার্গ-সংগীতের সঙ্গে।

শান্তিনিকেতন পত্রিকার (১৩২৬) আষাঢ় সংখ্যায় সম্পাদক লিখিতেছেন, "যাঁহারা সংগীত শিক্ষাকেই প্রধান লক্ষ্য করিয়াছেন, এপ্রকার ছাত্র আমরা আজ পর্যন্ত পাই নাই। আমরা জানি, কয়েকটি ব্যবসায়ী গায়ক—প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতেছেন।‥কিন্তু কেবল ঐ কয়েকটি ব্যবসায়ী গায়কের দ্বারা লোকের অভাব মোচন হইতেছে না।‥কেবল সংগীত শিক্ষার জন্য ছাত্রেরা আশ্রমে আসিলে, দুই বৎসর বা তাহারো অল্প সময়ে রবীন্দ্রনাথের সকল প্রকার সংগীতে তাহাদিগকে পারদর্শী করা যাইতে পারিবে।" এইভাবে ভাবী সংগীতভবনের আরম্ভ হইল।

১ কলাবিদ্যা, শান্তিনিকেতন ১৩২৬ অগ্রহায়ণ, ইহা 'শিক্ষা' গ্রন্থে নাই। সমসাময়িক অন্যান্য রচনা: ৩রা অগ্রহায়ণ ১৩২৬ বুধবার মন্দিরের উৎসব; শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩২১ পৌষ। ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩২৬ উপদেশ; শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩২৭ বৈশাখ। ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩২৬ ফণিভূষণ অধিকারীর স্ত্রীর ভ্রাতৃবিয়োগের পত্র; শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩২৬ পৌষ।

ভাবীকালে বিশ্বভারতী যে দুইটি বিষয়ে নিজ সুনির্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহার আরম্ভ হইল এই সামান্য আয়োজনের মধ্যে। কিন্তু 'ব্যবসায়ী গায়ক' প্রস্তুত করিবার জন্য কি কবি একদিন শহর হইতে দূরে গ্রামপল্লী মাঝে তপোবন স্থাপনের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন? ব্যবসায়ী গায়কদের 'প্রভূত অর্থ উপার্জনের' সহায়তা দান করা কি বিদ্যায়তনের আদর্শ হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না।

সংগীতের সঙ্গে নৃত্য অচ্ছেদ্য। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যে-সব নাট্যাভিনয় হইত তাহার মধ্যে বাউল সংগীতে বা জনতার সমবেত সংগীতে অপটু নৃত্যচ্ছন্দ সহজে আসিয়া পড়িত। সে নৃত্যের জন্য কোনো শিক্ষার প্রয়োজন ছিল না। তবে শারদোৎসবে বালকরা যে গান গাহিত তাহার মধ্যে খানিকটা action থাকিত, সেটা কবিই স্বয়ং শিখাইতেন। তবে উহাকে নৃত্য বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ নিজে 'প্রায়শ্চিত্তে' ধনঞ্জয় বৈরাগীর ও 'ফাল্গুনী'তে অন্ধ বাউলের ভূমিকায় নৃত্য করেন, সে রীতি তাঁহার নিজস্ব।

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হইলে শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের মধ্যে মণিপুরী নৃত্যাভ্যাস প্রবর্তনের চেষ্টা হইয়াছিল। ত্রিপুরা হইতে বুদ্ধিমন্ত সিং নামে এক শিল্পীকে পাওয়া যায়। বুদ্ধিমন্ত আসলে কারুশিল্পী— জোড়াসাঁকোয় গগনেন্দ্র-নাথদের বাড়িতে আসেন তাঁহার হাতের কাজকর্ম লইয়া। মণিপুরী নৃত্যও জানিতেন বলিয়া কবি তাঁহাকে শান্তি-নিকেতনে আনিলেন। বালকরা বুদ্ধিমন্তের খোলের বোলের সঙ্গে নৃত্যশিক্ষা শুরু করে (১৩২৬ অগ্রহায়ণ)। এই নৃত্য ব্যায়াম ও নৃত্যের সমবায় বলা যাইতে পারে— rhythmic dance। কবির ইচ্ছা ছিল যে বাঙালির ছেলের আড়ষ্ট দেহ নৃত্য ও ব্যায়ামের যুগ্ম সাধনায় সুন্দর, সুদৃঢ় ও সাবলীল হইয়া উঠে। মণিপুরী বা ঐ শ্রেণীর কোনো তালবদ্ধ সংঘনৃত্য ছাত্রদের মধ্যে প্রবর্তন করিবার ইচ্ছা সেইজন্যই। কিন্তু কয়েকমাস পরেই নানা কারণে সংঘনৃত্যের 'পরে যবনিকা পড়িয়া যায়।[১]

শান্তিনিকেতনের মনোলোকের বিকাশ যেমন হইতেছে বিশ্বভারতীর শিক্ষা পরিকল্পনায় আশ্রমের ব্যবহারিক জীবনেরও পরিবর্তন চলিতেছে তাহারই সঙ্গে। কিছুকাল পূর্বে শান্তিনিকেতন প্রেস বা ছাপাখানার পত্তন হয়। রবীন্দ্রনাথের আমেরিকা সফরকালে (১৯১৬) লিন্‌কলন্ শহরবাসীরা তাঁহার বিদ্যালয়ের কথা শুনিয়া ছাত্রদের জন্য একটি ট্রেডল্ মেশিন উপহার দেয়। সেই ছোটো ট্রেডল্ দিয়া ছাপাখানার পত্তন। এবার আশ্রমে ইলেকট্রিক বা বিজলীবাতির ব্যবস্থা হইল। ইলেকট্রিক বাতি হওয়ায় কেহ কেহ আশ্রমের আশ্রমত্ব ক্ষুণ্ণ হইবে বলিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করেন। প্রাচীনের প্রতি কবির অশ্রদ্ধা ছিল না যেমন, আধুনিকতার পরেও আকর্ষণ ছিল তেমনি প্রবল। কবির যুক্তি যে এতদিন বিদেশী ডিট্‌স্ লণ্ঠন ও ডিটমারের আলো যদি আশ্রমের আশ্রমত্ব নষ্ট না করিয়া থাকে, তবে উন্নততর বিজ্ঞানের সাহায্যে বিদ্যুতালোকও আশ্রমের শান্তিকে ক্ষুব্ধ করিবে না।

বিজলীবাতি চালাইবার জন্য যে ইঞ্জিন আসিল সেটি ছিল কুষ্টিয়াতে কবির জমিদারীতে। ঠাকুর কোম্পানির আখমাড়া-কল নির্মাণ ও সে-ব্যবসায়ের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন। সেই ছোটো ইঞ্জিন দিয়া বিজলী সরবরাহের ব্যবস্থা হইল; তখন আশ্রম কতটুকু।

এইবার বিদ্যালয়ের আর-একটি দিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি গেল। এতদিন শান্তিনিকেতনে অধ্যাপকদের সপরিবারে

১ কয়েক বৎসর পরে বীরভূমের তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট গুরুসদয় দত্ত রায়বেঁশে নাচ ও বাংলার folk-danceকে ভদ্রসমাজে চালাইবার চেষ্টা করেন। এখনো তাঁহার 'ব্রতচারী' নৃত্য বহুস্থানে চলিতেছে। মণিপুরী নৃত্যও লোকনৃত্য বা folk-dance, তবে বৈষ্ণব বাংলার প্রভাবে তাহার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। পার্বত্য উপজাতির উগ্রতা এ-নৃত্যে শমিত, তবে লালিত্য ও শৌর্য মিলিত হইয়াছে। পরবর্তী যুগে শান্তিনিকেতনের নৃত্যকলায় ইহার প্রভাব সুস্পষ্ট।

থাকিবার অনুকুল ব্যবস্থা ছিল না। আশ্রমে যাঁহারা কাজ করিতেন তাঁহারা ছাত্রদের সঙ্গে একই গৃহে বাস করিতেন। কয়েকজন ক্রমে পরিবার আনিয়া 'নূতন বাড়িতে' থাকিতে আরম্ভ করেন। এইবার শিক্ষকদের জন্য আশ্রমের দক্ষিণে একটি উপনিবেশের প্রস্তাব হইল। প্রথমে কথা হয় শিক্ষকরা বাড়িভাড়ার সহিত কিছু কিছু টাকা দিয়া অনেকটা hire purchase systemএর মতো বাড়ির মালিক হইবেন; বৃদ্ধবয়সে কর্মবিরতির পর তাঁহারা সেখানে থাকিতে পারিবেন। কিন্তু এই প্রস্তাব কাজে পরিণত করার মধ্যে অনেক অসুবিধা বুঝিয়া পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয় ও একবৎসর পরে কুটিরগুলির নির্দিষ্ট ভাড়া সাব্যস্ত হয়। এই বাড়িগুলি 'গুরুপল্লী' নামে পরিচিত।

গ্রীষ্মাবকাশের পর হইতে কবি শান্তিনিকেতনে আছেন · মাঝে কয়েকদিনের জন্য কলিকাতায় যান— সাংসারিক ও সামাজিক কাজ কিছু ছিল[১]; সামাজিক কাজের মধ্যে প্রধান হইতেছে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর স্মৃতিসভায় তাঁহার উপস্থিতি (১৮ শ্রাবণ ১৩২৬)।

এবার শান্তিনিকেতন বাসকালে কবি নূতন রীতিতে 'কথিকা' নামে কতকগুলি গল্পাণু বা গল্পকণা লেখেন। যে গদ্যছন্দ লইয়া কবি পরে অনেক আলোচনা করেন, তাহার পত্তন হয় এই সময়ে 'কথিকা'র মধ্যে। কথিকাগুলি পরে 'লিপিকা' নামে প্রকাশিত হয় (১৯২২ অগস্ট)। এগুলি নূতন রীতিতে লেখা গল্পের রেখাচিত্র, মনের ভাবনার নিরাভরণ আলপনা যেন। বহুকাল পরে তাঁহার প্রথম গদ্যকাব্য 'পুনশ্চ' (১৩৩৯ আশ্বিন) গ্রন্থের ভূমিকায় কবি বলিয়াছিলেন যে লিপিকায় প্রথম তিনি বাংলা গদ্য কবিতার পরীক্ষা করেন। কিন্তু "ছাপবার সময়ে বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয় নি— বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ।" লিপিকার প্রথম চোদ্দটি কথিকা এই সময়ের রচনা বলিয়া মনে হয়— কারণ রচনাগুলির মধ্যে একটিরও ভাবসামঞ্জস্য অস্পষ্ট নহে,— একটা বিষাদ ঘন অতীতের স্মৃতি সমস্ত লেখাগুলির উপর ছায়া ফেলিয়াছে।

মন যখন নূতন কিছু সৃষ্টির মধ্যে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিতেছে না, যখন নূতনের বা আকস্মিকের ঘাতপ্রতিঘাতে সাড়া দিবার মতো ঘটনারও অভাব, নূতন রচনার জন্য বাহিরের তাগিদও যখন কম— তখন মন রূপ ও অরূপের সন্ধানে পুরাতন স্মৃতির মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে চায়। "আজ ধূসর সন্ধ্যায় একবার পিছন ফিরে তাকালুম, দেখলুম, এই পথটি বহু বিস্তৃত পদচিহ্নের পদাবলী, ভৈরবী সুরে বাঁধা।" আশ্চর্যের বিষয় বহু বৎসর পূর্বের বিস্মৃত স্মৃতি 'পুষ্পাঞ্জলি'র[২] অনেক ভাব এমন কি ভাষা পর্যন্ত কয়েকটি কথিকার মধ্যে দেখা যায়। বলাকা পর্বে একদিন এলাহাবাদের অপ্রত্যাশিত পরিবেষ্টনে তাঁহার বৌঠাকুরানী কাদম্বরী দেবীর আলেখ্য দেখিয়া মনে যে ভাবোদয় হয়, তাহা রূপ পায় 'ছবি'তে; তেমনি আমাদের আলোচ্য পর্বে 'পুষ্পাঞ্জলি'র পাণ্ডুলিপি কি তাঁহার হস্তগত হয়— অথবা 'ভারতী'র লেখাটি চোখে পড়ে— যাহার অভিঘাতে 'কৃতঘ্ন শোক', 'সন্ধ্যা ও প্রভাত', 'একদিন', 'প্রথম শোক' প্রভৃতি উচ্ছ্বসিয়া উঠিল!

এই পুরানো স্মৃতির অভিঘাতেই কি কবির মনে নিজ জননীর কথাও স্মরণে উদিত হয়? এবং 'আগমনী' নামে পূজা-বার্ষিকে (১৩২৬) 'মাতৃবন্দনা' নামে কয়েকটি কবিতা প্রকাশের জন্য দেন। কবিতাগুলি পুরাতন বলিয়াই মনে হয়— একটি তো গীতাঞ্জলিতে মুদ্রিত হয়।[৩]

১ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৭৯; ১৪ শ্রাবণ ১৩২৬, ১৯১৯ জুলাই ৩০।

২ ভারতী ৯ম খণ্ড, ১২৯২ বৈশাখ, পৃ. ৪-১৩। দ্র. জীবনস্মৃতি, সংযোজনাংশ রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭, পৃ. ৪৮৫-৯৫।

৩ দ্র. শ্রীহলধর হালদার (পুলিনবিহারী সেন), মাতৃবন্দনা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; দেশ ১৩৫৪ আষাঢ় ৬। দ্র. জীবনস্মৃতি, পরিশিষ্ট। 'আগমনী' সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত প্রথম 'বার্ষিকী' (১৩২৬)।

মোট কথা মনের মধ্যে নূতন সৃষ্টির প্রেরণা না-পাওয়া পর্যন্ত পুরাতন লইয়া নাড়াচাড়া চলে। তাই দেখি সাহিত্যের অন্য ক্ষেত্রেও পুরাতন ভাঙিয়া নূতন গড়িতেছেন। কিছুদিন পূর্বে 'অচলায়তন' ভাঙিয়া 'গুরু' লিখিয়াছিলেন। এবার 'রাজা' দেখা দিলেন 'অরূপরতন'রূপে (১৩২৬ মাঘ)। ১৯১৭ সাল হইতে ১৯২৪ পর্যন্ত এই আট বৎসরে কবির গ্রন্থতালিকা দেখিলেই বুঝা যাইবে সৃষ্টিকার্যে কবি কোথাও নাই। এই পর্ব হইতেছে বিশ্বভারতীর জন্য ভ্রমণপর্ব, রাজনীতি আলোচনার পর্ব। তবে আপাতদৃষ্টিতে এই সাহিত্যশূন্য বৎসরগুলি কবির অন্তরজীবনের সম্পদ হরণ করে নাই, কারণ গীতিসরস্বতী কবিকে নিঃসঙ্গ রাখেন নাই। 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারী'তে কবি ১৯২৪ সালে এই কথাটি লিখিয়াছেন— অন্য পরিপ্রেক্ষায়। "আজ পনেরো যোলো বছর ধরে কর্তব্যবুদ্ধি আমাকে নানা ভাবনা নানা ব্যস্ততার মধ্যে জোর করে টেনে· · নিচ্চে।"—যাত্রী পৃ. ৭৩। তবে এই কয় বৎসর "খুব ক'ষে গানই লিখচি। লোকরঞ্জনের জন্যে নয়, কেননা, পাঠকেরা লেখায় ক্ষমতার পরিচয় খোঁজে। ছোটো ছোটো একটু একটু গানে ক্ষমতার কায়দা দেখাবার মতো জায়গাই নেই। · · এই কয় বছরে এত গান লিখেচি যে, অন্তত সংখ্যাহিসাবে লম্বা-দৌড়ের বাজিতে আমি বোধ হয় পয়লা নম্বরের পুরস্কার পেতে পারি।"—পৃ. ৬৭। বিবিধ সাহিত্যসৃষ্টিতে যতখানি ঘাটতি, ততখানি পুরতি হইয়াছে গানে ; ফাল্গুনীর গানের পর্ব ১৩২২ সাল পর্যন্ত ; তারপর ১৩২৫ সাল 'গীতপঞ্চাশিকা'র পর্ব। এখান হইতে (১৯১৭) নূতন গানের পালা শুরু। আমাদের আলোচ্য পর্বে অর্থাৎ ১৩২৬ সালে 'গীতবীথিকা' (বৈশাখ), 'কাব্যগীতি' (পৌষ), ও 'অরূপরতন' (মাঘ) প্রকাশিত হয়— এগুলিতে প্রায় ৪৫টি গান আছে। বিচিত্র কর্মের মধ্যে এই গানের নৈবেদ্য ছিল তাঁহার উপাসনার অন্তর্গত সাধনা।

শান্তিনিকেতন বাসকালে কবির মন পুরাতন বিদ্যালয় ও নূতন বিশ্বভারতীর বিচিত্র কর্মের সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত। ছাত্রদের কল্যাণের কথা সদাই মনের পুরোভাগে আছে— কত কল্পনাই না করেন তাহাদের জন্য। কখনো মনে করেন গৃহীশিক্ষকদের কাছে কয়েকটি করিয়া ছাত্র দিবেন— গুরুপত্নীরা নিজ সন্তানদের সহিত তাহাদের লালন করিবেন। কখনো মনে করেন আশ্রমবাসিনীদের উপর শিশুদের ভোজনের ভার দিবেন। এই সব পরিকল্পনানুযায়ী কাজ কিছুদিন চলে ভালো ; তারপর আপনি সব ঝিমাইয়া পড়ে। ছোটোখাটো সুবিধা-সুযোগ অসুবিধা-অভাবের ঘাত-প্রতিঘাতে সমস্ত ম্লান হইয়া যায়। এই গেল কবি মানসের একটি রূপ যেখানে তিনি ছাত্রদরদী— নিতান্তই শান্তিনিকেতনের মানুষ।

সাংসারিক ও সামাজিক কর্তব্যপালনের জন্য অগস্ট মাসের মাঝামাঝি কলিকাতায় যাইতে হইল ; হেমেন্দ্রনাথের কন্যা মনীষাদেবীর কন্যার বিবাহ— কবি এই বিবাহে আচার্যের কাজ করেন।

কলিকাতায় আসিয়া কবি অসুস্থ হইয়া পড়েন ; কিন্তু ভালো করিয়া সুস্থ হইবার পূর্বেই শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া গেলেন ও যথাবিধি ছাত্রদের ক্লাস লইতে লাগিলেন।[১]

বিদ্যালয় পূজাবকাশের জন্য বন্ধ হইবার পূর্বে ছাত্র-অধ্যাপকে মিলিয়া 'শারদোৎসব' নাটকের অভিনয় হইল (৬ আশ্বিন) ; কবি স্বয়ং সন্ন্যাসীর ভূমিকা গ্রহণ করেন।[২]

১ দ্র. সীতাদেবী, পুণ্যস্মৃতি, পৃ. ৪৫৩-৫৪।

২ এই পূজাবকাশের পূর্বে ৪ঠা আশ্বিন ১৩২৬ কবি শান্তিনিকেতন মন্দিরে প্রসাদের (মুলু) মৃত্যু উপলক্ষ্যে উপাসনা করেন। মুক্তিদাপ্রসাদ বা মুলু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র— শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্র। ইহার জন্য রামানন্দবাবু ১৯১৭ হইতে ১৯১৯ পর্যন্ত সপরিবারে আশ্রমে বাস করেন। তাঁহারা থাকিতেন শচীন্দ্রমোহন বসুর বাড়িতে। সে বাড়িটি পরে আগুনে পুড়িয়া যায়। প্রসাদ ছাত্রাবস্থায় ভুবনডাঙা গ্রামের হরিজন পল্লীতে নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করেন। শান্তিনিকেতনের ছাত্ররাই গ্রামের ছেলেদের পড়ানোর সাহায্য করিত। রামানন্দবাবু

এই উপলক্ষ্যে তিনি শারদোৎসবের মর্মকথাটুকু শান্তিনিকেতন পত্রে ব্যাখ্যা করেন।[১]

আমাদের এই আলোচ্য পর্বে শান্তিনিকেতন পত্রিকায় (১৩২৬) রবীন্দ্রনাথ ভাষা, ভাষান্তর, প্রতিশব্দ নির্বাচন লইয়া বহু আলোচনা করিতেছেন। গতবৎসর অনুবাদচর্চা[২] ও Selected passage নামে গ্রন্থ প্রণয়ন ও সম্পাদনকালে তিনি বুঝিতে পারেন যে ইংরেজির ন্যায় idomatic ভাষা হইতে বাংলায় ভাষান্তর করা কী কঠিন। আমরা অনেক সময়ে অনুবাদ করি বটে, তবে তাহা বিশুদ্ধ বাংলা হয় কিনা সে-কথা গভীরভাবে চিন্তা করি না। এবার এই বিষয় লইয়া কবি অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া আলোচনা করেন। পাঠক সেগুলি পাঠ করিলে কবি-প্রতিভার আর-একটি দিক দেখিতে পাইবেন।[৩]

আসামে একমাস

১৩২৬ সালের পূজাবকাশে কবির শিলং পাহাড়ে যাওয়া স্থির হইয়াছে। বিদ্যালয় বন্ধ হইবার (২৫ সেপ্টেম্বর) পরেও প্রায় পক্ষকাল কবি নির্জন আশ্রমে রহিয়া গেলেন। এন্‌ড্রুজ এতদিন কবির সঙ্গেই ছিলেন; তিনি লাহোর গেলেন, গান্ধীজি এতকাল পরে সরকার হইতে পঞ্জাব প্রবেশের অনুমতি পাইয়া সেখানে যাইতেছেন (১৭ অক্টোবর); গান্ধীজি রবীন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন 'It was good of you to have spared him [Andrews] for the Punjab!' গান্ধীজির ইচ্ছা এন্‌ড্রুজ পঞ্জাবের কাজ শেষ করিয়াই দক্ষিণ-আফ্রিকায় যান। কিন্তু এনড্রুজের ইচ্ছা শান্তিনিকেতন হইতে এক পা না নড়েন (His own inclination is not to stir out of Santiniketan)। কিন্তু কবি এন্‌ড্রুজের স্বভাব বুঝিয়া লইয়াছেন। এই বিষয়ে তিনি স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে যে পত্রখানি লেখেন, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য (১৩ নভেম্বর), "Andrew's personal love for me deludes him into thinking that his work lies here, and thereby he does himself injustice. His field of action is worldwide."—Sykes p. 138.

শিলং যাত্রার জন্য কলিকাতা রওয়ানা হইলেন। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছিবার পর এমন একটি হাস্যকর ঘটনা ঘটে যে তাহার কবিকৃত বর্ণনাটুকু উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না। কবি বালিকা রাণুকে লিখিতেছেন[৪] (৯ অক্টোবর),

প্রসাদের স্মরণার্থ এক সহস্র মুদ্রা দান করেন; নৈশবিদ্যালয়টি 'প্রসাদ বিদ্যালয়ে' নামে পরিচিত ছিল। শ্রীনিকেতন ইহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। সে বাড়ি ভাঙিয়া পড়িয়া যায়। পরে গ্রামের লোক গৃহটি পুনর্নির্মাণ করে; সেখানে এখন একটি গ্রাম্য লাইব্রেরী হইয়াছে। দ্র. রবীন্দ্রনাথের ভাষণ— প্রসাদ, প্রবাসী ১৩২৬ অগ্রহায়ণ, পৃ. ৩৩৭। শান্তিনিকেতন ২য় সংস্করণ ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯৮-৬০১। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেকের লেখা সংগ্রহ করিয়া 'প্রসাদ' নামে একখানি বই রামানন্দবাবু প্রকাশ করেন (পৃ. ১৫৪ বহুচিত্রসমন্বিত)। দ্র. প্রসাদ (পুস্তিকা ১৯৩৯) পৃ. ১৩।

১ শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩২৬ আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যা। দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী ৭. গ্রন্থপরিচয় পৃ. ৫৪১-৫৪৬।

২ অনুবাদচর্চা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত খণ্ড ২য়; অনুবাদচর্চা ও Selected Passage for Bengali Translation, ২ খণ্ড। শান্তিনিকেতন প্রেসে মুদ্রিত, ১৩২৪ সাল (১৯১৭)। ২য় সংস্করণ, ১৯৩৩ ডিসেম্বর।

৩ শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩২৬ সালে ভাষা ও ভাষান্তর সম্বন্ধে কবির রচনা; বৈশাখ— ইংরেজী শিক্ষা। জ্যৈষ্ঠ— ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ। আষাঢ়— প্রতিশব্দ। ভাদ্র— অনুবাদচর্চা। প্রতিশব্দ। আশ্বিন-কার্তিক— বাংলা কথ্যভাষা। প্রতিশব্দ। অনুবাদচর্চা। অগ্রহায়ণ— বাদানুবাদ (অনুবাদ সম্বন্ধীয়)। প্রতিশব্দ। পৌষ— অনুবাদচর্চা। প্রতিশব্দ। বাদানুবাদ।

৪ ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৩৭; পূর্ণিমা [২২ আশ্বিন] ১৩২৬।

"এসে শুনি, হাওড়ার ব্রিজ খুলে দিয়েচে। নৌকায় গঙ্গা পার হতে হবে। মালপত্র ঘাড়ে নিয়ে ঘাটে গেলাম। সবে জোয়ার এসেচে— ডিঙি নৌকো ঘাট থেকে একটু তফাতে। একটা মাল্লা এসে আমাকে আড়কোলা করে তুলে নিয়ে চলল। নৌকোর কাছাকাছি এসে আমাকে সুদ্ধ ঝপাস করে জলে প'ড়ে গেল। আমার সেই ঝোলা-কাপড় নিয়ে সেইখানে জলে কাদায় লুটোপুটি ব্যাপার। গঙ্গামৃত্তিকায় লিপ্ত এবং গঙ্গাজলে অভিষিক্ত হ'য়ে নিশীথ রাত্রে বাড়ি এসে পৌঁচানো গেল। গঙ্গাতীরে বাস তবু ইচ্ছে ক'রে বহুকাল গঙ্গা স্নান করিনি— ভীষ্ম-জননী ভাগীরথী সেই রাত্রে তার শোধ তুললেন।"

কলিকাতা ও হাওড়ার মধ্যে গঙ্গার উপর যে বিরাট সেতু দিয়া আমরা যাওয়া আসা করি তখন উহা নির্মিত হয় নাই। সে সময়ে পণ্টুন ব্রিজ বা নৌকাসেতু ছিল[১] বড় বড় জাহাজগুলিকে উত্তর দিকে যাইতে দিতে হইলে, সেতুর মাঝের কয়েকখানি নৌকা সরাইয়া লওয়া হইত। সে সময়ে সেতুর উপর চলাচল বন্ধ। লোকে সরকারী স্টীমারে বা ভাড়ানৌকায় গঙ্গা পারাপার করিত। রবীন্দ্রনাথ ভাড়ানৌকায় নদী পার হইতেছিলেন।

এবার শিলঙযাত্রী পরিবারের অনেকে— রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমাদেবী, দিনেন্দ্রনাথ ও কমলাদেবী। পথের নানা ঘটনা ও দুর্ঘটনার সরস বর্ণনা পাই রানুকে লিখিত পত্রে।[২]

কবি শিলঙে ছিলেন সপ্তাহতিন (১১-৩১ অক্টোবর)— ব্রুকসাইড নামে এক ভাড়াবাড়িতে। এখানে দিনগুলি নিরিবিলির মধ্যেই কাটে— একদিন মাত্র শিলঙ ব্রাহ্মসমাজে প্রাতে উপাসনা করেন। এ ছাড়া সাধারণের পক্ষ হইতে কোনো অনুষ্ঠানাদির আয়োজন হয় নাই। শিলঙবাসীদের পক্ষ হইতে এইরূপ তুষ্ণীম্ভাবের কারণ আমরা অনুমান করিতে পারি। শিলঙ আসামের রাজধানী— আমলাতন্ত্রের কেন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ সদ্য তাঁহার 'সার্' পদবী ত্যাগ করিয়া যে কাণ্ডটা করিয়াছেন, তাহার পর সরকারী চাকুরেদের (শিলঙে তাঁহারাই গণ্যমান্য ব্যক্তি) পক্ষে কবি-সম্বর্ধনা করা কঠিন।

শিলঙ বাসকালে বড়োরকম সাহিত্য সৃষ্টি চোখে পড়ে না,— 'দুই একটা ছোট কথিকা' লেখেন।[৩] 'কিছু ইংরেজি তর্জমাও' করেন।[৪] মাঝখান হইতে অস্ট্রেলিয়া সফরের একটা প্রস্তাব আসে তাহা লইয়া কয়েকদিন জল্পনা-কল্পনা ও উত্তেজনায় মনটা খুশি থাকে— সুদূরের আহ্বানে মন উতলা হয়।[৫] কিন্তু শেষপর্যন্ত এইসব কথাবার্তা কোনো বাস্তব রূপ লয় নাই।

রবীন্দ্রজীবনের সবটাই সাহিত্যসৃষ্টি বা বিশ্বভারতী সংগঠন নহে— রাজনীতির উত্তেজনাও নহে। এক জায়গায় তিনি আর পাঁচজনের মতোই মানুষ— অর্থচিন্তা ও বিষয় রক্ষার কথা ভাবিতে হয়। কিছুকাল হইতে এস্টেটের পার্টিশনের প্রস্তাব চলিতেছে। পাঠকের স্মরণ আছে ঠাকুর এস্টেটের মালিক ছিলেন তিন ভাই— দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ জীবিতকালেই এই ব্যবস্থা করিয়া যান; দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহার অংশ

১ ১৮৭৪, ১৭ অক্টোবর হইতে লোক চলাচল শুরু হয়।

২ ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৩৮; কৃষ্ণা তৃতীয়া ১৩২৬ [১২ অক্টোবর ১৯১৯]।

৩ কথিকা: একটি চাউনী, একটি দিন। প্রবাসী ১৩২৬ অগ্রহায়ণ, পৃ. ৯৯।

৪ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৮৩; পৃ. ২৬৪।

৫ শিলঙ হইতে লিখিতেছেন, "অস্ট্রেলিয়ায় বক্তৃতার কথা আছে তাই তৈরী হতে হচ্চে।" চিঠিপত্র ৫, পত্র ৮৩; ১৩ কার্তিক ১৩২৬ [৩০ অক্টোবর ১৯১৯] ··Letters to a Friend, p. 80. Santiniketan, 11 December 1918.···"Yesterday I had a letter from the university of Sydney.

অপর দুই ভ্রাতাকে ইজারা দিয়া জমিদারি পরিচালনার দায় হইতে মুক্তি পান। ফলে যাবতীয় এস্টেটের ব্যবস্থার ভার, বহু আত্মীয়পরিজনের নির্দিষ্ট মাসহারা দিবার দায় ও দায়িত্ব গিয়া বর্তায় রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথের উপর। সত্যেন্দ্রনাথ কোনো দিন জমিদারি সংক্রান্ত ব্যাপারে মন দেন নাই, কারণ সিবিল সার্বিসের বেতন ও তারপর পেন্‌শন তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট ছিল; তাঁহার একমাত্র পুত্র সুরেন্দ্রনাথই তাঁহার অংশের মালিক বলিয়া কাজকর্ম তাঁহাকেই দেখিতে হইত। কিন্তু কিছুকাল হইতে সুরেন্দ্রনাথ জমিদারির দেখাশুনা বিষয়ে অত্যন্ত অমনোযোগী হইয়াছেন, এখন তাঁহার মন গিয়াছে কলিকাতার জমিজমা ক্রয়বিক্রয়ের ফটকায়। রবীন্দ্রনাথ এইটিকে আদৌ শুভ লক্ষণ বলিয়া মনে করিতেছেন না। তিনি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছেন, সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে জমিদারি রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। সেইজন্য মনে করিতেছেন সময় থাকিতে পার্টিশন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শিলঙ আসিবার পূর্ব্ব হইতেই তিনি প্রথম চৌধুরীকে এ বিষয়ে তাগিদ দিতেছিলেন, কারণ এই সময়ে ঠাকুর এস্টেটের দেখাশুনার ভার চৌধুরীমহাশয়ের উপর ন্যস্ত ছিল। শিলঙ আসিয়াও তিনি এ বিষয়ে ত্বরান্বিত হইবার জন্য প্রমথ চৌধুরীকে তাগিদ দিলেন। তবে জমিদারি যাহাতে নিরপেক্ষভাবে বিভক্ত হয় তজ্জন্য উপদেশ দিয়া লিখিলেন, "আমার নিজের দিকে আমি যেমন ভাবব সুরেনের দিকেও ঠিক তেম্‌নি করেই ভাবব— ওকে মুস্কিলের মধ্যে ফেলে আমি কোনো সুবিধা চাই নে।"[১]

রবীন্দ্রনাথের বিষয়বুদ্ধি কত সূক্ষ্ম ও সুদূরপ্রসারী ছিল তাহা এই পার্টিশনের প্রস্তাব হইতে প্রমাণিত হইল। সম্পত্তি পার্টিশনের কয়েক বৎসরের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথের জমিদারির অংশ তাঁহার কুল ভাঙিয়া ঢাকার ভাগ্যকুলের জমিদার রায়গোষ্ঠীর 'ভাগ্যকুল'কে গড়িল। সময়মত পার্টিশন না হইলে রবীন্দ্রনাথের অংশও সহমরণে যাইত।

শিলঙ পরিত্যাগের পূর্বদিন প্রমথ চৌধুরীকে যে পত্র লেখেন তাহাতে জানাইতেছেন যে তিনি গৌহাটি হইয়া মণিপুর যাইবেন,— ইহাও অস্‌ট্রেলিয়া যাইবার মতো উড়ো কথা— তবে সিলেট যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ আসিয়াছে— সেখানে যাওয়া ঠিক।

কবি ৩১ অক্টোবর গৌহাটি পৌঁছিলেন; সেখানকার আইন কলেজের অধ্যক্ষ জ্ঞানাভিরাম বড়ুয়া কবির ভ্রাতুষ্পুত্র অরুণেন্দ্রনাথের জামাতা: কবি তাঁহার বাটীতেই উঠিলেন।

গৌহাটিতে যে তিনদিন ছিলেন, তার মধ্যে কবিকে অনেকগুলি অনুষ্ঠানেই যোগদান করিতে হয়। প্রথমে জুবিলি পার্কে বিরাট জনসভায় কবি-সম্বর্ধনা। সভায় উপস্থিত জনৈক শ্রোতা বহু বৎসরের পর লেখেন, "কি মধুর কণ্ঠস্বর, কি অপূর্ব বলার ভঙ্গী— সেই ধ্বনি-মাধুর্য যেন এক সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিয়া আমার মনে কি যে মোহ ছড়াইয়া দিয়াছিল তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।"[২]

পরদিন (২ ডিসেম্বর) কর্জন হলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গৌহাটি-শাখার পক্ষ হইতে কবি-সম্বর্ধনার অনুষ্ঠান। তৎপরেই আইনকলেজের হলে মহিলাদের সভা। এই সভায় অসমীয়া মেয়েরা তাহাদের স্বহস্তে বোনা এণ্ডি ও মুগার চাদর কবিকে উপহার দিয়া প্রণাম নিবেদন করে। সেই সন্ধ্যায় ব্রাহ্মসমাজ মন্দির প্রাঙ্গণে শিবনাথ শাস্ত্রীর স্মৃতিসভায় তিনি সভাপতি হন।[৩]

১ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৮৩; কার্তিক ১৩২৬ [৩০ অক্টোবর ১৯১৯] পৃ. ২৬৪।

২ সত্যভূষণ সেন, গৌহাটিতে রবীন্দ্রনাথ, কবি প্রণাম (১৩৪৮) পৃ. ২২।

৩ শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রবাসী ১৩২৬ অগ্রহায়ণ, পৃ. ৯৭-৯৮। দ্র. বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৭ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ১৩৫৬, পৃ. ২৩৪-৩৫।

গৌহাটিতে অসমীয়া মেয়েদের মধ্যে নিজ হাতে তাঁতে কাজ করার সামাজিক প্রথার কথা জানিতে পারিয়া কবি ভারি খুশি। সুতাকাটা ও কাপড়বোনা লইয়া কোনো প্রচারকার্য প্রয়োজন সে দেশে হয় নাই, সমাজ-জীবনের অঙ্গরূপে উহা প্রতিষ্ঠিত। কবির ইচ্ছা বাংলাদেশেও মেয়েদের মধ্যে এই প্রথার প্রবর্তন করেন। তজ্জন্য তিনি আসাম হইতে একজন বিধবা অসমীয়া মহিলাকে শান্তিনিকেতনে আনাইবার ব্যবস্থা করেন ও স্থানীয় পুরনারীদের তাঁত শিখাইবার সকল প্রকার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া দেন। কিন্তু শান্তিনিকেতনে কোনো কাজ দীর্ঘকাল সুষ্ঠুভাবে চালিত হইবার বাধা বিস্তর; তাই এই তাঁতশিক্ষা সেই কারণেই নষ্ট হইয়া যায়। সৃষ্টি করিবার আনন্দ ছিল কবির একার, নষ্ট করিবার অধিকার ছিল আমাদের সকলের।

গৌহাটিতে তিনদিন থাকিয়া আসাম-বেঙ্গল রেলপথে লামডিং ঘুরিয়া সিলেট যাত্রা করিলেন। সিলেট পাকিস্তান রাজ্যভুক্ত হইবার পূর্বে শিলঙের সহিত মোটরপথে যুক্ত ছিল। কিন্তু ১৯১৯ সালে সে মোটরপথ নির্মিত হয় নাই। সিলেট আসিতে হইলে চেরাপুঞ্জী পর্যন্ত মোটর গাড়ি বা ঘোড়ার এক্কায় আসিতে হইত। সেখান হইতে খাসিয়া শ্রমিকদের পিঠে বাঁধা 'থাপা'য় বসিয়া লোকে নামিত। 'থাপা' মাথার সঙ্গে ফেটিবাঁধা বেতের চেয়ার। এই দুর্গম পথে মানুষের পিঠে চাপিয়া রবীন্দ্রনাথ সিলেট যাইতে রাজি হন নাই বলিয়া গৌহাটি ঘুরিয়া রেলপথে যাওয়াই স্থির করিলেন।

গৌহাটি হইতে ট্রেন ছাড়িলে ট্রেন যে স্টেশনে থামে, সেখানেই কবির দর্শনপ্রার্থী জনতার ভিড়। কবির সঙ্গে আছেন, ভাটেরা[১] গ্রামের উমেশচন্দ্র চৌধুরী। "ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ভট্টপাঠক (ভাটেরা) নামক স্থানটি উমেশবাবু কবিকে ট্রেন থেকে দেখিয়েছিলেন। বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে উমেশচন্দ্র চৌধুরীমহাশয় ভাটেরার টিলার উপরিস্থিত তাঁর ভবনটি একটি বিশেষ শর্তে বিশ্বভারতীকে দান করেন। দানপত্রটি কবি দাতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে স্বহস্তে স্বাক্ষর করেছিলেন।"[২]

সিলেট স্টেশনে পৌঁছিলে (৫ নভেম্বর) দেখা গেল বিরাট জনতা প্রতীক্ষমান। স্থানীয় ছাত্র ও যুবকগণ কবির ফিটন গাড়ির ঘোড়া খুলিয়া নিজেরাই রাজপথ দিয়া গাড়ি টানিয়া চলিল; রবীন্দ্রনাথ প্রথমে ব্যাপারটা বুঝিতেই পারেন নাই, যখন বুঝিয়া প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন, তখন গাড়ি জয়ধ্বনির মধ্যে হু হু করিয়া আগাইয়া চলিয়াছে। শহরের উপকণ্ঠে টিলার উপর পাদরী টমাস সাহেবের বাড়ির পাশে একটি সুরম্য অট্টালিকা কবির অবস্থানের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।

সেইদিন সন্ধ্যায় স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে কবি উপাসনা করিলেন। পরদিন সকাল হইতে বিচিত্র অনুষ্ঠান শুরু হইল। প্রথমেই টাউন হলে জনসাধারণের পক্ষ হইতে কবি-সম্বর্ধনা (৬ নভেম্বর)। অভ্যর্থনা সভার সভাপতি সৈয়দ আবদুল মজিদ উর্দুভাষায় কবির কথা বলেন। প্রত্যুত্তরে কবি যে ভাষণ দান করেন তাহা 'বাঙালির সাধনা'[৩] নামে

১ ভাটেরা, ভট্টপাঠক। পূর্বপাকিস্তান, সিলেট জেলার কুলাউরা জংশন হইতে ৯ মাইল দূরে ভাটেরার টিলায় কেশবদেব ও ঈশানদেবের দুইখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়; ইহাতে একটি রাজবংশের ও পাঁচজন রাজার গুণকীর্তি লিখিত আছে। এইজন্য ভাটেরা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান।

২ সুধীরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, শ্রীহট্টে রবীন্দ্রনাথ, কবিপ্রণাম; পরিশিষ্ট পৃ. ৭। ভাটেরার এই সম্পত্তি কিভাবে কাহার হস্তে যায়, সে বিষয়ে আমাদের কিছু জানা নাই। কবিপ্রণাম (১৩৪৮) গ্রন্থে প্রকাশিত হইবার পূর্বে এই তথ্য জ্ঞাত ছিল না। পূর্বপাকিস্তানের কোনো পাঠক এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে তথ্য জানা যাইবে।

৩ বাঙালির সাধনা; প্রবাসী ১৩২৬ পৌষ, পৃ. ২৭৮-৮১।

প্রকাশিত হয়। সেদিন সন্ধ্যায় জনসভায় কবির বক্তৃতা ; জনৈক সমসাময়িক লিখিতেছেন, 'সিলেটে কবি যে সমস্ত বক্তৃতা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে এইটিই সবচেয়ে উদ্দীপনাপূর্ণ এবং প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় অনুলিখিত না-হওয়ার দরুণ কবির এই অমূল্য বক্তৃতাটি চিরস্থায়ীরূপে রক্ষিত হইল না।'[১]

পরদিন প্রাতে স্থানীয় প্রবীণ ব্রাহ্ম গোবিন্দনারায়ণ সিংহের বাটীতে একটি পারিবারিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন ; এই বৃদ্ধ মহর্ষিকে জানিতেন, কবির প্রতিও তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা। সেইদিন মধ্যাহ্নে মুরারীচাঁদ কলেজের ছাত্রাবাসে কবি-সম্বর্ধনা। কবি যে ভাষণ দান করেন, সেইটি 'আকাঙ্ক্ষা' নামে শান্তিনিকেতন পত্রিকায় (১৩২৬ পৌষ) প্রকাশিত হয়। এই ভাষণটি দীর্ঘকালের ব্যবধানে আজও যদি ছাত্রসমাজ পাঠ করেন তো দেখিবেন তাহাদের প্রতি কবির কী শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। কী উদার দৃষ্টিতে তিনি দেশের সমস্যাগুলিকে তাহাদের সমক্ষে বিশ্লেষণ করিয়াছেন।[২]

সেই সন্ধ্যায় রায়বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর গৃহে প্রীতিসম্মেলনে শহরের বিশিষ্ট ভদ্রেরা সমবেত হয়। রাত্রে স্থানীয় মণিপুরী-সমাজ কবিকে মণিপুরী-নৃত্য দেখাইবার ব্যবস্থা করেন ; মণিপুরী বালকবালিকাদের নৃত্য কবিকে বিশেষভাবে প্রীত করে।

সিলেট হইতে চাঁদপুর-গোয়ালন্দের পথে কবি কলিকাতায় ফিরিলেন (৯ ডিসেম্বর)।

কয়েক বৎসর পরে শ্রীহট্ট সম্বন্ধে একটি কবিতা রবীন্দ্রনাথ লেখেন। শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসীরা বাঙালি-হিন্দু-মুসলমান ; কিন্তু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে সেটিকে ও কাছাড়কে আসাম প্রদেশভুক্ত করা হইয়াছিল ; এই দুইটি জেলাকে বঙ্গপ্রদেশভুক্ত করিবার জন্য প্রায়ই কথাবার্তা হইত। আমাদের মনে হয় নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি সেই পরিপ্রেক্ষিতে রচিত—

মমতাবিহীন কালস্রোতে
বাঙলার রাষ্ট্রসীমা হোতে
নির্বাসিতা তুমি
সুন্দরী শ্রীভূমি।
ভারতী আপন পুণ্য হাতে
বাঙালীর হৃদয়ের সাথে
বাণীমাল্য দিয়া
বাঁধে তব হিয়া।
সে বাঁধনে চিরদিনতরে তব কাছে
বাঙলার আশীর্বাদ গাঁথা হয়ে আছে।[৩]

১ কবিপ্রণাম, পৃ. ৫।

২ আকাঙ্ক্ষা প্রবন্ধটি কবির কোনো গদ্যপ্রবন্ধাবলীতে সংগৃহীত হয় নাই। শুধু এইটি কেন— এখনো বহু প্রবন্ধ ইতস্তত ছড়াইয়া আছে।

৩ কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত হয় নাই। কবিপ্রণাম (১৩৪৮) গ্রন্থে কবির হস্তলিপি মুদ্রিত হয়। ১৩৬০ সালের 'মুখপত্র' নামে পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত দেখা যায়। কবিতাটির সময় জানা যায় না— তবে স্বাক্ষরে কবি 'শ্রী'হীন। কবি 'শ্রী'ত্যাগ করেন ১৩৩৯ ভাদ্র মাসে (১৯৩২ অগস্ট)। সুতরাং ১৯৩২-এর পর ইহা রচিত।

উত্তরায়ণের পর্ণকুটিরে

সিলেট হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া দেখেন জোড়াসাঁকোর বাড়ি রোগীতে ভরা— আসামে মাসাধিককালের ভ্রমণ-ক্লান্তির পর বিশ্রামের আশা নাই। তাই পরদিনই (১০ নভেম্বর ১৯১৯) শান্তিনিকেতনে চলিয়া আসিলেন।[১] তা ছাড়া দুই দিন পূর্বে বিদ্যালয় খুলিয়াছে; বিদ্যালয় খোলা থাকিলে কবি দীর্ঘদিন বাহিরে থাকিতেও চান না; তিনি জানেন খোলার মুখে শৈথিল্য প্রায়ই স্বাভাবিক কাজকর্মকে মন্থর করে।

এবার কবি আশ্রমে ফিরিয়া দেহলিতে উঠিলেন না। শান্তিনিকেতনের উত্তরে সীমাশূন্য প্রান্তরে তাঁহার জন্য যে দুইখানি কুটির নির্মিত হইয়াছে তাহার একটিতে আশ্রয় লইলেন। কবির খেয়ালমতো মাটির ঘর, খড়ের চাল, দরজা-জানালায় দরমার কপাট। ঘরের মেঝে মাটির উপর কাঁকর-পেটানো; কেবল স্নানের ঘরটির মেঝে পাকা। কবির ইচ্ছা সমস্ত হইতে দূরে অত্যন্ত সাদাসিদেভাবে জীবনযাপন করেন। কালে সে-বাড়ির রূপ বদলাইতে বদলাইতে 'কোনার্ক' হইল; আর তার পাশে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিল উত্তরায়ণের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা। সেদিন কেহ কখনোও কল্পনাও করে নাই পর্ণকুটিরের পরিণতি হইবে প্রাসাদ! বর্তমানে এই অট্টালিকা রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বহন করিয়া 'রবীন্দ্রসদন' নামে পরিচিত। আসলে ইহার স্রষ্টা রথীন্দ্রনাথ আর সুরেন্দ্রনাথ কর। আর ইহার আভ্যন্তরীণ বিভূষণ ও উদ্যান পরিকল্পনায় ছিল প্রতিমা দেবীর সুমার্জিত রুচির স্পর্শ। স্থাপত্য ও শিল্পকলার দিক হইতে এই অট্টালিকার মর্যাদা অবশ্যস্বীকার্য; কিন্তু আশ্রমজীবনের আন্তরিক আদর্শতা যে ইহারা দ্বারা ক্ষুণ্ণ এমনকি বিপর্যস্ত হয় নাই, তাহাও বলা যায় না; দক্ষিণে গুরুপল্লীর খড়ের ঘরগুলি আশ্রমের আশ্রমত্বের প্রতীকরূপে এই সময়েই নির্মিত হয়। আশ্রম-জীবনের আরম্ভে যে প্রায়-শ্রেণীহীন সমাজ আদর্শ ছিল— যে আদর্শে রবীন্দ্রনাথের পুত্রকন্যারা নূতন বাড়িতে খড়ের ঘরে বাস করিতেন— তাহা হইতে আমরা এখন বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি, এবং এখন হইতে ক্রমেই এই ভেদ প্রশস্ততর ও গভীরতর হইয়া চলিল। আর্টিস্ট রবীন্দ্রনাথ এই শিল্পসৃষ্টিকে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতে দেখিয়া মুগ্ধ; কিন্তু অন্তরের মধ্যে সরল জীবনযাপনের ইচ্ছা হইতে নূতন নূতন আড়ম্বরহীন গৃহনির্মাণ করিয়া তাহাতে বাসের জন্য গিয়াছেন, ইহার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ 'শ্যামলী'— মাটির ঘর।

উত্তরায়ণের পর্ণকুটিরে সন্ধ্যার পর আশ্রমে ছাত্র অধ্যাপক ও অন্য বাসিন্দারা জমায়েত হন। কবি প্রায়ই কিছু পড়িয়া শোনান; যেমন হুইটম্যানের 'লীভস্ অব গ্রাস্', এডোয়ার্ড কারপেন্টারের[২] 'টুওয়ার্ডস ডিমক্রেসি' নামে কাব্যসঞ্চয়ন, ব্রাউনিং-এর কবিতা, জাপানী কবিতার অনুবাদ; মাঝে মাঝে 'পার্সনালিটি'র কোনো প্রবন্ধ লইয়া আলোচনা চলে। এ ছাড়া জারমান কবি লেসিং-এর 'নাথান দি ওয়াইজ'-এর অনুবাদ পড়িয়া শোনান ও তার সৌন্দর্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন।

বিশ্বসাহিত্যের মধ্য হইতে ইহাদের বাছিয়া লইবার কারণ নিশ্চয়ই ছিল; হুইটম্যান-এর উদার দৃষ্টির দ্বারা কার্পেণ্টার অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। লেসিং-এর 'নাথান দি ওয়াইজ' গ্রন্থ আলোচনাও বিশেষ অর্থবোধক।

১ প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত পত্র। চিঠিপত্র ৫, পত্র ৮৩ক; পৃ. ২৬৫ [২৫ কার্তিক ১৩২৬ ॥ ১১ নভেম্বর ১৯১৯]।

২ Edward Carpenter (1844-1929) ইংরেজ লেখক। ১৮৭৭ আমেরিকা ভ্রমণে যান; সেই সময়ে এমাস ন, হোমস, হুইটম্যান প্রভৃতি ভাবনাদার সহিত পরিচিত হন। ইংলনডের সোশিয়েলিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ইহার কবিতাগুলি Towards Democracy (1883-1902) গ্রন্থে সংগৃহীত। কবিতায় হুইটম্যানের প্রভাব খুব স্পষ্ট। কবি বোধ হয় সেইজন্য হুইটম্যান ও কার্পেণ্টারের কবিতা পড়াইবার জন্য বাছিয়া লন। তাছাড়া ইঁহাদের অসমছন্দ বা গদ্যছন্দ (কবির 'লিপিকা' তুলনীয়) কবির এখন বিশেষভাবে ভালো লাগিতেছে।

যাঁহারা ১৮ শতকের য়ুরোপীয় সাহিত্য সম্বন্ধে কিছুটা ওয়াকিবহাল তাঁহারা জানেন আধুনিক সমালোচনা সাহিত্যের অন্যতম স্রষ্টা লেসিং। এ ছাড়া 'নাথান' (১৭৭৯) মুক্তমনের অভিযাত্রী— স্বাধীন চিন্তা বা চিন্তা করিবার স্বাধীনতা অর্জন হইতেছে এই নাটকের মুখ্যকথা। নাথান ইহুদী তাহার ধর্মসম্বন্ধে প্রশ্ন এ নহে তোমার কোন ধর্ম—তাহার প্রশ্ন তুমি কি অর্থাৎ what are you।[১] এই মহৎ আদর্শই রবীন্দ্রনাথের ধর্ম। বিশ্বমানবকে অখণ্ডদৃষ্টিতে গ্রহণ করিবার জন্যই কবি ইংরেজ, জারমান, আমেরিকান, জাপানী কবিদের বিচিত্র কাব্য লইয়া পড়াইতেছেন।

বিদ্যালয় খুলিলে প্রথম বুধবারে (১৯ নভেম্বর ১৯১৯) কবি উপাসনা করিলেন; কবির মনে নানা প্রশ্ন। আজ মানুষের সমাজজীবন যে নানাভাবে বিপর্যস্ত, সেই কথাটাই আজ মনের পুরোভাগে। বর্তমানে মানুষের শিক্ষাক্ষেত্রে ও সংসারাদর্শে যেমন বিরোধ, কর্মের সঙ্গে তাহার গৃহের বিচ্ছেদ তেমনি প্রবল। স্বস্থানে স্বাভাবিক জীবনযাপনের অধিকারী আজ কেহই নহে। এই সূত্রে তিনি বলিলেন, "যেখানে কর্মের সঙ্গে কর্মীর আন্তরিক সম্বন্ধ নেই, যেখানে স্বভাবের সঙ্গে কর্মের যোগ বিচ্ছিন্ন, সেইখানেই দাসত্ব। সেই দাসত্ব আজ সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত।"[২] কবির মনে সেদিনকার প্রশ্ন কালে পৃথিবীর কঠিনতম সমস্যায় দাঁড়াইয়াছে— মানুষ আজ কোথাও স্বাধীন নহে। পরস্পরের সমবায়ে ও সহযোগে যাহা গড়িয়া উঠে, তাহাতে সৃষ্টির আনন্দ আছে; কিন্তু এখন সমাজে সেটি দুর্লভ; কর্মের অর্থই দাঁড়াইয়াছে দাসশ্রম সকলের 'শ্রম' ধনিক ও ধনতন্ত্রী শাসনসংস্থার নিকট বিক্রেয় পণ্য মাত্র। ইহারই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ধনিক ও শ্রমিকের স্বার্থের বিরোধ; এবং সেই বিরোধ হইতে শ্রেণীসংঘাতের ও দুনিয়ার সকলপ্রকার অশান্তির জন্ম।

সাতই পৌষ (১৩২৬) উৎসবের ভাষণে ও অন্যান্য কথার মধ্যে কবির মনে এই কথাটাই উঠিতেছে জগতের শান্তি এমনভাবে নাড়া পাইল কেন। প্রথম মহাযুদ্ধ বৎসর কাল মাত্র শেষ হইয়াছে। কিন্তু কোনো সমস্যার সমাধানের আশা দেখা যাইতেছে না। "আজকের দিনে য়ুরোপ ধন মান প্রতাপ ও বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত। সেই য়ুরোপের আসন আজ মৃত্যুর আঘাতে যেমন করে টলে উঠেচে ইতিহাসে এমন প্রায় দেখা যায় না। বাহিরের সেই টলার সঙ্গে তার অন্তর যে টলে ওঠেনি তা নয়— জীবনসমস্যা আর একবার চিন্তা করে দেখতে সে প্রবৃত্ত হয়েছে। কিন্তু নূতন জীবনের দীক্ষা নেওয়া ছাড়া তার কি আর কোনো পথ আছে? ধনিকের স্বার্থজাল আজ সমস্ত জগতকে বেষ্টন করেছে। এই স্বার্থ যতই প্রবল হয়ে উঠচে এই স্বার্থের সংঘাতও ততই ভয়ংকর হয়েচে। সেই সংঘাতের ভীষণ রূপ আমরা দেখচি। এই ভীষণতা বিজ্ঞানের সহায়তায় ভাবীকালে আরো যে বিরাট মূর্তি ধরবে তার আর সন্দেহ নেই।" কবি স্পষ্টভাবে এই ভাষণে বলিলেন, "হয় নবজীবনের দীক্ষা নিতে হবে, নয় বারে-বারে মৃত্যুর পরে মৃত্যু এসে সমস্ত লোপ করে দেবে, এর মাঝখানে কোনো রফা-নিষ্পত্তির কথা চলবে না। নিজেকেই ঈশ্বর করে এই চলমান জগতের সমস্ত চলাকে নিজের প্রয়োজনের দ্বারা চিরকাল অবরুদ্ধ

১ Nathan the Wise: "the drama of free thought or more exactly of freedom to think...[It] ranks as the latest and greatest document of European Illumination (Aufklarung) by its insistence, through the exaltation of Nathan the Jew that the question of religion to pose to human kind is not 'what do you profess', but 'what are you'.— Magnus.

২ মন্দিরের ভাষণ, ৩ অগ্রহায়ণ ১৩২৬ [১৯ নভেম্বর ১৯১৯]; শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩২৬ পৌষ। দ্র. শান্তিনিকেতন [উপদেশমালা] বিশ্বভারতী সংস্করণ ১৩৪২ ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০১-৬০৬। এই প্রবন্ধ ১৩৫৬ সালের সংস্করণে নাই।

করে রাখতে পারে সৌভাগ্যক্রমে এমন ক্ষমতা বিশ্বে কারো নেই। বাঁধ ভাঙবেই; সে বাঁধ আরো বড়ো করে বাঁধতে গেলে আরো বড়ো রকমের প্রলয়ের মধ্যেই ভাঙবে।"[১]

এ কী ভবিষ্যদ্বাণী। তখনো প্রথম মহাযুদ্ধের পর সকল সন্ধিপত্রে পরাজিত রাষ্ট্রসমূহের শেষ সহি পড়ে নাই।

আটই পৌষ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের[২] বার্ষিক সভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতি। এই দিন আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্রদের উৎসব। বহুকালের চেষ্টায় এইবার তাহাদের নিজ গৃহ নির্মিত হইয়াছে। এই গৃহের উদ্বোধন হইল। আশ্রমের বহু পুরাতন ছাত্র সেদিন উপস্থিত ছিলেন; ছাত্রদের উপর কবির পরম ভরসা; জীবনের শেষ পর্যন্ত তাঁহার আশা ছিল ভাবীকালে তাহারাই বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করিবেন।[৩]

বুধবারে বা উৎসবে ভাষণ-দানাদি নিত্য ঘটনা নয়; এই সময়ে কবির দিন কি ভাবে যাইতেছে তাহার চিত্র পাই সমসাময়িক পত্রিকা হইতে। "ভোরবেলা যায় তাঁর ক্লাস পড়াইতে, দুপুর যায় 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা'র লেখা লিখিয়া এবং ক্লাস পড়াইয়া, সন্ধ্যাবেলা যায় ছেলেদের সঙ্গে গল্প ও খেলা করিয়া। এইভাবে তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি ও সময় আশ্রমের কাজে ঢালিয়া দিয়াছেন।"[৪]

নূতন-কিছু লিখিবার প্রেরণা নাই; প্রমথ চৌধুরীকে লিখিতেছেন, "উজানস্রোতে সাহিত্যের লগি ঠেলা বারোমাস মানুষের ভালো লাগে না। · কোনো লেখা প্রকাশ করতে · · উৎসাহ বোধ হয় না। যে মূঢ়তা সরল তারও একটা সৌন্দর্য আছে, যেমন শিশুদের— কিন্তু যে মূঢ়তা কুটিল এবং উদ্ধত তাকে সহ্য করা যায় না।"[৫]

কবির এই মন্তব্য হইতে তাঁহার প্রতি সমসাময়িক এক শ্রেণীর সমালোচকদের এবং তাঁহাদের প্রতি কবির মনোভাব স্পষ্ট। সমালোচকদের সজারুর সহিত তুলনা করিয়া পূর্বোদ্ধৃত পত্রে লিখিতেছেন, "ওরা ভাবচে আকাশের সব জ্যোতিষ্ককে ওদের ঐ সহজাত সম্মার্জ্জনী দিয়ে ওরা ঝেঁটিয়ে দেবে। পারে তো তাই করুক। ওদের কাঁটার ঝাঁটারই জিৎ হোক্।" কবির এই রুক্ষ মনোভাবের কারণ কি?

এই সময়ে চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকা রবীন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ, রামমোহন ও ব্রাহ্মধর্মের উপর এবং বিশেষভাবে কবির রচনার উপর নানাভাবে আক্রমণ করিতেছিলেন। আমাদের মনে হয় এইসব রচনার জন্য তাঁহার মনে এই সাময়িক বিরক্তির উদ্ভব। একটি প্রবন্ধে লিখিতেছেন— "পৃথিবীতে যারা বিজয়ী জাতি তারা শুভক্ষণে চলার মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েচে। আমাদের দেশে আমরা ধর্মের নাম করে জড়তার মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েচি। নূতনের আহ্বান

১ শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩২৬ ফাল্গুন। [১] ৭ই পৌষ প্রভাত। উৎসবের উদ্বোধন। [২] ৭ই পৌষ প্রাতে মন্দিরে— বক্তৃতার সারমর্ম। [৩] ৭ই পৌষ— সন্ধ্যার উদ্বোধন। [৪] সন্ধ্যায় মন্দিরে উপদেশ। দ্র শান্তিনিকেতন [উপদেশমালা] বিশ্বভারতী সংস্করণ ১৩৪২, ২য় খণ্ড পৃ ৬০২-৬১২ [সন্ধ্যার ভাষণ]। এই ভাষণ ১৩৫৬-এর সংস্করণে নাই। উপরের উদ্ধৃতিটি প্রাতের ভাষণ হইতে গৃহীত।

২ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পরিচালককে 'সর্বাধ্যক্ষ' বলিত; এই সময়ে ক্ষিতিমোহন সেন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সর্বাধ্যক্ষ ও বিশ্বভারতীর বিধুশেখর ভট্টাচার্য অধ্যক্ষ। ৮ই পৌষ বার্ষিক সভায় বিদ্যালয়ের বার্ষিক (১৩২৬) ও বিশ্বভারতীর ষাণ্মাসিক (১৩২৬ আষাঢ় পৌষ॥ ১৯১৯) প্রতিবেদন পেশ ও পঠিত হয়। দ্র. শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩২৬ মাঘ।

৩ কবির ভাষণ, দ্র. প্রাক্তনী পৃ ৩৪-৩৯। পুরাতন ছাত্রেরা আপনাদের মধ্যে অর্থ তুলিয়া নেপালবীথি ও গুরুপল্লীপথের চৌমাথায় একটি খড়ের ঘর নির্মাণ করেন। কয়েক বৎসর পরে ঘরটি আগুনে পুড়িয়া যায়; তখন করগেটটিনের আচ্ছাদন ও অ্যাসবেস্টসের পাটাতন দিয়া নূতন করিয়া গৃহ নির্মিত হয়। ১৯৭৭ সালে চীনাভবন তৈয়ারির সময় ঐ ঘর ভাঙিয়া ফেলা হয়; তখন প্রাক্তন ছাত্রেরা শ্রীনিকেতনের পথের ধারে নূতন গৃহ নিমাণ করেন।

৪ শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩২৬ চৈত্র।

৫ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৮৫; ১৪ ফাল্গুন ১৩২৬ (১৯২০ ফেব্রুয়ারি ২৬) পৃ ২৬৭।

বারে-বারে আসচে · · আর বারে-বারে আমাদের দেশে এক একজন অচলপন্থী উঠে বলচেন, চলবার দরকার নেই। · ·তাদের কথাকেই আমরা ধ্রুব সত্য বলে মান্‌চি, এইজন্যে যে, তাদের কথার সঙ্গে আমাদের চিরজীবনের অভ্যাসের সঙ্গে মিল হচ্চে ; এইজন্যে সমস্ত বিশ্বের সত্যের সঙ্গে আচরণের অনৈক্য নিয়েই আমরা বেশি গৌরব করি, মনে করি এই অনৈক্যেই আমাদের আভিজাত্য।"[১]

আমরা পূর্বে বলিয়াছি এই সময়ে কবির নূতন সাহিত্য সৃষ্টি চোখে পড়ে না, তবে গান লিখিতেছেন মাঝে মাঝে। আর পুরাতন নাটক 'রাজা' ভাঙিয়া নূতন গান সংযোজন করিয়া 'অরূপরতন' নামে নাটিকা লিখিলেন।

অরূপরতন ও রাজা

১৩২৬ সালের মাঘ মাসে যে 'অরূপরতন'[২] গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, তাহা রবীন্দ্র-রচনাবলী সংস্করণ (১৩৪২) হইতে পৃথক ; প্রথম সংস্করণ এখন প্রচলিত নাই।

(অরূপরতন মূল 'রাজা' নাটক হইতে বেশি রূপক-ঘেঁসা বা symbolistic। রাজার মধ্যে রূপক আছে, তবে উহাকে প্রতীকের খাঁজে খাঁজে বসাইবার চেষ্টা নাই বলিয়া ইহার রমণীয় নাটকীয়তা অক্ষুণ্ণ আছে।)

১ মনের চালনা, শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩২৬ ফাল্গুন।

২ অরূপরতনের ভূমিকায় কবি লেখেন—

সুদর্শনা রাজাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিল। যেখানে বস্তুকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁওয়া যায়, ভাণ্ডারে সঞ্চয় করা যায়, যেখানে ধনজনখ্যাতি, সেইখানে সে বরমাল্য পাঠাইয়াছিল। বুদ্ধির অভিমানে সে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল যে, বুদ্ধির জোরে সে বাহিরেই জীবনের সার্থকতা লাভ করিবে। তাহার সঙ্গিনী সুরঙ্গমা তাহাকে নিষেধ করিয়াছিল। বলিয়াছিল, অন্তরের নিভৃত কক্ষে যেখানে প্রভু স্বয়ং আসিয়া আহ্বান করেন সেখানে তাহাকে চিনিয়া লইলে তবেই বাহিরের সর্বত্র তাহাকে চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না ;— নহিলে যাহারা মায়ার দ্বারা চোখ ভোলায় তাহাদিগকে রাজা বলিয়া ভুল হইবে। সুদর্শনা একথা মানিল না। সে সুবর্ণের রূপ দেখিয়া তাহার কাছে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল। তখন কেমন করিয়া তাহার চারিদিকে আগুন লাগিল, অন্তরের রাজাকে ছাড়িতেই কেমন করিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরের নানা মিথ্যা রাজার দলে লড়াই বাধিয়া গেল— সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল, কেমন করিয়া দুঃখের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল এবং অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া তবে সে তাহার সেই প্রভুর সঙ্গলাভ করিল, যে প্রভু কোনো বিশেষরূপে, বিশেষ স্থানে, বিশেষ দ্রব্যে নাই, যে প্রভু সকল দেশে, সকল কালে ; আপন অন্তরের আনন্দরসে যাহাকে উপলব্ধি করা যায়, এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

এই নাটকটি "রাজা" নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ— নূতন করিয়া পুনর্লিখিত।

[১] রাজা (নাটক): ইন্‌ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। পৌষ ১৯১০ (১৩১৭) পৃ. ১২৮।

[২] অরূপরতন: ইন্‌ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, শান্তিনিকেতন প্রেসে মুদ্রিত, ১৩২৬ মাঘ: পৃ. ৭৩।

[৩] রাজা: ২য় সংস্করণ [১৩২৬ চৈত্র ?]। এই সংস্করণ রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

[৪] অরূপরতন: বিশ্বভারতী হইতে প্রকাশিত। ১৩৪২ (১৯৩৫) ইহা পরিবর্ধিত সংস্করণ। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪ খণ্ডে ভুক্ত।

অরূপরতনের প্রথম সংস্করণে ৩৬টি গান— কবির কোনো নাটিকায় এত গান নাই। তবে এই গানগুলির সবই যে নূতন তাহা নহে— নূতন গান ১০টি ; মূল রাজা নাটকের ১১টি গান ছাড়া গীতালি (৮টি), গীতিমাল্য (২), গীতবীথিকার (১) ইহাতে আছে। নাটিকার বিষয়বস্তু ও আকারের তুলনায় গানের সংখ্যা অত্যধিক মনে হয়।

অরূপরতন: প্রচলিত সংস্করণে গানের সংখ্যা ২৩টি ; তন্মধ্যে ১০টি গান মূল রাজা নাটকের: ৬টি প্রথম সংস্করণ অরূপরতনের ; এছাড়া গীতালি (৪), কাব্যগীতি (১) হইতে গান সংযোজিত হইয়াছে।

আমাদের আলোচ্যপর্ব অর্থাৎ ১৩২৬ সালের বসন্তকাল (১৯২০ ফেব্রুয়ারি - মার্চ)। 'রাজা' নাটক নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ায় তাহারও নূতন সংস্করণ মুদ্রণের প্রয়োজন হয়। এই সংস্করণের ভূমিকায় কবি লিখিলেন, "এই রাজা প্রথমে খাতায় যেমনটি লিখিয়াছিলাম, তাহার কতকটা কাটিয়া-ছাঁটিয়া বদল করিয়া [১ম সংস্করণ] ছাপানো হইয়াছিল। হয়তো তাহাতে কিছু ক্ষতি হইয়া থাকিবে এই আশঙ্কা করিয়া সেই মূল লেখাটি অবলম্বন করিয়া বর্তমান সংস্করণ ছাপানো হইল।" এই সংস্করণই এখনো প্রচলিত এবং রবীন্দ্র-রচনাবলীর অন্তর্গত (২৪শ খণ্ড)।[১]

রাজা, অরূপরতনের দুইটি সংস্করণের পাঠ গান ও বিষয়বস্তু, তত্ত্বকথা, টেকনিক প্রভৃতি লইয়া একটি সুন্দর তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্র আছে; ইহার সহিত 'শাপমোচন'ও লইতে পারা যাইবে।

গুজরাট-ভ্রমণ

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের অনেক প্রকারের পরীক্ষা হইয়াছে—দীর্ঘ অবকাশ লইয়াও পরীক্ষা কবি করিয়াছিলেন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিকে বিদ্যালয়ে গ্রীষ্মের সময় এক মাস, পূজার সময়ে পনেরো দিন ও শীতকালে এক মাস ছুটি থাকিত; অবশ্য সে রীতি বহুকাল চলে নাই। কালে গ্রীষ্মাবকাশের জন্য দেড় মাস শরৎকালে এক মাস ছুটির ব্যবস্থা চালু হয়; স্থানীয় উৎসবাদি ছুটিতে কেহ বাহিরে যাইতে পারিত না। আমাদের আলোচ্য পর্বেও সেইটিই রীতি ছিল। কিন্তু এবার কবির মনে হইল শরৎকালের ছুটি কমাইয়া গ্রীষ্মকালে তিন মাস ছুটি দিবেন চৈত্র ১২ হইতে (১৩২৭) আষাঢ় ১২ পর্যন্ত। এই পরীক্ষা একবার মাত্রই হয়—কারণ তিন মাস পরে বিদ্যালয় খুলিলে ছাত্রদের পাঠোন্নতির শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া এই পদ্ধতি পুনঃপ্রবর্তিত হইবার কথা আর কখনো উঠে নাই।[২]

কবি বিদ্যালয়ের কাজে যতই মনঃসংযোগ করুন— এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে তিনি মুখ্যত কবি, স্কুলমাস্টারি করিতে ভালো লাগে তবে তাহা কিছুকালের জন্য। বিদ্যালয়ের একঘেয়ে কাজে 'কবি'কে বাঁধা যায় না। মনে মনে বোধ হয় মুক্তির সন্ধান করিতেছিলেন— এমন সময়ে সুযোগ মিলিল। আহমদাবাদে গুজরাটি সাহিত্য সম্মেলন— কবিকে সভাপতিত্ব করিবার আহ্বান আসিয়াছে। এই ইচ্ছা প্রথম প্রকাশ করেন গান্ধীজি (১৯১৯ অক্টোবর ১৮)। কথা ছিল ডিসেম্বরে সভা হইবে; কিন্তু নানাকারণে পিছাইতে পিছাইতে শেষ পর্যন্ত ঈস্টারের ছুটিতে সম্মেলন আহূত হইল। গান্ধীজি কবিকে লেখেন (১৯২০ জানুয়ারি ১৪)—I sincerely hope that the capital of Gujrat will

১ রাজার ১ম সংস্করণে গান ছিল ২২টি; তন্মধ্যে ২১টি নূতন; ১টি পুরাতন 'আমায় তুমি কিসের ছলে' (ধর্মসংগীত ১৩২০) এবারকার ২য় সংস্করণে গানের সংখ্যা ২৬। ১ম সংস্করণে নূতন ২১টি গান ছাড়া আর ৫টি গান সংযোজিত হয়। তন্মধ্যে ৪টি নূতন।

১। আমি রূপে তোমায় ভোলাবো না (গীতবিতান ৩০৭)

২। ভয়েরে মোর আঘাত করো (গীতবিতান ৯৭)

৩। আমি কেবল তোমার দাসী (গীতবিতান ৪১৬)

৪। অন্ধকারের মাঝে আমায় ধরেছ দুই হাতে (গীতবিতান ৩৯)

৫। আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে (গীতাঞ্জলি। গীতবিতান ৫০১) ১ম সংস্করণের 'আমায় তুমি কিসের ছলে' গানটি এই সংস্করণ হইতে বর্জিত।

২ ২১ ফাল্গুন ১৩২৬ কলিকাতা রিপন (সুরেন্দ্রনাথ) কলেজের অধ্যাপক বিপিনচন্দ্র গুপ্ত আসেন। তাঁহার সহিত কবির সংলাপ; দ্র. মানসী ১৩২৬ চৈত্র, শান্তিনিকেতনে একরাত্রি। দ্র. তাঁহার গ্রন্থ 'বিচিত্র প্রবন্ধ'।

have the honour of receiving you during the Easter। কবি আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলে, গান্ধীজি সবরমতী হইতে লিখিলেন (১৯২০ মার্চ ১১)—Every effort is being made not to overload you with engagements or *tamashas*।

গ্রীষ্মের ছুটি আরম্ভ হইলে কয়েকদিন পরে (২৯ মার্চ) কবি বোম্বাই যাত্রা করিলেন— সঙ্গে তাঁহার এন্‌ড্রুজ, ক্ষিতিমোহন সেন, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও কিশোর ছাত্র প্রমথনাথ বিশী; রবীন্দ্রনাথ এই কিশোর ছাত্রের মধ্যে প্রতিভার লক্ষণ তখনই লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

বোম্বাই স্টেশনে একটা অভ্যর্থনার ঝড় পার হইয়া দিনটা শহরে কাটাইয়া রাত্রির ট্রেনে কবি সদলে আহমদাবাদ যাত্রা করিলেন। সেখানে তাঁহারা অম্বালাল সরাভাই-এর অতিথি। অম্বালাল আহমদাবাদের অন্যতম ধনী, বিরাট বয়নশিল্পের মালিক; অবশ্য ধনী ও কলের মালিক শহরে আরও আছেন। কিন্তু এই পরিবারের এমন একটি মার্জিত সংস্কৃতি ছিল, যাহা কবিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। অম্বালালের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভক্ত ছিলেন। অম্বালালের পত্নী সরলা সরাভাই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপদ্ধতির অনুরাগী; তিনি নিজ গৃহেই সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই শিক্ষিত পরিবারের গৃহ পরিবেশ কবির খুবই ভালো লাগিল। এই সময়ে সরাভাইদের সহিত যে ঘনিষ্ঠতা হয়, তাহা কবির জীবনকালে কখনো ক্ষুণ্ণ হয় নাই; বিশ্বভারতী স্থাপিত হইবার পর দীর্ঘকাল অম্বালাল উহার সাহায্যকল্পে অর্থদান করিয়াছিলেন; এই পরিবারের সহিত আমাদের আরও কয়েকবার সাক্ষাৎ হইবে।

আহমদাবাদে পৌঁছিবার পর দিন (২রা এপ্রিল ১৯২০) গুজরাট সাহিত্য সম্মেলন; কবি তাঁহার ভাষণ ইংরেজিতেই পাঠ করেন। সেইদিন অপরাহ্ণে কবি গান্ধীজির সবরমতী আশ্রমে যান, সেখানে রাত্রিবাস করেন ও পরদিন প্রাতে আশ্রমের প্রাত্যহিক উপাসনা নিষ্পন্ন করেন।

কবি অম্বালালদের গৃহে আছেন; একদিন নগরের গুজরাটি মেয়েরা কবিকে তাহাদের 'বনিতা আশ্রম' পরিদর্শনের জন্য লইয়া গেলেন; সেখানে ভাষণ-প্রসঙ্গে কবি বলেন, "স্বর্গরাজ্য যখন দৈত্যেরা অধিকার করে, যখন অধিকারচ্যুত দেবগণ যুদ্ধে ও রাজনীতির কূটপদ্ধতিতে পরাভূত হইয়া স্বর্গভ্রষ্ট হইল— তখন তাঁহারা দেখিলেন শিব আছেন ব্রহ্ম-সমাধিমগ্ন। সমাধিমগ্ন শিবকে জাগাইবার সাধ্য তাঁহাদের কাহারও নাই; একমাত্র তাহা পারেন গৌরী। নারীর সেই ঐকান্তিকী তপস্যাতে যদি শিব জাগ্রত হয়েন, তবেই দেবতাদের জয়ের আশা। তখন গৌরী তাঁহার নির্মল চিন্ময় তপস্যাতে শিবকে জাগাইলেন; স্বর্গরাজ্য মুক্ত হইল। আজ ভারত দুর্গতির চরম সীমায় উপনীত; পুরুষের দল আছেন কূট রাজনীতি লইয়া।" ভাষণ শেষে কবি বলিলেন, নারীরা যেন পুরুষদের অক্ষম দুর্বল অনুকরণ না করেন, তাঁহারা যেন দেশের শিব বা মঙ্গল শক্তিকে তপস্যার দ্বারা জাগ্রত করেন।[১]

দিন চার আহমদাবাদে কাটাইয়া কবি কাঠিয়াবাড়ের অন্যতম দেশীয় রাজ্য ভাবনগর যাত্রা করিলেন; তখন সেখানকার প্রধান মন্ত্রী সার্ প্রভাশঙ্কর পট্টানী; তাঁহার ব্যবস্থায় কবির জন্য স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা হয়; রাজ্যের নিজস্ব রেলওয়ে ছিল। রাজধানীতে কবি-সম্বর্ধনার বিপুল আয়োজন হইয়াছিল।

ভাবনগরের বৈষ্ণবসমাজের ভজনগান বিখ্যাত; ভক্তনারীদের কণ্ঠে মীরাবাঈ-এর ভজন ও সর্বদেহের ছন্দে ছন্দে প্রণিপাতন কবির ভক্ত হৃদয়ে অপার আনন্দ দেয়।

১ দ্র. শান্তিনিকেতন পত্রিকার মহিলা সমিতি কর্তৃক সম্পাদিত 'শ্রেয়সী' অংশে মুদ্রিত। ১৩৩০ পৌষ, পৃ. ২০৭-২০৮।

কবির পরবর্তী গন্তব্যস্থান লিম্‌ডী।[১] ইহাও কাঠিয়াবাড়ের অন্যতম ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য। এখানকার রাজা বিশ্বভারতী কর্মীদের স্বাস্থ্যনিবাস নির্মাণের জন্য দশ হাজার টাকা কবিকে দান করেন; সেই টাকার সুদ হইতে অসুস্থ কর্মীদের শৈলাবাসে পাঠাইবার ব্যবস্থা হয়। পরযুগে এই অর্থ সাধারণ তহবিলভুক্ত হইয়া যায় এবং দাতার ইচ্ছা ও অভিপ্রায় অনুসারে কার্য আর রূপ গ্রহণ করে নাই; এখন তাঁহার নাম বিশ্বভারতীতে অজ্ঞাত। রবীন্দ্রনাথ অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনিতেন— তাহার ব্যবস্থা, ব্যয় ও অপব্যয় করিতেন বিশ্বভারতীর পরিচালকমণ্ডলী বা সংসদ।

লিম্‌ডী হইতে কবি আহমদাবাদে আসিয়া অম্বালালদের গৃহে উঠিলেন। সেখান হইতে একদিনের জন্য নাদিয়াদে বক্তৃতা করিয়া আসিয়া সেইরাত্রে বোম্বাই যাত্রা করেন (৯ এপ্রিল)।

বোম্বাই আসিয়া শোনেন যে জালিনবালাবাগের হত্যাকাণ্ড স্মরণে সাম্বৎসরিক সভা হইতেছে ১৩ই এপ্রিল; পাঠকের স্মরণ আছে গত বৎসর ঐ দিন অমৃতসরে কী ঘটিয়াছিল। বোম্বাই-এর এই সভার অধিনায়ক বোম্বাই-এর ব্যারিস্টার কংগ্রেসী সদস্য জনাব মহম্মদ আলী জিন্না। জিন্না সাহেবের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ ঐ দিনের জন্য একটি ভাষণ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।[২]

কবি জিন্না সাহেবকে লেখেন, "আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতে পঞ্জাবে একটি মহাপাপাচার অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতো পাপের এই রকম ভীষণ আকস্মিক প্রকাশ তাদের পশ্চাতে রেখে যায়, আদর্শের ভগ্নস্তূপের ও ভস্মাবশেষের আবর্জনা। চার বছর ধরে যে দানবীয় সংগ্রাম বিধাতার সৃষ্ট এই জগতকে যে-আগুনে দগ্ধ ও যে-বিষে কলঙ্কিত করেছে, তারই আসুরিক ঔরস্য হলো এই জালিয়ানওয়ালাবাগ। যে দুঃসহ যন্ত্রণার রক্তলাঞ্ছিত দীর্ঘ পথে মানবতা চলেছে আজ পা টেনে টেনে, তারই বিপুল পাপভার, যাদের হাতে যথেচ্ছ ক্ষমতা আছে, তাদের মনে জাগিয়েছে অনমনীয় কাঠিন্য ও ঔদাসীন্য। সে মনে না আছে এতটুকু দরদের বাধা বা বাইরে থেকে বাধা পাওয়ার একটুও ভয়। এই যে ক্ষমতাবানের কাপুরুষতা তা এতটুকু লজ্জাবোধ করেনি অস্ত্রহীন ও অসতর্কিত গ্রামবাসীদের উপর মারণাস্ত্রচালনার ভয়াবহতায়; কিম্বা কুৎসিত বিচার-প্রহসনের যবনিকার অন্তরালে, অকথ্য অবমাননা প্রয়োগে। এক মুহূর্তের জন্যও তাদের অনুভূতিতে এ কথা জাগেনি যে, এটা তাদেরি মনুষ্যত্বের জঘন্য অপমান। গত যুদ্ধে মানুষ সত্য ও সম্ভ্রমবোধকে যেভাবে পদদলিত করে, আপন স্বভাবের মহত্তর প্রকাশকে যেভাবে নিয়ত লাঞ্ছিত করেছে, তাতেই সম্ভব হয়েছে এই কাপুরুষতা। ভূকম্পের পর ভূকম্পের সৃষ্টি ক'রে যাবে সভ্যতাসৌধের এই সমূল উৎপাটন; মানুষকে প্রস্তুত থাকতে হবে আরো দুঃখভোগের জন্য। আত্মঘাতী হিংস্র প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি (য়ুরোপের পীস্‌ কনফারেন্সে) শান্তি আলোচনার আবহাওয়াকে যেভাবে আজ কলুষিত করে তুলছে, তাতে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে ভারসাম্য ফিরে আসতে লাগবে বহুদিন। জয়মদমত্ত শক্তিপুঞ্জের এই ভৈরবীচক্রে আমাদের কোনো স্থান নেই। তারা তাদের অভিপ্রায় মতো দুনিয়াটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলছে। আমাদের যে-কথাটা জানা প্রয়োজন, সে হচ্ছে এই যে, যারা নিঃসহায়দের অপমান লাঞ্ছনা করে, নৈতিক অধঃপতন শুধু তাদেরই ঘটে না, যাদের উপর বর্ষিত হয় সে-অপমান, তাদেরও ঘটে সেই অধঃপতন। নিষ্ঠুর অবিচার যখন

১ লিম্‌ডীতে কবি ৬ এপ্রিল ১৯২০ হিন্দীতে এক ভাষণ দেন; বলা বাহুল্য কবির বক্তব্য তাঁহার সঙ্গী ক্ষিতিমোহন সেন লিখিয়াছিলেন। দ্র. শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩৩১ পৌষ পৃ. ২২৪-২৬।

২ অমল হোম এই মূল্যবান পত্রখানি পুরাতন পত্রিকা হইতে উদ্ধার করিয়া প্রকাশ করেন। দেশ, শারদীয়া সংখ্যা ১৩৬৪। দ্র. পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ ২য় সংস্করণ (১৩৬৪) পৃ. ৯৩-৯৮। মূল ইংরেজিপত্র ও অনুবাদ।

নিঃসন্দেহে জানে যে, সে পাবে নিশ্চিত অব্যাহতি, তখন তার কাপুরুষতা সত্যই কুৎসিত ও নীচ। কিন্তু এ অবস্থায়, দুর্বলের মনে যে ভয় ও নিবীর্য ক্রোধের সঞ্চার-সম্ভাবনা রয়েছে, তা সেই কাপুরুষতার চেয়ে কম হেয় নয়।

"ভ্রাতৃগণ, পশু-শক্তি যখন নিজের দম্ভবিশ্বাসে মানুষের আত্মাকে নিষ্পেষিত করবার চেষ্টা করে, তখনই মানুষের সময় আসে, তার আত্মা যে অজেয়, সে-কথা জোর করে জাহির করবার। আমাদের অন্তরে প্রতিহিংসা-গ্রহণের কুশ্রী স্বপ্ন পোষণ ক'রে, আমরা কিছুতেই স্বীকার করব না নৈতিক পরাজয়। সময় এসেছে, যখন যারা বিজিত, ন্যায়ের ক্ষেত্রে, তারাই হবে বিজয়ী।

"ভাই যখন মাটিতে ভাইয়ের রক্ত ঝরিয়ে, তার সে পাপকে মস্ত বড় একটা নাম দিয়ে, উল্লাস প্রকাশ করে, মাটির বুকে সেই রক্তের দাগকে যখন সে চায় তাজা রাখতে, তার ক্রোধের স্মরণস্তম্ভরূপে,— তখন বিধাতা লজ্জায় ঢেকে দেন সে কলুষচিহ্ন, তাঁর শ্যামল শষ্পের আস্তরণ বিছিয়ে, তাঁর পুষ্পের অকলঙ্ক সুমধুর শুভ্রতায়। আমরা যারা আমাদেরই দেশের নিরপরাধ মানুষের ব্যাপক হত্যাকাণ্ড দেখেছি, আমরা যেন গ্রহণ করতে পারি ঈশ্বরের সেই আপন কাজ;— যেন ঢেকে দিতে পারি পাপের রক্তচিহ্ন আমাদের এই প্রার্থনা দিয়ে— 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্'। হে রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহার দ্বারা আমাদের প্রতিনিয়ত রক্ষা করো। কেন না সত্যকার যে প্রসন্ন করুণা তা আসে রুদ্রের কাছে থেকেই। তিনিই পারেন দুঃখভয় ও মৃত্যুভয়ের বিভীষিকা থেকে আমাদের বাঁচাতে; তিনিই পারেন, সমস্ত ক্ষতিকে তুচ্ছ করে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি থেকে আমাদের বাঁচাতে। আসুন, বেদনা ও অপমানের মর্মজ্বালার তীব্র অনুভূতির মধ্যেই, তাঁর হাত থেকে আমরা এই শিক্ষা গ্রহণ করি যে, সমস্ত ক্ষুদ্রতা, নিষ্ঠুরতা এবং অসত্য যখন বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলুপ্ত হয়ে যাবে, তখন রইবে শুধু চিরন্তন হয়ে— যা মহৎ, যা সত্য। যারা তাই চায়, তারা তাদের ক্রোধের নিকষকৃষ্ণ স্মৃতির পাষাণশালায় ভারাক্রান্ত করে তুলুক ভবিষ্যৎ কালের অন্তর; কিন্তু আমরা যেন, যারা অনাগত যুগে আসবে, আমাদের সেই ভবিষ্যদ্বংশীয়দের জন্য রেখে যেতে পারি শুধু সেই স্মৃতিস্তম্ভ, যাতে আমরা পারব দিতে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য; আমরা যেন পারি আমাদের সেই পিতৃপুরুষদের কাছে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করতে, যাঁরা আমাদের দিয়ে গিয়েছেন ভগবান বুদ্ধের প্রতিমূর্তি— যিনি জয় করেছিলেন অহংকে, যিনি প্রচার করেছিলেন ক্ষমাধর্ম, যিনি দিগ্‌দিগন্তে, দেশে কালে বিতরণ করেছিলেন তাঁর মৈত্রী তাঁর প্রেম।"

বোম্বাই হইতে কবি যান বড়োদা[১]; সেখানে তিনি রাজ-অতিথি। একদিন প্রাতে (১৯ এপ্রিল ১৯২০) নৃসিংহচার্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নারীরা 'সহচরী সম্মেলনে' কবিকে স্বাগত করেন। এই অপরাহ্নেই স্থানীয় হাইকোর্ট বা ন্যায়মন্দিরে বড়োদার মহিলা-সমাজ কর্তৃক কবি-সংবর্ধনা হয়। মধ্যাহ্নে আব্বাস তায়েবজী মহাশয়ের বাড়ীর মেয়েরা কবির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নানারূপ প্রশ্ন করেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন 'নারী চরিত্রের কোন্ দিকটা আপনার সবচেয়ে বড়ো মনে হয়।' কবি বলেন, "আদর্শ বা idealism-এর কাছে তাহার আত্মোৎসর্গ।" প্রশ্ন হইল, 'এই আদর্শের জন্য কি নারীকে অপার দুঃখ ভোগ করিতে হয় না।' কবি বলেন, "নিশ্চয়ই, বিধাতার কাছে নারী চাহিল কোমল ফুলের মালা, বিধাতা দিলেন তাহাকে কঠোর কঠিন তপস্যার বরমাল্য।"

সেই রাত্রে বড়োদার দেওয়ান সার্ মনুভাই দেশাই-এর বাটিতে ইংরেজি 'চিত্রা'র অভিনয় হয়— বাড়ির ও পাড়ার মেয়েরাই ভূমিকা গ্রহণ করে।

বড়োদার আর-একটি সভার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেটি হইতেছে অন্ত্যজ সমাজের সভা। স্থানীয় বহুলোক গায়কোবাড়ের শিক্ষাব্যবস্থার ফলে উন্নত শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ণহিন্দুরা তাঁহাদের এ পর্যন্ত

১ Baroda বড়োদা: বর্তমানে গুজরাট রাজ্যের জেলা ও নগর। ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত উহা একটি করদ রাজ্য।

কোনোপ্রকার সামাজিক অধিকার দেন নাই। অন্ত্যজ শ্রেণীর শিক্ষিত নেতারা কবির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের দুর্গত জীবনের কথা বলেন ও মুক্তিলাভের জন্য সহায়তা চাহেন। কবি তাহাদের শোচনীয় অবস্থার কথা শুনিয়া অত্যন্ত মর্মাহত ও উত্তেজিত হন। শোনা যায়, কবি প্রথমে বালগঙ্গাধর টিলককে এই অন্ত্যজ সমস্যা গ্রহণ করিবার জন্য লেখেন; কিন্তু তখন তিনি মৃত্যুপথযাত্রী, কবিকে বলিয়া পাঠান— তাঁহার আর সময় নাই। তাঁহার মৃত্যু হয় ২১ জুলাই ১৯২০। অতঃপর কবি এন্‌ড্রুজকে এ বিষয়ে গান্ধীজিকে পত্র লিখিতে বলেন। কিন্তু গান্ধীজি তখন রাজনৈতিক নানা কর্মে জড়িত, তাঁহার পক্ষে, তখনই সে-সমস্যায় হস্তক্ষেপ করা সম্ভবপর হইল না।[১]

বড়োদা হইতে রবীন্দ্রনাথ যান সুরত (Surat); সেখানে নগরের বাহিরে নগিনদাসের বাগান নামক সুরম্য স্থানে তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা হয়। নগরীর ধনীকন্যারা কবির আতিথ্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুরতে তিন দিন (২১-২৩ এপ্রিল) থাকেন। পরে বোম্বাই হইয়া ৩ মে (২০ বৈশাখ ১৩২৭) কলিকাতায় ফিরিলেন। এ যাত্রায় বোম্বাই প্রদেশে কবির এক মাস অতিবাহিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী সন্তোষচন্দ্র এবারকার সফর সম্বন্ধে লিখিতেছেন— 'যে অভ্যর্থনা প্রীতি ও সমাদর জনসাধারণের কাছে তিনি পাইয়াছিলেন তাহা অপূর্ব। কাঠিয়াবাড়ের ছোটোবড়ো সমস্ত স্টেশনে দশ-পনেরো মাইল দূর হইতে দারুণ গ্রীষ্মে দ্বিপ্রহরের সময়েও সম্ভ্রান্ত ঘরের পুরুষ মহিলা হইতে আরম্ভ করিয়া চাষী গৃহস্থরা পর্যন্ত একবার তাঁহার দর্শন লাভ করিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন, দিনে রাত্রে এ জনতার বিরাম ছিল না। ফল ফুল মাল্য চন্দনের স্তূপে গাড়ির কামরা ভরিয়া উঠিত। অসূর্যম্পশ্যা বধূরা শিশুসন্তানদের তাঁহার পায়ের কাছে রাখিয়া আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতে আসিতেন। শহরে পৌঁছিবার পর তাঁহার গাড়ি জোরে চলিবার উপায় থাকিত না। যাঁহার গৃহের সম্মুখ দিয়া মোটর যাইত তাঁহার বাড়ির ছেলেমেয়েরা আসিয়া তাঁহাকে মাল্য চন্দন দিত, বধূরা আসিয়া বরণ করিতেন, কেহ বা নিজের হাতে-কাটা রঙীন সুতার মালা তাঁহাকে পরাইয়া দিত। কোনো মন্দিরের সম্মুখ দিয়া গেলে পুরোহিতেরা আসিয়া ধান্য দূর্বা দিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতেন।'[২]

ইংলন্‌ডে ১৯২০

দক্ষিণ-ভারত ও পশ্চিম-ভারত ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর নূতন শিক্ষাদর্শের কথাই বলিতেছিলেন। এবার ভ্রমণ করিতে করিতে মনে হইল বিশ্বভারতীর মৈত্রীর আদর্শ ভারতের বাহিরেও বলিবার মতো কথা। যুদ্ধান্তে রণক্লান্ত য়ুরোপের কাছে তাঁহার কিছু বলিবার আছে—এইটি মনের মধ্যে তীব্রভাবে অনুভব করিতেছিলেন। তা-ছাড়া কবিমন চিরদিনই সুদূরের পিয়াসী; তাই এবার সুদূর য়ুরোপে যাত্রার বাসনা লইয়া গুজরাট হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন।

কলিকাতায় ৫৯তম জন্মোৎসব নিষ্পন্ন হইবার কয়েকদিনের মধ্যেই য়ুরোপযাত্রার সকল আয়োজন প্রস্তুত হইল। এবার কবির সঙ্গে চলিলেন রথীন্দ্রনাথ ও তাঁহার পত্নী প্রতিমাদেবী; আর আছেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা মঞ্জু[৩]— বিলাতে কিছুকাল থাকিয়া পড়াশুনা করিবার উদ্দেশ্যে যাইতেছেন।

১ এই সব তথ্য ক্ষিতিমোহন সেন লিখিত 'রবীন্দ্রনাথের মতে নারীর সাধনা', প্রবাসী ১৩৪৮ কার্তিক, পৃ. ১০৯-১৪ হইতে প্রাপ্ত। দ্র. V. B. News 1947, Oct.-Nov. p. 84.

২ শান্তিনিকেতন ৫ম বর্ষ ১৩৩১ সাল ১২ সংখ্যা, পৃ. ২২৪।

৩ ইহার সহিত নৃতত্ত্ববিদ্ ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। মঞ্জু কিছুকাল শান্তিনিকেতনের ছাত্রী ছিলেন।

কবি বোম্বাই পৌঁছিলেন ১৪ মে। ইঁহারা পারসি ধনী বোমানজির অতিথি। য়ুরোপযাত্রী জাহাজ ছাড়িবার দুইদিন বাকী, এই অল্প-সময়ের অবস্থানের মধ্যেও কবির সহিত কয়েকজন লোক দেখা করিতে আসেন, তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সার্ জামসেদজী পেটিট ও সার্ স্ট্যানলি রীড্। স্ট্যানলি রীড্ 'টাইমস্ অফ্ ইন্ডিয়া'র সম্পাদক। ইনি জালিনবাণাবাগের ব্যাপার লইয়া পত্রিকায় যেসব মন্তব্য করেন, তাহা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সমাজের পছন্দ হয় নাই। কবির সহিত দেখা করিতে আসেন বোধ হয় কিছু নৈতিক সান্ত্বনার আশায়; কারণ স্বজন-সমাজে গঞ্জনাই পাইতেছিলেন।

বোম্বাই পৌঁছিয়াই মন টানিতেছে ঘরের দিকে; ঘরে থাকিলে মন বলে বাহিরে চলো; বাহিরে গেলে মন ব্যাকুল হয় নীড়ের জন্য। মন, সুদূরের পিয়াসীও যেমন তেমনি নীড়-বিলাসীও। বোম্বাই হইতে এনড্রুজকে লিখিতেছেন, "I. feel that we are not likely to be long in Europe।"[১] কনিষ্ঠা কন্যা মীরাদেবীকেও লিখিতেছেন, "আমরা বেশিদিন য়ুরোপে থাকব না যতশীঘ্র পারি ফিরে আসব।" জাহাজে চলিতে চলিতে লিখিতেছেন যে য়ুরোপে বেশিদিন থাকিবেন না, "কারণ ভালো লাগচেনা।"[২] 'উত্তরায়ণের কাঁটাবনে' তাঁহার মন বিচরণ করিতেছে। এডেনের কাছাকাছি পৌঁছিয়া এন্ড্রুজকে লিখিতেছেন, "My mind is constantly soaring back to my own place in Santiniketan"। কিন্তু য়ুরোমেরিকায় এবার কাটে চৌদ্দ মাসের উপর।

লোহিতসাগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কেবল যে প্রাকৃতিক আবহাওয়ার পরিবর্তন লক্ষ্য করিতেছেন তাহা নহে— সমস্ত আকাশই যেন প্রতিকূল মনে হইতেছে। উপকূলের ধারে একস্থানে বড়ো বড়ো করিয়া লেখা Trespassers from Asia will be prosecuted[৩] কবির সমস্ত মন এই বিজ্ঞপ্তি দেখিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি লিখিলেন, আমাদের দেশের লোকে এখানে আসিয়া যুদ্ধ করিবে— আমাদের কাঁচামাল ইহারা সরবরাহ করিবে— এই যখন ভাবি, তখন আমার সমস্ত দেহ shiver with cold and I feel homesick for the sunny corner in my Santiniketan bunglow.[৪]

জাহাজে বেশ ভিড়। সহযাত্রীদের মধ্যে আছেন আলবারের মহারাজা, মহামান্য আগা খাঁ, সার্ করিমভাই, সার্ জামসেদজি জিজাভাই, জামসাহেব রণজিৎ সিং এবং এই শ্রেণীর আরো কয়েকজন ভারতীয়। ইঁহাদের সহিত পরিচিত হইবার বাধা কম। অবশিষ্ট যাত্রীদের বেশির ভাগই অপরিচিত য়ুরোপীয় বা ইংরেজ। তাঁহাদের সম্বন্ধে কবি লিখিতেছেন, "অপরিচয় যেখানে কেবলমাত্র পরিচয়ের অভাব সেখানে বাধা অতি সামান্য, কিন্তু আধুনিক সভ্যতায় মানুষ অপরিচয়ের বর্ম পরে থাকে পরস্পরকে দূরে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য। এ জিনিসটা কেবল অভাব নয়, ফাঁক নয়, এ একটা কঠোর জিনিস, এ অদৃশ্যভাবে ঠেলা দেয়,— বিশেষত যেখানে ইংরেজ সহযাত্রী এবং ভারতবর্ষীয়-ইংরেজ।" ইহাদের সান্নিধ্যেও "সমস্ত প্রাণ হাঁপিয়ে উঠে! যদি ফিরে যাবার কোনো পথ থাকত তবে এই মুহূর্তেই আমি চলে যেতুম।"[৫]

১ Letters from Abroad, p. 4; Near Aden, May 19, 1920. Letters to a Friend-এ পত্রখানি নাই।

২ চিঠিপত্র ৪, পত্র ১; ১৫ মে ১৯২০।

৩ Letters from Abroad, p. 8; May 24, 1920. Letters to a Friend p. 84.

৪ Letters from Abroad, p. 8; May 24, 1920. Letters to a Friend. p. 84.

৫ শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ২য় বর্ষ ১৩২৭ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ৯৫-৯৬; বিলাতযাত্রীর পত্র ১।

এই প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তিনি বেশ স্বস্তি অনুভব করেন যখন মহামান্য আগা খাঁর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়। আগা খাঁর মুখে হাফিজের কবিতার আবৃত্তি শুনিতে বড়ই ভালো লাগে। এই অপরিচয়ের মরুতে এই ছিল কবির মরূদ্যান।

অবসর সময়ে কবি ডেকে বসিয়া পড়াশুনা করেন। 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালা হইতে অংশবিশেষ তর্জমা করিতেছেন।[১] মডার্ন রিভ্যুয়ে প্রকাশিত 'ছিন্নপত্রে'র তর্জমা[২] (সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত) লইয়া কাটছাঁট অদলবদল চলিতেছে। মৌলিক রচনা এই ভিড়ে লেখা সম্ভব নয়, তাই পত্রধারা লেখেন। তবে এ পত্রধারার অনেকখানি রাজনীতি, সমাজনীতির আলোচনা. 'জাপানযাত্রী'র পত্রধারার ন্যায় সরসও নহে, গভীরও নহে। সমসাময়িক রাজনীতির কশাঘাতে মন এমনি জর্জরিত যে বৃহৎ ভাবনাকে উহা যেন আশ্রয় দিতে পারিতেছে না।

একখানি পত্রে লিখিতেছেন, "কিসের জন্য যাচ্ছি সে কথাও মাঝে মাঝে ভাবি। বেড়াবার জন্যে না সে আমি জানি, আর কিসের জন্যে সে আমি স্পষ্ট জানিনে। কেবল একটা কথা মনে আসে; সেটি হচ্ছে এই, মন্থনে দুধের থেকে নবনী বিচ্ছিন্ন হয়ে আসে: য়ুরোপে লোকসমুদ্রে যে মন্থন হয়েছে, তাতে সেখানকার যাঁরা মনীষী যাঁরা ভাবুক তাঁরা আজ সেখানকার সমস্ত সমাজের মধ্যে মিলিয়ে অদৃশ্য হয়ে নেই। বোধ হয় আজকের দিনে তাদের দেখা পাওয়া সহজ। আজ তাঁরা সমস্ত প্রাণমন দিয়ে চিন্তা করচেন, সেই চিন্তার স্পর্শ পাওয়া যাবে। এ কথা মনে করা ভুল তাঁদের ভাবনায় ভারতবর্ষের ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। সর্ব-মানবের সমস্যা যাঁরা সমাধান না করবেন তাঁরা নিজের দেশের সমস্যার কোনো কিনারা করতে পারবেন না।"[৩]

কয়েকমাস পূর্বে ফরাসী ভাবুক ও লেখক রমাঁ্যা রলাঁ্যার নিকট হইতে Declaration of Independence of the Spirit নামে একখানি প্রচারপত্র পাইয়া কবি ভাবিতেছিলেন যে য়ুরোপে ভাবুক সমাজে মুক্তির সুর ধ্বনিয়াছে, তাহারই সহিত তাঁহাকে যোগ দিতে হইবে। কিন্তু ইংলন্ডে পৌঁছিয়া তাঁহার আদর্শ যে কী দারুণভাবে আহত হইল, তাহার কথা একটু পরেই বলিব।

বোম্বাই ছাড়িবার একুশ দিন পর জিব্রালটার প্রণালী ঘুরিয়া জাহাজ পৌঁছিল ইংলন্ডের প্লিমাউথ বন্দরে (জুন ৫, ১৯২০)। কবি দেখেন বন্দরে পিয়ার্সন উপস্থিত, রথীন্দ্রনাথ তাঁহাকে কেব্‌ল্ করিয়াছিলেন। তিন বৎসর পরে কবির সহিত পিয়ার্সনের সাক্ষাৎ হইল। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমেরিকা হইতে ফিরিবার পথে পিয়ার্সন জাপানে থাকিয়া যান। কয়েক মাসের মধ্যে পিকিঙে ইংরেজ সরকারের আদেশে বন্দী হইয়া ইংলন্ডে নীত হন। সেখানে যুদ্ধ-পর্বে নজরবন্দী থাকেন। যুদ্ধান্তে মুক্তিলাভ করেন।

প্লিমাউথ হইতে ৬৫ মাইল দূরে লন্ডন পৌঁছিতে বেশি সময় লাগিল না। লন্ডনের স্টেশনে রোদেনস্টাইন কবিকে স্বাগত করিলেন। কেনসিংটন প্যালেস্ ম্যানসন নামে একটি নামজাদা হোটেলে থাকিবার ব্যবস্থা হইল। পিয়ার্সন সেখানে কবির সেক্রেটারিরূপে থাকিয়া গেলেন।

রবীন্দ্রনাথ আসিয়াছেন এ সংবাদ দৈনিক পত্রিকা মারফত অল্পকালের মধ্যে প্রচার হইয়া গেল। বন্ধুবান্ধবরা

১ Thought Relics, The Macmillan Co., New York 1921.

২ Letters, Translated by S. N. Tagore, The Modern Review 1917, January to August. এই 'ছিন্নপত্র' *Glimpses of Bengal* নামে ১৯২১ সালে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়।

৩ শান্তিনিকেতন পত্রিকা ২য় বর্ষ ১৩২৭ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ৯৫-৯৬; বিলাতযাত্রীর পত্র ১।

দেখা করিতে আসিলেন, সামাজিক ভোজ-মজলিশ যথারীতি চলিতে শুরু করিল।[১] কিন্তু পরিচিতদের মধ্যে পূর্বের সে হৃদ্যতা এবার পাইতেছেন না— সবই যেন ভাসাভাসা, ইহা সকলেই অনুভব করিতেছিলেন। এই শীতলতার কারণ অবশ্যই পাঠক অনুমান করিতে পারিতেছেন। এক বৎসর পূর্বে জালিনবালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর রবীন্দ্রনাথ ভারত-সম্রাট ইংলণ্ডেশ্বর প্রদত্ত নাইটহুড বা সার্ উপাধি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন ; এই প্রত্যাখ্যানের অপমান রাজভক্ত ইংরেজ ভুলিতে পারে নাই।

লন্ডনে পৌঁছিবার পরদিন (৬ জুন) হোটেলে রোদেনস্টাইন আসিলেন। সাক্ষাৎ মাত্রেই নানা আলোচনায় মগ্ন ; বিতর্কের বিষয় আর্টিস্ট ও পলিটিক্স। শিল্পী ও মনীষীরা নিজ নিজ দেশের গবর্মেণ্টের দুর্বলতা, তাহার শোষণনীতি ও লুব্ধপ্রকৃতির কথা জানিয়াও উহার সহিত সহযোগিতা করিবেন কিনা। বোধ হয় আলোচনাটা উঠে কবির নাইট্‌হুড ত্যাগ সম্পর্কে। রোদেনস্টাইন সহযোগিতারই পক্ষপাতী। কিন্তু কবি বলেন শিল্পী ও মনীষী বা আর্টিস্টদের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই একমাত্র কাম্য ; কোনো বিশেষ মতের দাসত্ব করা তাঁহাদের মানসিক উন্নতির অন্তরায়, সুতরাং কোনো একটা আইডিয়াকে সমর্থন করিতেই হইবে এইরূপ জুলুম তাহাদের উপর প্রযোজ্য নহে।— রথীন্দ্রনাথের ডায়েরি।[২]

রোদেনস্টাইনের বাড়িতে কবি প্রায়ই যান, সেখানে পূর্বের ন্যায় নানা গুণী ও মনীষী জমায়েত হন। বিখ্যাত পর্যটক ও প্রাণীজগতের দরদী উইলিয়ম হাড্‌সন, ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রী ফক্স-স্ট্রাংওয়েজ,[৩] দর্শনশাস্ত্রী কানিংগ্রেহাম প্রভৃতি অনেকের সঙ্গেই এইখানে সাক্ষাৎ হইল। একদিন অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নিকোলাস রোএরিখ (৪৬)[৪] নামে এক রুশীয় চিত্রকর ও তাঁহার দুই অল্পবয়স্ক পুত্রকে কবির সহিত পরিচিত করাইবার জন্য উপস্থিত করিলেন। রোএরিখ কয়েকমাস পূর্বে রুশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার শিল্পখ্যাতি রুশের বাহিরে তখনো পৌঁছে নাই। রথীন্দ্রনাথ তাঁহার দিনপঞ্জীতে লিখিতেছেন, "ইহাদের কৌলিক সরলতা ও স্বাভাবিক ব্যবহার-নীতি খুবই চিত্তাকর্ষক।" রবীন্দ্রনাথ ইঁহাদের ছবি দেখিয়া খুবই মুগ্ধ। স্থির করিলেন বোলপুরে

১ The fury of social engagements is on me.— *Letters to a Friend*, 1920 June 17 ; p. 85

২ On the Edges of Time, pp. 129-30.

৩ Fox-Strangways, Arthur Henry (1859-1918). English writer on music. In 1903 and in 1910-11 visited India, studied Indian music, founded *Music and Letters* 1919 and editor till 1936 ; wrote *The Music of Hindusthan* (1914).

৪ Roerich, Nicholas Konstantin (1874-1947), Russian painter ; made pilgrimage through Russia (1901-04) and through Central Asia (1923-28) ; came to India and settled in the Kulu Valley, Himachal Pradesh. দ্র. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ; লনডনে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধে রোএরিখ সম্বন্ধে তথ্য আছে। শনিবারের চিঠি ১৩৪৮ আশ্বিন, পৃ. ৮০৩। রোএরিখ, প্রবাসী ১৩২৯ আষাঢ়, পৃ. ৪২৭-৩৪ (সচিত্র)। সুনীতিকুমার এ বিষয়ে আমাকে দীর্ঘ পত্র লিখিয়া বহু তথ্য সরবরাহ করিয়াছেন।

রোএরিখের পুত্র জর্জ লন্ডন স্কুল অফ ওরিয়েণ্ট্যাল্ স্টাডিজে ছাত্র ছিলেন। সুনীতিকুমার তখন সেখানে গবেষণার জন্য নিযুক্ত, তাঁহাদের সখ্যতা হইতে সুনীতিকুমারের সহিত নিকোলাস রোএরিখের পরিচয়। সুনীতিকুমার নিকোলাসকে রবীন্দ্রনাথের কাছে আনিয়া পরিচিত করেন ; তখন তিনি ইংরেজি জানিতেন না, পুত্র জর্জ দোভাষীর কাজ করিতেন।

রোএরিখ ভারতে আসেন, কিন্তু কবির সহিত দেখা করেন নাই ; কবি ইহাতে খুবই বিস্ময় প্রকাশ করেন। নিকোলাস রোএরিখ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র জর্জ পরে নগ্যাড় (Naggar) নামক স্থানে Urashvati Research Institute (কুলু উপত্যকা, হিমাচল প্রদেশ) স্থাপন করেন। জর্জ রোএরিখ সংস্কৃত, তিব্বতী, চীনা ভাষায় সুপণ্ডিত। সোবিয়েত রুশ ইহাকে দেশে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দিয়া মস্‌কৌতে প্রাচ্যবিদ্যা আকাদেমিতে অধ্যাপকপদ দান করিয়াছেন। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইন্‌জিনিয়ার, তিনি রবীন্দ্রনাথের দূর সম্পর্কীয়া (মহর্ষির দৌহিত্রীর দৌহিত্রী) আত্মীয়া দেবিকারানীকে বিবাহ করেন।

কয়েকখানি ছবি পাঠাইবেন— নন্দলালবাবুরা খুশি হইবেন। এই অখ্যাত প্রতিভার তেজোদৃপ্ত চিত্রাবলী কবিকে এমনি মুগ্ধ করে যে তিনি তাঁহার মনোভাব একখানি পত্র মধ্যে ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।[১] কবির সহিত রোএরিখের সাক্ষাৎ হইবার পর শিল্পী কবিকে যে পত্রখানি লেখেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল (২৪ জুন ১৯২০):

Dear Master,

Let my words remind you of Russia where the lovely poetical images which you evoke, bring beauty and solace to human life and your personality is surrounded by a halo of admiring respect: you bring into contemporary life that lofty spiritual joy, which gives strength to the seekers of a radiant future. Please accept the heartfelt greetings of a Russian artist.

কবি রোএরিখকে যে পত্র লেখেন— তাহার মধ্যে আছে: "When I tried to find words to describe to myself what were the ideas which your pictures suggested, I failed...when a picture is great, we should not be able to say what it is, yet we should see it and know...Your pictures are distinct and yet are not definable by words, your art is jealous of its independence, because it is great."[২]

দুইদিন পরে (১৯ জুন ১৯২০) রবীন্দ্রনাথ অক্স্‌ফোর্ড যান, সঙ্গে কেদার দাশগুপ্ত। সেখানে কবির বক্তৃতা। বক্তৃতার বিষয় The Message of the Forest। কথা ছিল, রাজকবি রবার্ট ব্রিজেস[৩] সভায় কিছু বলিবেন; কিন্তু ব্রিজেস সভায় উপস্থিত হইলেন না। কবিকে পরে তিনি যে পত্র দেন তার থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলেই কারণটি স্পষ্ট হইবে। ব্রিজেস লিখিতেছেন[৪] "...and am sorry that I do not feel able to accept the invitation which I have just received, to speak at the meeting in Oxford on Friday (25 June, 1920). I am writing especially as I never sent any answer to your several communications since the late disturbances in India. I began a long letter, but I feared that you might misunderstand it even more than you could misinterpret my silence, and in England we could not at first rely on the press reports of events."

অনুপস্থিতির কারণ সকলেই বুঝিলেন, কবির 'সার্' উপাধি ত্যাগের প্রতিক্রিয়ায় আজ তিনি ইংরেজ সুধীসমাজে অপাংক্তেয়। এইখানে কবির সহিত কর্নেল লরেন্সের[৫] (Thomas Edward Lawrence, 1888-1935) সাক্ষাৎ হইল। লরেন্স অক্স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, বিগত যুদ্ধে আরবদিগকে ব্রিটিশের অনুকূলে রাখিবার জন্য তিনি যে অসামান্য প্রতিভা ও কূটনীতিবুদ্ধি দেখাইয়াছিলেন তাহা ইতিহাসের সুপরিচিত ঘটনা। ইঁহার সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া কবি খুবই প্রীত হন। লরেন্সের সাহিত্যিক প্রতিভা তখন প্রকাশ পায় নাই। কথায় কথায় লরেন্স কবিকে

১ Letters from Abroad, p. 27 ; London Oct. 8, 1920. On the Edge of Time, p. 181. Letters to a Friend-নাই।

২ Letters from Abroad p. 27. On the Edge of Time, p. 181. Letters to a Friend-এ নাই।

৩ Robert Bridges (1844-1930), English Poet : Poet-Laureate (1930-30) ; author of *Testament of Beauty*.

৪ অমল হোম, দেশ; শারদীয় সংখ্যা ১৩৫৫, পৃ. ১৪।

৫ Lawrence, Thomas Edward, known as Lawrence of Arabia (1888-1935) b. in Wales. Educ. Oxford. On staff of Br. Museum expedition excavating Carchemish on the Euphrates (1910-14) : learnt Arabic ; served the World War I in various capacities ; leader of the Arab revolt against the Turks (1917-18), which he described in *The Seven Pillars of Wisdom* (1926). Invited to Paris Peace Conference (1919) as an adviser on Arab affairs. Withdrew from the colonial office in 1922, joined the Royal Air Force under the name of Ross, apparently with the desire to remove himself wholly from the public. Killed in a motorcycle accident in 1935, May 19.

বলিয়া ফেলিলেন যে তিনি আরবদের মধ্যে আর মুখ দেখাইতে পারিবেন না ; যুদ্ধের সময়ে তিনি তাহাদের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহার প্রায় সবটাই কূটনীতিজ্ঞদের দ্বারা নাকচ হইয়া গিয়াছে।[১]

অক্সফোর্ডে একদিন থাকিয়া রবীন্দ্রনাথ লন্ডনে ফিরিয়া আসিলেন ; বুঝিলেন অনেক পুরাতন বন্ধুই এখন বিমুখ। কেম্‌ব্রিজে গেলেন, সেখানে অধ্যাপক আন্‌ডারসন, লৌস-ডিকিন্‌সন, কেইন্‌স প্রভৃতির সহিত দেখা হইল ; কিন্তু সর্বত্রই সেই একভাব, সকলেই অত্যন্ত ভদ্র কিন্তু আন্তরিকতার অভাব খুবই স্পষ্ট।

আমেরিকা-প্রবাসী ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় এই সময়ে বিলাতে ; তিনি কিছুকাল পরে এই পরিস্থিতির একটি বিশ্লেষণ লেখেন ; তাহাতে তিনি বলেন, "But he [Tagore] had in consequence lost many of his English friends who had thought him disloyal to the king. I do not refer to the politicians but to English men of letters who repudiated him, when he most needed their kindness, though they have changed their opinion of the matter."[২]

যাহাই হউক কেদার দাশগুপ্তের ইস্ট্ এন্‌ড্ ওয়েস্ট্ সোসাইটির উদ্যোগে যে কাকস্টন হলে তিনি আট বৎসর পূর্বে 'সাধনা'র বক্তৃতা দেন, সেই হলেই কবি-সম্বর্ধনার আয়োজন হইল। ভারতসচিব মণ্টেগুর ভূতপূর্ব আনডার-সেক্রেটারি চার্লস রবার্ট সভাপতি হইলেন। মিস্ টাবৃস কবির চারিটি গান গাহিলেন। এই উৎসবের জন্য লরেন্স বিনিয়ন[৩] রচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করেন বিখ্যাত অভিনেত্রী সিবিল থর্নডাইক (১৮৮২)।[৪] সভায় ছিলেন আর্নেস্ট রীজ,[৫] গিলবার্ট মারে, লরেন্স বিনিয়ন, প্রভৃতি অনেকেই। ভারতীয়দের মধ্যে ছিলেন সার্ কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, সার্ ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র, আলবার ও ঝালবারের মহারাজদ্বয়।[৬] সিবিল থর্নডাইক কবির হোটেলে দেখা করিতে যান ও ধর্ম এবং নাটক সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করেন ; তিনি লিখিয়াছেন, "It was an hour I shall never forget as long as I live, for he (Tagore) gave me a glimpses of the very thing I had been striving to find and understand as a christian through the eyes of a great mind of another race."— Golden Book of Tagore, p. 253। আরেকদিন YMCA 'শেকসপীয়ার হাটে' কবির *The Centre of Indian Culture* বিষয়ক বক্তৃতা হয় (২৫ জুন)।

ইহার কয়েকদিন পরেই পিয়ার্সনকে সঙ্গে লইয়া কবি পোর্টস্‌মাউথের নিকটস্থ পিটার্সফীলড নামক ক্ষুদ্র একটি শহরে বেড়াইতে গেলেন। লন্ডন ক্রমেই তাঁহার কাছে দুর্বোধ্য হইয়া উঠিতেছিল, চারিদিকেই সন্দিগ্ধ মানুষের দৃষ্টি। লন্ডন হইতে বাহির হইবার জন্য মন চঞ্চল। পিটার্সফীল্‌ডে তাঁহারা শিল্পী ম্যুরহেড বোন্‌দের (১৮৭৬-১৯৫৩) অতিথি। এখানে দিন সাত মনের আনন্দে কাটে।

১ Rathindranath, *On the Edges of Time*, p. 121.

২ Amrita Bazar Patrika, Independence Number 1947, p. 8.

৩ Binyon, Lawrence (1869-1948), English poet and art-historian : author of works on Chinese, Japanese and Indian Art.

৪ Dame Sybil Thorndike (1882), English actress : married Lewis T. Casson (1908), played Shakespearean leads ; toured world : visited India 1955. দ্র. *On the Edges of Time*, p. 182.

৫ Ernest Rhys (1859-1946), English writer and editor : author of *Rabindranath Tagore—Biographical Study*. Macmillan and Co., London 1915.

৬ শান্তিনিকেতন পত্রিকা ২য় বর্ষ ১৩২৭ শ্রাবণ, পৃ. ৩-৪। *On the Edges of Time*, p. 182.

৫ই জুলাই লন্‌ডনে ফিরিলেন। পূর্বের ন্যায় আবার যথারীতি সামাজিক ভোজ ও পার্টি চলিতে লাগিল। ৮ই এনড্রুজকে লিখিতেছেন, "My days have become solid like cannonballs, heavy with engagements."[১] পরদিন রোদেনস্টাইন যে পার্টি দেন তাহাতে দিলীপ রায় উপস্থিত ছিলেন; পার্টিতে একটি হাঙ্গেরিয়ান মেয়ে বেহালা বাজাইয়া সকলকে মুগ্ধ করেন; ইঁহার কথা কবির বহু দিন স্মরণ ছিল। এই সভায় কবির সহিত ইয়েটসের দেখা হইল প্রায় আট বৎসর পর।

পরদিন প্রতিমাদেবী ও পিয়ার্সনকে লইয়া রবীন্দ্রনাথ ব্রিস্টল যান অধ্যাপক Leonard-এর নিমন্ত্রণে। কিছুকাল পূর্বে লিওনার্ড ও তাঁহার স্ত্রী শান্তিনিকেতনে কয়েকদিন বাস করিয়া আসেন— সে স্মৃতি তাঁহাদের কোনোদিন ম্লান হয় নাই।[২] সেখানে Clifton বোর্ডিং স্কুলের ছাত্রীরা কবির ইংরেজি 'রাজা' নাট্যের অভিনয় করে। সেদিন বৈকালে কবি ব্রিস্টলে গিয়া রাজা রামমোহন রায়ের সমাধিমন্দির দেখিয়া আসিলেন।

ব্রিস্টল হইতে ফিরিয়া আসিলে পূর্বোল্লিখিত হাঙ্গেরিয়ান বেহালাবাদিকা কবিকে নিমন্ত্রণ করিলেন। মেয়েটি কবিকে বলেন যে তাঁহার জীবনের বহুদিনের স্বপ্ন ছিল কবিকে বাজনা শোনানো। ইঁহার মধ্যবর্তিতায় ও ব্যবস্থায় কবির সহিত অনেক সংগীতকারের পরিচয় ঘটে ও তাঁহাদের বাজনা শুনিবার সুযোগ লাভ করেন।

আমাদের আলোচ্যপর্বে লন্‌ডন শহরে Beggar's Opera-র অভিনয় লইয়া খুবই মাতামাতি চলিতেছে। লন্‌ডনের শহরতলীর রঙ্গালয়ে ১৯২০ সালের ৫ জুন হইতে প্রায় সাড়ে তিন বৎসর এই অপেরা চলে, কী ভীড় সেখানে। শচীন সেন, পিয়ার্সন প্রভৃতির অনুরোধে রবীন্দ্রনাথরা একদিন এই অভিনয় দেখিতে গেলেন। কিন্তু কবির ভালো লাগিল না; বিরক্ত হইয়া পিয়ার্সনকে লইয়া উঠিয়া আসেন।

এখন এখানে এই বেগার্স অপেরার সাফল্যের কারণ কি এবং কেন কবির ভালো লাগিল না তাহার কিছুটা আলোচনা বোধ হয় অবান্তর হইবে না; কারণ কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এই নাটক পাঠ্য হইয়াছে।

বেগার্স অপেরা জন্ গে (John Gay, 1685-1732) নামক ইংরেজ নাট্যকারের রচনা (১৭২৮); "an amusing comedy of low life, to some extent parodying the Handelian Italian Opera and introducing a number of songs, some of them old-time play-house songs, other tunes, popular at the moment and the majority folksongs of English, Scottish and Irish origin."— Chamber's Cyclopaedia, p. 210।

এই অপেরা রচনার প্রায় দুই শত বৎসর পরে হঠাৎ ইংরেজি শিক্ষিত সমাজের পৃষ্ঠপোষকতায় এই বিকৃতরুচি নাটিকার এমন অভাবনীয় সাফল্য কেন হইল? এ বিষয়ে রথীন্দ্রনাথ তাঁহার ডায়েরিতে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা সমীচীন মনে হয়। "Only one explanation offers itself. After the war (1) there has been a great effort at a strong nationalist revival. The English feel humiliated that they should always have to go to hear foreign operas, foreign theatres, foreign music, etc. So they have brought forth this purely indigenous opera and to hide its shame they applaud in their loudest voices its great merits."

এবার বিলাতে আয়ারল্যাণ্ডের কর্মবীর সার্ হোরেস প্লাংকেটের (১৮৫৪-১৯৩২) সহিত কবির পরিচয় হইল (২ই জুলাই)। সার্ হোরেস ১৮৭৯ হইতে ১৮৮৯ পর্যন্ত আমেরিকায় গোপালনাদি করিয়া দেশে ফেরেন ও তৎপরে দেশের কৃষিউন্নতিতে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি আদর্শবাদী— তবে তাঁহার আদর্শবাদ কঠোরভাবে বস্তুকেন্দ্রিক।

১ *Letters to a Friend*, p. 85.

২ শুনিয়াছি প্রায় পঁচিশ বৎসর পর মিসেস লিওনার্ড বহু পুরাতন কথা লিখিয়া শান্তিনিকেতনে দীর্ঘ পত্র দেন। সেগুলি রবীন্দ্রসদনে আছে।

তিনি কবিকে বলিলেন, 'আমরা আয়ারল্যাণ্ডে প্রথম প্রথম অনেক ভুল করিয়াছি, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটি ব্যর্থতাই আমাদিগকে নূতন অভিজ্ঞতা দান করিয়াছে।' এই মনীষী ও কর্মীর সহিত কবির সাক্ষাৎ হওয়ায় পল্লী-সংস্কার সম্বন্ধে তাঁহার বহু বৎসরের পরিকল্পনাকে মূর্তিদানের ইচ্ছা বলবত্তর হইল বলিয়া আমাদের মনে হয়।

জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে কেদার দাশগুপ্তের ইউনিয়ন অফ্ ইস্ট্ এন্ড ওয়েস্ট্ সভার ব্যবস্থায় কবির পাঁচটি অপ্রকাশিত (ইংরেজিতে) নাটিকা অভিনীত হয়; একদিন 'বাংলাদেশের মরমী কবিদের গান' (*Some songs of the village mystics of Bengal*) সম্বন্ধে ভাষণ দান করেন। লন্ডনের বিগমোর হলে (Wigmore Hall) অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এই সময়ে সরোজিনী নাইডু বিলাতে ছিলেন— তিনি নাটিকাগুলির ভূমিকা করিয়া দেন।[১]

ইংলন্ডের মানসিক আবহাওয়া তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত রুদ্ধ মনে হইতেছে। তাই ইংলন্ড ত্যাগ করিয়া য়ুরোপের অন্য কোনো দেশে যাওয়াই স্থির করিতেছেন। একবার স্থির করিলেন স্কান্দানেভিয়ায় যাইবেন, টিকিট পর্যন্ত কেনা হইল; শেষ মুহূর্তে সব বদলাইয়া গেল। কবি ফ্রান্সে চলিলেন। ৪ অগস্ট এনড্রুজকে লিখিতেছেন, "I am sure you are ready to ascribe this to the inconsistency of my mind."। ভ্রমণকালে কবির যে inconsistency দেখা দিত না, তাহা সত্য নয়, কারণ রথীন্দ্রনাথের কাছে শুনিয়াছি যে একদিনে স্টীমার অপিসে চারবার টিকিট ফেরত-বদল তাঁহাকে করিতে হয়। কিন্তু এবারকার মত পরিবর্তনের কারণ ছিল খুবই জটিল। কবি সুইডেন যাইতেছেন এই কথা প্রচারিত হইলে এক মহিলা তাঁহার সহিত দেখা করিয়া বলিলেন যে তিনি য়ুরোপের বহু ভাষা জানেন, তিনি কবির একজন পরম ভক্ত; এবং তাঁহার একান্ত ইচ্ছা কবির য়ুরোপ ভ্রমণকালে তিনি তাঁহার সেক্রেটারির কাজ করেন। তিনি আপনাকে সুইড বলিয়া পরিচয় দেন। কিন্তু তাঁহার গতিবিধি চালচলন দেখিয়া অনেকেরই সন্দেহ হইল যে মহিলাটি স্পাই— কবির য়ুরোপ ভ্রমণকালে তাঁহার উপর নজর রাখিবার জন্য বিশেষভাবে কাহারো দ্বারা নিযুক্ত। সত্যই পরে জানা গিয়াছিল যে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে জারমেনি হইতে চররূপে আসিয়া মহিলাটি ধরা পড়েন ও তাঁহার কারাদণ্ড হয়। তারপর ব্রিটিশের চর-বিভাগে কার্য গ্রহণ করেন। ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য কবি শেষ মুহূর্তে স্কান্দানেভিয়া যাওয়াই স্থগিত করিয়া দিলেন।

রবীন্দ্রনাথ যখন বিলাত পৌঁছান তখন সেখানকার পার্লামেণ্টে জালিনবালাবাগের হত্যাকাণ্ড বিষয়ক তদন্ত কমিটির (Disorders Enquiry Committee)[২] আলোচনার উদ্যোগপর্ব চলিতেছে। ভারতের এই তদন্তকমিটির লৌকিক নাম হাণ্টার-কমিটি; কমিটিতে যে তিন জন দেশীয় লোক ছিলেন তাঁহারা ইংরেজ সদস্যদের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। তাঁহারা পৃথক মন্তব্যলিপি পেশ করেন। হাণ্টার-কমিটির অধিকাংশ সদস্যের প্রতিবেদনে পঞ্জাবের ছোটলাট মাইকেল ও'ডায়ার, সেনাপতি ডায়ার, জনসন প্রভৃতির অন্যায় সমর্থিত হয় নাই। কিন্তু কমিটির সদস্যগণ এমন কিছুই বলেন নাই, যাহাতে ভারতীয়দের অপমান ও আঘাত প্রশমিত হয়। অতঃপর ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে জালিনবালাবাগের তদন্তকমিটির আলোচনার (৮ জুলাই) মর্মার্থ শুনিয়া কবি আরও মর্মাহত হইলেন। হাউস অব কমন্সে ভারতসচিব মণ্টেগুর বিরুদ্ধে মনোভাব অত্যন্ত তীব্র; কারণ তদন্তকমিটির উপর তিনি যে মন্তব্যলিপি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতীয়দের পক্ষের কথা স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত ছিল। অধিকাংশ ইংরেজ সেটা

১ Rathindranath, *On the Edges of Time*, p. 136.

২ Disorders Enquiry Committee, Report 1920. সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কমিটি। কংগ্রেস পক্ষ হইতেও আর একটি কমিটি বসিয়া তদন্ত হয়। Report of the Commisioners appointed by the Punjab sub-committee of the Indian National Congress 2 Vols. 1920. মিঃ এনড্রুজ ও গুরুদয়াল মল্লিক এই কার্যে সহায়তা করেন।

সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। ভারতের প্রতি মণ্টেগুর এই ব্যবহারের জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া একখানি পত্র দেন।

ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ ইন্‌ডিয়া অফিসে যান এবং মণ্টেগু ও লর্ড সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মণ্টেগুকে ভারতবর্ষের অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, ভারতীয়েরা জেনারেল ডায়ারকে শাস্তি দিবার জন্য উদ্‌গ্রীব নহে; তাহারা এইটুকুই জানিতে চায় যে ব্রিটিশ নেশন এ কাজটিকে নীতি-বিগর্হিত বলিয়া স্বীকার করেন কিনা। যন্ত্রচালিত গবর্মেণ্টের ব্যাপারে ভারতবাসী পীড়িত। মণ্টেগু বলেন যে, তিনি একা কিছু করিতে বা বলিতে অক্ষম, তবে এই পর্যন্ত তিনি আশ্বাস দিতে পারেন, ভবিষ্যতে যাহাতে এইরূপ নিদারুণ ঘটনা না ঘটে তাহার জন্য যেসব আভ্যন্তরিক ব্যবস্থার প্রয়োজন তাহা তিনি করিবেন।[১]

কয়দিন পরে লর্ড সিংহ ও সার্ কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত রবীন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিতে আসেন; কথা-প্রসঙ্গে সার্ কৃষ্ণগোবিন্দ বলিলেন, পার্লামেণ্টের আলোচনায় পঞ্জাবের কোনো সুরাহার আশা নাই। সেই মতে সায় দিয়া লর্ড সিংহ বলিলেন, পঞ্জাবে যে কাণ্ড ঘটিয়াছিল এবং লোকে যেভাবে অপমান সহ্য করিয়াছিল, তাহা বাঙলাদেশে কখনো সম্ভব হইত না। বাঙলায় প্রতিবাদ হইতই। ভারতবর্ষে কিছুকাল হইতে জালিনবালাবাগে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের প্রস্তাব চলিতেছিল। রবীন্দ্রনাথ এই প্রস্তাবের ঘোর বিরোধী। সাময়িক 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় এ সম্বন্ধে যে মন্তব্যটি প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা রবীন্দ্রনাথের মত।

"পঞ্জাবে যে অমানুষিক অত্যাচার ঘটিয়াছে তাহার বিচার চলিতেছে। আমরা রাষ্ট্রনীতির দিক হইতে সে সম্বন্ধে কোনো কথা বলিব না। আমরা শাসনকর্তাদের কথা ছাড়িয়া দিলাম। ধর্মনীতির দিক হইতে এই ব্যাপারের বিচারকালে আমাদের স্বদেশীয়দের চরিত্র আলোচনা করাই কর্তব্য। যে ঘটনা কেবলমাত্র দুঃখকর তাহার দ্বারা কাহারও অবমাননা হয় না; কিন্তু মানুষের প্রতি পশুর মতো আচরণ করা সম্ভব হইলে সেই লজ্জা দুঃখকে ছাড়াইয়া উঠে। পঞ্জাবের ব্যাপারে আমাদের পক্ষে এই লজ্জার কারণ ঘটিয়াছে। ইহাই বুঝিতেছি যে আমাদের চরিত্রের মধ্যে এমন গভীরতর হীনতা ঘটিয়াছে যে আমাদের প্রতি শুদ্ধমাত্র দুঃখ প্রয়োগ করা নহে আমাদের মনুষ্যত্বের অসম্মান করা সহজসাধ্য হইয়াছে, ইহা আমাদের নিজেদের আন্তরিক দুর্গতির কারণ।

"পীড়ন যতই কঠিন হউক সহিব, কিন্তু আত্মাবমাননা কিছুতেই সহিব না—পঞ্জাবে এইরূপ পৌরুষের বাণী শুনিবার আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু যখন তাহা শুনিলাম না, তখন সর্বাগ্রে আপনাদিগকেই ধিক্কার দিতে হইবে। এই কারণেই আমরা বলি কোনো চিহ্নের দ্বারা পঞ্জাবের এই ঘটনা চিরস্মরণীয় করা আমাদের পক্ষে গৌরবের নহে। বীরত্বই স্মরণের বিষয়, কাপুরুষতা নৈব নৈব চ। নিরস্ত্র নিঃসহায়ের প্রতি অত্যাচার কাপুরুষতা, সেই অত্যাচার দীনভাবে গ্রহণ করাও কাপুরুষতা, কেননা কর্তব্যের গৌরবে বুক পাতিয়া অস্ত্র গ্রহণ করায়, মাথা তুলিয়া দুঃখ স্বীকার করায় পরাভব নাই। যেখানে পীড়নকারী ও পীড়িত কোনো পক্ষেই বীর্যের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না সেখানে কোন্ কথাটা সমারোহপূর্বক স্মরণ করিয়া রাখিব? আমাদের রাজপুরুষেরা কানপুরে ও কলিকাতায় দুষ্কৃতির স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিয়াছেন। আমরা কি তাঁহাদেরই অনুকরণ করিব? এই অনুকরণ-চেষ্টাতেই কি আমাদের যথার্থ পরাভব নাই?"[২]

১ Rathindranath, *On the Edges of Time*— Orient Longmans 1958, p. 160.

২ শান্তিনিকেতন ১৩২৭ বৈশাখ, ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, পৃ. ৬৫-৬৬।

বিলাতে এইসব আলোচনা লর্ড সিংহ প্রভৃতির সহিত চলিত। অমৃতসরের ব্যাপার তাঁহার মনকে যে খুবই নাড়া দিয়াছিল তাহা ২২ জুলাই এনড্রুজকে লিখিত এক পত্র হইতে স্পষ্ট জানা যায়।

কবি লিখিতেছেন, "ভারতের প্রতি এদেশের শাসকসম্প্রদায়ের প্রকৃত মনোভাব নিদারুণরূপে প্রতিফলিত হয়েছে— পার্লামেণ্টের দুটি কামরাতেই (জেনারেল) ডায়ার সংক্রান্ত সাম্প্রতিক আলোচনা ও বিতর্কমূলে। এর থেকে যে কথাটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা এই যে, এ-দেশে যাদের মধ্য থেকে আমাদের শাসনকর্তারা নির্বাচিত হয়ে থাকেন, তাঁদের আমলারা আমাদের উপর যত দানবীয় অত্যাচারই করুক-না কেন, তাতে তাঁদের মনে কোনো-রকম বিক্ষোভের সঞ্চার হয় না।

"তাঁদের বক্তৃতায় পাশবিকতা যে-রকম নির্লজ্জভাবে প্রশ্রয় পেয়েছে এবং তাঁদের খবরের কাগজগুলোতে তারই প্রতিধ্বনি যেভাবে ঝংকৃত হয়ে উঠেছে, তা অতি ভয়াবহরূপেই কুৎসিত। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান দাসত্বাধীন আমাদের অবস্থায় লজ্জা ও অপমানের অনুভূতি, বিগত পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিককাল, প্রতিদিন আমাদের উত্তরোত্তর অভিভূত করে ফেলেছে; কিন্তু তবুও আমাদের একটিমাত্র সান্ত্বনা ছিল, ইংরেজজাতির ন্যায়ানুরাগের উপর আমাদের আস্থা। আমরা ভেবেছি যে, সহজলভ্য যদৃচ্ছ ক্ষমতা ও প্রভুত্বের শক্তিমত্ততায়, অধীনস্থ দেশের সমগ্র জনমণ্ডলীর মনুষ্যত্ব নিতান্ত নিঃসহায়ভাবে দলিত মথিত করলেও, তার মারাত্মক গরল ইংরেজ-সাধারণের আত্মাকে ক্লেদাক্ত করতে পারেনি।

"কিন্তু বেশ দেখা যাচ্ছে যে, সে-বিষ আমরা যা ভাবিনি তার চেয়ে অনেক বেশি গভীরে প্রবেশ করেছে; ব্রিটিশ জাতির নাড়ীতে ঘুন ধরেছে; তার মজ্জা এই দারুণ বিষের প্রতিক্রিয়ায় জর্জরিত হতে চলেছে। আমি অনুভব করছি যে, ওদের মহদনুভূতির উদ্দেশে আমাদের আবেদন প্রতিদিনই ক্রমশঃ ক্ষীণতর সাড়া পাবে। কিন্তু আমার একান্ত আশা এই যে, আমার স্বদেশবাসিগণ এত নিরাশ বা হতাশ হবেন না, অপিচ দেশের সেবায় তাঁদের সমস্ত উদ্যম ও সামর্থ্য অদম্য সংকল্পে ও সাহসে উৎসর্গ করবেন।

"সাম্প্রতিক ঘটনাবলী স্পষ্টই প্রমাণ করেছে যে, আমাদের সত্যকার মুক্তি রয়েছে আমাদের আপন হাতে; কোনো জাতিরই প্রতিষ্ঠা ও মাহাত্ম্য কারও তাচ্ছিল্য-প্রণোদিত বা অবজ্ঞা-সঞ্জাত কার্পণ্যের মুষ্টিভিক্ষার উপর গ'ড়ে তোলা চলে না। আমাদের জাতীয় মুক্তির পথে বাধাবিঘ্ন সৃষ্টিতেই যাদের আত্মস্বার্থ সংরক্ষণের নির্দেশ, তাদেরই দয়ার উপর নির্ভর ক'রে জাতীয় সাধনার সুলভ সিদ্ধির সন্ধান, আমাদের চরিত্রবলের ক্ষীণতারই পরিচায়ক হবে মাত্র। শুধু আত্মত্যাগ ও নিরতিশয় দুঃখবরণের দ্বারাই আমরা পাব সাফল্যের সন্ধান; তা ছাড়া আর অন্য পথ নেই। অন্তর্নিহিত অমোঘ অমরাত্মার সক্রিয় শক্তিবিকাশেই সম্ভব হয় মানুষের শ্রেষ্ঠ বরলাভ; এবং সেই শক্তির উদ্বোধন হয় কেবলমাত্র বিপদ ও ক্ষতির উপেক্ষামূলেই।"[১]

১ দেশ, শারদীয়া সংখ্যা ১৩৫৫, সংযোজনী। পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ ২য় সংস্করণ, পৃ. ৮৮-৯০।

য়ুরোপ মহাদেশে

ইংলন্ডের পার্লামেন্ট ও ইংরেজ-পাবলিকের ভারত সম্বন্ধে মনোভাব দেখিয়া মর্মাহত কবি ফ্রান্সে চলিয়া গেলেন; প্যারিসে পৌঁছিয়া তিনি এন্‌ড্রুজকে লিখিলেন (১৩ অগস্ট): "Your Parliament debates about Dyerism in the Punjab and other symptoms of the arrogant spirit of contempt and callousness about India have deeply aggrieved me and it was with a feeling of relief that I left England."[১]

কবি, রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী ৬ই অগস্ট প্যারিস পৌঁছান। এই মহানগরী ইঁহাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত; পিয়ার্সন কবির সহিত আসিতে পারেন নাই। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তখন প্যারিসে ছিলেন সুধীরকুমার রুদ্র— এনড্রুজের বন্ধু দিল্লী সেণ্টস্টিফেনস কলেজের অধ্যক্ষ সুশীলকুমার রুদ্রের পুত্র। সুধীরকুমার[২] যুদ্ধের সময়ে সেবাকার্য করিবার জন্য (YMCAএর পক্ষে) ফ্রান্সে আসেন এবং যুদ্ধান্তে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। অগস্ট মাসে বিদ্যায়তনগুলিতে ছুটি থাকায়, সুধীরকুমার প্যারিসে কবির প্রধান সহায় হইলেন।

রবীন্দ্রনাথ আসিয়াছেন শুনিয়া প্যারিসের অন্যতম ধনী কাহ্‌ন (Kahn) কবিকে তাঁহার অতিথিশালায় (Autour de monde) থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন (৮ অগস্ট)। প্যারিসের শহরতলী সীন নদীর তীরে নিরিবিলি জায়গায় এই অতিথিশালা।

এই অতিথিবৎসল ধনপতি কাহ্‌নের কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার, সমসাময়িক পত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল— "প্যারিসে Autour de monde বলে একটা সমিতি আছে। এই সমিতির ·· ব্যাপারটা সবটাই M. Kahn নামে একটি ভদ্রলোকের মাথা থেকে বেরিয়েছে এবং তাঁর টাকায় চলছে। কতকটা যেন 'বিচিত্রা'। এই লোকটি প্রায় চল্লিশ বছর আগে ত্রিশ টাকা মাইনের একটি চাকরী নিয়ে প্যারিসে এসেছিলেন; তার থেকে এখন তিনি এখানকার প্রধান ক্রোড়পতি। এদেশে এঁর মতো ধনী আর বোধ হয় কেউ নেই। তিনি অবিবাহিত, নিরামিষাশী। অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যেও নিজে এক ছেঁড়া কাপড় প'রে, একটি ছোট্ট বাড়িতে নেহাত গরীবের মতো থাকেন। নিজের সম্বন্ধে এত মিতব্যয়ী, কিন্তু তাঁর দানের সীমা নেই।·· তিনি নিজে একটি ছোটো বাড়িতে থাকেন, কিন্তু আশে-পাশে প্রায় দশ পনেরোটা বাড়ি, সবগুলি তাঁর। তার প্রত্যেকটিতে একটি-না-একটি প্রতিষ্ঠান আছে। আমাদের যে-বাড়িতে থাকতে দিয়েছেন সেটা একটা ক্লাবের মতো, তার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাকে দেশবিদেশের একটা মিলনক্ষেত্র করা।·· অতিথিসেবার ব্যবস্থা খুব ভালো, পশ্চিমে এ রকম দেখা যায় না। যা হোক এই বাড়িতে যে দেশ-বিদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এসে থাকতে পারেন এবং মিশতে পারেন, কেবল তাই নয়, Autour de monde-এর উদ্দেশ্য ও কর্মণ্যতা আরো বিস্তৃত। প্রত্যেক দেশ থেকে দুজন চারজন করে লোককে তাঁরা টাকা দিয়ে এক বছরের জন্য পৃথিবী ঘুরতে পাঠিয়ে দেন।·· Lowes Dickinson এই বৃত্তি নিয়ে ভারতবর্ষ, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে গিয়েছিলেন।"[৩]

১ *Letters from Abroad*, p. 11; *Letters to a Friend*, p. 90.

২ সুধীরকুমার রুদ্র (Dr. S. K. Rudra) এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক হন। ১৯৫১ জুন মাসে নৈনিতালের হ্রদে স্নান করিতে গিয়া জলমগ্ন হন।

৩ শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩২৭ ভাদ্র, পৃ. ৯-১০।

কাহ্‌নের অতিথিশালায় আসার পূর্বদিন (৭ অগস্ট) কবি গ্যেটের ফাউস্ট অভিনয় দেখিতে যান— এ অভিনয় তাঁহার খুবই ভালো লাগে। দুই মাস পূর্বে লন্‌ডনে 'বেগার্স অপেরা'র অভিনয় দেখিতে গিয়া মন যেমন বিরক্ত হইয়াছিল, আজ ফাউস্ট অভিনয় দেখিয়া মন তেমনই তৃপ্তি লাভ করিল।

অত্যুর দ্য মঁদ-এ আসিবার দিন দুই পরে কবির সহিত অধ্যাপক Le Brun সাক্ষাৎ করিতে আসেন; ইনি কবির 'গার্ডনার' কবিতাগুচ্ছ ফরাসী কবিতায় অনুবাদ করেন; তাঁহার নবপরিণীতা স্ত্রী সঙ্গে আসেন; অধ্যাপক গল্প করেন যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য আলোচনাকালে তাঁহাদের প্রথম প্রণয় হয়।

কবি প্যারিসে আনন্দেই আছেন। একদিন কাহ্‌ন, কবি ও রথীন্দ্রনাথদের লইয়া মোটরযোগে ফ্রান্সের উত্তরে রাঁস্ (Rhiems) প্রভৃতি যুদ্ধক্ষেত্র দেখাইয়া আনিলেন। রথীন্দ্রনাথ তাঁহার ডায়ারিতে লিখিয়াছেন যে, সমস্ত দিন তাঁহারা প্রায় মোটরে চলিয়াছেন— কোথাও প্রাণের চিহ্ন নাই— গাছপালা কঙ্কালের ন্যায় খাড়া— বাড়িঘর ধ্বংসপ্রাপ্ত, জনমানব নাই বলিলেই চলে— চারিদিকে গভীর ট্রেন্‌চ বা খাদ। এ দৃশ্য দেখিয়া আসিবার পর কবির সে রাত্রে ভালো ঘুম হইল না— মানুষ কী বীভৎস কাণ্ড করিতে পারে ইহার চাক্ষুষ জ্ঞান তাঁহার হইল। কবি এন্‌ড্রুজকে লিখিতেছেন, "It was a most saddening sight. Some of the terrible damages deliberately done, not for any necessities of war but to cripple France for ever, were so savage that their memory can never be efaced."[১]

প্যারিসে কবির সঙ্গে যে কয়জনের সাক্ষাৎ হয়, তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি ও আঁরি বের্গসঁ। সিলভ্যাঁ লেভি প্রাচ্যভাষা ও ইতিহাস-বিশেষজ্ঞ— সংস্কৃতাদি ভারতীয় ভাষা, চীনা, তিব্বতী, মধ্য-এশিয়ার লুপ্ত ভাষা সমূহ হইতে বৌদ্ধসংস্কৃতির ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণার জন্য খ্যাত। এই মনীষী অধ্যাপক কবির জীবনাদর্শকে মূর্ত করিতে কতখানি সহায়তা করিয়াছিলেন, সে কথা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

বের্গসঁ-র সহিত পরিচয় করিবার জন্য কাহ্‌ন অত্যুর দ্য মঁদ-এ তাঁহাকে একদিন আমন্ত্রণ করিয়া আনেন (১৯ অগস্ট)। বের্গসঁ ইংরেজি বলিতে পারিতেন, সুতরাং কবির সহিত মন খুলিয়া কথাবার্তা হইল। তিনি বলিলেন, কবির অনেক তত্ত্বই তিনি স্বীকার করেন। তবে তাঁহার মতে য়ুরোপীয় মন বেশি precise ও ভারতীয় মন বেশি intuitive। তাহার কারণও তিনি দর্শান। তিনি বলেন, য়ুরোপীয়কে প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিতে হয় বলিয়া তাহাকে বস্তুজগত সম্বন্ধে অত্যধিক জ্ঞান আয়ত্ত করিতেই হইয়াছে। বস্তুজগতের প্রতি অত্যন্ত মনঃসংযোগ প্রয়োজন। সেইজন্য precision-এর উদ্‌ভব। সর্বশেষে বের্গসঁ কবিকে বলেন যে তাঁহার 'সাধনা' ও 'পার্সোনালিটি' গ্রন্থদ্বয়ে যে তত্ত্ব নিহিত, তাহা প্রকৃত intuition হইতে উদ্‌ভূত; এইদিকে ভারতীয়দের মনীষা বিশেষভাবে মহত্ত্ব লাভ করিয়াছে। এই দুই মনীষীর মোলাকাতের সময় সুধীর রুদ্র উপস্থিত ছিলেন। তিনি উভয়ের সংলাপের মর্মার্থ সমসাময়িক মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশ করেন।[২] রথীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন যে পরে তিনি জানিতে পারেন উভয়ের নিভৃত আলাপ বের্গসঁর অনুমতি না লইয়া প্রকাশ করা সমীচীন হয় নাই।[৩]

১ *Letters from Abroad*, Sep. 12, 1920. *Letters to a Friend* সংস্করণে এই পত্রের কিয়দংশ বাদ।

২ The Modern Review 1920.

৩ *On the Edges of Time*, p. 145. Footnote.

আর-একদিন কাহ্নের আমন্ত্রণে আসিলেন ফ্রান্সের বিদুষী মহিলা কঁতেস দ্য নোআলিস্।[১] এই বিদুষীর কথাবার্তা মনস্বিতা কবিকে খুবই আশ্চর্য ও মুগ্ধ করে। কবির সঙ্গে দেখা হইলে তিনি বলেন যে, যেদিন মহাযুদ্ধের খবর প্রকাশিত হইল, সেদিন তিনি ফ্রান্সের ঐতিহাসিক-খ্যাত কূটনীতিজ্ঞ ক্লেমাসোঁ-র[২] সহিত গল্প করিতেছিলেন; যুদ্ধের সংবাদে ক্লেমাসোঁ-র মন অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হয়। তখন তাঁহারা উভয়ে কবির সদ্য প্রকাশিত গীতাঞ্জলির অনুবাদ পাঠ করেন। নোআলিসের সহিত আমাদের পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে।

প্যারিসে এই কয়দিনের মধ্যে কবির সহিত যে কয়জন মনীষীর পরিচয় হয়, তাহাতে কবির মন বেশ তৃপ্ত। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় বা পাবলিক হইতে রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনার কোনো ব্যবস্থা হয় নাই সত্য, কিন্তু সিলভ্যাঁ লেভি প্রভৃতির উদ্যোগে ম্যুজি গিমে-তে (Musee Guimet)[৩] কবি-সম্বর্ধনার আয়োজন হয়। কবির ভাবপ্রবণ মন এই সামান্য ঘটনাকেই বড়ো করিয়া দেখিতেছেন; তিনি লিখিতেছেন (২৮ অগস্ট), "এখানকার যেসব মনীষী বিশ্বমানবের সমস্যা বড়ো রকম করে চিন্তা করচেন, তাঁদের অনেকের সঙ্গে দেখা হয়েচে। এঁদের সঙ্গে আলাপ হলে মন মুক্তিলাভ করে। কেননা মানুষের মুক্তির ক্ষেত্র হচ্চে ভাবের ক্ষেত্র।"[৪]

কিন্তু ফ্রান্সের পাবলিক বলিতে যে পদার্থ বুঝায় তাহারা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে উদাসীন, অর্থাৎ সাংবাদিকগোষ্ঠী ও রাষ্ট্রনায়কগণ। তাহার কারণ 'ন্যাশনালিজম' গ্রন্থে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে কবির মত 'রিপাবলিক' ফ্রান্সের কড়া সাম্রাজ্যবাদী নেতারা পছন্দ করেন না। কবির ন্যাশনালিজম গ্রন্থ তখন পর্যন্ত ফরাসী ভাষায় ঐ কারণেই অনূদিত হয় নাই।[৫] তবে শুনিয়াছি বইখানির টাইপ-করা অংশ যুদ্ধের সময়ে ট্রেন্চের শিক্ষিত ফরাসী যুবক সৈন্যদের মধ্যে চালাচালি হইত। ফরাসী সরকার বোধ হয় সেসব কথা জানিতেন, তাই তাঁহারা কবিকে বিশেষভাবে সম্মান দেখাইতেও ইতস্তত করিতেছিলেন; তাছাড়া ইংরেজ ও ফরাসীর মধ্যে তখন গভীর মিতালি— ভার্সাই সন্ধিপত্র বৎসরকাল পূর্বে (১৯১৯-জুন ২৮) সম্পাদিত হইয়াছে; ইংরেজ রাজার প্রদত্ত সম্মান যে-ব্যক্তি রাজনৈতিক কারণের জন্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন তাঁহাকে ফরাসীরা কখনো সম্মান দেখাইতে পারে না— তাহাদেরও বিশাল সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ শাসন করিতে হয়!

১ কঁতেস দ্য নোয়ালিস্ (Comtesse Anne Elisabeth Mathieu de Noailles : (1876-1933); নোআলিস্ ফ্রান্সের বিশিষ্ট অভিজাত বংশীয়। Isadora Duncan তাঁহার My Lifeএ বলিয়াছেন, the inspired face of the Sapho of France, Comtesse de Noailles, (Indian Edition, p. 105).

২ ক্লেমাসোঁ (Clemenceau, Georges : 1841-1929); ফরাসী রাজনীতিক— ১৯১৭-এর ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী। যুদ্ধশেষে ভার্সাই-সন্ধিশর্ত রচনা তাঁহার কীর্তি।

৩ Musee Guimet—named after a great French chemist J. B. Guimet (1798-1871); his son E. E. Guimet (1836-1918), an industrialist and scholar, founded in 1888 the Musee Guimet or Musee Nationale des Religions, containing exhibits from Egypt and the Far Eastern Countries... এই প্রতিষ্ঠান হইতে প্রকাশিত অতি মূল্যবান গ্রন্থ বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে উপহৃত হয়।

৪ শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩২৭ আশ্বিন, পৃ. ৩১৬।

৫ ইংরেজি *Nationalism* ১৯১৭। জারমান ভাষায় ১৯১৮, রুশীয় ১৯২২; ফরাসীতে ১৯২৪-এ প্রকাশিত হয়।

অত্যুর ছ মঁদ-এ দিন বারো থাকিবার পর দক্ষিণ ফ্রান্সে Cap Martin-এ কাহ্‌নের রাজপ্রাসাদতুল্য মস্ত এক বাড়িতে তাঁহারা কয়েকদিন গিয়া থাকিলেন। স্থানটি Alps Maritimae (Maritime Alps) বা ফ্রান্সের দক্ষিণে সমুদ্র-উপকূলস্থিত আল্পসের অংশ। কবি তাঁহার কন্যা মীরাকে লিখিতেছেন, "আমরা দক্ষিণ ফ্রান্সে সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের উপর ভারী সুন্দর একটা জায়গায় এসেচি।· · কিন্তু এম্‌নি অদৃষ্ট যে আমাদের কয়জনেরই তোরঙ্গ রেলের থেকে খোয়া গেছে। তাতে আমাদের সব কাপড় ছিল, বইও ছিল। যা প'রে বেরিয়েছিলুম · · তাই [দিয়ে] এখানে তিন চারদিন মাত্র কাটিয়েই আজ · · প্যারিসে ফিরে যাচ্চি।"[১]

নেদারল্যানডস ও বেলজিয়ামে

সেপ্টেম্বর মাসের (১৯২০) মাঝামাঝি পর্যন্ত কবি ফ্রান্সে রহিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে নেদারল্যানডস হইতে আমন্ত্রণ আসিয়াছে, তথাকার জন্য বক্তৃতা লিখিতেছেন। আর ভারতের অসহযোগ আন্দোলন ও শান্তিনিকেতনে তাঁহার প্রতিক্রিয়ার যেসব ঘটনার খবর পাইতেছে — সেই সকল বিষয় লইয়া এন্‌ড্রুজকে পত্রধারা লিখিতেছেন; দীর্ঘকাল এই পত্রধারা চলে এবং সে-সম্বন্ধে আমরা পৃথক পরিচ্ছেদে আলোচনা করিব।

নেদারল্যানডসের নগরগুলি ভারতীয় কবিকে অভ্যর্থনার জন্য আয়োজনে ব্যস্ত, কাগজে-পত্রে প্রচারকার্য ও আলোচনায় মুখর। রবীন্দ্রনাথ পুত্র-পুত্রবধূ লইয়া রটারডাম বন্দর-নগরীতে পৌঁছিলেন ১৯ সেপ্টেম্বর। রটারডাম রাষ্ট্রের দ্বিতীয় মহানগরী ও বহু শিল্পের ও বিচিত্র ব্যবসায়ের কেন্দ্র।

ওলন্দাজদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমসাময়িক মনীষী-সাহিত্যিক ভ্যান ঈডেন[২]। কবিকে স্বাগত করিয়া হুইজেন (Huizen) নামক স্থানে লইয়া গেলেন; ঈডেন যৌবনে চিকিৎসাবিদ্যায় উপাধি লন বটে, কিন্তু অল্পকাল মধ্যে সাহিত্যসাধনায় সকল মন ও শক্তি সমর্পণ করেন। আমেরিকার আদর্শবাদী ভাবুক থরো-র (Thoreau, 1814-62) ন্যায় ভাবুক সমাজগঠনের ব্যর্থ প্রয়াস করেন।

১ চিঠিপত্র ৪, পত্র ৩৭। দ্র. বিলাতযাত্রার পত্র ৬, পত্র ৭। Villa Dunana. Cap Martin, Alps Maritimes, 28 August 1920. কবি ১৯৩০ সালেও এখানে একবার যান। দ্র. শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩২৭ আশ্বিন, পৃ. ৩৫৬-৬১। *Letters to a Friend*-এ এনড্রুজ Ardennes হইতে লিখিত পত্রমধ্যে এই তোরঙ্গাদি খোয়া যাওয়ার কথা লেখেন; পত্রের তারিখ ২১ অগস্ট। Ardennes— ফ্রান্সের উত্তরপূর্বে পার্বত্য মালভূমি; এইখানে এনড্রুজ বোধ হয় দুইখানি পত্র মিশাইয়া ভুল করিয়াছেন।

২ Frederick William Van Eeden (1860-1932); Dutch poet, writer and neurologist Co-founder of the organ of the younger group of writer De Nieuwe Gids (1885). রথীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, "There we met Dr. Frederick Van Eeden, the translator of Father's book in the Dutch language. Van Eeden was a disillusioned idealist and as a reaction to the inhumanity of the war he was trying to establish a colony where plain living and high thinking would be strictly followed. The difficulty arose when his disciples preferred easy living on the plea of high thinking. Van Eeden's colony met the same fate as all previous attempts by unpractical idealists at establishing Utopians in this selfish material world of ours."— *On the Edges of Time*, pp. 149-50.

হুইজেন রটারডাম হইতে পনেরো মাইল দূরে ; এই নিরালা পরিবেশে ভ্যান ঈগেন[১] (Van Eegen) নামে এক ধনী পরিবারের গৃহে কবি অতিথি হইলেন।

নেদারল্যানডসে কবি দিন পনেরো ছিলেন ; ইহার মধ্যে আমস্টারডাম, রটারডাম, হেইগ, লাইডেন, য়ুট্রেক্ট-এ বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল The Message of the East ; কোনো কোনো স্থানে বাংলার লোকধর্ম বা বাউলদের সম্বন্ধেও বলেন।

য়ুট্রেক্ট নগরে একটি ছোট ঘটনার কথা রথীন্দ্রনাথের দিনপঞ্জীতে পাই। সভায় বক্তৃতার পর অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক কবির হাতে ছোটো একটি পুলিন্দা দিয়া বলিলেন যে একজন মহিলা শ্রোতা বক্তাকে উপহার দিয়া গিয়াছেন। পুলিন্দা খুলিয়া দেখা গেল একটি হীরার আংটি ও একটি সোনার লকেট, লকেটে একটি যুবকের ফটো, তার পাশে কয়েকটি শিশু। অনেক সন্ধানেও মহিলাটিকে পাওয়া গেল না। পরে শোনা গেল সে একজন সর্বহারা হাংগেরিয়ান উদ্‌বাস্তু।

ডক্টর জে. ভ্যানদর লিউ নামে একজন ওলন্দাজ লেখক সমসাময়িক পত্রে কবির বক্তৃতা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, 'কবি যখন হল্যানডে আসিলেন তখন তিনি তাঁহার শ্রোতাদের মধ্যে এমন লোক পাইলেন না, যাহারা তাঁহার সাহিত্য সম্বন্ধে অজ্ঞ ; সহস্র সহস্র লোক তাঁহার গ্রন্থ ইংরেজি বা ডাচ ভাষায় পাঠ করিয়াছে।' Spirit of Tagore কথাটা একটা বিশেষ মনোভাব বুঝাইবার জন্য ক্রমশ ব্যবহৃত হইতেছে।[২]

রবীন্দ্রনাথ থিওজফিস্ট ও ফ্রী রিলিজন কম্যুনিটি কর্তৃক আহূত হইয়া হল্যানডে আসিলেও সর্বত্র সর্বশ্রেণীর লোক তাঁহাকে যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহা ইতিপূর্বে কোনো য়ুরোপীয়ের ভাগ্যেও ঘটে নাই। তিনি যে কেবল তাঁহার বক্তৃতার দ্বারা ওলন্দাজ শিক্ষিত সমাজকে মুগ্ধ করিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহার সংস্পর্শ আশীর্বাদের ন্যায় সকলকেই তৃপ্ত করে। বক্তৃতার স্থলে জনতার স্থানসংকুলান হয় না এ ঘটনা বহু শহরেই ঘটে। রটারডাম নগরবাসীরা তাহাদের চার্চের বেদী হইতে কবিকে বক্তৃতা দিবার জন্য ব্যবস্থা করিয়া দেয়— এ সম্মান কোনো অ-খ্রীষ্টানকে তাহারা এ পর্যন্ত দেয় নাই।

কবি তাঁহার হল্যানড সফর সম্বন্ধে এনড্রুজকে এনটোয়ার্প হইতে লিখিতেছেন (৩ অক্টোবর ১৯২০): This fortnight has been most generous in its gifts to me . . Altogether Europe has come closer to us by this visit of ours . . Now I know more closely than ever before that *Santiniketan belongs to all the world* and we shall have to be worthy of this great fact . . Santiniketan *must be saved from the whirlwind of our dusty politics.*[৩]

শান্তিনিকেতনকে রাজনীতির ঘূর্ণিবাত্যা হইতে রক্ষা করিবার কথা কবির মনে কেন হইতেছে— তাহার কারণ আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি।

১ শ্রীমতী ভ্যান ঈগেন কয়েক বৎসর পরে শান্তিনিকেতনে আসিয়া বাস করেন। শ্রীনিকেতন যাইবার পথে বামদিকে প্রথমেই যে খড়ের ঘরটি দেখা যায়, সেইটি তাঁহার ব্যয়ে নির্মিত হয়। তখন শ্রীমতী স্বামী-পরিত্যক্তা ; কবি যখন তাঁহাদের গৃহে অতিথি ছিলেন, তখন সেখানে কী সুখ আনন্দই না দেখিয়া আসিয়াছিলেন, এখন শান্তিলাভের আশায় তিনি কবির সান্নিধ্যে কিছুকালের জন্য বাস করিতে আসেন।

২ Dr. J. Vander Leeuw. The Modern Review 1921 March. ইনি একবার শান্তিনিকেতন বেড়াইতে আসেন। তাঁহাকে ছাত্ররা বাল্মিকীপ্রতিভা শালতলার প্রাঙ্গণে অভিনয় করিয়া দেখায়। তিনি ইহার ফটো তুলিয়াছিলেন।

৩ *Letters to a Friend*, p. 96.

নেদারল্যানডসে বক্তৃতাদি হইয়া গেলে রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমাদেবী ইংলন্ড চলিয়া যান ; কবি চলিলেন বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রুসলসে, সঙ্গে পিয়ার্সন। ব্রুসলস নগরীতে রাজ্যের প্রধান বিচারালয়ের (Palace of Justice) বিরাট হল্‌ঘরে কবির বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়। বক্তৃতার বিষয় 'পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন'। একজন দর্শক লিখিতেছেন, 'In a touching comparison this Christ of India traced the course of the two civilizations—the East and West.'[১]

ইতিপূর্বে কবি তাঁহার আমেরিকা-সফরের সংকল্প জানাইয়া মেজর পন্‌ড-কে পত্র দিয়াছিলেন ; এই পন্‌ড ১৯১৬ সালে মার্কিন মুলুকে কবির বক্তৃতা-সফরের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নেদারল্যানডের হুইজেন বাসকালে পন্‌ডের কেব্‌ল্ আসে— তিনি জানান বক্তৃতার ব্যবস্থা করিতে তিনি অপারগ। কবির বিরুদ্ধে মার্কিনীদের মন অত্যন্ত উত্তেজিত। কবি বুঝিলেন তাঁহার 'নাইট' উপাধি ত্যাগের সংবাদ-তরঙ্গ অতলান্তিক প্রশান্তমহাসাগর পার হইয়া ব্রিটিশের মিত্র মার্কিনীদের ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যে আমেরিকায় যান সেটা ইংরেজ পররাষ্ট্র দৌত্যের ইচ্ছা ছিল না ; তাহাদের আশঙ্কা পাছে কবি ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু তথ্য সেদেশে গিয়া প্রকাশ করিয়া দেন। কবির মনে কিন্তু মুখ্যত পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন সমস্যার সমাধান-কথাই জাগিতেছে ; আর ব্যবহারিক দিক হইতে ভাবিতেছেন তাঁহার আন্তর্জাতিক মহাবিদ্যালয়ের (বিশ্বভারতী) জন্য অর্থসংগ্রহের কথা। কিন্তু আমেরিকা হইতে সাড়া না পাইয়া সেখানে যাইবার কল্পনা ত্যাগ করিলেন ; এনড্রুজকে লিখিতেছেন, "You must have heard by this time, that our American tour has been cancelled. The atmosphere of our mind has been cleared at a sweep, of the dense fog of the contemplation of securing money. This is deliverance."[২] কিন্তু মনের এই বৈরাগ্য সাময়িক।

বেলজিয়াম হইতে কবি পিয়ার্সনকে সঙ্গে লইয়া প্যারিসে ফিরিয়া গেলেন। কোথায় যাইবেন, কী করিবেন কিছুই স্থির হইতেছে না। য়ুরোপের মধ্যে চলাফেরার বাধা বহু প্রকারের ; এক দেশ হইতে অন্য দেশে যাইতে হইলে পাসপোর্ট-ভিসা চাই। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে সে-সবের খুঁটিনাটি পরীক্ষা ; সীমান্তে সীমান্তে বাক্স-পেটরা তন্ন তন্ন খানাতল্লাশী প্রভৃতির উপদ্রব।

কথা ছিল, রথীন্দ্রনাথ লন্ডন হইতে প্যারিসে আসিয়া পিতার সহিত মিলিত হইবেন। নানা অজ্ঞাত কারণে তাঁহাদের পত্র ও টেলিগ্রামাদি যথাস্থানে পৌঁছিতে আশ্চর্যরকম অযথা বিলম্ব হইতে লাগিল। লন্ডনে প্রতিমা দেবীর একটি অস্ত্রোপচারের কথা ছিল, সে সম্বন্ধেও কোনো সংবাদ না পাইয়া উদ্বিগ্ন মনে কবি লন্ডন চলিয়া গেলেন (১৩ অক্টোবর)। লন্ডনবাসকালেই আমেরিকা যাওয়ার কথা আবার উঠিল— কবির মনে হইতেছে তাঁহার বলিবার কথা আছে— They must listen to the appeal of the East। এনড্রুজকে লিখিত এক পত্রে শান্তিনিকেতন ও দেশ সম্বন্ধে তাঁহার উদ্বেগ প্রকাশ পাইতেছে।

অতঃপর একদিন পিয়ার্সনকে সঙ্গে লইয়া কবি ডাচ জাহাজ 'রটারডামে' আরোহণ করিয়া আমেরিকা রওনা হইয়া গেলেন। কবির সঙ্গে এবার চলিয়াছেন কেদারনাথ দাশগুপ্ত। রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী লন্ডনে রহিয়া গেলেন— পরে যাইবেন।

১ The Modern Review, 1921 January, pp. 22-24.

২ *Letters from Abroad*, p. 25.

আমেরিকায়

আমেরিকাগামী 'রটারডাম' জাহাজ ওলন্দাজদের ; 'খুব মস্ত, অত্যন্ত পরিষ্কার'। ভারত হইতে ইংলন্ড আসিবার পথে অ্যাংলো-ইন্‌ডিয়ান সহযাত্রীদের তুলনায় এ জাহাজের 'লোকেরা ভদ্র'। এইটা কবির কাছে বিশেষ কাম্য— বিশেষভাবে জাহাজে যেখানে মানুষ অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি ভাবে বাস করিতে বাধ্য।

কবি লিখিতেছেন "এ বছরের লক্ষ্মীপূর্ণিমা (২৭ অক্টোবর) সমুদ্রের উপরেই দেখা দিয়েছিল।·· তিনি কোজাগর রাত্রে আমাকে ভোলেননি— যাত্রীরা আমাকে কিছু বক্তৃতা দিতে বলেছিল— সেই বক্তৃতা থেকে ·· আমি প্রায় ছশো টাকা পেয়েছিলুম।" কবি ভাবিতেছেন, "লক্ষ্মী যদি সমুদ্রের ওপারেও প্রসন্ন হন তাহলে আমার যাত্রা সফল হবে।" তাঁহার মনে হইতেছে "এবার যেন ভাগ্য অনুকূল।"[১] এবার আমেরিকা "হতে কিছু হাতে করে নিয়ে আসবার ইচ্ছে আছে যাতে চিরদিনের মতো আশ্রমের অভাব মোচন হয়।" মিলিয়ন ডলারের স্বপ্ন লইয়া আমেরিকায় চলিয়াছেন।

২৮ অক্টোবর জাহাজ যখন নিউইয়র্ক পৌঁছিল তখন রাত্রি, জাহাজ হইতে আর নামা হইল না। এই কয়দিন সমুদ্রের 'পরে কবির মনে শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে অনেক কথা আলোড়িত হইতেছে ; দেশে রাজনীতির মধ্যে যে অসহযোগনীতি দেখা দিয়াছে তাহার তরঙ্গ শান্তিনিকেতনকেও যে উতলা করিয়া তুলিয়াছে, তাহার আভাস এনড্রুজের ও অন্যান্যের পত্র হইতে পাইতেছিলেন : এতৎসত্ত্বেও তিনি ভাবীকালের শান্তিনিকেতনের জন্য বিশ্বমানবতার স্বপ্ন দেখিতেছেন। শান্তিনিকেতন ও অসহযোগ সম্বন্ধে সাময়িক কথা আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করিব, এখানে কবির আমেরিকা সফরের কথাই বলা হইবে।

কবি নিউইয়র্কের Hotel Algonquin-এ আছেন। লাল মানুষের আলগঁকুইন উপজাতির নামে হোটেল হইলেও তাহা পুণার 'পর্ণকুটীরে'র ন্যায় মিথ্যা-বিনয়। কবি লিখিতেছেন, "একদিনেই আমরা এখানে যা খরচ করিয়াছি ইংলন্‌ডে বা ফ্রান্সে এক সপ্তাহে তা ব্যয়িত হইত।" হোটেলের মালিক কবির যথেষ্ট যত্ন করিতেছেন, তবুও তাঁহার মনে হইতেছে যেন উঁচু খাঁচার মধ্যে আছেন। রবীন্দ্রনাথ আসিয়াছেন এ সংবাদ রাষ্ট্র হওয়া মাত্রই সাংবাদিকের দল মোলাকাত-প্রার্থীরূপে হাজির হইতেছেন। ভারতবর্ষে ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে গান্ধীজির নন-কোঅপারেশন সম্বন্ধেই লোকের ঔৎসুক্য বেশি ; রাজনীতিক্ষেত্রে অহিংস অসহযোগনীতি পাশ্চাত্য জাতির পক্ষে দুর্বোধ্য। এই সম্বন্ধে কবিকে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন, "অসহযোগ আন্দোলন আদর্শাত্মক ; আমি আইডিয়ার শক্তিতে বিশ্বাসবান, পাশবিক বলে আমার শ্রদ্ধা নাই। ভবিষ্যতে মানুষের বিরোধ বাধিবে আইডিয়ার জগতে, দেহের জগতে নয়। আইডিয়ায় যাহাদের শ্রদ্ধা নাই তাহারাই পরস্পরকে হিংসা করে, অসহযোগনীতি এই আদর্শতার উপর প্রতিষ্ঠিত— ইহা হিংস্রতায় বিশ্বাস করে না। যদি আমাদের দেশ এই অহিংসনীতি গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ চালাইতে পারে, তবে আমি আমার জাতির জন্য গর্ব অনুভব করিব। এই আন্দোলনের গুরু শ্রীযুক্ত গান্ধি, আমার বিশ্বাস আছে, তাঁহার নেতৃত্ব শুভফলপ্রদ হইবে। কিন্তু ইহা খুবই স্বাভাবিক যে এই নিরুপদ্রব অহিংসতাকে শাসকগণ হিংসার দ্বারা আক্রমণ করিবেন। আমরা যদি দৃঢ় থাকিতে পারি, তবেই জয় আমাদের, পশুশক্তি পরাভূত হইবে।"— New York Call, 2 November 1920। এই সাংবাদিকের নিকট কবি তাঁহার আন্তর্জাতিক মহাবিদ্যালয়ের পরিকল্পনাও ব্যাখ্যা করেন।

১ চিঠিপত্র ৪, পত্র ৩৮ ; পৃ. ৯৮-৯৯।

আর একজন সাংবাদিক কবিকে পরলোক সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। যন্ত্রবিজ্ঞানী এডিসন্ (১৮৪৭-১৯৩১) তখন জীবিত ; তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি এমন এক যন্ত্র আবিষ্কার করিতেছেন, যাহার সাহায্যে মৃত্যুর পর যদি কোনো আত্মা বা জীবের অস্তিত্ব থাকে, তবে ঐ স্পর্শচেতন যন্ত্রে উহার সাড়া মিলিবে। সাংবাদিক এ সম্বন্ধে কবির মত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, "এখানে প্রশ্ন হইতেছে পৃথিবী ত্যাগ করিবার পর মানুষের ব্যক্তি-পুরুষ (personality) ইহলোকের সহিত বার্তা বিনিময় করিতে চায় কি ? জন্মের পূর্বে জীবন কি আকার গ্রহণ করিবে সে-সম্বন্ধে আমাদের কোনো ধারণা জন্মায় না, তেমনি মৃত্যুর পর কী আছে সে-সম্বন্ধেও আমরা অজ্ঞ। এই পর্যন্ত আমরা জানি যে পরলোকে মঙ্গল হইবে, তাহা না হইলে সর্বচরাচরের একমাত্র গতি মৃত্যু যে অতি ভীষণ হইত। মৃত্যু সত্ত্বেও জীবনপ্রবাহ চলিতেছে, তাহার আনন্দ, আকাঙ্ক্ষা সবই আছে। · · মৃত্যুর পর অসীম জীবনধারায় আমি বিশ্বাস করি, এবং তাহা প্রমাণের জন্য আমার কোনো যন্ত্রের প্রয়োজন হইবে না।"[১]

প্রসঙ্গত বলিতে পারি, পরলোক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট কৌতূহল ছিল ; তবে এসব সম্বন্ধে এদেশে বেশি কথা বলার বিপদ কোথায় জানিতেন বলিয়া কখনো কোনো ভাষণ প্রকাশ্যে দেন নাই। মৃত্যুর পর মানবাত্মার অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাসবান ছিলেন ; তাই প্লানচেট, মিডিয়ামের সাহায্যে অদ্ভুত কথা সব শুনিবার কৌতূহল বাল্যে যৌবনে এমন কি বার্ধক্যেও দেখা যায়। স্বর্গীয় মোহিতচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠা কন্যা উমা (বুলা) দেবীর মিডিয়ামের অলৌকিক শক্তি ছিল ; কবি তাহার মাধ্যমে অনেক সব আশ্চর্য কথা শুনিয়াছিলেন। তাঁহার এই অদ্ভুত খেয়াল সম্বন্ধে আমাদের ন্যায় অবিশ্বাসীরা প্রশ্ন করিলে বলিতেন, 'বিশ্বাস করিব না' ইহাও এক প্রকারের গোঁড়ামি, 'বিশ্বাস করিব' মনোবৃত্তি হইতে ইহা কম মূঢ় নহে। পরলোকে আত্মা আছে কিনা, সে-সম্বন্ধে মন খোলা রাখাই বাঞ্ছনীয়। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তাহাকে বুঝিতে চেষ্টা করায় কোনো ক্ষতি নাই। পরলোক সম্বন্ধে দিলীপকুমারকে দীর্ঘ একখানি পত্র তিনি একবার লেখেন।

নিউইয়র্ক আসিবার পর পিয়ার্সন ও পন্ডের চেষ্টায় ১০ নভেম্বর ব্রুকলিন[২] ইনস্টিটিউটের সংগীতভবনে (Academy of Music) 'পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন' সম্বন্ধে কবির প্রথম বক্তৃতা হয়। ১২ই ফিলাডেলফিয়ার Bryn Maeur[৩] স্থানে মহিলাদের কলেজে 'বাংলার মরমী কবিদের' সম্বন্ধে কবি প্রবন্ধ পাঠ করেন। নিউইয়র্ক মহানগরীতে প্রথম বক্তৃতা হইল League of Political Education সংঘের তত্ত্বাবধানে (১৬ই)। দ্বিতীয় বক্তৃতার (২১শে) বিষয় *The Poets' Religion*। তারপর ২১শে নভেম্বর ব্রুকলিনের সিভিক-ফোরামে 'কবির ধর্ম' বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন। এই বক্তৃতা সম্বন্ধে সমসাময়িক একখানি দৈনিক লিখিয়াছে যে ইতিপূর্বে সভাগৃহে বক্তৃতা শুনিবার জন্য এরূপ জনতা কখনো হয় নাই। বহুশত লোক স্থানাভাবে ফিরিয়া যায়।[৪]

নিউইয়র্কে দুই একজন অধ্যাপক কবির আন্তর্জাতিক বিদ্যায়তনের পরিকল্পনাকে মূর্তি দিবার জন্য বিশেষ উৎসাহী : কিন্তু তাঁহারা সামান্য শিক্ষাবিৎ ; কাজেই কিছু রূপ দিবার শক্তি তাঁহাদের সীমিত। আসলে আমেরিকানরা

১ International News Service by Margery Rex, Baltimore, November 9, 1920.

২ ব্রুকলিন নিউইয়র্ক নগরীর প্রায় সংলগ্ন অংশ, কলিকাতার হাওড়ার ন্যায়। Brooklyn Eagle, November 1920.

৩ Bryn Maeur— পেনসলভানিয়া স্টেটের ফিলাডেলফির অন্তঃপাতী আবাসিক পল্লী, এখানে Bryn Maeur College for Women ১৮৮৫ অব্দে প্রতিষ্ঠিত।

৪ Never has the Forum had as large an audience as that which turned out to hear the famous writer from the East, hundreds were turned away.—Standard Union N. Y., November 22. 1920.

আন্তর্জাতীয়তা সম্বন্ধে বড়ই উদাসীন, কেজো জাতের লোক তাহারা— ব্যবহারিকতায় যাহার চিত্ত সাড়া দেয় না। এনড্রুজ কারনেগির স্ত্রীর সহিত কবি সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে, তিনি দেখা করিতে রাজি হইলেন না ; বলিয়া পাঠাইলেন যে তাঁহার পক্ষে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানে সাহায্যদান করা সম্ভব নহে। কবি এই আঘাত পাইয়া ভাবিতেছেন, অর্থের জন্য এই হীনতা আর স্বীকার করিবেন না। বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ-সংগ্রহের উপর সাময়িকভাবে বিরক্তি আসিয়াছে, এনড্রুজকে লিখিতেছেন, "This visit of mine to America has produced in me intense contempt for money." কয়েকদিন পর লিখিতেছেন, "যখন আমরা ভারতবর্ষে থাকি তখন অর্থ আমাদের কি সুখ দিতে পারে তাহার কথাই কল্পনা করি। কিন্তু যখন এই দেশে আসি তখন ধনের বিপদ কোথায় বুঝিতে পারি।"

একজন ভাবুক কোয়েকার প্রায় প্রতি রবিবারে কবিকে তাঁহাদের গির্জায় লইয়া যান, কবির শিক্ষাদর্শকে প্রশংসা করেন, কবি ভাবেন এসব আশার কথা।[১]

রথীন্দ্রনাথ য়ুরোপ হইতে আমেরিকায় আসিয়া দেখেন মাসাধিক কালমধ্যে কাজের কাজ কিছুই অগ্রসর হয় নাই।

বিশ্বভারতীর কাজ কিভাবে কার্যকরী করা যায় সে সম্বন্ধে তিনি তখনই উপায় আবিষ্কারের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। পিয়ার্সন কবির সেক্রেটারিরূপে আসিয়াছিলেন, তাঁহার ভরসা ছিল পন্ডের 'পরে, পন্ড পিয়ার্সনকে বুঝাইয়াছিলেন যে আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের পূর্বের জনপ্রিয়তা নাই— সুতরাং চেষ্টা বৃথা। এ ছাড়া পন্ডের ব্যবসায় মন্দা হইবার উপক্রম হইয়াছিল। আসলে সার্ উপাধি ত্যাগের জন্য ব্রিটিশদের বিরক্তির তরঙ্গ অতলান্তিক পার হইয়া মার্কিন রাজনীতিকেও আচ্ছন্ন করিয়াছে— এই ব্যাপারটিও পন্ডের নিষ্কর্মতার অন্যতম কারণ বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, এইসব ব্যাপার লইয়া পিয়ার্সনের সহিত রথীন্দ্রনাথের মতান্তর হয়। পিয়ার্সনের পক্ষে আমেরিকার এই কার্য অত্যন্ত ক্লান্তিকর হইয়া উঠে। তিনি রথীন্দ্রনাথের উপর সমস্ত ভার দিয়া বস্টনে চলিয়া গেলেন। পিয়ার্সন চলিয়া যাওয়াতে কবি খুব দুঃখিত হন।— রথীন্দ্রনাথের ডায়ারি।

নিউইয়র্কে কোনো কাজ নাই, বক্তৃতার ব্যবস্থা নাই ; কবির মনে হইতেছে চারিদিক 'জনতার মরুভূমি', মানুষ যেন আপনার বিক্ষিপ্ততার প্রলয়প্লাবনে নিমজ্জিত।

চারিদিকে ব্যর্থতার মধ্যে আজ শান্তিনিকেতনের শান্তির কথাই মনে হইতেছে।

সাতই পৌষ উৎসব-দিনে কবির মন আশ্রমের জন্য ব্যাকুল।[২] খৃষ্টজন্মদিনের দিন কবি নিউইয়র্কের শহরতলীর একটি মনোরম স্থানে আছেন। এই পবিত্র দিনে খৃষ্টের কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কোথায় মানুষের অন্তরে খৃষ্টের বাণী? কবি এনড্রুজকে লিখিতেছেন, আজ নরনারীরা অতিরিক্ত ভোজন-পানে ব্যস্ত, অতি উচ্চ হাস্যপরিহাসে উন্মত্ত। তাহাদের আমোদ-আহ্লাদের মধ্যে অনন্তের স্পর্শ কোথায়— ভক্তির চিহ্ন কোথায়? ভারতের ধর্মোৎসব হইতে কী পার্থক্য how immensely different from the religious festivals of our country.—Letters, p. 112। কিন্তু সত্যই কী ভারতীয় ধর্মোৎসবগুলি খুব সাত্ত্বিকভাবে পালিত হয়? সেখানেও আহার-পান, বাজনা-বাজির যে তাণ্ডব ধর্মের নামে চলে, তাহার কথা কবি দূরে আসিয়া বিস্মৃত হইয়াছেন ; দূর হইতে সমস্তই idealised বা আদর্শায়িত হইতেছে, কল্পনায় সুন্দর লাগিতেছে।

১ *Letters to a Friend*, New York, 25 November 1920 ; p. 108.

২ "To day is the seventh of Paus. I wish it were allowed to me to stand among you and mingle my voice with yours in uttering our prayer. It is real starvation of my heart to be deprived of this great privilege..." *Letters to a Friend*, p. 111.

এই বক্তৃতার একটি বাক্য— a man's life must be his own creation, a work of art— শ্রোতাদের মনে ধরিয়াছিল।

ইতিমধ্যে ২০ নভেম্বর রথীন্দ্রনাথ সস্ত্রীক য়ুরোপ হইয়া আমেরিকায় আসিয়াছেন। দুইদিন পরে তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া কবি প্রিন্সটন শহরে যান ও সেখানে মিঃ হার্বার্ট গীবন্স-এর অতিথি হইলেন। মিঃ গীবন্স (১৮৮০-১৯৩৪) মার্কিনের সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও ঐতিহাসিক।

নিউইয়র্কের হোটেলে তিন সপ্তাহ কাটিয়া গেল: বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচার ও অর্থ সংগ্রহের যে কল্পনা লইয়া দেশ হইতে বাহির হইয়াছিলেন, তাহার কোনো আশাভরসা কোথাও পাইতেছেন না। সামাজিক পার্টি, ভোজসভা, মাঝে মাঝে এখানে ওখানে বক্তৃতার আহ্বান ছাড়া কাজের দুই-একটা আদর্শবাদের বড়ো কথা শুনিয়া অনেক কিছু কল্পনা করেন।

যখন কোথাও কোনো আশার ক্ষীণালোকটুকু দেখা যাইতেছে না, কবি তাঁহার কল্পনার আলোকে সমস্তই স্পষ্ট দেখিতেছেন: "Things are working well and I have causes to be sanguine of success."।

য়ুরোপে থাকিবার সময় সম্মানিত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মন বলিয়াছিল যে জগতে ভাবুকসমাজ একেবারে অবলুপ্ত হয় নাই। নিউইয়র্কেও তরুণ সাহিত্যিক ও শিল্পীরা কবিকে যথেষ্ট সমাদর করিলে তাঁহার মনে আশার কুহক জাগিতেছে। শিল্প ও বিজ্ঞান সভার (Society of Art and Science) তরফ হইতে একদিন কবি-সম্বর্ধনা হয়।

তাঁহার মতে পাশ্চাত্য জাতির লোকেরা ধন উপার্জনে সার্থকজীবন। কিন্তু জীবনের কার্যকে তাহারা নষ্ট করিতেছে। ইহারা ধনৈশ্বর্যে বিশ্বাসবান, কিন্তু ধন কেবল বাড়িয়া বাড়িয়াই চলে, কিছুকে সে পায় না। তাহারা যে সুখী নয় এটুকু হৃদয়ঙ্গম করিবারও অবসর তাহাদের নাই। তাহাদের অবসর-মুহূর্তগুলি উচ্ছৃঙ্খলতার আবর্জনায় ভারাক্রান্ত, পাছে তাহারা আবিষ্কার করে যে তাহাদের ন্যায় অসুখী জীব মর্তলোকে নাই।[১]

শহরতলী হইতে ফিরিবার পর ২ জানুয়ারি Community Forum-এর উদ্যোগে হাইস্কুল অব্ কমার্স গৃহে (১৫৬ ওয়েস্ট ৬৫ স্ট্রীট) কবি 'পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন' বিষয়ে ভাষণ পাঠ করেন। ইহার পর ৪ জানুয়ারি হেলেন কেলারের সহিত সাক্ষাৎ, ১১ জানুয়ারি বস্টনে ওয়েল্সলি মহিলা কলেজে[২] 'কবির ধর্ম' বিষয়ে বক্তৃতা ও হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে দুইটি ভাষণ দান করেন (২৫ জানুয়ারি)।

নিউইয়র্কে থাকার সময়ে হেলেন কেলারের সহিত কবি একদিন দেখা করিতে যান (৪ জানুয়ারি)। রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার কক্ষে পাইয়া হেলেন কেলার আনন্দে আত্মহারা; কবি কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করিয়া ও গান গাহিয়া শোনান। হেলেন জন্মান্ধ ও বধির। তিনি কবির কণ্ঠে ও ওষ্ঠে অঙ্গুলির স্পর্শ দ্বারা সমস্ত 'শুনিতে' পাইলেন।

রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এইটি একটি নূতন অভিজ্ঞতা। হেলেন কবিকে তাঁহার *The world I live in* (1908)

১ How to convince them the utter vanity of their pursuits! They don't have the time to realise that they are not happy. They try to smother their leisure with rubbish and dissipations, lest they discover that they are the unhappiest of mortals.— Letters, p. 47

২ Reads a paper—The Poets' Religion. Tagores were the guests of the concern. The poet came under the auspices of the Department of Philosophy of which Prof. Mary Whiton Calkim...is the Head.—Evening Globe, Boston. 12 January 1921.

৩ দ্র. হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসায়নিক বিভাগের অধ্যাপক নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত T.W. Richards (1868-1928) এই বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার পত্র ও কবির উত্তর—V. B. News 1951, August; from notes of Surhit Kumar Mukherjee.

নামক গ্রন্থ উপহার দিয়া— তাহাতে গার্ডনারের একটি পংক্তি লিখিয়া দিলেন, "I forgot, ever forget, that the gates are shut everywhere I dwell alone" (কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার সে কথা যে যাই পাসরি)। সম্ভবতঃ এই কবিতাটি কবি সেদিন পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। পুলিনবিহারী লিখিতেছেন, "ভাবতে ভালো লাগে · · এই কবিতাটির বিভিন্ন ব্যঞ্জনাসূত্রে উভয়ের মধ্যে ভাবৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।"[১]

ধন সৃষ্টির চেয়ে নষ্ট বেশি করিতে পারে। ধনকে সচল ও জীবন্ত রাখিতে হইলে ত্যাগের প্রয়োজন— *Letters from Abroad*, 6 January '21। অর্থের সন্ধানে ক্লান্ত হইয়া কয়েকদিন পরে লিখিতেছেন, তিনি যেন দুই নৌকায় পা দিয়া আছেন। তিনি পশ্চিমের চেলা 'কর্মকর্তা'কে (organiser) অন্তর হইতে ঘৃণা করেন। তাঁহার ভিতরে যে সন্ন্যাসী আছে, তাহার প্রতি অগাধ প্রত্যয়— সে সর্বদা বলিতেছে, সমস্ত ত্যাগ করো। কিন্তু তাহার মধ্যে যে কর্মকর্তা বা কেজো লোকটি আছে, সেই তাহার জীবনের সকল শক্তিকে দাবিও করে এবং পাইয়াও বসে।[২]

এইভাবে মনকে সান্ত্বনা দিয়া তৃপ্তি লাভের চেষ্টা করিতেছেন। এইবার নিউইয়র্কে মিসেস্ মুডির বাড়িতে এলমহার্স্ট নামে এক ইংরেজ যুবকের সহিত কবির পরিচয় হয়। এই আদর্শবাদী যুবক কবির প্রতি খুব আকৃষ্ট হন। এলমহার্স্টের এক আমেরিকান বান্ধবী ছিলেন ক্রোরপতির বিধবা ও ক্রোরপতির কন্যা; এলমহার্স্ট তাঁহার সহিত কবির পরিচয় করাইয়া দেন। মহিলাটি কবিকে বলেন Junior League[৩] ধনী তরুণীদের একটি ক্লাবের সভ্যদের সহিত তিনি কবিকে একদিন পরিচিত করিয়া দিবেন। প্রায় এক মাস কাটিয়া গেল এই ভরসায়, অবশেষে ক্লাবের অধিবেশনের দিন যাহা ঘটিল, তাহা যেমন হাস্যকর, তেমনই করুণ। কবি সামান্য কিছু বলার পর ভাবিয়াছিলেন আন্তর্জাতিক আদর্শবাদ লইয়া কথা উঠিবে। কিন্তু এক মহিলা মঞ্চে উঠিয়া 'হুভার ফান্ডে'র জন্য দীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। কবির কথা কাহারো মনে থাকিল না, হুভার ফান্ড লইয়া আলোচনা চলিল। হুভার (জ. ১৮৭৪) প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ছিলেন জাতীয় খাদ্য-সচিব, যুদ্ধান্তে হন য়ুরোপের খাদ্য-সরবরাহের ব্যবস্থাপক।[৪]

জুনিয়ার লীগের সভাধিবেশনের দিন অধ্যাপক উডস্ কবিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শান্তিনিকেতনের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের কোনো মত আছে কিনা। এই প্রশ্নেই কবি বুঝিতে পারিলেন যে এতদিন ধরিয়া তিনি আমেরিকার সহানুভূতি লাভের জন্য যেসব চেষ্টা করিয়াছেন তাহা কেন বাধাগ্রস্ত হইয়াছে। তাঁহার 'সার্' উপাধি ত্যাগের সংবাদ অতলান্তিক পার হইয়া এই তথাকথিত ডিমক্রেসির দেশের রাষ্ট্রনায়কগণকেও স্পর্শ করিয়াছে। কবি বুঝিলেন শান্তিনিকেতনে আন্তর্জাতিক বিদ্যায়তনের জন্য অর্থসন্ধান-চেষ্টা বৃথা।

নিউইয়র্ক ত্যাগ করিবার পূর্বে Poetry Society[৫] কবিকে অভিনন্দিত করিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর আমেরিকার যুবকদের মধ্যে 'ষোল-আনা আমেরিকান' হইবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়। এতদিন তাহারা ইংলন্ডের ইংরেজি সাহিত্যকেই তাহাদের আদর্শ বলিয়া মানিয়া আসিয়াছিল। মহাযুদ্ধের সময় তাহারা আপনাদের যে মহাশক্তি অনুভব করিয়াছিল, তাহার প্রেরণায় আজ সাহিত্য সম্বন্ধেও তাহারা আত্মচেতন হইয়া উঠিতেছে।

১ দ্র. হেলেন কেলার প্রসঙ্গ, আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৬০, চৈত্র ১৩।

২ *Letters from Abroad*, 25 January 1921 এই পত্রগুলি *Letters to a Friend*-এ নাই।

৩ Association of the Junior Leagues of America (1901) · Office of Waldorf, Astoria Hotel.

৪ হুভার (Hoover, Herbert Clerk) আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ১৯২৯-৩৩। কবি শেষবার ১৯৩০-এ যখন সে-দেশে যান, একদিন হুভারের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

৫ Poetry Society of America (1910), 217 East 5th Street, New York 17. N. Y. State POETRY নামে পত্রিকা ১৯১২ সালে শিকাগো হইতে প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলিবার পর, আমেরিকানরা তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছে তৎসম্বন্ধে তীব্রমত প্রকাশ করেন। তাঁহার নামের সহিত বিপ্লবী 'গদর' দলের নাম যোগ করিয়া যে সংবাদ রটিয়াছে, জারমান-ভক্ত বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে গোপনে যে প্রচারকার্য চলিয়াছে— তাহারই প্রতিবাদ সেদিন বাহির হইয়া পড়িল। আন্তর্জাতিকতার নামের অন্তরালে, কতকগুলি রাজনৈতিক অভীষ্ট সিদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি আমেরিকায় আসিয়াছেন—এই কথায় তিনি সর্বাপেক্ষা পীড়িত ও ক্ষুব্ধ। সভার বক্তৃতায় মনের ক্ষোভ প্রকাশ হইয়া পড়িল। রথীন্দ্রনাথ তাঁহার ডায়ারিতে লিখিয়াছেন যে তিনি যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল। 'This was the first time, I thought, he lost his dignity. I was moved to tears, it hurt me terribly. It seemed a tragedy to me.' আন্তর্জাতিক বিদ্যায়তনের জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টা এই জাতীয়তামোহমুগ্ধ দেশে এমনিভাবেই ব্যর্থ হইল।

নিউইয়র্ক হইতে শিকাগো ফিরিয়া (১ ফেব্রুয়ারি ১৯২১) কবি শ্রীমতী মুডির গৃহেই উঠিলেন ; পিয়ার্সন প্রায় দুই মাস পরে কবির সহিত মিলিত হইলেন। এইখানে কবির সহিত আমেরিকার বিখ্যাত সমাজ-সেবিকা শ্রীমতী জেন আডাম্স[১]-এর সাক্ষাৎ হয়। কবির আন্তর্জাতিক বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠাপরিকল্পনার কথা শুনিয়া তিনি সাতিশয় আনন্দপ্রকাশ করিলেন, কিন্তু তিনি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে বলিলেন যে আমেরিকায় বিশ্বমানবতার কোনো স্থান নাই। সকল জাতির, সকল মতামতের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা থাকার জন্য লোকে তাঁহাকে কখনো জারমান-ভক্ত, কখনো বল্‌শেভিক অপবাদে পুরস্কৃত করিয়াছে, অথচ গত ১৮৮৫ সাল হইতে তিনি জনসেবায় নিযুক্ত।

শিকাগোতে কবি জানিতে পারিলেন যে মেজর পন্‌ড দুই সপ্তাহের জন্য টেক্সাস স্টেটে বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অতঃপর কবি পনেরোটি দিন এক শহর হইতে অন্য শহরে ঘুরিলেন— প্রায়ই রাতটা কাটে ট্রেনের পুলম্যান-কারে দিন কাটে হোটেলে ও বক্তৃতামঞ্চে। "It is my tyrant *karma* which is dragging me from one hotel to another. Between my two hotel incarnations, I usually have my sleep in a Pulman car." টেক্সাসে কবি একটু আরাম অনুভব করিতেছেন. নিউইয়র্কের দুঃস্বপ্নময় জীবন ও ব্যর্থতার অপমান ভুলিতে চাহিতেছেন।

টেক্সাস হইতে শিকাগোতে ফিরিয়া দিন-পনেরো থাকিলেন ; তারপর নিউইয়র্ক হইয়া Rhyndam জাহাজে য়ুরোপ যাত্রা করিলেন (১৯ মার্চ ১৯২১)। মার্কিনমুলুকে এ যাত্রায় কবির চারি মাস একুশ দিন থাকা হয় ; ইহার মধ্যে অধিকাংশই কাটে নিউইয়র্কে।

এই চারি মাস বিশ্বভারতীর আদর্শপ্রচার বা প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টা একপ্রকার ব্যর্থ হইল বলিতে হইবে। মহাযুদ্ধে বিজয়ী মার্কিনদেশ এখন শক্তি সম্বন্ধে অত্যন্ত আত্মচেতন ; আজ পৃথিবীর রাজনীতি তথা অর্থনীতিকে নূতন পরিপ্রেক্ষিতে সে দেখিতেছে। ধনশক্তির সার্থকতা সম্বন্ধে সে যতই আজ নিশ্চিত, নীতিধর্ম বা আধ্যাত্মিক বল সম্বন্ধে ততই সে সন্দিহান ও শ্রদ্ধাহীন। কবি আমেরিকায় আসিবার পূর্বে কল্পনা করিতেছিলেন যে এবার সে-দেশ হইতে পাঁচ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করিবেন। হায় রে দুরাশা! শান্তিনিকেতনে তখন দারুণ

১ Jane Addams ১৮৬০-১৯৩৫ ; Hull Settlement স্থাপন করেন ১৮৮৫ অব্দে। ১৯৩১ সালে ইনি ও N. M. Butler শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পান।

অর্থাভাব। এনড্রুজ প্রাণপণে টাকা সংগ্রহের চেষ্টা করিয়া প্রয়োজন মিটাইতেছেন; কবিকে লিখিলেন, ব্যাঙ্কে পাঁচ মিলিয়ন ডলার কল্পনা করার চেয়ে আপাতত পাঁচ হাজার টাকা পাইলে তিনি বাঁচিয়া যান।[১]

কবি মার্কিনদেশের মনোভাব ভালো করিয়া বুঝিয়া লইয়াছেন। পাশ্চাত্য যন্ত্রসভ্যতার উপর কোনোপ্রকার ভরসাস্থাপন করিতে পারিতেছেন না। অপরদিকে ভারতবর্ষে রাজনীতি যে বর্জন নীতি গ্রহণ করিতেছে, তাহাকেও অন্তর হইতে অনুমোদন করা কঠিন। পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে যাহা সৃজনশীল, যাহা ভাবাত্মক— তাহার গ্রহণীয়তা সম্বন্ধে কবির মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, আবার গান্ধীজির আদর্শবাদের মধ্যে যে ত্যাগের দীপ্তি আছে, যে ঐকান্তিকতা আছে, সে সম্বন্ধেও মনে দ্বিধা নাই। কবির পক্ষে পাশ্চাত্য সর্বগ্রাসনীতি ও ভারতে গান্ধীজির সর্ববর্জন-নীতি মানিয়া লওয়া অসম্ভব। কবির এই নিদারুণ মানসিক সংগ্রামের চিত্র পাই তাঁহার পত্রধারায়। নানা জনকে নানা ভাবের পত্র দিতেছেন— কিন্তু অন্তরের রূপটি প্রকাশ পাইয়াছে এনড্রুজকে লিখিত পত্রধারার মধ্যে। আমরা পরে *Letters from Abroad* হইতে কবির মনোভূমির একটি চিত্র দিবার চেষ্টা করিব।

কবির মার্কিনমুলুক-সফর এবার ব্যর্থ হইয়াছে বলিতে হইবে; কেন এইরূপ হইল তাহার অতি সুন্দর বিশ্লেষণ করিয়াছেন আইরিশ কবি ও লেখক Padraic Colum (১৮৮১)। তিনি 'নেশন' (১৭ ডিসেম্বর ১৯২১) পত্রিকায় লেখেন: 'আমেরিকার খবরের কাগজ যে উদ্দেশ্যকে (cause) সুনজরে না দেখে তাহার বিষয় যদি কোনো য়ুরোপের বক্তা বক্তৃতা দেন তবে আমেরিকার জনসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করা তাহার পক্ষে অত্যন্ত দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথের আমেরিকার পূর্বপর্যটনের বিজয়গৌরব স্মৃতি এবারকার পুনরাগমনের উদ্দেশ্যকে সফলতা দান করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহার একমাত্র কারণ এই যে তিনি প্রকাশ্য সভায় না হউক কথাবার্তায় ভারতের স্বাধীনতালাভের সপক্ষে মত দিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া ইংরাজেরা হয়তো মনে করিবেন যে আমেরিকার মতো বন্ধু তাহাদের আর কেহ নাই। কিন্তু ইহা সত্য নহে। রবীন্দ্রনাথ যদি মুরদের স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল হইতেন তাহা হইলেও আমেরিকাবাসীর হৃদয় কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিতেন না। যাহা আছে তাহা বর্জন করিয়া নূতনের আমদানী করা আমেরিকানের ধাতে সহিবে না। তাহারা নিজে এক সময়ে বিদ্রোহী হইয়াছিল এবং সেই সময়কার বীরত্বের কাহিনী লইয়া আজিও তাহারা গৌরব অনুভব করিয়া থাকে; কিন্তু অন্যদেশের রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক বন্ধন মোচনের চেষ্টাকে ইহারা কখনোই সুনজরে দেখিতে চাহে না।'[২]

১ এনড্রুজ এই সময়ে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে কীভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন সে ইতিহাস এখানে অবান্তর হইবে; সংক্ষেপে বলিতে পারি এনড্রুজ না থাকিলে শিক্ষক ও ছাত্রদের দৈনন্দিন আহাযবস্তু সংগৃহীত হইত কিনা সন্দেহ, তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া টাকা আনিতেন। কবির পক্ষে য়ুরোমেরিকার সফরের অপরিমিত ব্যয় বহন করিয়া উদ্বৃত্ত দিবার মত কিছুই থাকিত না বলিয়াই মনে হয়।

২ শান্তিনিকেতন, ৩য় বর্ষ ১৩২৮ ফাল্গুন, পৃ. ২৭-২৮।

য়ুরোপে প্রত্যাবর্তন

আমেরিকা হইতে Rhyndam জাহাজ ২৪ মার্চ ১৯২১ ইংলন্ডে পৌঁছিল। পথে এবার প্রচণ্ড তুফান; তৎসত্ত্বেও সমুদ্রপীড়ায় কবি কাতর হন নাই, তবে সহযাত্রীদের দুর্ভোগের একটি সুন্দর বর্ণনা পাই একখানি পত্রমধ্যে। কবি লিখিতেছেন, 'প্রতি মুহূর্তে নানা প্রকার অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী অসহায়ভাবে করিতে হওয়ায় মানুষের পদমর্যাদা প্রতিপদে ক্ষুণ্ণ হইতেছিল। অতিকষ্টের মধ্যেও হাস্যকর ভঙ্গিমায় নিজেকে অপরের সম্মুখে প্রতিভাত করিতে বাধ্য হওয়ার মতো অপমানজনক আর কিছু নাই। বসিতে চলিতে খাইতে গিয়া ক্রমাগত লজ্জাজনক অসুবিধায় পড়িয়া আমাদের অপ্রত্যাশিত নানারূপ অঙ্গভঙ্গী করিতে হইতেছিল।'[১]

ইংলন্ডে আসিয়া কবি যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন। যে ইংলন্ডকে কয়েকমাস পূর্বে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহাকে আজ মন্দ লাগিতেছে না। লন্ডনে নেভিনসনের সহিত কথাবার্তা কহিয়া মন বেশ তৃপ্তি বোধ করিল; তিনি এনড্রুজকে লিখিতেছেন, 'ইংরেজ জাতির বিরুদ্ধে আমাদের নানা অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও, আপনাদের দেশকে ভাল না বাসিয়া আমি পারি না, কারণ সে-দেশ থেকে আমার কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু লাভ হইয়াছে।'[২]

ইংলন্ডে পৌঁছিবার পর প্রায় পক্ষকাল কাটিয়া গেল। একদিন লন্ডনের ভারতীয় ছাত্রদের হস্টেলে 'পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন' বিষয়ে একটি ভাষণ দান করেন। ইতিপূর্বে এই শ্রেণীর সমস্যামূলক বক্তৃতা কবি এদেশে করেন নাই। কবি বলিলেন যে, কয়েকমাস পূর্বে ফ্রান্সের যুদ্ধবিধ্বস্ত ভূখণ্ড দেখিয়া তাহার মনে হইয়াছিল যেন একটা প্রকাণ্ড দানবের পরুষস্পর্শে সমস্ত এখন বিশীর্ণ। পশ্চিমের সহিত পূর্বের সংযোগ ক্ষেত্রে এইরূপ একটা বিভীষিকাময় চিত্র দেখা যায়। পশ্চিম পূর্বদেশে কোনো রঙিন কল্পনা, কোনো আদর্শবাদের মোহ লইয়া উপস্থিত হয় নাই; যাহা সমবেদনা সৃষ্টি করে— সংযোগ সাধন করে— তাহা লইয়া সে আসে নাই। সে পূর্বদেশে আসিয়াছে রিপুর আক্রোশে, লোভের তাড়নায়। পশ্চিম প্রাচ্যে গুরুর ন্যায় আসিতে পারিত; কিন্তু সে আসিল প্রভুত্ব করিতে, ব্যক্তি ও জাতিকে দাসত্বে বন্ধন করিতে। সেই সাক্ষাৎকারকে সার্থক ও পরিপূর্ণ করিতে হইলে, মানুষের উচ্চতর আকাঙ্ক্ষা ও বৃত্তিনিচয়কে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে; সেই মহত্ত্বের পটভূমিতে মনুষ্যত্বকে সার্থক হইতে হইবে।[৩]

রবীন্দ্রনাথের এই বক্তৃতা শুনিয়া জনৈক ইংরেজ মহিলা তাঁহার নিকট এক প্রতিবাদ-পত্র প্রেরণ করিয়া বলেন যে, কবি অকারণে ব্রিটিশ জাতির উপর বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ মহিলার পত্রের জবাবে[৪] লেখেন যে, 'পৃথিবীর যে-সব দুর্বল জাতি শক্তিমান নেশনের নিষ্ঠুর শোষণনীতিবলে লাঞ্ছিত ও বসুন্ধরার স্বাচ্ছন্দ্য হইতে বঞ্চিত—

১ "Every moment the dignity of man is outraged by making him helplessly tumble about in a infinite variety of awkwardness. He is compelled to take part in a very broad farce; and nothing can be more humiliating for him than to exhibit a comic appearance in his very sufferings. While sitting, walking, taking meals, we are constantly being hurled about into unexpected postures, which are shamefully inconvenient."—*Letters From Abroad*, p. 101.

২ "With all our grievances against the English nation, I cannot help loving your country, which has given me some of my best friends."—Letters, 10 April 1921। আজ কবির মনে হইতেছে Englishmen are the best specimens of humanity.

৩ The Morning Post, London, 9 April 1921.

৪ দ্র, *Letters to a Friend*, London, 12 April 1921. p. 154। পত্রখানির অনুলিপি এনড্রুজকে পাঠাইয়াছেন।

আমি তাহাদের সকলের বেদনাই গভীরভাবে অনুভব করি— সে তাহারা পূর্বেরই হউক আর পশ্চিমেরই হউক। আমেরিকার যে হতভাগ্য নিগ্রো জীবন্ত দগ্ধ হয়— তাহার জন্যও আমার যেমন দুঃখ, তেমনই বেদনা পাই কোরিয়ানদের জন্য, যাহারা জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বলিস্বরূপ যূপবদ্ধ— ঠিক তেমনই কষ্ট পাই আমার দেশের অসহায় অগণিতের উপর যখন কোনো অন্যায় হয়।'

সপ্তাহ তিনেক লন্ডনে বাস করিয়া কবি এরোপ্লেন যোগে প্যারিসে গেলেন (১৬ এপ্রিল ১৯২১)। ইহাই কবির প্রথম বিমান-বিহার। প্যারিসে তাঁহারা কাহ্নের অতিথিশালায় পূর্বের ন্যায়ই উঠিলেন। এবার প্যারিসে বন্ধুদের মধ্যে সিলভ্যাঁ লেভি নাই; তিনি ফ্রান্সের নবাধিকৃত আল্‌সেসের রাজধানী স্ট্রাস্‌বুর্গে প্রাচ্যবিদ্যার অধ্যাপক হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। সুখের বিষয় অচিরেই নূতন বন্ধু লাভ হইল। ফরাসী ভাবুক রমঁ্যা রলঁ্যার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় হইল (১৯ এপ্রিল ১৯২১); ইতিপূর্বে দুই ভাবুকের মধ্যে পত্রবিনিময় হইয়াছিল। রলঁ্যা ইংরেজি জানেন না— সেইজন্য তাঁহার ভগিনী দোভাষীর কাজ করিলেন।[১]

এছাড়া এখানে কবির সহিত প্যাট্রিক গেডিসের সাক্ষাৎ হইল। গেডিস্[২] এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক কিছু আধুনিকতার প্রবর্তক তিনি। কবি গেডিসের মনস্বিতায় মুগ্ধ; অধ্যাপক কবির আদর্শতায় তেমনি আকৃষ্ট। কিছুকালের মধ্যে গেডিসের[৩] ভারতে যাইবার সম্ভাবনার কথা জানিতে পারিয়া কবি তাঁহাকে শান্তিনিকেতন পরিদর্শনের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। গেডিস কবির অনুরোধ রক্ষা করিয়া কয়েক মাস পরে আশ্রমে আসেন, তখনো কবি বিদেশ হইতে ফেরেন নাই।

প্যারিসে Museo Guimet অন্তর্গত প্রাচ্যবন্ধু সমিতির (Societe amis des orients) আহ্বানে কবি *Indian Folk Religion*-এর উপর বক্তৃতা করেন। আর একদিন কাহ্নের Comite national d'etudes sociales et politiques-এর উদ্যোগে *Public Spirit in India* নামে এক প্রবন্ধ পাঠ (২৫ এপ্রিল) করেন।[৪]

এবার প্যারিসে কবির সহিত শ্রীধর রাণা নামক এক ধনী ব্যক্তির পরিচয় হয়। বিংশ শতকের গোড়ায় তিনি য়ুরোপে আসেন তরুণ বয়সে। তখন তিনি ভারতের বিপ্লবীনেতা শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা ও মাদাম কামা-র সংস্পর্শে

১ Romain Rolland, Inde, Journal 1915-1943, p. 17। "19 avril 1921.— Visite de Rabindranath Tagore...avec son fils..."

২ Geddes, Sir Patric (1854-1932); Scottish biologist and sociologist. ভারতে Indore City Planning সম্বন্ধে বড়ো রিপোর্ট লেখেন। সার্ জগদীশচন্দ্র বসুর জীবনচরিতকার।

৩ লন্ডন হইতে কবি (বোধ হয়) মিস আমেলিয়া দেফ্রিসের অনুরোধে প্যাট্রিক গেডিসের সম্বন্ধে যে মন্তব্য লিখিয়াছিলেন, তাহা সাত বৎসর পর গ্রন্থমধ্যে ব্যবহৃত হয়। ইতিমধ্যে কবি উহার প্রতিলিপি এন্ড্রুজকে পাঠাইয়া দেন (৪ অগস্ট ১৯২০)—Letters, p. 8। কবি লিখিতেছেন: "What so strikingly attracked me in Patrick Geddes when I come to know him in India was not his scientific achievements, but, on the contrary, the rare fact of the fullness of his personality rising far above his science. Whatever subjects he has studied and mastered have become vitally one with his humanity: He has the precision of the scientist and the vision of the prophet; and at the same time, the power of the artist to make his ideas visible through the language of symbols. His love of man has given him insight to see the truth of man, and his imagination to realize in the world the infinite mystery of life and not merely its mechanical aspect." —*The Interpreter Geddes*; The man and his gospel by Amellia Defries. Foreword by Rabindranath Tagore. Preface by Lewis Mumford, Introduction by Israel Zangwill. London 1927.

৪ A discourse on the Public Spirit in India on 25 April 1921, under the presidentship Mm. Appelland Croiset. See for translation, *Servant* (a Calcutta Daily, now defunct) 19, 20, 22, 23, 24, 25 August 1921।

আসেন। প্রথমবারের বিপ্লবপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর শ্রীধর ব্যবসায়ে মন দেন ও বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হন, তাঁহার মৃতপুত্র রণজিত রাণার নাম করিয়া বিশ্বভারতীর জন্য তাঁহার গ্রন্থাগার দান করিলেন।

ইতিমধ্যে ভারতবন্ধু-সমাজও বিশ্বভারতীর জন্য অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল; এই কার্যে প্রধান সহায় হইলেন শ্রীকালিদাস নাগ— তখন তিনি প্যারিসে ডক্টরেট করিতেছেন। আমরা শান্তিনিকেতন গ্রন্থাগারে যে বিরাট ফরাসী গ্রন্থসংগ্রহ দেখি তাহার ক্রয় ও সংগ্রহ এই সময় শুরু হয়। ইহার সহিত কালিদাস নাগের অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা চিরদিনের জন্য যুক্ত থাকিল।

রবীন্দ্রনাথের কুতূহলী মন নানা জ্ঞান, নানা রস আহরণের জন্য সদাই উন্মুখ। য়ুরোপে কবি যখনই আসিয়াছেন, পাশ্চাত্য সংগীত শুনিবার ও অভিনয় দেখিবার সুযোগ পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। এই সময়ে প্যারিসে রিচার্ড বাগনার[১] (Wagnor)-এর বিখ্যাত নাট্য Valkyre অভিনীত হইতেছিল, কবি তাহা দেখিতে যান।

উৎকৃষ্ট কবিতা, সংগীত ও অভিনয় এই তিনের সমবায়ে যে কী অপরূপ আর্ট সৃষ্ট হইতে পারে রবীন্দ্রনাথ তাহা প্রত্যক্ষ করেন। পরযুগে কবি যে গীতোৎসব রচনা করেন, তাহার উপর কি ইহাদের প্রভাব পড়িয়াছিল! কোন্ রস, কোন্ সুর কীভাবে মনের অবচেতনে তলাইয়া যায় ও কীরূপে কখন তাহা রূপ গ্রহণ করে, সে রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবেন মনস্তাত্ত্বিক— ঐতিহাসিক নহে।

প্যারিস হইতে কবি সদলে চলিলেন স্ট্রাসবুর্গে (২৭ এপ্রিল ১৯২১)। স্ট্রাসবুর্গ আল্‌সেসের প্রধান নগর। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ফ্রান্স এই প্রদেশ ফিরিয়া পাইয়াছে। ফ্রাংকো-প্রুশিয়ান যুদ্ধে ফ্রান্স পরাভূত হইয়া এই প্রদেশ জারমেনিকে ছাড়িয়া দেয়; প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পর জারমেনিকে পরাভূত করিয়া ফ্রান্স পুনরায় ঐ স্থানের মালিক হইয়াছে। ফরাসীরা এখন সমস্ত প্রদেশকে ফরাসীকরণে ব্যস্ত। স্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় এখন ফরাসী সংস্কৃতির কেন্দ্র। এইখানে সিলভ্যাঁ লেভি অধ্যাপক হইয়া আসিয়াছেন। ইঁহারই উৎসাহে ও ব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি একদিন সভায় The Message of the Forest পাঠ করেন।

ছাত্রদের নিকট রবীন্দ্রনাথকে পরিচিত করিতে উঠিয়া অধ্যাপক লেভি বলিলেন: 'The University of Strassbourg do render homage not only to a poet of genius, and a genius marking the millennium of a great nation, the French University of Strassbourg entertains a sister University of India.'[২]।

অধ্যাপক লেভির উদার দৃষ্টি ও জ্ঞানগভীর মনের স্পর্শ পাইয়া কবি ভাবিতেছেন যে, তাঁহাকে বিশ্বভারতীতে প্রথম Visiting Professor রূপে আনিবেন।

বিশ্বভারতীকে পাবলিক প্রতিষ্ঠান রূপে উৎসর্গ করিবার সংকল্প গ্রহণ করিবার পর হইতে কবি উহার ভাবী বাস্তব রূপের কল্পনা মাঝে মাঝে করেন। এক পত্রে এনড্রুজকে লিখিতেছেন যে, সুবিধার জন্য তাঁহার কল্পিত

১ Richard Wagner (1813-83); জারমান সঙ্গীতকার, কবি ও সাহিত্য-সমালোচক। জারমান Nibelungen lied পুরাণ কাহিনী অবলম্বনে রচিত একটি নাট্যগীতির অন্যতম Valkyre। ফালকাঁরিবা উত্তর-য়ুরোপের পুরাণমতে রণচণ্ডী। ১৮৭৬-এ Bayreuth-এ এই তিনটি গীতিনাট্য অভিনীত হয়। ইহার সম্বন্ধে Saintsbury বলিয়াছেন: "The re-knitting of the connection of Apollo's two arts—*poetry and music*—so long severed from each other by nothing so much as by the frivolity and mindlessness of the older opera itself, is a phenomena in the history of literature far too important to escape notice here."—Quoted in Magnus, Dict. of European Literature. p. 574।

২ The Modern Review, July 1921, p. 96.

বিদ্যায়তনকে ইংরেজি International University আখ্যা দেওয়া হইতেছে; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় বা University শব্দের মধ্যে সাধারণের এমন কতকগুলি সংস্কারগত ধারণা আছে, যাহার সহিত তাঁহার কল্পিত বিদ্যায়তনের.আদর্শকে যথাযথভাবে খাপ খাওয়ানো সম্ভব নাও হইতে পারে; ইহাকে কোনো সংজ্ঞা দ্বারা পরিস্ফুট করা যাইবে না, আপনার জীবনের সাধনার মধ্যে উপলব্ধি করিতে হইবে। কবি এই দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়কে সরকারী শিক্ষাবিভাগের কবল হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন; এই আশ্রম-বিদ্যালয়কে তাহার অন্তর্নিহিত গতিবেগে চলিতে দিয়াছেন। তাঁহার আশঙ্কা, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তিনি কখনো কোনো পরিচালক-মণ্ডলীর সহিত কাজ করিতে পারিবেন না (very likely I shall never be able to work with a Board of Trustees.)[১]। কিন্তু কয়েকমাস পরেই সেই ট্রাস্টি, কমিটি সবই করিতে হইল; যথাস্থানে সে কথা আসিবে।

স্ট্রাসবুর্গ হইতে কবি যান জেনিভা (৩০ এপ্রিল ১৯২১); জেনিভা এখন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান 'লীগ অব নেশনসে'র কেন্দ্র— ১৯২০ মে ১৫ তারিখে এইখানে তার অপিসের পত্তন হয়। জেনিভাতে কবি যেখানে আশ্রয় পাইয়াছেন, স্থানটি নিরালা, তাই মন বেশ প্রসন্ন। এখানে যে কয়জন মনীষীর সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাঁহাদের মধ্যে Claparde-এর নাম শিক্ষাবিজ্ঞান-ক্ষেত্রে সুপরিচিত। তাঁহার উদ্যোগে রুশো ইনিস্টিটিউটে কবি শিক্ষা সম্বন্ধে এক ভাষণ দান করেন।

জেনিভাতে কবির জন্মদিন (৬ মে ১৯২১) পড়িল; এনড্রুজকে লিখিতেছেন (*Letters from Abroad*, p. 118) যে, আজ তাঁহার জন্মদিন, কিন্তু তিনি কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছেন না। "আজকার দিন যথার্থভাবে আমার জন্য নহে; যাহারা আমাকে ভালোবাসে তাহাদেরই আনন্দের দিন। তোমাদের কাছ হইতে দূরে আজকার এই দিন আমার কাছে পঞ্জিকার তারিখ মাত্র; আজ একটু নিরালা থাকিতে ইচ্ছা করিতেছে, কিন্তু তাহা হইবার উপায় নাই। সারাদিন অতিথি-অভ্যাগতের ভিড়, নিরন্তর কথোপকথনের পালা; এইসব আলোচনার মধ্যে রাজনীতি আসিয়া পড়িলে আমার মনের স্বস্তি নষ্ট করিয়া দেয়— সেজন্য অত্যন্ত পরিতপ্ত। রাজনীতিচর্চা আমার স্বভাবধর্মের বিরুদ্ধ। অথচ এমন দুর্ভাগা দেশে জন্ম যে, রাজনীতির উত্তেজনা হইতে আপনাকে দূরে রাখা অত্যন্ত কঠিন।·· পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ দুঃখক্লিষ্ট; সেজন্য আমার মন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত। কিন্তু ক্রুদ্ধ হৃদয়ে তীব্র আক্রোশ প্রকাশ করিয়া কী হইবে? সত্যের মহাশান্তির জন্য প্রার্থনা করিতেছি।

"পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, কিন্তু আজ চারিদিকে বিভীষিকাময় রাজনীতি ছাড়া কিছুই আর দৃষ্টিগোচর হয় না। এই সাক্ষাৎকার পূর্ব ও পশ্চিমের উভয়ের পক্ষেই প্রচণ্ড বোঝার মতো হইয়াছে।

"এই মিলনের মধ্যে মহাভবিষ্যতের বীজ সুপ্ত— এই কথা যখন অন্তরে অনুভব করি, তখন প্রত্যক্ষ বর্তমানের মর্মন্তুদ মনোবিকার হইতে নিরাসক্ত মনকে ফিরাইয়া পাই। আমরা ভারতীয় আত্মিক সাধনা হইতে এইটি জানিতে পারিয়াছি যে দ্বৈতের মধ্যেই অদ্বৈতম্ প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব ও পশ্চিমের দ্বৈতভাবের মধ্যেও এই ঐক্য, এই অদ্বৈতম্ রহিয়াছে সুতরাং পরস্পরের মিলনে উভয়েই একদা সার্থক হইবে।" হায় রে, আশাবাদী কবির স্বপ্ন!

জন্মদিনে জীবনের মহৎ ভাবনার কথা ধ্যান করিতেছেন বটে, কিন্তু ভারতের রাজনীতির কথা মন হইতে মুছিতে পারিতেছেন না কিছুতেই। ভারতের অসহযোগ আন্দোলনের নীতিকে মনেপ্রাণে সমর্থন করিতে পারিতেছেন না;

১ *Letters to a Friend*, p. 158-159; *Letters from Abroad*-এ ঐ দিনের পত্রের ভাষা অন্যরূপ। একস্থানে আছে— There was a proposal made by some friend of mine in England to form a Board of Trustees to help me in my work in Visvabharati. But it is needless to assure you that I am not going to allow my institution to be tied to the tow-boat of any official body. (p. 111)।

তার পর যখন জানিতে পারেন যে রাজনীতির উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ শান্তিনিকেতনের শান্তমকেও ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছে, তখন মন অবসন্ন হইয়া পড়ে। এ কথা পরে আসিবে।

জেনিভা হইতে কবি সপরিবারে লুসার্ন-এ আসিলেন। লুসার্নের প্রাকৃতিক দৃশ্য কবির মন হরণ করিল; লুসার্ন মধ্যযুগের নগর; বহু অট্টালিকা, চার্চ শোভিত; এখানকার পর্বতগাত্রে ক্ষোদিত সিংহমূর্তি বিখ্যাত। লুসার্ন হ্রদে মোটর-বোটে ভ্রমণ খুবই ভালো লাগিল। এই লুসার্ন বাসকালে কবি সংবাদ পাইলেন যে জারমেনিতে তাঁহার জন্মদিন-স্মরণে একটি বিদ্বজ্জন-সমাজ বিশ্বভারতীর জন্য জারমান ভাষার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহ সংগ্রহ করিয়া উপহার পাঠাইতেছেন। এই সংঘের মধ্যে ছিলেন জারমেনির প্রথিতনামা অনেক সাহিত্যিক দার্শনিক লেখক।[১] ইহার মূলে ছিলেন হাইনরিখ মিয়ার-বেনফী, রবীন্দ্রনাথের জারমান জীবনচরিতকার ও তাঁহার গ্রন্থ-প্রকাশক কুর্ট-উল্ফ।

কবি এই অভাবনীয় সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত প্রীত; তাঁহার জারমান বন্ধুদের উদ্দেশ্যে তিনি লিখিলেন: "আমার এক-ষষ্ঠিতম জন্মদিনে জারমেনি হইতে আমাকে আপনারা যে সহৃদয় অভিনন্দন ও উপহার প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা আমাকে অভিভূত করিয়াছে। আমি অন্তরের সঙ্গে অনুভব করিতেছি যে আপনাদের দেশের লোকের অন্তরের মধ্যে আমার নবজন্ম লাভ হইয়াছে, কারণ তাঁহারা আমাকে আত্মীয়ের ন্যায়ই গ্রহণ করিয়াছেন।

"পৃথিবীতে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা জারমেনি ভারতের সহিত পশ্চিমের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক যোগাযোগের পথ প্রশস্ত করিতে অধিকতর সহায়তা করিয়াছে এবং প্রাচ্য এক কবিকে জারমেনি যে প্রেমপূর্ণ শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছে, তাহাতে উভয় দেশের সম্বন্ধকে নিবিড়তর করিয়া তুলিবে।

"আমি আপনাদিগকে নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি যে ভারতের কবিকে যে আন্তরিক অভিনন্দন জারমেনি জানাইয়াছে, তাহার জন্য সমগ্র ভারতবাসী কৃতজ্ঞতা জানাইতেছে আমার এই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ভিতর দিয়া।"[২]

বাসল জারমান-সুইসদের শহর; এখানে কবিকে একদিন বক্তৃতা দিতে হয়। ১১ই মে ৎসুরিক (Zurich) বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন ও হোটেলে তাঁহার রচনাবলী হইতে পাঠ ও আবৃত্তি করেন।

অতঃপর সুইসদেশ ত্যাগ করিয়া কবি জারমেনির ডার্মস্টাটে একদিন কাউন্ট কাইসারলিঙের অতিথিরূপে থাকিয়া হামবুর্গ চলিয়া গেলেন। হামবুর্গ উত্তর-জারমেনির বিশিষ্ট নগর ও বন্দর। এইখানে কবি সাত দিন ছিলেন (১৩ - ২০ মে ১৯২১) শেসদিনে য়ুনিভার্সিটিতে তাঁহার বক্তৃতা হয়। জারমেনিতে এই তাঁহার প্রথম ভাষণ।

১ হাউপটমান, য়াকোবি, কাইসারলিঙ, বেরনস্টফ প্রভৃতি।

২ "The generous greeting and the gift that have come to me from Germany on the occasion of my sixtyfirst birthday are overwhelming in their significance for myself. I truly feel that I have had my second birth in the heart of the people of that country, who have accepted me as their own.

"Germany has done more than any other countries in the world for opening up and broadening the channel of the intellectual and spiritual communication of the West with India, and the homage of love, which she freely has given today to a poet of the East, will surely impart to their relationship the depth of an intimate and personal character.

"Therefore I assure you that my message of gratitude which goes out to my friends in Germany carries in it India's grateful appreciation of this hospitality of heart offered to her in the person of her poet."—Modern Review, September 1921, p. 376

Basle হইতে এনড্রুজকে এই দান সম্বন্ধে লিখিতেছেন বাহ্যত যাহারা আমাদের হইতে এত বিভিন্ন, তাহারা আমাদের কত নিকট-আত্মীয়, তাহা এই উপহারের দ্বারা আমি অনুভব করিলাম। "It has helped me to feel how near we are to the people who in all appearance are so different from ourselves."—Letters, 10 May 1921।

ইতিমধ্যে ডেনমার্ক হইতে কবির নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল। ২১ মে কবি কোপেনহাগেনে পৌঁছিয়া দেখেন বিরাট জনতা তাঁহার অপেক্ষায় স্টেশনে উপস্থিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার (২৩ মে) পর ছাত্ররা মশাল জ্বালাইয়া শোভাযাত্রা সহকারে কবিকে তাঁহার হোটেলে পৌঁছাইয়া দিল। তার পর হোটেলের সম্মুখে ছাত্ররা ডানিশ জাতীয়-সংগীত গাহিয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত উৎসব ও হল্লা করিয়া গৃহে গেল। বাঙালি কবির নিকট হইতে য়ুরোপ কী পাইয়াছে যে তাঁহাকে তাহারা এমনভাবে অভিনন্দিত করিতেছে? বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত দর্শনশাস্ত্রী হেফডিং-এর (Hoffding, 1843-1931) সহিত কবির পরিচয় ও কথাবার্তা হয়।

কোপেনহাগেন হইতে কবি সদলে সুইডেনের রাজধানী স্টক্‌হল্‌মে আসিলেন (২৪ মে ১৯২১)। স্টেশনে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সুইডিশ আকাদেমির সম্পাদক Dr. Erik Axel Karfeldt ও একদল সাহিত্যিক উপস্থিত, বাহিরে বিরাট জনতা!

রবীন্দ্রনাথ এখানকার সুইডিশ আকাদেমির নিকট হইতে ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন। আকাদেমির নিয়মানুসারে পুরস্কারের মানপত্র ব্রিটিশ রাজদূত মারফত ভারতে প্রেরিত হয় ও তদানীন্তন বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল বিশেষ দরবার আহ্বান করিয়া উহা কবির হস্তে সমর্পণ করেন। সাত বৎসর পর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবার প্রথম সুযোগেই সুইডেনে উপস্থিত হইলেন। সুইডিশ আকাদেমিতে কবির ভাষণের কথা স্মরণ করিয়া Sven Hedin, *The Golden Book of Tagore*-এর জন্য (পৃ. ১০৬) 'To my dear friend Rabindranath Tagore'-কে এক পত্র লেখেন; তাহাতে আছে— '...You came to Stockholm to deliver the public lecture that every receiver of Nobel Prize has to give. Our Academy at that occasion gave a dinner in your honour. Several Swedes of fame were present. The Secretary of the Academy, Dr. Erik Axel Karlfeldt, held the great speech to you. Our Archbishop Dr. Nathan Söderblom of Upsala also made a beautiful speech. Amongst those present were also the great historian Professor Harald Hjarne of Upsala and the famous archaeologist Dr. Oscar Montelius. All those four members of the Academy are dead now...I remember your speech...you mentioned my expeditions in Asia in the kindest and most encouraging words.'

রবীন্দ্রনাথ যখন স্টক্‌হল্‌মে পৌঁছিলেন তখন মহানগরীতে লোকউৎসব (folk festival) চলিতেছে। এখানে লোক-শিল্প ও কলার শ্রেষ্ঠনিদর্শন সংগ্রহের জন্য একটি ম্যুজিয়ম আছে, তাহার প্রাঙ্গণে লোকনৃত্যের আয়োজন হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথকে উদ্যোক্তারা সেখানে লইয়া যান। এইভাবে কবি সুদূর উত্তর য়ুরোপের স্কন্দানেভিয়ান লোকসংস্কৃতির শ্রেষ্ঠনিদর্শন দেখিবার সুযোগ পাইলেন।

সুইডিশ আকাদেমির নিয়মানুসারে নোবেল পুরস্কার প্রাপকরূপে কবিকে একদিন আকাদেমিতে বক্তৃতা করিতে হইল। সভাশেষে উপসালার আর্চবিশপ বলিলেন, 'সাহিত্যের জন্য নোবেল প্রাইজ তাঁহাকেই প্রদত্ত হয়, যিনি একাধারে শিল্পী ও দ্রষ্টা। এই উভয় গুণের সমাবেশ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যেমনভাবে হইয়াছে, তাহা আর কাহারও মধ্যে দেখা যায় নাই।'[১]

১ "The Nobel Prize for literature is intended for the writer who combines in himself the artist and the prophet. None has fulfilled these conditions better than Rabindranath Tagore."—Modern Review, September 1921, p. 877

সুইডেনের অন্যতম বিখ্যাত শহর উপসালা (Upsala)[১] হইতে কবির নিমন্ত্রণ আসিল; তথাকার আর্চবিশপ ক্যাথিড্রালে কবির বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন ও বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া তথায় তাঁহাকে লইয়া যান। অখ্রীষ্টান এশিয়ানকে খ্রীষ্টান য়ুরোপ যে সম্মান দান করিল, তাহা সত্যই অভাবনীয়; রবীন্দ্রনাথও বিস্মিত। তিনি লিখিতেছেন: 'পশ্চিমদেশের হৃদয়ে আজ উচ্ছল জোয়ার আসিয়া উহাকে পূবসাগরের তীরের দিকে কী এক রহস্যময় আকর্ষণে টানিয়া আনিতেছে। য়ুরোপীয় জাতির সীমাহীন অহংকার আজ বাধা পাইয়াছে এবং এতদিন যে ধারায় সে চলিয়া আসিয়াছে, তাহা হইতে তাহার মন ফিরিতেছে'। ইতিমধ্যে একদিন Volksbingen নাট্যশালায় 'ডাকঘরে'র সুইডিশ তর্জমার যে অভিনয় হয়, তাহাও কবি দেখিতে গিয়াছিলেন। উত্তর ও মধ্য য়ুরোপে 'ডাকঘর' এই সময় অত্যন্ত সমাদর লাভ করিয়াছিল। সুইডেন ত্যাগ করিবার পূর্বে তথাকার রাজার[২] সহিত ও লীগ অব্ নেশনসের সভাপতি ডাঃ ব্র্যান্টিং[৩]-এর সহিত পরিচিত হন।

কবির পরবর্তী গম্যস্থান বার্লিন; কথা হয় এরোপ্লেনে যাবেন, এই সংবাদ পাইয়া বিখ্যাত পরিব্রাজক পণ্ডিত সোয়েন হেডিন (Hedin, 1865) অত্যন্ত বিচলিত হন ও প্রস্তাবটি নাকচ করিয়া দিয়া বলেন রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মহামানবের জীবন সুইডিশ পাইলটের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না।

বার্লিনে (২৯ মে) কবি অতিথি হইলেন হুগো স্টিনেসের[৪]; স্টিনেস জারমেনির অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনকুবের শিল্পপতি। স্টিনেস দক্ষিণ জারমেনি হইতে চলিয়া আসিলেন কবির সহিত সাক্ষাতের জন্য।

কয়েকদিন পর (২ জুন) বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে কবির বক্তৃতা। সেই বক্তৃতার দৃশ্য একটা ইতিহাস হইয়া রহিয়াছে। কবিকে দেখিবার জন্য প্রায় পনেরো হাজার লোক রাস্তায় ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া। সভাগৃহে এরূপ জনতা ইতিপূর্বে কেহ দেখে নাই। সমসাময়িক পত্রিকায় লিখিতেছে: 'রবীন্দ্রনাথের একটি বক্তৃতায় উন্মত্ত জনতার বীরপূজার অপূর্ব দৃশ্য দেখা গেল। বসিবার স্থান অধিকার জন্য ভিড়ের চাপে অনেক মেয়ে অজ্ঞান হইয়া যায়। শেষ মুহূর্তে পুলিশ আসিয়া শৃঙ্খলা ফিরিয়া আনে।'[৫]

সেইদিন সন্ধ্যায় বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবীভাষার অধ্যাপক ও জারমেনির শিক্ষাসচিব ডক্টর বেকের[৬] (Becker) কবির জন্য একটি banquet-এর ব্যবস্থা করেন, সেখানে বার্লিনের বহু গণ্যমান্য লোক ও গুণী-জ্ঞানী অধ্যাপক উপস্থিত হইয়াছিলেন।

পরদিন (৩ জুন) কবিকে য়ুনিভার্সিটিতে পুনরায় বক্তৃতা করিতে হইল; কারণ প্রথম দিন বহু লোক প্রধানত কবিকে দর্শন ও দ্বিতীয়ত কবির ভাষণ শ্রবণ করিতে পারে নাই। সেইদিন অপরাহ্ণে ভারতীয় ছাত্ররা কবির জন্য

১ উপসালা (Uppsala, Upsala) স্টক্‌হল্‌ম্ হইতে ৪০ মাইল। সুইডেনের আর্চবিশপের স্থান; এখানে ১৪৭৭ অব্দে আর্চবিশপ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। স্থানীয় ক্যাথিড্রাল ১৩ শতকে নির্মিত হয়।

২ সুইডেনের রাজা ৫ম গুসতাভাস (১৯০৭)।

৩ লীগ অব নেশনের সভাপতি— ডাঃ ব্রান্টিং Karl Hjalmu Branting (1860-1925) সুইডেনের সমাজতন্ত্রী নেতা। ১৯২১ সালে শান্তিবাদের জন্য নোবেল প্রাইজ পান (ক্রিস্টিয়ান Lange-এর সহিত)। ১৯২০ হইতে প্রধানমন্ত্রী।

৪ Stinnes, Hugo (১৮৭০-১৯২৪), জারমান শিল্পপতি পরিবারে জন্ম। বহু কারবার ও কোম্পানীর মালিক। প্রথম মহাযুদ্ধপর্বে জারমেনির শিল্পজাত সামগ্রী প্রস্তুত করিবার অধিকর্তা। ১৯২০-২৪ রাইখস্টাগের সদস্য।

৫ "Scenes of frenzied hero-worship marked a public lecture given by Rabindranath Tagore. In the rush for seats many girls fainted. In the last moment the police came and restored order."

৬ বেকের (Carl Heinrich Becker, ১৮৭৬-১৯৩৩) জারমান ঐতিহাসিক। ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে পণ্ডিত ও গ্রন্থকার।

একটি পার্টির ব্যবস্থা করেন ও রাত্রে ওয়ালটার রাথেনাউ[১] কবিকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করেন। Walter Rathenau সে-সময়কার একজন চিন্তাশীল অর্থনীতিজ্ঞ ও বিশিষ্ট শিল্পস্রষ্টা; আর্থিক পুনর্গঠন সম্বন্ধে বহু গ্রন্থের রচয়িতা রূপে তখন তাঁহার মহা খ্যাতি।

বার্লিনের আকাদেমি (প্রুশিয়ান আকাদেমি)[২] ও গ্রন্থাগার পৃথিবীখ্যাত: এখানে আধুনিকযুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের কণ্ঠস্বরের রেকর্ড ও হস্তলিপির নমুনা সযত্নে রক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথের Message of the Forest-এর শেষাংশ ও 'মোর বীণা উঠে কোন্ সুরে বাজি' এই বাংলা গানটির রেকর্ড তুলিয়া তাহা চিরকালের জন্য রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইল।[৩]

বার্লিন হইতে কবি গেলেন ম্যুনিকে (৫ জুন); ম্যুনিক বেভেরিয়ার রাজধানী, প্রাচীন জারমেনির শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। এইখানে কবির গ্রন্থের জারমান প্রকাশক কুরট্ উলফ (Kurt Wolf)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল; ইঁহার বাসায় জারমেনির অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক ও ভাবুক **টমাস মান** (Thomas Mann)[৪] ও অন্যান্য সাহিত্যিকদের সহিত পরিচয় ঘটে। ম্যুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কবির যে বক্তৃতা হয় (৭ জুন), তাহাতে টিকিট বিক্রয় করিয়া প্রায় দশ হাজার মার্ক ওঠে; কবি ঐ টাকা গ্রহণ না করিয়া যুদ্ধোত্তর ক্ষুধাক্লিষ্ট জারমান শিশুদের জন্য দান করিয়া দেন। বিনিময়ে মার্কের মূল্যমান এমনই হ্রাস পাইয়াছে যে ভারতে ঐ মার্ক আনিলে, তাহার ভারতীয় মৌদ্রিক মূল্য হইবে কয়েকটি টাকা মাত্র।

কবির নিমন্ত্রণ আসিতেছে নানা স্থান হইতে। কিন্তু নিরন্তর ঘোরাঘুরিতে শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হওয়ায় অধিকাংশ স্থানের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু হেসের (Hesse) প্রাক্তন গ্রান্ড ডিউকের নিমন্ত্রণ এড়াইতে পারিলেন না, ডিউক স্বয়ং কবিকে স্বাগত করিতে আসিয়াছিলেন; তিনি তাঁহাকে তাঁহার পুরাতন রাজধানী Darmstadt লইয়া গেলেন। শহরটি ওডেনবাল্ড শৈলতলে অবস্থিত, ফ্রাংকফুর্ট হইতে ষোল মাইল দূরে। এই ডার্মস্টাট শহরে কাউন্ট কাইসারলিঙের[৫] জ্ঞানমন্দির (Schule der Weisheit) ১৯২০ সালে স্থাপিত হইয়াছে। হেসের ডিউক আজ যুদ্ধান্তে হৃতসর্বস্ব; তিনি এখন আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে মন দিয়াছেন; কাইসারলিঙের তিনি একজন বড় শিষ্য।

কাইসারলিঙ যখন ১৯১১ সালে ভারতে আসেন, তখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়; তাঁহার *Travel Diary*-তে তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করেন তাহা পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে; কাইসারলিঙ তাঁহার

১ রাথেনাউ (Walter Rathenau, ১৮৬৭-১৯২২) জারমেনির ইহুদীবংশীয় শিল্পপতি। ১৯২১ সালে রাইখের অন্যতম মন্ত্রী। ১৯২২ সালের ২৪শে জুন রাজনৈতিক আততায়ীর হস্তে নিহত হন।

২ প্রুশিয়ান আকাদেমি (Preussische Akademie der Wissenschaften) ১৭০০ অব্দে স্থাপিত।

৩ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বার্লিন বোমা-বিধ্বস্ত হইলে, মুজিয়ামের অনেক কিছু ধ্বংস হয়। রবীন্দ্রনাথের রেকর্ডগুলি ভাঙিয়া যায়। যুদ্ধান্তে পুনর্গঠনকালে এই ভাঙা রেকর্ডগুলি মেরামতি করা হয়। এইগুলির কপি রবীন্দ্রসদনে জারমেনি হইতে পাঠাইয়াছে।

৪ টমাস মান (Thomas Mann, ১৮৭৫-১৯৫৫) জারমান সাহিত্যিক। ১৯৩৩ হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। বহু গ্রন্থের লেখক।

৫ Keyserling, Hermann Alexander (1880-1946); German social philosopher and writer of many books; lived in Paris and England (1903-05); Berlin (1906-07) and on his estate in Esthonia since 1908. Travelled, visited India (1911); acquired admiration for oriental, specially Indian, philosophy; he was deprived of his fortune and estates by Russian revolution of 1917. Settled in Darmstadt; Capital of Hesse, republic since 1918; formed the "School of Wisdom" in Darmstadt 1920; Travelled again.

সেই তরুণ বয়সে রবীন্দ্রপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য কী আশ্চর্যভাবে ধরিতে পারিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে বিস্ময় লাগে; কারণ তাঁহার পূর্বে কোনো য়ুরোপীয় লেখক কবি সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

প্রথম দর্শনের দশ বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথকে কাউন্ট কী চোখে দেখিতেছেন, তাহা তাঁহার সমসাময়িক রচনা হইতে প্রকট হইতেছে। তিনি লিখিতেছেন:

'জ্ঞানের ঈশ্বর গণেশকে আমার ভক্তি নিবেদন করি— ওঁ। সূর্যাস্তের দেশে ধর্মনগর নামে জনপদ আছে। রবীন্দ্রের এক ক্ষত্রিয়বন্ধু সেখানে বাস করেন। তিনি সেখানে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার নিকট রবীন্দ্র আসিলেন। সূর্যাস্তের দেশের রীতি অনুসারে রাজকীয় গৌরবময় আলোকময় জীবন সম্বন্ধে যা কিছু ক্ষত্রিয়রাজ শিক্ষা দিয়াছিলেন, তার সমগ্র জীবন্ত অবিনশ্বর প্রতিমূর্তি দেখিল পশ্চিমবাসীরা— প্রাচ্যের এক কবির মধ্যে। সেই নগরীর উদারচেতা ডিউক তাঁহার প্রাসাদে এই কবিকে রাখিলেন এবং তাঁহার উদ্যানের সকল দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন যাহাতে প্রাচ্য-সূর্যালোক দেখিতে কেহই বাধা না পায়।'[১]

ডার্মস্টাটে কবি ছিলেন এক সপ্তাহ (৯-১৪ জুন ১৯২১)। ইহাকে বলা হইয়াছিল Tagore Woche[২] অর্থাৎ ঠাকুর-সপ্তাহ। প্রাতে ও অপরাহ্ণে সভা বসিত। পূর্ব হইতে চারিদিকে বিজ্ঞাপিত হয় যে ভারতীয় কবি আসিতেছেন, তিনি সর্বশ্রেণীর লোকের সহিত মিলিত হইবেন। এই প্রচারপত্রের ফলে প্রতিদিন সহস্র সহস্র লোক রবীন্দ্রনাথকে দেখিতে আসে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রশ্ন লিখিয়া কবিকে পাঠাইত। কবি তাহার উত্তর দেন ইংরেজিতে, কাইসারলিঙ জারমান ভাষায় তাহা বুঝাইয়া বলেন। কবির উপদেশাবলী প্রতিদিন জারমান ভাষায় মুদ্রিত হইয়াও প্রচারিত হয়। ভাষার এই ব্যবধান সত্ত্বেও সহস্র সহস্র নরনারী কেন যে ডার্মস্টাটের মুক্ত প্রাঙ্গণে সমবেত হইত তাহার রহস্য উদ্‌ঘাটন করা কঠিন। ডার্মস্টাটের একদিনের প্রশ্নের নমুনা দিতেছি— 'বৈজ্ঞানিক সভ্যতার পরিণাম কী', 'জনাধিক্যের সমস্যা কিভাবে সমাধান হইতে পারে', 'বৌদ্ধধর্মের মোট কথা কি'। এই প্রশ্ন কয়টির উত্তর দিতে কবির প্রায় তিন ঘণ্টা লাগে। য়ুরোপীয় মনের ব্যাকুলতা, প্রশ্নের ব্যাপকতা প্রভৃতি দেখিয়া কবির মন খুবই পুলকিত। সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের কথা মনে পড়িতেছে। সেখানে ইংরেজ অধ্যাপকগণ ভাবের ক্ষেত্রে ছাত্রদের মনকে উদ্‌বুদ্ধ করিতে পারেন না, এইটাই কবির অভিযোগ। ইহার উপর 'প্রত্যেক দেশেই রাজনীতি ধর্মনীতির আদর্শ নামাইয়া দিয়া মিথ্যা বঞ্চনার প্রশ্রয় দিয়াছে এবং জাতীয় দণ্ডের মাত্রা অতিরিক্ত বাড়াইয়া তুলিয়াছে'।[৩]

Tagore Woche বা ঠাকুর-সপ্তাহের একদিন, কবি ডিউকপরিবারের সম্মুখে Message of the Forest প্রবন্ধটি পাঠ করেন। অপর একদিন (১২ জুন) ডিউক কবিকে একটি সাধারণ-লোকের উৎসবক্ষেত্রে লইয়া গেলেন। এ ঘটনাটি

১ 'Om! Our adoration to the holy Ganesha, the God of wisdom... In the land of the sinking sun there is a town, Dharmanagara by name. And in it there lives a friend of Rabindra, a Kshatriya. He has built a school and to him he came. And whatever his friend the Kshatriya had taught, according to the fashion of the land of the sinking sun, of kingly life, of light fulfilling existence, it appeared now in person among the men of the West, a living symbol of the eternal. One personified by the man from the East. But the generous Duke of the land offered him the palace and opened wide all the gates of the royal park in order not to prevent any one from seeing the light of the Eastern Sun.— Der weg zur Vollendung (The Path of Perfection), quoted from Aranson's *Rabindranath through Western Eyes*, p. 66।

২ Tagore Week বা রবীন্দ্রসপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয় সর্বপ্রথম জারমানিতে; এখন ভারতে অনেকস্থানে রবীন্দ্রসপ্তাহ রবীন্দ্রপক্ষ প্রতিপালিত হইতেছে।

৩ 'Politics in every country has lowered the standard of morality, has given rise to a perpetual contest of lies and deceptions, cruelties, hypocrisies and has increased inordinately national habits of vainglory.'

বিশেষভাবে স্মরণীয়; চার হাজারের বেশি লোক একটা জায়গায় বনের ধারে টিলার উপর সমবেত হইয়াছে; কবি আসিলে তাহারা একসঙ্গে গান গাহিয়া উঠিল; সেসব গান জারমান লোক-সংগীত ও জাতীয়-সংগীত। প্রায় একঘণ্টাকাল এইভাবে গান ও উচ্ছ্বাস চলে; কবি একটি সময়োপযোগী ভাষণ দান করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।[১]

হেসের ডিউকের প্রাসাদে সে সময়ে ক্রাউনপ্রিন্স ব্যতীত কাইসারের পরিবারের অনেকেই ছিলেন। একদিন কাইসারের দ্বিতীয় পুত্র রথীন্দ্রনাথকে ধরিয়া কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন; রথীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, 'আমি পিতার সম্মুখে কঠোর হৃদয় জারমানদের কাঁদিতে দেখিয়াছি, কিন্তু রাজকুমার যেভাবে কাঁদিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িলেন, তাহাতে আশ্চর্য হইয়া গেলাম।'

ডার্মস্টাট একটি শিল্পকেন্দ্র, নগরীর শ্রমিক-সংঘ বলিয়া পাঠায় যে ভারতীয় কবিকে তাহারা দেখিতে পায় নাই, তাঁহাকে তাহারা তাহাদের মধ্যে পাইতে চায়। সাধারণ শিল্প-শ্রমিকরা শিক্ষা-দীক্ষার দিক হইতে আদর্শ মানুষ নহে; কবি তাহাদের ক্লাবে সত্যই একদিন উপস্থিত হইলেন। কিন্তু শ্রমিকরা তাঁহাকে কোনো সম্মান দেখাইবার জন্য ঔৎসুক্য দেখাইল না; বীয়ারের বোতল সম্মুখেই থাকিল, চুরুটের ধোঁয়া যথাপূর্ব কুণ্ডলিত হইয়া চলিল— কবি তাহাদের মধ্যে গিয়াই বসিলেন। ধীরে ধীরে কথা শুরু করিলেন এবং যেমন সেগুলি অনূদিত হইতে লাগিল, সভার শ্রোতাদের ব্যবহারে পরিবর্তন যুগপৎ লক্ষিত হইল। কিছুক্ষণের মধ্যে বীয়ারের মগ বেঞ্চের নিচে গেল, চুরুট নিবাইয়া লোকে পকেটে পুরিল, ঋজু হইয়া স্তব্ধভাবে সকলে বসিল। কবি বলিয়াছেন, জীবনে তাঁহার এত বড়ো বিজয় কোনো দিন হয় নাই। কাউণ্ট কাইসারলিঙ কবিকে কী শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন তাহা *The Golden Book of Tagore* (1931) গ্রন্থে প্রকাশিত তাঁহার রচনাটি পাঠ করিলে জানা যায় (পৃ. ১২৭)।

ডার্মস্টাট হইতে কবি অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা যাত্রা করিলেন। দেশে ফিরিবার জন্য মন ব্যাকুল; কিন্তু ভিয়েনার ডেপুটেশনকে অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। সেখানে দুইটি বক্তৃতা দিয়া কবি ১৭ জুন প্রাগ-এ (প্রাহা) পৌঁছিলেন। ভিয়েনায় এক সন্ধ্যায় কবি Wagner-এর Die Meistersinger son Nürnberg[২] নামে বিখ্যাত কমেডি দেখিতে যান; সঙ্গে অধ্যাপক বিনটারনিটস্ থাকায় অভিনয় বুঝিতে কবির ও রথীন্দ্রনাথের কোনো অসুবিধা হয় নাই।[৩]

প্রাগ চেক্‌জাতির নূতন রাজধানী; চেক্‌রা প্রথম মহাযুদ্ধের পর অস্ট্রিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নূতন রাজ্য গড়িয়াছে। সেখানে দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়— একটি জারমানভাষীদের, অপরটি চেক্‌ভাষীদের। প্রথমটির অধ্যাপক বিন্‌টারনিটস্ সংস্কৃতভাষায় মহাপণ্ডিত, তাঁহার খ্যাতি সুধীজগতে সর্বত্র; রবীন্দ্রনাথেরও তিনি মহাভক্ত। চেক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক লেসনী, বিন্‌টারনিটসের ছাত্র। উভয়েই কবির সেবার জন্য সর্বদা উপস্থিত থাকিতেন। প্রাগের বিশাল কনসার্ট হলে কবির বক্তৃতা হইল।[৪]

১ Rathindranath, *On the Edges of Time*, p. 151.

২ Die Meistersinger, counted among the few outstanding German comedies, was his last work [1862] intended for the stage as he found it, not as he wished it to be.—Cassells Encyclopaedia of Literature, Vol. II, p. 1618.

৩ *On the Edges of Time*, p. 156.

৪ বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্বর্ধনার পর একদিন কবি ও রথীন্দ্রনাথ মোটরগাড়িতে হোটেলে ফিরিতেছেন; হঠাৎ গাড়ি বিগড়াইয়া যায়। তখন পাশের দোকানের একটি লোক কবিকে এভাবে রাস্তার উপর থাকা অনুচিত বলিয়া তাহার দোকানে লইয়া গিয়া বসাইল; দোকানটি এক ফোটোগ্রাফারের। সে পূর্বে রথীন্দ্রনাথকে কবির ফোটো তুলিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হয়; তারপর মোটর-চালকের সহিত ব্যবস্থা করিয়া এই ঘটনাটি সৃষ্টি করে। এই ফোটো নাকি খুব ভালো হইয়াছিল।— *On the Edges of Time*, p. 154.

প্রাগ হইতে কবি (২১ জুন) স্টুটগার্ট হইয়া প্যারিসে আসিলেন। সেখানে কয়েকদিন থাকিয়া ১ জুলাই ভারতগামী জাহাজ ধরিয়া দেশের দিকে রওনা হইলেন ও Morea স্টীমারে বসিয়া কবি তাঁহার ভাবনারাজিকে পত্রধারায় ব্যক্ত করিতেছেন; পত্রগুলি এন্‌ড্রুজের উদ্দেশ্যে লিখিত। ১৬ জুলাই বোম্বাই পৌঁছিয়া কবি পত্রগুলি এন্‌ড্রুজের হাতে দেন। এই পত্রগুলি পরে *Letter to a Friend*-এর অন্তর্গত হয়। এ যাত্রায় বিদেশে এক বৎসর দুই মাস ও দুই দিন কাটে।

আমেরিকাবাসের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কবি দেশে ফিরিবার পরই যাহা বলেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। "অনবচ্ছিন্ন সাত মাস আমেরিকায় ঐশ্বর্যের দানবপুরীতে ছিলাম। দানব মন্দ অর্থে বলছিনে, ইংরেজিতে বলতে হলে হয়তো বলতাম টাইটানিক ওয়েলথ্‌। অর্থাৎ, যে ঐশ্বর্যের শক্তি প্রবল, আয়তন বিপুল। হোটেলের জানালার কাছে রোজ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশতলা বাড়ির ভ্রূকুটির সামনে ব'সে থাকতেম আর মনে মনে বলতেম, লক্ষ্মী হলেন এক আর কুবের হলো আর— অনেক তফাত। লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণ, সেই কল্যাণের দ্বারা ধন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। কুবেরের অন্তরের কথাটি হচ্ছে সংগ্রহ, সেই সংগ্রহের দ্বারা ধন বহুলত্ব লাভ করে। বহুলত্বের কোনো চরম অর্থ নেই।"[১]

পশ্চিমে শক্তির যে রূপ কবি এবার দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে তিনি তৃপ্তি লাভ করেন নাই, সেখানে দেখিয়াছেন ভোগের মূর্তি আনন্দের নয়, শক্তির রূপ সংযমের নয়। তাঁর কেবলই মনে হইত এই অতুল ঐশ্বর্যতৃষ্ণার পরিণাম কী, ইহার শেষ কোথায়— ততঃ কিম্, ততঃ কিম্।

বিদেশ হইতে পত্রধারা

রবীন্দ্রনাথের য়ুরোমেরিকা সফরের পর্ব হইতেছে ১৯২০ সালের ১২ মে হইতে ১৯২১-এর ১৬ জুলাই পর্যন্ত— অর্থাৎ চার দিন কম চৌদ্দ মাস। এই সময়ের মধ্যে কবি নানা লোককে অজস্র পত্র লিখিয়াছেন। তবে অধিকাংশ লেখা এন্‌ড্রুজকে— তখন তিনি কার্যত শান্তিনিকেতনে কবির প্রতিনিধি। এ ছাড়া তৎকালীন সর্বাধ্যক্ষ জগদানন্দ রায়, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা অনেকগুলি পত্র আছে। যাঁদের খুচরা দুই-একখানা পত্র লিখিয়াছেন, এমন লোকও আছেন অনেক। মোট কথা, এই পত্রগুচ্ছ কবির মনের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ উপাদান— কারণ সাহিত্য-বিষয়ক রচনা বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা এ যাত্রায় একেবারে নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না; রচনা যাহা কিছু চোখে পড়ে তাহা ইংরেজিতে লেখা— বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচারকল্পে বক্তৃতারাজি। এই দীর্ঘ পর্বে কবিতা বা গান চোখে পড়ে না। এবারকার পত্রধারার প্রধান আলোচ্য বিষয় হইতেছে— অসহযোগ আন্দোলন ও বিশ্বভারতী। এই দুই প্রসঙ্গের মধ্যে অন্যান্য বহু বিষয়ের আলোচনা আসিয়া পড়িয়াছে; বিশেষত এন্‌ড্রুজকে লিখিত কতকগুলি পত্র কবির নিগূঢ় কথায় পূর্ণ।

কবি যখন য়ুরোপ যাত্রা করেন, তখনো অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত হয় নাই। জালিনবালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রথম-বার্ষিক স্মরণ-সভায় রবীন্দ্রনাথ জিন্না সাহেবকে তাঁহার বক্তব্য বোম্বাইতে লিখিয়া দেন। পঞ্জাবের হত্যাকাণ্ড ও মিলিটারি-শাসনের অকথিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশের সর্বশ্রেণীর লোক ও সর্বদলের নেতারা

১ শিক্ষার মিলন, শিক্ষা (২য় সং) পৃ. ২৫১।

প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ইহার ফলে গভর্নমেণ্ট একটি তদন্ত-কমিটি বসান (Disorders Enqiry Committee)। কংগ্রেসও পাশাপাশি একটি তদন্ত-কমিটির ব্যবস্থা করেন। গভর্নমেণ্টের তদন্ত-কমিটির কি ফলাফল হয়, তাহার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ তখন ইংলন্ডে; ভারতের প্রতি বৃটিশ পার্লামেণ্টের অদ্ভুত মনোভাব দেখিয়া কবি তিক্ত মনে ইংলন্ড ত্যাগ করিয়া ফ্রান্সে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই ক্ষুব্ধ মনোভাব দীর্ঘকাল বহন করা সম্ভব নহে— কারণ তিনি কবি, রাজনীতিক নহেন। ক্ষুব্ধতা পোষণের দ্বারা গঠনমূলক কার্য হয় না, ইহা তিনি ভালো করিয়া জানেন। তাই এনড্রুজকে লিখিতেছেন (৭ সেপ্টেম্বর '২০), "পঞ্জাবের ঘটনা যেন আমরা ভুলিয়া যাই; কিন্তু একথা ভোলা কখনই চলিবে না যে, যতদিন না আমরা নিজেদের ঘর ভালো করিয়া বাঁধিব, ততদিন এই নিদারুণ লাঞ্ছনা ও অপমান আমাদের ভোগ করিতেই হইবে। সমুদ্রের ঢেউ-এর দিকে তাকাইলে কোনো কাজ হইবে না; নিজের নৌকার ছিদ্রগুলির দিকে মন দেওয়াই দরকার সর্বাগ্রে।"

ভারতের রাজনীতির গতি কোন্‌দিকে যাইতেছে তাহা এখানে সংক্ষেপে বিবৃত না করিলে পত্রধারার মর্মকথা স্পষ্ট হইবে না।

বৃটিশ-সরকারের বিরুদ্ধে ভারতীয় নেতাদের পুঞ্জীভূত অভিযোগ। প্রথমত রৌলট বিলের প্রতিক্রিয়ায় পঞ্জাবে যে অশান্তি হয়, তৎসম্বন্ধে সরকারী তদন্ত-কমিটির প্রতিবেদনের উপর পার্লামেণ্টের মন্তব্য ও বিচার ভারতীয়দিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। দ্বিতীয়ত খিলাফতের সমস্যা। ভারতের মুক্তি-আন্দোলনে মুসলীম সমাজের সহানুভূতি ও সহায়তা লাভের আশায় গান্ধীজি প্রমুখ নেতারা পরাজিত তুর্কীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া ভারতীয় মুসলমানদের প্রীত্যর্থে খিলাফত আন্দোলন সমর্থন করিলেন। মে (১৯২০) মাসে তুর্কীর সহিত মিত্রশক্তির সন্ধিশর্তগুলি প্রকাশিত হইলে আন্তর্জাতিক সমস্যা জটিলভাবে দেখা দিল। তুর্কীর সুলতান ছিলেন মুসলীম সমাজে 'খলিফ' বা ধর্মগুরু। মুসলমানদের মতে ধর্মনীতি ও রাজনীতি একাত্মক। ভারতের নয় কোটি মুসলমান তুর্কীর সুলতান বা 'রুমের বাদশাহ'র নামে নামাজের সময় 'খুতবা' পড়িত। তাহাদের কাছে তুর্কী সাম্রাজ্যের ব্যবচ্ছেদ ও ইসলামের অপমান একার্থক। গান্ধীজি ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষ গ্রহণ করিয়া এক ইস্তাহারে ঘোষণা করিলেন যে পয়লা অগস্টের (১৯২০) মধ্যে যদি ভারতসরকার খিলাফত সম্বন্ধে সুবিচার না করেন, তবে তিনি ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের সহিত সর্ববিষয়ে অসহযোগ করিবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করিবেন। এই তথাকথিত অবিচারের অজুহাতে গান্ধীজি ভারতীয় মুসলমানদের খিলাফত আন্দোলনকে ভারতীয় রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন, হিন্দুদের পক্ষ হইতে মুসলমানদের এই ধর্মবিপর্যয়ের দিনে সহায়তা করা উচিত। তদনুসারে ৩১ অগস্ট ভারতের সর্বত্র 'খিলাফত দিবস' বলিয়া ঘোষিত হইল; ঐ দিনটি হিন্দু-মুসলমান সকলের পক্ষেই পালনীয়। এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে পরে আরো আলোচনা করা হইবে।

সেপ্টেম্বরের গোড়াতে কলিকাতায় আহূত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে পঞ্জাবকেশরী লালা লাজপত রায় সভাপতি (৩-৪ সেপ্টেম্বর ১৯২০)। এই অধিবেশনে স্থির হইল খিলাফতের সুবিচার না হইলে অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তিত হইবে। গান্ধীজি রাজনীতিক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন।

এনড্রুজ গান্ধীজির খিলাফত আন্দোলনকে কিছুতেই সমর্থনযোগ্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছেন না। কলিকাতা কংগ্রেসের কয়েকদিন পরে তিনি কবিকে য়ুরোপে লিখিতেছেন, 'Where I feel that Mr. Gandhi has failed is in the relative importance he attaches to things. He has become so wholly absorbed in

Khilafat,' . . এনড্রুজ গান্ধীজিকে লিখিয়াছিলেন, 'I hate the Khilafat doctrine of a Turkish empire'। তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন যে খিলাফতের সমর্থনের অর্থ হইতেছে তুর্কীসাম্রাজ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখা। তাহা হইলে আরব সিরীয়া ফিলিস্তান ইরাক আরমেনিয়া— ইহারা কি স্বাধীনতা না পাইয়া তুর্কীসাম্রাজ্যের অন্তর্গত থাকিবে?[১] গান্ধীজি আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রশ্নের মধ্যে প্রবেশ করিলেন না। তাঁহার দৃষ্টিতে হিন্দু-মুসলমানের মিলন ঘটাইতে পারিলে ব্রিটিশের শাসনশক্তিকে আঘাত করা যাইবে। এনড্রুজ রবীন্দ্রনাথকে লিখিলেন, 'I am out against empires altogether, and to agree to the Khilafat demand (for an Ottoman empire) would surely cut the ground under the Indian demand for independence.'। রাজনীতি বা স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে 'ধর্মে'র প্রশ্ন আনিয়া ফেলায় মুসলমানের ধর্মবিষয়ে তাহার স্বভাব-উগ্র নিষ্ঠা উগ্রতর হইয়া উঠিল ও হিন্দুর মধ্যেও সংগঠন করিবার শিথিল ইচ্ছা সাম্প্রদায়িক আন্দোলনে গড়িয়া উঠিল। রবীন্দ্রনাথ চিরদিন ধর্মীয় প্রশ্নকে রাজনীতির সহিত মিশাইয়া উদ্দেশ্যসাধনে ব্যবহারের বিরোধী, ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা খুবই স্পষ্ট ছিল।

রবীন্দ্রনাথের কাছে ভারতীয় রাজনীতির সংবাদ পৌঁছিতেছে; তিনি দূর হইতে দ্রষ্টার ন্যায় বিচার করিতেছেন। এনড্রুজকে লিখিলেন, 'আমরা যেন আত্মমর্যাদা রক্ষা করিয়া চলি, কলহ বা জব্দ করিবার প্রবৃত্তি হইতে ক্ষুদ্রতার দ্বারা ক্ষুদ্রতার জবাব না দিই। আমাদের চরম নৈতিক প্রতিবাদ যখন স্বাভাবিকভাবে অসহযোগ আকারে দেখা দিবে, তখন উহা মহিমামণ্ডিত হইবে, সত্য হইবে।' রবীন্দ্রনাথের আপত্তি অসহযোগে নহে; তুচ্ছ ঘটনার প্রতিশোধকল্পে উহার প্রয়োগ করাতেই তাঁহার আপত্তি। তাই তিনি লিখিতেছেন, 'মহাত্মাজী সংগঠনমূলক কর্মের মধ্যে দেশকে উদ্‌বুদ্ধ করুন, . . আমি তাঁহার চরণপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার আদেশ পালন করিব; আমার দেশবাসীর সহিত আমাকে সেবার দ্বারা সহযোগ করিতে বলুন। কিন্তু 'I refuse to waste my manhood in lighting the fire of anger and spreading it from house to house'। কবি দিব্যচক্ষে দেখিলেন ক্রোধের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবার পর পরমুহূর্তে অহিংসার শান্তিবাণী প্রচার প্রাকৃতজনের মনের উপর ব্যর্থ হইবে। অন্ধ ধর্মমোহ উদ্রিক্ত করিয়া তৎপরেই আধ্যাত্মিকতার দোহাই দেওয়া নিরর্থক! খিলাফত সমর্থনের প্রতিক্রিয়ায় ভারতে সাম্প্রদায়িক বিষবৃক্ষ রোপিত হইল।

দেশের সংগঠনমূলক কাজ বলিতে কবি কী বুঝিতেন, তাহা স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বিশদভাবেই দেশবাসীর সম্মুখে ধরিয়াছিলেন। সেইগুলির ইংরেজি তর্জমা প্রকাশের ব্যবস্থা ইতিমধ্যে হইয়াছিল।[২]

রবীন্দ্রনাথ দূরে থাকিলেও অনুভব করিতেছেন যে, অসহযোগের তরঙ্গ শান্তিনিকেতনের অধিবাসীদিগকে চঞ্চল

১ Marjorie Sykes, *Life of C. F. Andrews*, pp.154-55.

২ মডার্ন রিভিউ ১৯২১ ও ১৯২২-এ এনড্রুজকে লিখিত অনেকগুলি পত্র *Letters from Abroad* নামে মুদ্রিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বদেশী আন্দোলনের যুগে লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধ অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। সেগুলি *Greater India* নামে S. Ganesan, Madras হইতে প্রকাশিত হয়— এই গ্রন্থে চারিটি প্রবন্ধ ছিল।

Letters from Abroad— S. Ganesan, Madras 1924. ইহার কোনো সংস্করণ হয় নাই।

Letters to a Friend, Edited with two Introductory essay by C. F. Andrews— George Allen & Unwin Ltd., Museum Street, London, 1928; এই বই-এরও দ্বিতীয় সংস্করণ হয় নাই। পত্রগুলি বাংলায় অনূদিত না-হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের মনের ইতিহাসের একটা বড়ো পর্ব অনেকের নিকট অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। মূল পত্রগুলি, মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ, *Letters from Abroad* ও *Letters to a Friend*-এর পাঠাদি মিলাইয়া পত্রগুলির অনুবাদ একান্ত বাঞ্ছনীয়। কারণ সম্পাদনের সময়ে প্রথম সংস্করণের প্রথম কয়েকটি পত্র বাদ দেওয়া হয়। আমরা উভয় সংস্করণই ব্যবহার করিয়াছি।

করিতেছে। হল্যান্ড হইতে এনড্রুজকে লিখিতেছেন (৩ অক্টোবর '২০), 'শান্তিনিকেতনকে ধূলিময় রাজনীতির ঘূর্ণীবায়ু হইতে রক্ষা করিতে হইবে' (Santiniketan must be saved from the whirlwind of dusty politics)। কয়েকদিন পর লন্ডন হইতে লিখিলেন (১৮ অক্টোবর), 'আমাদের সত্যদৃষ্টি পরিপ্রেক্ষণীর সহিত পরিবর্তিত হয়; আমি অনুভব করিতেছি রাজনৈতিক অশান্তির জন্য ভারতের স্বচ্ছদৃষ্টি ক্রমেই আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে। রাজনীতিকদের পক্ষে সবুর সহে না, তাঁহারা দ্রুত ফলাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু সর্বমানবের এবং সর্বকালের যে প্রয়োজন, তাহার জন্য ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতেই হইবে। মহামানবের প্রকাশের জন্য শান্তিনিকেতন— এ প্রার্থনা তখনো ধ্বনিবে, যখন সকল দেশের ভৌগোলিক সীমানা অর্থহীন হইয়া যাইবে।'

আমেরিকায় পৌঁছিয়া নিউইয়র্ক হইতে এন্ড্রুজকে লিখিতেছেন (৪ নভেম্বর '২০), 'আমি জানি ভারতের রাজনৈতিক উত্তেজনা যেভাবে তীব্র হইয়া উঠিতেছে, তাহা হইতে শান্তিনিকেতনকে রক্ষা করা কঠিন। কিন্তু আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে, আমাদের আদর্শ রাজনৈতিক নহে; আমি যখন রাজনীতি করিব, তখন আমি শান্তিনিকেতনের কেহ নহি।'[১]

কবির মন শান্তিনিকেতনের নিভৃতে বিশ্বভারতীকে বৃহত্তর পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার স্বপ্নে বিভোর। সর্বমানবের অতিথিশালা এই শান্তিনিকেতন। শান্তিনিকেতনের তরুণ অধ্যাপক সুহৃৎকুমারকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন, "ভারতের একটা জায়গা থেকে ভূগোলবিভাগের মায়াগণ্ডী সম্পূর্ণ মুছে যাক— সেইখানে সমস্ত পৃথিবীর পূর্ণ অধিষ্ঠান হোক— সেই জায়গা হোক আমাদের শান্তিনিকেতন! · · শান্তিনিকেতনের আকাশ আজকের দিনের বিশ্বব্যাপী আঁধির আক্রমণে যেন নিরালোক হয়ে না ওঠে।"[২] অনুরূপ পত্র এন্ড্রুজকেও লেখেন।[৩]

রবীন্দ্রনাথের কাছে শান্তিনিকেতন কেবল একটা স্থানগত প্রতিষ্ঠান নহে, উহা একটা idea। সেইজন্য তাঁহার মতে সেখানকার ভাবধারা স্থিতিশীল বা static নহে, উহা চলমান ও বর্ধিষ্ণু। কবি এন্ড্রুজকে কয়েকদিন পূর্বে লেখেন (১৭ ডিসেম্বর '২০) যে, কিছুকাল পূর্বে তিনি যখন ভারত হইতে য়ুরোপ যাত্রা করেন, তখন তাঁহার মনে ছিল শান্তিনিকেতনে ভারতীয় সংস্কৃতির একটি কেন্দ্র স্থাপন করিবেন— সর্বভারতীয় বিদ্যার কেন্দ্রমাত্র। কিন্তু য়ুরোপীয় মহাদেশে উপস্থিত হইয়া তিনি অনুভব করিলেন যে তিনি পাশ্চাত্য জাতিদের দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছেন এবং তাঁহার জীবনের কার্য বা মিশন— বর্তমানযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সমস্যার সমাধান, অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন সাধন। শান্তিনিকেতনের বাণী পৃথিবীর নিকট ভারতের বাণী। কবির আশঙ্কা মহাত্মাজীর অসহযোগনীতি তাঁহার নীতির পরিপন্থী; মহাত্মাজীর রাজনীতি যেন ভারতকে insular বা দ্বীপাচারী করিয়া তুলিবে। রবীন্দ্রনাথের মতে আধুনিক জগতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ঘটনা— পূর্ব ও পশ্চিমের সাক্ষাৎ, কিন্তু সেখানে মিলন ঘটে নাই বলিয়াই সমস্যা। যতদিন না এই মিলন সার্থক হইবে, ততদিন জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে বৈরী ও বিরোধিতা অনিবার্য।

পাশ্চাত্য জাতিসমূহ বিশ্বের নিরুদ্ধ জড়শক্তি উন্মোচনে যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর, কিন্তু

১ 'Keep Santiniketan away from the turmoils of politics...we must never forget that our mission is not political. Where I have my politics, I do not belong to Santiniketan.' 4 November 1920, *Letters from Abroad*.

২ শ্রীসুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রাংশ। ১১ ডিসেম্বর ১৯২০; নিউইয়র্ক। দ্র. সুধীরচন্দ্র কর লিখিত প্রবন্ধ— লোকসেবক, যুগান্তর, ১৮ নভেম্বর ১৯৪৯।

৩ "We must make room for Man, the guest of this age, and let not the Nation obstruct the path." 25 November 1920. *Letters from Abroad*.

তাহার পরিণাম ভয়াবহ। কবির প্রার্থনা, এই দানব ('intellectual brutes') যাহারা নখদন্ত বিষবাষ্প যন্ত্রের অধিকারী বলিয়া গর্বান্ধ ('boast of their factory-made teeth and nails and poison-fangs',—*Letters to a Friend*, p. 41), তাহাদের নিকট ভারত যেন মাথা নত না করে।

এতকাল পূর্বভূভাগের দেশগুলি পাশ্চাত্য জাতিসমূহের কবলে ছিল; আজ সেই সব দেশকে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য সচেষ্ট দেখিয়া তাহারা আর স্বস্তি পাইতেছে না। পূর্ব ও পশ্চিমের এই সংঘাতকে শমিত করিবার একমাত্র উপায় পরস্পরকে শ্রদ্ধার সঙ্গে জানা, আত্মার আলোকে পরস্পরকে দেখা। কবির মতে এযুগে রাজা রামমোহন রায় সর্বপ্রথম এই সমস্যাটির কথা হৃদ্‌গত করিয়া পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন সংগঠনের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন—সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ধর্মের ক্ষেত্রে। রাজনীতিকদের উপর কবির কোনো ভরসা নাই; তাই বলিতেছেন যে, মুঘল বাদশাহদের দরবারে রাজনীতিকদের তো অভাব ছিল না; কিন্তু ধ্বংসস্তূপ ছাড়া তাহারা সাম্রাজ্যের আর কি রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু কবীর নানক, যাঁহারা ভগবৎপ্রেমের মধ্য দিয়া মানুষের ঐক্যানুসন্ধান করিয়াছিলেন, তাঁহারা তো বিস্মৃত হন নাই (p. 43)।

রবীন্দ্রনাথ স্বাধীনতাকামী; কিন্তু তাঁহার স্বাধীনতার আদর্শ রাজনৈতিক পটপরিবর্তন মাত্র নহে, তাহা মানুষের জন্মগত স্বাধীনতা তথা মুক্তির তপস্যা, মনের গ্রন্থিমোচনের সংগ্রাম। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে স্বাধীনতার যে মূর্তি তিনি দেখিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত অলীক; বাহির হইতে আপাতদৃষ্টিতে তাহাদের স্বাধীনতাকে কত বড় বলিয়াই-না মনে হয়। কিন্তু আসলে তাহাদের আত্মা রুদ্ধকারায় বন্দী। তাহারা আজ রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক অসংখ্য বন্ধনে এমনভাবে বদ্ধ যে তাহাদের সভ্যতার শ্বাসরোধের উপক্রম হইয়াছে। কবি বলিতেছেন যে, তিনি জানেন এই বন্ধনদশার দুঃখ কী গভীর; কারণ এইসব বন্ধনের মধ্যে তাঁহার নিজের বাস। তিনি ইচ্ছা করিলেও তাঁহার আকাঙ্ক্ষার শৃঙ্খলকে ভাঙিয়া বাহির হইতে পারিবেন না। মানুষের এই আপাতস্বাধীনতা অত্যন্ত অবাস্তব— কারণ দাসত্ব অন্তরে (p. 50)।

আমেরিকার এই অবাস্তব সমাজজীবনের মধ্যে বাস করিতে করিতে কবির মনে ভারতের সন্ন্যাসীর ত্যাগমূর্তির কথা উদিত হইতেছে। তাঁহার ইচ্ছা করিতেছে একবার মহাতাপস শিবের দিগম্বর রূপের স্তব করেন; পাশ্চাত্য সভ্যতার অবাস্তব জীবন-প্রবাহের উত্থিত ধূলিরাশি তাঁহার শ্বাসরোধ করিতেছে (p. 51)। ভারতে যখন থাকেন তখন ধনাভাব হেতু মনে হয় ধনের দ্বারা মানুষের কতই না সুখ! কিন্তু ধনের দেশে আসিয়া দেখেন, অর্থ কী অনর্থের মূল; সৃষ্টি হইতে অনাসৃষ্টি বেশি করে অর্থ। অর্থকে সমাজে চলমান করিতে হইলে মনের মধ্যে অনেকখানি বৈরাগ্য প্রয়োজন; পুঞ্জীভূত অর্থ সমস্ত সমাজকে নীচের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। অর্থাগম হইলে শান্তিনিকেতনের অভাব নিশ্চয়ই দূর হইবে, কিন্তু তাহার ফলে শান্তম্ শিবম্ ও অদ্বৈতম্‌ও বেদিচ্যুত হইবার আশঙ্কা আছে। তাহার স্থলাভিষিক্ত হইবে বিচক্ষণ হিসাবনবীশ। 'Money may remove many of the wants it suffers from, but also may remove its shrine of the *Santam*, *Shivam* and *Advaitam* transforming it into an office, presided over by an efficient accountant.'[১]

কবির মনের প্রায় প্রতিদিনের ভাবতরঙ্গ পত্রধারায় প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার প্রশ্ন, তিনি preacher না poet—

১ 4th January 1921; এই পত্রটি *Letters to a Friend*-এ নাই। দ্র. *Letters from Abroad*, p. 52। কবির এই ভবিষ্যদ্‌বাণীর উপর কোনো মন্তব্য করিতে চাহি না।

প্রচারক না কবি। আজ তিনি দেশবিদেশে বিশেষ আইডিয়া প্রচারের জন্য ব্যাকুল, কবিসত্তার প্রেরণায় (inspiration) ইহার জন্ম নহে, ভাবুকের conscious effort বা চেষ্টায় ইহার উদ্ভব। আজ তিনি কবির ধর্ম ছাড়িয়া, বিশেষ ভাবরাজির (idea) বাহকরূপে লোকের দ্বারে উপস্থিত— তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর তাঁহাকে দিতে হইতেছে। এইভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে ভাবনাগুলি অভ্যস্ত বাক্যের পুনরুক্তিজালে চাপা পড়ে (smothered under the deadness of words)। কবি জানেন সংবিৎ বা চেতনবুদ্ধিকে লইয়া খুব কসরত করিতে থাকিলে, মনের স্বাভাবিক স্পর্শানুভূতি নষ্ট হয় (straining of consciousness lead to insensitiveness)। কবির আপসোস বৃথা, তাঁহার স্বভাবের মধ্যে ঐ ধর্ম আছে; তা না হইলে তিনি জগতে কেবল কবিখ্যাতিই লাভ করিতেন, কিন্তু তিনি যে শত-অভিধায় অভিহিত! মানবের অসংখ্য সমস্যা ও প্রয়োজনের কথা ভাবিয়াছেন বলিয়া তিনি লোকোত্তর মহামানব। রবীন্দ্রনাথ আর্টিস্ট— জীবনশিল্পী; সেইজন্য কাজ তাঁহার পক্ষে তেমনি অনিবার্য, যেমন তাঁহার আর্ট। তাঁহার শিল্পমানসে বিশ্বভুবনের ভূমারূপ সমন্বিত; কারণ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখাই বিরূপ দৃষ্টি। চিরদিনই কবি সম্যক্-দৃষ্টি; সম্যক্-বোধির কথা বলিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের মতে (১৪ জানুয়ারি ১৯২১), জাতি- বা নীতি-অভিমানের কাছে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শকে কখনো তিনি বলি দিতে পারেন না— 'the complete man must never be sacrificed to the patriotic man, or even to the merely moral man.' (p. 55)। এসব কথা মনে হইতেছে চারিদিকের স্বাজাত্যভিমানের আস্ফালন দেখিয়া। আধুনিক জগতে আমাদের জীবনে স্বাদেশিকতা বা জাতিপ্রেম তাহাদের প্রাপ্যগণ্ডা হইতে অনেক বেশি দাবী করিতেছে; কবির জীবনেও এই আবেশ একদিন আসিয়াছিল। কিন্তু স্বাদেশিকতার এই নিম্নাভিমুখী টান অনুভব করা মাত্র তিনি আপনাকে সকল প্রকার উত্তেজনা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছিলেন।

কবি অতি বেদনার সহিত লক্ষ্য করিতেছেন যে, পাশ্চাত্য জগতে প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তুসঞ্চয়ের উন্মাদনায় সাধারণ মানুষের ব্যক্তিসত্তা (personality) আজ কী বিকৃত, সে আজ কী নিখুঁতভাবে যন্ত্রে পরিণত! ভারতেও আজ জাতিপ্রেমের নামে মানবতা কেবল সংকুচিত নহে, উপহসিত। এইভাবে আত্মার সংকোচ-সাধন মহাপাপ। তাঁহার মতে যথার্থ ত্যাগের মূর্তি সৌন্দর্যে ও আনন্দের মধ্যে বিকশিত হইয়া উঠে— 'true renunciation blossoms, on the vigorous soil of beauty and joy.' (p. 56)। শান্তিনিকেতন তাঁহার কাছে এইজন্য এত প্রিয়। সেখানে তিনি চিরদিন পরিপূর্ণতার আদর্শকে অনুভব করিয়াছেন (the ideal of perfection, which we tasted all through, its growth)। ধনের দ্বারা আশ্রম গড়ে নাই— প্রেমের দ্বারা ত্যাগের দ্বারা ইহা পরিপূর্ণভাবে পরিপুষ্ট হইয়া আসিয়াছে। অভাব ও দারিদ্র্যের পটভূমেও আশ্রমের সরল সৌন্দর্য তাঁহার কাছে রমণীয়। শান্তিনিকেতনের মধ্যে যে স্বাধীনতা আছে তাহা সাধারণত অন্য প্রতিষ্ঠানে দুর্লভ, তাঁহার মতে 'all creations must have been freedom for their growth.'।

আসলে শান্তিনিকেতন কাহারও মতলব (plan) মত চালিত হয় নাই, সে আপনার অন্তরের প্রৈতি বলে চলিয়াছে। বাহিরের ধনসম্পদ হইতে ইহার এই অন্তরের সম্পদের মূল্য অনেক বেশি। কবির আন্তরিক ইচ্ছা ছিল তপোবন সৃষ্টি— বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা নহে। দুর্ভাগ্যবশত বিশ্বভারতী তখন অর্থের অভাবে ক্লিষ্ট; কিন্তু কবির প্রশ্ন অর্থদৈন্য একদিন উহার দূর হইবে— কিন্তু উহার তপস্যা কোথায়! (But unfortunately, money though scarce may be avilable, but *where is tapasya. ?* p. 60)। আজও সে প্রশ্নের উত্তর মেলে নাই— তপস্যা কোথায়?

কবির এই মনোভাব সম্পূর্ণ আদর্শাত্মক— বাস্তবজীবন হইতে অতিদূরে। পাশ্চাত্যদেশে জাতিপ্রেমের বীভৎসরূপ

দেখিয়া মন অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত ; এবং শান্তিনিকেতনে তাঁহার আদর্শান্বিত মানবতা বিকাশের অনুকূল ক্ষেত্র সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে মনে আত্মপ্রসাদ পাইতেছেন— কিন্তু তখন সেখানে তাঁহার ভাবনার সম্পূর্ণ বিপরীত এমন কি বিরুদ্ধ পরিবেশ গড়িয়া উঠিতেছে ; সেখানে কী ঘটিতেছে তাহার বিস্তারিত সংবাদ তাঁহার নিকট অত্যন্ত অস্পষ্ট। সেই সময়ের শান্তিনিকেতনে মনোবিকারের একটি উদাহরণ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইলে কবি বুঝলেন কী আদর্শহীনতার মধ্যে শান্তিনিকেতনের বাস্তব জীবন নামিয়াছে! স্বাদেশিকতা সম্বন্ধে তথাকার এক পুরাতন কর্মীর একখানি পত্র কোনো সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ; কবি তাহা পাঠ করিয়া দারুণ মর্মাহত হন ও নিউইয়র্ক হইতে এন্‌ড্রুজকে লেখেন, 'This is the ugliest side of patriotism'। ঐ পত্রে বলিতেছেন, 'সমস্ত পৃথিবী আজ জাতিপ্রেমের পূজায় অভিনিবিষ্ট। আমি যে অন্তরে কী দুঃখ পাইতেছি তাহা লিখিয়া প্রকাশ করিতে অক্ষম।' পত্রখানি একজনের লেখনীপ্রসূত হইলেও, এই মতের পরিপোষকের সংখ্যা আশ্রমে কম ছিল না, তাহা শান্তিনিকেতনের সমসাময়িক ইতিহাস হইতে জানা যায়। পূর্ব পরিচ্ছেদে আমরা তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি।

রাজনীতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের কোনো দিনই আকর্ষণ ছিল না— কারণ সমস্ত জীবন হইতে উহা বিচ্ছিন্ন। য়ুরোমেরিকা ঘুরিয়া রাজনীতিজ্ঞদের নীতিধর্মজ্ঞান দেখিয়া কবি তাঁহাদের 'পরে কোনো ভরসা স্থাপন করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার মতে ইহারা যে-মতবাদ এখনো আঁকড়াইয়া আছে, তাহা অতীতযুগের চিরঅভিশপ্ত মতদেহ (dogma) মাত্র। য়ুরোমেরিকার মজ্জমান তরী ধ্বংসের দিকে ধাবিত। এই আশ্রয় সম্বন্ধে পশ্চিমের একদল ভাবুক ক্রমশই সন্দিহান হইয়া উঠিতেছেন ; কিন্তু মনের অভ্যাস বা সংস্কারবশত পুরাতনের জীর্ণ আবাস ত্যাগ করিয়া নূতনকে গ্রহণ করিতেও পারিতেছেন না। ভারতের দুর্ভাগা রাজনীতিকরা ঠিক সেই ধারার মধ্যে আত্মবিসর্জন করিয়া ডুবন্ত নায়ের দিকে ছুটিতেছেন ও তাহারই মধ্যে আশ্রয় পাইবেন মনে করিয়া সংগ্রামে রত! অথচ আমাদের পর্ণকুটীর ঐ অভিশপ্ত ডুবন্ত তরী হইতে যে অধিক নিরাপদ সে ভরসা তাহাদের নাই (*Letters from Abroad*, p. 66)। কবির কাছে ইহাই হইতেছে আধুনিক সভ্যতার ট্রাজেডি। ভারতে লোকের দেশপ্রেম সম্বন্ধে মনোভাব যেভাবে বিকৃত হইতেছে তাহাতে তাঁহার আশঙ্কা যে দেশের লোক তাঁহাকে দেশে ফিরিলে বর্জন করিবে (I shall be rejected by my own people, when I go back to India)।

ভারতে অসহযোগ আন্দোলন ক্রমেই প্রসার লাভ করিতেছে। ডিসেম্বর (১৯২০) কংগ্রেসের পর কলিকাতার একদল ছাত্র অসহযোগে যোগ দিয়া গ্রামের ডাকে বাহির হইয়া পড়িল। এক বৎসরের মধ্যে 'স্বরাজ' আসিবে— সে আহ্বান কি প্রত্যাখ্যান করা যায়! রবীন্দ্রনাথ তখন শিকাগোতে এন্‌ড্রুজের নিকট হইতে উত্তেজনার সবিস্তার সংবাদ পাইতেছেন। কবির ভাবুক মন— আশায় আকাঙ্ক্ষায় আনন্দে আবেগে সাময়িকভাবে ভরিয়া উঠিতেছে। আজ যে মহাত্মা গান্ধী ক্ষীণদেহ, উপকরণহীন দুর্বলের প্রচণ্ড শক্তিকে সংহত করিয়া অহিংসার মন্ত্রে দেশকে উদ্‌বোধিত করিয়াছেন তাহার ভাবাত্মকরূপে কবিচিত্ত আনন্দিত, আশান্বিত। পাশ্চাত্য জগতের সম্পূর্ণ নির্ভর জড় বস্তুসম্পদ ও ধনৈশ্বর্যের উপর— এক কথায় বিজ্ঞান ও অর্থনীতির উপর তাহাদের চরম ভরসা। শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণ বা অস্ত্রনিয়ন্ত্রণের জন্য তাহারা আন্তর্জাতিক বৈঠকে যতই কোলাহল করুক, অন্তরে অন্তরে সকলেই তাহারা রণকামী, হিংসামন্ত্রে দীক্ষিত। ভারতকে আজ জগতসমক্ষে ইহাই দেখাইতে হইবে যে সত্যধর্ম কী, কেবলমাত্র নিরস্ত্রীকরণ বা অস্ত্রনিয়ন্ত্রণের কোলাহল মুখর সভাসমিতি স্থাপন করিলেই শান্তি আসিবে না। ভারতই বলিয়াছে ব্রহ্মবল ক্ষাত্রবল হইতে অধিক প্রবল— 'moral force is a higher power than brute force'। আজ ভারতের সহায় নারায়ণ, নারায়ণী সেনা নহে ; আত্মার শক্তি, পশুর শক্তি নহে। ভারতের চিরন্তনবাণী— ধিক্ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো-

বলং বলম্। আজ গান্ধীজি রাজনীতিক্ষেত্রে এই নীতি প্রয়োগ করিবার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ। রবীন্দ্রনাথ এই ভাবাত্মক আদর্শবাদকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করিতেছেন।

কবি লিখিতেছেন, রাজনৈতিক 'স্বরাজ' লাভেই মোক্ষ নহে; আমাদের সংগ্রাম আত্মার— মানুষের মুক্তির সংগ্রাম— কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা নহে। মানুষ তাহার চারিপার্শ্বে জাতিপ্রেমের অহমিকাজাল বুনিয়া আপনি বন্দী। আত্মার সেই বন্ধনদশা হইতে তাহাকে মুক্তিদান করাই ভারতের আদর্শ। রবীন্দ্রনাথের মতে তাহাই মানুষের স্বরাজ। মানুষের ধর্ম মনুষ্যত্ব; সেই মনুষ্যত্বলাভই তাহার স্বরাজ লাভ। "পূর্বপৃথিবীর ছিন্নকন্থা পরিহিত অর্ধভুক্ত দরিদ্র আমরাই জগতের সর্বমানবের জন্য সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইব। আমাদের ভাষায় 'নেশন' শব্দ নাই, পরের কাছে ধার করা এই শব্দ, ভারতীয় সমাজে ইহা খাপ খায় না।" কবি পাশ্চাত্য সভ্যতাকে ভালোরূপেই জানেন; তাই সেই বিকৃত সভ্যতার আদর্শ ভারতে রূপান্তরিত হইবার পক্ষপাতী নহেন— Not for us, is this mad orgy of midnight।

অধ্যাত্ম-বল ও ক্ষাত্র-বলের তুলনা করিয়া ব্রহ্ম-বলের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে যাহাই বলুন, মহাত্মাজী-প্রবর্তিত অসহযোগের ভাবাত্মক দিকের ঔজ্জ্বল্য সাময়িকভাবে মনকে যতই আচ্ছন্ন করুক, কিছুতেই অন্তর হইতে নীতি হিসাবে অসহযোগ-তত্ত্বকে সমর্থন করিতে পারিতেছেন না তিনি শিকাগো হইতে এন্‌ড্রুজকে লিখিতেছেন (৫ মার্চ ১৯২১), 'দেশের উপর দিয়া যে উত্তেজনার ভাবাবেগ চলিয়া যাইতেছে, তাহার প্রতি আমার মনের সুর মিলাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছি; কিন্তু আমার অন্তরে কেন এই বাধার ভাব? আমি ইহার পরিষ্কার জবাব পাইতেছি না'।

কবির মনে কী যে সংগ্রাম— তাহা এন্‌ড্রুজকে লিখিত পত্রধারার প্রতিটি পত্র সাক্ষ্য বহন করিতেছে। অ-সহযোগকে তিনি মানুষের সহজ ধর্ম বলিয়া কিছুতেই মানিতে পারিতেছেন না; কবির ভাষায় ইহা political ascoticism। তাঁহার প্রশ্ন এই— যেসব ছাত্র বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া অ-সহযোগে যোগদান করিয়াছে তাহারা কি জানে কিসের জন্য এই আত্মত্যাগ! কোনো পরিপূর্ণ শিক্ষার জন্য নিশ্চয় নহে— বরং অ-শিক্ষার জন্য। ইহার পটভূমে আছে নাস্তিকের মরু— যাহার একদিকে কৃচ্ছ্রতার শুষ্কতা এবং যাহার অপরদিকে উচ্ছৃঙ্খলতার মূঢ়তা। মানবপ্রকৃতি স্বাভাবিক জীবনধারার মূলগত সত্যের প্রতি আস্থা হারাইয়া অহেতুকী ধ্বংসকার্যে প্রবৃত্ত হইয়া নৈর্ব্যক্তিক আত্ম-পরিতোষ সম্ভোগ করে। নৈতিক-ধর্মের নিষ্ক্রিয় রূপ হইতেছে কৃচ্ছ্রতা (asceticism) এবং উহার প্রতিক্রিয়া-রূপ হইতেছে ধ্বংসকার্য (violence)। কবির আশঙ্কা পাছে আমাদের রাজনীতি এই দুই চরমতায় পৌঁছিয়া কখনো মূক, কখনো মুখর হয়, কখনো সাত্ত্বিক, কখনো তামসিক হয়।

স্বদেশী আন্দোলনের পর্বে একদা ছাত্রের দল তাঁহার পরামর্শের জন্য আসিয়াছিল। তাহারা পড়াশুনা ছাড়িয়া 'কাজ' করিতে চায়। কবি তাহাদের প্রস্তাবে সায় দিতে পারেন নাই। তাহার কারণ, তাঁহার কাছে 'ছাত্র' বলিতে কোনো অবচ্ছিন্ন সত্তা বুঝায় না; তাহাদের প্রত্যেকে এক-একজন individual, তাহারা abstraction নহে। অবচ্ছিন্নতা নানা নামে আজ যৌবনের আত্মাহুতির দাবীদার। সেই অবচ্ছিন্নতার কাছে কবির মন সায় দিতে পারে না; তাঁহার মতে বর্তমানে প্রযুক্ত অ-সহযোগনীতি অযথাভাবে সত্যকে আঘাত করিতেছে।

রবীন্দ্রনাথের মতে সহযোগতত্ত্ব আবিষ্কার দ্বারা মানুষ পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। এযাবৎকাল যে-সমাজ বা সংঘের মধ্যে সহযোগের পরিচয় সুস্পষ্ট— শান্তি ও শ্রী সেইখানেই বিরাজিত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সেই বিশেষ বিশেষ একক বা সমাজগণ্ডী এমনভাবে আত্মকেন্দ্রিক হইয়া উঠিল যে, তাহারা আর বাহিরের গণ্ডীবদ্ধ এককের সহিত সহযোগে বা সমবায়ে কার্য করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া গেল। ফলে বৃহৎ মানবসমাজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'নেশন'এর চারিদিকে

দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর গাঁথিয়া পরস্পর হইতে বিভক্ত হইয়া রহিল। এ কথা আজ সকলকেই স্বীকার করিতে হইতেছে যে, কোনো দেশের বা জাতির বিশেষ সমস্যা তাহারই ক্ষুদ্র রাজনৈতিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। যাহা জাতিবিশেষের 'ন্যাশনাল' সমস্যা তাহা বিশ্বমানবের সমস্যা— তাহা আন্তর্জাতিক। কোনো এক জাতির পক্ষে— অন্য সকলের হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া— আপনার মুক্তিসন্ধান সম্পূর্ণ সার্থক হইতে পারে না। হয়, মানবজাতি সমগ্রভাবে রক্ষা পাইবে, না হয় সকলকে মিলিয়া সমগ্রভাবে নিপাতে যাইতে হইবে (Either we shall be saved together, or drawn together into destruction.—*Letters from Abroad* p. 80)। আজও পৃথিবীর রাজনীতিকগণ, সাহিত্যিকেরা, বিজ্ঞানীরা কি এই কথাই বলিতেছেন না? কিন্তু কোথায় সে শুভবুদ্ধি!

· ভারতের এই অসহযোগ আন্দোলনের সময়, পৃথিবীর এই অসংখ্য বিরোধ-সংকুল ঘটনার সম্মুখে, ভারত কি তাহার গণ্ডী ভেদ করিয়া সহযোগ ও ঐক্যের মন্ত্র প্রচার করিতে পারিবে না? ইহাই হইতেছে কবি-জিজ্ঞাসা। দুর্বলাত্মারা বলে যে, ভারত যতদিন না ধনৈশ্বর্যে ও শক্তিমত্ততায় অন্যের সমতুল হয়, ততদিন সভ্যজগতের সমক্ষে কিছু বলিবার অধিকার তাহার নাই। কবি এই যুক্তিকে অশ্রদ্ধেয় বলিয়া মনে করেন। তিনি বলেন, 'আমার একমাত্র প্রার্থনা, ভারত নিখিলমানবের মিলনের জন্য দণ্ডায়মান হউক'।

কবির মতে, এইজন্যই অসহযোগ একপ্রকার আধ্যাত্মিক আত্মঘাত। আজ জাতীয় অহমিকার মোহে আমরা যদি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করি যে পশ্চিমের কিছুই ভালো নহে, তবে আমাদের প্রাচ্য মনস্বিতা সম্বন্ধে সন্দেহ হইবে। "Our present struggle to alienate our heart and mind from the West is an attempt at spiritual suicide. If, in the spirit of national vainglory, we shout from our house-tops that the West has produced nothing that has an infinite value for man, then we only create a serious cause of doubt about the worth of any product of the Eastern mind."[১]

পশ্চিম প্রাচ্যকে ভুল বুঝিয়াছে; সমস্ত বিরোধের মূলে এই ভুল বুঝা-বুঝি। কিন্তু সে ভুল কি শুধরাইবে যদি আমরা প্রতীচ্যকে ভুল বুঝি? পশ্চিমের শিক্ষাবর্জনের জন্য ভারতে আজ যে-অভিযান চলিতেছে, তাহা শেষ পর্যন্ত কখনো মঙ্গলপ্রদ হইতে পারে না। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বর্তমান জগৎ পশ্চিমের দ্বারা আবিষ্ট; প্রাচ্য দেশসমূহকে তাহার নিকট হইতে জ্ঞানাহরণ করিতেই হইবে। কিন্তু প্রাচ্যেরও পশ্চিমকে দিবার মত সম্পদ আছে। কবির বিশ্বাস, সময় একদিন আসিবে যখন পশ্চিমের পক্ষে প্রাচ্যের জ্ঞান আহরণের অবসর হইবে।

আমেরিকার কর্মবহুল ক্লান্তিকর জীবন আদৌ ভালো লাগিতেছে না। এন্‌ড্রুজকে নিউইয়র্ক হইতে লিখিতেছেন (১৮ মার্চ ১৯২১), 'এই কর্মজাল হইতে মুক্তির জন্য আমার একান্ত ইচ্ছা'। বসন্তকাল আসিয়াছে, কবির মন প্রতি বৎসরের ন্যায় প্রকৃতির সঙ্গে আপনাকে মিলাইয়া দিবার জন্য ব্যাকুল। সংগীতের জন্য অন্তর পিপাসিত; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে হইতেছে। আকাশে যখন বসন্তের স্পর্শ লাগিয়াছে, তখন হঠাৎ 'বাণী'দানের বিভীষিকা হইতে জাগিয়া দেখেন যে তিনি চির 'গৃহছাড়া' দলের একজন।

সকল কাজের মধ্যে চিরবুভুক্ষু কবিচিত্ত সংগীতের জন্য আকুল, অথচ প্রাণে গান নাই। অপরদিকে দেশের বর্তমান কঠিন অবস্থায় মন হইতে কিছুতেই দেশ সম্বন্ধে দুর্ভাবনা মুছিয়া ফেলিতে পারিতেছেন না। তবে তাঁহার কথা কাহারই বা কর্ণগোচর হইবে? The poets are too primitive for this age (*Letters from Abroad* p. 89)। তিনি ভালো করিয়াই জানেন যে যখন তিনি দেশে ফিরিবেন, the poet will be defeated (p. 90)।

১ *Letters to a Friend*, p. 136

দেশে ফিরিয়া কবিকে যে গভীর প্রতিরোধের মধ্যে পড়িতে হইবে, তাহা তিনি অনুমান করিতেছেন। তিনি লিখিতেছেন, নিজের দেশের জন্য তাঁহার বিশেষ প্রেম নাই, এ কথা সত্য নহে। দেশকে তিনি ভালোবাসেন ততক্ষণ, যতক্ষণ উহা বহির্জগতের বাস্তবতাকে অবরুদ্ধ করিয়া না দাঁড়ায়। তিনি আধ্যাত্মিক তুরীয়তার এমন উচ্চ শিখরে এখনো আরোহণ করেন নাই, যেখান হইতে দেশ ও বিদেশ সম্বন্ধে ভেদাভেদ নিরর্থক বা অনাবশ্যক বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন। কিন্তু অন্তরের অন্তর হইতে তিনি জানিতে পারেন যে এই মনোভাবের অনেকখানি অবাস্তব। (As there is in all passions that are generated through contraction of consciousness, through rejection of a great part truth—*Letters from Abroad* p 93)।

এন্‌ড্রুজ একবার প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, ইহুদিজাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া ও যীশুখৃষ্টের মধ্যে জাত্যাভিমান দেখা যায় না কেন; অথচ ইহুদীদের ন্যায় 'জাতিপ্রেম' খুব কম জাতির মধ্যে দেখা যায়। কবি উত্তরে লেখেন, 'It was because the great truth of man, which he realised, through his love of God, would only be cramped and crushed within that enclosure'—*Letters from Abroad*, p. 93।

কবি জানেন তাঁহার নিজের মধ্যে দেশপ্রেমিক ও রাজনীতিকের অনেক কিছু আছে; এবং সেইজন্য তাঁহার ভয় পাছে অন্তরের সত্যদৃষ্টি আচ্ছন্ন হয় (I have an inner struggle against submitting myself to their sway)। ভারত যখন কোনো অন্যায়ে উৎপীড়িত হয়, তখন তাহার বিরুদ্ধে তিনি বরাবরই দাঁড়াইয়াছেন; কিন্তু সে-দায়িত্ব ভারতবাসী বলিয়া নহে, মানুষ বলিয়া মানুষের দুঃখের অপমানের প্রতিবাদ করিয়াছেন (the responsibility is ours to right the wrong, not as Indians but as human beings)। সেইজন্য পৃথিবীর যেখানে কোনো অন্যায় অত্যাচার দেখিয়াছেন কবি তাহার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়া সাধ্যমত প্রতিবাদ জানাইয়াছেন।

দেশপ্রেম বা জাতিপ্রেম ভূগোলের পৌত্তলিকতার (idolatry of Geography) উপর প্রতিষ্ঠিত। জাতিপ্রেম বা ন্যাশনালিজম্ স্তূপীকৃত বৃহতের উপাসক; ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বা এককের অস্তিত্ব বা বিচিত্রের সমবায় তাহার অন্তরায়। সমস্তকে এক-আকার [uniformity] না করিতে পারিলে নেশনের তৃপ্তি হয় না। যে পার্থক্য মূলগত তাহাকে সে স্বীকার করিবে না; সে সংখ্যার দ্বারা শক্তিবৃদ্ধি করিতে চায়। শক্তি— উহা দেশপ্রেমের রূপই লউক অথবা অন্য যে-কোনো ভাবেই রূপ গ্রহণ করুক— শক্তি স্বাধীনতার পক্ষপাতী নহে। রাজনীতিজ্ঞরা একতার কথা বলেন, কিন্তু ভুলিয়া যান যে যথার্থ ঐক্য স্বাধীনতার মধ্য দিয়া স্থাপিত হয়। একাকারত্ব হইতেছে বন্ধনের ঐক্যমূর্তি।

কবি বলিলেন, 'আমি ভারতকে ভালবাসি; কিন্তু সে ভারত— আইডিয়া— ভৌগোলিক সংজ্ঞা নহে। সুতরাং আমি দেশপ্রেমিক নহি, আমি চিরদিন জগতময় আমার মনের মানুষ খুঁজিয়া বেড়াইব'[১]।

বিশ্বভারতীকে প্রতিষ্ঠানরূপে সংগঠন করিতে গিয়া কবির কেবলই মনে হইতেছে যে তাঁহার অন্তরের স্রোতধারাকে উহা যেন স্তব্ধ করিয়া দিবে। নানাদিক হইতে উহা শক্তিশালী হইতে পারে— এই সম্ভাবনায় তিনি আতঙ্কিত। এই আশঙ্কার কারণ এই যে, বিশ্বভারতীর শক্তি বাহির হইতে আহরিত হইতেছে এবং সে-শক্তি বস্তু-আশ্রয়ী অর্থাৎ ধনাগমের উপর নির্ভর। শান্তিনিকেতন সাধকের ধ্যানের সৃষ্টি, জীবনশিল্পী কবির রচনা। রবীন্দ্রনাথ যাহা কল্পনায় দেখিয়াছেন, তাহাকেই মূর্তি দিয়াছেন এতকাল ধরিয়া। ইহার উপকরণের বোঝা ছিল কম, বিধিবিধানের

১ "For patriotism is proud of its bulk....It would not acknowledge a difference which was fundamental. ...Why? Because power lies in number and in extension. ...It talks of unity—but forgets that true unity is that of freedom. Uniformity is unity in bondage." *Letters from Abroad* pp. 94-95.

নড়চড় করা শক্ত ছিল না— স্বাধীনতার মধ্যে সৌন্দর্যের সংযম সেখানকার ঐশ্বর্য। কবির ভয় আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় হইলে, উহার ভার হইবে গুরু, গঠনবিধি হইবে কড়া, সমস্তকে সুদৃঢ় করার দিকে যাইবে সকলের মন। অদলবদল করিতে গেলেই উহা ফাটিয়া হইবে চৌচির। কবির আরও আশঙ্কা এই নব প্রতিষ্ঠান শান্তিনিকেতনের পুরাতন বিদ্যালয়কে কোণঠাসা করিয়া মারিবে[১]। সকলেই বলেন বিশ্বভারতীকে স্থায়িত্ব দিবার জন্য organisationএর প্রয়োজন; কিন্তু কবির দৃষ্টিভঙ্গী অন্যরূপ।

তিনি বলেন যে, ঐ প্রতিষ্ঠান কালে সমাধিস্তম্ভের ন্যায় স্থায়ী ও স্তব্ধ হইয়াও স্থায়ী হইতে পারে। কিন্তু সে প্রাণহীন স্থায়িত্বদানে কবির কোনো আনন্দ নাই।

আমেরিকা হইতে য়ুরোপে ফিরিয়া এন্ড্রুজকে লিখিতেছেন যে, তাঁহার আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিস্থাপনের পরিকল্পনার কথা এখানে-সেখানে শুনিতেছেন। আন্তর্জাতিক লব্ধপ্রতিষ্ঠ জ্ঞানবান ব্যক্তিদের লইয়া পরিচালনা-সমিতি গঠনের কথা চলিতেছে; বুদ্ধিমান দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ধনবান ব্যক্তিদের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া কঠিন ভিত্তির উপর বিশ্বভারতীকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব হইতেছে। কিন্তু কবি কবুল করিতেছেন যে, প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দূরদৃষ্টি তাঁহার নাই, তবে তাঁহার আছে অন্তর্দৃষ্টি— তাহারই বলে তিনি দূরকালের স্বপ্ন দেখেন।

রবীন্দ্রনাথ কবি হইলেও ব্যবহারিক জ্ঞানের অভাব তাঁহার ছিল না; তিনি ভালো করিয়াই জানেন শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে বিজ্ঞলোকের দূরদৃষ্টি কখনো উহাকে পরিত্যাগ করিবে না। তাঁহারাই উহার কর্ণধার হইয়া বসিবেন; বুদ্ধিমান বিষয়ী লোক যাঁহারা অর্থ দিবেন, তাঁহারা উপদেশও দিবেন, সকলেই নিশ্চিন্ত হইবেন স্থায়িত্ব সম্বন্ধে।

কবির মতে এই স্থায়িত্বের মূল্য দিতে গিয়া জীবনেরও স্বাধীনতার অনেকখানি খর্ব করিতে হইবে, পাখির পিঞ্জর স্থায়ী, কুলায় নহে। জগতে যা-কিছু সত্যকারের স্থায়ী সৃষ্টি, তাহাকে অসংখ্য অ-স্থায়িত্বের মধ্যে দিয়া চলিতে হয়; বসন্তের ফুল স্থায়ী, কারণ, তাহারা জানে কেমন করিয়া মরিতে হয়। যে মন্দির পাথর দিয়া গাঁথা, সে সহজে মৃত্যুর সঙ্গে আপোস করিতে পারে না; ইঁটপাথরের অহংকারে সর্বদাই মৃত্যুকে বাধা দিতে তার চেষ্টা চলে, যে-পর্যন্ত না শেষকালে সত্যই তার বিলোপ ঘটে (p. 109)। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় প্রাণের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উহার স্থায়িত্ব অর্থপূর্ণ; কিন্তু কবির ভাবনা আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় বিধিবিধানের উপর তাহার স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে।

প্রতিষ্ঠান গড়িবার সংকল্প গ্রহণ করিবার মুহূর্ত হইতেই কবির দূরদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি যুগপৎ ভবিষ্যতের রূপকে দেখিতে চেষ্টা করিতেছে এবং আশঙ্কায় তাঁহার কবিহৃদয় ব্যথিত হইতেছে। কিন্তু আমাদের কথা এই যে, চিরদিনই প্রতিভার প্রেরণায় সৃষ্টি হয়; সংঘ উহাকে স্থায়িত্ব দান করে। মহাপুরুষের ভাবধারাকে চলিষ্ণু রাখে তাঁহার পরবর্তী সংঘসেবকগণ। বিশ্বভারতী সেই সংঘশক্তির অপেক্ষায় আছে, যাহা রবীন্দ্রনাথের বাণীকে মূর্তিদান করিয়া প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে। ১৯২০-২১ সালে রবীন্দ্রনাথ য়ুরোমেরিকায় ভ্রমণকালে যেসব বক্তৃতা করেন, সেগুলি *Creative Unity* নামে সংগৃহীত হয়। বইখানি উৎসর্গ করেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লিউইসকে।[২]

১ "Santiniketan has been the playground of my own spirit. What I created on its soil was made of my own dream-stuff. Its materials are few; its regulations are elastic; its freedom has the inner restraint of beauty. But the International Uuiversity will be stupendous in weight and rigid in construction; and if we try to move it, it will crack. It will grow up into a bully of a brother, and browbeat its sweet elder sister into a cowering state of subjection."—*Letters from Abroad*, p. 100.

২ Edwin Herbert Lewis (1866, Nov. 28). *The Work of Tagore*, Chicago Literary Club, 1917. (President Ch. Lit.

ইতিপূর্বে ১৯১২-১৩ সালে ইংলন্ডে প্রদত্ত বক্তৃতাধারা *Sadhana* নামে প্রকাশিত হয়। ১৯১৬-১৭ সালে জাপানে ও আমেরিকায় যে বক্তৃতা দেন, তাহার মধ্যে দার্শনিক প্রবন্ধগুলি *Personality*-তে ও রাজনীতির সমালোচনামূলক বিষয় *Nationalism* গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক নহেন এ কথা সর্বজনবিদিত। তাঁহার ধ্যানলব্ধ জ্ঞান ও আত্মানুভূত সত্য তিনি আপনার মত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সেইজন্য দর্শনের সাধারণ ছাত্র-অধ্যাপকেরা রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বালোচনাকে কবিজনোচিত জ্ঞানে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। কারণ, দর্শনের পরিভাষায় তাঁহার রচনা লিখিত নহে। অথচ কোনো কবি বা সত্যদ্রষ্টা কখনো দর্শন-গ্রন্থ লেখেন নাই, তাঁহাদের সাধনলব্ধ সত্যকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন অন্যেরা। বাংলাদেশ সেই দার্শনিকের অপেক্ষায় আছে, যিনি রবীন্দ্রনাথের মতবাদকে দার্শনিকের ভাষায় বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করিয়া একটি সমগ্রতা দান করিবেন।

রবীন্দ্রনাথের এইবারকার গ্রন্থের নামাকরণের মধ্যে বিশেষত্ব আছে। আঁরি বের্গসঁ লেখেন *Creative Evolution*, কবির বইএর নাম *Creative Unity* ও ইহার পর কাইসারলিঙ লেখেন *Creative Understanding*। বের্গসঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে আমরা বৈজ্ঞানিক বা জীবতাত্ত্বিক বলিতে পারি। অভিব্যক্তিবাদে অতীতকে ছাড়িয়া আসিতে হয়।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী ঐতিহাসিক বা মানসিক। তাঁহার মতে সমস্ত অচ্ছেদ্যভাবে পরস্পরের সহিত যুক্ত; সৃষ্টির মধ্যে সব অবিচ্ছিন্ন; নদীর উৎপত্তি ও সাগরমধ্যে তাহার আত্মসর্জন এবং পুনরায় বাষ্পাকারে জলধারায় পরিণতি— সমস্তের মধ্যে বহমান একটি ঐক্য। যাহা ফিরিয়া ফিরিয়া আসে— অনন্তগতি শূন্যতা সে নহে।

রবীন্দ্রনাথের এই ভাষণগুলি আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলেই দেখা যাইবে যে, তাহার মধ্যে একটি সংগতি আছে। বিশ্বপ্রকৃতিতে জড় জীব আকাশ অন্তরীক্ষ কবিদের নিকট অর্থহীন প্রলাপ বলিয়া প্রতিভাত হয় না; আমাদেরই অস্বচ্ছ দৃষ্টিতে কবির সৃষ্টিকে অসংবদ্ধ বলিয়া ঠেকে।

'ক্রিয়েটিভ ইউনিটি' গ্রন্থে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে— ১. The Poets' Religion, ২. The Creative Ideal, ৩. The Religion of the Forest,[১] ৪. An Indian Folk Religion, ৫. East and West[২], ৬. The Modern Age[৩], ৭. The Spirit of Freedom, ৮. The Nation, ৯. Woman and Home, ১০. An Eastern University। ১৯১৭ সালে প্রকাশিত *Personality* গ্রন্থে সঞ্চিত প্রবন্ধগুলির সহিত *Creative Unity*র ভাষণগুলির ভাবগত ঐক্য রহিয়াছে; *Nationalism* গ্রন্থের ব্যক্ত মতামতেরও প্রতিধ্বনি পাই ৫-৮ সংখ্যক চারিটি প্রবন্ধে। ১৯১৭ সালে রচিত প্রবন্ধাবলীর বিষয়বস্তুর পুনরুক্তি এগুলি নহে; জীবনের নূতন অভিজ্ঞতা ও পৃথিবীর রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিরাট পরিবর্তনের মুখে কবির দৃষ্টিভঙ্গীও পরিবর্তন হয়েছে। কবির বাংলা গদ্য রচনার সহিত পরিচিত পাঠকের নিকট ইংরেজির কোনো ভাষণ তেমন নূতন ঠেকিবে না।

Club 1919-20)। ১৯১৩ সালে কবি যখন আর্বানায় বক্তৃতা দেন তখন এই অধ্যাপকের সহিত কবির ঘনিষ্ঠতা হয়। United States Information Service (USIS), কলিকাতা-শাখা Library of Congress-এ লিখিয়া Lewis সম্বন্ধে বহু তথ্য সরবরাহ করিয়াছেন; তজ্জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

১ Cf. The Message of the Forest, Modern Review, May 1918.

২ East and West, Modern Review, September 1921.

৩ The Modern Age, Modern Review, December 1921.

সমসাময়িক আশ্রমের কথা

প্রায় চৌদ্দ মাস পরে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন। এই সময়ে শান্তিনিকেতনের 'সর্বাধ্যক্ষ' ছিলেন জগদানন্দ রায়। তবে এন্‌ড্রুজ সেখানে থাকায় অনেক দায়িত্ব তাঁহার উপর ছিল, বিশেষত অর্থের দায়। এই সময়ের মধ্যে আশ্রমে আসেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, গান্ধীজি ও সৌকত আলী। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের পূর্ব নাম ছিল লালা মুন্সিরাম— ইনি হরিদ্বার গুরুকুলের প্রতিষ্ঠাতা— কয়েক বৎসর হইতে আর্যসমাজের সন্ন্যাসী— এখন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ও হিন্দুসংগঠনের অন্যতম নেতা। তিনি অগস্ট (১৯২০) মাসের শেষভাগে শান্তিনিকেতন পরিদর্শনে আসেন— এন্‌ড্রুজ তাঁহার যথোপযুক্ত অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বাল্মীকি-প্রতিভা ছাত্রেরা অভিনয় করিয়া সন্ন্যাসী-অতিথিকে দেখায়।[১]

এই পর্বটা গান্ধীজিপ্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের সমকালীন। রবীন্দ্রনাথ বিদেশ হইতে যে পত্রধারা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বারে বারে বলিতেছেন যে শান্তিনিকেতনকে যেন রাজনীতির আবর্তে টানিয়া আনা না হয়। আশ্চর্যের বিষয় এবং ততোধিক দুঃখের বিষয় যে, রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনে নিখিল মানবের মহামিলনতীর্থ স্থাপনের সংকল্প লইয়া বিদেশে বিশ্বভারতীর বিশ্বমৈত্রীবাণী প্রচার করিতেছেন, ঠিক সেই সময়েই শান্তিনিকেতনের কর্মীরা তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে তাঁহার আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত মত লইয়া মত্ত। যে-শান্তিনিকেতনকে কবি এতাবৎকাল রাজনীতির উত্তেজনা হইতে দূরে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, আজ সেখানে অসহযোগ আন্দোলন লইয়া সকলেই উত্তেজিত। এন্‌ড্রুজ যিনি কবির প্রতিনিধিরূপে আশ্রমে বাস করিতেছিলেন, আশ্রমে এই আন্দোলন সম্পর্কে তাঁহারই উৎসাহ ছিল বেশি।

কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের কয়েকদিন পরে গান্ধীজি বিশ্রামের জন্য শান্তিনিকেতনে আসিলেন (১৩ সেপ্টেম্বর ১৯২০)। এবারের আগমন এন্‌ড্রুজের মধ্যস্থতায় ঘটে। কবির জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ আশ্রমের দক্ষিণে 'নিচুবাংলায়' বাস করেন। বিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁহার কোনোদিন কোনো যোগ ছিল না, তিনি আপন মনে আপনার দর্শন গণিত আলোচনা লইয়া থাকিতেন। তিনি এই আন্দোলনে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন ও গান্ধীজিকে একখানি পত্রযোগে এই অসহযোগ সমর্থন করেন। বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও কর্মীদের মধ্যে একদল এই আন্দোলনের প্রবল সমর্থক; অপর পক্ষে পুরাতন কর্মীদের মধ্যে যাহারা প্রাক্তন ছাত্র ও যাহারা কবিকে ও কবির আদর্শকে শ্রদ্ধা করিত তাহারা ছিল ইহার বিরোধী।

গান্ধীজির আশ্রমে বাসকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন মৌলনা সৌকত আলী। ইনি ও ইঁহার ভ্রাতা মহম্মদ আলী ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে চিরস্মরণীয়; ইঁহারাই খিলাফত আন্দোলনের জনক হইলেও অসহযোগ আন্দোলনে ইঁহারা ছিলেন গান্ধীজির প্রধান সহায়। দীর্ঘকাল অন্তরীণে আবদ্ধ থাকিবার পর ১৯১৯-র শেষভাগে আলীভ্রাতারা মুক্তিলাভ করেন। ১৯২০ মে মাসে তুর্কীর সহিত মিত্রশক্তির সন্ধিশর্ত প্রকাশিত হইলে, দেখা গেল তুর্কী-সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব আর থাকে না। তখন খলিফা তথা সুলতানের রাজনৈতিক অধিকার ও সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ভারতের মুসলমানসমাজের মধ্যে আন্দোলন সৃষ্টি হইল। ইহাই 'খিলাফত' আন্দোলন নামে পরিচিত। খিলাফত প্রচার ব্যপদেশেই সৌকত আলীর বাংলাদেশে আগমন। গান্ধীজি

১ Sykes p. 151; C. F. Andrews' *Letter to Poet*, 31 August 1920.

আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া তিনি তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন। শান্তিনিকেতন-আশ্রমের ইতিহাসে এটি স্মরণীয় ঘটনা। এখানে এতকাল মুসলমানদের সম্বন্ধে যে অন্ধ গোঁড়ামি কর্মীদের মধ্যে ছিল, তাহা আজ রাজনৈতিক উত্তেজনার মুখে হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেল। বিধুশেখর ভট্টাচার্য স্বয়ং সৌকত আলীকে সাধারণ ভোজনাগারে লইয়া গিয়া আহারস্থানে বসাইলেন! অথচ কয়েক বৎসর পূর্বে যখন একটি মুসলমান বালক ছাত্ররূপে আসিবার প্রার্থী হয় তখন তাহাকে কোথায় কিভাবে আহার করিতে দেওয়া যাইবে, তাহা লইয়া অনেকের কী দুর্ভাবনা দেখা দিয়াছিল! সাময়িক উত্তেজনায় ও আশু রাজনৈতিক ফললাভের আশায় মানুষ হঠাৎ বড়ো কাজ করিয়া ফেলে— ইহা তাহারই অন্যতম দৃষ্টান্ত। অথচ রবীন্দ্রনাথের শত উপদেশেও একাজ এতদিনে হয় নাই; কারণ সেখানে উত্তেজনা ছিল না, ছিল বিশুদ্ধ ধর্মবুদ্ধির উপর নির্ভর। এন্‌ড্রুজ কবিকে মহোৎসাহে আমেরিকায় লিখিতেছেন (৮ ডিসেম্বর ১৯২০), 'So now in the kitchen we have no Brahmin lines, for no one cares a pin about it, at last'.—*Life of C. F. Andrews*, p. 160। বলা বাহুল্য এ সংবাদ উত্তেজনার সুরে বাঁধা।

অথচ চারিমাস পূর্বে অগস্ট মাসের গোড়ায় এন্‌ড্রুজ কবিকে আশ্রমের রন্ধনশালা ও ভোজনাগার সম্বন্ধে যে পত্র দেন, তাহা হইতে জানিতে পারি যে গুজরাটি ছাত্রদের জন্য পৃথক ভোজনাগারে ছাত্ররা তাহাদের 'জাত' রক্ষা করিয়া পৃথক পৃথক দলে বসিতেছে; সে ঘরে তাঁহার প্রবেশাধিকার নাই। তবে তিনি আশাবাদী— আশা করেন এ সব বাধা দূর হইবে।[১]

জাতির পাঁতি তুলিবার জন্য কয়েকজন অভিভাবক তাঁহাদের আশ্রিত কয়েকটি ছাত্রকে আশ্রম হইতে সরাইয়া লইয়া যায় বলিয়া জানা যায়।

দেশের দিকে দিকে অসহযোগের ঝটিকায় মেঘ জমিতেছে— তাহার অভিঘাত অচিরকালের মধ্যে আশ্রমকেও স্পর্শ করিল। সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতার বিশেষ কংগ্রেস অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি নাগপুরের বার্ষিক অধিবেশনে (১৯২০ ডিসেম্বর) অনুমোদিত হইল। এই অধিবেশনে রাজনীতির সব চেয়ে বড়ো জয় হইল চিত্তরঞ্জন দাশকে কংগ্রেসের মধ্যে পাওয়ায়। চিত্তরঞ্জন ব্যারিস্টারি ছাড়িয়া, সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া এই আন্দোলনে যোগ দিলেন। গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব জয়যুক্ত হইল।

নাগপুর কংগ্রেসে স্থির হইল গবর্মেণ্টের সহিত সকল প্রকার সম্বন্ধ বর্জনই স্বরাজ লাভের একমাত্র উপায়; আগামী বৎসর (১৯২১ এপ্রিল) ভারতে মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড-সংবিধান প্রবর্তিত হইবে, তাহা কংগ্রেস বর্জন করিবেন। এ ছাড়া স্কুল-কলেজ ত্যাগ করিয়া ছাত্ররা জাতীয় বিদ্যালয়ে পড়িবে; সরকারী চাকুরেরা গবর্মেণ্টের কাজ ছাড়িবেন ইত্যাদি। মোটকথা গবর্মেণ্টের সহিত সকল প্রকার সম্বন্ধ ও সহযোগিতা ছিন্ন করিয়া গবর্মেণ্টকে অচল করিতে হইবে[২]— ইহাই হইল সংকল্প। গান্ধীজি ঘোষণা করেন, এইভাবে কাজ করিতে থাকিলে এক বৎসরের মধ্যে 'স্বরাজ' লাভ সুনিশ্চিত।

১ Sykes : *C. F. Andrews*, p. 152.

২ ১৯০৫ সালে বাংলাদেশে ইংরেজের বিরুদ্ধে 'বয়কট' আন্দোলন আসে— সেদিনও স্কুল-কলেজ ত্যাগ, জাতীয় শিক্ষালয় স্থাপনের প্রস্তাব হয়। আর ব্রিটিশপণ্য বয়কট বা বর্জননীতি প্রচারিত হয়। সেই বর্জননীতির ফলে আমেদাবাদ, বোম্বাই-এর মুহ্যমান কাপড়ের কলগুলি বাঁচিয়া গিয়াছিল। গান্ধীজিপ্রবর্তিত জাতীয় বিদ্যালয় আন্দোলন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় গতবারেরই মতো; তাঁহার খদ্দর চরকা আরো ব্যর্থ হইয়াছে— দেশব্যাপী আত্মপুষ্ট খদ্দরশিল্প সৃষ্ট হয় নাই। ১৯০৫-এর আন্দোলনের অভিঘাতে বাংলাসাহিত্যের মধ্যে দেশপ্রেমাত্মক বহু সংগীত, কবিতা, নাটক রচিত হয়— এবারের আন্দোলনে সাহিত্যিকের মনকেও সে-স্তরে উদ্রিক্ত করিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথের ১৯০৫-এর ও ১৯২১-এর রচনা তুলনীয়।

নাগপুর কংগ্রেসে অসহযোগনীতি প্রস্তাব গৃহীত হইলে কলিকাতায় ছাত্রসমাজের একাংশ স্কুল-কলেজ ত্যাগ করিয়া চিত্তরঞ্জন-প্রতিষ্ঠিত নূতন জাতীয় শিক্ষালয় বা বিদ্যাপীঠে প্রবেশ করিল ; একদল গ্রামের কাজে চলিয়া গেল ; তাহাদের ধারণা এক বৎসর গ্রামে বসিয়া চরকা কাটিতে পারিলেই 'স্বরাজ' আসিবে।

শান্তিনিকেতনে অসহযোগের তরঙ্গ লাগিল। পূজাবকাশের পূর্বেই আশ্রম-বিদ্যালয়ের সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ক্ষীণসূত্রের যোগ ছিল, তাহাও ছিন্ন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এতাবৎকাল শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা 'প্রাইভেট' প্রার্থীরূপে পরীক্ষা দিয়া আসিতেছে ; পরীক্ষার্থীদের আবেদনপত্রে লিখিতে হইত যে তাহারা গত বারো মাস কোনো বিদ্যালয়ে পড়ে নাই (not read in any school)। এতদিন পরে এই উক্তির মধ্যে অসত্যের আভাস আবিষ্কৃত হইল! এন্‌ড্রুজ কবিকে লিখিতেছেন (২৯ সেপ্টেম্বর '২০), 'but we feel that the whole country is moving forward to independence we should be independent too'। এন্‌ড্রুজ বৃহত্তর পটভূমি হইতে বিদ্যালয়কে দেখিতেছিলেন। কিন্তু পরীক্ষার্থীদের আবেদন পত্রে 'মিথ্যা' কথা লিখিত হয় বলিয়া যাঁহাদের 'বিবেকে' বিঁধিতে লাগিল, সেটা তাঁহাদের— যাহাকে বলে second thought— উত্তেজনার মুহূর্তে আবিষ্কৃত সত্য!

রবীন্দ্রনাথ এই সংবাদ পাইয়া এন্‌ড্রুজকে লেখেন যে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা উঠাইয়া দিতে তাঁহার কোনো আপত্তি নাই। এন্‌ড্রুজ প্রত্যুত্তরে মহানন্দে লিখিলেন, 'There was universal acclamation at your decision to abandon the matriculation (Life, p. 160)। কথাটা আংশিকভাবে সত্য, কারণ, একদল তখনও ম্যাট্রিকুলেশন উঠাইয়া দিবার ঘোর বিরোধী ছিলেন।

ইহার পর যখন কলিকাতায় ছাত্রসমাজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে nationalise করিবার জন্য আন্দোলন তুলিয়া ধর্মঘট করিল, তখন শান্তিনিকেতন আর স্থির থাকিতে পারিল না। অর্থাৎ এখানকার কর্মীরা অস্থির হইলেন— ছাত্ররা নহে। কবি যে বার বার লিখিতেছেন শান্তিনিকেতনকে রাজনীতি হইতে দূরে রাখো, সে-কথা কানে প্রবেশ করিলেও কাহারও মনকে স্পর্শ করিতেছে না। এন্‌ড্রুজ কবিকে (১৫ জানুয়ারি ১৯২১) লিখিতেছেন, 'After what has happened in Calcutta all are saying we must not for very shame have the matriculation now.' অর্থাৎ বাহিরের রাজনৈতিক উত্তেজনার সহিত শান্তিনিকেতনকেও তাল রাখিতে হইবে। কবি এন্‌ড্রুজের পত্রের উত্তরে নিউইয়র্ক হইতে লিখিলেন (২ ফেব্রুয়ারি ১৯২১), 'Let it go. I have no tenderness for it'। কবির মনের কথা ঠিক এটি নয়।[১]

তাঁহার হৃদগত ভাবটি প্রকাশ পায় আর-একখানি পত্রের মধ্যে (৫ মে ১৯২১)। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ও সমসাময়িক শিক্ষক সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখিতেছেন ; "ম্যাট্রিক আমার মনের মতো জিনিস নয়— কিন্তু দেশের অধিকাংশ লোক যখন এটা চায় তখন ছেলেদের জোর করে ম্যাট্রিক থেকে ছিন্ন করে আশ্রম থেকে বহিষ্কৃত করতে আমি এ পর্যন্ত পারিনি। আমার ইচ্ছা ছিল বিশ্বভারতীকে সম্পূর্ণ পাকা করে তুলে মাত্রিক ও অমাত্রিক এই

১ এন্‌ড্রুজ কবিকে লিখিতেছেন (৮ ডিসেম্বর ১৯২০), 'We are so thankful that the matriculation can now be finally abandoned...My idea is that we should not aim at taking more than about a hundred student in all. These would be as it were the background and then there would be our teachers who themselves were research students and learners and we should be one family together. The idea of All souls ; Oxford, has always deeply interested me, which is almost a purely a college *for research* and where the conventional *student who wishes* to *take 'degree, etc., is not encouraged....'*—Sykes ; *C. F. Andrews*, p. 161। এন্‌ড্রুজের এই কথাটি আজও গভীরভাবে চিন্তনীয়। বিশ্বভারতীর আদিযুগে ইহাই ছিল আদর্শ।

দুই ধারা রক্ষা করব, শেষকালে দুই ধারা যথা সময়ে একে এসে মিলবে। আমি উপস্থিত থাকলে নিশ্চয়ই কোনো ছাত্রকে কাঁদিয়ে বিদায় করতে পারতুম না। এ সমস্ত সত্ত্বেও ম্যাট্রিক উঠে যাওয়াটা আমি তত ক্ষতিকর মনে করিনে— কারণ ওটা ভূতের মতোই আমাদের বিদ্যালয়ের ঘাড়ে চেপেছিল— গেছে আপদ গেছে। কিন্তু আমার আপত্তি এই যে, বিদ্যালয়ের নিজের ভিতরের দিক থেকে এই সংস্কার হল না, এটা হল নন-কো-অপারেশন পর্বের একটা অধ্যায় রূপে। বাহির থেকে পলিটিক্সের ঝাঁটা আমাদের শান্তিনিকেতনের পিঠের উপর পড়ল। তাতে করে পিঠের যদি কোনো ময়লা উঠে গিয়ে থাকে সেই সঙ্গে অনেকখানি চামড়াও উঠে গিয়েছে— তার ব্যথা এবং তার দাগ সহজে মিটবে না।"—ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

কবি দূর হইতে দেশের ও আশ্রমের যথাযথ ঘটনাগুলি ঠিক স্পষ্টভাবে ধরিতে পারিতেছেন না, কারণ, এন্‌ড্রুজ তাঁহাকে যেসব দীর্ঘপত্র লিখিতেছেন তাহাতে তিনি যে চিত্র আঁকিতেছেন, তাহা খুবই আশাপ্রদ, তাহার মধ্যে আশঙ্কার কোনো কারণ কবি খুঁজিয়া পাইতেছেন না। তথাচ তিনি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছিলেন যে ঠিক ভাবে সব চলিতেছে না। যে-এন্‌ড্রুজের উপর আশ্রমের ভার, তিনিই যে এই অসহযোগ আন্দোলন আমদানির জন্য দায়ী, তাহা কবি বুঝিতে পারিতেছিলেন কিনা জানি না। বড়ই দুঃখের বিষয় যে শান্তিনিকেতনের বিশিষ্ট কর্মীরাই কবিকে সর্বাপেক্ষা অধিক আঘাত করিতেছিলেন। সহজলভ্য স্বরাজলাভের জন্য সকলেই ব্যাকুল! প্রাচানদের মধ্যে জগদানন্দ রায় যাঁহাকে সাধারণভাবে অত্যন্ত বৈষয়িক বলিয়াই লোকে জানিত, তিনিই সেদিন কবির আদর্শকে নষ্ট হইতে দিবার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি ছিলেন এই আয়তনের মহাপঞ্চক।

এন্‌ড্রুজ এই আন্দোলনের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা লাভেরই ইঙ্গিত দেখিতে পাইতেছেন; তাই সকল মনপ্রাণ দিয়া ইহার সহিত একাত্ম হইয়াছেন। তাঁহার পক্ষে উহা চিত্তের বিলাস নহে, অলস কল্পনা নহে, সাময়িক উত্তেজনা নহে— এইটি তাঁহার যথার্থ খ্রীষ্টীয় ধর্মবোধ হইতে উদ্রিক্ত— খাঁটি ইংরেজ ও ভক্ত খ্রীষ্টানের ভাবনা— প্রভুত্ব-দাসত্ব দুই-ই মানবসমাজের বিকৃতি।

'স্বাধীন ভারত'— এই কথা এন্‌ড্রুজের মনে বহুকালের; ১৯১২ সালের ২০ ডিসেম্বর তিনি রবীন্দ্রনাথকে যে পত্র দেন, তাহাতে লেখেন; 'My thought run more and more to an India that shall be really independent . . '। তিনি বলেন যে ১৯১০ সাল হইতে এই ভাবনা তাঁহার মনে আসিয়াছিল। তাঁহার জীবনচরিতকার মিস্ সাইকস্ লিখিতেছেন, 'Independent India, was Andrews the first man in the century to make the claim ?'—Sykes, p. 84।

সেই ভাবনা হইতেই এন্‌ড্রুজ এই অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে তাঁহার একটি পথ যেন পাইতেছেন। তিনি আন্দোলনের সময়ে 'Independence—The Immediate Need' (Ganesan, Madras) শীর্ষক প্রবন্ধ লেখেন।

এন্‌ড্রুজের মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে (১৯৪০ ফেব্রুয়ারি), মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় লেখেন এই কথাই—"In order to avoid any wrong impression, let me add that I entirely agree with Prof. Seeley, when he says that 'prolonged submission to a foreign yoke is one of the most potent causes of national deterioration.' I quote from memory. The emphasis there is on the word 'prolonged'. Every year that now passes in India, without the removal of the foreign yoke, is undoubtedly an evil. It is likely to undo any benefit that may have been derived before. This was my thesis in a series of articles which I wrote in 1921, called 'The Immediate need of Independence', where I emphasized

the word 'immediate,' and I hold fast to every word which I then wrote. Nearly twenty years have passed since that date and hope deferred has made the heart sick. Things in India *have* deteriorated, as Prof. Seeley prophesied, and the evil is rapidly increasing. This agony of subjection is eating like iron into the soul and the strain must be relieved at once."[১]

১৯২১ সালের গোড়া হইতে অসহযোগ আন্দোলন সবেগে চলিতেছে। অধ্যাপক নেপালচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে বাহিরের কলেজের একদল ছাত্র[২] গ্রামের কাজ করিবার জন্য বোলপুর আসিলেন। তাঁহাদের কর্মকেন্দ্র হইল সুরুলের কুঠিবাড়ি। এন্‌ড্রুজই এসবের ব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত আশ্রম-বিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা ব্যপদেশে যে সামান্য সম্বন্ধ ছিল, তাহাতে এই আন্দোলনের উত্তেজনায় ছিন্ন হইয়া গেল। অথচ পরিতাপের বিষয় স্বাধীন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়িবার দিকে কোনো প্রচেষ্টা কাহারো মধ্যে দেখা গেল না। রবীন্দ্রনাথ গত বৎসর বিশ্বভারতীর যে পত্তন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাও বিস্তারলাভ করিল না। আশ্রম-বিদ্যালয়েরও শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে কোনো অভিনবত্ব দেখা গেল না। যাহা হইল সবই Negative। এন্‌ড্রুজ বরাবরই এই আন্দোলনের মধ্যে একটা মহত্তর দিক দেখিতেছিলেন। তিনি জানিতেন দেশের স্বাধীনতা আনিতে হইলে অনেক উত্তেজনা, অনেক অব্যবস্থা, এমন কি অনেক ব্যর্থতার মধ্য দিয়া যাইতে হইবে ; নিষ্কর্মের জড়তা হইতে যে-কোনো কর্মতৎপরতা হয় তাহাই ভালো। তিনি কবিকে এই আন্দোলনের ভাবাত্মক দিকটাকেই দেখাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। দেশের জন্য যুবকরা কিছু একটা করিতে উদ্‌গ্রীব, এইটাকেই তিনি দেশের শুভচিহ্ন বলিয়া মনে করিতেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ আন্দোলনের সেই দিকটাকে অস্বীকার করেন নাই ; তিনি ভাবাত্মক দিকটার কথা ভাবিয়া লিখিলেন (২ মার্চ ১৯২১) : "I hope that this spirit of sacrifice and willingness to suffer will grow in strength... It is in the fitness of things, that Mahatma Gandhi,...should call up the immense power of the meek, that has been waiting in the heart of the destitute and insulted humanity of India. The destiny of India has chosen for its ally...the power of soul and not that of muscle. And she is to raise the history of man from the muddy level of physical conflict to the higher moral altitude.'—*Letters from Abroad* pp. 72-73।

কিন্তু এই আন্দোলনের অভাবাত্মক দিকটার সংবাদও কবি পাইতেছেন ; তখন কিছুতেই এই আন্দোলনের সুরের সঙ্গে আপনার সুর মিলাইতে পারিতেছেন না। তিনি কোথায় যেন অমঙ্গল আশঙ্কা করিতেছেন। শিক্ষার সঙ্গে এই বিরোধ, জ্ঞানের সঙ্গে এই অসহযোগ— এই অশিক্ষিতের দেশে কবির কাছে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক অভিযান বলিয়া মনে হইতেছে। তিনি স্পষ্ট করিয়াই বলিলেন, অসহযোগ নীতি সত্যকে অনর্থক আঘাত করিতেছে। ইহা আমাদের গৃহের রন্ধনের অগ্নি নহে ; কিন্তু ইহা সেই অগ্নি যাহা আমাদের গৃহ ও পাকশালা উভয়কে ভস্মীভূত করিবে।

১ দ্র. Nehru, *Autobiography*, p. 66।

২ এই দলে যেসব ছাত্র ছিলেন, ইঁহাদের মধ্যে প্রায় অনেকেই পরে সরকারী বা আধাসরকারী কাজে লিপ্ত হইয়াছিলেন। কেবলমাত্র নীরেন্দ্র দত্ত দেশসেবায় এখনো ব্রতী— আত্রাইতে বৃদ্ধ বয়সে পড়িয়া আছেন জনসেবায়। তিনি পাকিস্তান ত্যাগ করিয়াও আসেন নাই।

শিকাগো হইতে (৮ মার্চ ১৯২১) শান্তিনিকেতনের সর্বাধ্যক্ষ জগদানন্দ রায়কে কবি লিখিলেন, "আমাদের দেশে ফেরবার সময় কাছে এসেছে। একদিকে যেমন মন খুশি হচ্ছে, তেমনি আর-একদিকে ভয় লাগচে পাছে দেশে লোকের সাথে আমার সুর না মেলে।

"Nationalism হচ্ছে একটা ভৌগোলিক অপদেবতা, পৃথিবী সেই ভূতের উপদ্রবে কম্পান্বিত ; সেই ভূত ঝাড়্‌বার দিন এসেছে। কিছুদিন থেকে আমি তার আয়োজন করচি। দেবতার নাম করলে তবেই অপদেবতা ভাগে। আমাদের শান্তিনিকেতনের দরজায় সেই দেবতার নাম লেখা ; আমাদের বিশ্বভারতীতে সেই দেবতার মন্দির গাঁথচি। দেশের নাম করে এখানে যদি আমরা কোনো বাধা দেবার বেড়া তুলি তাহলে আমাদের দেবতার প্রবেশ-পথে বাধা দেওয়া হবে। যে-ভারতবর্ষকে বহুকাল সমস্ত পৃথিবী একঘরে করে রেখেছে, সেই ভারতবর্ষে সমস্ত পৃথিবীকে নিমন্ত্রণ করবার পত্র নিয়ে আমি বেরিয়েছিলুম— পাছে কিছুতে এই নিমন্ত্রণের পথ রোধ করে সেই আমার ভয়।· · সেদিন খবরের কাগজে পড়লুম মহাত্মা গান্ধী আমাদের মেয়েদের বলেছেন তোমরা ইংরেজি পড়া বন্ধ কর, সেই দিন বুঝেছি আমাদের দেশে দেয়াল গাঁথা শুরু হয়েছে, অর্থাৎ নিজের ঘরকে নিজের কারাগার করে তোলাকেই আমরা মুক্তির পথ বলে মনে করচি— আমরা বিশ্বের সমস্ত আলোককে বহিষ্কৃত করে দিয়ে নিজের ঘরের অন্ধকারকেই পূজা করতে বসেছি— একথা ভুল্‌চি, যে-সব দুর্দান্ত জাতি পরকে আঘাত ক'রে বড়ো হতে চায় তারাও যেমন বিধাতার ত্যাজ্য, তেমনি যারা পরকে বর্জন করে স্বেচ্ছাপূর্বক ক্ষুদ্র হতে চায় তারাও তেমনি বিধাতার ত্যাজ্য।"—প্রবাসী ১৩২৮ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ১৬৯।

আমাদের আলোচ্যপর্বে (১৯২০-২১) শান্তিনিকেতনের মধ্যে অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। নূতন শিক্ষাব্যবস্থাকে বিশ্বভারতীর 'উত্তরবিভাগ' বলা হইত। এই সময়ে হিরজীভাই পোস্তান্‌জি মরিস নামে এক পারসী যুবক আসেন ; ইনি ফরাসীভাষা ভালো জানিতেন। উত্তরবিভাগের ছাত্রদের ফরাসীভাষার ইনিই প্রথম শিক্ষক। গুরুদয়াল মল্লিক আসিলেন পঞ্জাব হইতে ; ইনি পঞ্জাবে জালিনবালাবাগ ঘটনার বেসরকারী তদন্তকালে এন্‌ড্রুজকে যথেষ্ট সহায়তা করেন। ইনি পঞ্জাবী হইলেও বাস করিতেন সিন্ধে। সিন্ধুদেশের সুফীদের সম্বন্ধে ইঁহার জ্ঞান ছিল গভীর। হাসপাতালের ডাক্তার আসিলেন চিমনলাল নামে এক সিন্ধী যুবক। ইনি পরম গান্ধীভক্ত। কয়েকমাস কাজ করিয়া তিনি দেশে চলিয়া যান— গ্রামের কাজ করিবার জন্য। জারমান পূর্ব-আফ্রিকা হইতে আসিলেন নরসিভাই পাটেল সপরিবারে। নরসিভাই ভালো জারমান জানিতেন— বিশ্বভারতীতে ইনি জারমান শিক্ষা দিতেন। এছাড়া তিনি গুজরাটি ছাত্রদের গুজরাটিও শিখাইতেন। এন্‌ড্রুজ সাহেবের ব্যবস্থায় ইনি আসেন।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে কয়েকজন পুরাতন ছাত্র আসিলেন শিক্ষক হইয়া ; যেমন সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ গুপ্ত, ভুবনেশ্বর নাগ, নরেন্দ্রনাথ নন্দী। ইতিপূর্বে ছিলেন গৌরগোপাল ঘোষ, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সুতরাং প্রাক্তন ছাত্রদের সংখ্যা এখন বেশ বাড়িল। পুরাতন শিক্ষকদের মধ্যে প্রমোদারঞ্জন ঘোষ কুচবিহারে চাকরী গ্রহণ করেন ; দেশের কাজ করিবার জন্য নেপালচন্দ্র রায় ও কালীমোহন ঘোষ কিছুকালের জন্য আশ্রম হইতে দূরে চলিয়া যান।

সমসাময়িক রাজনীতি

সমসাময়িক ভারত (১৯২০-১৯২১) জটিল সমস্যার সম্মুখীন। ধর্মে ভাষায়, সংস্কৃতিতে বিচ্ছিন্ন, মতান্তরে, মনান্তরে ক্ষুব্ধচিত্ত জনতাকে কোন্ ঐক্যসূত্রে বাঁধিয়া বৃটিশের শাসনশক্তির অবসান করা যাইতে পারে— ইহাই ছিল গান্ধীজির আদি জিজ্ঞাসা। ভারতের রাজনীতিতে হিন্দুমুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে যে মারাত্মক পার্থক্য, তাহারই সমাধান-চেষ্টা এই পর্বের স্মরণীয় ঘটনা। গান্ধীজি রাজনীতিক্ষেত্রে নামিবার বহু পূর্বে, বঙ্গচ্ছেদ ব্যপদেশে হিন্দুমুসলমানের মিলন সাধন করিতে গিয়া যেসব অঘটন ঘটে, রবীন্দ্রনাথ তাহার প্রত্যক্ষদর্শী; তখনও রবীন্দ্রনাথ এই সমস্যা বিষয়ে ভাবিয়াছিলেন, লিখিয়াছিলেন। ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের ক্ষেত্রে হিন্দুমুসলমানের পার্থক্যকে স্বীকার করিয়াই সর্বজন কল্যাণ-কামনায় ও কর্মে উভয় সম্প্রদায়ের মিলন সম্ভব— এই কথা রবীন্দ্রনাথ বলিয়া আসিতেছেন। জোড়াতালির মিলন বা বিশেষ রাজনৈতিক অভীষ্টসিদ্ধির জন্য মিতালি বারে বারে ব্যর্থ হইবে— এই ছিল কবির সতর্ক বাণী।

রবীন্দ্রনাথ হিন্দুমুসলমানের মিলনভাবনাকে সাহিত্যের মধ্য দিয়া ও নিজ ব্যক্তিগত জীবনের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, তাহাই আজ গান্ধীজি অন্য পরিপ্রেক্ষিতে বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রয়োগে প্রবৃত্ত। আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, মুসলমানের পক্ষে ধর্ম ও রাজনীতি একাত্মক, রাজনীতি হইতে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে তাহারা শিক্ষিত নহে। মুসলীমদের পক্ষে 'রুমের বাদশাই' অর্থাৎ ইস্তাম্বুলের তুর্কী সুলতানের 'মলিমাত্ব' দাবী আধুনিক জগতে অচল হইলেও ভারতীয় মুসলমানসমাজের সমস্ত দৃষ্টি এখানেই নিবদ্ধ হইল; রাজনীতিক আন্দোলনে মুসলমানদের সহানুভূতি ও সহায়তালাভের জন্য গান্ধীজি, নিখিল ইসলামের সম্মান বিপর্যস্ত এই কথা মনে করিয়া খিলাফত আন্দোলন সমর্থন করিলেন। তিনি জানিতেন যে, ধর্মের নামে মুসলমানেরা যত সহজে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারে, আর কোনো আহ্বান তাহাদের তেমনভাবে উৎচকিত করিতে পারে না। তিনি দেখিলেন সঙ্ঘবদ্ধ মুসলমান শিথিল-গ্রথিত হিন্দুদের সহিত অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিলে, তাঁহার আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হইবে এবং ১৯২০ সালের ডিসেম্বরের সংক্রান্তি দিনের মধ্যে 'স্বরাজ' হস্তগত হইবে। তাই তিনি মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক ধর্মান্দোলনকে উত্তেজিত করিয়া হিন্দুদের খিলাফত আন্দোলনে যোগদান করিতে বলিলেন— ইহার ফলে মুসলমানদের স্বভাব-সম্প্রদায়গত চেতনা উত্তেজিত হইতে থাকিল। গান্ধীজি জানিতেন মুসলমানদের সর্ববিষয়ে আত্মচেতন করিয়া তুলিতে পারিলে ভারতই শক্তিমান হইবে এবং তাহাদের শক্তিদ্বারা নিহিত ভারত শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। গান্ধীজি এই সময়ে শান্তিনিকেতনে আসেন, তাঁহাকে হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে— তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, 'We shall meet thom at their best। তিনি ভালো করিয়া জানিতেন—

এক পক্ষ শীর্ণ যে পাখির
ঝড়ের সংকটদিনে রহিবে না স্থির। —জন্মদিনে।

গান্ধীজির জীবনের তপস্যা ছিল— যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা দাও, লোভ করিও না— মা গৃধঃ।[১]

গান্ধীজিপ্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন, ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে তাহা ভালো কি মন্দ— তাহার বিচার-স্থান এ গ্রন্থে নহে। রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত এই নীতি কেন স্থানে স্থানে নানারূপ বিকারে পরিণত হইল— তাহার কারণ রবীন্দ্রনাথ বিদেশ হইতে লিখিত পত্রধারায় ব্যক্ত করিয়াছেন। এইখানে দ্রষ্টা ও স্রষ্টা বা কর্মীর ভেদ।

১ ভারত বিভক্ত হইয়া গেলে তিনি পাকিস্তানের প্রাপ্য অর্থ দিবার জন্য ভারত সরকারকে বাধ্য করেন।

পূর্বপরিচ্ছেদে আমরা যে ভাবে কবির পত্রধারা আলোচনা করিয়াছি, তাহা পাঠ করিলে এই ধারণা হইতে পারে যে, কবি ও কর্মীর মধ্যে কোনো মূলগত ভেদ ছিল। কবির আশঙ্কা ভারত হয়তো দ্বীপাচারী (insular) হইয়া পড়িবে— বিশ্বজগত ভারতের রুদ্ধদ্বার হইতে প্রত্যাখ্যাত হইবে। পত্রগুলি পাঠ করিলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে সেগুলি গান্ধীজির প্রতিবাদ ; কিন্তু দূর পরিপ্রেক্ষিতে আজ সেগুলি প্রতিবাদ মনে হইতেছে না— মনে হইতেছে পরিপূরক। কবি যাহা দ্রষ্টার ন্যায় দেখিয়াছিলেন, গান্ধীজি যাহা স্রষ্টার ন্যায় রূপরেখা অঙ্কিত করেন— স্বাধীনভারত তাহা সার্থক করিবার পথে চলমান।

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি উভয়েই পাশ্চাত্যসভ্যতা অনুকরণ-বিরোধী ; কিন্তু পাশ্চাত্যের মনস্বিতার যাহা শ্রেষ্ঠ দান, তাহাকে কেহই অস্বীকার করেন নাই। ইংরেজের প্রতি কোনো বিদ্বেষ ইঁহাদের ছিল না ; ইংরেজের শাসনযন্ত্র বা যান্ত্রিক-শাসনের বিরুদ্ধেই ইঁহাদের অভিযান। এই দুই পুরুষোত্তমকে সমগ্রভাবে বুঝিতে হইলে ইঁহাদের উভয়ের রচনা ধীরভাবে তুলনীয়। ভাবুকরূপে রবীন্দ্রনাথ যাহা শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী-মূর্তিতে গড়িবার প্রয়াস করেন, কর্মীরূপে গান্ধীজি তাহা প্রয়োগ করেন ব্যাপকতর ক্ষেত্রে, দেশমধ্যে। উভয়েই অজানা পথের পথিক, পথিকৃতের অবশ্যম্ভাবী ভুল ভ্রান্তি পদে পদে আঘাত পাইয়াছে, কিন্তু গতি স্তব্ধ হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক রাজনীতির আন্দোলন হইতে আপনাকে দূরে রাখিয়াছেন। কবির কথা কেহ কানে তুলিবে না, তাহা তিনি ভালো করিয়াই জানেন। তবে কবি বলিয়াই যেন তিনি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছিলেন যে, গান্ধীজি যতক্ষণ পর্যন্ত-না দারুণ কোনো আঘাত পাইবেন, ততক্ষণ স্বীকার করিবেন না যে, নিরুপদ্রব অহিংস সত্যাগ্রহের জন্য দেশবাসী প্রস্তুত হয় নাই। অন্ধশক্তি 'জাতীয়তা' নামে একটি অবচ্ছিন্ন ও অস্পষ্ট শব্দের নামে উচ্ছ্বসিত হইলে তাহার পরিণাম কী মারাত্মক হয়— তাহা অচিরেই প্রমাণিত হইল।

সমসাময়িক দুইটি ঘটনা রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে বিচলিত করিল— আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের ধর্মঘট ও মোপ্‌লা বিদ্রোহ।

তখন অখণ্ড বঙ্গদেশ ; পূর্ববঙ্গ ও আসামের যে রেলপথ চট্টগ্রাম হইতে আসামের তিনসুখিয়া পর্যন্ত বিস্তারিত ছিল, আজ তাহা বহুস্থানে খণ্ডিত। কিন্তু আমাদের আলোচ্যপর্বে আসাম-বেঙ্গল রেলপথ ১২০৬ মাইল দীর্ঘ ছিল। এই রেলপথে অকস্মাৎ ধর্মঘট ঘোষিত হইল।

১৯২১ সালে পৃথিবীব্যাপী বাজারমন্দার যুগ। আসামের চা-বাগিচার চুক্তিবদ্ধ কুলির দল সেই অর্থনৈতিক কারণে অত্যন্ত অভাবের মধ্যে পড়ে। কেমন করিয়া কুলিদের মাথায় প্রবেশ করিল যে, তাহাদের দেশে 'গান্ধীরাজ' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে— সেখানে ফিরিয়া গেলেই সকল দুঃখের অবসান সুনিশ্চিত। বাগিচা ত্যাগ করিয়া কুলিরা দলে দলে চাঁদপুর স্টেশনে হাজির হইতে লাগিল, স্টীমারযোগে গোয়ালন্দ হইয়া দেশে যাইবে। চা-বাগিচার মালিকরা সকলেই প্রায় ব্রিটিশ ; তাহারা প্রমাদ গণিল ; কুলি চলিয়া গেলে কাজ অচল। ব্রিটিশ বাগিচাওয়ালাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ব্রিটিশভারতীয় সরকার অগ্রসর হইলেন ; সরকারী হুকুমে চাঁদপুরে কুলিদিগকে স্টীমারে উঠিতে বাধা দেওয়া হইল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া অসহযোগী-নেতারা আসাম-বেঙ্গল-রেলওয়ের শ্রমিক ও কর্মচারীদিগকে 'ধর্মঘট' বা স্ট্রাইক করিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। ধর্মঘট হইল ; এন্‌ড্রুজ শান্তিনিকেতন হইতে চাঁদপুর উপস্থিত হইলেন (২১ মে ১৯২১); কিন্তু গবর্মেণ্ট কোনো প্রকার আপোষমীমাংসার জন্য অগ্রসর হইলেন না ; সরকারী ডাক ও কর্মচারীরা স্টীমলঞ্চে যাওয়া-আসা করিতে লাগিলেন। দীর্ঘকাল ধর্মঘট চলিল— কিন্তু কোনো ফল হইল না। অবশেষে চূড়ান্ত দুঃখের মধ্যে আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়া বাঙালী কর্মচারীদের কর্মে প্রবেশ করিতে হইল।

যাতায়াতের দুঃখ ভোগ করিল সাধারণ যাত্রী, আর অর্থের সর্বনাশ হইল চট্টগ্রামের তরুণ ব্যারিস্টার যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর। এই দারুণ ব্যর্থতা হইতে শ্রমিক সংঘবদ্ধ হইতে শিখিল। মরুভূমির পশুকঙ্কাল পথনির্দেশক।

এই ঘটনা হইতেও নিদারুণ হইতেছে মালাবারে মোপ্‌লা বিদ্রোহ। মালাবার তখন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির জেলা— বর্তমানে কেরল রাজ্যের অন্তর্গত। মালাবারের মোপ্‌লারা মুসলমান; তাহারা অত্যন্ত দুর্ধর্ষ— বহুবার তাহারা উপদ্রব সৃষ্টি করিয়াছে। খিলাফত আন্দোলনের সংবাদ শুনিয়া তাহাদের মাথায় ঢুকিল হিন্দুস্থানে অর্থাৎ উত্তর-ভারতে খিলাফত বা মুসলীম রাজ হইয়াছে— তাহাদের দেশেও কাফের নিধন, বা কাফেরকে মুসলমানধর্মে দীক্ষিত করিয়া 'ইসলামস্থান' স্থাপন করিতে হইবে। এই অশান্তি দীর্ঘকাল চলে, সরকারের পক্ষ হইতে উহা দমনের কোনো উৎসাহ নাই; তাঁহারা খুব ধীরে সুস্থে শান্তিস্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, পরে যেমন করিয়াছিলেন বাংলাদেশে ১৯৪৬ সালে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময়ে। ব্রিটিশ সরকারের যেন ইচ্ছা তাঁহারা ভালো করিয়া অসহযোগীদের বুঝাইয়া দেন 'প্যাক্‌স ব্রিটানিকা'র শাসনতন্ত্র কিয়দ্-পরিমাণে শিথিল হইলে কী দশা হয়।

গান্ধীজি ভারতের স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে হিন্দুদিগকে মুসলমানের 'খিলাফত' সমর্থনের জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন, আজ নানা স্থান হইতে সংবাদ আসিতেছে যে অসহযোগনীতি নিরুপদ্রবও নহে, অহিংসকও নহে। উগ্রপন্থী মুসলমানরা ভারতে পুনরায় ইসলাম-আধিপত্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিতেছে; কেবলমাত্র আলীভ্রাতৃদ্বয় এখনো গান্ধীজির আপাত-আনুগত্য বজায় রাখিয়া চলিতেছে বলিয়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে স্পষ্ট বৈরিতা দেখা যায় নাই— তবে এখানে-সেখানে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা প্রায়ই ঘটিতেছে। পাকিস্তানের ভিত্তিপ্রস্তর কন্‌গ্রেসের খিলাফত সমর্থনের দুর্বুদ্ধির দিন প্রোথিত হইল; একটা অতি-রাষ্ট্রিক মধ্যযুগীয় মতবাদকে রাষ্ট্রনীতিক সংগ্রামের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিবার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

ইতিমধ্যে ১৯২১ সালের জুলাই মাসে করাচিতে খিলাফত সম্মেলনে আলীভ্রাতৃগণ যে বক্তৃতা করিলেন, তাহা সরকারের মতে রাজদ্রোহাত্মক; বিচারে তাঁহাদের দুই বৎসর জেল হইল (সেপ্টেম্বর)। আলীভ্রাতৃযুগল কারা-প্রাচীরের অন্তরালে চলিয়া গেলে উগ্রপন্থী মুসলমানদের সংযত করিয়া রাখিবার মতো কোনো শক্তি আর কাহারও রহিল না। নানা কারণে হিন্দু-মুসলমান ও কন্‌গ্রেস-খিলাফতের মধ্যে প্রীতির বন্ধন শিথিল হইয়া আসিতে চলিল; জাতীয় আন্দোলনে বেসুর ধ্বনিল।

গান্ধীজি সেপ্টেম্বর (১৯২১) মাসে কলিকাতা হইতে সবরমতী (আহমদাবাদ) ফিরিয়া গিয়া ঘোষণা করিলেন যে আগামী ২৩ নভেম্বর গুজরাটের বরদোলী তালুকে করবন্ধ আন্দোলন (no-tax campaign) চালু করিবেন। গান্ধীজি আহমদাবাদ হইতে বোম্বাই আসিয়াছেন, সেখান হইতে বরদোলী (সুরত জেলা) যাইবেন। ইতিমধ্যে ১৭ নভেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ-এর পুত্র প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ (পরে অষ্টম এডোয়ার্ড ও বর্তমানে ডিউক অব্ উইন্‌ডসর্) ভারত-সফর উদ্দেশ্যে বোম্বাই বন্দরে উপস্থিত হইলেন। নগরীর গুণ্ডাশ্রেণীর লোকে অসহযোগ আন্দোলনের সুযোগ লইয়া যেসব লোক রাজপুত্র দেখিবার জন্য জাহাজঘাটে বা রাজপথে জমায়েত হইয়াছিল তাহাদের উপর পীড়ন শুরু করে। অচিরেই দাঙ্গা বাঁধিয়া গেল, ফলে ৫০ জন নিহত ও ৪০০ জন আহত হইল। গান্ধীজির বোম্বাই শহরে উপস্থিতি, তাঁহার ব্যক্তিত্ব, তাঁহার ধর্মোপদেশ কোনো কাজে লাগিল না। গান্ধীজি বরদোলী-সত্যাগ্রহ স্থগিত করিলেন— বুঝিলেন সত্যই দেশের লোকের মনকে অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত করা হয় নাই।

আহমদাবাদের কন্‌গ্রেস অধিবেশনের (১৯২১ ডিসেম্বর) পরেই গান্ধীজি বরদোলীতে সত্যাগ্রহ পরিচালনার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু সত্যাগ্রহ আরম্ভের পূর্বেই আবার অতর্কিত বাধা পাইলেন। উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর জেলার

চৌরিচৌরা নামক এক গ্রাম্য শহরের লোকেরা স্থানীয় পুলিশদের সহিত সামান্য কলহের সুযোগ লইয়া পুলিশথানা আক্রমণ করে ও ২১ জন দেশীয় পুলিশ ও চৌকিদারকে নৃশংসভাবে হত্যা করে (৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২২)। চৌরিচৌরার ঘটনা দেখিয়া শুনিয়া বিবেচক লোকে বুঝিলেন ধর্ম উপদেশের দ্বারা রাজনীতিক স্বার্থবুদ্ধিকে আধ্যাত্মিক করা যায় না। গান্ধীজিও বুঝিলেন সত্যাগ্রহের সময় হয় নাই; তিনি কন্‌গ্রেসের সম্মুখে গঠনমূলক কার্যপদ্ধতি পেশ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পত্রধারায় গঠনমূলক কার্যধারা গ্রহণের কথা বলিয়াছিলেন।

গান্ধীজির বরদৌলী-সত্যাগ্রহ প্রস্তাব কীভাবে ব্যর্থ হইল— রবীন্দ্রনাথ তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন; আহমদাবাদ কন্‌গ্রেসে পুনরায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রবর্তনার প্রস্তাব গৃহীত হইলে কবি অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া গুজরাটের বিখ্যাত সাহিত্যিক নানালাল দলপতরামকে দেশের রাজনৈতিক জটিল অবস্থা সম্বন্ধে এক খোলা-চিঠি লিখিয়া (১ ফেব্রুয়ারি ১৯২২) পাঠাইলেন। পত্রখানি ৩ তারিখ 'বেঙ্গলি' দৈনিকে প্রকাশিত হয়; এবং ৪ তারিখে চৌরিচৌরার হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইল। আর ৬ ফেব্রুয়ারি শ্রীনিকেতনে পল্লীসংস্কার বিভাগের কার্যারম্ভ হইল।

রবীন্দ্রনাথের এই খোলা চিঠিখানি পড়িলে পাঠক দেখিবেন কবি যেন দিব্যচক্ষে ভবিষ্যতে রাজনৈতিক কর্ম-পরম্পরার পরিণাম দেখিতে পাইতেছেন। বিশেষ রাজনৈতিক ফললাভের জন্য জনতাকে ধার্মিক করা যায় না, এই কথাটি কবি স্পষ্ট করিয়া এই পত্রমধ্যে বলিলেন—

"পৃথিবীর সকল দেশে যেখানে রাজনৈতিক শক্তিসমষ্টি পশুশক্তির উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল, সেখানেও উদ্দেশ্যসাধনে অহিংসার প্রয়োগসাফল্য আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু অন্য সকল নৈতিক মতবাদের ন্যায় অহিংসাও মানবমনের গভীরতা হইতে উদ্‌গত হইতে হইবে এবং মানুষের উপর বিশেষ কোনো জরুরী প্রয়োজনের বহিরাগত আবেদনরূপে চাপানো উচিত নয়। পৃথিবীর মহাপুরুষরা প্রেম ক্ষমা অহিংসার ধর্ম প্রচার করিয়াছেন আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের জন্য। প্রত্যক্ষ রাজনীতি বা জীবনের কোনো প্রয়োজনীয় কোঠার সাফল্যলাভের জন্য নহে। যেসকল লোক জীবনভর স্বার্থের সন্ধানে ফিরিয়াছে তাহাদিগকে বিশেষ সময়ের মধ্যে ও পাইকারীভাবে তাঁহাদের ধর্ম উপদেশে দীক্ষিত করা যে কী কঠিন তাহা তাঁহারা জানিতেন। বাহ্যিক ফললাভের প্রবল বাসনার চাপে মানুষ নিঃসন্দেহেই তাহাদের অভ্যাসগত মনোগতি বা ঝুঁকি কিয়ৎকালের জন্য শমিত করিতে পারে। কিন্তু যখন বিভিন্ন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির নানা স্তরের বিরাট জনতাকে লইয়া চলিতে হয়, এবং যখন দীর্ঘকালব্যাপী সকল সংগ্রামের জন্য সংযমের দাবী অনিবার্য হয়, তখন আমি ভাবিতে পারি না ইহা কীভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে। দক্ষিণ-আফ্রিকার ও এদেশের সত্যাগ্রহের অবস্থা একই পর্যায়গত করা যায় না; এবং আমার নিজস্ব শক্তির সীমা কতদূর তাহা জানি বলিয়া আমি যে অন্ধশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিব না তাহাকে লইয়া ব্যবহার করিতেও সাহসী হই না।"[১]

১ "I believe in the efficacy of *ahimsa* as the means of overcoming the congregated might of physical force on which the political powers in all countries mainly rest. But like every other moral principle *ahimsa* has to spring from the depth of mind and it must not be forced upon man from some outside appeal of urgent need. The great personalites of the world have preached love, forgiveness and non-violence, primarily for the sake of spiritual perfection and not for the attainment of some immediate success in politics or similar department of life. They were aware of the difficulty of their teaching being realised within a fixed period of time in a sudden and wholesale manner by men whose previous course of life had chiefly pursued the path of self. No doubt through a strong compulsion of desire for some external result, men are capable of repressing their habitual inclination for a limited time, but when it concerns an immense multitude of men of different traditions and stages of culture, and when

চৌরিচৌরার দুর্ঘটনার পর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের পট দ্রুত পরিবর্তন হইতে চলিল। বরদৌলীতে কন্‌গ্রেস-কমিটির সভায় (১১-১২ ফেব্রুয়ারি ১৯২২) ও দিল্লিতে আহূত কন্‌গ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে (২৭ ফেব্রুয়ারি) বরদৌলীর গঠনমূলক প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইল, অর্থাৎ চরকা-কাটা ও খদ্দর-ব্যবহার, জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন, অস্পৃশ্যতা-বর্জন, মাদকাদি-সেবা নিবারণ, বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য গ্রাম্য সালিশ-আদালত স্থাপন প্রভৃতি কর্মে মনোযোগ দিবার জন্য কন্‌গ্রেসকর্মীদের নিকট আহ্বান গেল।[১]

এদিকে ভারত গবর্মেণ্ট গত অক্টোবর (১৯২১) মাস হইতে চণ্ডনীতি অবলম্বন করিয়াছেন। সেই মাসে আলীভ্রাতাদের জেল হয়। তারপর ডিসেম্বর মাসে চিত্তরঞ্জন দাশ কারারুদ্ধ হইলেন। ১৯২২ সালের ১৮ মার্চ গান্ধীজি ছয় বৎসরের জন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। গত ১৯২০ সালের অগস্ট মাসে যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হয়— এই ভাবে তাহার প্রথম অঙ্কের উপর পর্দা পড়িয়া গেল।[২]

অসহযোগনীতি ও খিলাফতকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে সাময়িক প্রীতির বন্ধন দেখা দিয়াছিল, তাহা যে কী মিথ্যা, তাহার প্রমাণ অল্পকাল মধ্যে জমা হইতে লাগিল। গান্ধীজির এত সদিচ্ছা সত্ত্বেও বারে বারে কেন এই বন্ধন শিথিল হইয়া কুৎসিত ভয়াবহ দাঙ্গায় পর্যবসিত হইতেছে সে-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনে কোনো অস্পষ্টতা ছিল না। গান্ধীজির বিশ্বাস যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রীতির বন্ধন সত্যকার। কেবলমাত্র তৃতীয় পক্ষ ব্রিটিশের উপস্থিতিই মিলনের অন্তরায়। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে পার্থক্য সত্য ও শাশ্বত, তাহা যে সাময়িক উত্তেজনা ও আশু রাজনৈতিক ফললাভের আশায় নিরাকৃত হইতে পারে না— তাহা রাজনৈতিক বাস্তবতাবোধ-অন্ধ আদর্শবাদীরা সেদিনের স্বরাজ্যলাভের সুলভ সম্ভাবনায় ভুলিয়া ছিলেন অথবা স্বীকার করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন।

এই মিলন-মরীচিকা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভ্রান্তবোধ ছিল না। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়াও কেন দুর্বল ও মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ হইয়াও কেন শক্তিমান— বহু স্থানে বহু বার তিনি তাহার আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। সমসাময়িক এক পত্রে লিখিতেছেন (২১ জুন ১৯২২)[৩]—

"পৃথিবীতে দুটি সম্প্রদায় আছে— অন্য সমস্ত ধর্মমতের সঙ্গে যাদের বিরুদ্ধতা অত্যুগ্র— সে হচ্ছে খৃষ্টান আর মুসলমান ধর্ম। তারা নিজের ধর্মকে পালন করেই সন্তুষ্ট নয়, অন্য ধর্মকে সংহার করতে উদ্যত। এইজন্য

the object for which such repression is exercised needs a prolonged period of struggle, complex in character, I cannot think it possible of attainment. The conditions of South Africa (referring to the Passive resistance of South Africa and those in India) are not nearly the same, and fully knowing the limitations of mine I restrict myself to what I consider as my own vocation, never venturing to deal with blind forces which I donot know how to control."—The Bengalee, 8 February 1922.

১ দ্র. স্বদেশী সমাজ ও স্বদেশী সমাজের খসড়া। ২য় খণ্ড পরিশিষ্ট।

২ ১০ মার্চ ১৯২২ 'ইয়ং ইন্ডিয়া' সাপ্তাহিকে চারিটি প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য গান্ধীজি ও শঙ্করলাল ব্যাংকার আহমদাবাদে গ্রেপ্তার হন। গান্ধীজি এজলাসে গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপ্রচারের অভিযোগ অস্বীকার করিয়া বলিলেন, 'সব জানিয়া শুনিয়া আমি আমার কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছি। মাদ্রাজ, বোম্বাই, চৌরিচৌরার অপরাধের জন্য আমাকে দায়ী করা হইয়াছে— সে দায়িত্ব আমি অস্বীকার করিতেছি না। আজ যদি আমাকে মুক্তি দেওয়া হয়, আমি আবার আগুন লইয়া খেলা করিব। জনসাধারণ সর্বত্র সংযত হইয়া চলে নাই, তথাপি অহিংসাই যে আমার মূলমন্ত্র তাহাতেও কিছুমাত্র ভুল নাই।'—প্রবাসী ১৩২৯ বৈশাখ, পৃ. ১২৯।

৩ ডক্টর কালিদাস নাগকে লিখিত পত্র, ৭ আষাঢ় ১৩২৯। শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ৩য় বর্ষ ১৩২৯, পৃ. ৮৩-৮৪।

তাদের ধর্মগ্রহণ করা ছাড়া তাদের সঙ্গে মেলবার অন্য কোনো উপায় নেই।· ·হিন্দুর ধর্ম মুখ্যভাবে জন্মগত ও আচারমূলক হওয়াতে তাদের বেড়া আরো কঠিন। মুসলমান ধর্ম স্বীকার ক'রে মুসলমানের সঙ্গে সমানভাবে মেলা যায়, হিন্দুর সে পথও অতিশয় সংকীর্ণ। আহারে ব্যবহারে অপর সম্প্রদায় নিষেধের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করে না, হিন্দু সেখানেও সতর্ক। তাই খিলাফত উপলক্ষ্যে মুসলমান নিজের মসজিদে এবং অন্যত্র হিন্দুকে যত কাছে টেনেছে, হিন্দু মুসলমানকে তত কাছে টানতে পারে নি। আচার হচ্চে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের সেতু, সেখানেই পদে পদে হিন্দু নিজের বেড়া তুলে রেখেচে। · · এখানে হিন্দু মুসলমান দুই জাত একত্র হয়েছে, ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল। আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল, এক পক্ষের যেদিকের দ্বার খোলা, অন্য পক্ষের সেদিকের দ্বার রুদ্ধ।· · হিন্দুধর্মকে ভারতবাসী প্রকাণ্ড একটা বেড়ার মতো করেই গড়ে তুলেছিল— এর প্রকৃতিই হচ্চে নিষেধ এবং প্রত্যাখ্যান। · · সমস্যা তো এই, কিন্তু সমাধান কোথায়? মনের পরিবর্তনে, যুগের পরিবর্তনে। · · ধর্মকে কবরের মতো তৈরি ক'রে তারি মধ্যে সমগ্র জাতিকে ভূতকালের মধ্যে সর্বতোভাবে নিহিত করে রাখলে উন্নতির পথে চলবার উপায় নেই, কারো সঙ্গে কারো মেলবার উপায় নেই। আমাদের মানসপ্রকৃতির মধ্যে যে অবরোধ রয়েচে তাকে ঘোচাতে না পারলে আমরা কোনো রকমের স্বাধীনতাই পাব না। · · হিন্দু মুসলমানের মিলন, যুগ পরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে ; অন্যদেশে মানুষ সাধনার দ্বারা যুগ পরিবর্তন ঘটিয়েচে, গুটির যুগ থেকে ডানা-মেলার যুগে বেরিয়ে এসেছে। আমরাও মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আসব ; যদি না আসি তবে 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'।"

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রতন্ত্র সর্বজাতির সংস্কৃতির বুনিয়াদের উপর গড়িতে হইবে এই কথা রবীন্দ্রনাথ ভালোভাবেই জানিতেন।

দেশে প্রত্যাবর্তনের পর

য়ুরোমেরিকার ভ্রমণ শেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বোম্বাই হইতে বর্ধমান হইয়া বোলপুর চলিয়া আসিলেন (১৬ জুলাই ১৯২১)। কবি-সম্বর্ধনা হইল বিশ্বভারতীর নূতন বাড়িতে। এই গৃহটি নির্মিত হইয়াছে আশ্রম-হিতৈষী গুজরাটি বন্ধুদের অর্থানুকুল্যে। দুই বৎসর পূর্বে বিশ্বভারতীর গৃহনির্মাণ-সংকল্প গৃহীত হয় ও নানা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সহকারে মহাসমারোহে আশ্রমের দক্ষিণের মাঠে ভিত্তিপ্রস্তর প্রোথিত হয়। নানা কারণে সেই স্থানে গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয় এবং অন্যস্থলে ছাত্রাবাস নির্মিত হইল ; এই গৃহটি এখন সন্তোষালয়[১] বা শিশুবিভাগ নামে আশ্রমে পরিচিত। সেই নূতন গৃহে কবিকে স্বাগত করা হয়।

শান্তিনিকেতনে কয়েক দিন থাকিয়া কবি কলিকাতায় চলিয়া গেলেন (২০ জুলাই ১৯২১) ; প্রথমত আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন ; দ্বিতীয়ত দেশের প্রকৃত অবস্থা জানাও দরকার। কলিকাতায় পৌঁছিলে সাংবাদিকদের উপদ্রবে কবি অস্থির হইয়া উঠিলেন ; গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁহার মত জানিবার জন্য দেশ উদ্‌গ্রীব। সাংবাদিকদের নিকট তাড়াতাড়িতে কবি কী মতামত প্রকাশ করিয়া ফেলেন, তাহা লইয়া দেশী

১ সন্তোষালয়— সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের মৃত্যুর (১৯২৬) পর শিশুবিভাগের বাড়িটির নাম হয় 'সন্তোষালয়'। অনুষ্ঠানদ্বারা যে স্থানটি প্রথম নির্দিষ্ট হয়, সেখানে পরে টেনিস্‌কোর্ট নির্মিত হয়। আরও পরে সেখানে পাঠভবনের ছাত্রাবাস নির্মিত হইয়াছে। শিশুবিভাগ বা সন্তোষালয় ভাঙিয়া এখানে বিশ্বভারতীর নূতন গ্রন্থাগার নির্মিত হইবে।

কাগজে নানারূপ আলোচনা শুরু হইবার উপক্রম হইল। তিনি বেশ বুঝিলেন সাংবাদিকদের নিকট এইভাবে মতামত প্রকাশ করিয়া কোনো লাভ নাই, তাঁহার যাহা বক্তব্য তাহা স্বয়ংই বলিবেন। তজ্জন্য কলিকাতা হইতে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিয়া 'শিক্ষার মিলন'[১] নামে প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

১০ই অগস্ট (২৫ শ্রাবণ) বুধবার প্রাতে কবি যথারীতি মন্দিরে উপাসনা করিলেন বহুকাল পরে। সেইদিন অপরাহ্ণে আশ্রমবাসীদের সমক্ষে 'শিক্ষার মিলন' পড়িয়া শুনাইলেন। গান্ধীজিপ্রবর্তিত অসহযোগনীতির ইহাই প্রথম আলোচনা।

পরদিন কবি রথীন্দ্রনাথকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। ১৫ অগস্ট (১৯২১) য়ুনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট হলে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের পক্ষ হইতে অনুষ্ঠিত কবি-সম্বর্ধনা সভায় তিনি 'শিক্ষার মিলন' ভাষণ পাঠ করিলেন; সভাপতি ছিলেন সার্ আশুতোষ চৌধুরী। সন্ধ্যায় সভা, কিন্তু সভাগৃহ বেলা চারিটার পূর্বেই পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজি সম্বন্ধে কী বলিবেন, তাহা জানিবার জন্য লোকের কি কৌতূহল!

এই প্রবন্ধের শুরুতেই কবি বলিলেন, "একথা মানতেই হবে যে, আজকের দিনে পৃথিবীতে পশ্চিমের লোক জয়ী হয়েছে। পৃথিবীকে কামধেনুর মতো দোহন করছে, তাদের পাত্র ছাপিয়ে গেল। আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছি। দিন দিন দেখছি, আমাদের ভোগে অন্নের ভাগ কম পড়ে যাচ্ছে। ক্ষুধার তাপ বাড়তে থাকলে ক্রোধের তাপও বেড়ে উঠে; মনে মনে ভাবি, যে-মানুষটা খাচ্ছে ওটাকে একবার সুযোগমত পেলে হয়। কিন্তু ওটাকে পাব কী, ওই-ই আমাদের পেয়ে বসেছে, সুযোগ এ-পর্যন্ত ওরই হাতে হাতে, আমাদের হাতে এসে পৌঁছয় নি।"

আমাদের হাতে সুযোগ যে কেন আসে নাই, তাহারই আলোচনা করিয়াছেন এই প্রবন্ধের প্রথমে। কবির মতে পশ্চিম বিশ্বজয় করিয়াছে বিদ্যার জোরে; বিদ্যা সত্য পদার্থ। "সেই বিদ্যাকে গাল পাড়তে থাকলে দুঃখ কমবে না, কেবল অপরাধ বাড়বে।"

আসলে বুদ্ধির ভীরুতাই হইতেছে শক্তিহীনতার মূলে; পাশ্চাত্যদেশে বিজ্ঞানের আলোচনা লোকের মনকে ভয়মুক্ত করিয়াছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিয়মের কোথাও একটুও ত্রুটি থাকিতে পারে না, এই বিশ্বাসটাই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের জোরেই জিত হয়। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও সকলেই বুঝিলেন যে, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিন্দা করিতেছেন তাহা আধুনিক ভারতের পক্ষে আদৌ সদুপদেশ নহে। দৈব ও জাদুমন্ত্রে মুক্তি হয় না; স্বরাজের প্রতিষ্ঠা বাহিরে নয়, যে-আত্মবুদ্ধির প্রতি আস্থা, আত্মশক্তির প্রধান অবলম্বন সেই আস্থার উপরে; রবীন্দ্রনাথ চিরদিন এই আত্মবুদ্ধি ও আত্মশক্তির উদ্‌বোধনের জন্য বলিয়া আসিয়াছেন, আজও তিনি সেই কথাই বলিলেন।

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যদেশের ন্যাশনালিজমের বীভৎস রূপের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, পশ্চিমের চিন্তাশীল মনীষীরা আত্মসর্বস্ব দেশপ্রেমকে দুর্বুদ্ধিরই নামান্তর মনে করিতেছেন। দেশের সর্বজনীন এই আত্মম্ভরিতা নূতন রূপ লইয়া য়ুরোপে কী মহা অশান্তি আনিয়াছে, তাহা তো তিনি স্বয়ং দেখিয়া আসিয়াছেন। মানুষের এই রিপু জাগিয়াছে তাহার শিক্ষার মধ্য দিয়া; সাম্রাজ্যবাদ, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতির শিক্ষা পাইয়া মানুষ এমন বিভীষিকাময়

১ শিক্ষার মিলন, প্রবাসী ১৩২৮ আশ্বিন। দ্র. পুস্তিকা। শিক্ষা ২য় সংস্করণে (১৩৫১ চৈত্র) প্রথম সন্নিবেশিত হয়।…১৫ অগস্ট ১৯০৬ সালে National Council of Education স্থাপিত হয়। কালান্তর ২য় সংস্করণ ১৩৫৫, পৃ. ১৬২-৮৮। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪-এ কালান্তর গ্রন্থে এইটি নাই।

মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে যে আজ জগৎ আতঙ্কগ্রস্ত। সুতরাং পৃথিবীতে নূতনভাবের আদর্শ প্রচারের জন্য নূতন শিক্ষার প্রয়োজন। কবি বলিলেন, "স্বাজাত্যের অহমিকা থেকে মুক্তিদান করার শিক্ষাই আজকের দিনে প্রধান শিক্ষা। কেননা কালকের দিনের ইতিহাস সার্বজাতিক সহযোগিতার অধ্যায় আরম্ভ করিবে। যে সকল রিপু, যে সকল চিন্তার অভ্যাস ও আচারপদ্ধতি এর প্রতিকূল তা আগামীকালের জন্য আমাদের অযোগ্য করে তুলবে।" য়ুরোপের ন্যাশনালিজমের ও অসহযোগের যে যুগ্মরূপ দেখা দিয়াছে, তাহা ভারতীয় সাধকদের সাধনালব্ধ ঐশ্বর্য নহে।

এইজন্যই কবির ভাবী ভারতে শিক্ষার অসহযোগ নহে, শিক্ষার মিলন ঘটাইতে হইবে। "আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনকে পূর্ব-পশ্চিমের মিলন-নিকেতন করে তুলতে হবে। বিষয়লাভের ক্ষেত্রে মানুষের বিরোধ মেটে নি, সহজে মিটতেও চায় না। সত্যলাভের ক্ষেত্রে মিলনের বাধা নেই· · আমার প্রার্থনা এই যে, ভারত আজ সমস্ত পূর্ব-ভূভাগের হয়ে সত্য সাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করুক। তার ধনসম্পদ আছে। সেই সম্পদের জোরে সে বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করবে এবং তার পরিবর্তে সে বিশ্বের সর্বত্র নিমন্ত্রণের অধিকার পাবে।"— প্রবাসী ১৩২৮ ভাদ্র। লোকে বুঝিল রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করিতেছেন না; লোকে তখন উন্মত্ত-প্রায়। তাহারা আশ্বাস পাইয়াছে এক বৎসরের মধ্যে 'স্বরাজ' হইবে! সকলে অসহযোগ করুক আর নাই করুক— ইহার নৈতিকতা ও আস্তিকতা সম্বন্ধে কাহারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং এই সময়ে এমন সহজলভ্য স্বরাজপ্রাপ্তির বিরুদ্ধে কিছু বলার অর্থ সাধারণের বিরাগভাজন হওয়া। রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন নিজের মত স্পষ্ট করিয়া বলিয়া লোকের অপ্রিয় হইতে ভয় পান নাই; স্বদেশী আন্দোলনের যুগে 'পথ ও পাথেয়' 'সমস্যা' আদি প্রবন্ধ লোকের মনোরঞ্জনার্থে লিখিত হয় নাই; আজও তাহাই হইল।

য়ুনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে প্রবন্ধ পাঠের তিন দিন পরে (১৮ অগস্ট, শনিবার) আলফ্রেড থিয়েটর গৃহে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে কবি 'শিক্ষার মিলন' পুনরায় পাঠ করেন।

দুই দিন পরে সেবাসমিতি হইতে এবং পরদিন সংগীতসংঘ হইতে কবি-সম্বর্ধনা হইল। সংঘের উদ্যোগে গানের জলসা হয় এবং রবীন্দ্রনাথ 'আমাদের সংগীত'[১] শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই সংগীতসংঘের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতমা ছিলেন প্রতিভা দেবী— কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী ও জাস্টিস সার্ আশুতোষ চৌধুরীর পত্নী। প্রতিভা দেবীর সহিত কবির এই শেষ সাক্ষাৎ।[২]

জলসাতে গানের সুর কানে লাগিতেই কবির গীতচিত্ত বহুকাল পরে অকস্মাৎ উদ্‌বোধিত হইল। শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া গিয়া বর্ষামঙ্গল উৎসবের আয়োজনে মন দিলেন। অন্তরে গানের সুর আসিতেছে, অল্প কয়েকদিনের মধ্যে কয়েকটি নূতন গান রচনা করিলেন। কিন্তু অচিরেই তাঁহাকে পুনরায় রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইল। 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধ পঠিত হইবার পর ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র ইহার প্রতিবাদে লেখেন 'শিক্ষার বিরোধ' নামে প্রবন্ধ। শরৎচন্দ্র সেই সময়ে অসহযোগ আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট সমর্থক। তাঁহার প্রতিবাদ প্রকাশিত হইলে কবির পক্ষে আর নীরব থাকা সম্ভব হইল না; তিনি 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে অসহযোগ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ কোনো

১ আমাদের সংগীত, সবুজ পত্র ১৩২৮ ভাদ্র।

২ আলফ্রেড থিয়েটরে ও সংগীতসংঘের জলসায় টিকিট করা হয়; যথাক্রমে ৬৬০।০ ও ১৫০০৲ টাকা উঠে; এই টাকা খুলনা দুর্ভিক্ষ তহবিলে প্রদত্ত হয়। যদিও বিশ্বভারতীর যথেষ্ট অর্থসংকট চলিতেছে। দ্র. চিঠিপত্র ৫, পৃ. ৮৩।

সমালোচনা করেন নাই, 'সত্যের আহ্বান' নামক প্রবন্ধে তাহা স্পষ্টতর করিলেন। কলিকাতায় আসিয়া য়ুনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে (১৩ ভাদ্র ১৯২৮) প্রবন্ধটি পাঠ করিলেন।

এই প্রবন্ধের প্রথম দিকে কবি সাধনার যুগে স্বদেশীযুগে ও রুদ্রপন্থার যুগে কিভাবে রাজনীতির আলোচনা করিয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেন; ইহা দিবার কারণ যে, ঐসব আন্দোলনের সহিত গান্ধীজির আন্দোলনের গুণগত পার্থক্য দেখানো। কবি বলিলেন, "বঙ্গবিভাগের আন্দোলনের পরে এবার দেশে যে আন্দোলন উপস্থিত হয়েছে তার পরিমাণ আরও অনেক বড়ো: সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে তার প্রভাব। বহুদিন ধরে আমাদের পোলিটিক্যাল নেতারা ইংরেজি-পড়া দলের বাইরে তাকান নি · · মহাত্মা গান্ধী এসে দাঁড়ালেন ভারতের বহুকোটি গরীবের দ্বারে— তাদেরই সঙ্গে কথা কইলেন তাদের আপন ভাষায়। এইজন্য তাঁকে যে মহাত্মা নাম দেওয়া হয়েছে এ তার সত্য নাম।— চাতুরী দ্বারা যে রাষ্ট্রনীতি চালিত হয় সে নীতি বন্ধ্যা, সত্যের যে কী শক্তি, মহাত্মার কল্যাণে আজ তা আমরা প্রত্যক্ষ দেখছি।— প্রেমের দ্বারা দেশের হৃদয়ের এই যে প্রেম উদ্বেলিত হয়েছে— এইটাই মুক্তি, এইটেই দেশের আপনাকে পাওয়া।

"প্রেমের ডাকে ভারতবর্ষের হৃদয়ের এই যে আশ্চর্য উদ্বোধন এর কিছু সুর সমুদ্রপারে আমার কানে গিয়ে পৌঁছেছিল। তখন বড়ো আনন্দে ওই কথা মনে হয়েছিল যে— ভারতবাসীর চিত্তে শক্তির যে বিচিত্র রূপ প্রচ্ছন্ন আছে সমস্তই প্রকাশিত হবে।

"দেশে সেই আনন্দময় মুক্তির হাওয়া বইছে এইটেই আমি কল্পনা করে এসেছিলুম। এসে একটা জিনিস দেখে আমি হতাশ হয়েছি। দেখেছি, দেশের মনের উপর বিষম একটা চাপ। বাইরে থেকে কিসের একটা তাড়নায় সবাইকে এক কথা বলাতে এক কাজ করাতে ভয়ংকর তাগিদ দিয়েছে। কার কাছে বাধ্যতা? মন্ত্রের কাছে, অন্ধবিশ্বাসের কাছে।"

গান্ধীজি কেবল অসহযোগ নীতি ঘোষণা করেন নাই, তিনি দেশবাসীকে চরকা কাটিয়া সুতা তৈয়ার করিতে বলেন; এবং তিনি আশ্বাস দেন যে যদি একবৎসরকাল লোকে তাঁহার উপদেশ পালন করে, তবে স্বরাজ ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে হস্তগত হইবে।

রবীন্দ্রনাথের মতে "কোনো একটা বাহ্যানুষ্ঠানের দ্বারা অদূরবর্তী কোনো একটা বিশেষ মাসের বিশেষ তারিখে স্বরাজলাভ হবে এ কথা যখন অতি সহজেই দেশের অধিকাংশ লোক বিনা তর্কে স্বীকার করে" তখন বুঝিতে হইবে উহারই মধ্যে দেশের অস্বাভাবিক মনোবিকারের চিহ্ন সুস্পষ্ট। "এ যেন সন্ন্যাসীর মন্ত্রশক্তিতে সোনা ফলাবার আশ্বাস। · · অতি সত্বর অতি দুর্লভ ধন অতি সস্তায় পাবায় একটা · · আশ্বাসের প্রলোভনে মানুষ নিজের বিচার-বুদ্ধি অনায়াসে জলাঞ্জলি দিতে পারে।" রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কা, আজ ভারত সেই মূঢ়তার মরুপ্রান্তরে দাঁড়াইয়া মরীচিকার স্বপ্ন দেখিতেছে। মহাত্মাজি সম্বন্ধে কবির অগাধ আশা এবং সেইজন্য তাঁহার কাছ হইতে দাবিও প্রচুর। "মহাত্মাজির কণ্ঠে বিধাতা ডাকবার শক্তি দিয়েছেন কেননা তাঁর মধ্যে সত্য আছে, অতএব এই তো ছিল আমাদের শুভ অবসর। কিন্তু তিনি ডাক দিলেন একটি মাত্র সংকীর্ণ ক্ষেত্রে, তিনি বললেন— কেবলমাত্র সকলে মিলে সুতো কাটো, কাপড় বোনো · · এই ডাক নবযুগের মহাসৃষ্টির ডাক?" কবি বলিলেন, "স্বরাজ গড়ে তোলবার তত্ত্ব বহুবিস্তৃত, তার প্রণালী দুঃসাধ্য এবং কালসাধ্য; তাতে যেমন আকাঙ্ক্ষা এবং হৃদয়াবেগ তেমনি তথ্যানুসন্ধান এবং বিচারবুদ্ধি চাই। তাতে যাঁরা অর্থশাস্ত্রবিৎ তাঁদের ভাবতে হবে, যন্ত্রতত্ত্ববিৎ তাঁদের খাটতে হবে, শিক্ষাতত্ত্ববিৎ

সকলকেই ধ্যানে এবং কর্মে লাগতে হবে। অর্থাৎ দেশের অন্তঃকরণকে সকল দিক থেকে পূর্ণ উদ্যমে জাগতে হবে।"—কালান্তর, পৃ. ১৭০।

মহাত্মাজি দেশবাসীকে চরকা কাটিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া যেসব কথা বলেন, রবীন্দ্রনাথের মতে সেসব তত্ত্ব তথ্যানুসন্ধানের দ্বারা প্রমাণিত হওয়া প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিলেন তাহার মূল কথা হইতেছে দেশ সম্বন্ধে করিবার অনেক কিছুই আছে, কিন্তু সবার পূর্বে Planning-এর প্রয়োজন; তিনি 'বিশ্বাসযোগ্য প্রণালীতে তথ্যানুসন্ধান' দাবি করিলেন।

মহাত্মাজি বলিয়াছিলেন বিদেশী কাপড় 'অপবিত্র', এই উক্তিতে কবির ঘোর আপত্তি; অসহযোগ আন্দোলনের তরফ হইতে ঘোষণা করা হইতেছে 'বিদেশী কাপড় অপবিত্র অতএব তাকে দগ্ধ করো।' রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, এখন "অর্থশাস্ত্রকে বহিষ্কৃত ক'রে তার জায়গায় ধর্মশাস্ত্রকে জোর করে টেনে আনা হল।— কোনো কাপড় পরা বা না পরার মধ্যে যদি কোনো ভুল থাকে তবে সেটা অর্থতত্ত্বের বা স্বাস্থ্যতত্ত্বের বা সৌন্দর্যতত্ত্বের ভুল— এটা ধর্মতত্ত্বের ভুল নয়।"

ইহার উপর যুদ্ধোত্তর আর্থিক দুর্গতির দিনে 'কাপড় পোড়ানোর হুকুম আজ আমাদের 'পরে এসেছে'। কবি বলিলেন, "সে হুকুমকে হুকুম বলে আমি মানতে পারব না"; কবি তাহার যথাযথ যুক্তি দিলেন— প্রথমত এই শ্রেণীর যুক্তিহীন আদেশের শেষ নাই, দ্বিতীয়ত দরিদ্র যাহারা বস্ত্র ক্রয় করিতে পারিতেছে না তাহাদের বস্ত্র পোড়াইবার অধিকার কাহারো নাই।

এই 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অতি স্পষ্টভাবে মহাত্মাজির অসহযোগনীতি চরকা-কাটা কাপড় পোড়ানো প্রভৃতি সকল তত্ত্বই অগ্রাহ্য করিলেন। কিন্তু এই রচনার প্রতিছত্রে গান্ধীজির প্রতি তাঁহার অপরিমেয় বিশ্বাস ও ভরসার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। কবি চাহিয়াছিলেন যে, জাতির সর্বলোকের বিচিত্র শক্তি, শ্রেষ্ঠ অবদান উদ্‌বোধিত করিবার বাণী মহাত্মাজি ঘোষণা করুন; সংকীর্ণ ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ হইতেছে দেখিয়াই কবির দুঃখ।

অসহযোগনীতির সমালোচনাপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা ও পাঠ কবিজীবনের একদেশ ঘটনামাত্র। সাময়িক উত্তেজনা ও আলোচনার উর্ধ্বে আছে তাঁহার অন্তরের গীতশ্রী। বর্ষা ঘনাইতেছে— এমন দিনে কবিচিত্ত কি সাড়া না দিয়া থাকিতে পারে?

জোড়াসাঁকোর বাড়ির প্রাঙ্গণে বর্ষামঙ্গলের যে উৎসব অনুষ্ঠিত হইল (১৭, ১৮ ভাদ্র ১৩২৮), বাংলার চারুকলার ইতিহাসে সেটি একটি বিশেষ ঘটনা। এই দিনে যে কেবলমাত্র রবীন্দ্র-সংগীতের জলসার সূত্রপাত তাহা নহে— ঋতু-উৎসবও যে জীবনের অন্যতম আনন্দ অনুষ্ঠান, সেদিন বাঙালি শিক্ষিত-সমাজ তাহা বুঝিল। কবি 'কল্পনা' হইতে বর্ষার কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করেন; আর শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীরা গায়। এই প্রথম উৎসবে নৃত্য ছিল না, এমনকি ভাবব্যঞ্জনার কোনো চেষ্টাও ছিল না; গায়ক-গায়িকারা বসিয়া বসিয়া (১৮টি) গান গাহিয়াছিল।[১]

১ বর্ষামঙ্গল, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি, কলিকাতা। ভাদ্র ১৩২৮, দাম চার আনা। কান্তিক প্রেস, ২২ সুকিয়া স্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। [১৫ পৃষ্ঠা]। গানের তালিকা— ১. বিশ্ববীণা রবে বিশ্বজন মোহিছে, ২. আবার এসেছে আষাঢ়, ৩. বাদল মেঘে মাদল বাজে [রচনা ১০ ভাদ্র ১৩২৮], ৪. আজু মোরণ বোলে, ৫. ওগো আমার শ্রাবণমেঘের [রচনা ১৫ ভাদ্র], আবৃত্তি— শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৬. তিমির অবগুণ্ঠনে [রচনা ১৩ ভাদ্র], ৭. ঝরঝর বরিষে, ৮. গানের সুরের আসনখানি, ৯. আমার নিশীথ রাতের বাদল ধারা। আবৃত্তি— শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১০. এ ভরা বাদর, ১১. দুঃখের বরষায়, ১২. হারে রে রে রে, ১৩. আমার

দেশের এই রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যে সংগীতের জলসা করায় কবিকে একদল লোক খুবই নিন্দা করেন। দেশ যখন বৎসরকালের মধ্যে স্বরাজলাভের জন্য বৃটিশের সহিত অসহযোগ সংগ্রামে রত, এই সময় আনন্দ-উৎসব চরম বিলাস মাত্র! একজন বিশিষ্ট নারীকর্মী (সরলা দেবী) কবিকে জানাইয়া দেন যে, 'দেশে যখন আগুন লেগেছে তখন বর্ষামঙ্গলের গান করা অকর্তব্য এবং যে-মেয়েরা সেদিন গানের সভায় সেজে এসেছিল তারা এই অগ্নিকাণ্ডে আহুতি দিয়েছে।'

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাদান করা বা ছাত্রছাত্রীদের লইয়া নৃত্য গীত অভিনয় করাকে কোনোদিন দেশের অ-কাজ বলিয়া মনে করেন নাই।

কবি লিখিতেছেন, "মানুষের ইতিহাসে অনেক স্বরাজ বুদ্বুদের মত উঠেছে আর ফেটে গেছে— কিন্তু যে গানগুলোকে দেখতে বুদ্বুদের মত তা'রা আলোর বুদ্বুদ— নক্ষত্রের মতই। সৃষ্টিকর্তার খেলনাগুলির সঙ্গে তাদের রঙের মিল আছে। সেইজন্যেই যখন তারা গড়ে উঠতে থাকে তখন কর্তব্য ভুলে যাই।"[১]

বর্ষামঙ্গল শেষ হইলে কবি কলিকাতায় বাহির হইতে পারিলেন না। প্রথমে (১৯ ভাদ্র) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে কবি-সংবর্ধনা হয় ও তাহার দুই দিন পরে গান্ধীজির সহিত তাঁহার মোলাকাত (২১ ভাদ্র) ঘটে।

মহাযুদ্ধোত্তর য়ুরোপে এবার রবীন্দ্রনাথ যে বিপুল সমাদর লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে বাঙালি কত যে আনন্দিত, তাহাই ব্যক্ত করিবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সদস্যদের এই আয়োজন! হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদকরূপে ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সভাপতিরূপে কবিকে অভিনন্দিত করিলেন। রবীন্দ্রনাথ উহার উত্তরে যে অভিভাষণ দান করেন তাহার মধ্যে অন্যান্য কথার প্রসঙ্গে এই সময়ে কবির মনে যে কথা সব থেকে বড়ো হইয়া জাগিতেছিল সেই বিশ্বমানবতার কথাই প্রকাশ পাইয়াছে।

"আমি নিজে, সকলের চেয়ে যেটিকে আমার সৌভাগ্য বলে মনে করি, সে সাহিত্যের ফল নয়।... য়ুরোপে আমার কাছে তারা হৃদয়ের অনুরাগ অকৃত্রিম উৎসাহের সঙ্গে ব্যক্ত করেছে,— তারা প্রীতি দিয়েছে, যা সকল মূল্যের বেশি। দেখলেম সেখানে আমার বাসস্থান আছে। দেখলেম সংসারে এই আমার দ্বিতীয় জন্মের মাতৃক্রোড় পূর্ব হতেই প্রসারিত। আপন দেশ থেকে দূরে যেখানে জন্মগত কোনো দাবি নেই, কর্মগত কোনো দায় নাই, সেইখানে যখন প্রেমের অভ্যর্থনা পাওয়া যায় তখনি আমরা বিশ্বজননীর সুধাস্পর্শ পেয়ে থাকি।" বাংলাদেশের সুহৃদ্গণ তাঁহাকে লইয়া যে আনন্দ করিতেছেন তাহার বিশ্লেষণ করিয়া বলিলেন, "এই আনন্দের মধ্যে একটি মুক্তির উৎসাহ আছে। দেশ যখন আপনটুকুকে নিয়েই আপনি নিবিষ্ট, তখন সে বিশ্বের অগোচর থাকে।... আমরা বিশ্বের মানুষ, কেবলমাত্র দেশের মানুষ নই;... আমার রচনায় আমি মহামানবের বাহন, এই বলে যদি আমাকে সমাদর করেন তবে তাঁর আতিথ্যের জন্য প্রস্তুত থাকুন। তাঁকে ফেরাবেন না, বলবেন না, আজ আমাদের দুঃসময়, আজ আমাদের দরজা বন্ধ।... এতদিন আমরা পরের দিকে তাকিয়েছিলেম ভিক্ষা করার জন্য, তাতে লজ্জার পর লজ্জা পেয়েছি, অভাব পূরণ হয়নি। আজ যদি ধিক্কারের সঙ্গে বলতে পারি পরের কাছে ভিক্ষা করব না, সে তো ভাল কথা। কিন্তু

দিন ফুরালো। আবৃত্তি— শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৪. শ্রাবণের ধারার মতো, ১৫. উতল ধারা বাদল ঝরে, ১৬. আজি বারি ঝরে ঝরঝর, ১৭. এই শ্রাবণের বুকের ভিতর [রচনা ১৫ ভাদ্র]।

মুদ্রিত তালিকার বাহিরে ১৭ ভাদ্র রচিত—'মেঘের কোলে কোলে যায় রে চলে' এবং 'ওগো আমার শ্রাবণমেঘের' গান দুইটি গীত হয়।

১৫ ভাদ্র অসিতকুমার হালদারের 'বাগগুহা' গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন। দ্র. বাগগুহা ও রামগড়, ইন্‌ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস ১৩২৮।

১ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৮৭; ১৮ কার্তিক ১৩২৮ [৪ নভেম্বর ১৯২১]।

সেই ক্ষোভে যদি বলি, পরের আতিথ্য করব না তবে আরো বেশি লজ্জা। ভিক্ষায় যে দীনতা অতিথির প্রত্যাখ্যানে যে বিশ্বাবমাননা, তার অভিশাপ কঠিন।"[১]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ কর্তৃক সম্বর্ধিত হইবার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে জগত্তারিণী পদক প্রদান করিয়া সম্মান দান করিলেন; অবশ্য ইতিপূর্বে ১৯১৩ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে সমসাময়িক প্রবাসী লিখিয়াছিলেন যে, ১৯১৩ হইতে ১৯২২ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রচিত গ্রন্থ মাত্র দুইবার পাঠ্য হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত হয়; কিন্তু অন্যদের দশবারও হইতে দেখা যায় (প্রবাসী ১৩২৮ আশ্বিন, পৃ. ৯০৬-৯০৮)।

ইতিমধ্যে গান্ধীজি কলিকাতায় আসিয়াছেন। গত বৎসর সেপ্টেম্বর (১৯২০) মাসে এই সনেই অসহযোগনীতির প্রথম পর্বের সূত্রপাত হয় বিশেষ কন্‌গ্রেস অধিবেশনে। তারপরে এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে: এই সময়ের মধ্যে দেশের স্থানে স্থানে অসহযোগের যে মূর্তি প্রকাশ পাইয়াছে তাহা আদৌ বৎসরকালের মধ্যে নিমজ্জিত অসহযোগীদের নিকট তাহা তেমনভাবে পরিস্ফুট হয় নাই। যাহারা এই বহ্নি-উৎসবের ইন্ধন জোগাইতেছিল, তাহাদের মনে হইয়াছিল যে ঐ আলোকেই দেশ প্রদীপ্ত হইবে। কিন্তু অচিরেই দেখা গেল রাজনৈতিক অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য ধর্ম কখনো বাহন হন না। আর যাহারা বহ্নিযজ্ঞের আহুতি হইল— যূপের বলি— সিদ্ধির সোপান— তাহাদের কথা কে ভাবিল! মুক্তধারায় বিভূতি বলিয়াছিল, "বালি-পাথর জলের ষড়যন্ত্র ভেদ করে মানুষের বুদ্ধি হবে জয়ী এই ছিল উদ্দেশ্য। কোন্ চাষীর কোন্ ভুট্টা খেত মারা যাবে সে কথা ভাববার সময় ছিল না।" রাজনীতির ধর্ম এই abstraction বা অবচ্ছিন্ন মনোভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত; ইহার মূর্তি সর্বদেশে সর্বকালে একই।

কলিকাতা অবস্থানকালে গান্ধীজি একদিন (৬ সেপ্টেম্বর) জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রায় চারিঘণ্টাকাল আলোচনা হয়— সেখানে এন্‌ড্রুজ ছাড়া আর কেহই উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহাদের সংলাপের কোনো প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় নাই। ভারতের এই দুই মহাপুরুষের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা লাভের উপায় ও উদ্দেশ্য লইয়া যে দীর্ঘ আলোচনা হয় তাহার কোনো ফল দর্শাইল না। গান্ধীজি তাঁহার অসহযোগ আন্দোলনের ইন্ধন সন্ধানে বাহির হইয়া ও কয়েক মাসের মধ্যে (১৯২২ মার্চ) কারারুদ্ধ হইলেন; রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া তাঁহার মিলনমূলক বিশ্বভারতী গঠনের পরিকল্পনায় মনোনিবেশ করিলেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য একজন ব্যাকুল, অপরজন দেশবাসীর মনের মুক্তির জন্য উৎসুক। একজন ভাবিতেছেন ব্রিটিশ শাসনমুক্ত হইলে স্বাধীনতা আসিবে, অপরজন মনে করিতেছেন মানুষের মনের মুক্তি হইলে স্বাধীনতা আপনি আসিবে।

য়ুরোপের একজন মনীষী রম্যাঁ রলাঁ ভারতের এই দুই মহাপুরুষ সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করিয়া লিখিলেন, It seems as if it were a controversy between a St. Paul and a Plato।

রলাঁর পত্র—"It may gratify you to know that your thought is the nearest to mine that I feel in the world, and that the soul of India, as expressed by your luminous spirit, and the ardent heart of Gandhi is for me a larger native land in which my limbs stretch themselves free from

১ অভিভাষণ, সবুজ পত্র ১৩২৮ ভাদ্র ১১০-১৭। হীরেন্দ্রনাথ দত্তের অভিনন্দন ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আশীর্বচন। পৃ. ১২১-২৮।

the bonds of fanatical Europe, which has bruised them. But I know quite well that in India you also are isolated enough. ."[১]।

জোড়াসাঁকোর বিচিত্রাভবনের দ্বিতলকক্ষে (বর্তমান বিশ্বভারতী প্রকাশনীর দপ্তরখানা) রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির আলোচনা চলিতেছে, আর বাড়ির সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে বিপুল জনতার কোলাহলে মুখর। জনতার মধ্যে যাহারা অতিভক্ত অহিংসাবাদী তাহারা জানে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির অসহযোগনীতির পূর্ণ সমর্থক নহেন এবং বিলাতী বস্ত্রে অগ্নিসংযোগের বিরোধী। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের এই বিরোধিতার সমুচিত উত্তরদান কল্পে এই বুদ্ধিমান লোকেরা কবির গৃহপ্রাঙ্গণে বিলাতীবস্ত্রে অগ্নিসংযোগ করিয়া তাণ্ডব উৎসব নিষ্পন্ন করিল। এই নিরুপদ্রব অহিংসকদের ব্যবহারে গান্ধীপন্থীরা খুবই লজ্জিত হইয়াছিলেন।

শিশু ভোলানাথ

গান্ধীজির সহিত সাক্ষাৎকারের একদিন পরে (৮ সেপ্টেম্বর) রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে আসিলেন; তিনি বুঝিলেন দেশবাসীর মানসিক উত্তেজনা যেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সেখানে তাঁহার কবিকণ্ঠ পৌঁছিবে না।

বিদ্যালয়ে পূজাবকাশের এখনো প্রায় একমাস দেরি। তাই কবি অধ্যাপনা-কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। এছাড়া উত্তরায়ণের প্রান্তরে পর্ণকুটিরে সন্ধ্যার সময় আশ্রমবাসীদের নিকট কখনো সাহিত্য লইয়া, কখনো *Creative Unity*-র কোনো প্রবন্ধ লইয়া আলোচনা করেন।

এইবার কবি একাদিক্রমে প্রায় সাড়ে তিন মাস (৮ সেপ্টেম্বর-২৮ ডিসেম্বর) আশ্রমে বাস করেন; এই পর্বে বিশ্বভারতী জনসাধারণের নিকট উৎসর্গীত হয় এবং বিশ্বভারতীর প্রথম বিদেশী অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি আসেন; আমরা অন্য পরিচ্ছেদে সে-কথার আলোচনা করিব।

কলিকাতা হইতে ফিরিবার কয়েকদিনের মধ্যে কবিকে গল্প কবিতা লিখিতে দেখিতেছি; এইগুলি 'শিশু ভোলানাথ' অন্তর্গত কবিতা— ২১ সেপ্টেম্বর (৪ আশ্বিন) হইতে ২২ অক্টোবর (৫ কার্তিক ১৩২৮) মধ্যে রচিত। কবির শেষকাব্য 'পলাতকা'র (১৩২৫) পর এই কাব্য; পলাতকা গল্পধর্মী কাব্য— থাকিয়া থাকিয়া গল্প বলিবার যে-আবেগ কবির সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে বারে বারে দেখা দিয়াছে— 'পলাতকা' তাহারই অন্যতম প্রকাশ। 'শিশু ভোলানাথে' কবির বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া শিশুমনের সন্ধান পাই। লিরিকধর্মী শেষ কবিতাগুচ্ছ 'বলাকা' (১৩২১), তার পর দীর্ঘ ব্যবধানে রচিত হয় 'পূরবী' (১৩৩২); এই কালের মধ্যে কবির বেশির ভাগ রচনাই গান— যদিও সেগুলি যথার্থ লিরিকধর্মী কবিতা সুরসংযোগে উদ্‌গীত।

বলাকা ও পূরবীর দীর্ঘ একাদশ বৎসরের ব্যবধান মধ্যে খুব সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে একবার 'পলাতকা'র গল্পধর্মী কবিতাগুলির (১৩২৫) ও এইবার (১৩২৮) শিশু ভোলানাথের কবিতাগুলি আবির্ভূত হয়।

অকস্মাৎ শিশুদের কথা লইয়া কবিতা লিখিবার প্রেরণা কোথা হইতে পাইলেন— কী পটভূমে এইগুলি রচিত— এই সব প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদয় হয়। আঠারো বৎসর পূর্বে রচিত (১৩১০) শিশুকাব্যের প্রেরণা-উৎসের কথা স্মরণীয় ও তুলনীয়। যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই উৎসের সন্ধান করিয়া তাঁহার বক্তব্য বলিয়া গিয়াছেন:

১ *Rolland and Tagore* p. 87। Letter, 2 March 1928।

ইন্দিরা দেবীকে শান্তিনিকেতন হইতে পত্রে[১] লিখিতেছেন, "ছেলেদের কবিতা . . লেখবার একমাত্র তাগিদ ছিল বয়স্ক লোকদের দায়িত্ববোধের জীবনকে ক্ষণকালের জন্য মন থেকে সরিয়ে দেবার ইচ্ছায়। খেলার জগতে শিশু হয়ে জন্মেছি এই ঘটনাটির মধ্যে অস্তিত্বের মূলসত্যটি আমাদের জীবনের ভূমিকারূপে লিখিত হয়েচে, এই কথাটি কিছুকাল থেকে আমি ভাবচি এবং শিশুর কবিতায় এক-রকম করে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেচি। দায়িত্ববোধরূপ ব্যাধি মানুষের বয়স্কতাকে কড়া করে পাকা করে তোলে, সে অবস্থায় সে খেলাকে অবজ্ঞা করতে থাকে, এবং খেলার সঙ্গে কাজের চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়ে কর্তব্যসাধন করেচে বলে গৌরব বোধ করে। জানে না সে যা বলে তাতে জগৎকর্তার নিন্দা করা হয়, কেন না খেলা ছাড়া তাঁর আর কোনো কাজ নেই— তাঁর দায় নেই বলেই তিনি আনন্দময়।"

কবির ভাবনা বিশ্বভারতী নামে যে প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে, সেখানেও "খেলার চেয়ে দায়িত্ব পাছে বড়ো হয়ে ওঠে"— এইটা তাঁহার ভয়। কবি ভালো করিয়া জানেন যে, এ রকম অনুষ্ঠানের মধ্যে যে অংশটা আইডিয়া সেইটিই বিশুদ্ধ আনন্দ, আর যে অংশটা নিয়ম ও ব্যবস্থা সেইটি হইতেছে বিষম দায়; সেইটা যদি আইডিয়াকে চাপা দিয়া আটেঘাটে আষ্টেপৃষ্ঠে পাশ হইয়া উঠে, তাহা হইলে কিন্তু সৃষ্টিকর্তার তাতে বিতৃষ্ণা। মানুষ মুক্তি পাইতে চায়, অর্থাৎ কাজ-খেলাকেই কাজ করিয়া তুলিয়া তাহার মুক্তি। ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্রের মনোভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে শিশু ভোলানাথের প্রথম কবিতায়—

> আপন বিভব
> আপনি করিস নষ্ট হেলাভরে;
> প্রলয়ের ঘূর্ণিচক্র 'পরে
> চূর্ণ খেলেনার ধূলি উড়ে দিকে দিকে;
> আপন সৃষ্টিকে
> ধ্বংস হতে ধ্বংস মাঝে মুক্তি দিস্ অনর্গল,
> খেলারে করিস রক্ষা
> ছিন্ন করি খেলেনা শৃঙ্খল।[২]

শিশু ভোলানাথকে উদ্দেশ করিয়া কবি বলিতেছেন—

> সকল ভোলার ঐ ঘোর,
> দেবে চিত্তে মোর
> খেলেনা-ভাঙার খেলা দে আমারে বলি।
> আপন সৃষ্টির বন্ধ আপনি ছিঁড়িয়া যদি চলি,
> তবে তোর মত্ত নর্তনের চালে
> আমার সকল গান ছন্দে ছন্দে মিলে যাবে তালে।

শিশু ভোলানাথ হইতে উদ্ধৃত এই প্রথম কবিতাটি যেমন তত্ত্বময়, ইহার পরবর্তী 'শিশুর জীবন' কবিতাটি— যাহা এই কাব্যের শেষ রচনা বলিয়া মনে হয়— তেমনই তত্ত্ব-ঐশ্বর্যে পূর্ণ। আমরা যদি বলি বৈদান্তিকের যথার্থ নিরাসক্ত

১ চিঠিপত্র ৫, পত্র ১০; ২৭ বৈশাখ ১৩২৯ (১০ মে ১৯২২) শান্তিনিকেতন হইতে লিখিত।

২ তু. খেলেনার মুক্তি— পুনশ্চ।

মন— কিছুকে আঁকড়িয়া না-থাকার মোহমুক্ত মন তার পরিচয় কবিতাগুলির মধ্যে পাই তবে তাহা অতিকথন হইবে না।

রবীন্দ্রনাথ শিশু ভোলানাথের মর্মকথা বলিয়াছেন 'যাত্রী'র একদিনের ডায়ারির পাতায় (৭ অক্টোবর ১৯২৪)। "কিছুকাল আমেরিকার প্রৌঢ়তার মরুপারে ঘোরতর কার্যপটুতার পাথরের দুর্গে আটকা পড়েছিলুম। সেদিন খুব স্পষ্ট বুঝেছিলুম জমিয়ে তোলবার মতো এতবড়ো মিথ্যে ব্যাপার জগতে আর কিছু নেই। এই জমাবার জমাদারটা বিশ্বের চিরচঞ্চলতাকে বাধা দেবার স্পর্ধা করে; কিন্তু কিছুই থাকবে না, আজ বাদে কাল সব সাফ হয়ে যাবে।·· পৃথিবীতে সৃষ্টির যে লীলাশক্তি আছে সে যে নির্লোভ, সে নিরাসক্ত, সে অকৃপণ— সে কিছু জমতে দেয় না; কেননা জমার জঞ্জালে তার সৃষ্টির পথ আটকায়,— সে যে নিত্যনূতনের নিরন্তর প্রকাশের জন্যে তার অবকাশকে নির্মল করে রেখে দিতে চায়। লোভী মানুষ·· জঞ্জাল জড় করে·· ভাণ্ডার তৈরী করে তুলছে। সেই ধ্বংসশাপগ্রস্ত ভাণ্ডারের কারাগারে জড়বস্তুপুঞ্জের অন্ধকারে বাসা বেঁধে সঞ্চয়গর্বের ঔদ্ধত্যে মহাকালকে কৃপণটা বিদ্রূপ করছে, —এ বিদ্রূপ মহাকাল কখনোই সইবে না।··

"কিছুকালের জন্যে আমি এই বস্তু-উদ্‌গারের অন্ধযন্ত্রের মুখে এই বস্তুসঞ্চয়ের অন্ধভাণ্ডারে বদ্ধ হয়ে আতিথ্যহীন সন্দেহের বিষবাষ্পে শ্বাসরুদ্ধপ্রায় অবস্থায় কাটিয়েছিলুম।·· আমেরিকার বস্তুগ্রাস থেকে বেরিয়ে এসেই [৪ মাস পরে] শিশু ভোলানাথ লিখতে বসেছিলুম।·· দেয়ালের মধ্যে কিছুকাল সম্পূর্ণ আটকা পড়লে তবেই মানুষ স্পষ্ট করে আবিষ্কার করে, তার চিত্তের জন্যে এতবড়ো ফাঁকটা দরকার। প্রবীণের কেল্লার মধ্যে আটকা পড়ে সেদিন আমি তেমনি করেই আবিষ্কার করেছিলুম, অন্তরের মধ্যে যে শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোকলোকান্তরে বিস্তৃত। এইজন্যে কল্পনায় সেই শিশুলীলার মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশুলীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলুম, মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে, মুক্ত করবার জন্যে।"

য়ুরোমেরিকা সফরের সময়ে কবি না লেখেন কবিতা, না লেখেন গান। দেশে ফিরিয়া বর্ষামঙ্গলের জন্য কয়েকটি গান লিখিলেন— বোধ হয় বহুকাল পরে। তারপর শিশু ভোলানাথের কবিতা লেখার পালা, মাসেক কালের মধ্যে সেটা শেষ হয় (৫ কার্তিক ১৩২৮)। ১৮ কার্তিক প্রমথ চৌধুরীকে লিখিতেছেন "মাঝে মাঝে প্রায়ই গান লিখি।" এই গানগুলিই বোধ হয় 'ঋণশোধ' নাটকের মধ্যে বসাইয়া দেন। সেই গানগুলি হইতেছে— হৃদয়ে ছিলে জেগে (গীতবিতান, পৃ. ৪৮৯), যখন সারা নিশি ছিলেম শুয়ে (পৃ. ৪৮৯), আমারে ডাক দিল কে (পৃ. ৫৫২), কেন-যে মন ভোলে (পৃ. ৫৫১), দেওয়া-নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া (পৃ. ১৪৩)।

কবির মানসিক অবস্থাটা জানা যায় ঐ পত্র হইতে। তিনি লিখিতেছেন— "যখন [গান] লিখি তখন মনে হয় স্বরাজ ব্যাপারটা এমন কিছু গুরুতর জিনিস নয়।·· সৃষ্টিকর্তার খেলনাগুলির সঙ্গে তাদের রঙের মিল আছে। সেইজন্যেই যখন তারা গড়ে উঠতে থাকে তখন কর্তব্য ভুলে যাই। অথচ দেশের কর্তাব্যক্তিদের কাছ থেকে হুকুম আসছে যে, 'সময় খারাপ অতএব, বাঁশি রাখো, লাঠি ধরো।' যদি তা করি তাহলে কর্তারা খুসি হবেন, কিন্তু আমার এক বাঁশিওয়ালা মিতা আছেন কর্তাদের অনেক উপরে, তিনি আমাকে একেবারে বরখাস্ত করে দেবেন। আমি ভূগোলের প্রতিমার পাণ্ডাদের যদি আজ মানতে বসি তাহলে আমার জাত যাবে।"—চিঠিপত্র ৫, পত্র ৮৭।

পূজার ছুটি আগত; বিদ্যালয়ে ছাত্র-অধ্যাপকগণ এই সময়ে কবির কোনো নাটক বরাবর অভিনয় করেন। খেলা ও কাজের যে দ্বন্দ্ব মনে চলিতেছে তাহা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা; কিন্তু নূতনকিছু সৃষ্টির আবেগ নাই সময়ও নাই।

তাই শারদোৎসবকে লইয়া কাটাছাঁটা জোড়াতাড়া দিয়া 'ঋণশোধ' নাটক লিখিলেন এবং পূজাবকাশের পূর্বে অভিনয় করিলেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কবিশেখরের ভূমিকা গ্রহণ করেন।

আমরা পূর্বে একবার আভাস দিয়াছি যে কিছুকাল হইতে বিশেষভাবে 'ফাল্গুনী'র সময় হইতে নাটকের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার নূতন দুর্বলতা দেখা দিয়াছে। শারদোৎসবের মধ্যে রাজা বিজয়াদিত্যই যে সন্ন্যাসী এই নাটকীয় রহস্য প্রচ্ছন্ন ছিল— এই সংবাদটি নাটকের শেষ পর্যন্ত অব্যক্ত রাখিয়া, অতি সহজভাবে তাহার আসল রূপের প্রকাশ দ্বারা যে অপরূপ নাটকীয়তা সৃষ্টি করিয়াছিল— ঋণশোধের ভূমিকায় প্রথমেই তাহা ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন। এই নাট্যভূমিকায় আছেন রাজা মন্ত্রী সেনাপতি ও কবিশেখর। নাটকের সংলাপ মধ্যে রাজা ও কবিশেখরের সাথে জুটিলেন ঠাকুরদা; তিনজনে মিলিয়া যে কথাবার্তায় মগ্ন তত্ত্বহিসাবে সেগুলি মূল্যবান; কিন্তু বালকদের নাট্যমধ্যে তাহা সম্পূর্ণ অবান্তর। অভিনয়কালে মনে হইল যেন তিনটি ধর্মাত্মা পুরুষ পরস্পরের প্রশংসায় তন্ময়। রবীন্দ্রনাথ নাটকের দুর্বলতা কোথায় তাহা বুঝিতে পারিয়া অভিনয়োপলক্ষে কিছুকিছু পরিবর্তন করিয়াছিলেন। এবং দ্বিতীয়বার এই গ্রন্থ মুদ্রণের অনুমতি আর দেন নাই।[১]

পূজাবকাশের পূর্বদিন (১৩২৮ আশ্বিন) সন্ধ্যায় নাট্যঘরে অভিনয় হইয়াছিল; সে ঘর এখন নাই। রবীন্দ্রনাথ কবিশেখর, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরদা, সন্তোষচন্দ্র রাজা, জগদানন্দ রায় লক্ষেশ্বরের ভূমিকা গ্রহণ করেন।

পূজার ছুটিতে রবীন্দ্রনাথ কোথাও গেলেন না; তিনি আছেন উত্তরায়ণের প্রান্তর মধ্যস্থিত পর্ণকুটীরে। পূজাবকাশ বলিয়া অতিথি সমাগম কিছু কম নয়। বাঁকুড়া হইতে আসেন অধ্যাপক এডোয়ার্ড টমসন,[২] তিনি কবির জীবনী লিখিবার উপকরণ সংগ্রহে রত। মাদ্রাজ হইতে আসিয়াছেন কাজিন্‌স দম্পতি (Cousins); তাঁহারা উঠিয়াছেন কবির পর্ণকুটীরের পাশের কুটীরে। সুকুমার রায় আসেন সপরিবারে— সত্যজিৎ তখন শিশু; সুকুমার তখন অসুস্থ; তাঁহারা থাকিতেন প্রাক্তন ছাত্রদের বাড়িতে— গুরুপল্লীর পথের ধারে। এ ছাড়া আসেন অধ্যাপক শহীদুল্লা ও তরুণ কবি নজরুল ইসলাম।

অতিথিদের তত্ত্বাবধান সম্বন্ধে কবি অত্যন্ত সচেতন, স্বয়ং খোঁজখবর রাখিতেন। এছাড়া রোগী ও পীড়িতদের সংবাদ রাখেন— ঔষধ দেন, প্রায়ই তাহাদের দেখিতে যান। লেখকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুহৃৎকুমার তখন বিদ্যালয়ের শিক্ষক; তিনি তাঁহার দিনপঞ্জীতে (৮ নভেম্বর ১৯২১) লিখিতেছেন, "আমি অসুস্থ থাকায় এ কয়দিন গুরুদেবের কাছে যেতে পারিনি, তিনি আমাকে দুদিন [গুরুপল্লীতে] দেখতে আসেন।" লেখকের জননী তখন পীড়িত, গুরুপল্লীর বাসায় কবি প্রায়ই আসেন খোঁজখবর লইতে। রবীন্দ্রনাথের জীবনের এই দিকটা অনেকের অজ্ঞাত।

এই সকল কাজ ও অকাজের মধ্যে মন নিরাসক্তভাবে বাসা-ভাঙিবার জন্য ব্যাকুল; ইন্দিরা দেবীকে শান্তিনিকেতন হইতে লিখিতেছেন (২০ অক্টোবর ১৯২১। চিঠিপত্র ৫, পত্র ৮)— "এবার দেশে এসে অবধি আমার শান্তি নেই, বিশ্রাম নেই। আজকাল তাই কেবলি ইচ্ছা করে চারদিকের বেড়া সমস্ত ভেঙেচুরে ফেলে, সেই আমার অল্পবয়সের সাহিত্যের খেলাঘরে পালিয়ে যাই— যখন জীবনে কোনো দায়িত্ব সাধ করে গ্রহণ করিনি— যখন ভাবতুম গল্প লেখা কাব্য লেখাই যথেষ্ট, আর সমস্ত অকিঞ্চিৎকর। তখন কাঁচা ছিলুম বলেই যে ভুল বুঝেছিলুম, আর এখন

১ ঋণশোধ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ. ২১৩-৬৪। গ্রন্থপরিচয়, পৃ. ৫৩৮-৪১। দ্র. শারদোৎসব, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৭।

২ ১৯২১ সালে টমসনের রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। *Rabindranath Tagore, His Life and Work*; Association Press YMCA 1921। ইহার বৃহত্তম জীবনী ১৯২৬-এ প্রকাশিত হয়।

বুদ্ধি পেকেচে বলেই যে ঠিক বুঝেচি তা নয়। আসলে জগদ্ব্যাপারটা খেলার মত হালকা, গানের মত পাখা-ওয়ালা— আমরা ওর পরে আমাদের ঘরগড়া চিন্তার বোঝা চাপিয়ে ওকে আমাদের পক্ষে বিষম ভারী করে তুলেচি।"

কিন্তু বলা বাহুল্য মনের মধ্যে যে-সংগ্রামই চলুক, যে-কাজে নামিয়াছেন তাহা হইতে মুক্তি নাই— বিশ্বভারতীর ভার স্বয়ং সৃষ্টি করিয়াছেন, এখন 'ভারের বেগেতে চলেছি বন্ধু, এ যাত্রা মোরে থামাও' বলিলেও রথ আর থামিতে চাহে না।

রথীরে কহিল গৃহী উৎকণ্ঠায় উর্ধ্বস্বরে ডাকি,
'থামো থামো, কোথা তুমি রুদ্রবেগে রথ যাও হাঁকি,
সম্মুখে আমার গৃহ।' রথী কহে, 'ওই মোর পথ,
ঘুরে গেলে দেরি হবে, বাধা ভেঙে সিধা যাবে রথ।'
গৃহী কহে 'নিদারুণ ত্বরা দেখে মোর ডর লাগে,
কোথা যেতে হবে বলো।' রথী কহে 'যেতে হবে আগে।'

বিশ্বভারতী ১৯২১

আমরা পূর্বে বলিয়াছি কলিকাতায় গান্ধীজির সহিত সাক্ষাৎকারের একদিন পরে রবীন্দ্রনাথ ৮ সেপ্টেম্বর (১৯২১) শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসেন ও সেই হইতে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত সেখানেই থাকেন; এই পর্বে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিশ্বভারতীর মহৎ আদর্শ প্রচারিত হইবার পর হইতে গত আড়াই বৎসরের মধ্যে নানাশ্রেণীর লোক আশ্রমে আসিয়াছেন— কেহ বা সাময়িকভাবে এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সেবার উদ্দেশে আসেন, কেহ বা কবির স্বপ্নকে সফল করিবার জন্য আত্মপ্রাণ সমর্পণ উদ্দেশে আসেন, আবার কেহ আসেন বিশেষ কোনো অনুগ্রহ লাভ বা সুবিধা-সুযোগের ভরসায়।

বহু বৎসর পর পিয়ার্সন ভারতে ফিরিলেন। পাঠকের স্মরণ আছে আমেরিকার বক্তৃতা-সফরের শেষে (১৯১৭ মার্চ) কবি দেশে ফিরিয়া আসেন, কিন্তু তাঁহার সহযাত্রী পিয়ার্সন চীন দেশে থাকিয়া যান। তাঁহার রাজনৈতিক কাজকর্ম ও মতামতের জন্য ব্রিটিশ পুলিশ তাঁহাকে বন্দী করিয়া (১৯১৮ মে ১২) ইংলন্ডে পাঠাইয়া দেন। ১৯২০ সালে কবি য়ুরোপ গেলে পিয়ার্সন তাঁহার সেক্রেটারি রূপে থাকেন ও আমেরিকায় যান। সাড়ে চারি বৎসর পর তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন ২৬ সেপ্টেম্বর।

পরদিন শান্তিনিকেতনে আসেন লেনার্ড এলমহার্স্ট নামে এক ইংরেজ যুবক। এই যুবকের পরিচয় দেওয়া দরকার, কারণ ইঁহার সহিত কবির ও বিশ্বভারতীর জীবনসূত্র অচ্ছেদ্যবন্ধনে বাঁধা। পাঠকের মনে আছে আমেরিকা বাসকালে কবির সহিত লেনার্ডের পরিচয় হয়। ইনি বিলাতের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া আমেরিকায় যান; সেখানে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের গ্রামসংস্কার সম্বন্ধে কথাবার্তা শুনিয়া তিনি এমনই আকৃষ্ট হন যে ভারতে আসিয়া একদিন কবির স্বপ্নকে মূর্তিদান করিবেন বলিয়া সংকল্প গ্রহণ করেন। ইংলন্ডে ফিরিয়া এলমহার্স্ট কবিকে পত্রযোগে জানান যে তিনি বিশ্বভারতীর গ্রামসংস্কার কর্মে যোগদান করিতে

ইচ্ছুক ; কবি তদুত্তরে তাঁহাকে লিখেন যে বিশ্বভারতীর আর্থিক অবস্থা এখন সচ্ছল নহে এবং দেশের অবস্থাও এমন অনুকূল নহে যে যাহাতে অনতিকাল মধ্যে তিনি তাঁহার কল্পনাকে বাস্তবে রূপদান করিতে পারিবেন। এলমহার্স্ট তদুত্তরে কবিকে জানাইলেন যে অর্থের ব্যবস্থা তিনি করিবেন— কবিকে সে-বিষয়ে ভাবিতে হইবে না।

এই অর্থের ব্যবস্থা করিয়াই তিনি কবির কাছে আসিলেন। পাঠকের স্মরণ আছে নিউইয়র্কে জুনিয়ার লীগের ধনীকন্যাদের সভায় যে মিসেস স্ট্রেট কবিকে সদস্যদের সহিত পরিচিত করাইয়াই অন্তর্হিতা হন, তিনিই এলমহার্স্টকে বিশ্বভারতীর গ্রামসংস্কার কর্মের জন্য অর্থদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এলমহার্স্ট কবিকে জানাইলেন যে এই কাজের জন্য মিসেস স্ট্রেটের সম্পত্তি হইতে বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা পাওয়া যাইবে। অপ্রত্যাশিত এই দান!

স্থির হইল সুরুলের কুঠিবাড়ি এই গ্রামোদ্যগের কেন্দ্র হইবে। অসহযোগ আন্দোলনের উত্তেজনায় কয়েকজন যুবক শান্তিনিকেতনের শিক্ষক নেপালচন্দ্র রায়ের (অসহযোগের সময় কয়েক মাস তিনি বিদ্যালয়ের কাজ ছাড়িয়া যান) নেতৃত্বে 'গ্রামের কাজে' প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের লইয়া এলমহার্স্ট সুরুলে কার্য শুরু করিবেন ঠিক হইল। কিন্তু কার্য আরম্ভের পূর্বে তিনি ভারতের নানা স্থানে কৃষি ও তৎসংক্রান্ত বিষয় লইয়া যে সব কাজ হইতেছে, তাহা দেখিবার জন্য সফরে বাহির হইলেন।

পূজাবকাশের পর বিদ্যালয় খুলিবার পূর্বদিন অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি[১] সস্ত্রীক আশ্রমে আসিলেন (১০ নভেম্বর ১৯২১)। ইনি বিশ্বভারতীর প্রথম 'অভ্যাগত অধ্যাপক' বা Visting Professor। লেভি অধ্যাপকরূপে আসাতে প্রাচীন ভারতের সহিত বহির্জগতের সম্বন্ধ ইতিহাস বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন। এ ছাড়া চীনা ও তিব্বতী ভাষা শিক্ষাদানের ক্লাস খুলিলেন। লেভির বক্তৃতা ও কথোপকথন হইতে বুঝা গেল যে, এই দুইটি ভাষাজ্ঞান ছাড়া ভারতের সহিত পূর্ব-এশিয়ার যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার সম্যক ইতিহাস আমাদের নিকট চির অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে। কয়েকজন অধ্যাপক তাঁহার নিকট এই ভাষা শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রাচ্যজ্ঞান জগতে সুপরিচিত।[২]

লেভি সাহেব ইংরেজিতে বক্তৃতা করিতেন, রবীন্দ্রনাথ সভাশেষে বাংলাভাষায় তাহার চুম্বক করিয়া বলিয়া দিতেন ; তজ্জন্য বক্তৃতা শ্রবণকালে তাঁহাকে 'নোট' লইতে দেখিয়াছি। মাদাম লেভি ফরাসী ভাষা শিক্ষা দিতে লাগিলেন।[৩] রবীন্দ্রনাথের কাজের অন্ত নাই ; তাহারই মধ্যে তিনি ২ অগ্রহায়ণ ১৩২৮ হইতে উত্তর বিভাগের

১ সিলভ্যাঁ লেভির ১৮৬৩ সালে প্যারিসে জন্ম। প্রায় ৫০ বৎসরকাল ফ্রান্সের সোরবন ও পরে কলেজ দ্য ফ্রাঁসে এবং স্ট্রাসবুর্গে অধ্যাপনা করেন। ভারতে প্রথমে আসেন ১৮৯৭-৯৮ সালে, তখন নেপালের প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়া ৩ খণ্ড গ্রন্থ লেখেন। তারপর আসেন বিশ্বভারতীর অধ্যাপকরূপে। শেষবার ১৯২৯এ জাপান হইতে ফিরিবার পথে কিছুকাল এদেশে থাকেন। ইঁহার মৃত্যু হয় ১৯৩৫, ৬ই নভেম্বর। দ্র. প্রবোধচন্দ্র বাগচী, সিলভ্যাঁ লেভি, পরিচয় ১৩৪৩ বৈশাখ, পৃ. ৫৫৫-৬৪।

২ লেভিরা থাকেন সুবপুরীতে, আশ্রমের উত্তরদিকে 'রতনকুঠি'র পিছনে এই বাড়িটি নির্মাণ করান সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কিনিয়া লন। তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ বাড়ির মালিক হইয়াছেন তাঁহার ভাগ্নেয় সঞ্জীব চৌধুরী।

৩ ইতিপূর্বে হিরজীভাই পেস্তনজী মরিস ফরাসীভাষা শিক্ষা দিয়াছিলেন। মাঝে মিসেস্ নাসিরুল্লা ফরাসী শিখাইতেন। মিঃ নাসিরুল্লা দিল্লি সেণ্ট স্টিফেন্স কলেজের অধ্যাপক মিঃ লেদারের শ্যালক। মিঃ নাসিরুল্লা য়ুরোপে এই ফরাসী মহিলাকে বিবাহ করিয়া আসেন ও আশ্রমে কয়েকমাস থাকেন। মিঃ এনড্রুজ এইসব ব্যবস্থা ও যোগাযোগ করিয়াছেন। পল রিশাল যখন কয়েক সপ্তাহ আসিয়া থাকেন, তখন তিনিও নিয়মিত ফরাসীর ক্লাস নেন। এইভাবে বিশ্বভারতীর কর্মরূপ নানাভাবে ধীরে ধীরে দেখা দিতে লাগিল। বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার য়ুরোপ হইতে প্রাপ্ত গ্রন্থরাজির দ্বারা সমৃদ্ধ হইল। চীন হইতেও বহু শত খণ্ডে বিরাট গ্রন্থ-সঞ্চয় এই সময়ে আসিয়া পড়িল।

ছাত্রছাত্রীদের তাঁহার 'বলাকা' কাব্য পড়াইতে শুরু করিলেন। কবির সেই বক্তৃতাগুলির সারমর্ম শান্তিনিকেতন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[১]

এদিকে পৌষ-উৎসব আসিয়া গেল। বিশ্বভারতীকে সর্বসাধারণের হস্তে সমর্পণ করিবার আয়োজন চলিতেছে। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বিশ বৎসর এইবার পূর্ণ হইল। এই দীর্ঘকাল বিদ্যায়তনের ব্যয়ের মূলাংশ কবি একাই বহন করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পর হইতে তাঁহার একার পক্ষে এ ভার বহন করা আর সম্ভব নহে। বিশ্বভারতীতে নানা বিষয় অধ্যয়ন-অধ্যাপনার পরিকল্পনা রহিয়াছে, বিদেশ হইতে গুণী-জ্ঞানীদের আসিবার সম্ভাবনা। কবির মনে তাঁহার 'মিশন' সম্বন্ধে কোনো দ্বিধা নাই; তাঁহার অন্তরের বিশ্বাস আন্তর্জাতিকতার মনোশিক্ষা না পাইলে ভাবীকালের সভ্যতা টিকিবে না।

আশাবাদী কবি তাই জোরের সহিত বলিতে পারেন— "এই কথাটি বিশ্বাস কর যে, এই institution-টার প্রসার সমস্ত সভ্য পৃথিবীতে।"[২] সাতই পৌষের উৎসব-প্রাতে যে ভাষণ দান করিলেন (দীক্ষা) তাহার মধ্যেও এই কথাটি ধ্বনিতেছে, "এ বৎসর আমাদের শান্তিনিকেতনে নূতন যুগের আবির্ভাব প্রকাশমান হল। এখানে আমাদের নবযুগের অতিথিশালা খুলেছে।

"মানুষের সঙ্গে মানুষ যে একত্র হয়েছে এই মহৎ ঘটনাকে আমরা আজ সত্য বলে অনুভব করতে পারছিনে। তাই আমাদের শিক্ষাদীক্ষায় সেই প্রাচীন অভ্যাসটাকে মনের মধ্যে পাকা ক'রে তোলবার চেষ্টা এখনও চলেছে — তাই স্বাজাত্যের অভিমানকে অতিশয় ক'রে তোলাকেই আমরা কর্তব্য বলে স্থির করেছি। এমন অবস্থায় কোনো এক জায়গায় আজ সেই বাণী ঘোষণার কেন্দ্র থাকা চাই, যে-বাণী সীমাবদ্ধ অতীতকালের বাণী নয়, যে-বাণী ভবিষ্যতের বিরাট মুক্তিক্ষেত্রের বাণী। এই বাণী কা'রা ঘোষণা করবে? · · অকিঞ্চনের কণ্ঠ থেকে নবযুগের জয়ধ্বনি উঠবে এমন আশা আছে।"—শান্তিনিকেতন ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২০-২১।

আটই পৌষ প্রাতে শান্তিনিকেতন আম্রকুঞ্জে বিশ্বভারতীর উদ্বোধন সভা হইল; আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সভাপতির আসন অলংকৃত করিলেন। এই সভায় 'বিশ্বভারতী পরিষদ' গঠিত হইল এবং বিশ্বভারতীর জন্য যে বিধান (constitution) প্রণীত হইয়াছিল তাহা গৃহীত হইল।

রবীন্দ্রনাথ সভার উদ্‌বোধন-ভাষণে বিশ্বভারতী পরিকল্পনার যে ইতিহাসটুকু বিবৃত করেন, তাহা পাঠকদের জানা দরকার। কয়েক বৎসর পূর্বে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক বিধুশেখর ভট্টাচার্য মহাশয়ের মনে সংকল্প হইয়াছিল যে আমাদের দেশে সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তার সাধন করা দরকার। তাঁহার মনে হইয়াছিল যে-কালকে আশ্রয় করিয়া আমাদের টোলচতুষ্পাঠী সমূহের প্রতিষ্ঠা, সে-কালে ইহাদের উপযোগিতার কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু কালের পরিবর্তন হইয়াছে। এখন প্রয়োজন, ইহাদের ভিতর দিয়া নূতন যুগের আহ্বান প্রকাশ পাওয়া।

এই সংকল্প মনে রাখিয়া বিধুশেখর নিজের গ্রামে (মালদহে) চলিয়া যান। সে-সূত্রে তাঁহার সঙ্গে শান্তিনিকেতনের সম্বন্ধ তখনকার মতো বিযুক্ত হওয়াতে কবি খুবই দুঃখিত হইয়াছিলেন।

গ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপনের সংকল্প সফল হয় নাই। তখন কবিই তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলেন যে, তাঁহার

১ শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র। বি. এ. পাস করিয়া কিছুকালের জন্য এখানে থাকেন; তিনি কবির বক্তৃতার নোট নেন। দ্র. শান্তিনিকেতন ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম বর্ষ ১৩২৯ জ্যৈষ্ঠ হইতে ১৩২৯ মাঘ পর্যন্ত। ক্ষিতিমোহন সেনও নিয়মিতভাবে বলাকার নোট লইতেন; তিনি সেই সবের উপর নির্ভর করিয়া বহু বৎসর পরে 'বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা' (১৩৫৯) লিখিয়াছেন।

২ চিঠিপত্র ৫. পত্র ৮৮।

ইচ্ছা-সাধন শান্তিনিকেতনেই হইবে, এই স্থানই তাঁহার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। এই ভাবে ১৯১৯ জুলাই মাস হইতে বিশ্বভারতীর পঠন-পাঠন আরম্ভ হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ এই ইতিহাস বিবৃত করিয়া বলিলেন, "গাছের বীজ ক্রমে ক্রমে প্রাণের নিয়মে বিস্তৃতি লাভ করে; সে বিস্তার এমন করে ঘটে যে, সেই বীজের সীমার মধ্যে তাকে আর ধরেই না। তেমনি প্রথমে যে শিক্ষার আয়তনকে মনে করেছিলাম দেশের প্রয়োজনের মধ্যেই অবরুদ্ধ থাকবে, ক্রমে তা বৃহৎ আকাশে মুক্তিলাভের চেষ্টা করতে লাগল। যে অনুষ্ঠান সত্য তার উপর দাবি সমস্ত বিশ্বের, তাকে বিশেষ প্রয়োজনে খর্ব করতে চাইলে তার সত্যতাকেই খর্ব করা হয়।

"কোনো জাতি যদি স্বাজাত্যের ঔদ্ধত্যবশত ধর্ম ও সম্পদকে একান্ত আপন বলে মনে করে, তবে সেই অহংকারের প্রাচীর দিয়ে সে তার সত্য সম্পদকে বেষ্টন করে রাখতে পারবে না। যদি সে তার অহংকারের দ্বারা সত্যকে কেবলমাত্র স্বীকার করতে চায় তবে তার সে সত্য বিনষ্ট হয়ে যাবে। · · আমরা কি এ কথাই বলব যে মানবের বড়ো অভিপ্রায়কে দূরে রেখে ক্ষুদ্র অভিপ্রায় নিয়ে আমরা থাকতে চাই। তবে কি আমরা মানুষের যে গৌরব তার থেকে বঞ্চিত হব না? স্বজাতির অচল সীমানার মধ্যে আপনাকে সংকীর্ণভাবে উপলব্ধি করাই কি সব চেয়ে বড়ো গৌরব।

"এই বিশ্বভারতী ভারতবর্ষের জিনিস হলেও এ'কে সমস্ত মানবের তপস্যার ক্ষেত্র করতে হবে। · · এইজন্যই ভারতের ক্ষেত্রে বিশ্বভারতীকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।"[১]

বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠান সাধারণের হস্তে সমর্পিত হইল; এই সাধারণ বা পাবলিক বিশ্বসংসারের জনতা নহে। বিশ্বভারতীর সদস্য বা মেম্বররা এই পাবলিক; যাঁহারা বার্ষিক বারো টাকা দেন তাঁহারা সাধারণ সদস্য ও যাঁহারা এককালীন আড়াই শত টাকা দান করেন তাঁহারা আজীবন সদস্য। ইঁহাদের লইয়া গঠিত সভার নাম 'পরিষদ'। পরিষদ ও বিশ্বভারতীর নানা বিভাগ হইতে নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্য লইয়া কার্যকারী সভা বা 'সংসদ' গঠিত হইল। বিশ্বভারতীর প্রত্যেক বিভাগ পরিচালনার ভার এই সংসদের উপর প্রদত্ত হয়।

১৯২২ সালের ১৬ মে বিশ্বভারতী একটি রেজিস্টার্ড সোসাইটিরূপে গঠিত হইল। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী সোসাইটিকে তাঁহার বাংলা গ্রন্থের উপস্বত্ব দান করিলেন এবং শান্তিনিকেতনে (শান্তিনিকেতন আশ্রমের মূল বিশ বিঘা জমির বাহিরে) কবির নিজস্ব অস্থাবর ও স্থাবর সম্পত্তি সমস্তই বিশ্বভারতীকে অর্পণ করিলেন। কবির গ্রন্থাদির উপস্বত্ব ১৯০৭ সাল হইতে বিদ্যালয় ভোগ করিয়া আসিতেছিল, এইবার (২৬ জুলাই ১৯২৩) ট্রাস্টডীড্ প্রভৃতি সম্পাদন করিয়া সেইসব দান করিলেন।

বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের মানসপুত্র— কবির মনোলোকে তাহার জন্ম; তিনি জনক। কিন্তু এই জন্মাতুরকে লালন করিয়াছে 'মিউস্'রা। পাঠকের স্মরণ আছে ১৯১৮ সালে যখন রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বভারতী' সম্বন্ধে প্রথম তাঁহার ভাষণ দেন, সেই সময়ে আমরা তাঁহার একটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। তখন রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংস্কৃতিচর্চার কেন্দ্ররূপে বিশ্বভারতীকে গড়িতে চাহিয়াছিলেন। তার পর ১৯২০-২১ সালে য়ুরোমেরিকা সফরের পর দেশে আসিয়া যখন অসহযোগ আন্দোলন দেখিলেন, তখন তাঁহাকে সমস্তটাকেই নূতন করিয়া ভাবিতে হইয়াছিল। যুদ্ধোত্তর-পর্বে দেশের ও বিশ্বের নবতর পরিস্থিতিতে শিক্ষাদর্শের নব রূপায়ণের প্রয়োজন হইল। তাই রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বভারতী' উৎসর্গকালে

১ শান্তিনিকেতন, ৩য় বর্ষ ১৩২৮ মাঘ, পৃ. ২-৩।

যে মেমোরেণ্ডাম অব্ অ্যাসোসিয়েশন বা 'পরিমেল-বন্ধ' রচনা করেন, তাহাতে শিক্ষা ও জীবনের সমবায়ে সার্বিক শিক্ষা-তথা-জীবনদর্শনের সূত্রটি রচনা করেন। এই সূত্রটির পটভূমে আছে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ট্রাস্টডীড ও রাজা রামমোহন রায় কৃত ব্রাহ্মসমাজের ন্যাসপত্র। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই তিনটি পর পর পাঠ করিলে দেখিবেন যে রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের প্রদর্শিত পথকে রবীন্দ্রনাথ প্রশস্ততর ও সুন্দরতর করিয়া রচিলেন।

মুক্তধারা

প্রায় আড়াই মাস (৮ সেপ্টেম্বর হইতে ২৮ ডিসেম্বর) একাদিক্রমে শান্তিনিকেতনে কবি বাস করিতেছেন— শরীর মন ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাই কয়েকদিন বিশ্রামের জন্য গেলেন শিলাইদহ, বহুকালের যোগ এই নদীর সঙ্গে। বালিকা রানুকে কবি লিখিতেছেন, "আমি নদী ভালোবাসি। কেন, বলব? আমরা যে-ডাঙার উপর বাস করি, সে ডাঙা তো নড়ে না·· নদীর জল দিনরাত্রি চলে, তার একটা বাণী আছে। তার ছন্দের সঙ্গে আমাদের রক্ত-চলাচলের ছন্দ মেলে, আমাদের মনে নিরন্তর যে-চিন্তাস্রোত বয়ে যাচ্ছে সেই স্রোতের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে— এইজন্যে নদীর সঙ্গে আমার এত ভাব।" সাত দিন পরে শিলাইদহ হইতে ফিরিয়া আসিয়া শান্তিনিকেতন হইতে বালিকা রানুকে এই পত্রখানি লেখেন (২২ পৌষ ১৩২৯)।[১]

পদ্মা হইতে ফিরিয়া 'বোলপুরের শুষ্ক ধূসর মাঠের মধ্যে ইস্কুল-মাস্টারি' করিতেছেন। কিন্তু মন বড়রকমের একটা কিছু লিখিবার জন্য উৎসুক— অথচ তেমন তীব্র প্রেরণা নাই— নূতনেরও আহ্বান ক্ষীণ। তাই 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের সূক্ষ্ম সূত্র অবলম্বন করিয়া নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। পৌষসংক্রান্তির (১৪ জানুয়ারি ১৯২২) দিন নাটকটি শেষ করিয়া এক পত্রে লিখিতেছেন[২] "আমি সমস্ত সপ্তাহ ধরে একটা নাটক লিখছিলুম— শেষ হয়ে গেচে তাই আজ আমার ছুটি।·· এর নাম 'পথ'।" পরে পথের নাম দেন 'মুক্তধারা'।

পরদিন আশ্রমবাসীদের নিকট নাটকটি পড়িয়া শোনান: কবির বহু রচনার প্রথম শ্রোতা আশ্রমবাসীরা ও ছাত্ররা। তৎপর দিবস কবি কলিকাতায় গেলেন, সেখানে বন্ধুমহলেও শোনানো চাই; সেখানে আছে সমঝদার গোষ্ঠী, ভক্তবৃন্দ ও সাহিত্যরসিক। দুই দিন পরেই আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

মুক্তধারার মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নাটকের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শোনা গেলেও ইহা একটি নূতন সৃষ্টি। উত্তরকূটের রাজা রণজিতের শিল্পী বিভূতি বহু বৎসরের পরিশ্রমের পর একটি জলধারার (মুক্তধারা) বাঁধ নির্মাণ করিয়াছে। এতদিন পরে শিবতরাই-এর দুর্ধর্ষ প্রজাদের স্বাভাবিক জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হইলে, তাহারা রাজার শাসনমুষ্টির মধ্যে আসিল। প্রজারা বিদ্রোহভাবাপন্ন হইলে রাজা তাঁহার পুত্র যুবরাজ অভিজিৎকে তথাকার শাসনকর্তা করিয়া পাঠান। প্রজারা শান্ত হইল, সুখীও হইল। কিন্তু রাজকোষে তথা হইতে ধনাগম হয় না। প্রজাদের যুক্তি জলকষ্টে অন্নকষ্টে তাহারা অর্ধমৃতপ্রায়— এ অবস্থায় নিজের অন্ন না রাখিয়া রাজার খাজনা দিবে কেমন করিয়া। রাজা রণজিৎ বিরক্ত হইয়া অভিজিতকে শিবতরাই হইতে আহ্বান করিয়া আনিলেন— তাহাতে প্রজাদের ক্ষোভ শমিত হইল না। প্রজাদের পক্ষে আছে সর্বত্যাগী ধনঞ্জয় বৈরাগী।

১ ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৪৫।

২ ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৪৩।

এদিকে মুক্তধারার বাঁধ নির্মাণ উপলক্ষ্যে রাজ্যময় উৎসব। মুক্তধারার জল অবরুদ্ধ হওয়ায় শিবতরাই-এর প্রজারা যে অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছে— সেদিকে কী রাজা, কী শিল্পী বিভূতি সকলেই উদাসীন। বালি-পাথর জলের ষড়যন্ত্র ভেদ করিয়া মানুষের বুদ্ধি হবে জয়ী— এই ছিল বিভূতির উদ্দেশ্য। কোন্ চাষীর কোন্ ভুট্টার খেত মারা যাইবে সে-কথা ভাবিবার সময় তাহার ছিল না। সে যন্ত্রশক্তির মহিমা প্রচারে মত্ত। গর্ব করিয়া সে বলে, "জলের বেগে আমার বাঁধ ভাঙে না, কান্নার জোরে আমার যন্ত্র টলে না, দৈবশক্তির সঙ্গে যার লড়াই, মানুষের অভিশাপ সে গ্রাহ্য করে না।" বিজ্ঞানী-যন্ত্রবিদের এতবড়ো দম্ভোক্তিকে ব্যর্থ করিবার জন্য অভিজিৎ অগ্রসর হলেন— তিনি মনস্থ করিলেন বাঁধ তিনিই ভাঙিয়া শিবতরাই-এর লোকদের তৃষ্ণার জল ফিরাইয়া দিবেন। রণজিতের খুল্লতাত বিশ্বজিতের কাছে শোনেন যে তিনি রাজবাড়ির কেহ নহেন, রাজা তাঁহাকে মুক্তধারার কাছে অসহায় শিশু অবস্থায় কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। এই সংবাদ পাইবার পর হইতে অভিজিতের মন উতলা হয়— তিনি বুঝিতে পারেন যে তিনি সাধারণ ঘরের ছেলে। তাঁহার সংকল্প হইল সেই সাধারণ লোকের দুঃখ দূর করিবেন। বিভূতি নির্মিত বিরাট যন্ত্রদানবের একস্থলে দুর্বল ছিদ্র থাকিয়া যায়; ইহার কথা কেমন করিয়া অভিজিৎ জানিতে পারেন। রাজা রণজিৎ পুত্রের উত্তরকূটের রাজকীয় স্বার্থপরিপন্থী মত পোষণের জন্য অত্যন্ত বিরক্ত; অবশেষে তাহাকে বন্দী করিয়া কারারুদ্ধ করিলেন। বিশ্বজিতের ষড়যন্ত্রের ফলে বন্দীশালায় আগুন লাগে; অভিজিৎ মুক্তি পাইয়া অন্ধকার রাত্রে মুক্তধারার বাঁধের দুর্বল অংশে আঘাত করিলেন। বাঁধের ছিদ্র খুলিয়া গেল— সেই জলস্রোতে অভিজিত ভাসিয়া গেলেন; মুক্তধারাকে অবরুদ্ধ করিবার প্রয়াস ব্যর্থ হইল— শিবতরাই-এর মানুষরা তাহাদের জলধারা ফিরাইয়া পাইল।[১]

ব্যষ্টি ও সমষ্টি, ব্যক্তিসত্তা ও জাতীয়তা প্রভৃতির সম্বন্ধ বিষয়ে কবির মনে যেসব প্রশ্ন উঠিতেছে তাহারাই যেন মুক্তিলাভ করিল— মুক্তধারার মধ্যে। য়ুরোমেরিকা পরিভ্রমণ করিয়া পাশ্চাত্য জাতীয়তা ও কলীয়তার যে বীভৎস মূর্তি দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে কিভাবে পীড়িত করিয়াছিল, তাহার নিদর্শন বহু রচনার মধ্যে পাওয়া যায়। দেশে ফিরিয়া দেখেন সত্যাগ্রহের প্রতীক গান্ধীজির অহিংসপ্রতিরোধনীতি বৃটিশ রাজপ্রতাপকে আঘাত করিবার জন্য ছিদ্র অনুসন্ধান করিতেছেন। কবি পাশ্চাত্য দেশে দেখিয়া আসিয়াছেন যে রাষ্ট্রপরিচালকগণ আপন-আপন রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষার্থে বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পকে বাহন করিয়াছেন— আর বিজ্ঞানীরা প্রায় নির্বিকারভাবে আপনার আবিষ্কার-সৃষ্টির গৌরবে আত্মতৃপ্ত। আর্টের খাতিরে আর্টিস্ট যেমন— বিজ্ঞানের খাতিরেই বিজ্ঞান চর্চা ও আবিষ্কার তেমনই হইয়া দাঁড়াইয়াছে— তাহার ফলাফলের জন্য আর্টিস্ট ও বিজ্ঞানীর কোনো দায় নাই। আর্টিস্টের চারুকলাকে ধনলোভী শিল্পপতি প্রয়োগ করে কারুশিল্পে, আর বিজ্ঞানীকদের রাষ্ট্রনায়কগণ কাজে লাগান মারণাস্ত্ররূপে প্রতিবেশী নিধন উদ্দেশ্যে। আর্ট ও বিজ্ঞান ধর্ম ও নীতি হইতে ভ্রষ্ট। সকল দেশের শিক্ষানীতি ধর্মনীতি স্বজাতীয় রাষ্ট্রনীতির পাদপীঠতলে পিষ্ট; উগ্র জাতিপ্রেমের ইন্ধন সরবরাহ নাগরিক মাত্রেরই মুখ্য কর্তব্য। সেই ইন্ধন-সংগ্রহে পরাঙ্মুখ অভিজিতের পক্ষে আত্মাহুতি দান ছাড়া আর কোনো 'পথ' মুক্ত ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ কালিদাস নাগকে লিখিত একপত্রে (২১ বৈশাখ ১৩২৯) বলিতেছেন— "· ·machine এই নাটকের

১ মুক্তধারা [লিখিত পৌষ-সংক্রান্তি ১৩২৮]। প্রবাসী ১৩২৯ বৈশাখ, পৃ. ১-৩৯। পুস্তকাকারে প্রকাশ— মুক্তধারা (নাটক), প্রকাশক শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ২১০।৩।১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট। ব্রাহ্মমিশন প্রেসে মুদ্রিত ১৪ আষাঢ় ১৩২৯ [২৮ জুন ১৯২২] পৃ. ১৩৬। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪। ৭ মাঘ ১৩২৯ [১৯২৩ জানুয়ারি ২১] রবীন্দ্রনাথ রামানন্দকে লিখিতেছেন, "মুক্তধারা বইগুলি আপনি বিশ্বভারতীকে উপহার দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। ইহাতে আমি বড় আনন্দ পাইলাম।"—প্রবাসী ১৩৪৮ আশ্বিন, পৃ. ৬৫৯। ইংরেজি অনুবাদ—*The Waterfall*, Modern Review, 1922 May।

একটা অংশ। এই যন্ত্র প্রাণকে আঘাত করছে, অতএব প্রাণ দিয়েই সেই যন্ত্রকে অভিজিৎ ভেঙেছে, যন্ত্র দিয়ে নয়। যন্ত্র দিয়ে যারা মানুষকে আঘাত করে তাদের একটা বিষম শোচনীয়তা আছে— যেমন যে মনুষ্যত্বকে তারা মারে, সেই মনুষ্যত্ব যে তাদের নিজের মধ্যেও আছে— তাদের যন্ত্রই তাদের নিজের ভিতরকার মানুষকে মারছে। আমার নাটকের অভিজিৎ হচ্ছে সেই মারনেওয়ালার ভিতরকার পীড়িত মানুষ। নিজের যন্ত্রের হাত থেকে নিজে মুক্ত হবার জন্যে সে প্রাণ দিয়েছে। আর ধনঞ্জয় হচ্ছে যন্ত্রের হাতে মারখানেওয়ালার ভিতরকার মানুষ। সে বলছে, 'আমি মারের উপরে; মার আমাতে এসে পৌঁছয় না— আমি মারকে না-লাগা দিয়ে জিতব, আমি মারকে না-মারা দিয়ে ঠেকাব।' যাকে আঘাত করা হচ্ছে সে সেই আঘাতের দ্বারাই আঘাতের অতীত হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু যে মানুষ আঘাত করছে আত্মার ট্র্যাজেডি তারই— মুক্তির সাধনা তাকেই করতে হবে, যন্ত্রকে প্রাণ দিয়ে ভাঙবার ভার তারই হাতে— পৃথিবীতে যন্ত্রী বলছে, 'মার লাগিয়ে জয়ী হব।' পৃথিবীতে মন্ত্রী বলছে, 'হে মন, মারকে ছাড়িয়ে উঠে জয়ী হও।' আর নিজের যন্ত্রে নিজে বন্দী মানুষটি বলছে, 'প্রাণের দ্বারা যন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে, মুক্তি দিতে হবে।' যন্ত্রী হচ্ছে বিভূতি, মন্ত্রী হচ্ছে ধনঞ্জয়। আর মানুষ হচ্ছে অভিজিৎ।"[১]

বিশ্বভারতীর কাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে; অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি ও মাদাম লেভি থাকায় ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যচর্চার বেশ ভালো পরিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছে। চিরজীভাই মরিস নামে যে পারসী যুবকের কথা বলিয়াছি তিনি ফরাসীভাষা ভালো জানিতেন; তাঁহার উৎসাহে শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী সম্মেলনের পক্ষ হইতে ফরাসী হাস্যরসিক নাট্যাচার্য মোলিয়েরের ত্রিশতবার্ষিকী[২] এবৎসর উদ্‌যাপিত হইল (১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২২)। রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের এই সভায় হাস্যরস ও নাটক সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে এক ভাষণ দান[৩] করিলেন। এই ক্ষুদ্র ঘটনাটির উল্লেখ এইজন্য করিলাম যে এখন শান্তিনিকেতনের সাংস্কৃতিক পটভূমি কতদূর বিস্তারিত হইয়াছে তাহাই লক্ষ্যণীয়।

এতদিন আশ্রমে আশ্রম-সম্মিলনী ছিল— বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কর্মীদের সভা; এবার বিশ্বভারতী সম্মিলনীর অঙ্কুরোদ্গম হইল। এখন বিশ্বভারতীতে নূতন ছাত্র ও অধ্যাপক আসিতেছেন; "তাঁহারা বহুদিন হইতে পরস্পর প্রীতিভাবের আদান-প্রদান ও যোগরক্ষা প্রভৃতির উপযুক্ত ক্ষেত্রের অভাব অনুভব করিতেছিলেন। সম্প্রতি সে অভাব দূরীভূত হইয়াছে; 'বিশ্বভারতী সম্মিলনী' নামে একটি সভা গঠিত হইয়াছে।"[৪]

১৯২২ অব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি ১৩২৮ সালের ২৩ মাঘ বিশ্বভারতীর একটি অবিস্মরণীয় দিন; বিশ্বভারতীরই বা

১ রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, পৃ. ৫৩১।

২ ত্রিশতবার্ষিকী উৎসব; মোলিয়ের ১৫ই জানুয়ারি জন্মিয়াছিলেন ও ১৭ ফেব্রুয়ারি ৫১ বৎসর বয়সে মারা যান। সুতরাং শান্তিনিকেতনের উৎসব মৃত্যুদিনে উদ্‌যাপিত হয়। ইহা ত্রিশতবার্ষিকী জন্মোৎসব বলা যায় না।

৩ মোলিয়ের (Moliere, Jean Baptiste Poquelin (15 Jan 1622—17 Feb 1673): জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্বপ্রথম বাংলাভাষায় এই ফরাসী নাট্যকারকে পরিচিত করেন। ১৩০৭, শ্রাবণ ২৪ শিলাইদহ হইতে রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথ সেনকে লিখিতেছেন, "সুরেন ইতিমধ্যে Newman-দের ওখানে মোলিয়েরের অর্ডার দিয়ে এসেছে, তারা পাঁচ ছ দিনের মধ্যে পাঠাবে এমন আশ্বাস দিয়াছে।" —শনিবারের চিঠি, ১৩৪৮ আশ্বিন, পৃ. ৭৩৮। বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে Bohn's classics-এর মোলিয়েরের অনুবাদ তখনও ছিল।

৪ দর্শনশাস্ত্রের নবনিযুক্ত অধ্যাপক রাসবিহারী দাস ইহার সভাপতি ও ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য (কণ্ড) সম্পাদক। ২ চৈত্র ১৩২৮ প্রথম সভা হয়।" দ্র. শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ৩য় বর্ষ ১৩২৮ ফাল্গুন, পৃ. ৩২।

বলিব কেন— ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসেও এই দিনটি স্বীকৃত হইবে আশা করি। এইদিন Rural Reconstruction বা পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের কেন্দ্র সুরুল শ্রীনিকেতন কুঠিতে স্থাপিত হইল। পাঠকের স্মরণ আছে গত ২৭ সেপ্টেম্বর লেনার্ড এলমহার্স্ট নামে এক ইংরেজ যুবক শান্তিনিকেতনে আসিয়াছিলেন; ভারতের নানাস্থানে কৃষি ও গ্রাম সমস্যা সম্বন্ধে কিছুটা ওয়াকিবহাল হইয়া তিনি ফিরিয়াছেন; অসহযোগী জন ৫।৬ ছাত্র, সন্তোষ মিত্র, আলু (সচ্চিদানন্দ রায়) ও একখানা ছাউনি দেওয়া ফোর্ড মোটর ট্রাক লইয়া এলমহার্স্ট গ্রামোদ্যোগ কর্মে ব্রতী হইলেন।

রবীন্দ্রনাথের গ্রামসংস্কার, পল্লীসমাজ সম্বন্ধে বহুকালের স্বপ্ন। তাহা আজ ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের বিপুল উত্তেজনার সময়ে একজন ইংরেজের উৎসর্গীত প্রাণের ও এক আমেরিকান মহিলার অর্থানুকুল্যে বোলপুরের মাঠে রূপ লইতে চলিল। প্রসঙ্গক্রমে বলি শ্রীনিকেতনে কার্য শুরু হইবার দুই দিন পূর্বে উত্তরপ্রদেশে গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরা গ্রামে কন্‌গ্রেসের নামে উন্মত্ত জনতা স্থানীয় পুলিশথানার কয়েকজন দেশীয় লোককে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছিল। অসহযোগ আন্দোলনের চরম উত্তেজনার সময়ে বীরভূম জেলার একটি নিভৃত পল্লী মধ্যে ভারতের কৃষি ও গ্রামের চরমতম সমস্যা সমাধানের জন্য একটি অতি ক্ষুদ্র বীজ বপন করা হইল।

দেশের কাজ বলিতে রবীন্দ্রনাথ কী বুঝিতেন, তাহাই আজ শ্রীনিকেতনে মূর্তি লইতে চলিয়াছে দেখিয়া কবি বড়ই তৃপ্ত। রবীন্দ্রনাথ কবি হইলেও জমিদার— জমির সহিত, চাষীর সহিত তাঁহার নিবিড় যোগ। কয়েকবারই আপনার জমিদারিতে স্বল্পপুঁজি লইয়া গ্রামসংস্কারে নামিয়াছিলেন; কিন্তু নানা কারণে তাহা ফলপ্রসূ হয় নাই। তিনি দেশের সমস্যা ভালোরূপেই জানিতেন। এ কথা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না যে ভারতের সর্বাপেক্ষা বড়ো সমস্যা কৃষি, দেশের জনসংখ্যা কিছু-না-কিছু বাড়িতেছেই, অথচ কৃষি-উপযোগী জমি অফুরন্ত নহে। সুতরাং ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়াইতে না পারিলে, পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য জোগাইয়া মানুষকে শক্তিমান করিতে না পারিলে, দেশের মূল সমস্যার সমাধান হইবে না। এই উৎপাদনের শক্তির উৎস পল্লীবাসীর জীবনধারার উন্নয়নে, সেইজন্য শ্রীনিকেতনে এই নব প্রতিষ্ঠানের নাম হইল Rural Reconstruction— গ্রাম পুনর্গঠন।

এলমহার্স্টের সহিত কবি এইসব সমস্যা লইয়া আলোচনা করেন। এলমহার্স্ট বলিতেন মানুষ ভূমিলক্ষ্মীর বিত্ত-অপহারক; মাটি হইতে সে তাহার সমস্ত খাদ্য সংগ্রহ করে। কিন্তু মাটিকে পর্যাপ্ত পরিমাণে তাহার খাদ্য সে ফিরাইয়া দেয় না; ফলে মাটি অনুর্বর নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে, এবং চারিদিকে খাদ্যাভাব ও খাদ্যাভাবজনিত বিচিত্র ব্যাধি মাটির মানুষকে নির্বীর্য ও দুর্বল করিয়া ফেলিতেছে।

এইসকল কাজের কথা আলোচনা চলে রবীন্দ্রনাথের মনের এক কোঠায়; মনের অন্য কোঠায় তথ্য ও তত্ত্ব হইতে সংগ্রহ চলে অন্তরের রস। সর্বপ্রাণ-আধার ধরিত্রীর রহস্য কবিচিত্তে নূতন প্রেরণা আনে। জড়মৃত্তিকা ভেদিয়া যে প্রাণতরঙ্গ উছলিছে— তাহার সৌন্দর্যধ্যানে অন্তর বিস্মিত, মন পুলকিত— তাহারই গীতে ও ছন্দে মুক্ত হইল।

শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার একমাস পরে 'মাটির ডাক' স্তবক চতুষ্টয় লিখিলেন (২৩ ফাল্গুন ১৩২৮)। এই কবিতার চতুর্থ স্তবকে আছে—

যাই ফিরে যাই মাটির বুকে,
যাই চলি যাই মুক্তিসুখে,
ইটের শিকল দিই ফেলে দিই টুটে;

আজ ধরণী আপন হাতে
অন্ন দিলেন আমার পাতে,
ফল দিয়েছেন সাজিয়ে পত্রপুটে। · ·
কী ভুল ভুলেছিলেম, আহা,
সবচেয়ে যা নিকট তাহা
সুদূর হয়ে ছিল এত দিন :
কাছেকে আজ পেলেম কাছে—
চারিদিকে এই যে ঘর আছে
তার দিকে আজ ফিরল উদাসীন। —পূরবী।

সেইদিন লেখেন 'মাটির গান'[১]—

ফিরে চল মাটির টানে—
যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে।

সমগ্র গানটি স্থির চিত্তে না পড়িলে বা না শুনিলে ইহার গভীর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না; এই গানটি শ্রীনিকেতনের মর্মকথা— তাই সেইটি তথাকার সংগীতরূপে গৃহীত হইয়াছে— প্রতি বৎসর উৎসবে উহা গীত হয়।

মাটির ডাকে প্রাণ সাড়া দিল; সুর যখন একবার ধ্বনিল, তখন সে আর মাটির টানে, মাটির গানের মধ্যে সীমিত থাকিতে পারিল না; নানাভাবে আপনাকে মুক্তি দিয়া চলিল; বিচিত্র বাণী বহন করিয়া নবগীতিকার (২য়) অনেকগুলি গান এই সময়ের আগন্তুক।[২]

ইতিমধ্যে অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভির সস্ত্রীক নেপাল যাইবার কথা হইল; লেভি বহুবৎসর পূর্বে একবার নেপাল যান ও *Le Nepal* নামে তিন খণ্ডে বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, নেপালের দরবার মহলে তিনি খুবই পরিচিত। লেভিদের নেপাল যাবার কথা শুনিয়া কবির মন নেপাল যাইবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিল; প্রমথ চৌধুরীকে ১৫ মার্চ [১ চৈত্র ১৩২৮] লিখিতেছেন, "বুধবার প্রাতে কলকাতায় গিয়ে পৌঁছব · · আঠারই তারিখ নেপাল রওনা হব।"[৩] কিন্তু নেপালের দুর্গম পথে যাইবার প্রস্তাবে আত্মীয় বন্ধু কেহই উৎসাহ প্রকাশ না-করায়, সেখানে যাওয়া হইল না। অবশেষে শিলাইদহ যাওয়াই স্থির হইল— মন যখন ছুটিয়াছে— কোথাও যাইতেই হইবে।

কিন্তু তৎপূর্বে য়ুনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে (১৭ মার্চ। ৩ চৈত্র) সংগীত-সংঘের ছাত্রীবৃন্দের পারিতোষিক বিতরণ সভায় তাঁহাকে সভাপতিত্ব করিতে হইল। বক্তৃতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন যে, এই সংঘের গত রাখীপূর্ণিমার অধিবেশনে[৪] তিনি আমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন; সংঘের সেই উৎসবে প্রতিভা দেবী শেষ যোগদান করেন।

১ মাটির গান, শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩২৯ বৈশাখ। দ্র. নবগীতিকা (১৩২৯); গীতবিতান পৃ. ৬১২।
২ ২৩ ফাল্গুন— ফিরে চল মাটির টানে (গীতবিতান পৃ. ৬১২)
২৮ ফাল্গুন— রাতে রাতে আলোর শিখা রাখি জ্বেলে (গীতবিতান পৃ. ৩০১)
২৯ ফাল্গুন— ও মঞ্জরী, ও মঞ্জরী, আমের মঞ্জরী (গীতবিতান পৃ. ৫০২)
—তোমার সুরের ধারা ঝরে যেথায় (গীতবিতান পৃ. ৬)
৩ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৯০ [১২ মার্চ ১৯২২]।
৪ ২১ অগস্ট ১৯২১ সংগীত-সংঘের জলসা হয়; সেইখানে কবি 'আমাদের সংগীত' প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।

অল্পকাল পূর্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে (২৩ পৌষ ১৩২৮)। কবি বলিলেন যে এবার তাঁহার আমন্ত্রণ স্বর্গীয় প্রতিভা দেবীর অন্তর হইতে আসিয়াছে, সেজন্য এই আহ্বান গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করিলেন না, কবি বলেন তাঁহারা প্রায় এক-বয়সী এবং বাল্যকালে প্রতিভা তাঁহার খেলার সাথী ছিলেন। বাংলাদেশে সংগীত ও সাহিত্যচর্চার প্রতিষ্ঠাত্রীদের অন্যতমা ছিলেন প্রতিভা দেবী। পাঠকের স্মরণে আছে ইনিই কবির বাল্মীকি-প্রতিভার— প্রতিভা। এই ভাষণে সংগীত সম্বন্ধে কবির মতামত কিছু আছে।[১]

পরদিন (১৮ মার্চ) লেভিরা নেপাল যাত্রা করিলে কবিও শিলাইদহ চলিয়া গেলেন। সেখানে কুঠি বাড়িতেই উঠিলেন। "আগে পদ্মা কাছে ছিল— এখন নদী বহু দূরে সরে গেছে।" কবি লিখিতেছেন, "আমার তেতালার ঘরের জানালা দিয়ে তার একটুখানি আভাস যেন আন্দাজ করে বুঝতে পারি ; অথচ একদিন এই নদীর সঙ্গে আমার বড়ো ভাব ছিল।··তারপর কত বৎসর··কাটল,··এখন এসে দেখি সে-নদী যেন আমাকে চেনে না। এই তো··মানুষের জীবন। ক্রমাগতই কাছের জিনিস দূরে চলে যায়। জানা জিনিস ঝাপসা হয়ে আসে, আর যে-স্রোত বন্যার মতো প্রাণ-মনকে প্লাবিত করেছে, সেই স্রোত একদিন অশ্রুবাষ্পের একটি রেখার মতো জীবনের একান্তে অবশিষ্ট থাকে।"[২]

শিলাইদহ বাসকালে 'নবগীতিকা'র আরও গান লিখিতে[৩] দেখি। এগানগুলির মধ্যে 'ক্লান্ত বাঁশির শেষ রাগিণী'র সুর ধ্বনিছে ; যে অতীতকে আর দেখিতে ধরিতে পারিতেছেন না, এসব যেন তাহারই ছবি ও স্মৃতি।[৪] এই পর্বে রচিত গানের কয়েকটি কবি গীতবিতানে 'প্রেম' পর্যায়ে কয়েকটি 'প্রকৃতি'র মধ্যে শ্রেণীত করিয়াছেন। গানগুলি—

১০ চৈত্র ১৩২৮	পূর্বাচলের পানে তাকাই অস্তাচলের ধারে আসি	(গীতবিতান, পৃ. ৫২৯)
১১ চৈত্র	আসা-যাওয়ার পথের ধারে	(গীতবিতান, পৃ. ২৭৭)
১২ চৈত্র	কার যেন এই মনের বেদন	(গীতবিতান, পৃ. ৫০৩)
১৩ চৈত্র	নিদ্রাহারা রাতের এ গান	(গীতবিতান, পৃ. ২৭৫)
১৪ চৈত্র	এক ফাগুনের গান সে আমার	(গীতবিতান, পৃ. ৫৩২)
১৯ বৈশাখ ১৩২৯	ক্লান্ত বাঁশির শেষ রাগিণী	(গীতবিতান, পৃ. ৩৪০)

১ আনন্দসংগীত পত্রিকা হইতে গৃহীত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮৪৪ শক (১৩২৯) বৈশাখ, পৃ. ২৯-৩০।

২ ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৪৬ ; ২২ চৈত্র ১৩২৮ ॥ ৫ এপ্রিল ১৯২২।

৩ প্রথম পাঁচটি গানের নাম যথাক্রমে শেষবেলা, বিতরণ, অবশেষ, নিদ্রাহারা, চেনা— ভারতী, ১৩২৯ বৈশাখ।

৪ "শিলাইদা ঘুরে এলুম— পদ্মা তাকে পরিত্যাগ করেচে—তাই মনে হল বীণা আছে, তা'র তার নেই। তার না থাকুক, তবু অনেক-কালের অনেক গানের স্মৃতি আছে। ভাল লাগ্‌ল, সেইসঙ্গে মনটা কেমন উদাস হল।" —চিঠিপত্র ৫, ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্র ৯, ২ বৈশাখ ১৩২৯, পৃ. ৩৮।

বর্ষামঙ্গল ও শারদোৎসব

শিলাইদহে দিন-পনেরো (৮ চৈত্র হইতে ২৩ চৈত্র ১৩২৮) বাস করিয়া কবি কলিকাতায় তিন দিন থাকিয়া শান্তিনিকেতন ফিরিলেন (২৭ চৈত্র)। বর্ষশেষের[১] দিন সন্ধ্যায় ও নববর্ষের[২] দিন প্রত্যুষে যথারীতি মন্দিরে উপাসনা করিলেন।

গ্রীষ্মকালটা 'এইখানেই যাপন করবার সংকল্প' গ্রহণ করিয়া ইন্দিরা দেবীকে (২ বৈশাখ ১৩২৯) লিখিতেছেন যে "তার ফলে যেমন একদিকে গ্রীষ্ম পাব, তেমনি অন্যদিকে সান্ত্বনাস্বরূপে অবকাশ পাওয়া যাবে। বিশ্রামের জন্যে সর্বদাই মনের মধ্যে একটা ব্যাকুলতা আছে— তাতে কেবল ফল হয় সেই ব্যাকুলতা অবিশ্রাম-ব্যাকুলতারূপেই থেকে যায়। আমার এই অবস্থা।"[৩]

বিদ্যালয় গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বন্ধ হইবে বৈশাখের মাঝামাঝি; এখন শান্তিনিকেতন নলকূপ খনন লইয়া খুব উত্তেজনা। বীরভূমের ন্যায় মরুসদৃশ দেশে জল সরবরাহ একটা প্রকাণ্ড সমস্যা; ইহার সমাধান প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথই পথপ্রদর্শক। পাঠকের স্মরণ আছে ১৯১৬ সালে কবি আমেরিকায় বক্তৃতা-সফরে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে কাহার পরামর্শে একরাশ অতিকায় নলকূপ খননের সাজসরঞ্জাম ক্রয় করিয়া শান্তিনিকেতনে পাঠাইয়া দেন। বহু ইঞ্জিনিয়ার যন্ত্রপাতি দেখিয়া যান, কিন্তু অতবড়ো কলকব্জা চালানোর মতো শক্তি বা বুদ্ধি কাহারও তখন ছিল না। বহুকাল সেগুলি অকেজোভাবে পড়িয়া থাকে। তার পর অনেক লেখালেখির পর বড়োদা স্টেট পরীক্ষাধীনভাবে সেগুলি লইতে সম্মত হন। কিন্তু তাহারাও সেগুলির সদ্ব্যবহার করিতে না পারিয়া বড়োদা হইতে বোলপুরে ফেরত পাঠাইয়া দেন; সেখান হইতে পাঠানো ও আনানোতে বেশ মোটা টাকা ব্যয় হইয়া গেল। অবশেষে পুরাতন লোহার দরে সেগুলিকে একদিন বিক্রয় করা হইল। এই আখ্যানটি পাঠ করিয়া বিজ্ঞ পাঠক নিশ্চয়ই হাসিতেছেন; কিন্তু তাঁহারা যেন ভুলিয়া না যান যে সে-যুগে ভারতে নলকূপ খননের কথা কেহ জানিত না বলিলেই চলে; স্বল্প বারির দেশে জল-উৎস সন্ধানের জন্য এই অর্থব্যয়কে অপব্যয় বলিব না— ইহা রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সাহসিকের উপযুক্ত কার্য।

যাহাই হউক আমাদের আলোচ্যপর্বে (১৯২২) আশ্রমের মধ্যে নলকূপ খননের ব্যবস্থা হইতেছে। আমেরিকা প্রত্যাগত অখিল চক্রবর্তী নামে এক যুবক এই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও কৌতূহলের অন্ত নাই— প্রায়ই কাজের জায়গায় আসেন। কবি এই প্রচেষ্টা অমর করিলেন 'এসো এসো হে তৃষ্ণার জল' গানটি লিখিয়া (৪ বৈশাখ ১৩২৯)। এই গানের পর গ্রীষ্মের প্রশস্তি করিয়া কয়েকটি গান রচিলেন (নবগীতিকা ২; গীতবিতান, পৃ. ৪৩৪) যেমন—

> প্রখর তপনতাপে আকাশ তৃষায় কাঁপে
> বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া
> বৈশাখ হে, মৌনী তাপস, কোন্ অতলের বাণী (১৪ বৈশাখ)

১ বর্ষশেষ (মন্দিরের উপদেশ, ৩০ চৈত্র ১৩২৮), শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ৩য় বর্ষ ১৩২৯ শ্রাবণ, পৃ. ৭৭-৭৯।

২ নববর্ষ (১লা বৈশাখ ১৩২৯, মন্দিরের উপদেশ), শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩২৯ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ৫৩-৫৬।

৩ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৯; পৃ. ৪০।

গ্রীষ্মাবকাশে আশ্রম প্রায় জনশূন্য। বিদেশী অধ্যাপকদের মধ্যে লেভিসাহেবরা ইতিপূর্বেই নেপাল চলিয়া গিয়াছেন। পিয়ার্সন ও ফরাসী-অধ্যাপক বেনোয়া সিমলা পাহাড়ে কোটগড়ে মিঃ স্টোকস-এর নিকট গেলেন। এলমহার্স্ট গেলেন দেহরাদুনে; আশ্রমে আছেন এন্‌ড্রুজ ও স্টেলা ক্রামরিশ।

পঁচিশে বৈশাখ শান্তভাবে উদ্‌যাপিত হইল। প্রমথ চৌধুরীকে লিখিতেছেন, "আমার জন্মদিনে নিজের খেয়ালে নিজেরই উদ্দেশে একটা কবিতা লিখেছিলুম।"[১] কবিতাটি সবুজ পত্রে[২] প্রকাশিত হয়। এই কবিতাটি শেষ তিন স্তবক ভাঙিয়া বিশ বৎসর পরে কবি শেষ জন্মদিনের জন্য একটি গান রচনা করিয়া দেন— 'হে নূতন দেখা দিক আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ' (২৩ বৈশাখ ১৩৪৮)। ইহাই কবির নিজস্ব সুর দেওয়া শেষ গান (দ্র. গীতবিতান পৃ. ৮৫৮)।

জন্মলাভের সঙ্গে ব্যক্তিমাত্রেরই জীবতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য; ভাবুকচিত্তে এই দিনে জীবনের এই জিজ্ঞাসা স্বাভাবিক। জন্মদিনে কবির মনে যে সব প্রশ্ন উঠিতেছে তাহা ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্রে (২৭ বৈশাখ) বিশ্লেষিত হইয়াছে। কবি লিখিতেছেন, "আমার পারিবারিক আসক্তি তেমন প্রবল নয়।··নিজের ছেলে মেয়েদের উপর একটা স্বাভাবিক স্নেহ সকলেরই আছে কিন্তু সে জিনিষটাকে পারিবারিক বলা চলে না। সেটা যথার্থ আত্মীয়তা, পারিবারিকতা নয়।··পারিবারিক সত্তা আমার মধ্যে প্রবল নয় বটে, কিন্তু তাই বলে আমার মন যে কেবলমাত্র মানবসাধারণের আম-দরবারেই দিন কাটাতে ভালবাসে তা নয়— বিরাট মানবের মধ্যেই আমার আত্মা কৈবল্য লাভ করেচে তা বল্‌তে পারিনে— আমার মধ্যে খুবই একটা প্রবল ব্যক্তিগত সত্তা আছে। বিশেষ মানুষ এবং বিশ্বমানুষ দুটোই আমার কাছে সবচেয়ে সত্য— পারিবারিক মানুষ এই দুইয়ের মাঝখানের প্রদোষান্ধকারের একটা জিনিস— আমার কাছেও সুস্পষ্ট নয়— এইজন্যে ওর উদ্দেশে আমার ত্যাগের উৎসাহ জাগে না। একদিন সেক্রেটারির পদ পেয়ে আদি ব্রাহ্মসমাজকে আমি বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত করে দিতে চেষ্টা করেছিলুম; যেই দেখলুম সেটা সম্ভবপর নয়, যে হেতুক ওটা আমাদের পারিবারিক জিনিস, তখনি ওর জন্যে এক মুহূর্ত বা এক পয়সাও খরচ করা আমার পক্ষে অপব্যয় বলে বোধ হল।"[৩] কবিকে কখনো ঠাকুরবাড়ি নিয়ে গর্ব করিতে শুনি নাই— একটা জায়গায় মন খুবই নিরাসক্ত ছিল।

কবির নৈর্ব্যক্তিক মনের চিত্র পাই আর একখানি সমসাময়িক পত্র হইতে। রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার কোনো ভক্ত এক পত্রে লেখেন যে কবি হইয়াও কর্মীর দৃষ্টান্ত তাঁহার মধ্যে সার্থক রূপ লইয়াছে। সেই কথা তুলিয়া কবি উত্তরে লিখিতেছেন, "তুমি এক সাক্ষী করেচ বিশ্বভারতী। হায় রে, তুমি কবি হয়েও ওর স্বরূপটা বুঝতে পারলে না। ওটা কি কাজ? ওটা আমার কাজ-কাজ খেলা। সেই জন্যেই তো আমাদের দেশের প্রধান কাজের লোকে কেউ ওকে গ্রাহ্যই করলে না। যাবার বেলায় হয় ত ও পুতুলটা ভেঙ্গে দিয়ে যেতে হবে— এমন অনেক পুতুল ত ভেঙেচি।— অতএব তোমরা আমার কাছ থেকে এমন কিছুই প্রত্যাশা কোরো না যাতে কাজের সুবিধা হ'তে পারে। কারণ আমার দরবারের অধিষ্ঠাত্রী আমাকে কাজে পাঠাতে চান না— কাছে রাখতেই চান।"[৪]

১ চিঠিপত্র ৫, প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত পত্র ৯২: ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯, পৃ. ২৭৬।

২ পঁচিশে বৈশাখ (রাত্রি হলো ভোর); সবুজ পত্র, ৮ম বর্ষ ১৩২৯ চৈত্র-বৈশাখ সংখ্যা, পৃ. ৪৯০-৯৩। দ্র. পূরবী, পৃ. ১৮-২১। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, পৃ. ৯-১২।

৩ চিঠিপত্র ৫, ইন্দিরা দেবীকে ২৭ বৈশাখ ১৩২৯ লিখিত পত্র ১০; পৃ. ৪০-৪৫।

৪ শ্রীকালিদাস নাগকে লিখিত পত্র (১৬ বৈশাখ ১৩২৯); শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ৩য় বর্ষ ১৩২৯ অগ্রহায়ণ, পৃ. ১৩১-৩২।

বিশ্বভারতী সম্বন্ধে যে কথা এখানে লিখিতেছেন, তাঁহারই প্রায়-প্রতিধ্বনি পাই ইন্দিরা দেবীকে জন্মদিন উপলক্ষ্যে লিখিত পূর্বোদ্ধৃত পত্রে ; সেখানে কবি লিখিতেছেন, "আমার ভয় হচ্চে বিশ্বভারতীতে খেলার চেয়ে দায়িত্ব পাছে বড় হয়ে ওঠে। এরকম অনুষ্ঠানের মধ্যে যে অংশটা আইডিয়া সেইটেই হচ্ছে বিশুদ্ধ আনন্দ— আর যে অংশটা নিয়ম ও ব্যবস্থা সেইটেই হচ্চে বিষম দায়— সেটা যদি আইডিয়াকে চাপা দিয়ে আটে ঘাটে আষ্টে পৃষ্ঠে পাকা হয়ে ওঠে তা হলেই পাকা বুদ্ধির লোকে খুসি হয়ে ওঠে, কিন্তু সৃষ্টিকর্তার তাতে বিতৃষ্ণা হয়। মানুষ মুক্তি পেতে চায়· ·কাজ পরিহার করে মুক্তি নয়, কিন্তু খেলাকেই কাজ করে তুলে তার মুক্তি।"[১]

কবির এই ভাবনাগুলি তাঁহার অন্তরের কিন্তু বহির্বিশ্ব? তাহাকে উপেক্ষা করিবার শক্তি কি তাঁহার আর আছে? যে বিশ্বভারতীকে খেলা বলিয়া উপহাস করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহাকে সুদৃঢ় করিবার জন্য 'কাজে' নামিতেই হইতেছে ; কবির ভাষায় বলি—

জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই,
ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে।

কবি খেলা ভাবিতে পারেন— কিন্তু যে শত শত কর্মী তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে— তাহাদের কাছে উহা খেলা হইতে পারে না তাহাদের জীবন ও জীবিকা, তাহাদের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ এই প্রতিষ্ঠানের সহিত কঠিন নিগড়ে বাঁধা পড়িয়াছে।

দুই মাস ছুটির[২] পর বিদ্যালয় খুলিল ১৪ আষাঢ় ১৩২৯। কবি লিখিতেছেন "ছেলেরা· · কলরব করতে করতে এখানকার শূন্যঘর সব পূর্ণ করে দিয়েছে। তখন আমার আর কাজের অন্ত নেই।"[৩] "আমি ছেলেদের ভালবাসি, সেই ভালবাসার সঙ্গে আমার পূজা মিশ্রিত হয়ে আমার কাছে বিশেষ রসের সামগ্রী হয়েচে, তাই এ'কে সময় দিতে সামর্থ্য দিতে আমার কিছুমাত্র বাধে না।"[৪]

বিদ্যালয় খুলিলে কবি স্কুলের ছাত্রদের ক্লাস পড়াইতেছেন ; সন্ধ্যার পর বয়স্কদের সঙ্গে সাময়িক বিদেশী পত্রিকার রচনা কেন্দ্র করিয়া আর্ট পলিটিক্স সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা করেন। ছাত্রদের সভা-সমিতিতে সদাই উপস্থিত হন।

শেলির মৃত্যুশতবার্ষিকী (১৯২২ জুলাই ৮) উপলক্ষ্যে[৫] সভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতিরূপে এক দীর্ঘ ভাষণ দিলেন। শেলি কিভাবে রাষ্ট্র ও ধর্মের দুই সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিকে আক্রমণ করিয়া নাস্তিক্য অপবাদ লাভ করেন— তাহা সবিস্তারে বলেন। তবে রবীন্দ্রনাথ শেলিকে নাস্তিক বলিতে প্রস্তুত নহেন ; শেলির মধ্যে ধর্মতৃষ্ণা ছিল, একটা আধ্যাত্মিক উপলব্ধিও ছিল। রবীন্দ্রনাথ শেলির Alastor কাব্যের উল্লেখ করিয়া প্রশ্ন করেন যে এই-যে সন্ধান— ইহা কিসের সন্ধান? এলাস্টারে "মানুষের ব্যথা প্রকৃতি সৌন্দর্যের ভিতরে অমৃতের সন্ধান ক'রে সেই প্রকৃতির অতীত লোকে তাকে পাবার চেষ্টা করেচে। প্রকৃতির মধ্যে তার তৃপ্তির পূর্ণতা হয় নি।· · তার যে বেদনা, সেই যে সন্ধান,

১ চিঠিপত্র ৫ ; ২৭ বৈশাখ, পৃ. ৪৫। ২ জ্যৈষ্ঠ (১৬ মে) বিশ্বভারতীর কন্‌স্টিটিউসন কলিকাতায় রেজিস্টার্ড হইল।

২ এই গ্রীষ্মের ছুটিতে শান্তিনিকেতনে কবির সঙ্গে দেখা করিতে আসেন সুরেন্দ্র ঘোষ, মনোরঞ্জন গুপ্ত, আশু দাস, অরুণ গুহ ও যাদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়। ইঁহারা সকলেই অগ্নিযুগের বিপ্লবী ছিলেন। ইতিপূর্বে যাদুগোপাল কবির সঙ্গে কলিকাতায় কোনো সময়ে দেখা করেন। দ্র. যাদুগোপাল, বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি, পৃ. ৪৭০।

৩ ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৪৭।

৪ চিঠিপত্র ৫, পৃ. ৪৩।

৫ শেলি (Shelley, Percy Bysshe), জন্ম ৪ অগস্ট ১৭৯২ : ইতালিতে স্পেজিয়া উপসাগরে নৌকাডুবি হইয়া মারা যান ৮ জুলাই ১৮২২।

তারই দ্বারা প্রমাণ হয় যে পরম-সৌন্দর্যময় একটি আত্মিক সত্তা বিশ্বের মধ্যে আছে; সে-সম্বন্ধে শেলির চিত্তে গভীর বেদনাপূর্ণ একটি আকুতি ছিল।”[১]

শেলির প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকৈশোরের আকর্ষণ— তাঁহার কয়েকটি সুপরিচিত কবিতা রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইন্দিরা দেবীকে ১৮৯৫ সালে একপত্রে “শেলিকে অন্যান্য অনেক বড়লোকের চেয়ে বিশেষরূপে কেন ভাল লাগে” তার কারণ দর্শাইয়াছেন।[২]

পরদিন (৯ জুলাই) কবিকে কলিকাতায় যাইতে হইল; কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের[৩] মৃত্যু হইয়াছে— রবীন্দ্রনাথকে সেই সভায় সভাপতিত্ব করিতে হইবে। এই কাজটি কবির পক্ষে যে কী বেদনাদায়ক তাহা এই তরুণে-প্রবীণে সখ্যতার কাহিনী যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই বুঝিবেন। বাংলাদেশের যে কয়জন কবি-সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকিয়াও তাঁহার প্রভাব হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহাদের অন্যতম।[৪] রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মর্মের কথা একটি কবিতায় ব্যক্ত করিলেন; উহার একস্থানে আছে—

আজো যারা জন্মে নাই তব দেশে,
দেখে নাই যাহারা তোমারে, তুমি তাদের উদ্দেশে
দেখার অতীত রূপে আপনারে করে গেলে দান
দূর কালে; তাহাদের কাছে তুমি নিত্য-গাওয়া গান
মূর্তিহীন। কিন্তু, যারা পেয়েছিল প্রত্যক্ষ তোমায়
অনুক্ষণ, তারা যা হারালো তার সন্ধান কোথায়,
কোথায় সান্ত্বনা। বন্ধুমিলনের দিনে বারম্বার
উৎসবরসের পাত্র পূর্ণ তুমি করেছ আমার—
প্রাণে তব, গানে তব, প্রেমে তব, সৌজন্যে, শ্রদ্ধায়,
আনন্দের দানে ও গ্রহণে। সখা, আজ হতে হায়,
জানি মনে, ক্ষণে ক্ষণে চমকি উঠিবে মোর হিয়া
তুমি আস নাই ব'লে— অকস্মাৎ রহিয়া রহিয়া
করুণ স্মৃতির ছায়া ম্লান করি দিবে সভাতলে
আলাপ আলোক হাস্য প্রচ্ছন্ন গভীর অশ্রুজলে। —পূরবী।

কলিকাতায় আসিলেই পাঁচ রকম কাজ কবিকে অনুসরণ করেই, তবে তিনিও যে পাঁচ রকম উত্তেজনা সৃষ্টি করেন না— একথাই বা কি করিয়া বলা যায়। গত বৎসর বর্ষামঙ্গল হইয়াছিল— ইতিমধ্যে কতকগুলি

১ শেলি, ভারতী ১৩২৯ আশ্বিন। প্রবাসী ১৩২৯ কার্তিক, পৃ. ১০৪-০৬।

২ ছিন্নপত্র, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ ১৩৫২, পৃ. ৭৬-৭৭।

৩ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত: জন্ম ১৮৮২ ফেব্রুয়ারি ১১ ॥ ১২৮৮ মাঘ ৩০ — মৃত্যু ১৯২২ জুন ২৪ ॥ ১৩২৯ আষাঢ় ১০। ইনি অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র; রজনীনাথ দত্তের পুত্র। দ্র. হরিপ্রসাদ মিত্র, ‘সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা ও কাব্যরূপ।’ সনজিদা খাতুন, ‘কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত’ (১৯৫৮), পৃ. ১৮৮-১৯৩।

৪ সত্যেন্দ্রনাথ, অজিতকুমার ও সতীশচন্দ্র এই তিনজন ছিলেন বন্ধু; তাঁহাদের তিনজনের কৈশোরের একটি আলোকচিত্র আছে — তিন বন্ধু এক ছত্রতলে। এই তিন জনই রবীন্দ্রনাথের পরম ভক্ত ছিলেন। কবির জীবনে এই ত্রয়ী সাহিত্যিক এক সময়ে অনেকখানি জুড়িয়া ছিল।

নূতন গান জমিয়াছে— তাই এবারও বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানের কথা বন্ধুমহলে উঠিয়া পড়িল। কিন্তু কবির মনে হইতেছে "যে-গান শান্তিনিকেতনের মধ্যে তৈরি, সে-গান কি কলকাতার হাটে জমবে।"[১] কিন্তু তখনই কোনো আয়োজন করা সম্ভব হইল না— উত্তরবঙ্গে জমিদারি-সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁহাকে যাইতে হইবে। কলিকাতায় দিন ছয় (২৫-৩০ আষাঢ়) থাকিয়া জমিদারিতে চলিলেন, এবার শিলাইদহে নয়— এবার আত্রাই নদীতে। চার দিন পরেই কলিকাতায় ফিরিলেন— আত্রাইতে একটি গান ইতিমধ্যে লিখিয়াছেন 'আমি কান পেতে রই'। —নবগীতিকা ২।

কলিকাতা শহরটা "মোটেই পছন্দ করিনে" বলিয়া রাণুকে আত্রাই হইতে পত্র[২] লিখিয়া, সেই কলিকাতায় ফিরিয়া সেখানে রহিয়া গেলেন। কারণ সভার পর সভার আহ্বান আসিতেছে।

পাঠকের স্মরণ আছে গত ২ জ্যৈষ্ঠ (১৬ মে ১৯২২) বিশ্বভারতী রেজিস্টার্ড সোসাইটি হইয়াছে। এই জুলাই মাসে বিশ্বভারতীর আদর্শ ও কার্য প্রচারের জন্য কলিকাতায় একটি সমিতি গঠিত হইল; তাহার প্রথম সভায় এলমহার্স্ট Robbery of the Soil[৩] নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন (২৮ জুলাই)। প্রবন্ধ পঠিত হইলে রবীন্দ্রনাথ 'সামাজিক স্বাস্থ্যরক্ষা ও প্রাণরক্ষার পথ কোন্ দিকে'[৪] এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। কবির ভাষণের সারমর্ম:

"আমাদের দেশে একটি কথা আছে যে, সংসারের গতি চক্রপথে চলে। মাটি থেকে যে প্রাণের উৎস উৎসারিত হচ্ছে তা যদি চক্রপথে মাটিতে না ফেরে, তবে তা'তে প্রাণকে আঘাত করা হয়। মাটিতে ফসল লাগানো সম্বন্ধে এই চক্ররেখা পূর্ণ হচ্ছে না বলে আমাদের চাষের মাটির দারিদ্র্য বেড়ে চলেছে; গাছপালা জীবজন্তু প্রকৃতির কাছ থেকে যে সম্পদ পাচ্ছে, তা তারা ফিরিয়ে দিয়ে আবর্তন গতিকে সম্পূর্ণতা দান করছে, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে মানুষ নিয়ে।" এই ভাষণে কবি প্রাণরক্ষার মূল তত্ত্ব যেমন আলোচনা করেন, স্বাস্থ্যরক্ষার কথাও তেমনি বলেন। তিনি আরও বলেন যে, আমাদের মনের চিন্তা ও চেষ্টা কেবলই শহরের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে, সেইজন্য পল্লীসমাজও তার মানসিক প্রাণ ফিরিয়া পাইতেছে না।

এই সভার পাঁচদিন পরে কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে (১৭ শ্রাবণ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যুসাম্বৎসরিক উপলক্ষ্যে কবিকে সভাপতিত্ব করিতে হয়। কবির মনে সে-সময়ে যে-কথাগুলি সবচেয়ে বড়ো হইয়া জাগিতেছে— সেই বিদ্যাসমবায় ও বিদ্যাসমন্বয়ের কথাই ভাষণের মুখ্যস্থান অধিকার করে। কবি বলেন, "এই বিদ্যাসম্মিলনের ভার নিয়েছিলেন এমন এক ব্যক্তি যাঁর বাইরের ব্যবহার বেশভূষা প্রাচীন, কিন্তু যাঁর অন্তর চিরনবীন। স্বদেশের পরিচ্ছদ গ্রহণ করে তিনি . . অতি প্রসন্নচিত্তে পাশ্চাত্য বিদ্যাকে গ্রহণ করেছিলেন।"[৫]

কবি ৯ জুলাই কলিকাতায় আসেন— প্রায় একমাস শান্তিনিকেতনের বাহিরে আছেন। আশ্রমে ফিরিয়া 'বর্ষামঙ্গলে'র অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন (২২ শ্রাবণ ১৩২৯ ॥ ৭ অগস্ট)। সেদিন পূর্ণিমা। ইহা আশ্রমের আনুষ্ঠানিক দ্বিতীয় বর্ষামঙ্গল উৎসব। একজন প্রত্যক্ষদর্শী জলসা এই সম্বন্ধে লিখিতেছেন; "কবি যখন 'আজ আকাশের মনের কথা ঝরঝর বাজে' গানটি গাহিতেছিলেন, তখন বাহিরে শ্রাবণের ধারাও ঝরঝর ধারে ঝরিতেছিল। গানের মধ্যে মধ্যে

১ ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৪৮; কলিকাতা, ২৯ আষাঢ় ১৩২৯।

২ ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৪৯; আত্রাই, ২ শ্রাবণ ১৩২৯।

৩ Robbery of the Soil, মাটির উপর দস্যুবৃত্তি; প্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত কর্তৃক অনূদিত। শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩২৯ ভাদ্র-আশ্বিন, পৃ. ৯০-৯৭।

৪ সামাজিক স্বাস্থ্যরক্ষা ও প্রাণরক্ষার পথ কোন্ দিকে; শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩২৯ কার্তিক, পৃ. ১১৫-১৬।

৫ বিদ্যাসাগর; বিদ্যাসাগর স্মৃতিসভার বক্তৃতার সারমর্ম, প্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত অনুলিখিত। প্রবাসী ১৩২৯ ভাদ্র, পৃ. ৭৫৯-৬৩।

তিনি 'ঝুলন', 'বর্ষামঙ্গল', 'নিরুপমা'— তাঁহার বর্ষার এই তিনটি কবিতা[১] আবৃত্তি করেন। মানুষে-প্রকৃতিতে মিলিয়া সেদিন যে সন্ধ্যাটির সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা দুর্লভ সামগ্রী, জীবনে এমনতরো সন্ধ্যা খুব আসে না।"[২]

বর্ষামঙ্গলের পরে (৯ অগস্ট) লেভিসাহেবদের বিদায়সভা। অধ্যাপক ১০ নভেম্বর (১৯২১) আশ্রমে আসেন নয় মাসের মধ্যে নেপালে মাস দুই কাটে— অবশিষ্ট সময় শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করেন। বিদায়সভায় কবি তাঁহার ভাষণ দেন ইংরেজিতে; ভাষণের একস্থলে বলেন "You, in your adventure of truth, had sailed across trackless centuries reaching the India of ancient days, had gained access to her secrets which could never be for pedants but only for lovers." লেভিসাহেব সত্যই প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতিতে মুগ্ধ ছিলেন, এবং শ্রদ্ধার চক্ষেই ভারত-ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণা করিতেন।[৩] এই ভাষণের একস্থলে কবি বলেন যে বিশ্বভারতী হইবে সেই প্রতিষ্ঠান যেখানে training young minds for a future, when the federation of races will be acknowledged। কবির স্বপ্ন ছিল মহাজাতিসমূহের মিলন যেদিন জগতে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হইবে, সেদিনকার যাহারা কর্ণধার হইবে, তাহাদের শিক্ষাকেন্দ্র হইবে বিশ্বভারতী। বিদ্যার্থীরা সর্বমানবের মিলনক্ষেত্রে শিক্ষা পাইয়া জাতিপ্রেমের যে-নঙাত্মক দিক মানুষকে স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন করিয়া তোলে, তাহা হইতে মুক্ত হইয়া মহামানবের শুভকর্মে ব্রতী হইবে। অর্থাৎ তাহারা যথার্থভাবে বিশ্বজগতের নাগরিক (citizen of the world) হইবে— বিশেষ দেশের নহে।

পরদিন (১০ অগস্ট) বিশ্বভারতীর কনস্টিটিউশন সভা; পাঠকের মনে আছে ইতিপূর্বে ১৬ মে কলিকাতা বিশ্বভারতী সোসাইটি ১৮৬০ সালে ২১নং অ্যাক্ট অনুসারে রেজিস্টার্ড হইয়াছিল। এবার সোসাইটির সংবিধানধারাগুলি সভায় গৃহীত হইল। সেদিন অপরাহ্ণে কবি ও লেভিদম্পতি কলিকাতায় গেলেন। কলিকাতায় বর্ষামঙ্গলের আয়োজন হইতেছে। শান্তিনিকেতন হইতে ছাত্রছাত্রীরা কলিকাতায় আসিল— ১২ অগস্ট রামমোহন লাইব্রেরিতে জলসা— আমন্ত্রিত হইলেন বিশ্বভারতীর সদস্য ও বন্ধুরা। পরদিন বিশ্বভারতী সম্মিলন পক্ষ হইতে লেভির[৪] বিদায় সভা; কবি সম্মিলনীতে যে ভাষণ দেন, তাহা বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা।[৫]

অতঃপর বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠিত হইল পাবলিক রঙ্গমঞ্চে— প্রথম দিন (১৬ অগস্ট) মাদান থিয়েটরে (কর্পোরেশন স্ট্রীটে) ও দ্বিতীয় দিন (১৯ অগস্ট) আলফ্রেড থিয়েটরে (হ্যারিসন রোডে)। এই প্রথম শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা পাবলিক রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া জলসা করেন; প্রসঙ্গত বলি— এখনো নৃত্য জলসার অঙ্গ হয় নাই।

বর্ষামঙ্গলে ১৮টি গান গীত হয়— গ্রীষ্মের আবাহন দিয়া গানের পালা শুরু ও বাদল বিদায়ে তাহার শেষ। ভাবের একটি সংগতি রাখিয়া গানগুলি সাজানো— ঋতুউৎসবের আংশিক রূপ। গানগুলি ১৩২৯ বৈশাখ হইতে আষাঢ়ের মধ্যে রচিত।[৬]

১ ঝুলন— সোনার তরী; রবীন্দ্র-রচনাবলী ৩, পৃ ৯৩। বর্ষামঙ্গল— কল্পনা; রবীন্দ্র-রচনাবলী ৭, পৃ. ১২২। অবিনয়; হে নিরুপমা— ক্ষণিকা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৭, পৃ. ১২২।

২ শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩২৯ ভাদ্র-আশ্বিন, পৃ. ১০৯।

৩ বিদায় অভিনন্দন— অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি মহাশয়ের বিদায় উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ (৯ অগস্ট ১৯২২)। শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩২৯ ভাদ্র-আশ্বিন, পৃ. ১০১-০৩।

৪ লেভিরা ১৮ অগস্ট কলিকাতা ত্যাগ করেন।

৫ দ্র. শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩২৯ পৌষ, পৃ. ১৪৩-৪৫। ভাষণটি বিশ্বভারতী ১৩৫৮ পৌষ ৭ প্রকাশিত গ্রন্থের ৫নং বক্তৃতা, পৃ. ৩৪-৪১,।

৬ গানগুলির সংগতি দেখাইবার জন্য আমরা তালিকা দিতেছি গীতবিতান ১ম সং পৃ. ৬০৫-১৫। দ্র. নবগীতিকা ২, স্বরবিতান ১৫।

১. দারুণ অগ্নিবাণে, গীতবিতান, পৃ. ৪৩১। ২. এসো এসো হে তৃষ্ণার জল, পৃ. ৪৩১ (৪ বৈশাখ ১৩২৯)। ৩. ওই যে ঝড়ের মেঘের

বর্ষামঙ্গল জলসার দুই দিন পরে (২১ অগস্ট) প্রেসিডেন্সি কলেজে কবি-সম্বর্ধনা হয়। কবি সেখানে যে দীর্ঘ ভাষণটি দেন তাহাতে তাঁহার জীবনেতিহাস ও বিশ্বভারতীর কথা অতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।[১]

বিশ্বভারতী আদর্শ প্রচার ছাড়া তাহার ব্যবহারিক দিকের কথাও কবিকে ভাবিতে হইতেছে তাহাকে খেলা-খেলা কাজ বলিয়া লঘুভাবে অনিশ্চয়তার উপর ছাড়িতে পারিতেছেন না; তাই কথা হইল— বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে নাটক অভিনয় করিয়া। স্থির হইল পূজাবকাশের পূর্বে কলিকাতায় 'শারদোৎসব' নাটক অভিনীত হইবে, কবি সন্ন্যাসীর ভূমিকায়। রাণুকে লিখিতেছেন, "আমার এই সন্ন্যাসী সাজবার আর কোনো অর্থ নেই অর্থ সংগ্রহ ছাড়া।"[২]

শান্তিনিকেতনে অগস্টের শেষ দিকে ফিরিয়া কবি নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মে লিপ্ত হইলেন; যথারীতি বুধবারে[৩] মন্দিরে উপদেশ দিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে শারদোৎসবের রিহার্সাল। বালিকা রাণুকে আর এক পত্রে লিখিতেছেন (৪ সেপ্টেম্বর), "রোজ দুপুরবেলা বিভূতি [গুপ্ত][৪] এসে একবার ক'রে আমার কাছ থেকে আগাগোড়া পাঠ নিয়ে যায়; ছোটো ছেলেরা যে রকম করে পড়া মুখস্থ করে আমাকে তাই করতে হয়। কিন্তু এমনি আমার বুদ্ধি, তবু রিহার্সালের সময় কেবল ভুলি, ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত হাসে— এত অপমান সে আর কী বলব।"[৫] এই সামান্য পত্র হইতে আমরা বুঝিতে পারি ছাত্র ও শিক্ষকদের সহিত তাঁহার কী গভীর প্রীতির সম্বন্ধ; তাহাদের সহিত অভিনয় করতে তাঁহার কী অপার আনন্দ।

কয়দিনের মধ্যে শারদোৎসব নাটকের দলবল লইয়া কবি কলিকাতায় চলিলেন। ১০ সেপ্টেম্বর রাণুকে লিখিতেছেন, "আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ি একতলা থেকে তিনতলা পর্যন্ত কলরবে মুখরিত হয়ে উঠেছে; পা ফেলতে সাবধান হতে হয়, পাছে একটা না একটা ছেলেকে মাড়িয়ে দিই। মেয়ের দলও এবার নেহাত কম নয়।"[৬]

কোলে, পৃ. ৪৫২। ৪. হৃদয় আমার ঐ বুঝি তোর, পৃ. ৪৫২। ৫. কখন বাদল-ছোঁয়া লেগে, পৃ. ৪৫৩ (২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯)। ৬. আজ নবীন মেঘের সুর লেগেছে, পৃ. ৪৫৩ (২ আষাঢ় ১৩২৯)। ৭. আজ আকাশের মনের কথা, পৃ. ৪৫৪। ৮. এই সকাল বেলার বাদল আঁধারে, পৃ. ৪৫৪ (২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯)। ৯. পুব-সাগরের পার হতে, পৃ. ৪৫৪। ১০. আজি বর্ষারাতের শেষে, পৃ. ৪৫৫ (২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯)। ১১. শ্রাবণমেঘের আধেক দুয়ার, পৃ. ৪৫৫ (২৯ আষাঢ় ১৩২৯)। ১২. বহু যুগের ওপার হতে, পৃ. ৪৫৫ [প্র. আষাঢ় ১৩২৯]। ১৩. বাদল-বাউল বাজায় রে, পৃ. ৪৫৬। ১৪. এ কি গভীর বাণী এলো, পৃ. ৪৫৬। ১৫. আজি হৃদয় আমার যায়, পৃ. ৪৫৬। ১৬. ভোর হল যেই শ্রাবণ-শর্বরী, পৃ. ৪৫৭ (১৬ আষাঢ় ১৩২৯)। ১৭. বৃষ্টিশেষের হাওয়া, পৃ. ৪৫৭। ১৮. বাদল-ধারা হল সারা, পৃ. ৪৫৭।

১ প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিন, vol. IX, no. 1, 1922 September, pp. 97-104। কবির ভাষণ প্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত কর্তৃক অনুলিখিত। উক্ত ম্যাগাজিনে Welcome Rabindranath শীর্ষক রচনায় এই বক্তৃতার আনুষঙ্গিক বিবরণ মুদ্রিত আছে। বক্তৃতাটি আছে বিশ্বভারতী (১৩৫৮ পৌষ) গ্রন্থে ৬ সংখ্যক ভাষণ, পৃ. ৪২-৫৮।

২ ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৫০; ১৩ ভাদ্র ১৩২৯ ॥ ৩০ অগস্ট।

৩ মন্দিরের উপদেশ, ১৩ ভাদ্র (৩০ অগস্ট)। দ্র. শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩২৯ ভাদ্র-আশ্বিন, পৃ. ১০০-০১। মন্দিরের উপদেশ, ২০ ভাদ্র (৬ সেপ্টেম্বর), শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩২৯ কার্তিক।

৪ বিভূতিভূষণ গুপ্ত শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র; সে সময়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষক। বর্তমানে শিক্ষাভবনের অধ্যাপক।

৫ ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৫১; ১৮ ভাদ্র ১৩২৯ ॥ ৪ সেপ্টেম্বর ১৯২২।

৬ ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৫২; ২৪ ভাদ্র ॥ ১০ সেপ্টেম্বর।

কলিকাতায় যে শারদোৎসব নাটক অভিনীত হইবে তাহা 'ঋণশোধ' নহে— তাহা মূল গ্রন্থই। তবে ইহারও একটা ভূমিকা-নাটক প্রথমে জুড়িয়া দিলেন— যেমন ফাল্গুনীর জন্য লিখিয়াছিলেন বৈরাগ্যসাধন। শারদোৎসবের এই ভূমিকা ব্যাখ্যানও বটে কৈফিয়ৎও বটে।

রাজা উৎসবের জন্য কবিশেখরকে পালা বাঁধিতে বলিয়াছিলেন— সেই নাটক অভিনীত হইবে। মন্ত্রীর কাছ হইতে জানিতে পারিলেন কবিশেখর যাহা রচিয়াছেন তাহার মধ্যে বস্তুপদার্থ কিছুই নাই।

"কবিশেখরের· · সুবিধা-অসুবিধা, স্থান-কাল-পাত্র ও-সবের দিকে· · একেবারেই দৃষ্টি নেই। তিনি আপন খেয়াল মতোই চলেন। ছোট একটা পালা লিখেছেন· · সেটা গানেতে গন্ধেতে রঙেতে রসেতে মিশিয়ে একটা কিছু-না গোছের জিনিস।· · তাতে গল্প কিছু· · নেই বললেই হয়। যুদ্ধ· · কোনোরকমের রক্তপাত· · আত্মহত্যা· · পতন ও মূর্চ্ছা— একেবারেই নেই। আদিরস বীররস করুণরস একটুও নেই।· · তার মধ্যে যা আছে তা শরৎকালের উপযোগী খুব হালকা রকমের ব্যাপার। শরৎকালের মেঘ যে হালকা, তার কোনো প্রয়োজন নেই; তার জলভার নেই, সে · · নিঃসম্বল সন্ন্যাসী· · শরৎকালের শিউলিফুলের মধ্যে যেন কোনো আসক্তি নেই, যেমন সে ফোটে তেমনি সে ঝরে পড়ে।· · শরৎকালের কাশের স্তবক না বাগানের না বনের;· · শরতে কাঁচা ধানের যে খেত দেখি, কেবল আছে তার রং, কেবল আছে তার দোলা। আর কোনো দায় যদি তার থাকে সে-কথা সে একেবারে লুকিয়েছে। শারদোৎসবের যে পালা সে ওইরকমই হালকা, ওইরকমই নিরর্থক। সে-পালায় আছে ছুটির খুশি।"[১] কবির মনে কিছুকাল হইতে খেলা ও কাজ লইয়া যে তর্ক চলিতেছে তাহারই প্রকাশ হইয়াছে এই ভূমিকায়।

শারদোৎসবের অভিনয় হইল অ্যালফ্রেড থিয়েটরে ও মাদান থিয়েটরে (৩১ ভাদ্র, ১ আশ্বিন ১৩২৯। ১৭, ১৮ সেপ্টেম্বর)। রবীন্দ্রনাথ সন্ন্যাসীর ভূমিকা গ্রহণ করেন; দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরদা, জগদানন্দ রায় লক্ষেশ্বর, অসিত হালদার রাজা। ভূমিকাংশে রাজার অংশ গ্রহণ করেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মন্ত্রী হন সমরেন্দ্রনাথ।

অভিনয়ের দ্বিতীয় দিন প্রাতে বোলপুর হইতে টেলিগ্রাম আসিল যে সেই-দিন দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের[২] মৃত্যু হইয়াছে। পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া দিনেন্দ্রনাথ বোলপুর চলিয়া গেলেন— অশীতিপর পিতামহ দ্বিজেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে একা। এদিকে অভিনয়ে দিনেন্দ্রনাথের ভূমিকা কে গ্রহণ করে? অবনীন্দ্রনাথ অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুত হইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন— আশ্চর্য সফলতার সহিত অভিনয় করিলেন, দর্শক-শ্রোতারা বুঝিতেই পারিল না যে অবনীন্দ্রনাথ সেই দিন মাত্র তাঁহার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অভিনয়ে নামিয়াছেন।

১ শারদোৎসবের ভূমিকা; শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩২৯ ভাদ্র-আশ্বিন, পৃ. ৯৭-৯৯। ঋতুউৎসব, পৃ. ৩৩-৩৭। রবীন্দ্র-রচনাবলী ৭, গ্রন্থপরিচয়, পৃ. ৫৪৭-৫০।

২ দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর (জন্ম ২১ আষাঢ় ১২৬৯ — মৃত্যু আশ্বিন ১৩২৯)। মহর্ষির পৌত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের অন্যতম ট্রাস্টি। মহর্ষির মৃত্যুর কিছুকাল পরে দ্বিপেন্দ্রনাথ পিতা দ্বিজেন্দ্রনাথকে লইয়া শান্তিনিকেতনে বাস করিতে আসেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্য নিচু-বাংলার বাড়ি মেরামত ও নির্মিত হয়। দ্বিপেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের বাড়ির একতলায় আসিয়া বাস করিতে থাকেন। বহুবৎসর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ধনাধ্যক্ষ ছিলেন। বোলপুর ও শান্তিনিকেতনের মধ্যে ইনি ছিলেন সেতুস্বরূপ; সকল শ্রেণীর লোক তাঁহাকে সম্ভ্রম করিত।

পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে : সিংহলে

শারদোৎসব অভিনয়ের দুই দিন পরে ২০ সেপ্টেম্বর কবি পশ্চিম-ভারত সফরে বাহির হইলেন— সঙ্গে মি. এলমহার্স্ট ও শান্তিনিকেতনের অন্যতম শিক্ষক গৌরগোপাল ঘোষ। লৌকিক দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের হয়তো একদিনের জন্যও পুত্রশোকাহত দ্বিজেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার দেখা করিতে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কবি মৃত্যু-আঘাতকে কোনো দিনই একান্ত করিয়া দেখেন নাই ; তাই পরিবারগত দুঃখের নিকট নিজ কর্তব্যকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারিলেন না।

বোম্বাইএ পৌঁছিয়া পরদিনই (২৩ সেপ্টেম্বর) কবি পুণা যাত্রা করিলেন— সঙ্গে সিলভ্যাঁ লেভি ও এন্ড্রুজ। লেভিরা ১৮ অগস্ট কলিকাতা ত্যাগ করিয়া নানাস্থান ভ্রমণান্তে বোম্বাই আসিয়াছিলেন। 'এন্ড্রুজ সাহেব পাঞ্জাবে আকালীদের নাক্কাল সম্বন্ধে তদন্ত করতে অমৃতসরে' ছিলেন, তিনি কবির সফরে সহায়তা করিবার জন্য দ্রুত চলিয়া আসিলেন।[১] কবি পুণায় লেডি থ্যাকারসে-র অতিথি। সেখানকার কিরলোসকর থিয়েটরে তাঁহার প্রথম বক্তৃতা Indian Renaissance দিলেন ; 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধের বিষয় এই ভাষণের মুখ্য কথা। তদুপরি কবি স্পষ্ট করিয়া বলেন যে ভারতের কোথায়ও এমন-একটি স্থান নাই যেখানো কোনো বিদেশীয় বা ভারতীয় ছাত্র ভারত-চিত্তের শ্রেষ্ঠ আদর্শ আয়ত্ত অথবা ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করিতে পারে। সেই অভাব দূর করিবার জন্য ভারতের সকল সংস্কৃতিকে এক বিদ্যাকেন্দ্রে আহ্বান করিবার জন্য তিনি বিশ্বভারতী সংস্থাপন করিয়াছেন ("a University which would help India's mind to concentrate and to be fully conscious of itself ; free to seek its truth and make this truth its own wherever found, to judge by its own standard, give expression to its own creative genius, and offer its wisdom to the guests who come from other parts of the world")।

পুণায় যে স্বল্পকাল ছিলেন, তাহার মধ্যে তথাকার প্রায় সকল প্রতিষ্ঠান কবি ও লেভি পরিদর্শন করিলেন। সার্বজনিকসভা পুণার বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান— সেখানে কবি একদিন লোকমান্য টিলক সম্বন্ধে বিশেষ আবেগের সহিত তাঁহার শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ; ১৯২০ সালের ৩১ জুলাই টিলকের মৃত্যু হইয়াছিল। সেই মহাপ্রাণের সহিত কবির কী সম্বন্ধ ছিল, তাহা সেই দিন বলেন (দ্র. যাত্রী)।

পুণা হইতে কবি সদলে মৈসুর চলিলেন। পথে বেলগাঁও ও হুবলি স্টেশনে কবিকে অভিনন্দিত করিবার জন্য জনতার কী ভিড়! বঙ্গলুরে তখন ব্রজেন্দ্রনাথ শীল আছেন— তিনি মৈসুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলর। কবি ব্রজেন্দ্রনাথের বাটিতে দুই দিন থাকেন (২৭-২৮ সেপ্টেম্বর)। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে কবিকে একদিন বক্তৃতা করিতে হয়।

বঙ্গলুর হইতে কবি মাদ্রাজ চলিলেন ; সেখানে রামস্বামী আয়ার-এর অতিথি। গোখলে হলে ২৯-এর সন্ধ্যায় কবি Vision of India[২] নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন ; পর দিন The Spirit of Modern Times সম্বন্ধে ভাষণ দান করেন।

১ "In his loving anxiety to ease the strain on his friend he took upon himself a heavy burden of secretarial responsibility ; though at the same time, in his eagerness that Tagore's ideals should be known, he tended to arrange for him [Tagore] impossibly crowded programmes." —Sykes, p. 187। কবির বক্তৃতার প্রোগ্রাম যে কি তাহা এই পরিচ্ছেদ পাঠ করিলে জানা যাইবে।

২ A Vision of India's History—Visva-Bharati Quarterly 1923, Vol.I, No. 1। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদকত্বে এই ত্রৈমাসিক পত্রিকা বিশ্বভারতী হইতে প্রকাশিত হয়। ১৯২৩ হইতে ১৯৩১ পর্যন্ত চলিয়া অর্থসংকটে উহা বন্ধ হইয়া যায়। পুনরায় ১৯৩৫ হইতে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে।

মাদ্রাজ হইতে এন্‌ড্রুজের সহিত কবি কোয়াম্বতুর পৌঁছিলেন (১ অক্টোবর)। কোয়াম্বতুর দক্ষিণ-ভারতের বিশিষ্ট শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানকার বণিকসংঘ হইতে আড়াই হাজার টাকার চেক্‌ তাঁহার হস্তে অর্পিত হয়। শহরের ভ্যারাইটি হলে কবি দুই দিন বক্তৃতা করেন— A Vision of India's History ও An Eastern University[১]।

কোয়াম্বতুরের নিকট Vaiyampalayam নামে ক্ষুদ্র এক গ্রামে কবিকে একদিন উপস্থিত (৩ অক্টোবর) হইতে দেখিয়া লোকে তো অবাক! এখানে বহুকাল পূর্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একবার আসিয়াছিলেন; স্থানীয় লোকদের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম-অনুরাগী অনেকে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে তাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত ১৮৩৲ টাকার একটি তোড়া উপহার দেন। এই দানপ্রাপ্তির কথা কবি বিশেষ গৌরবের সহিত স্মরণ করিতেন।

গত পনেরো দিনের নিরন্তর চলাফেরা ও বক্তৃতাদানের ফলে কবির শরীর খুবই অসুস্থ হইয়া পড়িল, তাঁহার বয়স এখন বাষট্টির উপর। কথা ছিল কোয়াম্বতুর হইতে মালায়ালাম বা কেরলের আলওয়ে (Alwaye) শহরে যাইবেন; কিন্তু শরীর আর সায় দিতেছে না। তাই সেখানে যাওয়া রদ করিয়া মঙ্গলুরে চলিয়া গেলেন। আরবসাগরের তীরে অবস্থিত এই বন্দর-নগরটিতে খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের বহু প্রতিষ্ঠান আছে; এখানকার বাস্‌ল (Baslo) মিশনারীরাই সমধিক খ্যাত। কবি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি দেখিলেন ও নানা অনুষ্ঠানে যোগও দিলেন; কিন্তু শরীরের কোনো উন্নতি না হওয়ায় সকল প্রকার অনুষ্ঠানে যোগদান বন্ধ করিয়া দিলেন।

মঙ্গলুর হইতে ১১ অক্টোবর এন্‌ড্রুজকে সঙ্গে লইয়া কবি সিংহল যাত্রা করিলেন। সেখানে কবি ডি'সিলভার অতিথি। একদিন ডি'সিলভার সহিত স্থানীয় ট্রেনিংকলেজ বা শিক্ষকশিক্ষণ বিদ্যালয়ে ছাত্র-অধ্যাপকদের নিকট বিশ্বভারতী সম্বন্ধে ভাষণ দান করেন। ১৩ অক্টোবর YMCA হলে প্রথম পাবলিক সভা; Sir Anton Betrom সভাপতি। পর দিন উক্ত হলে Forest University of India শীর্ষক ভাষণ এবং তৎপর দিবস (১৫ই) The Growth of My Life's Work শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। সার্‌ পোনম্বলম অরুণাচলম্‌ সভাপতিত্ব করেন। ১৬ই কলম্বোর ভারতীয় ক্লাবে নানা জাতি ও সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট লোকেরা সমবেত হন; কবি তাঁহাদের নিকট তাঁহার শিক্ষাদর্শ ব্যাখ্যা করেন ও বাংলায় তাঁহার কাব্য হইতে কিছু আবৃত্তি করেন।

পরদিন কবি গ্যালে (Galle) যান। সেখানে সুবৃহৎ অলকট্‌ হলে তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য অভূতপূর্ব জনতা হইয়াছিল। পরদিন প্রাতে মহিন্দ কলেজ পরিদর্শন করিয়া কবি এনড্রুজের সহিত কলম্বো ফিরিয়া আসেন। কলম্বোতে ফিরিয়া তাঁহার বিশ্রাম নাই; নানা সামাজিক সভায় যোগদান, সভায় বক্তৃতা, কলেজের পারিতোষিক সভায় পুরস্কার বিতরণ প্রভৃতি কাজ করিতে হইতেছে। কিন্তু শরীরে এত পরিশ্রম সহ্য হইল না; তাই কয়েকদিনের জন্য Newara Eliya নামক স্থানে তিনি বিশ্রামের জন্য গেলেন। কলম্বো (শ্রাবস্তি) হইতে একখানি পত্রে এই ঘোরাঘুরি সম্বন্ধে তাঁহার মনের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। তিনি লিখিতেছেন, "আমি ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্চি— হাতে নিয়ে বললে ঠিক হয় না, কণ্ঠে নিয়ে। এবিদ্যা আমার অভ্যস্ত নয়, তৃপ্তিকরও নয়। সুতরাং দিনগুলো যে সুখে কাটচে তা নয়। জীবনের পূর্বাহ্ণ সোনার স্বপ্ন নিয়ে অতীত হয়েচে, জীবনের সায়াহ্ণ সোনার সন্ধান নিয়ে তীত হয়ে উঠল। যখন মন শ্রান্ত হয়ে পড়ে তখন বিশ্বভারতীকে মরীচিকা বলে মনে হয়— তখন বুঝতে পারি যখন কবিত্ব রচনা করেচি সেই ছিল আমার বাস্তব কাজ, আর আজ যখন শুভানুষ্ঠানের পাকা ভিত্তি পত্তন করতে বসেচি এই হচ্চে মায়া। এ কি টিঁকবে? আইডিয়া জিনিসটা সজীব,

১ An Eastern University— Visva-Bharati Bulletin No. 7.

কিন্তু কোনো ইনস্টিট্যুশনের লোহার সিন্ধুকে ত তাকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না— মানুষের চিত্তক্ষেত্রে যদি সে স্থান পায় তবেই সে বর্তে গেল।"[১]

সেবার এলিয়াতে সপ্তাহ খানেক বিশ্রাম করিয়া কবি সিংহল ত্যাগ করিলেন। সিংহলবাসীদিগকে কবি বারে বারে ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত যোগযুক্ত হইবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া আসেন। সিংহলীরা বহু শতাব্দী পোর্তুগীজ ওলন্দাজ ও ইংরেজের অধীন থাকিয়া তীব্রভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতানুকারী, তাহাদের পারিবারিক পদবীর সহিত য়ুরোপীয় নাম যুক্ত; তাহাদের গান-বাজনা বিনোদন সমস্তই পাশ্চাত্যের অনুকরণ। এই সব দেখিয়া শুনিয়া কবি তাহাদিগকে বলেন, ভারত ও সিংহলের রাজনৈতিক ইতিহাস পৃথক হইলেও ধর্ম ও ভাষার দিক হইতে উভয়ের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য; সুতরাং উভয় দেশের মধ্যে সেই আধ্যাত্মিক যোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

সিংহল পরিভ্রমণান্তর কবি ত্রিবাঙ্কুরে আসিলেন (৯ নভেম্বর)। কবি আসিয়া দেখেন বিরাট জনসংঘ তিরুবন্দরমে তাঁহার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে; তিনি সবিনয়ে বলিলেন, "সম্মান আমি আপনাদের নিকট চাহি না, আমি চাহি প্রীতি; আমি আপনাদের নিকট আসিয়াছি একজন ব্যক্তি হিসাবে, কবি হিসাবে; কোনো বাণী আমার দিবার নাই।" কিন্তু একথা বলিয়াও তিনি বিশ্বভারতী সম্বন্ধে তাঁহার আদর্শ ব্যাখ্যা করিলেন। কুইলন যাইবার পথে বরকালে নামক স্থানে কবি থিয়া জাতির গুরু শ্রীনারায়ণগুরুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সর্বত্যাগী মানুষটি অস্পৃশ্য থিয়াদের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের সামাজিক আচার-ব্যবহার অনেক পরিমাণে উন্নত করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত কথাবার্তা বলিয়া কবি খুব তৃপ্ত হন; এই সাধুর চরিত্র কি ভাবে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন করিয়াছে তাহা দেখিয়া কবি আশ্চর্য হইলেন।

এরানকুল্লম যাইবার পথে তিনি Allepey-তে থামিলেন; পূর্বে সেখানে যাইবার কথা ছিল না, হঠাৎ ঠিক হয়; কিন্তু সেই অল্প সময়ের মধ্যে লোকে যে আয়োজনটা করিয়াছিল, তাহা সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিল।

কোচিনের নিকটবর্তী হইলে কবি দেখিলেন যে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কোচিনের কতকগুলি Snake-boat আসিয়াছে, তাহার উপর নানাবিধ মধুর সংগীত চলিতেছে, তাঁহাদের মোটর-বোটের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা এরানকুল্লমের বন্দরে প্রবেশ করিল (১৭ নভেম্বর)। কবি এখানে কলেজে বক্তৃতা করেন; বক্তৃতার টিকিট বিক্রীত হয়। সেই দিনই তাঁহারা Alwaye যাত্রা করেন। সেখানে প্রথমে স্বামী নারায়ণগুরুর অদ্বৈতাশ্রম দেখিতে যান। তৎপরেই তাঁহাকে Union Collegeএর একটি হস্টেল উন্মোচনের উৎসবের জন্য যাত্রা করিতে হয়। সেখানকার কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া সেই রাত্রেই তাঁহারা Alwaye ত্যাগ করিয়া তাতাপুরম যাত্রা করেন (১৮ নভেম্বর)। সেখানকার গুজরাতি বনিকসংঘ তাঁহার যথেষ্ট সংবর্ধনা করেন ও বিশ্বভারতীর জন্য কিছু টাকা দেন।

১৯ নভেম্বর কবি মাদ্রাজ ফিরিয়া আসিলেন। মাদ্রাজে United Womens' Collegeএ ২০ তারিখে একটি বক্তৃতা করা ছাড়া আর কোনো পাবলিক কর্মে তিনি যান নাই।

মাদ্রাজ ও সিংহলে কবি প্রচুর অভ্যর্থনা পাইয়াছিলেন, অর্থ প্রচুর পান নাই; পাইয়াছিলেন বক্তৃতার টিকিট বিক্রয়লব্ধ টাকা; এককালীন দান সামান্যই পান। মাদ্রাজে কবির বক্তৃতা ও মোলাকাতের রিপোর্ট যে একেবারে সমালোচিত হয় নাই, তাহা নহে। গান্ধীজির চরকা সম্বন্ধে কবির বিরুদ্ধ মতপোষণ লইয়া একদল গান্ধীভক্ত তাঁহাকে তীব্রভাবেই আক্রমণ করে (Swarajye, 6 December 1922)।

১ চিঠিপত্র ৫, ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্র ১১, ৩০ আশ্বিন ১৩২৯।

২৩ নভেম্বর (১৯২২) কবি মাদ্রাজ হইতে বোম্বাই আসিলেন; সপ্তাহখানেক সেখানে থাকেন। বোম্বাইতে পারসী সমাজ ধনে মানে উচ্চ স্থান অধিকার করে। কবি তাঁহাদের সমক্ষে Indo-Iranians সম্বন্ধে যে ভাষণ দান করেন তাহাতে কবির অন্তর্দৃষ্টি ও ব্যাপক অধ্যয়নের পরিচয় পাই।[১] বিশ্বভারতীতে পারসিক সংস্কৃতির কেন্দ্র স্থাপনের কথা এই সময় হইতে শুরু হয়; বোম্বাইতে ডি. জে. ইরানী কবির সকল কর্মে দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন।

ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে কবি আমেদাবাদ আসিলেন; সেখানে অম্বালাল সরাভাইদের বাটিতে অতিথি হন। ৪ ডিসেম্বর কবি মহাত্মাজির সবরমতী আশ্রম দেখিতে যান; ১৯২০ সালে এপ্রিল মাসে কবি সেখানে প্রথম গিয়াছিলেন। এবার মহাত্মাজি কারাগারে। কেবল গতবারের মধুর স্মৃতি পুনর্জাগরিত করিবার জন্য এবার আশ্রমে আসা। তখন সবরমতী নিখিল ভারত খাদি বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। কবি মহাত্মাজির অসহযোগ আন্দোলনের অভাবাত্মক দিকের সমালোচনা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার প্রতি কী গভীর শ্রদ্ধা যে ছিল তাহা ঐ দিনে প্রদত্ত ভাষণ পাঠ করিলে জানা যাইবে।

কবি বলেন, "মহাত্মাজি যখন দুই বৎসর পূর্বে এই আমেদাবাদে আপনাদের সহিত বাস করিতেছিলেন, তখন আমি একবার এই আশ্রমে আসিয়াছিলাম। তদবধি দিনের পর দিন ধরিয়া আমি এই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম যে, কবে আবার মহাত্মার পদরজঃপূত আশ্রম দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইব। এতদিনে আমার বাসনা চরিতার্থ হইয়াছে দেখিয়া আমি আপনাকে ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিতেছি। আজ মহাত্মাজি আপনাদের মধ্যে নাই, আপনারা তাঁহার অনুপস্থিতির অভাব বৃশ্চিকদংশনের মতো অনুভব করিতেছেন— ইহা জানি এবং তাহা জানি বলিয়াই আমি সংক্ষেপে দু'চার কথা বলিব।

"আপনারা সকলে এই আশ্রমে স্বার্থবলিদান করিয়া বাস করিতেছেন। আপনারা 'সত্য' কী তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। প্রবৃত্তিতে মানুষকে পশু করিয়া তোলে, নিবৃত্তিই দেবত্ব গঠনের সহায়ক, এই 'সত্য' আপনারা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন।

"ত্যাগ কাহাকে বলে? ত্যাগের অর্থ এই যে, মানুষের দেহটাই প্রকৃত জীবন নহে, আত্মাই প্রকৃত জীবন।

"পশুর সহিত এই যে পার্থিব জীবন আমরা যাপন করি, এই জড় জগতই কেবল জগত নহে, কিন্তু আমাদের মধ্যে ইহাপেক্ষা আরও উচ্চতর যে জীবন লুক্কায়িত আছে, সেই জীবনের জন্য আরও উচ্চতর জগতের প্রয়োজন। আমাদের এই লুক্কায়িত জীবন অবিনশ্বর— অমর অক্ষয় ও অব্যয়। যে ব্যক্তি এই জড় জগতের স্বার্থকে জয় করিতে পারিয়াছে কেবল সেই-ই সেই অমর জীবন উপভোগ করিতে পারে। প্রত্যেক মানুষকে 'দ্বিজ' হইতে হইবে, একবার দেহ লইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, আবার সত্যের আলোক লইয়া অমর জীবনের সন্ধান পাইয়া নূতন জন্ম লাভ করিতে হইবে। যাহারা আপনার মধ্যে অসীমকে উপভোগ করিতে পারে তাহারাই অমর হয়। মুরগীর ছানা যেমন ডিম ভাঙিয়া আলোক আনে, মানুষ তেমনি আলোক আনিতে পারে— যদি সে স্বার্থের ডিম্ব ভাঙিতে পারে,— মানুষ যতদিন হইতে বুঝিতে পারিয়াছে যে, এই জড় জগতই চরম জগত নহে, সেইদিন হইতেই মানুষ এই শৃঙ্খল ভাঙিয়া নূতন জগতের সন্ধানে ফিরিতেছে। পৃথিবীর সমস্ত ধর্মই এই অমর জগতে লোককে লইবার জন্য নানাভাবে আলোক প্রদর্শন করিতেছে। সকল ধর্মের উদ্দেশ্য কিন্তু অমর জগতের সন্ধান দেওয়া। সকল ধর্মই বলে ত্যাগের দ্বারা সেই অমর জগতে পৌঁছান যায়। ত্যাগ যদি সত্যসত্য অবলম্বন

১ The Visva-Bharati Quarterly, Vol. I. No. 3, 1925 October.

করা হয় তবে তাহা অমর জগতে মানুষকে লইয়া যায়। এই ত্যাগ অবলম্বন করিতে গেলে কঠোর তপস্যা চাই। এই আশ্রমে আপনারা সেই তপস্যায় নিমগ্ন আছেন। আপনারা নিশ্চয়ই অমৃতলোকের অধিকারী হইবেন।

"মহাত্মাজি আজ আপনাদের মধ্যে নাই, কিন্তু তাঁহার আত্মা আপনাদের মধ্যেই বিরাজ করিতেছে। মহাত্মাজি আত্মাকে বিশুদ্ধ করিতে বলিয়াছেন। এই আত্মশুদ্ধিতেই আপনাদের মুক্তি নিহিত। মহাত্মাজির বাণী শুধু আপনাদের মধ্যেই আবদ্ধ নাই; তাহা বিশ্বের সর্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে। অতএব মহাত্মাকে 'বিশ্বকর্মা' বলা যাইতে পারে। তিনিই অসীম, তাঁহার জ্যোতি আজ সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। প্রতি বিশ্বমানবের হৃদয়ে মহাত্মার জন্য রত্নসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে অসীমময়, সে অসীমকে পায়। উপনিষদের ইহাই বাণী। তাঁহাকে মনে ও বাক্যে জানিতে পারিলে বিশ্বকর্মাকে জানা হয়। জীবনটিকে বিশ্বের হিতের জন্য উৎসর্গ করিতে পারিলে সেই বিশ্ববন্ধুকে ধরা যায়। আপনাদের আশ্রমশিক্ষাও এই আলোকদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মা স্বয়ং ত্যাগ স্বীকার করিয়া এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ত্যাগের দ্বারাই সৃষ্টি হয়— কখনও ধ্বংস হয় না। আমরা সেই সত্যটুকু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে মহাত্মার হৃদয়ের সহিত আপন হৃদয় এক যোগসূত্রে বাঁধিতে পারিব এবং তখন প্রকৃত মহাত্মার কর্মের অংশী বলিয়া গণ্য হইব।"[১]

পশ্চিম ভারত, দক্ষিণ ভারত, সিংহল এবং পুনরায় পশ্চিম ভারত ভ্রমণে প্রায় তিন মাস কাটে (১৯২২ সেপ্টেম্বর ২০ ডিসেম্বর ৩য় সপ্তাহ)। এই সময়ের মধ্যে কতগুলি স্থানে কতগুলি বক্তৃতা দেন তাহা দেখাইবার জন্য আমরা পূর্বের এক তালিকা দিলাম। বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচার ও শান্তিনিকেতনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া না আনিলে বিশ্বভারতীর-জীবনযাত্রা অচল। কারণ তখনো রাজা মহারাজা নিজাম প্রভৃতির বাৎসরিক অর্থসাহায্য আসে নাই। এই অর্থ সংগ্রহ ব্যাপারে কৃতিত্ব ছিল এনড্রুজের; তিনি কবির সহিত বরাবর ছিলেন। কবি বোম্বাই ফিরিয়া আসিলে এনড্রুজ আবার উত্তর ভারতে চলিয়া যান— যেখানে বহু রাজনৈতিক জটিলতা সেখানে তাঁহার উপস্থিতির নিতান্ত প্রয়োজন।

বিশ্বভারতীর দ্বিতীয় বর্ষ

পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত এবং সিংহল সফর করিয়া রবীন্দ্রনাথ পৌষ-উৎসবের পূর্বে (১৩২৯) আশ্রমে ফিরিলেন। যথাবিধি পৌষ-উৎসবে উপাসনা করিলেন[২]। ৮ই পৌষ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসব, কলিকাতা হইতে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও অনেক প্রাক্তন ছাত্র-শিক্ষক আসিয়াছেন। সেইদিন প্রাক্তন ছাত্রদেরও মিলন উৎসব,[৩] রবীন্দ্রনাথ সভাপতি। খ্রীস্টজন্মোৎসবেও কবি মন্দিরে ভাষণ দান করেন।

পৌষ-উৎসবের কয়েকদিন পরে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন দেখিতে আসিলেন; এখানে তিনি শেষ আসেন পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে— তখন তিনি অখ্যাত যুবক, শান্তিনিকেতন অজ্ঞাত স্থান। আজ অবনীন্দ্রনাথ ভারত-

১ হিন্দুস্থান দৈনিক ১ জানুয়ারি ১৯২৩ হইতে অনূদিত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৪৪ শক (১৩২৯) মাঘ, পৃ. ২৬৩-৬৪, সাবরমতী আশ্রমে রবীন্দ্রনাথ।

২ ৭ই পৌষ মন্দির, শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩২৯ পৌষ, পৃ. ১৩৭-৪০।

৩ ৮ই পৌষ, শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩২৯ পৌষ, পৃ. ১৪১-৪৩।

খ্যাত এবং শান্তিনিকেতনও রবীন্দ্রনাথের নামের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হইয়া সভ্যজগতে সুপরিচিত। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পীশিষ্যদের মধ্যে নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার ও সুরেন্দ্রনাথ কর এখন বিশ্বভারতীর কলাভবনে নিযুক্ত। তাঁহার প্রেরণায় উদ্‌বোধিত বাংলার নব শিল্পচেতনা রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়ে কী রূপ লইতেছে— তাহা জানিবার ও বুঝিবার ঔৎসুক্য তাঁহার অধিক। তখন সন্তোষালয়ে (বর্তমান শিশুবিভাগ) কলাভবন ছিল, অবনীন্দ্রনাথ ঐ প্রতিষ্ঠানের অঙ্কুর-উদ্‌গমপর্বে আসিয়া দেখে গেলেন। অবনীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনা সভায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন যে তাঁহার তিরোভাবের পর অবনীন্দ্রনাথ যেন আচার্য হইয়া আসেন[১]। কবির মৃত্যুর পর অবনীন্দ্রনাথ সে-ভার গ্রহণ করেন।

অবীন্দ্রনাথ ফিরিয়া যাইবার কয়েকদিন পরে জানা গেল যে বাংলার তদানীন্তন গভর্নর লর্ড লীটন শান্তিনিকেতন দেখিতে ইচ্ছুক। সরকারী আদবকায়দা অনুসারে কবির তরফ হইতে গভর্নরকে নিমন্ত্রণ করিতে হয়। শান্তিনিকেতনে তখনো অসহযোগ আন্দোলনের ঘোর কাটে নাই। বিধুশেখর প্রমুখ কয়েকজন অধ্যাপক গভর্নরকে নিমন্ত্রণের বিরোধী; তাঁহারা কবিকে সরাসরি বলিয়া দিলেন যে তাঁহারা অভ্যর্থনা সভায় উপস্থিত হইবেন না। রবীন্দ্রনাথ কখনো কাহারও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে আঘাত করিতেন না— যাঁহারা কর্তব্যবুদ্ধি হইতে কবিকে সহায়তা করিতে চাহিলেন, তাঁহাদের সহায়তায় সম্মানার্হ অতিথিকে আম্রকুঞ্জে স্বাগত করিলেন। অতিথির প্রতি অসৌজন্য প্রকাশ কবির কৌলিক আভিজাত্য-আদর্শের বিরোধী।

আমাদের আলোচ্যপর্বে (১৯২২-২৩) বিশ্বভারতী নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। প্রথম বিদেশী অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি অগস্ট মাসে (১৯২২) আশ্রম ত্যাগ করিয়া যান। পূজার পর আসিলেন অধ্যাপক বিনটারনিৎস্ (M. Winternitz)। ইনি চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাহা-র (Prague) জারমান-বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও প্রাচ্যসংস্কৃতির অধ্যাপক। জারমানভাষায় লিখিত তিন খণ্ডে ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস (Geschite der Indischi Literatur) তাঁহাকে বিদ্বজ্জনসভায় অমরস্থান দিয়াছে। ইঁহার সঙ্গে আসেন চেক্‌জাতীয় অধ্যাপক লেস্‌নি (V. Lesney); লেস্‌নি প্রাহা-র চেক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক— বিনটারনিৎসের ছাত্র ও বন্ধু। ১৯২১ সালে কবি যখন মধ্যয়ুরোপ ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন ইঁহাদের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। সেই সময়ে স্টেলা ক্রামরিশ নামে এক তরুণী আর্ট-শাস্ত্রীর সঙ্গে কবির দেখা হয়। ইঁহার মনস্বিতা, নৃত্যশীলতা, আর্টসমঝৌতা কবিকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে; তিনি তাঁহাকে বিশ্বভারতীতে আহ্বান জানাইয়া আসেন; তিনি এইবার আসিয়াছেন। শ্লোমিও ফ্লাউম (S. Flaum) নামে এক ইহুদী মহিলা এই সময়ে আসিলেন; ইনি শিশু-শিক্ষা সম্বন্ধে পারদর্শী— আমেরিকার কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট, জারমান ইংরেজি ফরাসী হীব্রু ভাষায় অভিজ্ঞ। আশ্রমবিদ্যালয়ের শিশুবিভাগের কাজে তিনি সহায়তা করিতে লাগিলেন।

গত বৎসর সুইস-ফরাসী বেনোয়া (F. Benoit) আসিয়াছিলেন; এবার আসিলেন রুশদেশীয় পণ্ডিত বগ্‌দানফ (Bogdanov)। ইনি ফার্সিভাষা ও ইসলামীয় ইতিহাসে সুপণ্ডিত। রাশিয়ায় কম্যুনিষ্ট্ সরকার প্রবর্তিত হইলে বগ্‌দানফ দেশত্যাগ করিয়া পারস্যের পথ দিয়া ভারতে আসেন। আর-একজন অসাধারণ ভাষাতত্ত্ব-বিদ পণ্ডিত আসেন— তাঁহার নাম মার্ক কলিন্স। এইসব নবাগত ছাড়া পূর্ব হইতে ছিলেন এন্‌ড্রুজ, পিয়ার্সন ও এলমহার্স্ট। রে, স্ট্যানলি জোন্‌স কয়েক মাস শান্তিনিকেতনে থাকিয়া যান।

১ শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩২৯ মাঘ, পৃ. ১০।

কবি যখন দক্ষিণ-ভারত সফরে, সেই সময়ে প্যাট্রিক গেডিস্ শান্তিনিকেতন ঘুরিয়া যান। পাঠকের স্মরণ আছে ফ্রান্সে কবির সহিত এই মনীষীর সাক্ষাৎ হয়। তখন কবি তাঁহাকে ভারতে আসিলে একবার বোলপুর ঘুরিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। সেই সূত্রেই তিনি আসিয়াছিলেন। গেডিস্ শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন ও আশে-পাশের গ্রাম ঘুরিয়া কিভাবে স্বাস্থের উন্নতি ও সৌন্দর্য-বৃদ্ধি করা যায়, সে সম্বন্ধে বিস্তারিত পরিকল্পনা পেশ করেন।

শ্রীনিকেতনে এলমহার্স্ট ছিলেন— তাঁহার পল্লীসংস্কার কাজে সহায়তা করিতে থাকিলেন মিস্ গ্রেটচেন গ্রীন নামে এক আমেরিকান মহিলা। প্যাট্রিক গেডিসের পুত্র আর্থারও সেখানে থাকেন। ইনি ফরাসীভাষায় *Pays du Tagore* নামে শ্রীনিকেতনের গ্রামোদ্যোগের বহু তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া এক গ্রন্থ লিখিলেন।

উপরে উল্লিখিত অধ্যাপক ও কর্মীদের তালিকা হইতে পাঠক দেখিতে পাইতেছেন বিশ্বভারতীর কর্মতৎপরতা কত দিকে কত ভাবে বিকশিত হইতেছে। বিবিধ ভাষা, বিচিত্র বিষয় অধ্যাপনার কী আয়োজনই না হইল।

ফ্রান্স জারমেনি চীন হইতে বহু সহস্র গ্রন্থ, পত্রিকা আসিল; বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারে বই আর ধরে না; গ্রন্থাগার সম্প্রসারিত হইল। এইভাবে বিশ্বভারতীর বিচিত্র কার্য শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে নানাভাবে রূপ লইতেছে। রবীন্দ্রনাথ খুবই আশান্বিত— তাঁহার আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় স্বপ্ন হইতে বাস্তবে পরিণত হইতেছে।

কিন্তু বিশ্বভারতীর বিচিত্র কার্যের চাপে ও চাহিদায় কবির সাহিত্যসৃষ্টিতে একেবারে ভাঁটা। ১৯২৩ সালের মতো বন্ধ্যা বৎসর খুব কমই দেখা যায়। কবি তাঁহার বিশ্বভারতীকে 'খেলা' বলিয়া হাসিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু আজ তাঁহারই সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান তাঁহার সমস্ত মনোযোগকে এমন রূঢ়ভাবে আকর্ষণ করিতেছে। বিশ্বভারতীর অর্থচিন্তা ও দৈনন্দিন তুচ্ছকর্মের আবর্জনা মনকে এমনভাবে উত্তেজিত করিয়া রাখিয়াছে যে একমাত্র গান গাহিয়া মনকে হালকা করা ছাড়া মুক্তির স্বাদ আর কোনো ভাবেই খুঁজিয়া পাইতেছেন না।

অনেকগুলি গান জমিয়াছে; সেইগুলিকে এক-করিয়া 'বসন্তোৎসব' নাটিকা রচিলেন; ইহাই তাঁহার ঋতুনাট্যের প্রথম অর্ঘ্য। গানগুলির মধ্যে আছে প্রকৃতির বনভূমি, আম্রকুঞ্জ, করবী, বেণুবন, মাধবী, শালবীথি, বকুল, নদী, দখিণ হাওয়া, বনপথ ইত্যাদির কথা। ইহারাই পাত্রপাত্রী— বসন্তের নানা অঙ্গরূপের বাণীবাহক। শান্তিদেব লিখিতেছেন, "বর্ষামঙ্গলের আদর্শে বসন্তঋতুর নতুন এক ঝাঁক গান নিয়ে 'বসন্ত' নামে একটি সংগীত-আসর বসালেন কলকাতায়। এ-নাটকের বৈশিষ্ট্য রাজা ছিল। এই সময়ে রঙ্গমঞ্চে একটি রাজসভা সাজিয়ে রাজা যেন তাঁর রাজকার্যের নীরস জীবনের অবসরে ও নিভৃতে রাজকবিকে তাঁর দলবলের দ্বারা অনুষ্ঠিত বসন্তের গান শুনতে বসেছেন।· · গানগুলিকে সংগীতময় করে তোলাই ছিল কথার লক্ষ্য।· · দুই একটি গানে নাচ ছিল, কিন্তু সে-নাচ আজকালকার মতো· · না। শেষ গানটিতে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং গানের দলের সঙ্গে নাচে রঙ্গমঞ্চকে মাতিয়ে তুলে ছিলেন।"[১]

নাটিকার মধ্যে কথোপকথন হইতেছে রাজা ও তাঁহার বয়স্যবন্ধু কবির সাহিত্য, নাট্যবস্তুর 'অর্থ' আবিষ্কার-ইচ্ছুদের ব্যঙ্গ করিতেছেন রাজকবি— যেন অর্থ বুঝিবার চেষ্টাই সাহিত্যে উপহসনীয়। রাজার প্রশ্নের উত্তরে কবি বলিতেছেন,· · "বোঝাবার চেষ্টা করি নি· · বোঝা-না-বোঝার কোনো বালাই নেই, কেবল এতে সুর আছে।" 'উপদেশ'-এর উপর বিদ্রূপও আছে যথেষ্ট। 'ফাল্গুনী'র সময় হইতে ব্যাখ্যা করিবার তাগিদে তিনি বৈরাগ্যসাধন লিখিয়াছিলেন, অল্পকাল পূর্বে শারদোৎসবের ভূমিকা-নাটকেও সেই ব্যাখ্যানের চেষ্টা করিয়াছেন। বসন্তের

১ রবীন্দ্রসংগীত, ২য় সং, পৃ. ২৫০।

গানগুলির সঙ্গে কথোপকথন অনেকটা টানা-টীকা বা রানিং কমেন্ট্রির মতো লাগে— এগুলি বোঝাবার চেষ্টা ছাড়া আর কি বলিব!

বসন্ত[1] গীতিনাট্যখানি কবি উৎসর্গ করিলেন নজরুল ইসলামকে (২২ ফেব্রুয়ারি ১৯২৩)। এইখানে রবীন্দ্রনাথের সহিত এই বিদ্রোহীকবির পরিচয় কিভাবে ঘটে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

পাঠকের স্মরণ আছে গত ১৯২১ পূজাবকাশের পর অধ্যাপক শহীদুল্লা সাহেব ও নজরুল শান্তিনিকেতনে আসেন। অতঃপর গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান আসিলে এই নির্ভীক যুবক-কবি তাহাতে যোগদান করেন; তবে তাহা নৈষ্কর্ম অসহযোগ নহে— সাহিত্যের মধ্য দিয়া বিদ্রোহের বাণী প্রচার হইল তাহার কর্মরূপ। তিনি 'ধূমকেতু' নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে মনস্থ করিলেন। রবীন্দ্রনাথের কাছ হইতে একটি বাণী আনিবার জন্য বন্ধুবান্ধবদের সকলেরই ইচ্ছা— কিন্তু কীভাবে পাওয়া যায়— তাহাই লইয়া গবেষণা চলিল। অচিন্ত্যকুমার তাঁহার 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে (পৃ. ৪৬) লিখিতেছেন—

"নৃপেন বললে, এমন শুভকাজে দেবতার কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা করবেন না? তিনি কি চাইবেন মুখ তুলে? তবু নজরুল শেষ মুহূর্তে তাঁকে টেলিগ্রাম করে দিল। রবীন্দ্রনাথ কবে কাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন? তা ছাড়া এ নজরুল, যার কবিতায় পেয়েছেন তপ্ত প্রাণের নতুন সজীবতা। শুধু নামে আর টেলিগ্রামেই তিনি বুঝতে পারলেন 'ধূমকেতু'র মর্মকথা কি। যৌবনকে চিরজীবী আখ্যা দিয়ে বলাকায় তিনি আধ-মরাদের ঘা মেরে বাঁচাতে বলেছিলেন, সেটাতে রাজনীতি ছিল না; কিন্তু, এবার 'ধূমকেতু'কে তিনি যা লিখে পাঠালেন তা স্পষ্ট রাজনীতি, প্রত্যক্ষ গণজাগরণের সংকেত।"

আয় চলে আয় রে ধূমকেতু
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন।
অলক্ষণের তিলক-রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা
জাগিয়ে দে রে ডঙ্কা মেরে
আছে যারা অর্ধ-চেতন।

'ধূমকেতু' পত্রিকায় নজরুলের কতকগুলি কবিতা প্রকাশিত হয়— যাহা গবর্মেণ্ট রাজদ্রোহাত্মক বলিয়া মনে করিলেন, এবং তার ফলে নজরুলের জেল হইল।

'বসন্ত-উৎসবে'র দিন (২৫ ফেব্রুয়ারি) নজরুল প্রেসিডেন্সি জেলে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার উৎসর্গীত (২২ ফেব্রুয়ারি) বসন্তের একখণ্ড জেলের মধ্যে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পবিত্রকুমার

১ বসন্ত (গীতিনাট্য) ১৩২৯ ফাল্গুন। পরে ঋতুউৎসব অন্তর্গত পৃ. ১০১-২৭ রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫, পৃ. ৩৯-৩৮; গ্রন্থপরিচয় ৫৪২-৪৩। গীতিবিতান ১ম সংস্করণের ৬৫৫-৬৮। ২য় সংস্করণে প্রকৃতি অংশ ছাড়া প্রেম, পূজার মধ্যে দেওয়া আছে। স্বরবিতান ৬ খণ্ডে ২৩টি গানের স্বরলিপি আছে। বসন্তের সকল গান গীতবিতান ২য় সংস্করণে প্রকৃতির (বসন্ত) বর্গে আছে, পৃ. ৫১২-৫১৯। 'এখন আমার সময় হল' পূজাবর্গে পৃ. ২২৭ ও 'ভয় করব না রে বিদায়বেদনারে' প্রেমবর্গে, পৃ. ৩৪১। বসন্ত [উৎসর্গ : শ্রীমান কবি নজরুল ইসলাম স্নেহভাজনেষু, ১০ ফাল্গুন ১৩২৯] ১৩ ফাল্গুন ১৩২৯ (২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২৩) নাটিকা অ্যালফ্রেড থিয়েটারে অভিনীত হয়।

সাহিত্যিকদের খেয়ামাঝি— সকলকেই নিজ নিজ ঘাটে পৌঁছাইয়া দেন— অদ্ভুত চরিত্রের যুবক। তিনি 'বসন্ত' নাটিকাখণ্ড লইয়া প্রেসিডেন্সি জেলে গিয়া নজরুলের হস্তে উহা সমর্পণ করিলেন।

ইহার পর নজরুলকে হুগলি জেলে স্থানান্তরিত করা হয়— সেখানে তিনি অনশন ধর্মঘট করেন। রবীন্দ্রনাথ সেই সংবাদে উদ্বিগ্ন হইয়া টেলিগ্রাম করিলেন— Give up hunger-strike our literature claims you। টেলিগ্রাম কবি পাঠাইয়াছিলেন প্রেসিডেন্সি জেলের ঠিকানায়— টেলিগ্রাম ফিরিয়া আসিল Addressee not found।[১]

কয়েক বৎসর পরে নজরুল যখন 'লাঙল' নামে পত্রিকা বাহির করেন, তখনও রবীন্দ্রনাথ পত্রিকার প্রচ্ছদপটের জন্য এই দুইটি পংক্তি লিখিয়া দেন—

ধর হাল বলরাম আন তব মরু-ভাঙা হল
বল দাও ফল দাও স্তব্ধ হোক ব্যর্থ কোলাহল।

উত্তর ও পশ্চিম ভারতে

কলিকাতার অ্যালফ্রেড থিয়েটরে বসন্ত গীতিনাট্য অভিনয়ের তিন দিন পরে ২৮ ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথ বারাণসী (কাশী) যাত্রা করিলেন— এবার সঙ্গে আছেন ক্ষিতিমোহন সেন। কাশীতে প্রবাসী-বাঙালিদের প্রথম সাহিত্যসম্মেলন— রবীন্দ্রনাথ সভাপতি। অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ। কাশীতে কবি উঠিলেন অধ্যাপক ফণীভূষণ অধিকারীর বাসায়; ফণীভূষণ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক; ইহার কন্যা বালিকা রানুর (এখন লেডি রানু মুখার্জি) উদ্দেশ্যে 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' লিখিত।

প্রবাসী-বাঙালিদের এই প্রথম বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনে (৩-৪ মার্চ ১৯২৩) উত্তরভারতের নানা স্থান হইতে বহু শত বাঙালি আসিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্মেলন-আরম্ভে প্রথম ও সম্মেলন-শেষে দ্বিতীয় ভাষণ দান করেন। সম্মেলনে কবি যে ভাষণ[২] দেন তাহার মর্মার্থ এইরূপ—

মানুষের পরিচয় তখনই সম্পূর্ণ হয় যখন সে যথার্থভাবে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে। প্রকাশ [expression] হইতেছে নিজের সঙ্গে অন্য-সকলের সত্য সম্বন্ধে। ঐক্য একের মধ্যে নয়, অনেকের মধ্যে সম্বন্ধের ঐক্যই ঐক্য। সেই ঐক্যের ব্যাপ্তি ও সত্যতা লইয়াই, কি ব্যক্তিবিশেষের কি সমূহবিশেষের, যথার্থ পরিচয়। ভূ-বিবরণের অর্থগত যে-বাংলা তাহার মধ্যে কোনো ঐক্যকে পাওয়া যায় না। কেননা বাংলাদেশ কেবল মৃণ্ময় নয়, তা চিন্ময়ও বটে। কোনো সাধারণ ভূখণ্ডে জন্মলাভ নামক ব্যাপারের মধ্য দিয়াই কোনো মানুষের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় না।

তাই বাঙালি বাংলাদেশে জন্মিয়াছে বলিয়াই সে বাঙালি তা নয়, বাংলাভাষার ভিতর দিয়া মানুষের চিত্তলোকে যাতায়াতের বিশেষ অধিকার পাইয়াছে বলিয়াই সে বাঙালি। ভাষা আত্মীয়তার আধার। বাঙালি তাহার আনন্দময় সত্তাকে প্রকাশ করিবার একমাত্র ক্ষেত্র লাভ করিয়াছে বাংলাভাষার মধ্যে। স্ব-দেশের ভাষা

১ দ্র. কল্লোলযুগ, পৃ. ৫১।

২ শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ ১৩৩০ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ৫৯-৬৬ ও ৬৬-৬৯। দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩, 'সাহিত্যের পথে'র পরিশিষ্ট পৃ. ৪৬৭-৪৭৭।

একদিন ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করিয়া বিস্তারিত হইয়া পড়ে, তখন উহা স্ব-জাতির ভাষা হয়— কারণ স্বদেশের বাহিরে তখন তার প্রকাশ হয়। "ভাষা-বসুন্ধরাকে আশ্রয় করে যে-মানসদেশে তার চিত্ত বিরাজ করে সেই দেশ তার ভূসীমানার দ্বারা বাধাগ্রস্ত নয়, সেই দেশ তার স্ব-জাতির সৃষ্ট দেশ। আজ বাঙালি · · খণ্ডদেশকালের বাহিরে · · আপন চিত্তের অধিকারকে উপলব্ধি করছে।"

এই ভাষণে রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রভাষা বা নিখিল ভারতের এক ভাষা-সমস্যা সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছেন। "ভারতবর্ষে আজকাল পরস্পরের ভাবের আদানপ্রদানের ভাষা হয়েছে ইংরেজিভাষা। অন্য একটি ভাষাকেও ভারতব্যাপী মিলনের বাহন করবার প্রস্তাব হয়েছে। কিন্তু এতে করে যথার্থ সমন্বয় হতে পারে না; হয়তো একাকারত্ব হতে পারে, কিন্তু একত্র হতে পারে না। কারণ, এই একাকারত্ব কৃত্রিম ও অগভীর · · দড়ি দিয়ে বাঁধা মিলনের প্রয়াসমাত্র। · · সে মিলন শৃঙ্খলের মিলন অথবা শৃঙ্খলার মিলনমাত্র।" ইতিহাস হইতে ইমপীরিয়ালিস্ট নেশনদের নিজ ভাষা অন্যদের উপর চাপাইবার ব্যর্থপ্রচেষ্টার উদাহরণ দিয়া তিনি বলিলেন, "সাম্রাজ্যবন্ধনের দোহাই দিয়ে যে ঐক্যসাধনের চেষ্টা তা বিশেষ বিড়ম্বনা। · · বাহ্য সাম্যকে যারা চায় তারা ভাষা-বৈচিত্র্যের উপর স্টীম-রোলার চালিয়ে দিয়ে আপন রাজরথের পথ সমভূম করতে চায়। পাঁচটা বিভিন্ন ফুলকে কুটে দলা পাকালেই তাকে শতদল বলা যেতে পারে না।" রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে জবরদস্ত লোকেরা বলেন যে প্রয়োজন সাধনের জন্য বৈচিত্র্য লোপ করিয়া ঐক্য আনিতে হইবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতে "বাইরের যে-এক তা হচ্ছে প্রলয়, তাহা একাকারত্ব [Uniformity], আর অন্তরের যে-এক তা হল সৃষ্টি, তাই ঐক্য [unity]।"

কয়েক বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ভারতের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে এক পত্রে লিখিয়াছেন—

"গান্ধি মহাত্মা হিন্দিভাষা ভারতের সর্বত্র প্রচলনের জন্য নানা চেষ্টা বিস্তার করিয়াছেন; সে-চেষ্টা আজ জাগিয়া উঠে কাল ম্লান হইবার কোনো বাধা নাই। কিন্তু বাংলাভাষা ভারতের সকল প্রদেশের লোক আপনি শিখিতেছে— কেহ তাহাদিগকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করে নাই। যতদিন বাংলাদেশে প্রতিভাশালী লেখকের আবির্ভাব হইতে থাকিবে, ততদিন বাংলাভাষা আপনার আলোকে আপনি দশদিক উদ্‌ভাসিত করিবে।"[১]

বহু বৎসর পূর্বের পত্র ও ভাষণ হইলেও কবি যেন দেখিতে পাইয়াছিলেন যে ভারতে একদিন ভাষা সমস্যা আসিবে।

সম্মেলনের শেষ ভাষণে কবি যেসব কথার আলোচনা করেন, তাহার মধ্যে একটা কথা বিশেষভাবে ভাবিবার মতো। বাঙালি বাংলাদেশের বাহিরে যেসব দেশে গিয়া বাস করে, সেখানকার কোনো পরিচয় তাহারা পায় না, বা লয় না, সেটা যে জাতীয় চিত্তের অসাড়তার কত বড়ো নিদারুণ লক্ষণ তা কবি সেদিন স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া বলেন। "যে চিত্ত যথার্থ প্রাণবান তার ঔৎসুক্য চির-উদ্যমশীল। নির্জীব মনেরই দেখবার ইচ্ছা নেই, দেখবার শক্তি নেই। যা-কিছু তার থেকে পৃথক, সমবেদনার দুর্বলতাবশত তাকে সে অবজ্ঞা করে। এই অবজ্ঞা অজ্ঞতারই নামান্তর।

১ নিউইয়র্কের হোটেল আলগনকুইন হইতে ৭ পৌষ ১৩২৭ [১৯২০ ডিসেম্বর ২২] আগরতলার হেডমাস্টার ভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে [শিল্পী রমেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ সহোদর] পত্র। দ্র. আনন্দবাজার পত্রিকায় কবির স্বহস্ত লিখিত পত্র মুদ্রিত হয়।

১৯১৮ সালের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির হিন্দীভাষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে লেখেন (২৮ জানুয়ারি) ··· Hindi is the only possible national language for inter-provincial intercourse in India. But about its introduction at the Congress, I think, we cannot enforce it for long time to come ... Hindi will have to remain optional in our national proceedings until a new generation of politicians, fully alive to its importance, pave the way toward its general use by constant practice as a voluntary acceptance of a national obligation.

জানবার শক্তির অভাব এবং ভালোবাসবার শক্তির অভাব একসঙ্গেই ঘটে।... বাঙালির প্রধান রিপু হচ্ছে এই আত্মাভিমান, যে-জন্য নিরন্তর প্রশংসাবাদ না শুনতে পেলে সে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।... এই চাটুলোলুপ আত্মাভিমান সত্যের অপলাপ বলেই এতে যে মোহান্ধকার সৃষ্টি করে তাতে অন্যকে স্পষ্ট দেখতে দেয় না। এই অন্ধতা দ্বারা আমরা নিজেকে বঞ্চিত করি।" কবির মতে বাঙালির "মনের পায়ে অভিমান ও অশ্রদ্ধার বেড়ি পরানো। এই উপেক্ষার ভাবকে মন থেকে না তাড়াতে পারলে কাশীর মতো স্থানে সাহিত্য সম্বন্ধে বাঙালির প্রতিষ্ঠান নিরর্থক হবে।"

কাশীতে চারি দিন থাকিয়া (১-৪ মার্চ ১৯২৩) কবি লখনৌ গিয়া অতুলপ্রসাদ সেনের বাড়িতে দিন চার অতিবাহিত করেন। উত্তরভারতে গেলেই রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ নষ্ট করিতেন না। এই দুই কবিবন্ধুর মধ্যে একটা আত্মিক যোগ ছিল : অতুলপ্রসাদকে আমরা দুইবার শান্তিনিকেতনে দেখিয়াছি। কলিকাতায় আসিলে তিনি কবির সহিত সাক্ষাৎ না-করিয়া যাইতেন না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার যে কাব্যকে শেষ রচনা বলিয়া ভাবিয়াছিলেন—সেই 'পরিশেষ' কাব্য অতুলপ্রসাদকে উৎসর্গ করেন (১৯৩২)। এই গ্রন্থের সংযোজনী অংশের শেষ কবিতা অতুলপ্রসাদের উদ্দেশ্যে রচিত— তখন তিনি বিদেহী হইয়াছেন।

লখনৌ-এ চারিদিন থাকিয়া কবি ১০ মার্চ বোম্বাই রওনা হইলেন। সেখানে জাহাঙ্গীর পেটিটের গৃহে একদিন বিশ্রাম করিয়া আহমদাবাদ আসিলেন। সেখানে তাঁহার পুরাতন বন্ধু অতিথিবৎসল অম্বালাল সরাভাইদের গৃহে উঠিলেন। সেখানে দিন চারি থাকিয়া কবি সিন্ধুদেশ যাত্রা করিলেন। সিন্ধুদেশ তখন বোম্বাই প্রেসিডেন্সির বিভাগ। কবি করাচি পৌঁছলেন ১৯ মার্চ।

করাচিতে থাকিবার ব্যবস্থা হয় জমশেদ মেতার বাটিতে। প্রথম দিনেই বার্নস উদ্যানে বিরাট জনসভায় কবি-সম্বর্ধনা হইল। পরদিন করাচি মুন্সিপালিটি কর্তৃক কবি সম্বর্ধিত হইলেন। ২১ মার্চ স্থানীয় থিওজফিক্যাল হলে কবি বিশ্বভারতী সম্বন্ধে এক ভাষণ দান করিলেন। এ ছাড়াও যেসব অনুষ্ঠানে কবিকে আপ্যায়ন করা হয়, তাহার মধ্যে সিন্ধী নারী-মজলিসে কবি-সম্বর্ধনা উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমভারতের মধ্যে সিন্ধুদেশ ছিল ধনীদেশ : দেশ-বিদেশে তাহারা যাওয়া আসা করিত বলিয়া তাহাদের মধ্যে ইংরেজিয়ানা ও বিদেশীপনার বাড়াবাড়ি ছিল বেশি। রবীন্দ্রনাথ সেটি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাই নারীদের উদ্দেশে বলিলেন, "পরের অনুকরণ, স্বার্থান্ধ পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ প্রতিদিন আমাদের দুর্বল করবে। তাদের সভ্যতার সুরাপান করে কেমন মত্ত হয়েছি, তা দেখলে ভবিষ্যতের জন্য নিরাশা ও অবসাদ আসে। জানি এই দুর্গতি আসবে ও যাবে। তোমরা যদি তোমাদের তপস্যার জ্যোতি দাও, তোমাদের শ্রদ্ধার জীবন দাও, প্রাচ্যের আত্মাও জাগ্রত হবে।"[১]

করাচির বাহিরে হায়দরাবাদ হইতেছে সিন্ধী-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ; এখানে কবি চারি দিন ছিলেন (২৫-২৮ মার্চ)। অতঃপর করাচি ফিরিয়া স্টীমার যোগে কাঠিয়াবাড়ের পোরবন্দর যাত্রা করিলেন।[২] কবির ভ্রমণ-সঙ্গী ক্ষিতিমোহন সেন তাঁহার সহিত আছেন।

পোরবন্দরের মহারাজা বা রাণাসাহেব কবির যথোচিত সমাদর করিলেন। পোরবন্দরের প্রাচীন নাম সুদামা-পুরী। রবীন্দ্রনাথ সুদামাপুরীবাসীদের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দিয়াছিলেন।[৩] এখানে এবার কবির জন্য স্থানীয়

১ শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩৩০ বৈশাখ, পৃ. ৪৯।
২ ২৯ মার্চ গান লিখিলেন 'পাখি বলে, চাঁপা, আমারে কও'। গীতিমালিকা ১ ; গীতবিতান, পৃ. ৫৮৫।
৩ শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩৩০, পৃ. ৮৮-৮৯।

লোকসংগীত ও লোকনৃত্য প্রদর্শনীর বিশেষ ব্যবস্থা হয়। কবির ইচ্ছা এই লোকনৃত্য শান্তিনিকেতনের মেয়েরা দেখে ও শেখে। সেইজন্য তিনি একটি গুজরাটি চাষী-পরিবারকে তাঁহার সঙ্গে আনেন। কবি বোম্বাই হইয়া ১০ এপ্রিল বোলপুর পৌঁছাইলেন।

শান্তিনিকেতনে ফিরিবার কয়েকদিন পরে আম্রকুঞ্জে গুজরাটি মেয়েটির নাচের আসর বসে; দুই হাতে দুই জোড়া মন্দিরা লইয়া তাহার সাবলীল নৃত্য সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের লেখনী হইতে বাহির হইল এই গানটি 'দুই হাতে কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে'।[১] পশ্চিমভারত ভ্রমণান্তে শান্তিনিকেতনে আসিয়া যথারীতি বর্ষশেষ (১৩২৯) ও নববর্ষ[২] (১৩৩০) উৎসব উদ্‌যাপন করিলেন।

নববর্ষের উপাসনার পর সেই প্রাতে 'রতনকুঠি'র ভিত্তি স্থাপিত হইল (১৪ এপ্রিল ১৯২৩)। বোম্বাই-এর পার্সি দানপতি স্যার্ রতন টাটা বিশ্বভারতীর বিদেশী অধ্যাপকগণের বাসের জন্য পঁচিশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন; সেইজন্য তাঁহারই নাম অনুসারে গৃহটির নামকরণ করা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞানের পার্সি অধ্যাপক ডক্টর তারাপুরবলা এই গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন। সেইদিন প্রাতে নববর্ষের ভাষণে রবীন্দ্রনাথ দানপতি রতন টাটার শর্তহীন দানের মাহাত্ম্য-কথার উল্লেখ করিয়াছিলেন; "স্বজাতির নামে মানুষ আত্মত্যাগ করচে এমন একটা আহ্বান কয়েক শতাব্দী ধরে পৃথিবীতে খুব প্রবল হয়ে উঠেছিল।‥যে ধর্মবিধি সর্বজনীন, তাকেও স্বজাতির বেদীর কাছে অপমানিত করা মানুষ ধর্মেরই অঙ্গ মনে করেচে।"

জরথুষ্ট্রীয় সংস্কৃতি বা পার্সিধর্ম ও আবেস্তাদির চর্চার সংবাদ পাইয়া এন্‌ড্রুজ এই সময়ে কবিকে যে-একখানি পত্র লেখেন, তাহা তাঁহার মনস্বিতা ও বিশ্বভারতীর মর্মগত কথা যে তিনি কী গভীরভাবে বুঝিয়াছিলেন— তাহারই প্রকাশ।[৩] তিনি লিখিতেছেন—

"With regard to the building of a Zoroastrian Institute I am perfectly happy in my mind— just as I should welcome with all my heart an Islamic Institute. But I feel that our simple central place of worship with its white pavement and its absence of all imagery and symbol [Santiniketan mandir] — except the pure white flowers the children bring at the time of religious service-- is the best expression both of common worship of the One Supreme. Each of us may add what colour he likes to the pure whiteness. But if we build our separate mosques and chapels and fire-temples we stand in danger of repeating over again the religious divisions of the world."— Sykes, p. 164।

১ শান্তিদেব ঘোষ, রবীন্দ্রসংগীত, পৃ. ২২২। বর্ষশেষ (১৩২৯) দিনে গানটি লিখিত হয়।

২ নববর্ষে মন্দিরের উপদেশ (১ বৈশাখ ১৩৩০)। শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩৩০ ভাদ্র, পৃ. ১১৯-১২১।

৩ এই অদ্ভুত মানুষটি কবিকে এবারও সময়মত সতর্ক বাণী লিখিয়াছিলেন; বিশ্বভারতীর আন্তরিক অভিপ্রায় সম্বন্ধে এন্‌ড্রুজের মনে কোনো অস্পষ্টতা ছিল না। বিশ্বভারতীর আদর্শ বিশ্বমানবতা— সেইজন্য শান্তিনিকেতনে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের মন্দির, মসজিদ, চার্চ, গুরুদ্বার, অগ্নিপূজাকুণ্ড প্রভৃতির স্থান হইতে পারে না। নিরাকার ঈশ্বর ভজনার জন্য যে মন্দির আছে তাহাই যথেষ্ট বলিয়া তিনি মনে করিতেন। তেমনই ভারতীয়দের জাতীয় আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এমন কোনো রূপ অনুষ্ঠান সম্পাদনেরও বিরোধী ছিলেন। আশ্চর্য হইয়া ভাবি ইংলন্‌ডের নিষ্ঠাবান অ্যাংলিকান পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া, ভারতে দীক্ষিত পাদরীর কাজ করিয়া তাঁহার জীবনের ও মতের কী পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে; অথচ তিনি নৈষ্ঠিক খ্রীষ্টান ছিলেন। ভারতের দুই তপস্বী রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার জীবনের এমন পরিবর্তন ঘটে। ইনি ছিলেন উভয়ের মধ্যে সেতুস্বরূপ।

শান্তিনিকেতনে এখন বিচিত্র কর্মসাধনা চলিতেছে। কিছুকাল হইল নারীবিভাগ খোলা হইয়াছে। শ্রীযুক্তা স্নেহলতা সেন পরিচালিকা; স্ত্রীসদনের বিশাল বাটি তখন নির্মিত হয় নাই। ১৯২২ সালে দ্বারিক,[১] নেবুকুঞ্জ[২] ও নূতন বাড়িতে মেয়েরা থাকে।

এই সময়ে আশ্রমের বালিকাদিগকে সংঘবদ্ধভাবে সেবা ও সর্ববিধ কার্যে ব্রতী করিবার জন্য শ্রীযুক্তা সেন ও শ্রীনিকেতনের মিস্ গ্রীন 'গার্ল-গাইড'[৩] নামে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কলিকাতা শাখার অন্যতম পরিচালিকা শ্রীমতী মুলে (Moule)-কে আহ্বান করিয়া আনেন। কবির এ বিষয়ে খুবই উৎসাহ; মেয়েরা স্বাস্থ্যবতী হয়, সংঘবদ্ধ হইয়া সমাজের সেবায় প্রবৃত্ত হয়— ইহা তাঁহার অন্তরের ইচ্ছা। তিনি স্থানীয় গার্ল-গাইডের নামকরণ করিলেন— 'গৃহদীপ' পরে বদলাইয়া 'সহায়িকা' করেন। এই সহায়িকাদের জন্য একটি গানও তৈয়ারী করিয়া দেন (১৭ এপ্রিল ১৯২৩)— 'অগ্নিশিখা, এসো এসো'।[৪]

'সহায়িকা' নামে যে-প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয়, গার্ল-গাইডের সহিত তাহার সম্বন্ধ রক্ষা করা সম্ভব হইল না; তাহার কারণ আছে। বয়স্কাউট ও গার্ল-গাইডএর নিয়মানুসারে সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রভৃতি কয়েকটি oath (দিব্য) গ্রহণ করা আবশ্যিক। এন্‌ড্রুজ এই সংবাদ পাইয়া কবিকে প্রতিবাদ করিয়া পত্র দেন; তখন কবি বুঝিতে পারিলেন যে ইহা কী অনিষ্টের কারণ হইতে পারে। তিনি এন্‌ড্রুজকে লিখিলেন—

"You are perfectly right in not pressing the girls to take the oath of loyalty. The idea...is repugnant to me. It is barbarous—very similar to medicineman's prescription of magical formula... I can never encourage an importation of such a system of blasphamous hypocrisy in our country for the sake of any benefit that may come to us from source whatever!"[৫]

১ দ্বারিক— দেহলির নিকট পিয়ার্সন নির্মিত গৃহ। সে গৃহ এখন নাই।

২ নেবুকুঞ্জ— দ্বারিকের নিকট মাবা দেবীর জন্য নির্মিত গৃহ। এখন প্রায় নিশ্চিহ্ন।

৩ *Girl Guide Association*: An organisation founded by the Late Lord Baden-Powell as a sister movement to the Boy Scouts and incorporated by Royal Charter in 1915. Imperial Hd. Qr. 17-19 Buckingham Palace Road, London.

৪ এই পর্বের গান— ১০ ফাল্গুন 'বসন্ত' প্রকাশিত হয়। তারপর ১৫ ফাল্গুন কাশী যাত্রা করেন; প্রত্যাবর্তন করেন ২৬ চৈত্র ১৩২৯।

কাশীতে রচিত গান— ১৯-২০ ফাল্গুন, নাই বা এলে যদি সময় নাই, গীতবিতান, পৃ. ৩৩১।

লখনৌ, বোম্বাই ও আমেদাবাদে রচিত— ২৬ ফাল্গুন, যুগে যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিল সে, গীতবিতান, পৃ. ৩৭৩। ২৯ ফাল্গুন, তোমায় গান শোনাব, গীতবিতান, পৃ. ১৭১। ২৯ ফাল্গুন ঐ হাটের ধুলা সয় না যে আর, গীতবিতান, পৃ. ৫৫২।

সিন্ধু দেশে রচিত — ২ চৈত্র, পাখি বলে, 'চাঁপা, আমারে কও', গীতবিতান, পৃ. ৫৮৫। ২৩ চৈত্র, তোমার বাণায় গান ছিল, গীতবিতান, পৃ. ৩৬৮।

শান্তিনিকেতনে— ৩০ চৈত্র, কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে, গীতবিতান, পৃ. ৫৪৫। ৪ বৈশাখ ১৩৩০, অগ্নিশিখা, এসো এসো, গীতবিতান, পৃ. ৬১৩। ৫ বৈশাখ, আয় রে মোরা ফসল কাটি, গীতবিতান, পৃ. ৬১৩।

৫ On taking oath of loyalty; Letter written to C. F. Andrews, Modern Review 1929 December।

শিলঙে ও পরে

১৩৩১ সালে গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বিদ্যালয় বন্ধ হইবার পূর্বে কবি বিশ্রামের জন্য শিলঙ যাত্রা করিলেন (২৬ এপ্রিল ১৯২৩)। শিলঙে 'জিতভূম' নামে বাড়িতে ছিলেন। কবির দিন যায় গান রচনায়, পড়াশুনায়— কবিতা চোখে পড়ে কম ; তবে দুইটি মেয়ের[১] অনুরোধের উত্তরে ৯ মে 'শিলঙের চিঠি' কবিতা লিখিতে হয়।

ছন্দে-লেখা একটি চিঠি চেয়েছিলে মোর কাছে—
ভাবছি বসে, এই কলমের আর কি তেমন জোর আছে।
তরুণ বেলায় ছিল আমার পদ্য লেখার বদ অভ্যাস ;
মনে ছিল, হই বুঝি বা বাল্মীকি কি বেদব্যাস ; · ·
এখন শুধু গদ্য লিখি, তাও আবার কদাচিৎ,
আসল ভালো লাগে খাটে থাকতে পড়ে সদা চিৎ। —পূরবী।

এই কবিতার একটি পদ হইতে জানিতে পারি কবি একখানি নাটক লিখিতেছেন—

জানলা দিয়ে বৃষ্টিতে গা ভেজে যদি ভিজুক তো,
ভুলেই গেলাম লিখতে নাটক আছি আমি নিযুক্ত।

কবিতাটি লেখেন ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ (৯ জুন) ; তখন কবি 'যক্ষপুরী', পরে যার নাম হয় 'রক্তকরবী', লিখিতেছেন। এই নাটকটির মধ্যে শিল্পযুগের যন্ত্রীয়তার যে চিত্র ফুটিয়াছে, তাহার আভাস ইতিপূর্বে 'মুক্তধারা'র মধ্যে পাই। যক্ষপুরী রক্তকরবী নামে যখন প্রকাশিত হইবে, তখন আমরা এই নাটকের বিষয়বস্তু লইয়া আলোচনা করিব।

শিলঙে এই সময়ে অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় আছেন— কবির সহিত তাঁহার দেখা-সাক্ষাৎ হয় প্রায়ই। রাধাকমল অল্পকাল পূর্বে বোম্বাই-এর শিল্পকেন্দ্রের শ্রমিকদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছিলেন— সেইসব কথা তিনি কবির কাছে গল্পচ্ছলে বলেন। রাধাকমল লেখককে বলিয়াছেন যে কবি খুব মনোযোগ দিয়া তাঁহার কথাগুলি শুনিতেন ; তখন কি তিনি জানিতেন যে কবির মনে একটি নাটকের প্লট জুটিতেছে।[২] ১১ মে অমিয় চক্রবর্তীকে এক পত্রে লিখিতেছেন, "একটা নাটকগোচের একটা-কিছু লেখবার ইচ্ছা আছে।"[৩] প্রায় একমাস পরে দেখি কবি 'লিখতে নাটক · · নিযুক্ত'।

প্রায় মাস দুই শিলঙে কাটাইয়া আষাঢ়ের গোড়ায় (১৩৩০) বা জুন মাসের মাঝামাঝি কবি কলিকাতায় ফিরিলেন। ২৩ জুন নৈহাটিতে চতুর্দশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন আহূত হইয়াছে— বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থানে (২৭ জুন জন্মদিন)। সভাপতি বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চাঁদ মহতাব। সেইদিন অপরাহ্ণে তরুণ অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়ের সঙ্গে কবি মোটরযোগে নৈহাটি গেলেন। সমসাময়িক 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখিতেছেন, "রবীন্দ্রনাথ

১ বালিকা দুইটির মধ্যে একটির নাম শোভনা দেবী (বয়স ১৩) : পিতা গোপেন্দ্রনারায়ণ বাগচী ; গোপেন্দ্রনারায়ণ কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচীর কনিষ্ঠ ও কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর খুল্লতাত পুত্র। অমিয় চক্রবর্তীর মাসতুতো বোন। দ্বিতীয় বালিকা নলিনী দেবী ; স্বর্গীয় অধ্যাপক নিখিলনাথ মৈত্রের কন্যা ও অমিয় চক্রবর্তীর মামাতো বোন।

২ লখনৌতে ২৫ অক্টোবর ১৯৪৮ লেখককে অধ্যাপক রাধাকমল এই তথ্যগুলি বলেন।

৩ কবিতা, ৯ম বর্ষ ১৩৫০ চৈত্র, পৃ. ১৮৭। অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত পত্রাবলী, পত্রগুচ্ছ ৩০। Jitbhum, Shillong, Assam ২৮ বৈশাখ ১৩৩০।

সভাস্থলে পদার্পণ করিলে তাঁহাকে সমুচিত অভ্যর্থনা করা হয়। সভাপতির বিশেষ অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ অতি মনোহর কবিত্বপূর্ণ ভাষায় নবযুগের সাহিত্য ও বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলেন।··নৈহাটি পল্লীগ্রাম হইলেও স্থানীয় অধিবাসীরা সাহিত্যিকদের অভ্যর্থনার বিপুল আয়োজন করিয়াছিল।"[১]

কয়েকদিন পরে ১৩ আষাঢ় ভবানীপুরে কলিকাতা সাহিত্য-সম্মিলনীর অধিবেশন[২] হয়। রবীন্দ্রনাথ সভাপতি। প্রধান বক্তা বিপিনচন্দ্র পাল। সেদিন বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মদিন—সুতরাং ভাষণের বিষয় ছিল বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলাসাহিত্য। বিপিনচন্দ্র বাংলাসাহিত্যে তিনটি যুগের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে প্রথমযুগের নাম দেওয়া যায় ব্রাহ্মযুগ। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভাষণে বলেন যে, সাহিত্যক্ষেত্রে একটি বিশেষ যুগকে বিশেষ সম্প্রদায়ের যুগ বলায় তাঁহার আপত্তি আছে। গদ্যসাহিত্যের প্রথমযুগের লেখকগণের দৃষ্টি গিয়াছিল মনের মুক্তির দিকে। কবি বলেন, আমাদের দেশে সকলের চেয়ে বড়ো বন্ধন সেই ধর্ম যাহা প্রধানত আচারমূলক। বাহ্য আচারের জড় অভ্যাসে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি নিশ্চল ও অন্ধসংস্কারে দূষিত হইয়াছিল। এক অন্ধ তামসলোক হইতে মুক্তিলাভের ঔৎসুক্য ধর্মসংস্কারের প্রয়াসরূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিল। বস্তুত তখনকার সাহিত্য বিশেষ সম্প্রদায়ের সাহিত্য নহে, সাধারণ লোকের জ্ঞানোন্মেষের জন্য পাঠ্যপুস্তকের সাহিত্য। পাশ্চাত্যবিদ্যা যাহা ইংরেজিভাষার মধ্যে আবদ্ধ, এবং ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ যাহা সংস্কৃতের মধ্যে অবরুদ্ধ—উভয়কেই দিতে হইয়াছিল বাংলার মাধ্যমে। এই স্বজাতির প্রতি নিষ্ঠাকে ব্রাহ্ম সাম্প্রদায়িকতা বলা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভাষণে বিপিনচন্দ্রের আরেকটি কথার আলোচনা করেন। বিপিনচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের একটা message ছিল—সেটি স্বদেশপ্রীতি। রবীন্দ্রনাথ ঠিক এই কথারই প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, বিশেষ কোনো গ্রন্থের মেসেজ্ ভুলও হইতে পারে, সত্যও হইতে পারে। এই লইয়া তর্ক হইতে পারে। কিন্তু সাহিত্যে যে আনন্দরূপের সৃষ্টি হয়, তা ভুল মেসেজ্ লইয়াও হইতে পারে। কবি বলেন, "আমি বঙ্কিমের কাছে কৃতজ্ঞ যেখানে তিনি মেসেজ্ দেন নি, সেখানে উনি সৃষ্টি করবার আনন্দকে রূপ দান করেছেন আনন্দময় সাহিত্য ভাষাকে প্রাণময় জগত ক'রে তোলে, মেসেজের সে শক্তি নেই। এইজন্য সাহিত্যসংসারে আমরা তাঁদেরই নমস্কার করি যাঁরা তাঁদের প্রতিভা থেকে সাহিত্যের ভিতর প্রাণের চিরন্তন সুর ঢেলে দিয়ে থাকেন। তাঁদের সঙ্গে আমাদের সাম্প্রদায়িক দিকে মনের মিল না থাকতে পারে, তাঁদের উপরে সামাজিক অসামাজিক নানা কারণে রাগও হতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বলব তাঁরা আমাদের মস্ত দান করেছেন—যা দিলেন এ আর কেউ দিতে পারত না।"[৩]

কলিকাতা হইতে শান্তিনিকেতন ফিরিলেন[৪] বটে, কিন্তু মন টানিতেছে কলিকাতা। গত দুই বৎসর বিশ্বভারতীর

১ আনন্দবাজার পত্রিকা, অতীতের পৃষ্ঠা থেকে ২১ জুন ও ২৫ জুন ১৯৬০ তারিখের কাগজ দ্রষ্টব্য। রবীন্দ্রজীবনী ৪, সংযোজন পৃ. ৩০৪।

২ ২৮ জুন ১৯২৩ হইতে আনন্দবাজার পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি: সাহিত্যসম্মিলনী (কালীঘাট)। অদ্য বৃহস্পতিবার ১৩ আষাঢ় ১৩৩০, ৬॥০ ঘটিকার সময় দ্বারকানাথ স্কোয়ারের পূর্বদিকে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে সম্মিলনীর দ্বিতীয় 'পূর্ণিমা-মিলন' হইবে। সাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়। সভাপতি— শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বক্তা— শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল। বিষয়— বাংলার নবযুগে বঙ্কিম-সাহিত্য।

৩ কবির ভাষণ শ্রুত লিখিত হয়। নব্যভারত, ১৩৩০ ভাদ্র। দ্র. শান্তিনিকেতন পত্রিকা ৪র্থ বর্ষ, পৃ. ১৫৮।

৪ এই সময়ে পিয়ার্সন বিলাতে; তিনি সেখান হইতে কবিকে এক পত্রে Institutional religion সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জানিতে চাহেন। শান্তিনিকেতন হইতে ৪ঠা জুলাই ১৯২৩ তিনি পিয়ার্সনকে লিখিতেছেন—"An institution which brings together individuals, who are profoundly true and sincere in their common aspirations, is a great help to all its

ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা 'বর্ষামঙ্গল' উৎসব নিষ্পন্ন করিয়া কিছু অর্থের আগম হইয়াছিল। এবার ভাবিতেছেন বিসর্জন নাটক অভিনয় করিয়া টাকা তুলিবেন। এখানে একটি কথা পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার। সংগীতের জলসা বা নাটক অভিনয়— যাহাই কেন করা হউক— তাহার আপাত উদ্দেশ্য টিকিট বিক্রয় করিয়া বিশ্বভারতীর জন্য অর্থসংগ্রহ ; কিন্তু ইহাই সবটা নয়। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে আর্টিস্ট সত্তা আছে— তাহা আপনাকে দেখিতে চায় : রিহার্সালের মধ্যে তাঁহার আনন্দ, অভিনয় করিতে ও করাইতে তাঁহার আনন্দ, পাবলিকের সমক্ষে 'সুন্দরে'র পরিবেশন করিয়া তাঁহার আনন্দ। সেইজন্য আরও বৃদ্ধবয়সেও যে দল লইয়া বাহির হইতেন, তাহা কেবলমাত্র অর্থের সন্ধান বলিলে রবীন্দ্রনাথের প্রতি অবিচার করা হইবে।

শান্তিনিকেতন হইতে কবি জুলাইমাসের কোনো সময়ে কলিকাতায় আসিলেন— বিশ্বভারতী-সংক্রান্ত কয়েকটি গুরুতর কার্য আছে। পাঠকের স্মরণ আছে ১৯২১ সালের ২৩ ডিসেম্বর বিশ্বভারতীকে আনুষ্ঠানিকভাবে সর্বসাধারণের হস্তে উৎসর্গীত হইলেও তাহা আইনসিদ্ধ তখনই হয় নাই। এইজন্য ১৯২২ সালের ১৬ মে বিশ্বভারতীকে রেজিস্টার্ড সোসাইটি (১৮৬০ সালের ২১ আইন অনুসারে) রূপে গঠন করা হয়। এইবার কলিকাতায় আসিয়া কবিকে আরও দুইটি দলীল সম্পন্ন করিতে হইল। এই দলীলগুলি ১৯২৩ সালের ২৬ সালের জুলাই তারিখে রেজিস্টার্ড হয়। প্রথম দলীল দ্বারা কবি তাঁহার বাংলায় রচিত সমস্ত গ্রন্থাদির (১৯২৩ পর্যন্ত) স্বত্ব বিশ্বভারতীকে দান করেন। অবশ্য এতকাল রবীন্দ্রনাথের বাংলা গ্রন্থের রয়ালটি শান্তিনেকেতন বিদ্যালয়ই ভোগ করিয়া আসিতেছিল। এইবার তাহা আইনসিদ্ধ হইল। বাংলা রচনা (১৯২৩ পর্যন্ত) ব্যতীত কবির রচিত ইংরেজি পুস্তকাদি, তাঁহার গ্রন্থের অনুবাদ, ফিলম ও অভিনয় করণের অধিকার বর্তায় রথীন্দ্রনাথের উপর।

দ্বিতীয় দলীলে বিশ্বভারতীর জন্য একটি ট্রাস্টি সভা গঠিত হয়— ট্রাস্টি হল রবীন্দ্রনাথ, ডাক্তার নীলরতন সরকার ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। বিশ্বভারতীর যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির ভার অর্পিত হয় এই ট্রাস্টির উপর।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ১৮৮৮ অব্দের ৮ মার্চ (১২৯৪ সাল ২৬ ফাল্গুন) শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট সম্পাদন করিয়া ২০ বিঘা জমি ও তদুপরি বাড়ি মন্দির বাগান পাবলিকে দান করিয়াছিলেন ; ইহার বাহিরে রবীন্দ্রনাথ প্রচুর জমি খরিদ করেন।

১৯০১ সালে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপিত হইবার পর এই পুরাতন ট্রাস্ট জমির মধ্যে অনেক ঘরবাড়ি নির্মিত হয় এবং ট্রাস্টের যাবতীয় আয় আংশিকভাবে বিদ্যালয়ই এতকাল ভোগ করিতেছে। ১৯২৩ সালে বিশ্বভারতীর জন্য যে নূতন ট্রাস্টি হইল, আইনত তাহাদের কোনো এক্তিয়ার শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের উপর থাকিতে পারে না। কিন্তু কার্যত কালে শান্তিনিকেতনের ট্রাস্টের যাবতীয় আয় ও ব্যয় বিশ্বভারতীর পরিষদ, সংসদ, কর্মসমিতির হস্তে আসিয়া যায়। বিশ্বভারতীর নূতন ট্রাস্টিরা বা বিশ্বভারতী-সংসদ মহর্ষির ট্রাস্টের শর্তাদি যথাযথভাবে পালন করিয়াছিলেন কিনা, তাহা রবীন্দ্রজীবনীর আলোচ্য বিষয় বোধ হয় নহে। তবে এ লইয়া যে মতান্তর ও মনান্তর হয় নাই তাহা বলা যায় না ; বিধুশেখর ভট্টাচার্যের আশ্রম ত্যাগের নানা কারণের মধ্যে ইহাও একটি ; অবশ্য রবীন্দ্রনাথ তখন জীবিতই ছিলেন।

members But if, by its very constitution, it offers accommodation to those who merely have uniformity of habits and not unity of true faith it necssarily becomes a breeding place of hypocrisy and untruth."— *Letter to a Friend*, Appendix II p. 193।

রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাদির প্রকাশক ছিলেন এলাহাবাদের ইণ্ডিয়া প্রেসের সত্বাধিকারী চিন্তামণি ঘোষ[১]। আমার মনে হয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মাধ্যমে কবির গ্রন্থপ্রকাশনের ভার চিন্তামণি গ্রহণ করেন বোধ হয় ১৯০৮ সালে। ১৯২৩ পর্যন্ত মুদ্রিত কবির মজুত বই-এর মূল্য নির্ধারিত হয় ৭৮,০০০৲ টাকা; চিন্তামণিবাবু ২৬,০০০৲ টাকায় সমস্ত বই (শিশু ভোলানাথ পর্যন্ত) বিশ্বভারতীকে দিয়া দিলেন; কলিকাতায় এই মাল লইয়া বিশ্বভারতী প্রকাশনীর অঙ্কুর উপ্ত হইল ১৯২৩ সালের জুলাই মাসে।[২] রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কবির "মুক্তধারা" নাটক ৩০০০ কপি বিনামূল্যে বিশ্বভারতীকে দান করেন।

কবি কলিকাতায় আসিয়াছেন। 'বিসর্জন' অভিনয়ের আয়োজন শুরু হইয়াছে, রিহার্সাল চলিতেছে। গগনেন্দ্রনাথদের পাঁচ নম্বর প্রাসাদোপম বাড়ি তখন জমজম্ করিতেছে। গগনেন্দ্র সমরেন্দ্র অবনীন্দ্র— তিন ভাই — তাঁহাদের পুত্রকন্যা জামাতা পৌত্রপৌত্রী দৌহিত্রদৌহিত্রী— দাস-দাসী নায়েব-গোমস্তা শোফারে-ক্লিনারে মালিতে-দারোয়ানে বাড়ি পূর্ণ। এই বাড়ি ছিল কলিকাতা ভ্রমণকারী বিদেশীদের অবশ্য-দর্শনীয় স্থান— কারণ ইঁহাদের আর্ট-সংগ্রহ ছিল অতুলনীয় ঐশ্বর্যে ভরা। রবিকাকার জলসা, অভিনয়ে ইঁহাদের উৎসাহ সর্বাপেক্ষা বেশি। বিসর্জন অভিনয় প্রস্তাবে ইঁহারা সকলেই মহোৎসাহী।

রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিলে কত লোক যে কত কাজ-অকাজ, বাজে কাজ ও বাজে কথা লইয়া উপস্থিত হয়— তাহার ফর্দ কেহ কখনো রাখে নাই; রাখিলে বহু কৌতুককর সংবাদের রসদ মিলিত!

আমাদের আলোচ্যপর্ব অর্থাৎ ১৯২৩ সাল— অসহযোগ আন্দোলনের দ্বিতীয়পর্ব। ১৯২১ সালে নূতন দ্বৈরাজিক শাসনসংস্থা (Dyarchy) কার্যকরী হয়; তখন অসহযোগী কন্‌গ্রেস জনতাকে ভোট দিয়া সদস্য প্রেরণের বিরোধী ছিলেন। ইহার ফলে হিন্দুসমাজের নিকৃষ্ট লোক ও ব্রিটিশরাজের বশম্বদ লোক কাউন্সিলের সদস্যপদ প্রাপ্ত হয় এবং মুসলমানসমাজের সাম্প্রদায়িক বিষজর্জর ব্যক্তিরা কাউন্সিলে প্রবেশ করেন; মুসলমানদের মধ্যে জাতীয়তাবাদীরা প্রথম বারের নির্বাচনে যোগদান করেন নাই। কন্‌গ্রেস কাউন্সিলে প্রবেশ বা মন্ত্রীত্বপদ গ্রহণ না করায় সরকারের কোনোই অসুবিধা হয় নাই— কাউন্সিলে যথাযোগ্য সংখ্যক সদস্য নির্বাচিত হয় এবং মন্ত্রীত্বের গদি লইবার জন্য অযোগ্য লোকের অভাব হয় নাই।

১৯২৩ সালের জানুয়ারি মাসে চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে কন্‌গ্রেসের মধ্যে 'স্বরাজ্য' দল গঠিত হয়। গত দুই বৎসরে অসহযোগ আন্দোলন ব্রিটিশ রাজনীতির যে কোনো পরিবর্তন করিতে পারে নাই তাহা আজ আর অস্পষ্ট নহে। নূতন স্বরাজ্যদলের উদ্দেশ্য হইল যে তাহারা কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া, পদে পদে বাধা সৃষ্টিদ্বারা সরকারের কাজ অচল করিয়া তুলিবেন।

রবীন্দ্রনাথ বহুকাল রাজনীতি সম্বন্ধে কোনো মতামত প্রকাশ বা প্রচার করেন নাই, তিনি জানিতেন দেশবাসীর বর্তমান উত্তেজিত ও বিক্ষিপ্তচিত্তে তাঁহার বাণী পৌঁছিবে না। তবুও নেতারা প্রয়োজন হইলেই তাঁহার মতামতের জন্য উপস্থিত হইতেন। কলিকাতায় বাসকালে বিসর্জন অভিনয়ের কয়েকদিন পূর্বে তাঁহার সহিত মোলাকাতে

১ দ্র. শান্তা দেবী, রামানন্দ ও অর্দ্ধশতাব্দীর বাংলা; পৃ. ৮৮

২ The gross sale in 1923 was over Rs. 22,000 against Rs. 19,748 (1922), Rs. 19,800 (1921), Rs. 16,160 (1920), Rs. 15,297 (1919). The outlook of the Publishing Department is very hopeful and it is expected to yield a very considerable income to the General Funds.— Visva-Bharati Annual Report (Pub. Dep.) 1923।

আসিলেন সাংবাদিক মৃণালকান্তি বসু (১৯ অগস্ট)। কবির সহিত সমসাময়িক রাজনীতিক পরিস্থিতি লইয়া যে আলোচনা হয় তাহা বসু-মহাশয় বিজলী[১] নামে সাপ্তাহিকে প্রকাশ করেন (১৪ ভাদ্র ১৩৩০ ॥ ৩১ অগস্ট)।

কন্‌গ্রেসের দলাদলির জন্য যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে রবীন্দ্রনাথ জীবনেরই লক্ষণ বলিয়া অভিহিত করিলেন। তিনি বলিলেন যে একটিমাত্র প্রোগ্রাম বা কার্যপদ্ধতি লইয়াই যে সকলকে কাজ করিতে হইবে এমন কথায় তাঁহার মন সায় দেয় না। তবে মতানৈক্যের ক্ষেত্রে বিশেষ দলের উপর হীন উদ্দেশ্যের আরোপ হইলেই মনান্তরের সৃষ্টি হয়। অপরের মনোভাব বুঝিতে না পারা দুর্বল মনের লক্ষণ।

কাউন্সিলে প্রবেশ তখনকার দিনে সবথেকে বড়ো কথা। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, কাউন্সিলে প্রবেশের উদ্দেশ্য লইয়া যদি কোনো দল প্রবল হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের কাউন্সিলে যাইতে দেওয়াই ঠিক, এবং সেখানে তাঁহারা যাহা করিতে পারেন, তাহা করিতে দেওয়া সমীচীন। কিন্তু কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া উহাকে ধ্বংস করিবার চেষ্টার তিনি পক্ষপাতী নহেন: ইহা অপেক্ষা নিজেদের স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান গড়িয়া তোলার জন্য চেষ্টান্বিত হওয়া ভালো।

হিন্দুমহাসভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, কেবলমাত্র রাজনীতিক আন্দোলনের চেয়ে সামাজিক আন্দোলন তিনি অধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন। মুসলমানদের সংঘবদ্ধ হইবার যে স্বাধীনতা আছে, হিন্দুদেরও তাহা থাকা উচিত। হিন্দুরা সংঘবদ্ধ হইতে চাহিলে মুসলমানেরা তাহাকে বাধা দিবে কেন? অতঃপর হিন্দুদের দুর্বলতা সম্বন্ধে আক্ষেপ করিয়া বলেন, মোপ্‌লা বিদ্রোহের পর তিনি মালাবারে গিয়াছিলেন; সেখানে চল্লিশ লক্ষ হিন্দু এক লক্ষ মোপ্‌লার ভয়ে মারাত্মক রকম অভিভূত হইয়া আছে। এই সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে বলিলেন "একমাত্র অর্থনীতিক ব্যাপার আশ্রয় করিয়া একটা সত্যকার স্থায়ী মিলন সম্ভবপর করিয়া তোলা যায়, আর কোনো ভাবে যায় না। এইখানে আমাদের স্বার্থ এক, একে অন্যের সাহায্যে পুষ্ট।"

এই ক্ষুদ্র বাক্যটির মধ্যে কী গভীর অর্থ নিহিত, তাহা আধুনিক পাঠকদের নিকট অস্পষ্ট হইবে না।

বিসর্জন অভিনয়ের জন্য কলিকাতায় আটোক পড়িয়াছেন; "'অভিনয়ের পূর্বে শান্তিনিকেতনে কিছুদিন কাটিয়ে" যাবার ইচ্ছা হইতেছে। . . "শরীরটা ক্লান্ত, এবং মনটা অবসন্ন, তাকে আর নাড়া দিতে ভালো লাগচে না।" . . তিনি অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিতেছেন (২৩ শ্রাবণ) ". . তেতলার ঘরে আমি একলা। আমার সেইসব ছেলেবেলাকার নির্জন মধ্যাহ্ন মনে পড়চে। আবার একবার আমার সেদিনকার নিঃসঙ্গ জীবনের মধ্যে ফিরে গিয়ে কল্পলোকের রহস্যনিকেতনে তেমনি ক'রে পথ-হারিয়ে বেড়াতে ইচ্ছে করে। . হায়রে সেদিনের মধ্যে প্রবেশের পথ বন্ধ হয়ে গেচে— কেবলি জনতাবর্তে ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে হয়রান হলুম।"[২] বলা বাহুল্য এই জনতাকে তো তিনি স্বয়ং আহ্বান করিয়াছেন এবং একথা আরও সত্য যে এই জনতার স্পর্শ না-পাইলে তাঁহার জীবন সপ্ততন্ত্রী বীণায় ঝংকৃত হইত না— গ্রাম্য একতারাতে একটি সুরই বারে বারে ধ্বনিত হইত।

১ ১৯২১ সালে ভারতের নূতন সংবিধান মতে শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে ভারতসম্রাট পঞ্চম জর্জ আন্দামানে দ্বীপান্তরিত বোমার মামলার আসামীদের মুক্তি দান করেন। ইহাদের মধ্যে ছিলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহারা মুক্তি পাইয়া উত্তর কলিকাতা হইতে 'বিজলী' নামে সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন; এই পত্রিকার জন্য রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা দিয়াছিলেন।

২ অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র, ২৩ শ্রাবণ ১৩৩০ (৮ অগস্ট ১৯২৩), কবিতা ১৩৫০ চৈত্র, পৃ. ১৯০।

অগস্ট মাসের শেষদিকে 'বিসর্জন' অভিনীত হইল এম্পায়ার থিয়েটরে। রবীন্দ্রনাথ জয়সিংহের ভূমিকা গ্রহণ করেন ; বাষট্টী বৎসরের বৃদ্ধ রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলে লোকে যৌবনের কবিকে যেন নূতন করিয়া দেখিল।[১]

প্রচলিত 'বিসর্জন' হইতে এবারকার অভিনীত নাটকে[২] কিছু গান সংযোজিত হয়।[৩]

অভিনয়ের পর সাময়িক পত্রিকায় দর্শকদের রুচিভেদে নানারূপ সমালোচনা বাহির হইতে লাগিল ; কিন্তু বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অমৃতলাল বসু রবীন্দ্রনাথের অভিনয় দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।[৪]

বিসর্জন অভিনয়ের দুই দিন পরে 'বিজলী'তে কবির সহিত (২ ভাদ্র) মৃণালকান্তির মোলাকাতের বিবরণ ১৪ ভাদ্র প্রকাশিত হইল। বাংলা কাগজ হইতে সেই কথাগুলি ইংরেজিতে ভাষান্তরিত হইয়া কিছুটা পরিবর্তিত হইয়াছিল। কবি দেখিলেন তাঁহার মতামত লইয়া অচিরকালের মধ্যে মসীবর্ষণ আরম্ভ হইবে ; তাই বিসর্জন অভিনয়ের পরে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া কবি নিজের মত স্পষ্ট করিয়া ইংরেজিতে লিখিয়া প্রচার করিলেন (The Way to Unity)।[৫] এই প্রবন্ধে কবি যে কথাগুলি বলিলেন তাহার মধ্যে দেশবাসীর চিন্তার জন্য যথেষ্ট বাস্তব সত্য ছিল। খিলাফত আন্দোলনে হিন্দুরা যোগদান করিলেই যে দেশের সমস্যা নিরাকৃত হইবে না— কবির একথা শুনিয়া সেদিন রাজনীতিকরা খুশি হইতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথ 'পোলিটিশিয়েন' নিশ্চয়ই ছিলেন না— কিন্তু তিনি ত্রিকালজ্ঞ ঋষির ন্যায় ভবিষ্যৎ বোধ হয় দেখিতে পাইতেন— তাহা না হইলে তিনি একথা কেন বলিবেন— 'এ মিলন ক্ষণিকের স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত, ইহার দ্বারা স্থায়ী ফল ফলিবে না।'

শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া ১৯ ভাদ্রের (৫ সেপ্টেম্বর) শান্তিনিকেতন মন্দিরে বুধবারের ভাষণে কবি বলেন

১ বিসর্জন, অভিনয় ২৫, ২৭, ২৮ অগস্ট ১৯২৩ ॥ ৮, ১০, ১১ ভাদ্র ১৩৩০। সাত বৎসর পূর্বে ফাল্গুনী অভিনয়ের রাত্রে কবিকে প্রথমে যুবক কবিশেখর ও পরে বৃদ্ধ অন্ধবাউলের ভূমিকায় দেখিয়াছিলাম।

২ বিসর্জন অভিনয়ে প্রধান পাত্রপাত্রী : রঘুপতি— দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। জয়সিংহ— রবীন্দ্রনাথ। গোবিন্দমাণিক্য— রথীন্দ্রনাথ। নক্ষত্রমাণিক্য— তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়। অপর্ণা— ১ম রাত্রে মঞ্জু ঠাকুর ; পরে রাণু অধিকারী। গুণবতী— ১ম রাত্রে সজ্জা দেবী, পরে মঞ্জু ঠাকুর। এবার শান্তিনিকেতনের কোনো ব্যক্তিকে লওয়া হয় নাই।

৩ মূল বিসর্জনের গান— ১. আমি একলা চলেছি এ ভবে, ২. উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে, ৩. ওগো পুরবাসী, ৪. আমারে কে নিবি ভাই, ৫. থাকতে আর তো পারলি নে মা। দ্র. স্বরবিতান ২৮।

এবার অভিনয়ে এই গানগুলি ছিল— ১. তিমিরদুয়ার খোলো, গীতবিতান পৃ. ১৮৪, স্বরবিতান ৩৬। ২. ঝর ঝর রক্ত ঝরে, গীতবিতান পৃ. ৭৭৬, স্বরবিতান ২৮। ৩. আমি একলা চলেছি এ ভবে, গীতবিতান পৃ. ৫৫২, স্বরবিতান, ২৮। ৪. এত রঙ্গ শিখেছ কোথা, গীতবিতান পৃ. ৬৪৩, স্বরবিতান ৪৯। ৫. আমার আঁধার ভালো, গীতবিতান পৃ. ৮৭, স্বরবিতান ১। ৬. দিন ফুরালো হে সংসারী, গীতবিতান পৃ. ২০২। ৭. কোন্ ভারুকে ভয় দেখাবি, গীতবিতান পৃ. ৮৪৮, স্বরবিতান ২। ৮. থাকতে আর তো পারলি নে মা, গীতবিতান পৃ. ৭৭৭, স্বরবিতান ২৮। ৯. আঁধার রাতে একলা পাগল, গীতবিতান পৃ. ২২০, স্বরবিতান ১। ১০. আমার যাবার বেলায়, গীতবিতান পৃ. ২২৮, স্বরবিতান ২১। ১১. জয় জয় পরমা নিষ্কৃতি, গীতবিতান পৃ. ২২০, স্বরবিতান ৫।

৪ অমৃতলাল বসুর সমালোচনা, দ্র. সমসাময়িক দৈনিক— ইন্‌ডিয়ান ডেইলি নিউজ। সমালোচনা প্রকাশিত হইবার পর রবীন্দ্রনাথ উক্ত দৈনিকের সহকারী-সম্পাদক শ্রীঅমল হোমকে লেখেন— "…তোমার কাগজে অমৃতলাল বসুর বিসর্জনের প্রশস্তি উদার। তাঁর এই অকুণ্ঠ সাধুবাদ আমাকে আনন্দ দিয়াছে, তুমি তাঁকে জানিও আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদনসহ। বাংলা রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠদের কাছ থেকে ইতিপূর্বে এমন প্রশংসাবাক্য পূর্বে কখনো শুনেছি বলে মনে পড়ে না।"

৫ The Way to Unity, Visva-Bharati Quarterly, Vol. I, Part II, 1923 July-September। এই প্রবন্ধের অংশ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র অশোক চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত Welfare নামক মাসিকে প্রকাশিত হয়।

"সম্প্রতি দু'মাস কলিকাতায় ছিলুম, মনের মধ্যে পীড়ার অন্ত ছিল না। নিউইয়র্কের অসীম ঐশ্বর্যের মধ্যে কয়েক মাস ছিলুম, মনে হয়েছিল আমি উপবাসী।"[১] কলিকাতায় বাসের সহিত নিউইয়র্কের নিদারুণ শূন্যতার তুলনা মনে আসিল কেন? ইহার কারণ, কলিকাতার নাগরিক জীবনের অন্তহীন উত্তেজনা তাহার এই বয়সে অত্যন্ত অরুচিকর হইয়াছে। কতবার ভাবিয়াছেন এইসব ছাড়িয়া শান্তিনিকেতনের নিরালায় ছাত্রছাত্রীদের লইয়া আনন্দে দিন কাটাইবেন। কিন্তু দীর্ঘকাল যাইতে-না যাইতেই, সেখানকার পুনরাবৃত্ত রুটিনবাঁধা জীবনধারা দুর্বহ হইয়া উঠে, সেখানকার 'ইস্কুলমাস্টারি'র বন্ধন হইতে মুক্তির জন্য মন ব্যাকুল হয়— এ ঘটনা একাধিকবার আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। স্থানান্তরে নূতন পরিবেশের মধ্যে গেলেই মন সাময়িকভাবে প্রফুল্ল হয়— নূতন সাহিত্যও সৃষ্ট হয়। কিন্তু নূতন স্থান পুরাতন হইতেও বেশিদিন লাগে না— এই নিত্য চলাফেরার মধ্যে স্থান পরিবর্তনের মধ্যেই কবির জীবনে নিত্য নব ফসল ফলিয়াছে।

'বিসর্জনে'র পর শান্তিনিকেতনে বাস

বিসর্জন অভিনয়ের পরে কবি শান্তিনিকেতনে আছেন; কলিকাতা হইতে সংবাদ পাইলেন সুকুমার রায়ের (তাতাবাবু)[২] মৃত্যু হইয়াছে। যে কয়জন ব্রাহ্মযুবক রবীন্দ্রনাথের ধর্মীয় আদর্শবাদকে অন্তর দিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুকুমার তাঁহাদের অন্যতম। সুকুমার বহুবার শান্তিনিকেতনের উৎসবাদি উপলক্ষ্যে সেখানে সমদরদী বন্ধুদের সহিত আসিয়াছিলেন; দুই বৎসর পূর্বে অসুস্থ হইয়া সপরিবারে শান্তিনিকেতনে কিছুকাল বাস করিয়া গিয়াছিলেন— তখন সত্যজিৎ শিশু। অসুস্থ সুকুমারকে কবি কয় দিন পূর্বে কলিকাতায় দেখিয়া আসিয়াছিলেন। শান্তিনিকেতন মন্দিরে সুকুমারের মৃত্যুর পর উপাসনা হয়; তখন কবি বলিয়াছিলেন (২৬ ভাদ্র) "আমার পরম স্নেহভাজন যুবকবন্ধু সুকুমার রায়ের রোগশয্যার পাশে এসে যখন বসেছি এই কথাই আমার মনে হয়েচে— জীবলোকের ঊর্ধ্বে অধ্যাত্মলোক আছে— যে-কোনো মানুষ এই কথাটি নিঃসংশয় বিশ্বাসের দ্বারা নিজের জীবনে স্পষ্ট করে তোলেন অমৃতধামের তীর্থযাত্রায়— তিনি আমাদের নেতা। আমি অনেক মৃত্যু দেখেচি। কিন্তু এই অল্পবয়স্ক যুবকটির মতো, অল্পকালের আয়ুটুকু নিয়ে মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে এমন নিষ্ঠার সঙ্গে অমৃতময় পুরুষকে অর্ঘ্যদান করতে প্রায় আর-কাউকে দেখিনি। মৃত্যুর দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে অসীম জীবনের জয়গান তিনি গাইলেন; তাঁর রোগশয্যার পাশে বসে সেই গানের সুরটিতে আমার চিত্ত পূর্ণ হয়েচে।"[৩] কবিকে সুকুমার দুইটি গান গাহিতে অনুরোধ করেন— 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে' ও 'দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো— গভীর শান্তি এ যে।' শেষের গানটি কবিকে দুইবার অনুরোধ করিয়া তিনি শোনেন।

শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া কলিকাতার উত্তেজনাজনিত ক্লান্তি শমিত হইয়াছে; সন্ধ্যায় আশ্রমবাসীদের লইয়া নানা

১ মন্দির ১৯ ভাদ্র ১৩৩০ ॥ ৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৩। শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩৩০ আশ্বিন, পৃ. ১৩৯।

২ সুকুমার রায়, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। সুকুমারের বিবাহ হয় ১৯১৩ ডিসেম্বরে: কবি শিলাইদহ হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। —সীতা দেবী, পুণ্যস্মৃতি, প্রবাসী ১৩৪৮ চৈত্র, পৃ. ৬৭১।

৩ মন্দিরের উপদেশ, ২৬ ভাদ্র ১৩৩০। শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩৩০ ভাদ্র, পৃ. ১২৭-২৯।

বিষয়ের আলোচনা করেন,— তার মধ্যে দুইদিনের কথা লিখিত আছে— একদিন আলোচনা করেন 'বর্তমান সভ্যতা ও বিজ্ঞান' লইয়া, অপর দিন 'পুরুষ ও নারী' সম্বন্ধে।[১]

ধীরে ধীরে কবিমানস কাব্যশ্রীর স্পর্শ অনুভব করিতেছে। মনের এই প্রশান্তির নিদর্শন পাই দুইটি কবিতায়— যাত্রা (৫ আশ্বিন ১৩৩০) ও তপোভঙ্গ (কার্তিক ১৩৩০)।

প্রায় আড়াই বৎসর পূর্বে আমেরিকা-বাসকালে তথাকার বৈষয়িকতায় ও বস্তুতান্ত্রিকতায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া কবি নিউইয়র্ক হইতে এন্‌ড্রুজকে লিখিয়াছিলেন (১৯২১ জানুয়ারি ৪) যে সর্বত্যাগী শিবের স্তব করিতে তাঁহার বড়ই ইচ্ছা করিতেছে— "I seem to pass through a real training for becoming a *sannyasi*. When I am in this country...I wrote a poem when I was in India. I shall never be an ascetic [আমি হব না তাপস]. But when I am here, inspiration comes to me, with a rush of lyrical fervour, to write a hymn to Shiva, the Lord of Ascetics, who uses the four quarters of the sky for his dress."—*Letters from Abroad*, p. 51।

এতকাল পরে কলিকাতার দিনগুলিকে নিউইয়র্কের নিদারুণ শূন্যতার সহিত তুলনা করিয়া সেই স্তব যেন রচিত হইল— উভয় কবিতাই শংকরের উদ্দেশে।

যাব যেথা শংকরের টলমল চরণপাতনে
জাহ্নবীতরঙ্গমন্দ্র-মুখরিত তাণ্ডবমাতনে
গেছে উড়ে জটাভ্রষ্ট ধুতুরার ছিন্নভিন্ন দল,
কক্ষচ্যুত ধূমকেতু লক্ষ্যহারা প্রলয়-উজ্জ্বল
আত্মঘাতমদমত্ত আপনারে দীর্ণ কীর্ণ করে
নির্মম উল্লাসবেগে, খণ্ড খণ্ড উল্কাপিণ্ড ঝরে,
কণ্টকিয়া তোলে ছায়াপথ। — পূরবী।

কিন্তু কবির এ 'যাত্রা' তো আনন্দ আবেগের মধ্যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে না। ইহার মধ্যে বেদনা প্রচ্ছন্ন। কিন্তু তাহা কবির শেষ কথা হইতে পারে না। শংকরের তাণ্ডব মাতনে "আত্মঘাতমদমত্ত আপনারে দীর্ণ কীর্ণ করে নির্মম উল্লাসবেগে"— উহা কবির সাধনার পরিণতি নহে।

শংকরের 'তপোভঙ্গ' হয় বসন্তের সমাগমে—

একদা সে দিনগুলি তোমার পিঙ্গল জটাজালে
শ্বেত রক্ত নীল পীত নানা পুষ্পে বিচিত্র সাজালে,
গেছ কি পাসরি।

দস্যু তারা হেসে হেসে
হে ভিক্ষুক, নিল শেষে
তোমার ডম্বরু শিঙা, হাতে দিল মঞ্জিরা বাঁশরি।

১ শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ ১৩৩০ আশ্বিন, পৃ. ১৫৫-৫৬।

গন্ধভারে আমন্থর বসন্তের উন্মাদনা রসে
ভরি তব কমণ্ডলু নিমজ্জিল নিবিড় আলসে
মাধুর্যরভসে।··
বসন্তের বন্যাস্রোতে সন্ন্যাসের হল অবসান;··
তেনকালে মধু মাসে
মিলনের লগ্ন আসে,
উমার কপোলে লাগে স্মিতহাস্যবিকশিত লাজ।
সেদিন কবিরে ডাক' বিবাহের যাত্রাপথতলে,
পুষ্পমাল্যমাঙ্গল্যের সাজি লয়ে সপ্তর্ষির দলে
কবি সঙ্গে চলে। —পূরবী।

যে কবি ব্যথিত চিত্তে "অসমাপ্ত সংগীতের ডালিখানি নিয়ে বক্ষতলে" যাত্রা করিয়াছিলেন আজ সে-কবির চিত্ত "সুন্দরের জয়ধ্বনিগানে" তৃপ্ত।

তাই কবি গাহিয়াছেন—

যৌবনবেদনারসে উচ্ছল আমার দিনগুলি
হে কালের অধীশ্বর, অন্য মনে গিয়েছ কি ভুলি,
হে ভোলা সন্ন্যাসী।

আমেরিকা বাসকালে তাঁহার দিগম্বর শংকরের যে স্তব করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল সেই কুঞ্চিত আবেগটুকু এতদিনে যেন সামান্য প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইলেন; কিন্তু পরিপূর্ণভাবে নহে। সেই ভাবনাগুলি অচিরে মুক্তি লইবে 'নটরাজে'র ধ্যানে। 'সুন্দরে'র মধ্যে তাহারই আবাহন গাহিয়া বলিয়াছিলেন, "ভাঙব তাপস, ভাঙব তোমার কঠিন তপের সাধন।" সেইভাব ক্রমেই কাব্যমধ্যে নবনব রূপে মূর্ত হইতেছে।

আমেরিকার নিউইয়র্কে বহুতল হোটেলের এক কক্ষে বাসকালে কবির মনে দিগম্বর শংকরের যে স্তব করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, সেই কুঞ্চিত আবেগটুকু এতকাল পরে সামান্যভাবে মুক্তিলাভের সুযোগ পাইল; কিন্তু পরিপূর্ণভাবে নহে। সেই ভাবনারাশি অচিরে মুখর হইয়া উঠিবে 'নটরাজে'র নৃত্যের তালে— মৃদঙ্গের করাঘাতে— সুরের রণনে।

'যাত্রা' কবিতাটি লিখিয়া (২২ সেপ্টেম্বর) কবির মন বেশ পূর্ণ, বিশ্বভারতীর কাজেকর্মে জ্ঞানচর্চায় মুখর। এমন সময়ে ৩০ সেপ্টেম্বর সংবাদ আসিল পিয়ার্সন ভারত প্রত্যাবর্তনের পথে ইতালিতে রেলদুর্ঘটনায় মারা গিয়াছেন (২৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৩)। গতবৎসর পিয়ার্সন দেশে গিয়াছিলেন— এখানে শরীর বারেবারে খারাপ হইতেছিল। সুস্থ হইয়া ভারতে ফিরিবার সময়ে য়ুরোপের কতকগুলি স্কুল ভালো করিয়া দেখিয়া আসিতেছিলেন। ইতালি ভ্রমণকালে ফ্লোরেন্স হইতে ১৭ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত Pistoia নামক স্টেশনের কাছে ট্রেনের কামরার দরজা হঠাৎ খুলিয়া যায় ও তিনি নিচে পড়িয়া যান, তাহার ফলে তাঁহার মৃত্যু হয়।[১]

পিয়ার্সন ছিলেন সবার প্রিয়— এরূপ অজাতশত্রু মানুষ দেখা যায় না; সাঁওতাল পাড়ার আবালবৃদ্ধবনিতা

১ Visva-Bharati News, Vol. X, No. 5, 1924 November, pp. 57-60, also p.78ff।

ও শান্তিনিকেতনের অশীতিপর বৃদ্ধ দ্বিজেন্দ্রনাথ— ইঁহাদের সকলের যেন ইনি সমবয়সী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ ও গান্ধীজি— ভারতীয়দের সাধনার এই ত্রি-প্রতীককে বুঝিবার চেষ্টাই ছিল পিয়ার্সনের জীবনাদর্শ। রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ে বলিয়াছিলেন "We seldom meet with anyone whose love of humanity was so concretely real, whose idea of service so assimilated to his personality as it had been with him."[১]

"পিয়ার্সন ছিলেন ইংরেজ, কিন্তু ভারতবর্ষে সম্পূর্ণভাবে তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করতে পেরেছিলেন।·· যাকে আমরা দেশাত্মবোধ নাম দিয়েছি সেই দেশাত্মবোধকেই তিনি সকলের চেয়ে বড়ো মর্যাদা দেন নি।·· আমি তাঁকে দেশ বিদেশে নানা অবস্থায় দেখেছি·· যেখানেই তিনি দুঃখ বা অপমান দেখেছেন এবং এও অনুভব করেছেন যে, সেই দুঃখ বা অপমানের মূলে আছে তাঁর স্বজাতি— সেখানে তিনি মুহূর্তকালের জন্য এবং লেশমাত্র পরিমাণেও স্বদেশের রাষ্ট্রীয় স্বার্থের কথা চিন্তা করেন নি।·· তিনি তাঁর শুভ চিন্তা ও সাধু লক্ষ্য বিশুদ্ধভাবে নিঃস্বার্থভাবে ও সম্পূর্ণভাবে সর্বমানবের অভিমুখে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

"কিন্তু যখন পিয়ার্সনকে আমরা ভারতবন্ধু বলে আদর করি তখন তাঁর জীবনের এই বড়ো সত্যটিকে এক রকম চাপা দিয়ে রাখি। তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যেখানে আমাদের স্বাজাত্য অভিমানকে তৃপ্ত করে সেইখানেই তাঁকে যথার্থভাবে গ্রহণ করি; ক্ষণকালের জন্যে চিন্তাও করি নি যে এই স্বাজাত্য অভিমানকে জলাঞ্জলি দিয়ে তবে তিনি আমাদের কাছে এসেছেন, এবং সেই মহিমাতেই তাঁর জীবন দীপ্যমান্।"[২]

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় পূজাবকাশের জন্য বন্ধ হইল ২৫ আশ্বিন ১৩৩০ (১২ অক্টোবর ১৯২৩)। কবি আশ্রমেই থাকিলেন; বিজয়াদশমীর দিন তিনি তাঁহার 'যক্ষপুরী' নাটক পড়িয়া শুনাইলেন; কিন্তু এখনো মনের মতো হইতেছে না; তাই প্রকাশের তাড়া নাই।

ছুটির মধ্যে হাতে তেমন কাজের চাপও নাই, তাগিদও নাই; একখানি ক্ষুদ্র নাটিকা লিখিলেন। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন যে, "আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান্ প্রমথনাথ বিশীর কোনো রচনা হইতে এই নাট্যদৃশ্যের ভাবটি আমার মনে আসিয়াছিল।"[৩]

"বিষয়টি এই— রথযাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখতে পেলে, মহাকালের রথ অচল। মানবসমাজের সকলের যে বড়ো দুর্গতি, কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধবন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই রথ টানবার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানবসম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চলছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহনরূপে; তাদের অসম্মান ঘুচলে, তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে।"[৪]

১ Manchester Guardian, 1929 November.

২ আশ্রমের পরলোকগতদের স্মরণোপলক্ষে ৯ পৌষ ১৩৩০ যে সভা হয়, তাহাতে কবি এ উক্তি করেন। শান্তিনিকেতন ১৩৩০ ফাল্গুন, পৃ. ২১।

৩ রথযাত্রা, প্রবাসী ১৩৩০ অগ্রহায়ণ, পৃ. ২১৬-২৬। বিশ্বভারতী সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশনে শ্রীপ্রমথনাথ বিশী 'রথযাত্রা' নামে তাঁহার স্বরচিত একটি নাটক পাঠ করিয়াছিলেন। দ্র. শান্তিনিকেতন ১৩৩০ ভাদ্র, পৃ. ১৩৮।

৪ নয় বৎসর পরে 'রথযাত্রা' ভাঙিয়া কবি 'কালের যাত্রা' লেখেন ও শরৎচন্দ্রের জন্মতিথিতে উৎসর্গ করেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ৫৭তম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে (১৩৩৯ ভাদ্র) লিখিত পত্র হইতে উদ্ধৃত। বিচিত্রা ১৩৩৯ কার্তিক। দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২, পৃ. ১১৫।

'রথযাত্রা' প্রবাসী পত্রিকায় যে মাসে প্রকাশিত হয় (১৩৩০ অগ্রহায়ণ) সেই মাসে কবির দুইটি প্রবন্ধ— 'সমস্যা' ও 'সমাধান' যুগপৎ বাহির হয়। ভারতবর্ষ স্বাধীনতার জয়যাত্রার পথে নামিয়াছে, তাহার এই চলার পথে সমস্যা কী এবং সমাধান বা কিসে, তাহারই আলোচনা হইয়াছে প্রবন্ধাকারে। 'রথযাত্রা'র মধ্যেও এই সমস্যা ও সমাধানের ইঙ্গিত রূপক মূর্তিতে প্রকাশ পায়।

রবীন্দ্রনাথের প্রশ্ন— আমরা যে স্বাধীনতা চাহিতেছি তার স্বরূপটি কী। মানুষ যেখানে সম্পূর্ণ একলা, সেইখানে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু মানুষ এ স্বাধীনতা কেবল চায় না, তা নয়; পেলে বিষম দুঃখ বোধ করে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের মধ্যেই স্বাধীনতা কাম্য। যখন দেশের স্বাধীনতার কথা উঠে, তাহার অর্থ দেশের সকল লোকের সঙ্গে সম্বন্ধকে যথাসম্ভব সত্য ও বাধামুক্ত করিতে চাই। অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে ভেদের কারণ ঘুচাইয়া ফেলিতে চাই। য়ুরোপের ইতিহাসে স্বাধীনতা-সংগ্রামের কাহিনী সুপরিচিত; ভেদ-ঘুচানো-প্রচেষ্টার ইতিহাস সেখানে। য়ুরোপে রাষ্ট্রবিপ্লব হইয়াছে কখনো শ্রেণীগত ভেদ ঘুচাইবার জন্য, কখনো অধিকারগত ভেদ দূরীকরণের জন্য। আসলে ভেদেই পীড়া ঘটে, সেই পীড়ায় মানুষ বিপ্লব ঘটায়। ভেদের দুঃখ থেকে, ভেদের অকল্যাণ থেকে মুক্তিই হইতেছে মুক্তি। তবে ভেদও একরকমের নয়। ভিন্ন ভিন্ন ভেদের প্রতিকার ভিন্ন রকমের। আমরা স্বাধীনতা চাই, কিন্তু যে বুদ্ধি আমাদের বিচ্ছিন্ন করিয়া নিঃশক্তি করিয়াছে সেই ভেদ-ছিদ্র বন্ধ করিতে না পারিলে শনি যে সেই পথেই প্রবেশ করিয়া ভরা নৌকা ডুবি করিতে পারে, সে-সম্বন্ধে চিন্তার প্রয়োজন। সমাজটাকে একটা ভেদবিহীন বৃহৎ দেহের মতো ব্যবহার করিতে পারি তখনই— যখন তাহার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে মধ্যে বোধশক্তি ও কর্মশক্তির প্রাণগত যোগ থাকে। প্রাণগত ঐক্যের অভাবটাই সমস্যা। কিন্তু যাঁহারা রাষ্ট্রনৈতিক তাঁহাদের সবুর সয় না, তাঁহারা বলেন স্বাধীনতা পাইলেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ঐক্য আপনি-আপনি ঘটিয়া উঠিবে। আপনি ঘটিবে একথা সর্বনেশে ফাঁকির কথা। কবি বরাবর বলিয়া আসিয়াছেন যে য়ুরোপে নেশন হইয়াছে, মুসলমানরা সংঘবদ্ধ, তার কারণ তাদের বিমিশ্রণের কোনো বাধা নাই, ধর্মে বা আচারেও নয়। 'সকলের চেয়ে গভীর আত্মীয়তার ধারা নাড়ীতে বয়, মুখের কথায় বয় না।' হিন্দুসমাজে একের আঘাত অন্যের মর্মে সহজে বাজে না। —কালান্তর, পৃ. ১৯২।

হিন্দুসমাজের স্তরে স্তরে ভেদ যেমন উক্ত সমাজকে পৃথক করিয়াছে, হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্ম সম্বন্ধে বোধও তাহাদের পরস্পরকে এক হইতে দেয় নাই। হিন্দু নিজেকে ধর্মপ্রাণ বলিয়া পরিচয় দেয়, মুসলমানও তাই দেয়। উভয় ধর্মপ্রাণ লোকের মধ্যে মিলন হইতেছে না— খিলাফত খাড়া করিয়াও মিল হইল না। রাজনীতিকে আশ্রয় করিয়া যে মিলন হয়, তাহা স্থায়ী হয় না; তাই খিলাফতের উপলক্ষ্যর পর অন্য কোনো উপলক্ষ্যর কথা নেতাদের চিন্তা করিতে হইতেছে। হিন্দু-মুসলমানে কেবল যে ধর্মগত ভেদ তা নয়, তাদের মধ্যে একটা সামাজিক শক্তির অসমকক্ষতা ঘটিয়াছে।

"মুসলমানের ধর্মসমাজের চিরাগত নিয়মের জোরেই তার আপনার মধ্যে একটা নিবিড় ঐক্য জমে উঠেছে, আর হিন্দুর ধর্মসমাজের সনাতন অনুশাসনের প্রভাবেই তার আপনার মধ্যে একটা প্রবল অনৈক্য ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। এর ফল এই যে কোনো বিশেষ প্রয়োজন না থাকলেও হিন্দু নিজেকেই মারে, আর প্রয়োজন থাকলেও অন্যকে মারতে পারে না। আর মুসলমান কোনো বিশেষ প্রয়োজন না ঘটলেও নিজেকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করে, আর প্রয়োজন ঘটলে অন্যকে বেদম মার দিতে পারে। তার কারণ এ নয় মুসলমানের গায়ের জোর আছে, হিন্দুর নেই; তার আসল কারণ, তাদের সমাজের জোর আছে, হিন্দুর নেই। একদল আভ্যন্তরিক বলে বলী, আর একদল আভ্যন্তরিক

দুর্বলতায় নির্জীব।"— পৃ. ২০৪। রবীন্দ্রনাথের মত— "ভারতবর্ষের কল্যাণ যদি চাই তা হলে হিন্দু-মুসলমানে কেবল যে মিলিত হতে হবে তা নয়, সমকক্ষ হতে হবে।"

এই সব সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে "আজকাল আমরা এই একটা বুলি ধরেছি, ঘরে যখন আগুন লেগেছে তখন শিক্ষাদীক্ষা সব ফেলে রেখে সর্বাগ্রে আগুন নিবাতে কোমর বেঁধে দাঁড়ান চাই; অতএব সকলকেই চরকার সুতো কাটতে হবে।" রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস "বিদেশীকে বিদায় করলেও আগুন জ্বলবে, এমনকি স্বদেশী রাজা হলেও দুঃখ দহনের নিবৃত্তি হবে না। এমন সময় যে, হঠাৎ আগুন লেগেছে হঠাৎ নিবিয়ে ফেলবে।· ·আজ দুশো-বছর আগে চরকা চলেছিল, তাঁতও বন্ধ হয় নি, সেই সঙ্গে আগুনও দাউ-দাউ করে জ্বলছিল। সেই আগুনের জ্বালানি-কাঠটা হচ্ছে ধর্মেকর্মে অবুদ্ধির অন্ধতা।"

কবির মতে সমস্যার সমাধান হইতেছে বুদ্ধির কর্ষণ; "ব্যাপকভাবে সর্বসাধারণের মনের ক্ষেত কর্ষণ করে বিচিত্র ও বিস্তীর্ণভাবে বুদ্ধিকে ফলিয়ে তুলতে পারলে তবেই সে সভ্যতা মনস্বী হয়।" সর্বজনের স্বাধীন বুদ্ধি ও স্বাধীন শক্তি প্রকাশের সুযোগ পাইলে, জ্ঞান- ও শক্তি- সাধনার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি বহুলপরিমাণে সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হইলে জাতি সর্বতোমুখী শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। "অন্ধ বাধ্যতা দ্বারা চালিত হবার চিরাভ্যাস নিয়ে মুক্তির বিপুল দায়িত্ব কোনো জাতি কখনো ভালো ক'রে বুঝতেই পারবে না, বহন করা তো দূরের কথা।" আমাদের ধর্ম ও সমাজ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন লোকের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অসম্ভবের আশায় বসিয়া থাকে; রাজনীতি ক্ষেত্রেও লোকে যাঁহাকে "অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ব'লে বিশ্বাস করে তাঁর বাণীকে দৈববাণী ব'লে জেনে তারা ক্ষণকালের জন্যে একটা দুঃসাধ্য সাধনও করতে পারে," কিন্তু তাহার দ্বারা স্থায়ী ফললাভ করা জাতির পক্ষে সম্ভব কিনা তাহাই বিচার্য। তথাকথিত শিক্ষিতসমাজের মধ্যেও মুক্তবুদ্ধির জোর বড়ো বেশি দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া কবি মন্তব্য করিতেছেন। "তারাও উচ্ছৃঙ্খল-ভাবে যা-তা মেনে নিতে প্রস্তুত, অন্ধভক্তিতে অদ্ভুত পথে অকস্মাৎ চালিত হতে তারা উন্মুখ হয়ে আছে; আধিভৌতিক ব্যাপারের আধিদৈবিক ব্যাখ্যা করতে তাদের কিছুমাত্র সংকোচ নেই, তাহাও নিজের বুদ্ধিবিচারের দায়িত্ব পরের হাতে সমর্পণ করতে লজ্জা বোধ করে না, আরাম বোধ করে।" · · "নিজের সতর্ক বুদ্ধিকে সর্বদা জাগ্রত রাখতে সচেষ্ট শক্তির প্রয়োজন হয়।" · · "দেশের মুক্তি কাজটা খুব বড়ো অথচ তার উপায়টা খুব ছোটো হবে এ কথা প্রত্যাশা করার ভিতরেই একটা গলদ আছে। এই প্রত্যাশার মধ্যেই হয়ে গেছে ফাঁকির 'পরে বিশ্বাস। বাস্তবের 'পরে নয়, নিজের শক্তির 'পরে নয়।"— কালান্তর, পৃ. ২১৬।

'শিক্ষার মিলন' ও 'সত্যের আহ্বান'এর প্রায় দুই বৎসর পর কবি গান্ধীজি-প্রবর্তিত অসহযোগনীতি পুনরায় সমালোচনা করিলেন। এই প্রবন্ধ রচিত হইবার পর প্রায় পঁচিশ বৎসর অতীত হইয়াছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি বিশ্লেষণের অসারত্ব প্রমাণ হয় নাই, তিনি কবির দিব্যদৃষ্টিতে সমস্ত দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার মনের কথা একটি সমসাময়িক কবিতায় ব্যক্ত করেন; নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল (প্রবাহিনী, পৃ. ১২০-২১)—

মনের মধ্যে নিরবধি শিকল-গড়ার কারখানা।
একটা বাঁধন কাটে যদি বেড়ে উঠে চারখানা॥
কেমন করে নামবে বোঝা, তোমার আপদ নয় যে সোজা,
অন্তরেতে আছে যখন ভয়ের ভীষণ ভারখানা॥
রাতের আঁধার ঘোচে বটে বাতির আলো যেই জ্বালো।
মূর্ছাতে যে আঁধার ঘটে রাতের চেয়ে ঘোর কালো।

ঝড় তুফানে ঢেউয়ের মারে তবু তরী বাঁচ্‌তে পারে,
সবার বড় মার যে তোমার ছিদ্রটার ঐ মারখানা॥
পর তো আছে লাখে লাখে কে তাড়াবে নিঃশেষে?
ঘরের মধ্যে পর যে থাকে পর ক'রে দেয় বিশ্বে সে।
কারাগারের দ্বারী গেলে তখনি কি মুক্তি মেলে?
আপনি তুমি ভিতর থেকে চেপে আছ দ্বারখানা॥
শূন্য ঝুলির নিয়ে দাবি রাগ করে রোস্ কার পরে?
দিতে জানিস্ তবেই পাবি পাবিনে ত ধার ক'রে।
লোভে ক্ষোভে উঠিস্ মাতি, ফল পেতে চাস্ রাতারাতি,
মুঠোরে তোর করবে ফুটো আপন খাঁড়ার ধারখানা॥

শ্রীনিকেতনে

পূজাবকাশের (১৯২৩) অধিকাংশই শান্তিনিকেতনে কাটাইয়া নভেম্বর মাসের গোড়ায় কবি চলিলেন গুজরাট ভ্রমণে। কবির সঙ্গে আছেন এন্‌ড্রুজ, ক্ষিতিমোহন সেন ও গৌরগোপাল ঘোষ। এন্‌ড্রুজ আসামে ছাত্র-সম্মেলনে গিয়াছিলেন, সেখানে পিয়ার্সনের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তার পর কবির সঙ্গী হইলেন। এবার কাঠিয়াবাড়-সফরের ফলে রাজাদের নিকট হইতে যে অর্থ সংগৃহীত হইল তাহা দ্বারা 'কলাভবন' গৃহের পত্তন করা হয়। কবি প্রায় দেড় মাস পরে পৌষ-উৎসবের পূর্বে আশ্রমে ফিরিলেন।

এবারকার কবির এই সফরের বিস্তারিত কোনো বিবরণ আমাদের হস্তগত হয় নাই; কেবল রাজকোট হইতে দিলীপ রায়কে সংগীত সম্বন্ধে একখানি পত্র লেখেন বলিয়া জানি।[১] কাঠিয়াবাড় হইতে ফিরিয়া কবি যথানিয়মে পৌষ-উৎসব নিষ্পন্ন করেন। এবারকার ৯ই পৌষ মন্দিরে কবি পিয়ার্সন সম্বন্ধে যে ভাষণ দেন তাহা হইতে আমরা পূর্বে উদ্‌ধৃত করিয়াছি। সেই সন্ধ্যায় বড়োদিন বা খ্রীষ্টজন্মদিন উপলক্ষ্যে কবি মন্দিরে উপাসনা করেন।[২]

রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে শ্রীনিকেতনের পথের ধারে একটি নূতন বাড়িতে আছেন। এই সময়ের কথা প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমরা নিম্নে উদ্‌ধৃত করিলাম—

"কুড়ি বছর আগে [১৩৩০] ৭ই পৌষের উৎসব সময়ে কোনো পারিবারিক ব্যাপারে কবির মন অত্যন্ত পীড়িত। একটা ব্যবস্থা করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু কিছু হল না। ৬ই পৌষ সন্ধ্যাবেলা শান্তিনিকেতনে গিয়ে পৌঁচেছি। কবি তখন থাকেন ছোটো একটা নূতন বাড়িতে— পরে এ বাড়ির নাম হয় 'প্রান্তিক'। শুধু দুখানা ছোটো ঘর। খাওয়ার পর বললেন, 'তুমি এখানেই থাকবে।' লেখবার টেবিল সরিয়ে আমার শোয়ার জায়গা হল। পাশেই কবির ঘর। মাঝে একটা দরজা, পর্দা টাঙানো। গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়ে শুনতে পেলুম গান করছেন, 'অন্ধজনে

১ রাজকোট হইতে পত্র ১১ নভেম্বর ১৯২৩। বিচিত্রা, ১৩৩৮ অগ্রহায়ণ।

২ খৃষ্টোৎসব; শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩৩০ চৈত্র, পৃ. ৪৮-৪৯। দ্র. খৃষ্ট (১৯৫৯), পৃ. ২৮-৩৩। ইহা কবির খৃষ্ট সম্বন্ধে ৩য় ভাষণ: ১ম ১৯১০, ২য় ১৯১৪, ৩য় ১৯২৩।

দেহ আলো মৃতজনে দেহ প্রাণ'। বারবার ফিরে ফিরে গান চলল, সারা রাত। ফিরে ফিরে সেই কথা, 'অন্ধজনে দেহ আলো'। বিকাল থেকে মেঘ করেছিল, ভোরের দিকে পরিষ্কার হল। সকালে মন্দিরের পর বললুম, 'কাল তো আপনি সারারাত ঘুমোন নি।' একটু হেসে বললেন, 'মন বড়ো পীড়িত ছিল তাই গান করছিলুম। ভোরের দিকে মন আকাশের মতোই প্রসন্ন হয়ে গেল।'[১]

এবার প্রায় দুই মাস কবি শান্তিনিকেতনে কাটাইলেন। শ্রীনিকেতনে থাকিবার নূতন আকর্ষণ হইয়াছে বৃক্ষাবাস বা গাছের মধ্যে বাড়ি। শ্রীনিকেতনে একটি বিশাল বটগাছ আছে। সেই গাছের উপর কাসাহারা নামে জাপানী শিল্পী ও বর্ধকী এই নীড়টি নির্মাণ করেন। নূতন ঘর নূতন বাড়ি কবিকে বড়ই আকর্ষণ করে— তাই এবার কয়দিন এই বৃক্ষনীড়ে বাসা বাঁধিলেন।

শ্রীনিকেতন পল্লীসংস্কার বিভাগের দ্বিতীয় সাংবৎসরিক (৬ ফেব্রুয়ারি ॥ ২৩ মাঘ) উৎসব উদ্‌যাপনকালে কবি এই বৃক্ষাবাসেই ছিলেন। প্রাতের উৎসবাদির পর সেই দিন অপরাহ্ণে এক জনসভা হয়— কবি সেখানে উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা করেন; জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ব্ল্যাকউড সাহেবের বাংলায় বক্তৃতা করিবার ধৃষ্টতা দেখিয়া লোকে হাস্যসম্বরণ করিতে পারে নাই। সেইদিন 'শ্রীনিকেতন হাট' বসানো হয়।

শ্রীনিকেতনের বৃক্ষাবাসে নূতন পরিবেশ কবিকে যেন নূতন চেতনা দিল; বহুকালের রুদ্ধ লিরিক-প্রবাহ অকস্মাৎ খুলিয়া গেল— মন বহুদিন গানের মধ্যে ডুবিয়া ছিল; কিন্তু গানের মধ্য দিয়া মনের সকল কথা তো প্রকাশ পায় না; না-বলা বাণীর অনেকখানি সুর ভরিয়া রাখে। লিরিকের মধ্যে মন মুক্তি পায় বৃহত্তর ভূমিকায়। তাই আমরা বারে বারে দেখিয়াছি গানের পালা শেষ হইলে— হয় লিরিকের ধারা, নয় গল্পের ফোয়ারা ছোটে।

এবারকার কবিতাধারার প্রথম কবিতা 'ভাঙা মন্দির'[২] (মাঘ ১৩৩০)। বহুকাল পূর্বে কল্পনার যুগে (১৩০৭) কবি লিখিয়াছিলেন 'ভগ্ন মন্দির'—

ভাঙা দেউলের দেবতা।
তব বন্দনা রচিতে, ছিন্না বীণার তন্ত্রী বিরতা।
সন্ধ্যা-গগনে ঘোষে না শঙ্খ তোমার আরতি-বারতা।
তব মন্দির স্থির গম্ভীর, ভাঙা দেউলের দেবতা।

আজ 'ভাঙা মন্দিরে' তেইশ বৎসর পরে লিখিতেছেন—

পুণ্যলোভীর নাই হল ভিড় শূন্য তোমার অঙ্গনে,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়।
অর্ঘ্যের আলো নাই বা সাজাল পুষ্পে প্রদীপে চন্দনে,
যাত্রীরা তব বিস্মৃত-পরিচয়।

এই কবিতা রচনার প্রত্যক্ষ কোনো প্রেরণা আছে কি? কয়েক মাস পূর্বে কবি 'রথযাত্রা' নাটিকায় ও 'সমস্যা' প্রবন্ধে জীর্ণ পুরাতনের অভাবাত্মক দিকটাকে খুটিশ্বরীর পূজা বলিয়া কঠোর বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের

১ কবিকথা, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫০ ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা পৃ. ১৪২। এইখানে যে ঘটনাটির কথা বলা হয় নাই সেইটি আমাদের অনুমান তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা মীরার সহিত জামাতা নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলির মন কষাকষি।

'প্রান্তিক' বাড়িটি সুরুলের পথের উপর মিস্ গ্রীন-এর জন্য নির্মিত হয়; বিশ্বভারতীর বাড়ির তালিকায় ইহার সংখ্যা ছিল ৫৬ নং।

২ ভাঙা মন্দির, বঙ্গবাণী ৩য় বর্ষ ১৩৩০ চৈত্র, পৃ. ১৩৭-৩৯। দ্র. পূরবী।

ন্যায় মনীষীর পক্ষে কেবল অভাবাত্মক দিকটা দেখাইয়া আরাম বা আনন্দ হয় না; সকল বিষয়ের ভাবাত্মক ও বিশেষভাবে সৌন্দর্যাত্মক দিকটার প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। তাই গ্রামের জীর্ণ মন্দির দেখিয়া ইহার ভাবময় দিকটার প্রতি মনটা ধাবিত হইল।

নাই মুখরিল পার্বণ-ক্ষণ ঘন জনতার গর্জনে,
অতিথি-ভোগের না রহিল সঞ্চয়।
পূজার মঞ্চে বিহঙ্গদল কুলায় বাঁধিয়া করে কোলাহল,
তাই তো হেথায় জীববৎসল আসিছেন ফিরে ফিরে।
নিত্য সেবার পেয়ে আয়োজন তৃপ্ত পরানে করেছি কূজন,
উৎসবরসে সেই তো পূজন জীবন-উৎসতীরে।

যাহা-কিছু জীর্ণ, যাহা কিছু দীর্ণ-পুরাতন তাহারা সার্থক হয় নবীন প্রাণের স্পর্শে, যেখানে জীববৎসল আসেন ফিরে ফিরে।

তাইতো কবির প্রশ্ন—

মাঘের বুকে সকৌতুকে কে আজি এল, তাহা
বুঝিতে পার তুমি? • •
বনের তলে নবীন এল,
মনের তলে তোর।— আগমনী, পূরবী।

বসন্তের আগমনে সমস্ত বনভূমি প্রাণে যেন পুলকিত হইয়া উঠিল— সেই তো প্রাণের প্রতীক।

এমন সময়ে কলিকাতায় যাইতে হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুদিনের প্রতিশ্রুত বক্তৃতা দিবার জন্য। কলিকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়ি তাঁহাদের অংশ প্রায় জনশূন্য। কবির এখন যে বয়স, তখন পুরাতন স্মৃতি ঘুরিয়া ঘুরিয়া মনের মধ্যে উদিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। অবচেতনের তল হইতে কত স্মৃতি, কত মুখ, কত কথা জাগে! এই সময়ের রচিত কবিতাগুলি সেইদিনের বেদনা-জড়িত দীর্ঘশ্বাসে তপ্ত।

'উৎসবের দিন' কবিতায় যে কথাটি বলিতে চাহিতেছেন, তাহা বাস্তবের অভিঘাতে মূর্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় বক্তৃতা দিনে (২০ ফাল্গুন ১৩৩০) প্রাতের সামান্য ঘটনা আশ্রয়ে কবিতাটির আবির্ভাব হয়। "আজ এই বক্তৃতাসভায় আসব ব'লে যখন প্রস্তুত হচ্চি তখন শুনতে পেলুম আমাদের পাড়ার গলিতে শানাই বাজছে। কী জানি কোন বাড়িতে বিবাহ। খাম্বাজের করুণ তান শহরের আকাশে আঁচল বিছিয়ে ছিল।"

তাই আজ উৎসবের ভোরবেলা হতে
বাষ্পাকুল অরুণের করুণ আলোতে
উল্লাস-কল্লোলতলে ভৈরবী রাগিণী কেঁদে বাজে
মিলন-সুখের বক্ষোমাঝে।— পূরবী।

ইহার পর কয়েকটি কবিতা (গানের সাজি, লীলাসঙ্গিনী, বৈঠিক পথের পথিক, বকুল-বনের পাখি) সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে রচিত, এবং সকলগুলির মধ্যে সেই পুরাতন জীবনদেবতার দর্শন ও স্পর্শনের জন্য আকুল মনের আভাস। 'গানের সাজি'র মধ্যে আছে কাহার স্মৃতিঢালা আকুল চাহনি। জীবনদেবতা না মানসসুন্দরী? কত নামে আহ্বান! আজ তাহাকে স্মরণ হইতেছে লীলাসঙ্গিনীরূপে। উৎসবের দিনের বাঁশি কবির মনে কি কোনো

পুরাতন স্মৃতি উদ্রেক করিল? কাব্যলক্ষ্মী বহুকাল কর্মজালে তাঁহাকে ফেলিয়া অন্তর্হিতা ছিলেন— এতদিন পরে পুরাতন বন্ধুকে পড়িল কি মনে?

কবে, নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা, ছিলে লীলাসঙ্গিনী?
কাজ ফেলে মোরে চলে গেলে কোন্ দূরে,
মনে পড়ে গেল আজি বুঝি বন্ধুরে?
ডাকিলে আবার কবেকার চেনা সুরে— বাজাইলে কিঙ্কিণী।
বিস্মরণের গোধূলিক্ষণের আলোতে তোমারে চিনি।

তাই প্রশ্ন—

আবার সাজাতে হবে আভরণে মানসপ্রতিমাগুলি? · ·
দেখো না কি, হায়, বেলা চলে যায়— সারা হয়ে এল দিন।
বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর বীন।
একদিন হেথা ছিনু আমি পরবাসী,
হারায়ে ফেলেছি সেদিনের সেই বাঁশি,
আজ সন্ধ্যায় প্রাণ ওঠে নিঃশ্বাসি
গানহারা উদাসীন।
কেন অবেলায় ডেকেছ খেলায়,
সারা হয়ে এল দিন।

আজ তাই কবি জীবনদেবতা, লীলাসঙ্গিনী, বিচিত্ররূপিনীকে তাঁর ‘শেষ অর্ঘ্য’ নিবেদন করিতেছেন—

যে-তারা মহেন্দ্রক্ষণে প্রত্যূষবেলায়
প্রথম শুনাল মোরে নিশান্তের বাণী
শান্ত মুখে · ·
এ-সন্ধ্যার অন্ধকারে চলিনু খুঁজিতে,
সঞ্চিত অশ্রুর অর্ঘ্যে তাহারে পূজিতে।[১]

এ কোন্ তারা— যাহাকে একদিন ‘জীবনের ধ্রুবতারা’ বলিয়া আহ্বান করিয়াছিলেন— এ কি সেই তারার স্মৃতি। ‘বিস্মরণের গোধূলিক্ষণে’ আজ ‘স্মৃতি ডালা’ কি খুলিয়া গেল? সেই ‘ছবি’, সেই পুরাতনী? ‘বকুল-বনের পাখি’র উদ্দেশে বলিতেছেন—

বালক ছিলাম, কিছু নয় তার বাড়া,
রবির আলোর কোলেতে ছিলেম ছাড়া,
চাঁপার গন্ধ বাতাসের প্রাণ-কাড়া
যেত মোরে ডাকি ডাকি।

১ তু. পূরবীর ‘ক্ষণিকা’ ও ‘তারা’ কবিতাদ্বয়।

সহজরসের ঝরনা-ধারার 'পরে
গান ভাসাতেম সহজ সুখের ভরে।[১]

আজ অন্তর হইতে বেদনাকাতর প্রার্থনা—'মুক্তির টিকা ললাটে দাও তো আঁকি' আর 'যাই যবে যেন কিছুই না যাই রাখি।'

'বলাকা' (১৯১৬) কাব্যর পরে যথার্থ লিরিক কবিতার দেখা পাইলাম 'পূরবী'র এই আগমনী কবিতাগুচ্ছে। ইহার পর আরও আসিতেছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা

ফেব্রুয়ারির শেষদিকে কবি কলিকাতায় আসিয়াছেন— সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। সেখানে আসিলেই নানা লোকের নানা চাহিদা মিটাইতে হয়। সেইরূপ একটি আহ্বান আসিল প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে; অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষের মৃত্যু হইয়াছে ১৯২৪ জানুয়ারী ৪। তাঁহার স্মৃতিসভায় কবিকে ভাষণ দিতে হইল। মনোমোহন প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক— শ্রীঅরবিন্দের জ্যেষ্ঠ সহোদর। ইংরেজিসাহিত্যে অসাধারণ দখল ছিল এবং ইংরেজি কবিতা লিখিয়া সেযুগে যশ অর্জন করেন। রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল বলিয়াই যে তিনি এই ভাষণদানের আহ্বান গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নহে, সাহিত্যরসিক বলিয়া কবি তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন।[২]

রবীন্দ্রনাথ মনোমোহন সম্বন্ধে বলেন—

"মনোমোহন, অরবিন্দ ও ভাইদের সকলকে নিয়ে তাঁদের মা যখন ইংলণ্ডে পৌঁছলেন, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলুম। শিশুবয়সেই তাঁদের আমি দেখেছি। ইংলণ্ডে দুঃসহ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতিত্ব লাভ করেছেন।··· মনোমোহন যখন দেশে ফিরে এলেন তখন তাঁর সঙ্গে পুনরায় পরিচয় হয়— সে পরিচয় আমার কাব্যসূত্রে।···তিনি সুদীর্ঘকাল ··· ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করেছেন।··· মনোমোহন তাঁর অসাধারণ কবিত্ব ও কল্পনাশক্তির প্রভাবে সাহিত্যের নিগূঢ় মর্ম ও রসের ভাণ্ডারে ছাত্রদের চিত্তকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। যে শক্তি নিয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে শক্তি ছিল গান গাবার জন্যে। অধ্যাপনার মধ্যে যে তিনি আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন তাতে নিঃসন্দেহে তাঁর গভীর ক্ষতি হয়েছিল। আমি যখন ঢাকায় কন্‌ফারেন্সে গিয়েছিলুম তখন তাঁর নিজের মুখে এ কথা শুনেছি। অধ্যাপনা যদি সত্যসত্যই এমন হত যে ছাত্রদের চিত্তের সঙ্গে অধ্যাপকের চিত্তের যথার্থ আনন্দবিনিময় হতে পারে তবে অধ্যাপনায় ক্লান্তি বোধ হত না।··· এই কবি বিধাতা যাঁর হাতে বাঁশি দিয়ে পাঠিয়েছিলেন— তিনি যখন অধ্যাপনার কাজে বদ্ধ হলেন তখন তা তাকে কোনো সাহায্য করে নি। আমি তাঁর সেই বেদনা অনুভব করেছি।" কবি তাঁহার এই নাতিদীর্ঘ ভাষণে মনোমোহনের ইংরেজি কাব্যপ্রতিভা, তাঁহার নির্লিপ্ত নিঃসঙ্গ জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলেন "কবি মনোমোহনের কাব্যের যখন প্রকাশ হবে তখন সমস্ত পাশ্চাত্য দেশের কাছে বাংলাদেশের আলোক কি উজ্জ্বল হবে না? ··· এই কবি মনোমোহন নিগূঢ় নিকেতন থেকে যা বের করেছেন তা আজো ঢাকা রয়েছে। এ যখন প্রকাশ পাবে তখন বাংলা দেশের একটি মহিমা সর্বত্র প্রকাশিত হবে।"

১ তু. মুক্তপাখির প্রতি, বঙ্গদর্শন ১৩০৯। উৎসর্গ ৩১ নং।

২ প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিন, ১৯২৪ মার্চ, পৃ. ৩০৭-০৮।

কোথায় প্রেসিডেন্সি কলেজে সাহিত্যিক-অধ্যাপকের স্মৃতিতর্পণ—আর আলফ্রেড থিয়েটর হলে অ্যান্টি-ম্যালেরিয়া সোসাইটির সভায় ভাষণ (২৪ ফেব্রুয়ারি)। বর্তমানে ম্যালেরিয়া দূরীকরণের জন্য যে চেষ্টা দেখা যায়—চল্লিশ বৎসর পূর্বে সেটা অবজ্ঞাত ছিল; ব্রিটিশ সরকার এই কালব্যাধি নিরাকৃত করিবার জন্য কোনো আন্তরিক প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হয় নাই। ১৯২১ সালে কলিকাতার ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'অ্যান্টি-ম্যালেরিয়া সোসাইটি' করিয়া বাংলাদেশে ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করেন। গবর্মেণ্ট কুইনাইনটা সস্তায় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত।

রবীন্দ্রনাথ বহু কাল বাংলাদেশের গ্রামের মধ্যে কাজ করিতেছেন, দুই বৎসর পূর্বে সুরুলে পল্লীসংস্কারে অবতীর্ণ হইয়া এই ব্যাধির করালরূপ দেখিতেছেন। কবি জানেন যাহারা ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া মরে, তাহাদের সংখ্যা নগণ্য নহে; কিন্তু যাহারা ভুগিয়া-ভুগিয়া অর্ধমৃত অবস্থায় থাকে, যাহাদের প্রাণশক্তি কর্মশক্তি প্রতিদিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর ও জীবিকার পন্থা সংকীর্ণতর হইতেছে—তাহাদের সমস্যা বড়ই কঠিন। রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, যদিও ম্যালেরিয়া নিবারণ এই সমিতির উদ্দেশ্য, তথাচ জীবনের অন্য সকল অবস্থা ও ব্যবস্থা হইতে উহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যাইবে না। মানুষের মধ্যে যে অনন্ত শক্তি নিহিত আছে তাহাকে উদ্‌বুদ্ধ করিতে পারিলে সব দুঃখ তাপ একসঙ্গে দূর হয়। তিনি বলিলেন একটি জাতির নবজন্মে সর্বলোকের শ্রেষ্ঠ সম্পদের অর্ঘ্য চাই। "কেহ কবি হতে পারে, কেহ ডাক্তার হতে পারে, কেহ ইঞ্জিনীয়ার হতে পারে, যার যে রকম শক্তি, যার যে রকম শিক্ষা, সকল রকম চিত্তবৃত্তির সকল রকম শক্তির দরকার।" বহুধা শক্তি, বৃহৎ শক্তিকে আমাদের সমাজের ভিতর, নিজের ভিতর যদি স্বীকার করেই তবেই জাতির অনন্ত শক্তির উদ্বোধন হইবে, একটা ছোটো কাজ করিয়া একটা ছোটো কথা বলিয়া কিছু হইবে না।[১]

এবার কবি কলিকাতায় আসিলে সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে কবির বহুদিন প্রতিশ্রুত বক্তৃতার অন্তত একটিও এইবার দিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। কবি সার্ আশুতোষকে জানাইলেন যে প্রবন্ধ লিখিয়া সভায় পাঠ করিবার সময় তাঁহার নাই, মৌখিক ভাষণ শুনিতে কর্তৃপক্ষের যদি আপত্তি না থাকে, তবে তিনি তদ্রূপ করিতে প্রস্তুত। সার্ আশুতোষ রাজি হইলে কবি সাহিত্য সম্বন্ধে তিনটি ভাষণ[২] দান করিলেন (১ মার্চ - ৩ মার্চ ১৯২৪ ॥ ১৮ - ২০ ফাল্গুন ১৩৩০)। এ সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন "আশু মুখুজ্জে মশায় বললেন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করতে হবে। তখন তো ভয়ে ভয়ে বললেম আচ্ছা। তারপর যখন জিজ্ঞাসা করলেন, বিষয়টা কী, তখন চোখ বুজে বলে দিলেম, সাহিত্যসম্বন্ধে। সাহিত্যসম্বন্ধে কী-যে বলব আগে-ভাগে তা জানবার শক্তিই ছিল না। একটা অন্ধ ভরসা ছিল যে, বলতে বলতেই বিষয় গড়ে উঠবে। তিন দিন ধরে বকেছিলেম। শুনেছি অনেক অধ্যাপকের পছন্দ হল না। বিষয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা রাখতে পারিনি।

১ ম্যালেরিয়া [অ্যান্টিম্যালেরিয়া কো-অপারেটিভ সোসাইটির ৪র্থ বার্ষিক সভায় সভাপতিরূপে প্রদত্ত ভাষণ— এলফ্রেড থিয়েটর হল। ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪]। বঙ্গবাণী, ৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ১৩৩১ জ্যৈষ্ঠ. পৃ. ৩৯০-৪০৪।

২ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে কবি সাহিত্যসম্বন্ধে যে তিনটি ভাষণ দেন; তার প্রথম দুইটির অনুলিপি 'পরিচারিকা'য় ও তৃতীয়টি 'পল্লীশ্রী' পত্রিকায় (১৩৩১ বৈশাখ) প্রকাশিত হয়। সম্ভবত উক্ত অনুলিখনগুলি (তারানাথ রায় কৃত) কবির বিবেচনায় যথাযথ হয় নাই; তাই তিনি বঙ্গবাণীর জন্য পুনরায় সেগুলি লিখিয়া দেন। দ্র. 'সাহিত্য'— বঙ্গবাণী, ৩য় বর্ষ ১৩৩১ বৈশাখ, পৃ. ৩০৩-১২। 'তথ্য ও সত্য'— বঙ্গবাণী, ৪র্থ বর্ষ ১৩৩১ ভাদ্র, পৃ. ১-১০। 'সৃষ্টি', বঙ্গবাণী ৪র্থ বর্ষ ১৩৩১ কার্তিক, পৃ. ৬৫-৭২। দ্র. সাহিত্যের পথে (নূতন সংস্করণ ১৩৬৫)। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩, গ্রন্থপরিচয় অংশ।

তাঁদের দোষ নেই, সভাস্থলে যখন এসে দাঁড়ালেম তখন মনের মধ্যে বিষয় বলে কোনো বালাই ছিল না। বিষয় নিয়ে যাঁদের প্রতিদিনের কারবার বিষয়হীনের অকিঞ্চনতা তাঁদের কাছে ফস্ করে ধরা পড়ে গেল।"[১]

রবীন্দ্রনাথের প্রদত্ত এই ভাষণত্রয় বিশ বৎসর পূর্বে জাতীয় শিক্ষাপরিষদে প্রদত্ত বক্তৃতা চতুষ্টয়ের ন্যায় বিশিষ্ট রচনারূপে গণ্য হইবে। সেবার তাঁহার ভাষণের যথার্থ বিষয়বস্তু ছিল Philosophy of Literature আলোচনার বিষয় ছিল বিশ্বসাহিত্য (বা Comparative Literature), সৌন্দর্যবোধ (Aesthetics), সৌন্দর্য ও সাহিত্য এবং সাহিত্যসৃষ্টি। এবারকার ভাষণের নামগুলি দেখিলে মনে হইতে পারে বিষয়গুলি একই। কিন্তু এবার Art-এর জোর পড়িয়াছে ; তবে সে art-এর অর্থ বহুব্যাপক। Personality (১৯১৭) নামে ইংরেজি বক্তৃতামালার মধ্যে কবি What is Art প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন Art is expression...art is life, life art। এই প্রকাশতত্ত্বই হইতেছে এবারকার বক্তৃতামালার অন্তর্নিহিত বাণী— ত্রিশ বৎসরের ব্যবধানে জীবনের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি ব্যাপক ও গভীর হইয়াছে। আমি আছি (সত্যম্), আমি জানি (জ্ঞানম্), আমি প্রকাশ করি (অনন্তম্)— এই তিনটি হইতেছে মানবাত্মার চরমরূপ বা তাহার পরম বাণী। আর ইহার মূলে আছে অন্তরের অহেতুকী আনন্দ ; এই আনন্দকে বাহিরে প্রত্যক্ষগোচর করার দ্বারা তাহাকে পর্যাপ্তি দান করার নাম দিয়াছেন লীলা ; এই লীলা হইতেছে রূপসৃষ্টি করিবার বৃত্তি, প্রয়োজন সাধনের বৃত্তি নয়।

রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের মূলকথা এই লীলা বা খেলা ; Life is real, life is earnest কথাটা আপাতদৃষ্টিতে যতই সত্য মনে হউক, অন্তরের গভীরস্থলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে সমস্তই একটা বিরাট খেলা, একটা উপহাসের মতোই মনে হয় ; এই লীলাবাদ সম্পূর্ণ হিন্দুভারতের অবদান।[২]

চীনের আহ্বান

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণদানের পরেই কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন— অচিরে চীন যাত্রা করিবেন তাহারই আয়োজনের জন্য।

চীনযাত্রার ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার। জাগ্রত চীন পূর্ব-পশ্চিমের মনীষীদের কথা এখন জানিবার জন্য উৎসুক। পেকিঙের বক্তৃতা সমিতি (Lecture Association) হইতে বক্তৃতা দিবার নিমন্ত্রণ কবি পান ১৯২৩ সালের গোড়ার দিকে। এই সমিতির আহ্বানে ইতিপূর্বে আমেরিকা হইতে আসেন জন্ ডিউই ও ব্রিটেন হইতে বার্টারান্ড রাসেল।

রবীন্দ্রনাথের মনে চীনদেশ ভ্রমণের ইচ্ছা বহুকালের ; বাল্যকালে কবি শুনিয়াছিলেন যে তাঁহার পিতা একবার চীনদেশে গিয়াছিলেন। ১৯১৭ সালে আমেরিকা যাত্রাকালে জাপানের পথে হংকং বন্দরে দুইদিন জাহাজ থামে। সেই বন্দরে প্রথমেই চোখে পড়ে চীনা মজুরদের কাজ। কবি সেদিন মুগ্ধ হইয়া যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার প্রতিটি বর্ণ সত্যরূপে দেখা দিয়াছে।

"এমন শরীর কোথাও দেখিনি, এমন কাজও না।· · মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোথাও অনিচ্ছা, অবসাদ বা জড়ত্বের লেশমাত্র দেখা গেল না।· · চীন সুদীর্ঘকাল · · পূর্ণভাবে কাজ করতে শিখেছে ;· · চীনের এই শক্তি আছে

১ ক্রাকোভিয়া জাহাজ (১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৬)। যাত্রী ২য় সংস্করণ, পৃ. ১১২।

২ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, কল্লোলযুগ, পৃ. ১৪৪-৪৫।

বলেই আমেরিকা চীনকে ভয় করছে— কাজের উদ্যমে চীনকে সে জিততে পারে না, গায়ের জোরে তাকে ঠেকিয়ে রাখতে চায়।

"এই এতবড়ো একটা শক্তি যখন · · আধুনিক কালের বাহনকে পাবে, অর্থাৎ যখন বিজ্ঞান তার আয়ত্ত হবে, তখন পৃথিবীতে তাকে বাধা দিতে পারে এমন কোনো শক্তি আছে? তখন তার কর্মের প্রতিভার সঙ্গে তার উপকরণের যোগসাধন হবে। এখন যেসব জাতি পৃথিবীর সম্পদ ভোগ করছে তারা চীনের সেই অভ্যুত্থানকে ভয় করে, সেই দিনকে তারা ঠেকিয়ে রাখতে চায়।"[১]

চীনাদের আপনদেশে রবীন্দ্রনাথ চীনাদের এই প্রথম দেখিলেন। কিন্তু কবির বিশ বৎসর বয়সে 'চীনে মরণের ব্যবসায়' (ভারতী ৫ম খণ্ড, ১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ) প্রবন্ধে এই জাতির প্রতি তাঁহার প্রথম সহানুভূতি প্রকাশ পায়। অতঃপর প্রথম মহাযুদ্ধকালে ১৯১৬ সালে জাপানে গিয়া জাপানীদের হাতে চীনের লাঞ্ছনা দেখিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে যে প্রবন্ধ লেখেন (দ্র. ন্যাশানালিজম্) তাহার আলোচনা আমরা পূর্বে করিয়াছি। ১৯২১ সালে বিশ্বভারতীর প্রথম বিদেশী অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি শান্তিনিকেতনে চীনা ও তিব্বতী ভাষার চর্চাকেন্দ্র স্থাপন করিয়া যান। ভারতীয় বৌদ্ধশাস্ত্রের অমূল্য সম্পদ ঐ দুই দেশের ভাষায় অনূদিত হইয়া এখনো রহিয়াছে। ভারতের কয়েক সহস্র সংস্কৃত গ্রন্থ— যাহা ভারতে প্রায় অজ্ঞাত ও লুপ্ত— তাহা চীনা ও তিব্বতী অনুবাদে পাওয়া যায়— এই সংবাদ জানিতে পারিয়া কীভাবে সেসবের পুনরুদ্ধার করা যায় তাহার কথা গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন।

এমন সময়ে চীন হইতে কবির আহ্বান আসিল। কবির ইচ্ছা তিনি বিশ্বভারতীর প্রতিনিধিরূপে সেদেশে গমন করেন— ব্যক্তিগত পরিচয়ে নহে। বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ সানন্দে তাহা অনুমোদন করিলেন।

ভারতের দানবীর যুগলকিশোর বিড়লা কবির চীনভ্রমণের পরিকল্পনার কথা জানিতে পারিয়া কবির সহিত কলিকাতায় সাক্ষাৎ করেন (১৯২৩ অক্টোবর)। কবিকে তিনি বলেন যে ভারতের তরফ হইতে কয়েকজন জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গী হইলে তিনি তাঁহাদের ব্যয়ভার বহন করিতে প্রস্তুত। তজ্জন্য যুগলকিশোর এগার হাজার টাকা এককালীন দান করিলেন। স্থির হইল বিশ্বভারতীর পক্ষ হইতে ক্ষিতিমোহন সেন ও নন্দলাল বসু কবির সহিত যাইবেন। আরও স্থির হইল চীন-সফরে এলমহার্স্ট কবির সেক্রেটারির কাজ করিবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডক্টর কালিদাস নাগকে তাঁহাদের প্রতিনিধিরূপে কবির সঙ্গে দিলেন। এছাড়া শ্রীনিকেতনের মহিলা কর্মী মিস্ গ্রীণ ইঁহাদের সঙ্গী হইলেন, তিনি দেশে ফিরিবেন এই পথে।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি কবি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়া শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া যান। চীনযাত্রার পূর্বে মন্দিরে উপাসনাকালে কবি বলেন (১৮ মার্চ ১৯২৪). "দেশের গণ্ডির মধ্যে আশ্রমের পরিচয় যতই মনোরম হোক, তার যথার্থ যে বড়ো চেহারা, তার ভিতরকার বড়ো শক্তির পরিচয় নেই। যদি শান্তিনিকেতনের দূত হয়ে ভারতবর্ষের বাইরে এখানকার বাণী বহন করে যেতে পারি, যদি কোনো বিশ্ববাণীকে অন্তরে বহন করে আনতে পারি, তবে আশ্রমের বড়ো পরিচয়টি পাব।"

সেইদিন সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতন-অধিবাসীদের তরফ হইতে অনুষ্ঠিত বিদায়সভায় বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ বিধুশেখর ভট্টাচার্য স্বরচিত দুইটি সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করেন— একটি কবির উদ্দেশে, অপরটি চীনাবাসীদের সম্বোধন করিয়া।[২]

১ জাপানযাত্রী ; জাপানে-পারস্যে, পৃ. ৫৬।

২ মন্দির (৫ চৈত্র ১৩৩০), শান্তিনিকেতন পত্রিকা ৫ম বর্ষ, ১৩৩১ ভাদ্র, পৃ. ১৩৮।

চীনের পথে

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে বিশ্বভারতী সম্মিলনীর পক্ষ হইতে আলিপুর বীক্ষণাগারের বিরাট উদ্যানে কবি-সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ; প্রশান্তচন্দ্র তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক এবং সেই পদাধিকারে মেটেরোলজিক্যাল বিভাগের অধ্যক্ষ, তিনি বিশ্বভারতীরও কর্মসচিব। এই সভায় পাঁচশতের উপর নরনারী নিমন্ত্রিত হন।

কলিকাতা বন্দর হইতে পূর্বসাগরগামী 'ইথিওপিয়া' জাহাজ ছাড়িল ৮ চৈত্র ১৩৩০ (২১ মার্চ ১৯২৪)।

২৪ মার্চ জাহাজ বর্মার রাজধানী ও বন্দর রেঙ্গুন পৌঁছিল। আট বৎসর পূর্বে ১৯১৬ সালের মে মাসে জাপান-আমেরিকাসফরের পথে এখানে কয়দিন ছিলেন। এবারও বন্দরে পৌঁছিয়া দেখেন বেশ ভিড় ; ভারতীয় হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীষ্টান ছাড়া বর্মী এবং চীনারাও জনতার মধ্যে আছে। ঘাটেই ধনপতি জনাব জে. এ. কে. জমাল কবিকে স্বাগত করিয়া বিগেনডেন্ট স্ট্রীটের একটি সুসজ্জিত গৃহে লইয়া গেলেন। সেইদিন বর্মার গভর্নর (বর্মা তখন ব্রিটিশভারত-সাম্রাজ্য অন্তর্গত প্রদেশ) সার্ হারকোর্ট বাটলার-এর সহিত মধ্যাহ্নভোজন ও সন্ধ্যায় জুবিলি হলে কবি-সম্বর্ধনা। সভার সভাপতি বর্মা ব্যবস্থাপকসভার সদস্য উ. তোক্‌কিয়ি। নাগরিকদের পক্ষ হইতে যে মানপত্র পঠিত হয়— সংক্ষিপ্ত হইলেও কবিজীবনের মূল সুরটি উহাতে বিবৃত হয়।[১]

রবীন্দ্রনাথ এই অভিনন্দনের দীর্ঘ প্রতিভাষণ দেন ; তিনি বলেন, পৃথিবীতে প্রত্যেক বড়ো জাতি এমনকিছু দান করিয়াছে যাহা বিশ্বমানবের সম্পদ হইয়া আছে। ভারত পূর্বকালে অন্যদের সহিত যেসম্বন্ধ সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা ব্যবসায়ের পণ্যবিনিময় অথবা রাজ-শক্তিপ্রসারের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই ; জাতির কোনো মহৎ কল্যাণ আদর্শের উপর উহার প্রতিষ্ঠা ছিল। সকলেই জানি যে ভারতের গৌরবময় অতীতে ভারতের দূতেরা মরুপর্বত পার হইয়া পৃথিবীর দূর দূর দেশে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা ভারতের শ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রচার করিয়া সর্বত্র জানাইয়া দেয় যে তাহারা এমন কিছু আনিয়াছে, যাহা তাহাদিগকে চিরকালের মতো আত্মীয়তাসূত্রে বাঁধিবে। মৈত্রীর আদর্শই জগৎ-ইতিহাসে হিন্দু-ভারতের শ্রেষ্ঠ দান। "She was known and would be known to all the world for all time by her immortal thoughts and her love of humanity"[২]।

পরদিন (২৫ মার্চ) সন্ধ্যায় সুনাইরাম হলে রেঙ্গুনপ্রবাসী বাঙালিদের সাহিত্যসম্মেলনের পক্ষ হইতে কবি-সম্বর্ধনা ; রেঙ্গুন-মেল নামক দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়[৩] সভাপতি। জনাব মোয়াজ্জেম আলী অভিনন্দন পাঠ করেন। এই অভিনন্দনপত্র রচনা ও সম্বর্ধনার অন্তরালে ছিলেন স্থানীয় বেঙ্গল আকাদামি নামে

১ Visva-Bharati Bulletin No. 1, Part 1, 1924, pp. 6-7।

২ চীন তিব্বত ও মধ্যএশিয়ায় যেসব বৌদ্ধভিক্ষু ও শ্রমণরা সদ্ধর্ম প্রচারের জন্য গিয়াছিলেন— তাহাদের মধ্যে আদর্শবাদ ছিল। কিন্তু বৃহত্তর ভারতে বা পূর্ব দ্বীপাবলিতে হিন্দুদের বাণিজ্য উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য গঠন যুগপৎ চলে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় হিন্দু উপনিবেশীদের মধ্যে রাজ্য লইয়া যুদ্ধ কিছু কম হয় নাই। জনতাও যে কীভাবে শোষিত হইয়াছিল তাহার ইতিহাস অজ্ঞাত থাকিলেও বিশাল স্থাপত্যাদি হিন্দু রাজাদের বৈদান্তিক দৃষ্টির পরিচায়ক নহে। আমাদের মনে হয় কবির মনে চীনের কথাই জাগিতেছিল ; বৃহত্তর ভারতের আভ্যন্তরীণ ইতিহাস ভালরূপে জানিলে তিনি হিন্দুভারতের আদর্শতা সম্বন্ধে এই ভাবালুতার কথা বলিতেন না।

৩ নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়— ইনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন, অসহযোগ আন্দোলনের সময় সরকারী চাকুরী ছাড়িয়া আন্দোলনে যোগ দেন। পরে রেঙ্গুন গিয়া রেঙ্গুন মেল্-এর সম্পাদক হন। ইনি বহুবার শান্তিনিকেতনে আসিয়াছিলেন।

বাঙালিদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোহিতকুমার মুখোপাধ্যায় ও সাহিত্যিক সুধীরচন্দ্র চৌধুরী। ইঁহাদের চেষ্টায় বর্মী-নৃত্যের ব্যবস্থা হয়।[১]

রেঙ্গুনের চীনাসমাজ শিক্ষায় শিল্পে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে; তাহাদেরও নিজস্ব বিদ্যালয় আছে; ২৬ মার্চ কেমেনডাইন পল্লীস্থিত চীনা বিদ্যালয়ে কবি-সম্বর্ধনা হইল। ইহার উদ্যোক্তা ছিলেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মিঃ লিন ওয়াঙ চিয়াংগ (Dr. Lin Wong Chiang)।[২] চীনাদের সহিত কবির প্রথম পরিচয় ঘটিল রেঙ্গুনে।

কবি ও তাঁহার সঙ্গীদের তিন দিন রেঙ্গুনে কাটিল। ২৭ মার্চ জাহাজ বর্মাবন্দর ছাড়িয়া ৩০ মার্চ প্রাতে মালয় উপদ্বীপের বন্দর পেনাঙ পৌঁছিল; সেই রাত্রেই জাহাজ ছাড়িবার কথা। কিন্তু ইতিমধ্যে কবির আগমনবার্তা হ্যাণ্ডবিল দ্বারা শহরে ও শহরতলীতে বিতরণ করা হইয়াছিল। জাহাজ বন্দরে পৌঁছাইলে দেখা গেল বিরাট জনতা প্রতীক্ষমান। শোভাযাত্রা ও বাদ্যসহকারে সেই জনসমুদ্র কবিকে লইয়া স্থানীয় অ্যাডভোকেট শ্রী পি. কে. নাম্বায়ারের গৃহে উপস্থিত হইল। অতঃপর মোটরগাড়ি করিয়া কবি শহরের উপর চোখ বুলাইয়া আসিলেন। নাম্বায়ারের গৃহ হইতে কন্যা মীরা দেবীকে এক পত্রে লিখিতেছেন— "চীনের জন্যে দু'টা লেকচার লিখতে হবে— তার মধ্যে দুটো লিখে ফেলেচি। জাহাজের ক্যাবিনের কোণে বিছানার উপর বসে লেখা কি কম কথা! বিশেষত অপরাহ্নের রৌদ্রে যখন ক্যাবিনের কাঠের দেয়াল তেতে উঠে দেহটাকে পাঁউরুটি সেঁকা করে তুলতে চায়। যাই হোক, চীনে যাবার পূর্বে আশা করি লেকচারগুলো চুকিয়ে দিতে পারব।"[৩]

পরদিন (৩১) মার্চ জাহাজ ভিড়িল মালয় উপদ্বীপের অন্যতম বন্দর সুইটেনহাম (Port Swettenham)। সেখান হইতে ২৭ মাইল দূরে রাজ্যের প্রধান নগর কুয়ালালুম্‌পুর। মালয়ের পথঘাট অতি সুন্দর, প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। কুয়ালালুম্‌পুরে কয়েক ঘণ্টার জন্য ডাক্তার পরেশনাথ সেনের[৪] গৃহে আতিথ্যগ্রহণ করিয়া সেইদিনই বন্দরে ফিরিয়া আসিতে হয়। জাহাজ এবার চলিয়াছে সিঙাপুর।

মালয় আজ প্রায় স্বাধীন দেশ; কিন্তু তখন ব্রিটিশ টিনখনির মালিক ও রবার-বাগিচাওয়ালাদের মুষ্টিমধ্যে তাহারা পিষ্ট হইতেছে। শিক্ষার দুর্ভিক্ষ সবথেকে বেশি করিয়া সকলের চোখে ঠেকে। এতোবড়ো দেশে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নাই— তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করিলেন যে, সে-দেশে সাধারণের মধ্যে দারিদ্র্য নাই। ধনের প্রাচুর্য যথেষ্ট, তবে সেটা কেন্দ্রিত হইয়াছে ব্রিটিশ চীনা ভারতীয় টিনখনি ও রবারবাগানের মালিকদের হাতে— কারণ মূলধন তাহাদেরই। মালয়রা শ্রমিকমাত্র, উঞ্ছবৃত্তির দ্বারা যাহা পায় তাহাতেই আপাতদৃষ্টিতে তাহারা খুশি।

১ রেঙ্গুন বাঙলা সাহিত্যসম্মিলনীতে কবির সম্বর্ধনা উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ— বঙ্গবাণী ১৩৩১ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ৫১৪-১৬। কবির সহযাত্রী ডঃ কালিদাস নাগ রেঙ্গুন হইতে রথীন্দ্রনাথকে এক পত্র লেখেন— Mr. Mahit Kumar Mukherji, Headmaster of Bengal Academy and Sudhir Chandra Chowdhury the noted Bengali Poet, personally attended to the Poet and his Party.— *Tagore and China*, Edited by Dr. Kalidas Nag, Editor Pranabesh Chandra Sinha. p. 86। মোহিতকুমার জীবনীলেখকের জ্যেষ্ঠ সহোদর ও সীতানাথ তত্ত্বভূষণের জামাতা; সুধীরচন্দ্র, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জামাতা, সুলেখিকা সীতা দেবীর স্বামী। ইঁহারা ব্রাহ্ম-সমাজের লোক।

২ ডক্টর লিন্‌ ১৯২৫ সালে শান্তিনিকেতনে চীনাভাষার অধ্যাপক রূপে আসেন ও কয়েক বৎসর থাকেন। ইনি প্রথম চীনা অধ্যাপক। ১৯৪৮ জুন ২৩ তিনি একবার শান্তিনিকেতনে আসেন; তখন তিনি নানকিঙে সরকারী কাজ করেন।

৩ চিঠিপত্র ৩; পৃ. ৩৮।

৪ ডাক্তার পরেশনাথ সেনের কন্যারা শান্তিনিকেতনে কিছুকাল পড়িবার জন্য আসিয়াছিল।

তাহাদের হিতের জন্য কাহারও কোনো শিরঃপীড়ার লক্ষণ নাই। কবির সহযাত্রী এলমহার্স্ট লিখিতেছেন— There is, I believe, a political consciousness, but it has hardly begun to take an aggressive form. ইহা লিখিত হয় ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে; বহু বৎসর পরে সেই মালয়ে কী ভীষণ আন্দোলন আসিয়াছিল তাহা সর্বজনবিদিত।

সুইটেনহাম বন্দর হইতে জাহাজ গিয়া থামিল সিঙাপুরে— ইথিওপিয়া জাহাজের গন্তব্য এই পর্যন্ত। ৭ এপ্রিল সিঙাপুরে জাপানী 'আতসুতা মারু'তে উঠিয়া ১০ই কবি সদলে হংকঙে পৌঁছিলেন।

চীনদেশে

পেকিঙের পথে

এবার জাহাজের গন্তব্যস্থল হংকঙ বন্দর— চীনদেশের দক্ষিণে কান্‌টন নদীর মুখে অবস্থিত দ্বীপ; ইহা ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যভুক্ত কলোনী। ১৮৩৯ সাল হইতে তাহাদের দখলে আছে। এই বন্দর-নগরটি ব্রিটিশেরই সৃষ্টি, তাহাদেরই বাণিজ্যকেন্দ্র। ব্যবসায় ও চাকুরীর খাতিরে কিছু ভারতীয় সেখানে জুটিয়াছে; খাসবাসিন্দারা চীনা। শাসক ও শোষকগোষ্ঠী ইংরেজ।

কবি যখন হংকঙে উপস্থিত হইলেন তখন সেখানকার নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্যরূপে অধিষ্ঠিত আছেন মিঃ হর্নেল[১]; হর্নেল বহু বৎসর বাংলাসরকারের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর (১৯১৩-১৯২৪) ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা কবি ও কবিসঙ্গীগণ তাঁহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। কিন্তু পূর্বাহ্নের ব্যবস্থামতে তাঁহারা সুরতী ধনিক ও বণিক নেমাজীর বাড়িতেই উঠিলেন।

রবীন্দ্রনাথ হংকঙ আসিতেছেন— এই সংবাদ কান্‌টনে পাইলেন সান-ইয়াৎ সন। তাঁহার নিকট হইতে দূত আসিল পত্র লইয়া; তিনি কবিকে কান্‌টনে আহ্বান করিয়াছেন। পত্রখানি (৭ এপ্রিল ১৯২৪) Republic of China Government, Head Quarters, Canton হইতে লিখিত। পত্রখানি উদ্ধৃত হইল— Dear Mr. Tagore, I should greatly wish to have the privilege of personally welcoming you on your arrival in China. It is an ancient way to show honour to the scholar. But in you I shall greet not only a writer who has added lustre to Indian letters, but a rare worker in those fields of endeavour wherein lie the seeds of man's future welfare and spiritual triumphs.

May I then have the pleasure of inviting you to Canton.।

সান-ইয়াৎ সনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করা সম্ভব হইল না, সময়ের অজুহাতে। তবে দূতকে বলা হইল যে ফিরিবার পথে তিনি কান্‌টন যাইবেন। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি কবি রাখিতে পারেন নাই।

হংকঙ হইতে একশত মাইলের মধ্যে অবস্থিত কান্‌টন মহানগরীতে প্রাচ্যের অন্যতম মহামানবের আহ্বানে রবীন্দ্রনাথ সাড়া দিতে পারিলেন না— ইহা সময়ের অজুহাত হইতে পারেনা তাহা কবির চীনসফর হইতে বুঝা যাইবে।

১ W. W. Hornell 1878-1950. Indian Educational Service [I. E. S.]; Knighted 1930; Director of Public Instruction, Bengal 1913-24; First Vice-Chancellor of the Hongkong University 1924.

কবির সঙ্গীরা ও হংকঙের হিতাকাঙ্ক্ষীরা বোধ হয় কবিকে বুঝাইলেন যে তিনি পেকিঙবাসীদের নিমন্ত্রণে উত্তর-চীনে যাইতেছেন ; কান্টনে যে রিপাবলিক চীনাসরকার গঠিত হইয়াছে, তাহা পেকিঙসরকার কর্তৃক স্বীকৃত নহে, উহা চীনের বিকল্প গবর্মেণ্ট। মোটামুটিভাবে কবি বুঝিলেন বা তাঁহাকে বুঝানো হইল যে উত্তর-চীন ও দক্ষিণ-চীনে সদ্‌ভাব নাই— কান্টনের রিপাবলিকসরকার পেকিঙসরকারের বিরুদ্ধে গঠিত ; এক্ষেত্রে তাঁহাকে পাশ-কাটাইয়া যাওয়াই উচিত।

বারো বৎসরের উপর চীনারা মাঞ্চু সম্রাটদের দূর করিয়া রিপাবলিকতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে বটে, কিন্তু এখনো তাহা একরাষ্ট্ররূপ গ্রহণ করিতে পারে নাই। সান-ইয়াৎ সন লোকরাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলেন ; কিন্তু শাসন-সংস্থা পরিচালনার শক্তি ও অভিজ্ঞতা সান-ইয়াৎ সন-এর ছিল না। তাই রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা স্বভাবতই গিয়া পড়ে সেনাপতি য়ুনশি-কাই-এর উপর। য়ুনশি-কাই জবরদস্ত সমরনেতা— তিনিই ধীরে ধীরে চীনের সর্বময় কর্তা হইয়া নূতন রাজবংশ স্থাপন করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন ; এমন সময়ে মহাকালের আহ্বানে তাঁহাকে যাইতে হইল (১৯১৬)। তাঁহার কঠোর শাসনব্যবস্থার অবসান হওয়ামাত্র প্রাদেশিক তুচুন বা প্রদেশপাল— যাহারা এতকাল প্রায়-স্বাধীনভাবে 'রাজত্ব' করিয়া আসিতেছিল— তাহারা পরস্পরের মধ্যে প্রভুত্ব লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হয়— প্রায় বারো বৎসর এই অন্তর্দ্বন্দ্ব চলিতেছে। এই পর্বে পেকিঙে সাত জন স্থায়ী ও অস্থায়ী প্রেসিডেণ্টের উত্থানপতন হইয়া গিয়াছে। সান-ইয়াৎ সন মাঞ্চু সম্রাটবংশের কবল হইতে দেশ মুক্ত করিয়া স্বার্থান্বেষী তুচুনদের হস্তে জাতির ধনপ্রাণ সমর্পণ করিতে চাহেন নাই। সেইজন্য উত্তরচীনের এই অশান্তিকর পরিবেশের বাহিরে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে দক্ষিণচীনের কান্টন মহানগরীতে বিকল্প শাসনসরকার প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসে রবীন্দ্রনাথ যখন চীনে পৌঁছিলেন, তখন পেকিঙে চীনাসরকারের প্রেসিডেণ্ট ৎসাও-কুন (Tsao-kun)। ইনি ১৯১৬ হইতে ১৯২৩ পর্যন্ত চিহ্‌লীপ্রদেশের তুচুন ছিলেন। এই প্রায়-নিরক্ষর সমর-নায়ক উ-পাই-ফু প্রভৃতি যোদ্ধনেতৃদের সহায়তায় অক্টোবর মাসে প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন। ১৯২৪ নভেম্বর মাস পর্যন্ত তিনি কোনো রকমে তাঁহার পদমর্যাদায় আসীন ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যে-সময়ে চীনে ছিলেন (১৯২৪ এপ্রিল-জুন), সে-সময়টা চীন-ইতিহাসের অপেক্ষাকৃত শান্তিপর্ব। এই সময়ের মধ্যে চীনের সহিত সোবিয়েত রুশ ও জারমেনির রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক নানা প্রকার সন্ধিপত্র সম্পাদিত হয়। কিন্তু চীনের এই শান্তিপর্ব দীর্ঘকাল টিকে নাই, অচিরেই গৃহবিবাদ শুরু হইয়া যায়। অতঃপর সান-ইয়াৎ সন-এর মৃত্যুর (১৯২৫) পর দক্ষিণচীনে কম্যুনিস্টরা ক্রমশই প্রবল হইয়া উঠিতে আরম্ভ করে— সম্পূর্ণ রাষ্ট্রশক্তি হস্তগত হইতে তাহাদের আরও বিশ বৎসর লাগে।

১৯২১ সাল হইতে চীনের একদল যুবকের কানে সোবিয়েত রুশের মার্ক্সীয় মতবাদের কথা আসিয়া পৌঁছায়। মিখাইল বোরোদিন নামে এক রুশ মস্কৌ হইতে চীনে আসিলেন— তাঁহার চেষ্টায় দক্ষিণচীনে ও বিশেষভাবে কান্টনে বামপন্থীদের বিশিষ্ট কেন্দ্র হইয়া উঠে। বোরোদিনের চেষ্টায় কুওমিনটাঙ-এর ভাবধারা সুসংস্কৃত হইল। সান-ইয়াৎ সন-এর কান্টন সরকারে এই বামপন্থীরা বড় আসন লাভ করে।[১]

এইসব সমসাময়িক তথ্যের দৃষ্টিতে আমরা একথা বলিতে পারি— কবি যে হংকঙ হইতে কান্টনে যাইতে পারিলেন না, তাহা সময়াভাবজনিত নহে।

১ সমসাময়িক চীন সম্বন্ধে আধুনিক বহু গ্রন্থ আছে। অধুনা Foreign Language Press, Peking হইতে প্রকাশিত *An Outline History of China* (1958), পৃ. ৩২৫-২৯ দ্রষ্টব্য।

হংকঙ অবস্থানকালে আময় (Amoy) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্‌সেলর ডাঃ লিম বুন কেঙ কবিকে তাঁহাদের নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে লইয়া যাইবার জন্য আসেন। কিন্তু সময়াভাবে তাহাও সম্ভব হইল না। রবীন্দ্রনাথের প্রতি এই অধ্যাপকের কী প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল তাহা তাঁহার 'গোলডেন বুক্‌ অব টেগোর'[১] গ্রন্থের রচনা পাঠ করিলে জানা যায়। মালয় সফরকালে ইঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইবে।

হংকঙে দিন তিন থাকিয়া কবি সদলে শাংহাই রওনা হইলেন। হংকঙের দৈনিক China Mail লিখিল (১০ এপ্রিল), রবীন্দ্রনাথ উত্তরচীনে যাইতেছেন, ইহাতে আমাদের ঔৎসুক্য ও ঈর্ষা হইতেছে; উত্তরচীন ভাগ্যবান। কিন্তু কবির বাণীপ্রচারের উপযুক্ত ক্ষেত্র দক্ষিণচীন। হংকঙবাসীরা আশা করে ফিরতি পথে কবিকে তাহারা তাহাদের মধ্যে পাইবে।[২] দুঃখের বিষয় সে সুযোগ হয় নাই।

এবার স্বাধীনচীনের বন্দর শাংহাই। আতামারু ১২ এপ্রিল শাংহাই-এ ভিড়িল। কবিকে স্বাগত করিতে পেকিঙ হইতে আসিয়াছেন ন্যাশনাল য়ুনিভার্সিটির সাহিত্য-অধ্যাপক সু-ৎসী মো (Hsu-Tse Mu) ও National Institute of Self-Governmentএর ডীন্ S. Y. Ch'a। সু-ৎসী মো আধুনিক যুগের যুবক, ইংলন্‌ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া ছাত্র। ইনি রবীন্দ্রনাথের চীনভ্রমণে দোভাষীরূপে সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন।

পেকিঙ যাত্রার এখনো সাতদিন দেরি— কবি ও তাঁহার সঙ্গীরা শাংহাই-এর বার্লিংটন হোটেলে উঠিলেন।

শাংহাই প্রশান্তমহাসাগর তীরস্থ এশিয়ার বৃহত্তম বন্দর— চীনা ব্যতীত, জাপানী ইংরেজ ও আমেরিকানরা আছে। ভারতীয়দের মধ্যে শিখরা বেশি— তাহারা ব্রিটিশ লিগেশনের রক্ষীরূপে সিপাহীর কাজে নিযুক্ত। শাংহাই বন্দরে প্রায় সকল দেশের জাহাজ আছে— নাই কেবল চীনাদের ও ভারতীয়দের। এমন অবস্থা ছিল এই দুই দেশের ১৯২৪ সালেও। শাংহাই চীনদেশে অবস্থিত হইলেও নগরীর শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য ব্যাংকিং— সবেরই বড়মালিক জাপানী মার্কিন ও ইংরেজ। প্রত্যেক জাতির 'লিগেশন' এলাকায় তারা প্রায় স্বাধীনভাবে বাস করে— বিদেশীদের উপর চীনাসরকারের শাসনহস্ত স্পর্শ করিতে পারে না।

শাংহাই-এ রবীন্দ্রনাথের প্রথম সম্বর্ধনা হইল শিখগুরুদ্বারে (১৩ এপ্রিল)। নারীকণ্ঠে মীরাবাঈ-এর ভজন শুনিয়া কবির খুবই ভালো লাগিল; সভায় কবি যাহা বলিলেন ক্ষিতিমোহন তাহা হিন্দীতে ভাষানুবাদ করিয়া দিলেন।

সেইদিন মি. হার্দুন (S. A. Hardoon) নামে এক ধনী ইহুদীর গৃহে কবির নিমন্ত্রণ হইল। হার্দুন এক ধর্মপ্রাণা চীনাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য ইঁহারা উভয়েই উৎসুক।[৩] তাই অপরাহ্নে

১ Dr. Lim Boon Keng, The Beauty and Value of Tagore Thoughts, *The Golden Book of Tagore* (1931), pp. 124-261 also *Tagore and China*, pp. 89-40।

২ "Only a few have had the privilege of communing with Rabindranath Tagore during his brief stay in Hongkong. ...Tagore goes North on a mission that excites our interest and envy. The North is fortunate, as fortunate as we hope Hongong may be when the return journey has to be made. In no place than Hongong is the doctrine of this poet more worthy of preachment and acceptance."—The China Mail, 10 April 1924। Visva-Bharati Bulletin No. 1, Part II (June 1924)।

৩ অধ্যাপক লেভি মিঃ হার্দুনের বদান্যতার কথা বলেন।—আমি বিশ্বভারতীতে চীনাভাষার চর্চা হইতেছে জানাইয়া একসেট চীনা ত্রিপিটক উপহার দিবার জন্য অনুরোধ-পত্র লিখি। ১৯২১ পৌষউৎসবের সময় বহুখণ্ডে ত্রিপিটক ডাকযোগে পাইয়াছিলাম। পরে তিনি ২৪-বংশের চীনা ইতিহাসও পাঠান।

মি. কারসন চ্যাঙ[১]এর উদ্যানবাটিকায় নগরীর শ্রেষ্ঠ নরনারীদের সহিত কবি পরিচিত হইলেন। মি. কারসন চ্যাঙ সে-সময়ের একজন নামকরা দার্শনিক ও লেখক; রুডলভ অয়কেনের ছাত্র ও সহকর্মী।

তাঁহার উদ্যানবাটিকায় (party) মি. সু-ৎসী মো যুবচীনের পক্ষ হইতে কবিকে অভিনন্দিত করিলে রবীন্দ্রনাথ প্রতিভাষণে বলিলেন, চীন-যে একজন কবিকে তাহাদের দেশে আহ্বান করিয়াছে এই ঘটনাটি খুবই বিস্ময়কর। শতাব্দী ধরিয়া বণিক ও সৈনিক এদেশে আসিয়াছে— কিন্তু কবি কখনো আসে নাই। আজ কবিরই সহায়তার প্রয়োজন— "because at a time of awakening he only proclaims that the winter that...keeps human races within closed doors...are going to open." তিনি বলেন, এশিয়ার ভাবুকচিত্ত যুগে যুগে পৃথিবীকে আর-একটু মধুর করিবার বাণী শুনাইয়াছে; এশিয়া আজও সেই ভাবুকের প্রতীক্ষায় আছে। চীন ও এশিয়ার অপর প্রতিবেশী জাতিসমূহের সহিত ভারতের মৈত্রীপথ উন্মোচন করিবার জন্য তিনি আজ চীনের যুবমনকে আহ্বান জানাইতেছেন।[২]

কবির এই ভাষণে পূর্ব-এশিয়ায় নানারূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ভারত তো কখনো অকারণে বহির্বিশ্বের সহিত কোনো প্রকার সম্বন্ধস্থাপনের জন্য ইতিপূর্বে বিদেশে আসে নাই— রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যটা কী! কেহ মনে করিল নিখিল-এশিয়ার (Pan-Asianism) যে স্বপ্ন একদল লোক দেখিতেছে ইহা কি তাহারই প্রকাশ— না আর কিছু। রবীন্দ্রনাথ এইসব কথার উত্তর দিলেন পরদিন এক বক্তৃতায়। তিনি বলিলেন, প্রাচীন ভারতের সহিত চীনের যে সম্বন্ধ ছিল— যাহার ক্ষীণধারা বিস্মৃতির অন্তরালে প্রায়-বিলীন— তিনি সেই প্রাণধারা পুনঃপ্রবাহিত করিবার সংকল্প গ্রহণ করিয়া এদেশে আসিয়াছেন। এই সংযোগ কোনো রাজনৈতিক সুবিধাসুযোগ সংগ্রহের উদ্দেশ্য প্রণোদিত নহে, কেবল প্রেম ও মৈত্রীর জন্য (disnitorested human love and for nothing else)— আর মানুষের সহিত মানুষের যে সহজ সম্বন্ধ আছে তাহাকে আবিষ্কার ও প্রচার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

ইতিমধ্যে কবির আহ্বান আসিয়াছে হাংচৌ (Hangchow) হইতে। শাংহাই হইতে ১১০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ৎসিয়েন্‌ৎসাঙ নদীর মোহনায় অবস্থিত এই নগরী প্রাচীনকাল হইতে বিখ্যাত। মার্কোপোলো ১২৮০ অব্দে লিখিয়াছিলেন 'beyond dispute the noblest and finest in the world'। এখানকার সি-হু বা পশ্চিমহ্রদের সৌন্দর্য অতুলনীয়, কবির নববর্ষ[৩] উদ্‌যাপিত হইল এই নূতন পরিবেশ মধ্যে। হাংচৌ-তে বহু প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির ও কীর্তি এখনো বিদ্যমান। ক্ষিতিমোহন, নন্দলাল, কালিদাস এখানকার বৌদ্ধ-গুহা ও -মন্দিরগুলি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন— কবির পক্ষে সমস্ত দেখা সম্ভব হয় নাই। প্রবাদ মতে প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বে এইস্থানে হুই-লি নামে এক ভারতীয় বৌদ্ধ (৩২৬-৬৪ খ্রীষ্টাব্দ) বাস করিতেন; তিনি Linyin-szu নামে বিখ্যাত বিহারের স্থাপয়িতা— পশ্চিমহ্রদের পার্শ্বস্থ পাহাড়ের উপর অবস্থিত। হাংচৌ-এর শিক্ষাসমিতির আহ্বানে যে সভা হয়, তাহাতে কবি এই ভারতীয় ঋষির কথা বলেন। ভারতীয় সাধক চীনের সংস্কৃতির সহিত আপনার সাধনাযোগে যে সত্যধন

১ মিঃ কারসন চ্যাঙ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষদিকে ভারতভ্রমণে আসেন এবং শান্তিনিকেতনে আসিয়াছিলেন।

২ Age after age in Asia great dreamers have made the world sweet with the showers of their love. Asia is again waiting for such dreamers to come and carry on the work not of fighting, not of profit making, but of establishing bonds of spiritual relationship (Visva-Bharati Quarterly, 1924 July, p. 200)। ইহার মধ্যে পঞ্চশীলের বাণী যেন নিহিত!

৩ ১ বৈশাখ ১৩৩১ লিখিত পত্র। দ্র. প্রবাসী ১৩৩১ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ২৮৫। আরেকখানি পত্রে বিধুশেখরকে শান্তিনিকেতন হইতে চীনে আসিবার ও উভয় দেশের মধ্যে পণ্ডিত বিনিময়ের কথা লেখেন। Visva-Bharati Bulletin, No. I vol. I, p. 20।

চীনকে দান করিয়াছিলেন, তাহা আজও চীনারা বিস্মৃত হয় নাই। কবির ভরসা এই শ্রেণীর সাধনা পূর্বকালে যেমন চীন ও ভারতকে এক যোগসূত্রে বাঁধিয়াছিল, তেমনি অদূর ভবিষ্যতে উভয় দেশকে আবার প্রীতির বন্ধনে টানিবে।[১]

তিনদিন হাঙচৌ-এ থাকিয়া কবি ও তাঁহার সঙ্গীরা শাংহাই-এ ফিরিয়া আসিলেন (১৭ এপ্রিল)। সেইদিনই শাংহাইপ্রবাসী জাপানীদের কবি-সম্বর্ধনা। শাংহাই-এ তখন জাপানীদের বিপুল আধিপত্য— ব্যবসায়ী শিল্পী ব্যাংকার অধ্যাপক সাংবাদিক রাজনীতিক প্রভৃতি বিচিত্র লোকের ভিড়। রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই জাপানীদের গুণমুগ্ধ; তৎসত্ত্বেও তিনি তাহাদের উগ্র জাতিপ্রেম ও পরস্বাপহরণ প্রবৃত্তির ঘোর বিরোধী। সেদিনকার সম্বর্ধনা সভায় কবি স্পষ্ট করিয়া বলিলেন যে, পাশ্চাত্য জাতিসমূহের ধনলোলুপতা ও শক্তিমত্ততার আদর্শ প্রাচ্যদেশগুলিকে যেন গ্রাস না করে। পূর্বদেশসমূহের সম্মুখে আজ এই বড়ো বিপদ যে, সে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাদের সাত্ত্বিকতার প্রতি শ্রদ্ধাহীন, সে আজ পশ্চিমের অস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহাকে প্রতিহত করিবে ভাবিতেছে। তিনি শ্রোতাদের বলিলেন, "not to acquire that mentality of the primitive man, the mentality of the west—eternally striving after power. The world was waiting for the moral idealism for that spiritual standard of life to save it from that demon—the worship of Power.

রবীন্দ্রনাথের এই ভাষণে প্রাচ্য এশিয়ার কোনো পক্ষই আপ্যায়িত হইল না। পাশ্চাত্য জাতি শক্তিবাদী, বিজ্ঞানলব্ধ শক্তি তাহার করায়ত্ত; আজ নবীন চীনের একশ্রেণীর তরুণের দল এই শক্তি অর্জন করিবার জন্যই বদ্ধপরিকর। এমন সময়ে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মহৎব্যক্তির নিকট হইতে সেই আদিম শক্তি অর্জনের নিন্দা শুনিয়া তাহারা বিচলিত হইল; ইতিমধ্যে একশ্রেণীর যুবক মার্ক্সীয় কম্যুনিজমবাদের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। তরুণ চীনারা— যাহারা পাশ্চাত্য ভাবধারায় শিক্ষিত বা বিদেশ হইতে শিক্ষালাভ করিয়া প্রত্যাগত তাহারা রবীন্দ্রনাথকে পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্বন্ধে এইরূপ তীব্র মত ব্যক্ত করিতে দেখিয়া সর্বাধিক উত্তেজিত। তাহাদের সন্দেহ চীন যে পশ্চিমকে প্রতিহত করিবার জন্য উদ্যত— তাহা যে-শ্রেণীর লোকের স্বার্থবিরোধী রবীন্দ্রনাথ তাহাদের মতবাদের বাহক।

অপর দিকে ব্রিটিশ-পরিচালিত পত্রিকাসমূহও রবীন্দ্রনাথের মতের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের আশঙ্কা সম্পূর্ণ অন্যপ্রকারের। একজন বলিলেন, য়ুরোপীয় সভ্যতা যে ধ্বংসোন্মুখ তাহা তাহাদের নানা উপসর্গ হইতে আজ

১ এই ভারতীয় সাধকের চীনা নাম হুই-লি, বোধিজ্ঞান রূপে তাহা অনূদিত হইয়াছে। বোধিজ্ঞান নামে কোনো ভারতীয় বৌদ্ধের নাম চীনা ইতিহাসে পাওয়া যায় না। চীনাভবন হইতে নিম্নলিখিত টীকা আমি পাইয়াছি—"There was no Indian monk named Bodhi-jnana. But there was an Indian monk named Hui-li, who once resided in Hangchou, during the year 826-834 A. D.; he was respected as the founder of the Linyin-zen, a reputed monastery on the Western Hill (Si Hu) in Hangchou. The Chinese word 'Hui' is the translation of Bodhi in Sanskrit and 'Li' can be restored as Siddhanta, hetu or nidana.

According to a Chinese Buddhist history written in 1269 A. D. by Sramana Chihpan, that during the Hsien-ho era (826-834), and Indian monk named Hui-li, went to the Western Lake of Hangchou; when he saw a peak there, he was surprised and pointed out saying 'this is a peak of Griddhrakuta of Rajagriha, how it flew there?' Thereafter the peak was called Fei-lai feng (fly-come-peak). There is no earlier record of this reference.

রবীন্দ্রনাথ এই কাহিনীটি হাঙচৌ-তে শুনিয়াছিলেন এবং বক্তৃতায় তাহার উল্লেখ করেন। *Talks in China* (1st Edition, p. 21) গ্রন্থে বোধিজ্ঞান নাম ব্যবহার করিয়াছেন। দ্র. ক্ষিতিমোহন সেন, বজ্রকূট বা শ্বেতনাগ মন্দির, প্রবাসী ১৩৩২ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ২২১।

স্পষ্ট[১] হইলেও তাহাদের প্রশ্ন, কবি যে পাশ্চাত্য সভ্যতার সরাসরি নিন্দা এবং প্রাচ্য সংস্কৃতির জয়গান করিলেন, তাহার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে কোন্ সত্য উদ্‌ঘাটিত হইবে। পূর্ব ও পশ্চিমকে সরাসরি আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক বলিয়া সূচিত করা যায় না। য়ুরোপের ইতিহাসে মহৎ বাণী ও মহৎ জীবনের দৃষ্টান্তের অভাব নাই, আবার প্রাচ্যদেশসমূহের ইতিহাসে রক্ত লিখিত বীভৎস কাহিনীর উদাহরণ অল্প নহে। এশিয়া শক্তিমত্ততার জন্য য়ুরোপের গায়ে কাদা ছুঁড়িতে পারে না, য়ুরোপও সে বিষয়ে এশিয়াকে নিন্দা করিতে অপারগ। লেখকের মতে রবীন্দ্রনাথ যদি আধ্যাত্মিক মিলনাদর্শের কথাই প্রচার করিতে চান, তবে কেন তিনি এশিয়ার race pride ও prejudice এমনভাবে অতিরঞ্জিত আকারে ব্যাখ্যা করিতেছেন? এইভাবে কি তাঁহার মহৎ আদর্শ সফল হইবে? ইংরেজ লেখক স্বীকার করিলেন যে পাশ্চাত্যদেশের ধনৈশ্বর্য সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক কর্মের জন্য নিয়োজিত হয় নাই। তবে পূর্বদেশের সহিত তুলনা করিলে পশ্চিমকে লজ্জিত হইতে হইবে না। পূর্বদেশের ধনীরা তাজমহল ও পেকিঙে প্রাসাদাদি নির্মাণ করিয়াছেন। কিন্তু পশ্চিমের ধনে অক্সফোর্ড কেমব্রিজ প্যারিস হাইডেলবার্গ ভিয়েনার বিদ্যায়তন সৃষ্টি হইয়াছে; পূর্বদেশে ইহার সমকক্ষ কী আছে?[২]

বলা বাহুল্য এই ইংরেজ লেখকের মন্তব্যগুলি প্রতিবাদের ঊর্ধ্বে না হইলেও একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই ভারতবাসীকে তাহাদের নেতি ও নৈষ্কর্মের জন্য তিরস্কার করিয়া আসিয়াছেন; তাঁহার চীনা জাপানী শ্রোতাদের পক্ষে সে বাণী নিরর্থক। তিনি যাহা বলিতে চাহিয়াছিলেন তাহা বর্তমান জাপানীদের উগ্র-জাতিপ্রেম বা ন্যাশনালিজমের নিন্দা— আধুনিক বিজ্ঞানের নিন্দা তিনি করিতে পারেন না।[৩]

শাংহাইতে আর একদিন ইহুদীসংঘ কর্তৃক মি. কাডুরির[৪] (Kadoorie) গৃহে রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা হইল। কাডুরি নিজে কবি। তিনি রবীন্দ্রনাথকে স্বাগত করিয়া বলেন যে, কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি *The Wedding of Death* নামে যে কাব্য লেখেন, তাহা পাঠ করিয়া সমালোচকরা বলেন ইহাতে রবীন্দ্রনাথের ভাবধারা আছে। "This immediately aroused my great interest. Thanks to Dr. Tagore, an inspired vision of a new world was put before my eyes." এই স্বাগত-ভাষণে কাডুরি ভারতীয় কবির যে প্রশস্তি করেন, তাহা শ্রদ্ধায় সুন্দর, যুক্তিতে সুদৃঢ়।[৫]

শাংহাই ত্যাগ করিবার পূর্বে মহানগরীর পঁচিশটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে আহূত এক সভায় কবিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হইল (১৮ এপ্রিল)। কবি চীন ও প্রাচ্যদেশসমূহ সম্বন্ধে তাঁহার আশা ও ভরসার কথা প্রাণস্পর্শী

১ The Great War [I] was only a symptom of a disease which is destroying the social organism।

২ Europe needs all the spiritual inspiration which it can get from Asia; but it will not be helped by abuse. Is it not possible that Asia would be benefitted also by a better understanding of Europe's spiritual aspiration? Tagore who knows these from personal contact might tell Chinese students something about them. He would then be an apostle of good-will. Might not Tagore spend some of his time in warning peoples of Asia of the demoralising influences of sloth and of disregard of their own resources. *The Peking Leader*, 24 April 1924। see Visva-Bharati Bulletin, No. I Part II June 1924, pp. 9-10।

৩ দ্র. প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের পাদটীকা। Visva-Bharati Bulletin, I—II, p. 10।

৪ E. S. Kadoorie; President, Zionist Organisation, Marble Hall, Shanghai (China)।

৫ Visva-Bharati Quarterly 1924, pp. 802-808।

ভাবাবেগে ব্যক্ত করিলেন। কবি বলেন, পশ্চিমের মনস্বিতা ও অর্থসাচ্ছল্য পূর্বদেশসমূহের জীবনযাত্রাকে না মহৎ, না বৃহৎ করিয়াছে; অথচ তাহাদের উদ্‌ভাবিত যন্ত্রদানব এশিয়া মহাদেশের রাজনীতি বাণিজ্যনীতি সমাজনীতিকে যে ভাবে গ্রাস করিতেছে, তাহা ভাবিলে আতঙ্ক হয়।

এই সভায় আসিবার পূর্বে কবি Chinese Women's College-এ তাঁহার শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে ভাষণ দিয়া আসিয়াছিলেন।

পেকিঙে

শাংহাই মহানগরীতে সাতদিন কাটিল (১২-১৮ এপ্রিল); এবার উত্তরপথে পেকিঙ অভিমুখে যাত্রা। শাংহাই হইতে চীনের গঙ্গা ইয়াংৎসির জলপথে কবি ও তাঁহার সঙ্গীরা নানকিঙ (দক্ষিণীনগর) চলিলেন— পথ ১৩০ মাইল। নূতনদেশের মধ্য দিয়া নদীপথের সৌন্দর্যশোভা পদ্মাবিলাসী কবির বড়ই ভালো লাগিতেছে।

নানকিঙ বিশাল নগরী, বহুবার চীনের রাজধানী ছিল। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে কবির ভাষণ; সে কী অসম্ভব ভিড়! ভিড়ের চাপে হলঘরের অলিন্দ (balcony) ভাঙিয়া যাইবার মতো হয়। কবির ইংরেজি বক্তৃতায় সু-ৎসী মো দোভাষীর কাজ করিলেন। শাংহাইতেও যেখানে প্রয়োজন হইয়াছিল তিনিই ভাষান্তরিত করিয়া বলিয়াছিলেন।[১]

নানকিঙের অসামরিক প্রদেশপাল হান্‌ৎজু-সুএ-র সহিত কবির পরিচয় হইল; এই লোকটির মনের ব্যাপ্তি ও অনুভূতির গভীরতা দেখিয়া কবি আশ্চর্য হইয়া গেলেন। কথাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিলেন যে প্রদেশপাল কবির সকল কার্যকলাপ ও মতামত সম্বন্ধে অত্যন্ত ওয়াকিবহাল। তিনি দুঃখ করিয়া বলিলেন, কবির বাণী সাধারণ শিক্ষিত যুবকেরা বুঝিবে না, এবং হয়তো ভুলই বুঝিবে। কিন্তু যাহারা বৌদ্ধশাস্ত্র জানে ও ঐ ধর্মের মহৎ আদর্শের স্বাদ জীবনে লাভ করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে কবির বাণী সহজবোধ্য হইবে।

নানকিঙের সমরপাল জেনারেল চে-শে-যুআন-এর সহিত সমসাময়িক চীনের রাজনৈতিক অবস্থা লইয়া কবির দীর্ঘ আলোচনা হয়। চীনের গৃহবিবাদ কবিকে কীভাবে পীড়িত করিতেছে, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, পৃথিবীর সকল অমর কীর্তি— সাহিত্য কলা সংগীত— জাতির জীবনে শান্তি না থাকিলে প্রকাশ পায় না। চীনের এই আত্মঘাতী সংঘাত বন্ধ করা প্রয়োজন— for the sake not only of China, but of Asia and humanity।

শাংহাইতে সান-ইয়াৎ সনের প্রধান সহায় এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইলে কবি এই কথাই তাঁহাকেও বলিয়াছিলেন।

নানকিঙ হইতে কবি ও তাঁহার সঙ্গীরা পেকিঙের দিকে চলিয়াছেন— মধ্যে শান্‌টুঙের রাজধানী ৎসি-নান (Tsi-nan)-এ থামিলেন (২২ এপ্রিল)। এই প্রদেশের উপর দিয়া ইংরেজ জারমান সর্বশেষে জাপানীদের যথেষ্ট উপদ্রব বহিয়া গিয়াছে; মাত্র ১৯২২ সালে জাপানীরা আন্তর্জাতিক চাপের ফলে এই প্রদেশ ছাড়িয়া গিয়াছে। ৎসি-নান এই উৎপীড়িত প্রদেশের প্রধান নগর। নগরে পৌঁছিয়া সেই অপরাহ্ণে মুক্তপ্রাঙ্গণে ভারতীয় কবির সম্বর্ধনা

১ নানকিঙে বক্তৃতা। *Talks in China* (1st Edition) pp. 26-32; Revised Edition, p. 30।

হইল। কবি চীনদের স্পষ্ট করিয়া বলিলেন যে, তিনি জানেন তাঁহার আদর্শবাদের কথা অনেকেরই ভালো লাগিতেছে না, তাহাতে তাঁহার ব্যক্তিগতভাবে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই : তবে এ কথা একদিন লোককে বুঝিতেই হইবে যে বস্তুবাদের তামসিকতার মধ্যে প্রগতি নাই— অত্যন্ত সহজ জীবনযাপন ও সৌন্দর্যসৃষ্টি যথার্থ প্রগতিবাদের লক্ষণ। এই সভার পর জনতা মহোল্লাসে কবিকে লইয়া শান্টুঙ খ্রীষ্টান মহাবিদ্যালয়ে (Christian University) গেল। এইখানে কবি বক্তৃতা দেন— শান্তিনিকেতনে তাঁহার শিক্ষাদর্শ কিভাবে মূর্তি লইয়াছে সেই কাহিনী বলেন।

শান্টুঙ হইতে পেকিঙ ২২৫ মাইল : স্পেশাল ট্রেন যোগে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীদের সহিত ২৩ এপ্রিল সন্ধ্যায় চীনের রাজধানীতে পৌঁছিলেন। শান্টুঙ হইতে এই ট্রেনে গবর্মেণ্ট প্রেরিত বিশেষ দেহরক্ষীর দল ছিল— পাছে বিরোধী দল অশিষ্টতা প্রকাশ করিয়া অতিথির অবমাননা করে। পেকিঙ রেল স্টেশনে ছাত্র অধ্যাপক সাংবাদিক, নানা প্রতিষ্ঠানের গণ্যমান্য প্রতিনিধি— চীনা জাপানী ইংরেজ আমেরিকান— এমনকি কয়েকজন ভারতীয়ও জনতার মধ্যে দেখা গেল। চারিদিক হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও তাহার সঙ্গে চীনারীতি অনুসারে পট্‌কাবাজির কর্ণভেদী আওয়াজ। এরূপ অভূতপূর্ব দৃশ্য কেহ দেখে নাই— ইতিপূর্বে ইংলন্ড ও আমেরিকা হইতে পণ্ডিতরা তো আহূত হইয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু এভাবে সমাদর তো কেহ পান নাই। ইংরেজের কাগজে লিখিল— Many men have come to China and have gone, yet none of them has been so enthusiastically received. What is the explanation ?

পরদিন রবীন্দ্রনাথের প্রথম পাবলিক সম্বর্ধনা— স্থান পেকিঙের রাজকীয় উদ্যান। এই উদ্যানে পূর্বকালে সম্রাটগণ বিদেশী দূতদের দর্শন দিতেন। পেকিঙের নানা প্রতিষ্ঠানের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা এই সম্বর্ধনা সভায় উপস্থিত হইলেন। রবীন্দ্রনাথকে স্বাগত করিয়া লিয়াং চি চাও যে দীর্ঘ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ পাঠ করেন, তাহা প্রত্যেক ভারত তথা এশিয়াবাসীর পাঠ করা উচিত।

লিয়াং চি চাও (১৮৭৩-১৯২৭) এই সময়ে শিক্ষাব্রতী, বহুবিদ্বজ্জন সভার সহিত যুক্ত ; যৌবনে তিনি বৈপ্লবিক দলে সান-ইয়াৎ সেনের সহিত যুক্ত ছিলেন ; বহু বৎসর (১৮৯৮-১৯১২) দেশের বাহিরে বাস করেন। চীনের নবচেতনার ইতিহাসে যে দুইজন মনীষীর নাম অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত— তাঁহাদের একজন লিয়াং চি চাও ও অপর জন ডঃ হু সি।[১]

লিয়াং চিং চাও-এর ভাষণ হইতে কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।[২]

"আমরা সাত-আটশত বৎসর পরস্পরকে ভালবাসিয়া ও শ্রদ্ধা করিয়া স্নেহশীল ভাইয়ের মতো বাস করিয়াছিলাম।

"আমরা উভয়েই বিশ্বজনীন সত্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলাম ; আমরা মানবজাতির লক্ষ্যস্থানে পৌঁছিবার জন্য যাত্রা করিয়াছিলাম : আমরা পরস্পরের সহযোগিতার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলাম। আমরা চীনেরা আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভারতীয়দের নেতৃত্বে ও পরিচালনার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছিলাম।

১ 'The new thought movement was inspired by a group of intellectual revolutionaries associated with the faculty of the National University, chief among them being Liang-Chi-Chao and Hu shi.—Chambers Encyclopaedia, article Peking।

২ লিয়াং চি চাও-এর ইংরেজি ভাষণ Visva-Bharati Quarterly, 1924 October : *Talks in China*। দ্র. প্রবাসী ১৩৩২ বৈশাখ পৃ. ১২১-২২ (উক্ত ভাষণের কিয়দংশের অনুবাদ)।

আমাদের উভয়ের মধ্যে কেহই বিন্দুমাত্র স্বার্থপরতার প্রেরণার দ্বারা কলঙ্কিত হই নাই— উহা আমাদের মোটেই ছিল না।" এই ভাষণে ভারতের নিকট চীনারা কত বিষয়ে ঋণী, তাহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ঐতিহাসিক রেখাঙ্কন আছে।

পরদিন (২৫ এপ্রিল) অ্যাংলো-আমেরিকান এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে Wagonlits হোটেলের হলে কবি-সম্বর্ধনা হইল। সভাপতিত্ব করেন সার্ ফ্রান্সিস আগলেন (Aglen)— সমিতির সভাপতি। কবিকে সভায় পরিচিত করিয়া দেন Dr. G. Schurman— ইনি আমেরিকান; আমেরিকায় কবির সহিত পরিচিত হন, তাঁহার বক্তৃতা শোনেন; উপস্থিত ভদ্রদের মধ্যে তিনিই কবিকে জানিতেন।

রবীন্দ্রনাথ প্রতিভাষণে যাহা বলিলেন, তাহার মধ্যে নূতন কথা বিশেষ কিছু নাই; যে-পাশ্চাত্য সভ্যতার সমালোচনা তিনি ইতিপূর্বে করিয়াছেন, তাহাই বিস্তারিত করেন— ইহার সঙ্গে ভাবাত্মক গঠনমূলক বিশ্বমৈত্রীর কথাও ছিল।

কবির এই ভাষণে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল; পাশ্চাত্যজাতিরা তো খুশি হইলই না, যুবচীনেরও মনোভাব কঠোর হইয়া উঠিল। কবির আগমন সূচনার সময় হইতেই তাঁহার বিরুদ্ধে মার্কসিস্টদের প্রচারকার্য আরম্ভ হইয়াছিল। চীনের তরুণ ভাবুক ও কর্মী কুও-মুড়ো (Kuo-Muro) চীনা পত্রিকায় সে-সময়ে যাহা লেখেন— তাহার সারমর্ম পাঠ করিলেই যুবচীনের একশ্রেণীর মনোভাবের আভাস পাওয়া যাইবে। রবীন্দ্রনাথকে পেকিঙ হইতে আমন্ত্রণ প্রেরিত হইয়াছে— এই সংবাদ ১৯২৩-এর অক্টোবর[১] মাসের মধ্যে চীনে নিশ্চয়ই প্রচারিত হইয়াছিল। কুও-মুড়োর প্রবন্ধ ১৪ অক্টোবর এক চীনা পত্রিকায় (Creation weekly) প্রকাশিত হয়; অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের চীনে পদার্পণের প্রায় ছয় মাস পূর্ব হইতে কম্যুনিস্টরা তাঁহার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য আরম্ভ করে।

কুও-মুড়ো যৌবনে পরম রবীন্দ্রভক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের রচনা ইংরেজি হইতে চীনাভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশের জন্য বহু চেষ্টা করিয়া কিভাবে ব্যর্থ হয় সে কথা তিনি বলিয়াছেন। কিন্তু কম্যুনিজমের ভাবধারার স্পর্শে তাঁহার মতের আমূল পরিবর্তন হইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ চীনে আসিতেছেন এই সংবাদ রাষ্ট্র হওয়ার পর তিনি লিখিলেন "ব্রহ্মার প্রকাশ, আত্মন-এর গরিমা, 'প্রেম'-এর বাণী কেবলমাত্র কর্মবিরল মানুষের অহিফেন বা তাড়ি; নিঃস্বের পক্ষে অনবরত শরীরের ঘাম আর রক্তক্ষয় করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সমন্বয়ের প্রচার হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে সাংঘাতিক বিষ, সমন্বয়ের প্রচার হচ্ছে বিত্তবানদের ছলনার আশ্রয়, নিঃস্বদের লৌহশৃঙ্খল। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত ইচ্ছায় চীনদেশে বেড়াতে আসছেন, এতে আমরা তাঁকে অন্তরের আহ্বান জানাচ্ছি। কিন্তু চীনা সর্বসাধারণের ডাকে চীনদেশে আসছেন— এ কথা বললে আহ্বানকারীর বিরুদ্ধে আমাদের যথেষ্ট অভিযোগ থেকে যায়।"[২]

এই আবহাওয়ার মধ্যে কবির এই প্রথম ভাষণ শুনিয়া যুবচীনের ধারণা হইল ভারতীয় কবি প্রতিক্রিয়াশীল (reactionary)। তিনি প্রাচীনের জয়গৌরবে পঞ্চমুখ, আধুনিক এশিয়ার নবজাগরণ আন্দোলন তাঁহার দ্বারা প্রতিহত হইবে। নবীনচীনের একদল যুবক ভারতের পাশ্চাত্য বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীদের ন্যায়ই পশ্চিমমুখী—

১ ১৯২৩ পূজাবকাশের কোনো সময়ে যুগলকিশোর বিড়লা কবির চীনসফরের ব্যয় নির্বাহার্থ এগার হাজার টাকা প্রতিশ্রুত হইলে, বোধ হয় কবি পেকিঙের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া সংবাদ দেন; সেই সংবাদ পেকিঙে প্রকাশিত হইবার পর কুও-মুড়োর রবীন্দ্রবিরোধী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

২ কুও-মুড়ো, রবীন্দ্রনাথের চীন-ভ্রমণ সম্পর্কে আমার মতামত।— অনুবাদক অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভারত ও চীন, ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র ১৮৮০-৮১ (১৯৫৯)।

প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাহীন। তাহারা পশ্চিমের নূতনতম বাণীর জয়গানে মুখর ও আপনদেশের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সন্দিহান।[১]

যাহা হউক, বক্তৃতাসভায় চীনা যুবকরা কখনো কোনো অশিষ্টতা করে নাই— তাহারা কবির বক্তৃতার পূর্বে ছোটো ছোটো বিজ্ঞাপনীতে তাহাদের বক্তব্য মুদ্রিত করিয়া বিলি করিত। তাহারা বলিত, রবীন্দ্রনাথ তাহাদের পূজনীয় অতিথি, কিন্তু তাহারা তাঁহার মত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহে।

এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "নিছক সম্মান পাবার সৌভাগ্য আমার হয় নি। সেখানেও একদল লোক আছে— তাও বলি তাদের দল খুব ভারি নয়— তারা বললে এ লোকটা ভারতবর্ষ থেকে এসেছে আমাদের মাথা খারাপ করতে; এখন আমরা এ সমস্ত কথা, ভারতবর্ষের বাণী বৌদ্ধধর্ম যা দিয়েছে শুনতে পারিনে। তাতে ক্ষতি হয়েছে, গায়ের জোর কমিয়ে দিয়েছে, হিংসা প্রভৃতি খর্ব করেছে: এ লোকটি একে কবি, তা'তে ভারতবাসী, ও আমাদের মাথা খারাপ করতে পারে।"[২]

নবীন সমাজের অন্যতম নেতা ডক্টর হু সি। হু সি[৩] আমেরিকায় শিক্ষিত কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট প্রাপ্ত। চীনাভাষায় নূতন রচনা শৈলী ও চল্‌তি-ভাষার (Pai-hua) প্রবর্তক।

রবীন্দ্রনাথের সহিত পেকিঙে পরিচিত হইবার ও তাঁহার সহিত কথাবার্তা কহিবার পর ডঃ হু সি বুঝিতে পারিলেন এই চৌষট্টী বৎসরের বৃদ্ধের অন্তরে যে তারুণ্যের অগ্নি আছে, তাহা ভাবপ্রবণ তরুণদের বোধের অগম্য। হু সি বুঝিলেন রবীন্দ্রনাথের মতামত পশ্চিমের ধার-করা বুলি নহে, অতীতের মরিচা ধরা বাক্যও নহে। হু সি-র পরিবর্তন হইলে চীনা যুবকদের মধ্যে যাহারা কেবলমাত্র প্রগতিশীল— কম্যুনিস্ট নহে তাহাদের উগ্রতা শমিত হইয়াছিল।

অতঃপর একদিন (২৬ এপ্রিল) পেকিঙের ন্যাশনাল য়ুনিভার্সিটির হলে নানা বিদ্যায়তনের ছাত্রদের সহিত কবির সাক্ষাৎ হইল। ঘরোয়াভাবে কথাবার্তা হয়। কবি বলিলেন যে তিনি যখন চীন হইতে আমন্ত্রণ পান, তখন তিনি জানিতেন না যে, এদেশের সকল শ্রেণীর লোক ভারত-আগত মানুষটিকে চাহে না। এ কথা সত্য তিনি তাহাদের কোনো সহায়তা দান করিতে পারেন না— তার জন্য শত সহস্র অধ্যাপক আছেন। তবে তাঁহার বক্তব্য এই যে, যাঁহারা বলেন শক্তিশালী 'নেশন' হইতে হইলে বস্তু-আশ্রয়ী শক্তির প্রয়োজন— তাঁহারা, কবির মতে, পৃথিবীর ইতিহাস জানেন না। শক্তির উপর নির্ভরশীলতা— বর্বরতারই বৈশিষ্ট্য। যে সব 'জাতি' এই পশুশক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল— হয় তাহারা নিশ্চিহ্ন হইয়াছে না-হয় বর্বরই আছে। কবির বক্তব্য ধর্মের পথই সত্যের পথ— seek righteousness though success be lost[৪]। ইহার ফল হইল আশাতীত। এ সম্বন্ধে কবির সঙ্গী ও সেক্রেটারি মিঃ এলমহার্স্ট লিখিতেছেন, His first talk to them has completely won their hearts and

১ "গুরুদেব যে মৈত্রীর কথা বলতে আজ চীনে এসেছেন, এরা তাতে কর্ণপাতও করে না, একেবারে গোঁয়ার-গোবিন্দ হয়ে বসে আছে।" নন্দলাল বসু, চীন-জাপানের চিঠি, প্রবাসী ১৩৩১ আশ্বিন, পৃ. ৭৮৪।

২ ৮ শ্রাবণ ১৩৩১ কলিকাতা ইউনিভার্সিটি হলে বক্তৃতার অনুলিখন হইতে। প্রবাসী ১৩৩১ কার্তিক, পৃ. ৮৯-১০১।

৩ Hu Shih (1891-) Chinese philosopher; Education in U. S. A.; B. A. Cornell 1914; and Ph. D. Columbia (1917); Professor of Philosophy and Dean (1917-26) at Peking National University: invented 'pai-hua', modern simplified Chinese language and wrote poems in it.

৪ First Public Talk in Peking (National University), *Talks in China* (1st Edition) pp. 79-82।

minds. They found that he had all time been as much of a revolutionary in the field of letters as any of them.[১]

পেকিঙ বাসকালে কবি জানিতে পারিলেন যে চীনের সিংহাসনচ্যুত প্রায়-নির্বাসিত মাঞ্চু সম্রাট ও তাঁহার পত্নীদের সহিত কবির সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হইয়াছে।

পাঠকের স্মরণ আছে ১৯১১ সালে চীনে যে গণতান্ত্রিক বিপ্লব দেখা দেয় তাহার অভিঘাতে মাঞ্চু রাজবংশ সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিল তখন এই প্রবল সম্রাট Hsuan Tung নামে সিংহাসনে অধিষ্ঠ (১৯০৮-১২)। তাঁহার বয়স যখন ছয় বৎসর মাত্র, তখন চীন রিপাবলিক স্থাপিত হয়। অতঃপর ১৯১২ হইতে ১৯২৪ পর্যন্ত তিনি পেকিঙের বাদশাহী প্রাসাদে বাস করিতেছেন। সার্ রেগিনল্ড জনস্টন নামে এক ইংরেজ তাঁহার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন; ইনি তাঁহার নাম দেন হেন্‌রি— তাঁহার আসল নাম ছিল পু-য়ী। এখন তিনি হেন্‌রি পু-য়ী নামেই পরিচিত।[২]

২৭ এপ্রিল রবিবার প্রাতে কবি ও তাঁহার সঙ্গীরা প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। প্রাসাদ অবস্থিত পেকিঙ মহানগরীর উত্তরে, সেইটি মাঞ্চুনগরী— দক্ষিণাংশ চীনা শহর। এই উত্তর-নগরী প্রায় পনেরো মাইল প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত— এই প্রাচীর ৫০ ফুট উচ্চ— উপরিভাগের প্রস্থ প্রায় ৪০ ফুট। প্রবেশের নয়টি দ্বার। এই মাঞ্চু নগরীর একাংশ বাদশাহী নগর বা Imperial city; ইহাও প্রাচীর দ্বারা পুনর্বেষ্টিত; ইহার মধ্যে সম্রাটের নিষিদ্ধ পুরী (Forbidden city)— এইখানে সম্রাটের প্রাসাদ। এই এলাকায় মাঞ্চু-শাসনকালে কোনো চীনা রাত্রিবাস করিতে পারিত না। এই প্রাসাদ বিরাট— বহু অট্টালিকা মন্দির উদ্যান জলাশয়ে শোভিত। এই বিশাল পুরীর সিংহদ্বার হইতে প্রাসাদ পর্যন্ত পৌঁছাইতে প্রায় একঘণ্টা লাগিল; রবীন্দ্রনাথ এক দোলায়, অপর দুইটি দোলায়— দুইজন রমণী মিস্ গ্রীন ও মিস্ লীন্।[৩] অপর সকলে হাটিয়া চলিলেন।

হেন্‌রি পু-য়ীর দুই পত্নীর জন্য রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের শাঁখাচুড়ি উপহার দিলেন; সম্রাটকে এলমহার্স্ট রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি গ্রন্থ ও নন্দলাল কয়েকখানি চিত্র উপহার দিলেন। সম্রাট কবিকে একটি মূল্যবান প্রস্তরের বুদ্ধমূর্তি উপঢৌকন দিলেন।

ইতিপূর্বে সম্রাট একমাত্র ডক্টর হু সি ছাড়া আর কাহাকেও প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান নাই। সাময়িক পত্রিকা 'পেকিঙ লীডার' তাই সবিস্ময়ে লিখিলেন—Ex-Emperor Hsuan Tung shattered another precedent on Sunday [27 April] when he received Rabindranath Tagore and his party in the garden of the Imperial Palace.

প্রায় আড়াই ঘণ্টা প্রাসাদের নানারূপ সামগ্রী দেখিয়া ইঁহারা ফিরিলেন; চীনের এই শিল্পসংগ্রহ দেখা তখন সকলের ভাগ্যে হইত না; কবির সঙ্গীদের মধ্যে নন্দলাল আর্টসংগ্রহ তন্ন তন্ন করিয়া দেখেন; তিনি এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধও লেখেন (প্রবাসী ১৩৩১)।

১ Visva-Bharati Bulletin No. 1. Part II. p. 24.

২ হেন্‌রি পু-য়া ১৯১২-২৪ পর্যন্ত পেকিঙয়ের রাজপ্রাসাদে প্রায় বন্দীজীবন অতিবাহিত করেন। রবীন্দ্রনাথের চীন সফর হইতে প্রত্যাবর্তনের অল্পকাল মধ্যে (১৯২৪ নভেম্বরে) পুনবায় গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয় ও তখন পু-য়া জাপানীদের আশ্রয়ে তিয়েনৎসিন-এ গিয়া বাস করেন (১৯২৪-৩১)। ১৯৩২-এ জাপানীদের চেষ্টায় মাঞ্চুরিয়া চীন হইতে পৃথক হইয়া মাঞ্চুকুও নামে রাজ্য সৃষ্ট হয়; তখন হেন্‌রি পু-য়াকে সেখানকার রাজা করিয়া দেওয়া হয় এবং ১৯৩৪-এ তিনি কাঙ-তে (K'ang Te) এই সম্রাট নাম গ্রহণ করেন।

৩. Lin Hui-Yin বিদুষী মহিলা। পরে Mrs. Liang Szu Cheng (Son of Lioo-chi-ch'ao)।

সেইদিন সন্ধ্যায় (২৭ এপ্রিল) পেকিঙের বুধমণ্ডলী কর্তৃক আয়োজিত ভোজসভায় কবি ও তাঁহার সঙ্গীদের নিমন্ত্রণ। মিঃ লিন্ নামে একজন সাহিত্যিক কবি রবীন্দ্রনাথকে স্বাগত করিয়া যে ভাষণ দেন তাহাতে তিনি চীনা কবিদের কাব্যসৃষ্টির অন্তরায় কোথায় সে বিষয়ে আলোচনা করেন, তিনি বলেন, ভাষা ছন্দ রীতি সমস্তই প্রাচীন পথ আশ্রয়ী বলিয়া মুক্তপথে চীনাকাব্যর প্রগতি বাধাগ্রস্ত। মিঃ লিন্-এর ভাষণান্তে রবীন্দ্রনাথের উত্তর— তাঁহার কাব্যজীবনের ইতিহাস। এই ভাষণে তিনি বলেন, য়ুরোপীয় কবি দান্তে ও গোটের সঙ্গে তাঁহার যে পরিচয় হয়, তাহা অতি সামান্য। তিনি বলেন, ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতসাহিত্য মুষ্টিমেয়ের মধ্যে তাহার রসগ্রাহিতা ও অর্থবোধ সীমিত ছিল। সাধারণ লোক আপন ভাষায় আপন কথা ছন্দের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিত। রবীন্দ্রনাথের জীবনে ছন্দে মুক্তি আসে এই গতানুগতিকের পথ ছাড়িবার পর। কবি বলেন, তিনি বিধিবদ্ধ ভাবে স্কুলকলেজে শিক্ষিত হন নাই বলিয়া পরম্পরাগতভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে নকলনবীশী করা তাঁহার হয় নাই। My ignorance combined with my heresy turned me into a literary out-law। রবীন্দ্রনাথের ভাষণের বিষয় বলা যাইতে পারে— The creative aspect of the revolution in Bengali literature— অবশ্য ইহার মধ্যে নিজ জীবনের কথাই বেশি করিয়া আলোচিত হইয়াছে।[১]

চীনা ছাত্রদের সহিত ন্যাশনাল য়ুনিভার্সিটিতে মিলিত হইবার পর ধরিত্রী-মন্দির (Temple of Earth)[২] প্রাঙ্গণে সহস্রাধিক ছাত্রদের সমক্ষে দীর্ঘ এক ভাষণ দান করিলেন। (২৮ এপ্রিল) প্রথমেই কবি এই কথা বলেন, এশিয়ার বাণী কী তাহারই সন্ধানে তিনি ফিরিতেছেন ; তিনি ভারতের ব্যক্তিবিশেষরূপে চীনদেশে আসেন নাই, তিনি এশিয়ার প্রতিনিধিরূপেই উপস্থিত।[৩] কবি এশিয়ার যে বিরাট সংহতির কথা কল্পনা করিতেছেন— তাহা Asian Federation নহে (পরযুগে জাপানের সাম্রাজ্যবাদীদের Co-prosperity ও নহে), তাহা সংস্কৃতিগত ঐক্য— Cultural Unity। কবি বলিলেন, এমন একদিন ছিল যখন এশিয়া জগতকে বর্বরতা হইতে রক্ষা করিয়াছিল ; তারপর এই মহাদেশে অন্ধকার নামিয়া আসে। কেন এইরূপ ঘটিল, তিনি বলিতে পারেন না। পরে যখন বিদেশীদের আঘাতে আমাদের তন্দ্রাঘোর কাটিয়া গেল, য়ুরোপ তাহার শক্তির ও বুদ্ধির গর্ব লইয়া আসিল, আমরা তাহাকে ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি নাই। সেই পাপে য়ুরোপ এশিয়াকে অভিভূত করিয়াছে। য়ুরোপের প্রতি আমরা অন্যায় করিয়াছি— আমরা তাহাদের সহিত সমকক্ষভাবে মিলিত পারি নাই। ইহার ফলে মিলন হইল শক্তিমান ও শক্তিহীনের মধ্যে একপক্ষ হইতে অপমান (insult), অপর পক্ষ হইতে দাস্যভাব (humiliation)।

আমরা ভাবিয়াছিলাম যে আমাদের নিজস্ব কিছু নাই ; এখন পর্যন্ত আমরা আত্মবিশ্বাসী হইতে পারি নাই। আমাদের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে আমরা সচেতন নহি। পশ্চিম আমাদের মঙ্গল করিবার জন্য আসে নাই ; তাহারা আসিয়াছিল বস্তুজগতকে শোষণ করিবার জন্য। আমাদের গৃহে আসিয়াছিল— আমাদের সম্পদকে লুণ্ঠন করিবার জন্য। আমাদের এই তন্দ্রাঘোর হইতে মুক্তি পাইতেই হইবে এবং প্রমাণ করিতে হইবে এশিয়াবাসীরা ভিক্ষুক নহে। ইহাই আমাদের যুগের দায়িত্ব। আমাদের সন্ধান করিয়া আবিষ্কার করিতে হইবে আমাদের চিরন্তন সম্পদ কী। তবেই

১ *Talks in China* (1st Edition), pp. 57-69।

২ Temple of Earth— এখানে পূর্বকালে চীনসম্রাটরা তাঁহাদের দরবার আহ্বান করিতেন (দ্র. Altar of Earth, E. R. E. Vol. 1 p. 337 B)

৩ "You are glad that I have come to you, in a sense, representing Asia. I feel myself that Asia had been waiting long and is still waiting to find her voice."

আমরা রক্ষা পাইব এবং জগতকে রক্ষা করিতে পারিব। পাশ্চাত্য জাতিসমূহ শোষণনীতি অবলম্বন করিয়া আজ নীতিহীন, আজ আমাদের জন্মসত্ব আবিষ্কার করিবার দিন আগত। পূর্বদেশের অনেকের আজ মনে হইতেছে যে পশ্চিমের অনুকরণ করিয়াই বড়ো হইব। আমি তাহা বিশ্বাস করিনা। পশ্চিম যাহা গড়িয়াছে তাহা পশ্চিমেরই জন্য। কিন্তু প্রাচ্যের আমরা, পশ্চিমের মন অথবা পশ্চিমের চরিত্রনীতিকে ধার করিতে পারিব না।

কবি বলেন, আমরা মানুষের উপযুক্ত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিবলে সংগ্রাম করিব। প্রাচ্যদেশ কখনো সেনানায়ক অথবা মিথ্যা-ব্যবসায়ী কূটনীতিজ্ঞকে সম্মান দেখায় নাই— সে পূজা করিয়াছে ধর্মগুরুদের। তাঁহাদের মধ্যে দিয়া হয় আমরা বাঁচিব, না-হয় নিধন হইব। পশুশক্তিই জগতে শ্রেষ্ঠ শক্তি, ইহা কখনো স্বীকৃত হইতে পারে না। শক্তি নিজের আগুনে নিজে পুড়িয়া মরে। আমরা পশ্চিমকে প্রতিযোগিতায় বর্বরতায় স্বার্থপরতায় অনুকরণ করিব না।[১]

ইতিমধ্যে একদিন চীনা বৌদ্ধযুবসমিতির সদস্যগণ পেকিঙের ফে-য়েন (Fe-yen) নামক প্রাচীন বৌদ্ধমন্দির প্রাঙ্গণে কবিকে আহ্বান করেন। চীনের অন্যতম খ্যাতিমান বৌদ্ধভিক্ষু তাও-কাই (His Holiness Rev. Tao-Kai) এই মন্দিরের আচার্য। লিলাক্ বৃক্ষের বিস্তারিত ছায়াতলে সমবেত জনতার সমক্ষে কবি ভারতের মৈত্রীভাবনার কথাই বলেন— যে বাণী সহস্রাধিক বৎসরকাল চীনারা কোনো ভারতীয়ের মুখ হইতে শুনিতে পায় নাই— সেই বুদ্ধের বাণী আজ তাহারা শুনিল। এই বৎসরের জন্য চীনা কবি লিউ য়েন হোন্ (Liu Yen Hon) যে কবিতাটি রচনা করেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত[২] হইতেছে।

এক সপ্তাহ পেকিঙে থাকিবার পর মে মাসের প্রথমে কবি ৎসিঙ হুআ (Tsing Hua) কলেজের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন— অন্যেরা চীনের বিশিষ্ট স্থান পরিদর্শনে গেলেন। এই প্রতিষ্ঠানটি আমেরিকানদের দ্বারা স্থাপিত। বক্সার (Boxer, চীনা I-he-chuan—righteous-uniting-band) বিদ্রোহের পর চীনের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণের মোটা টাকা য়ুরোপের শক্তিশালী জাতিরা আদায় করিয়া লন।

আমেরিকানদের পাওনা হয় বহু টাকা ; কিন্তু গবর্মেণ্ট তাহা পুরা না লইয়া অর্ধেক পাওনা টাকা চীনা যুবকদের শিক্ষার জন্য দান করিয়া দিয়াছিলেন। তদনুযায়ী পেকিঙ হইতে বারো মাইল দূরে বিস্তৃত ভূখণ্ডে এই মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়।[৩]

১ Japan Advertiser, Quoted in Visva-Bharati News 1947, Vol. XV, No. 12, pp. 110-11, 9 May 1924। also Visva-Bharati Bulletin No. 1, Part II 1924, pp. 25-26।

২ He comes from the glorious India, queen of peacocks, which gave him the splendour of spirit. He comes from our holy place, the motherland of Buddha, and the Bodhi trees provided him with supreme intelligence.

He breathed the cloud-kissed air of the Himalayas, and washed his body in the sacred river Ganges. His touch revived the ancient soul of India. The Vedas, Upanishads and Brahmanas stood by him.

Our dream in a dark night ends thus on a sudden. Truth shines forth and man says, 'It is I'. Thus do scented flowers open up in the air, and freely do the swimming fishes run to and fro ; a thousand rivers flow gently to the ocean, and tides ebb and flow between the East and the West.

The East has its re-birth through our Poet seer. May he live long.—*The Golden Book of Tagore* (1931), p. 108।

৩ ১৯০৮ মে ১৩ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনাসরকারের নিকট প্রাপ্য খেসারতের অর্ধেক মকুব করিয়া Tsing (ch'ing) Hua College ১৯১১ সালে স্থাপন করে। ১৯১১ হইতে ১৯২৭-এর মধ্যে ১১০০ ছাত্র এই কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। চীনে জনরাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে এই বিদ্যায়তন সরকারী বিভাগের অন্তর্গত হয়।

এই কলেজে কবি কয়দিন থাকার সময়ে স্থানীয় ছাত্রসমাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার অবসর পান। ছাত্রেরা কবির কাছে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিত; যেমন, 'ঈশ্বর সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি' 'ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ কিরূপ' 'বাঁচিয়া থাকায় সুখ কী' 'পাপ কাহাকে বলে'। রবীন্দ্রনাথ অতি ধৈর্যের সহিত তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন[১]। এই সূত্রে কবি Civilization and Progress শীর্ষক এক দীর্ঘ ভাষণ লিখিয়া তাহাদের কাছে পাঠ করেন।[২] এই প্রবন্ধটিতে সভ্যতা ও ধর্ম সম্বন্ধে কবির মত অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

সভ্যতা ও প্রগতি সম্বন্ধে কবির বক্তব্য শুনিয়া ঐ কলেজের একজন আধুনিক শিক্ষিত তীক্ষ্ণধী অধ্যাপক (J. Wong-Quincy) ইহার সমালোচনা করিয়া বলেন যে, কবির কথার মধ্যে চীন সম্বন্ধে অনেক সত্য উক্তি আছে, তাঁহার ভাষণ তাঁহাদের ভালোই লাগিয়াছে। কিন্তু আধুনিকদের ভয় পাছে বিদেশীর মুখে প্রশংসা-বাণী শুনিয়া তাহারা ঝিমাইয়া পড়ে। কবি তাঁহার ভাষণে প্রগতি ও পরিপূর্ণতার সমালোচনা করিয়াছিলেন; অধ্যাপক বলিলেন, "It remains for Tagore to point out the antagonism between progress and perfection. The thought is fruitful and profound. Have we Chinese succeeded in bridging the gulf between progress and perfection? Tagore thinks we have. Again we would like to agree with him."[৩]

ৎসিঙহুয়া বাসকালীন একদিন শিক্ষা-শিক্ষণ বিদ্যায়তনের (Yen ching) ইংরেজি ভাষার শিক্ষকদের[৪] সমক্ষে কেন তিনি বিদ্যালয় স্থাপন করিতে প্রয়াসী হন তাহার ইতিহাস ব্যক্ত করিয়া বক্তৃতা করিলেন (৬ মে)।

আমেরিকান মহাবিদ্যালয় হইতে কবি পেকিঙে তাঁহার হোটেলে ফিরিলেন তাঁহার জন্মদিনের দিন (৮ মে); তদুপলক্ষে (Hsin Yüeh Pai) ক্রেসেণ্ট মুন সোসাইটির উদ্যোগে উৎসব, ডক্টর হু সি উৎসবের পৌরোহিত্য করিলেন। সমস্ত অনুষ্ঠান ইংরাজি ভাষায় সম্পাদিত হয়। তবে লিয়াং চি চাও উপস্থিত থাকায় হু সি চীনাভাষায় ভূমিকা করেন। এই উৎসবক্ষেত্রে কবিকে 'চু-চেন-তান' উপাধি প্রদত্ত হয়— ইহার অর্থ 'ভারতের মেঘমন্দ্রিত প্রভাত'। একটি মূল্যবান প্রস্তরখণ্ডের উপর এই তিনটি অক্ষর খোদিত করিয়া কবির হস্তে অর্পিত হইল।

উৎসবান্তে কবির ইংরেজি 'চিত্রা'র অভিনয়। রবীন্দ্রনাথ ধুতিপঞ্জাবী পরিয়া চাদর লইয়া বাঙালিবেশে রঙ্গমঞ্চে বসিলেন; কবির পাশেই ছিলেন চীনের বিখ্যাত নট মাইলন ফাং, অতঃপর 'চিত্রা' বা 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্য সম্বন্ধে ভূমিকা করিলেন। নাট্যভূমিকায় চীনা তরুণ-তরুণীরাই নামিয়াছিল— রূপসজ্জায় নন্দলাল কিছু সাহায্য করেন। উৎসবশেষে চীনা ভক্তরা কবিকে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট চিত্র ও একটি চীনামাটির পেয়ালা ও অন্যান্য বহুবিধ সামগ্রী উপহার দেন।[৫]

১ Visva-Bharati Quarterly, 1924 October, pp. 295-98। To the Students at Tsing Hua College, Peking—*Talks in China* (1st Edition), pp. 48-56।

২ *Talks in China*, (2nd Edition), pp. 121-48।

৩ Peking and Tien Tsin Times, 7 May 1924। See Visva-Bharati Bulletin No. I. Vol. II. pp. 81-82।

৪ To the English Teachers' Association—*Talks in China*, pp. 70-78।

৫ সেইদিন প্রাতে শান্তভাবে জন্মদিন উদ্‌যাপিত হইল। নন্দলাল প্রমুখ কবির সঙ্গীরা কবির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন, কালিদাস নাগ 'কবিপ্রশস্তি' কবিতা পড়েন, ক্ষিতিমোহন শ্লোক পড়িলেন, নন্দলাল ছবি উপহার দিলেন। দ্র. প্রবাসী ১৩৩১ ভাদ্র, পৃ. ৬৩৩-৩৪।

কবির মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বে চীনে-অনুষ্ঠিত এই জন্মদিনের কথা স্মরণ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

একদা গিয়েছি চিন দেশে,
অচেনা যাহারা
ললাটে দিয়াছে চিহ্ন 'তুমি আমাদের চেন' ব'লে। . .
ধরিনু চিনের নাম, পরিনু চিনের বেশবাস।
এ কথা বুঝিনু মনে,
যেখানেই বন্ধু পাই সেখানেই নবজন্ম ঘটে। —জন্মদিনে

ইহার পর রবীন্দ্রনাথ কয়দিন, তিনি যে ভাষণদানের জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন, সেই ভাষণগুলি দিলেন। এই ভাষণগুলি তাঁহার *Talks in China* গ্রন্থে আছে। ক্ষিতিমোহন লিখিতেছেন (১৩ মে) যে কবি গোটা তিন বক্তৃতা দিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়েন এবং বিশ্রামের জন্য ২০ মাইল দূরে পশ্চিম-পাহাড়ে (Western Hill) গেলেন।

১৮ মে পেকিঙে প্রত্যাবর্তনের পর ন্যাশনাল য়ুনিভার্সিটিতে কবির বিদায়সভা হইল; কবি যে ভাষণটি দেন, তাহা মৈত্রেয়ী দেবী বাংলায় অনুবাদ করিয়াছেন।[১]

কবি বক্তৃতা-আরম্ভে বলেন, "মনে অতৃপ্তি রয়ে গেল— কী যেন করতে পারলেম না, যেন আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হল না। কিন্তু এ আমার দোষ নয়, এ বর্তমান যুগের দোষ।" কবি ভাষণ শেষ করেন এই কয়টি কথা বলে, "আপনাদের দেশের কোনো কোনো দেশাত্মবোধী বড় ভীত হয়েছিলেন যে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়াচ ছড়িয়ে আমি হয়ত আপনাদের অর্থসম্পদ ও বস্তুতন্ত্রের প্রতি অগাধ বিশ্বাস টলিয়ে দেব। যাঁরা এ ভয় করেন তাঁরা আশ্বস্ত থাকুন আমি একান্তই নিরীহ। আমার এ শক্তি নেই যে আমি তাঁদের এ প্রগতি বন্ধ করতে পারি। যে আত্মার অস্তিত্বে তাঁরা বিশ্বাস করেন না সেই আত্মাকে বিক্রী করবার জন্য তাঁরা হাটের দিকে দৌড়াচ্ছেন, তাঁদের যেন গতিরোধ করবার আমার সাধ্য নেই। তাঁদের আশ্বাস দিয়ে আমি এও নিশ্চয় করে বলতে পারি যে এ পর্যন্ত একজন অবিশ্বাসীকেও বিশ্বাস করাতে পারিনি যে তার আত্মা আছে বা নৈতিক সৌন্দর্য জড়শক্তির চেয়ে মূল্যবান। আমার প্রচেষ্টার এই পরিণাম জানতে পারলে নিশ্চয় তাঁরা আমাকে ক্ষমা করবেন।"

কবির ভাষণের পর ডক্টর হু সি যে প্রতিভাষণ দেন সেইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; তিনি বলেন যে তিনি জোর করিয়া বলিতে পারেন 'that they [Tagore and his party] succeeded nobly and admirably in their task.'।

হু সি তরুণদের নেতা— রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রথম দিকে তাঁহার মনেও দ্বিধাগ্রস্ত ভাব ছিল; কিন্তু কবির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া, তাঁহার কথাবার্তা শুনিয়া তিনি বলেন তাঁহার আমূল পরিবর্তন হইয়াছে। "If a personal reference is allowed, I may add that I myself, for one, have been completely disarmed by the presence of our guests and converted from one who was rather unsympathetic and who, willing to stand aloof, to one who, from personal contact has become a warm admirer of the poet and his friends. This warmth I have received from the personality of the poet himself."[২]।

চারি সপ্তাহ পেকিঙে বাস হইল; মহানগরী পরিত্যাগের পূর্বদিন (১৯ মে) International Institute-এর

১ *Talks in China* (1st Edition), pp. 147-55। অনুবাদ— বিদায়; ভারত ও চীন, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৩৫৮, পৃ. ৮-১১।

২ *Talks in China* (1st Edition), p. 155।

তত্ত্বাবধানে কবির শেষ বক্তৃতা (Poet's Religion) হয়।[১] এই সম্মেলনে নয়টি ধর্মের প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ জাতীয় পোশাক পরিয়া মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন।

সেইদিন সন্ধ্যায় চীনের শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী মাইলন ফাঙের নৃত্যের বিশেষ ব্যবস্থা হয়; শিল্পী তাঁহার বিখ্যাত Goddess of the Lo River নৃত্যটি দেখান। এই অনুষ্ঠানের পরদিন কবি পেকিঙ ত্যাগ করিলেন।[২]

প্রত্যাবর্তনের পথে

পেকিঙের পালা শেষ হইলে কবি সদলবলে শান্‌সির (Shansi) রাজধানী তাই-য়ুআন (Tai-yuan, বর্তমান নাম Yang-ku, পেকিঙ হইতে ২৬৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে) শহরে উপস্থিত হইলেন।[৩] শান্‌সির তুচুন য়েন্‌শি-সান কুঙফুৎসু মতাবলম্বী আদর্শ শাসক; নূতন রিপাবলিককে ধর্ম ও নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা। রবীন্দ্রনাথের সহিত এই মহাপ্রাণ তুচুনের দীর্ঘ আলোচনা হয়। কবি বলেন, মানবসমাজকে বিশেষ আধ্যাত্মিক আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হইতেই হইবে; আর সমাজের কোনো বিশেষ অংশ সমস্ত শক্তি নিজ আয়ত্তে রাখিবে— তাহাও মঙ্গলপ্রদ নহে।[৪] তুচুন য়েন্‌শি-সান কবির সকল মতের সহিত একমত। তিনি কবিকে বলেন, মানুষ সুখে থাকিবার জন্যই জন্মিয়াছে; এবং এই সিদ্ধির পথে যেসব বাধা তাহা দূর করিবার ভার শাসনসংস্থা বা রাজশক্তির উপর ন্যস্ত; কুঙফুৎসু-র নীতি অনুসারে পরিবার হইতেছে একটি একক, ব্যক্তি তাহার অঙ্গ। পরিবার সুখী হইলে রাষ্ট্রের সমস্তই সুষ্ঠুভাবে চলিবে।

জনসাধারণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন যে সমস্ত সমাজ যদি সুখী না হয়, তবে কোনো ব্যক্তিও সত্যকার সুখের অধিকারী হইতে পারে না। "Unless the whole people is happy no individual can have true happiness. Unless all are wealthy no man, however rich, can have real wealth...I want to give the people the

১ Religious Experience, *Talks in China* (1st Edition), pp. 108-119। 'I am glad that when I am about to take my farewell from China, Dr. [Gilbert] Reid has given me this opportunity to speak to you about something which lies deep in my heart, something to which I have not yet been able to give expression in China'. দ্রষ্টব্য *Talks in China* (2nd Edition), pp. 48-55. (উপরের উদ্ধৃত অংশ এই সংস্করণে নাই)।

২ তারিখের গোলমাল আছে, Visva-Bharati Bulletin, No. I. Vol. II, p. 44…gave his farewell address at the Chen Kwang Theatre yesterday [25 May] etc.,… Peking Leader, 26 May 1924। Prof. Prasanta Chandra Mahalanobis writes in the Publisher's Notes on *Talks in China*—They left Peking on the 20th May।

৩ নন্দলাল বসু লিখিতেছেন, 'দেশ…বড় অরাজক। এক প্রদেশ আর-এক প্রদেশের ধার ধারে না। কিন্তু যে-যে প্রদেশের ভিতর দিয়ে গুরুদেব যাচ্ছেন, তারা সৈন্য-পাহারা, স্পেশাল ট্রেন থাকাব বন্দোবস্ত সব করছে, এবং বাদশাহের মত খাতির করছে— যেন চীনের বাদশাহ তাঁর গভর্নরদের দেখতে এসেছেন।'—প্রবাসী ১৩৩১ আশ্বিন, পৃ. ৭৮৪।

৪ "There can be no real civilization when the best ideals are concentrated in the hands of a few powerful men, whilst the bulk of the population has neither the leisure nor the mind to enjoy, and remains desolate."

responsibility for their own destiny, so that through their self-respect they may help themselves." । নিজেদের ভাগ্যরচনার দায়িত্ব লোকের উপর ন্যস্ত হউক ইহাই কবির মত।

সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির এই দুই ব্যক্তির সাক্ষাৎকারকে কবির সঙ্গী কালিদাস নাগ বলিয়াছেন "a symbolical meeting between the Hindu seer and the Chinese administrator."[১]

যে-প্রাতে তুচুনের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ হয়, সেই দিন অপরাহ্নে তাই-ইউয়ানে এক জনসভায় কবি আধুনিক অর্থনীতি ও ধর্মনীতি সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন। ধর্মনীতিহীন ধনিকতা জগতকে কোন্ মরুভূমির মধ্যে লইয়া যাইতেছে, তাহা কবি ঋষির দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করিলেন। এই সভায় এলমহার্স্ট শ্রীনিকেতনের গ্রাম-উদ্যোগের আদর্শ সম্বন্ধে ভাষণ দেন। এলমহার্স্ট এক পত্রে লেখেন প্রদেশপাল য়েন্‌শি-সান শ্রীনিকেতনের পল্লীসংস্কার সম্বন্ধে কথা শুনিয়া খুবই মুগ্ধ হইয়াছেন। ইহার কারণ বোধ হয় চীনদেশে গ্রামের সমস্যা তখন ভারতীয় অবস্থা হইতেও জটিল।

তাই-ইউয়ান হইতে কবি হু-পে প্রদেশের রাজধানী হানকৌ আসিলেন; এই শহরটি উত্তর ও দক্ষিণ চীনের মধ্যস্থলে, ইয়াংসের উপর ও হান নদীর মোহনায় অবস্থিত, শিল্প ও বাণিজ্যপ্রধান স্থান, শাংহাইএর প্রতিদ্বন্দ্বী বলিলে ভুল হয় না। এই নগরীর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বিরাট জনসভায় ভাষণ দান করিয়া সেই রাত্রেই স্টীমারযোগে তাঁহারা শাংহাই যাত্রা করিলেন। হানকৌ হইতে নদীপথে শাংহাই ৫৮৫ মাইল; দুইদিন স্টীমারে কাটিল। দীর্ঘ ঘোরাঘুরির পর নদীপথের যাত্রা ভালোই লাগিতেছে।

২৮ মে কবি শাংহাই পৌঁছিলেন; সেই সন্ধ্যায় শ্রীমতী বেনা (Bena) নামে ইতালীয় মহিলার দ্বারা আহূত শিক্ষাব্রতীদের বৈঠকে শিক্ষা সম্বন্ধে কবি এক মনোজ্ঞ ভাষণ দান করিলেন।[২]

পরদিন চীন তথা শাংহাই ত্যাগের দিন। সেদিন সকাল হইতে নানা প্রতিষ্ঠান ও সম্প্রদায় কর্তৃক অনুষ্ঠিত বিদায়সভা— জাপানী চীনা পার্সি সিন্ধী ও ভারতীয় মুসলমান সকলেই উপস্থিত। কবি সেখানে তাঁহার শেষ বিদায় সম্ভাষণ[৩] দিয়া সেইদিনই এলমহার্স্ট নন্দলাল বসু কালিদাস নাগকে সঙ্গে লইয়া জাপান যাত্রা করিলেন। ক্ষিতিমোহন চীনের প্রাচীন স্থানগুলি দেখিবার ও চীনা পণ্ডিতদের সহিত আলাপ-পরিচয় করিবার জন্য কিছুকাল থাকিয়া জাপানে মিলিত হন।

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গীদের চীনভ্রমণ সম্বন্ধে এলমহার্স্ট লিখিতেছেন—

There are men in China who are still convinced that civilization must have a moral basis and that material prosperity is prone to lead a nation to destruction if it lacks that moral balance which alone can give it poise and harmony....To such men the voice of Tagore has come...as voice of a friend.

এলমহার্স্ট আরও বলেন যে, চীনের সহিত সাক্ষাতের শুভফল ফলিবেই—These cannot but bear fruit in the future. The future of the world already lies in the hands of Asia. *Russia China and India* will have to decide what that future is to be. The old ideal of exploiting imperialism is struggling

১ Modern Review, 1924 July, p. 80।

২ *Talks in China* (1st Edition) XVII. At Mrs. Bena's.; Shanghai, pp. 138-146।

৩ *Talks in China* (1st Edition) XII. Farewell Speech at Shanghai, pp. 95-101।

for breath upon its deathbed. Disregarding the warning of the catastrophy of five years ago, it has set its face once more upon the same road to destruction. Are we, the nations of the East and West, to be swept a second time into this maelstorm of selfish aggrandisement and thereby to build our own tombs? Or, meeting in friendship, based on a mutual understanding and approciation, can we rescue humanity and give to the world a new lease of life.[১]

ইহার ভাষা ইংরেজি, লেখক ইংরেজ— কিন্তু ভাবধারা যে রবীন্দ্রনাথের তাহা অতি সুস্পষ্ট।

জাপানে একমাস

চীনের শাংহাই হইতে জাপানের কোবে বন্দর পৌঁছিতে অবশ্য দীর্ঘকাল লাগে নাই; মে মাসের শেষেই কবি টোকিওতে আসিলেন— কবি, এলমহার্স্ট ও কালিদাস উঠিলেন ইম্পিরিয়াল হোটেলে; নন্দলাল শিল্পী আরাইসনের বাড়িতে; ক্ষিতিমোহন আছেন কিয়োতোর মন্দিরে। কবি যখন জাপানে পৌঁছিলেন, তখন নানাদিক হইতে জাপানের দুর্দিন।[২] কিছুকাল পূর্বে (১৯২৩ সেপ্টেম্বর এবং পুনরায় ১৯২৪ জানুয়ারী ১৫) ভূমিকম্পের ফলে জাপান ধনে-জনে বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত; আমেরিকার সহিত প্রশান্তমহাসাগরের আধিপত্য লইয়া রাজনৈতিক সম্বন্ধ অত্যন্ত জটিল। আমেরিকায় প্রবেশাধিকার সংকুচিত করিবার জন্য নানাপ্রকার বিধিবিধান রচনায় মার্কিনরা প্রবৃত্ত।[৩]

রবীন্দ্রনাথ জাপানে আসিয়াই দেশের এই উত্তেজিত মনোভাব অনুভব করিলেন। তিনি তাঁহার এক ভাষণে[৪] জাপানকে আমেরিকার এই ক্ষুদ্র ব্যবহারে উৎক্ষিপ্ত না হইবার জন্য উপদেশ দিলেন। কবির বক্তব্য এই যে যখন কেহ অন্যায় বা অবিচার করে, তখন স্বভাবতই মানুষের রিপু বিক্ষুব্ধ হয়। সে অবস্থায় উচ্চ আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করা কঠিন। জাপানীরা দুর্বল প্রতিবেশী জাতির প্রতি যে ব্যবহার করিতেছে [কোরিয়া ও চীন] সে বিষয়ে কবি স্পষ্টভাবেই সমালোচনা করিলেন। তিনি বলিলেন— "I have deep love for you as a people but

১ L. K. Elmhirst, Rabindranath's Visit to China [Tokyo, June 8, 1924]; Modern Review 1924, August।

২ রবীন্দ্রনাথের জাপান পৌঁছিবার কয়েকদিন পূর্বে জাপানের সাধারণ নির্বাচনে Baron Tomosaburo Kato (1859-1926) কোয়ালিশন মন্ত্রীপরিষদ গড়িয়াছিলেন; বৈদেশিক মন্ত্রী হন Baron Kijuro Shidehara (1872-1951)। শিদেহারার কার্যকালে (১৯২৪ জুন - ১৯২৭ এপ্রিল) চীনের প্রতি জাপানের ব্যবহার শান্তিপূর্ণ (conciliatory) ছিল।

৩ জাপানের জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত বাড়িতেছে; ১৯৩০ পর্যন্ত গড়ে প্রতি বৎসর দশ লক্ষ করিয়া লোক বৃদ্ধি পাইতেছে। জাপানের ন্যায় দ্বীপরাষ্ট্রে তাহাদের সংকুলান সম্ভব নহে; সেইজন্য জাপানীরা ব্রাজিল, হাবাই, মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতে বাধ্য হইতেছে। মহাযুদ্ধের পর মার্কিন গবর্মেণ্ট বিদেশী প্রবাসন নিয়ন্ত্রণের জন্য নানা আইন প্রস্তুত করেন; কিন্তু জাপানীদের সম্বন্ধে নিয়ন্ত্রণ নহে— total exclusion বিল্ আসিল। The bill provided the total exclusion of the Japanese, thereby abrogating the gentleman's agreement। ১৯২৪ মে ২৬ অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের জাপানে আসার কয়েকদিন পূর্বে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বিধানসভায় এই আইন পাস হইয়া যায়।

৪ International Relations, Visva-Bharati Quarterly Vol. II, No. IV, 1925 January - March।… জাতি ও জনসাধারণ, প্রবাসী ১৩৩২ বৈশাখ, পৃ. ৮৪-৮৫ (Visva-Bharati Quarterly-র প্রবন্ধ হইতে সংকলিত)।

when as a nation you have your dealings with other nations you can also be deceptive, cruel and efficient in handling those methods in which the western nations show such mastery."

আট বৎসর পূর্বে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কবি যখন জাপানে আসেন, তখনও তিনি জাপানীদের রাজ্যলোলুপতার নিন্দা করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, এবারও তাহাই বলিলেন, If you must have peace, you will have to fight the spirit of this demon, Nation। তিনি বলেন,[১] "নেশনের এই সমস্ত সৃষ্টি— ধ্বংসসাধনের ও ধনবৃদ্ধির যন্ত্রপাতি— কূটরাজনীতির প্রকাশ্য ও গোপন আচরণ। এইসবের মূল্য কী? ইহাদের সম্মুখে নৈতিকবন্ধন পরাভূত এবং পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাব বিনষ্ট। এগুলি গ্রহণ করিতে আপনারা প্রলুব্ধ হইতেছেন, অথবা আপনাদিগকে প্রায় বাধ্য করা হইতেছে।·· আমি জাপানবাসী আপনাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতে আসিয়াছি যে জাপানে বসিয়া আমি ন্যাশন্যালিজমের বিরুদ্ধে বক্তৃতা লিখিয়াছিলাম এবং এমন সময়ে লিখিয়াছিলাম যখন লোকে আমার মতামত উপহাস করিয়াছিল।·· আর-একবার আমি আপনাদিগকে সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিতে আসিয়াছি।·· জাপান তাহার প্রকৃত স্বরূপ খুঁজিয়া বাহির করুক— যে-স্বরূপ কেবল পরের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিবে না, নিজের জগত সৃষ্টি করিবে, যে-জগত মানুষকে যাহা দিবার তাহা দিতে ঔদার্য দেখাইবে। আপনাদের মহত্ত্ব স্বীকার করিয়া এশিয়ার সমস্ত জাতি গর্বান্বিত হউক; সে মহত্ত্ব পরজাতিকে দাস করিয়া রাখার উপর যেন প্রতিষ্ঠিত না হয়, কেবলমাত্র নিজেদের সুখের জন্য অর্থ-আহরণের উপর যেন তাহার ভিত্তি না থাকে— সে-অর্থ সর্বকালের মানব কর্তৃক গৃহীত হয় না এবং ঈশ্বর তাহা প্রত্যাখ্যান করেন।"

বলা বাহুল্য কবির বাণী শুনিবার ও ভাবিবার অবসর রাজনীতিকদের নাই। কিন্তু মহাকাল একদিন প্রমাণ করিল রাজনীতিকদের বুদ্ধি ও বিবেচনা হইতে কবির দৃষ্টি ও বোধি আরও গভীর। বিশ বৎসর পরে কী কঠিন মূল্য দিয়া জাপানকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল— অবশ্য কবি তখন ইহলোকে নাই।[২]

জাপানে কবির সহিত রাসবিহারী বসুর সাক্ষাৎ হইল; তিনিই কবির সকলপ্রকার সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া দেন। পাঠকের স্মরণ আছে ১৯১৬ সালে ভারতে বিপ্লব-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলে রাসবিহারী কলিকাতা হইতে P. N. Tagore নাম গ্রহণ করিয়া ছদ্মবেশে জাপান যাত্রা করেন; তিনি রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়, কবির জাপানসফরের অগ্রদূতরূপে সেখানে যাইতেছেন এই বলিয়া পাসপোর্ট সংগ্রহ করেন ও পুলিশের চোখে ধূলি দিয়া কলিকাতা বন্দর হইতেই জাহাজে উঠেন। রবীন্দ্রনাথ জানিতেন যে রাসবিহারীর উপর ব্রিটিশ গুপ্তচরদের শ্যেনদৃষ্টি আছে তাই তিনি একাই রাসবিহারীর সঙ্গে দেখাশুনা করেন— অপর কাহাকেও লন নাই।

১ জাতি ও জনসাধারণ, প্রবাসী ১৩৩২ বৈশাখ, পৃ. ৮৪-৮৫।

২ জাপানে কবির ভাষণ— International Relations; Visva-Bharati Quarterly 1925। দ্র. জাতি ও জনসাধারণ, প্রবাসী ১৩৩২ বৈশাখ, পৃ. ৮৪-৮৫।

To the People of Japan, Modern Review, 1925 January।
The Place of Science (Farewell Lecture in Japan), Modern Review, 1925 April।
To the Child (spoken at Kyota Girls' School), Modern Review, 1925 May।
My School (Lecture in Japan), Modern Review, 1925 May।
Notes and Comments (An address to the Indian Community in Japan), Visva-Bharati Quarerly Vol. III, No. I, 1925 April-June।
The Soul of the East (An address to the Japanese passengers on board the S. S. Suwa-Maru), Visva-Bharati Quarterly, Vol. III, No. I, 1925 April-June।

জাপানে প্রায় একমাস কাল থাকিয়া জুন মাসের শেষভাগে কবি দেশাভিমুখে 'সুয়ামারু' জাপানী জাহাজে যাত্রা করিয়া কলিকাতায় ফিরিলেন ২১ জুলাই (১৯২৪)। কবি ভারতের বাহিরে চারি মাস (২১ মার্চ - ২১ জুলাই) ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের চীন-জাপান-সফরের ফল যে কতদূর প্রসারিত তাহার সম্পূর্ণ সংবাদ আমাদের নিকট অজ্ঞাত ছিল। কবি জুলাই মাসে ভারতে ফেরেন; আর সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ায় শাংহাই-তে প্রথম Asiatic Conference আহূত হয়। আমেরিকার বিখ্যাত দৈনিক Christian Science Monitor-এর বিশেষ সংবাদদাতা ৮ই সেপ্টেম্বর যে প্রতিবেদন প্রেরণ করেন ও যাহা ৩ অক্টোবর বস্টনে প্রকাশিত হয় তাহা অত্যন্ত অর্থপূর্ণ। সাংবাদিক লেখেন—

"There is on foot an important movement to establish Asiatic concord through the common culture of Asiatic nations···It has been accentuated by the recent Japanese exclusion legislation in the United States and stimulated by the recent visit to the Far East of Rabindranath Tagore, who preached the doctrines of idealism opposed to western materialism.

"The new feeling is shown in the formation of the Asiatic association in the principal centres, the first of which is located at Shanghai. The formation affected all the Far East, especially Japan. At the inauguration representatives of all Asiatic countries were present.

"Inspiration for the movement is acknowledged to Tagore, whose teachings permeate the issued declaration."[১]

পূর্বএশিয়াকে ও বিশেষভাবে জাপানকে দেখিবার ও বুঝিবার ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথের বহুকালের। বিংশ শতকের গোড়ায় ওকাকুরার সহিত তাঁহার সৌহার্দ্য হইতে এই ইচ্ছার উদয় হয়; ১৯১৬ সালে জাপান ভ্রমণের সুযোগ হয়; কিন্তু চীন-পরিদর্শন ঘটিল এতদিন পরে। ১৯১২ সালে কবি যখন প্রথমবার আমেরিকায় যান, সেসময়ে ওকাকুরা বস্টন-এ ফীল্ড মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ; রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাঁহাকে চীনদেশ দেখিয়া আসিবার জন্য বিশেষভাবে বলেন। কবি লিখিতেছেন— He asked me to visit China... He expressed very profound respect for China ... According to him, China was a great country with endless possibilities...it was his wish that I should know and acknowledge this; and that was another good help which he rendered me. It at once strengthened my interest for that ancient land, my faith in her future, because I could trust him when he expressed his admiration for those people, who are today [1929] living in comparative obscurity, whose lamps of culture are not completety lit up, but who were, according to him, waiting for another opportunity to have the fulness of illumination, shedding

১ Christian Science Monitor, 1924 October 8; Published in the Hindusthan Standard, 1947 May 11. The note was supplied by Sri Pulin Bihari Sen. See also Visva-Bharati News Vol. XV, No. 12, 1947 June, pp. 112-18. সেদিনকার Hindusthan Standard লিখিতেছেন, It is not widely known that soon after the Poet's return from China, an Asiatic Association acknowledging its inspiration to the teaching of Tagore, was organized in Shanghai in 1924 at the inauguration of which representatives of all Asian countries were present. The convention was thus a predecessor to the Asian Relation Conference held in Delhi 23 years later—1947 May 18।

fresh glory upon the history of Asia. when I first met him [Okakura in 190-203], I neither knew Japan nor I had any experience of China. I came to know both of these countries from the personal relationship with this great man."[১]

ওকাকুরার নিকট হইতে চীনের প্রশস্তি শুনিয়া অবধি কবির মন এই প্রাচ্য মহাদেশের প্রাচীন জাতির প্রতি আকৃষ্ট হয়; তারপর ১৯১৬ সালে জাপান বাসকালে চীনের চিত্রকলার নিদর্শন দেখিয়া মুগ্ধ হন। অতঃপর ১৯২১-২২-এ বিশ্বভারতীতে অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি আসিয়া তাঁহার চীন সম্বন্ধে কৌতূহল আরও উদ্দীপ্ত করেন। তখন হইতে শান্তিনিকেতনে চীনাভাষার চর্চার সূত্রপাত; ইহার পূর্ণ পরিণতি হইল চীনাভবন স্থাপন দ্বারা। এ সম্বন্ধে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার 'দ্বীপময় ভারত' গ্রন্থে লিখিতেছেন—

"কবি চীনে গিয়ে সেখানকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সম্মান আকর্ষণ করেছেন। চীনা ভাষায় তাঁর বইও অনেক অনূদিত হয়েছে, চীনেদের মধ্যে তাঁর ভক্ত পাঠক অনেক আছে। তা ছাড়া, ভারত আর চীন, এই দুই প্রাচীন জাত, যারা এক সময়ে ঘনিষ্ঠভাবে সৌহার্দ্য-সূত্রে গ্রথিত ছিল, তাদের মধ্যে আবার যাতে উৎকর্ষের ঐক্য আর মনের মিল নোতুন ক'রে হয়, তার জন্য কবির যে একান্ত আগ্রহ আছে, তার প্রতি চীনাদেরও পূরা সহানুভূতির সৃষ্টি হয়েছে। কবি চান, যাতে আধুনিক ভারতে চীনা ভাষার চীনা সাহিত্যের আর চীনা সংস্কৃতির আলোচনা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর বিশ্বভারতীতে ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম ভালো ক'রে চীনা ভাষায় আলোচনার প্রতিষ্ঠা তিনিই করেছেন; বিখ্যাত ফরাসী চীন-বিদ্যাবিৎ আচার্য (Sylvain Levi) সিলভ্যাঁ লেভির সাহায্যে, লেভির উৎসাহে আর শিক্ষায়, আর পরে রোম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত যুবক অধ্যাপক (Giuseppe Tucci) জুসেপ্পে তুচ্চি'র, এবং চীন-দেশীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত (Ngo Choong Lim) ঙো চিওঙ্ লিম-এর সহযোগিতায়, এখন চীনাভাষা নিয়ে আলোচনা করছেন এই রকম পণ্ডিত একাধিক জন হয়েছেন।

"এঁদের মধ্যে উল্লেখ করতে পারা যায়— সুবিখ্যাত আদর্শ-চরিত্র অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, আর বিশ্বভারতীর গ্রন্থশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, এঁদের দুজনকে। কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত (Ryukwan Kimura) র‍্যুখাঙ্ কিমুরা আগে থেকে একটু চীনা, একটু জাপানী পড়িয়ে আসছেন, কিন্তু এ পর্যন্ত তাতে বিশেষ কোন ফল হয় নি। আচার্য শ্রীযুক্ত লেভির প্রিয় ছাত্র শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী তিন বৎসর প্যারিসে চীনাভাষা, বৌদ্ধধর্ম আর প্রাচ্য সংস্কৃতি অধ্যয়ন ক'রে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম Docteur-es-Letters অর্থাৎ 'সাহিত্যাচার্য' উপাধি নিয়ে দেশে ফিরেছেন।· · ইনি ভারতের চীনা-ভাষায় প্রথম বড়ো পণ্ডিত হয়ে ফিরলেন, এঁর দ্বারা দেশে চীনবিদ্যার প্রতিষ্ঠা হতে অনেক সাহায্য হবে। বাগচী মহাশয়ের চেষ্টার মূলেও রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী।"

১ Address delivered on the 15 May 1929 at the Kogya Kurbu (Industrial Club) Tokyo.—Visva-Bharati News Vol. I. 1933 February, p. 78।

২ প্রবোধচন্দ্র বাগচী (১৮৯৮-১৯৫৬), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-পদ ত্যাগ করিয়া ১৯৪৫ সালে বিশ্বভারতীতে চীনাভবনে গবেষণা-বিভাগের অধ্যক্ষ হিসাবে যোগ দেন। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের অবসর গ্রহণের পর বিদ্যাভবন বা গবেষণা-বিভাগের অধ্যক্ষপদে বৃত হন, ১৯৫৪ সালে বিশ্বভারতীর উপাচার্য নির্বাচিত হন, মৃত্যুকাল পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

দেশে দুইমাস

জাপান হইতে রবীন্দ্রনাথ যেদিন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন সেই দিন (২১ জুলাই) অপরাহ্ণে য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে এক জনসভায় কবি তাঁহার চীন-জাপান সফরের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে মৌখিক ভাষণ দান করিলেন। এই দীর্ঘ ভাষণের একস্থলে তিনি বলেন এশিয়ার সংগঠন প্রভৃতি প্রচারকার্য তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না; তবে এশিয়ার সর্বদেশের মধ্যে যে-একটি মিলনসূত্র আছে, তাহা আবিষ্কারের বাসনাই তাঁহার অন্তরে ছিল। এই ভাষণে বর্মা মালয় ও জাপান সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতার কথা বলেন।[১]

পরদিন (২২ জুলাই) কবি শান্তিনিকেতনে আসিলেন— এবার আশ্রম হইতে চারি মাসের উপর অনুপস্থিত। আশ্রমেও তাঁহার যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা হইল।[২] শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া বিদ্যালয়ের নানা কাজে ও আনন্দ-উৎসবে যথাপূর্ব যুক্ত হইলেন। এই সময়ের একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; সেটি সুসীমো চা-চক্র উদ্বোধন। চীন ভ্রমণকালে চীনা দোভাষী ও কবির নিত্যসহায় সু-ৎসী মো-র নামে এই চা-মজলিশের নামাকরণ হইল। কবি বলেন যে আশ্রমের কর্মী ও অধ্যাপকগণের অবসর সময়ে মিলিত হইবার জন্য এই শ্রেণীর মজলিশের বিশেষ প্রয়োজন— যেখানে উচ্চনীচের ভেদ নাই, অর্থের মান বিচার নাই। তিনি আরও বলেন যে, চীনদেশে চা-পান একটি আর্টের মধ্যে গণ্য। আমাদের দেশের মতো সেখানে ইহা যেমন-তেমন ভাবে সম্পন্ন হয় না। তিনি আশা করেন, চীনের এই দৃষ্টান্ত আমাদের ব্যবহারের মধ্যে একটি সৌষ্ঠব ও সুসঙ্গতি দান করিবে।[৩]

এই সুসীমো চা-চক্রের উদ্বোধন উপলক্ষে কবি একটি সময়োপযোগী গান রচনা করিয়াছিলেন সেদিন দিনেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে তাহা গীত হইল। এই গানের মধ্যে তৎকালীন শান্তিনিকেতনবাসী চা-চক্রের নিত্য সভ্যদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

হায় হায় হায় দিন চলি যায়।
চা-স্পৃহ চঞ্চল চাতকদল চলো চলো চলো হে॥
টগবগ-উচ্ছল কাথলিতল-জল কল' কল' হে।
এল চীনগগন হতে পূর্বপবনস্রোতে শ্যামলরসধরপুঞ্জ॥
শ্রাবণবাসরে রস ঝর'ঝর' ঝরে ভুঞ্জ হে ভুঞ্জ দলবল হে!
এসো পুঁথিপরিচারক তদ্ধিতকারক তারক তুমি কাণ্ডারী।
এসো গণিতধুরন্ধর কাব্যপুরন্দর ভূবিবরণভাণ্ডারী।

১ চীন ও জাপান ভ্রমণ-বিবরণ— ইন্দ্রকুমার চৌধুরীর অনুলেখনের সংশোধিত সংস্করণ। প্রবাসী ১৩৩১ কার্তিক, পৃ. ৮৯-১০১। এই ভাষণে মালয় ও চীনের শ্রমিকদের কথা আছে। দ্র. ভূমিলক্ষ্মী ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৩৩১ আশ্বিন, পৃ. ২২ (শ্রীনিকেতন হইতে প্রকাশিত পত্রিকা)।

২ শান্তিনিকেতন, ৫ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৩৩১ আষাঢ়, পৃ. ১১৫।

৩ এই সূত্রে ব্যক্তিগতভাবে একটি কথা উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না; আমি বহুকাল চা-চক্রের সম্পাদক ছিলাম; কবি বিদেশে যাইতেছেন— কবি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, চা-চক্রটিকে বাঁচাইয়া রাখিবে। তিনি জানিতেন এই মিলনক্ষেত্রে উচ্চনীচ ভেদের কথা সকলে ভুলিয়া সমবেত হইবেন।

এসো বিশ্বভারনত শুষ্করুটিনপথ- মরু-পরিচারণক্লান্ত।
এসো হিসাবপত্তরত্রস্ত তহবিল-মিল-ভুল-গ্রস্ত লোচনপ্রান্ত-ছল' ছল' হে।
এসো গীতিবীথিচর তম্বুরকরধর তানতালতলমগ্ন।
এসো চিত্রী চট'পট' ফেলি তুলিক-পট রেখাবর্ণবিলগ্ন।
এসো কন্‌সটিট্যুশন- নিয়মবিভূষণ তর্কে অপরিশ্রান্ত।
এসো কমিটিপলাতক বিধানঘাতক এসো দিগ্‌ভ্রান্ত টল'মল' হে॥[১]

শান্তিনিকেতনে কয়েকদিন থাকিয়া কবি কলিকাতায় গেলেন। সেখানে বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধে-উপরোধে পড়িয়া একটি বিতর্কের মধ্যে জড়িত হইয়া পড়িলেন। বিষয়টা সংক্ষেপে এইরূপ—

ফরিদপুর জেলার চরমনিয়া নামে এক গ্রামে পুলিশের দুর্ব্যবহার লইয়া দেশের মধ্যে উত্তেজনা ও পত্রিকাদিতে সমালোচনা চলিতেছিল। ইতিমধ্যে জুলাই মাসে (১৯২৪) ঢাকার পুলিসবাহিনীর বার্ষিক মিলনোৎসবে লাটসাহেব লর্ড লিটন এমন-একটি ভাষণ দান করেন, যাহার কদর্থ করা অসম্ভব নহে। সাময়িক পত্রিকাগুলি তাহার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া বলিলেন যে লিটনের বক্তৃতার মধ্যে ভারতীয় নারীর চরিত্রের উপর অশ্রদ্ধাপূর্ণ উক্তি আছে। লিটন যাঁহাদের নিকট ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা জানিতেন যে লিটনের ন্যায় অভিজাতের পক্ষে নারী সম্বন্ধে অপমানকর কথা বলা কঠিন। অথচ দেশের লোকের কাছে তাঁহার বক্তব্য পরিষ্কার করিয়া বলিতেও পারিতেছেন না; কিভাবে তিনি উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করেন, তাহা সমসাময়িক 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশ পাইয়াছিল।

লর্ড লিটন তাঁহার প্রতি যে সব আক্রমণ হয়, তাহার একটা জবাব লিখিয়া ২।৩ অগস্ট বাংলাসরকারের দপ্তরখানায় পাঠাইয়া দেন। কিন্তু কিভাবে তাহা প্রকাশ করা যায় তাহাই হয় সমস্যা; কারণ খবরের কাগজের আক্রমণের প্রত্যুত্তর দেওয়া তখন লাটমর্যাদায় বাধিত। কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোককে লিটনের জবাবটা দেখানো হয়, তাঁহারা উত্তরটা সমীচীন বলিয়া মনে করেন। প্রথমে সার্ দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীকে মধ্যস্থতা করিতে অনুরোধ করা হয়, তিনি রাজি হইলেন না। নদীয়ার মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র তখন লাটসভার মেম্বর— তিনি রবীন্দ্রনাথের নাম করেন। প্রথমে রবীন্দ্রনাথ ইহার মধ্যে থাকিতে রাজি হন নাই। পরে ফজলুল্ হক্ সাহেবের সবিশেষ অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ (২২ অগস্ট ১৯২৪) লাটপ্রাসাদে লিটনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কিভাবে এই জটিল পরিস্থিতির সমাধান করা যায়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করেন। পরদিন রবীন্দ্রনাথের ও লিটনের পত্র সংবাদপত্রে যুগপৎ প্রকাশিত হয়। লর্ড লিটন তাঁহার পত্রে বলেন যে, তিনি আদৌ ভারতীয় নারীর উপর কোনো অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে চান নাই; তবে তাঁহার ভাষণের ভাষায় যদি কোনো ত্রুটি থাকে, তাহার জন্য দুঃখিত। বিষয়টা এইখানে থামিতে পারিত; কিন্তু সাময়িক সংবাদপত্রে আলোচনা বন্ধ হইল না। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ ৩১ অগস্ট শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিয়া লিটনকে আর-একখানি পত্র লেখেন।[২] এই পত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, চরমনিয়ার পুলিসী জুলুমের

১ শান্তিনিকেতন, ৫ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, ১৩৩১ শ্রাবণ, পৃ. ১২৯-৩০। দ্র. গীতবিতান, পৃ. ৫৯৮। তু. দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কবিতা, শান্তিনিকেতন, ১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা ১৩২৬ পৌষ। সমসাময়িক কর্মীদের নাম দিয়া এই কবিতা লিখিত হয়।

২ "In consequence, a considerable number of my countrymen who are honestly hurt at such an untimely expression of faith in the police department and sympathy with its individual members, are ready to challenge your Government to produce trustworthy evidence in support of your statement even about those rare cases of a particular type of conspiracy against public officials."

অব্যবহিত পরে পুলিসের প্রশংসাবাদ এবং নারীদের সম্বন্ধে মন্তব্য করা তাঁহার পক্ষে অশোভন হইয়াছিল। দার্জিলিং হইতে লিটন একখানি জবাব লিখিয়া (৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৪) পাঠান; এই পত্রে তাঁহার সৌজন্য যথেষ্ট প্রকাশ পায়; তিনি তাঁহার উক্তির অন্যরূপ অর্থ হইতে পারে বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন; কিন্তু তাঁহার মূল বক্তব্য অর্থাৎ রাজনৈতিক অভিষ্ট-সিদ্ধির জন্য এক শ্রেণীর নেতারা পুলিসের বিরুদ্ধে স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অত্যাচার হইয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ আনেন— সে কথার প্রত্যাহার করিলেন না। এই সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন, 'incidents which must be familiar to almost every Judicial authority': তাঁহার বক্তৃতার ভাষার জন্য sincere regret প্রকাশ করিলেন।

রবীন্দ্র-লিটন সংবাদ তো মিটিল। কিন্তু পত্রিকাওয়ালাদের টিপ্পনী বন্ধ হইল না; রবীন্দ্রনাথের প্রথম পত্রের প্রথম বাক্য— I am being urged by my countrymen ইত্যাদি ভাষার ভাষ্য চলিল। অর্থাৎ তাহা হইলে কি কবি স্বেচ্ছায় পত্র লিখেন নাই, নিজে অনুভব করেন নাই— ইত্যাদি তাহাদের অনুযোগ। এবার কবি যখন বিদেশে, সেই সময়ে বাংলাদেশের এক দিকপালের তিরোভাব হয়; তিনি সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। দেশে আসিয়া কবি এই পুরুষসিংহের প্রতি তাঁহার যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন তাহার একস্থানে তিনি বলেন, "He [Sir Asutosh] had the courage to dream because he had the power to fight and the confidence to win,— his will itself was the path to the goal"। আশুতোষের সহিত কবির বহুবার সাক্ষাৎ হয়; তিনিই তাঁহার প্রতিভাকে স্বীকার করিয়া তাঁহাকে Doctor of Literature উপাধিতে ভূষিত করেন। আশুতোষের একান্ত ইচ্ছায় কবিই প্রথম 'কমলা লেকচার'এর বক্তা হন ও 'জগত্তারিণী' পদক তাঁহাকেই সর্বপ্রথম প্রদত্ত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু সুবিধা-সুযোগ শান্তিনিকেতন স্কুল পাইয়াছিল— সে তাঁহারই জন্য; আজ কৃতজ্ঞচিত্তে কবি সেসব স্মরণ করিলেন।[১]

এখন দেখা যাক রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনার রূপ। এখানে বলিবার মত বিশেষ কিছু নাই। চীনযাত্রার পূর্বে কবি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতা দেন। গান ছাড়া অন্য রচনা স্বল্পই; কবিতা বহুকাল পরে দেখা দিয়াছিল, কিন্তু চীন সফরে তাহার ছেদ পড়িয়া যায়। এই চারি মাস কোনো প্রকার বাংলা রচনাই চোখে পড়ে না। ইংরেজি রচনা ও অনুবাদে মন দিয়াছেন, কারণ গত বৎসর (১৯২৩) হইতে ইংরেজিতে Visva-Bharati Quarterly নামে একখানি ত্রৈমাসিক প্রকাশিত হইতেছে— সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর হইলেও কবিকেই লিখিতে হয় বেশি; Notes and Comments তাঁরই লেখা।

এই শ্রেণীর খুচরা লেখা বাংলাতেও দুই-একটা চোখে পড়ে বটে। এই সময়ে বিশ্বভারতী-শ্রীনিকেতন হইতে 'ভূমিলক্ষ্মী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন শান্তিনিকেতনের ইতিহাস-অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীনিকেতনের কৃষিবিৎ সন্তোষবিহারী বসু।

প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার প্রথম রচনাটি[২] রবীন্দ্রনাথের। প্রায় এই সময়ে বর্ধমান সমবায় বিভাগ হইতে 'উপায়' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। কবিকে উহার ভূমিকা স্বরূপ কিছু লিখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ লইয়া আসেন বর্ধমান জেলার তৎকালীন কৃষি-অধ্যক্ষ হিরণকুমার বসাক। জীবনী-লেখকের মধ্যস্থতায় কবির একটি রচনা সংগৃহীত হয়। সংক্ষেপে কবি যাহা লিখিয়া দেন, তাহারই মধ্য হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করা যাইতে

১ **Visva-Bharati Quarterly 1924.**

২ **ভূমিলক্ষ্মী, ১৩৩১ আশ্বিন। শ্রীসুধীরচন্দ্র কর, প্রতিবেশী রবীন্দ্রনাথ, মাসিক বসুমতী ১৩৫৭ ফাল্গুন।**

পারে। "উপায় এই শব্দটি শুনিলেই প্রথমেই মনে হয় বাহিরের পন্থা। ছেলে পড়াশুনায় কাঁচা, পাস্ করে কী উপায়ে। নোট মুখস্থ করাও। মনে লোভ আছে, দ্বেষ আছে, শান্তি পাব কী উপায়ে। লোভীরা দ্বেষীরা একত্রে মিলে লীগ অফ নেশনস ফাঁদলে শান্তি পাওয়া যাবে।" আমাদের দেশের দুঃখদৈন্য দূর করিবার জন্য নানা লোকে নানা পথ বাৎলাইতেছেন। কবি বলেন, "আসলে উপায় পথে নয়, পথে যে মানুষ চলবে তার নিজের মধ্যে। যে মানুষ চলতেই পারে না, পথ তাকে চলায় না। আমাদের দেশে যতকিছু দুর্গতি আছে তার মূলগত কারণ হচ্ছে এখানে মানুষ মানুষের সঙ্গে মিলতে পারে না।" আমাদের সমাজে ধর্ম কিভাবে মানুষে মানুষে মিলিবার পথে বাধাস্বরূপ তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া বলিলেন— "যে দেশে মানুষের বিচ্ছেদকেই ধর্ম বলে, সে দেশকে দুর্গতি থেকে কোনো 'উপায়ে' কেউ রক্ষা করতে পারবে না।"[১]

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের লেখনী নিবৃত্ত, কোনো নূতন রচনা চোখে পড়ে না। পাঠকের স্মরণ আছে দেড় বৎসর পূর্বে শিলঙ বাসকালে (১৩৩০ বৈশাখ) যক্ষপুরী নামে একটি নাটকের জোগাড় করেন। এতদিন পরে সেইটি মাজিয়া-ঘসিয়া 'রক্তকরবী' নাম দিয়া প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশ করিলেন (১৩৩১ আশ্বিন)। হাতে বেশি কাজ নাই তাই সেই নাটকটি নিজেই অনুবাদ করিলেন Red Oleanders নাম দিয়া।[২] গতবার য়ুরোমেরিকা সফরের পর পাশ্চাত্য যন্ত্রসভ্যতার (Machine age) উপর কবিমনের বিরূপতা প্রকাশ পায় 'মুক্তধারা'য়। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের আখ্যায়িকা অংশ ইহাতে রূপ লয়। যান্ত্রিকতা মানুষের সহজ শক্তি-সৌন্দর্যকে নষ্ট করিয়া স্তূপীকৃত বস্তুপিণ্ডের উপর তাহার সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রবৃত্ত ; সেই বেদনা রূপকে রূপ লইয়াছে 'যক্ষপুরী' তথা 'রক্তকরবী' নাটকে। এই নাটকখানিতে আধুনিক সভ্যতার সমস্ত প্রশ্ন যেন প্রাণ পাইয়াছে; মানুষ নৈর্ব্যক্তিক হইয়াছে, "যে জিনিসটাকে মন দিয়ে জানা যায় না, প্রাণ দিয়ে বোঝা যায়, তার 'পরে তার দরদ নাই, কারণ আদর্শবাদকে বা ধর্মকে বিশ্বাস করিতে সাহস হয় না তাহার— পাছে সে ঠকে!" এই মারাত্মক দৃষ্টি পৃথিবীকে পাইয়া বসিয়াছে। এই নাটক তাহার প্রতিবাদ। 'রক্তকরবী' প্রকাশিত হইবার ছয় মাস পরে (১৩৩২ বৈশাখ) কবি তাঁহার নূতন নাটক সম্বন্ধে দীর্ঘ এক কৈফিয়ত বা সমালোচনামূলক প্রবন্ধ প্রবাসীতে প্রকাশ করেন, যেমন করিয়াছিলেন 'ফাল্গুনী' লেখার পর। কবি আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে রামায়ণের রূপকের সঙ্গে রক্তকরবীর মর্মকথার মিল গাঁথিয়া দিলেন। রচনাটি হাল্কা ছাঁদে লিখিত হইলেও বক্তব্যটা লঘু নহে।

তিনি বলিতেছেন, "রামায়ণের গল্পের ধারার সঙ্গে এর যে একটা মিল দেখছি, তার কারণ এ নয় যে, রামায়ণ থেকে গল্পটি আহরণ করা। আসল কারণ, কবিগুরুই আমার গল্পটিকে ধ্যানযোগে আগে থাকতে হরণ করেছেন। যদি বলো প্রমাণ কী, প্রমাণ এই যে, স্বর্ণলঙ্কা তাঁর কালে এমন উচ্চ চূড়া নিয়ে প্রকাশমান ছিল, কেউ তা মানবে না। এটা যে বর্তমান কালেরই হাজার জায়গায় তার হাজার প্রমাণ প্রত্যক্ষ হয়ে আছে। ধ্যানের সিঁধ কেটে মহাকবি ভাবীকালের সামগ্রীতে কী রকম কৌশলে হস্তক্ষেপ করেছেন তার আর-একটি প্রমাণ দেব।

"কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণজীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিষম দ্বন্দ্ব আছে, এ সম্বন্ধে বন্ধুমহলে আমি প্রায়ই আলাপ করে থাকি। কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষিপল্লীকে কেবলি উজাড় করে দিচ্ছে। তাছাড়া শোষণজীবী সভ্যতার ক্ষুধা তৃষ্ণা দ্বেষ হিংসা বিলাসবিভ্রম সুশিক্ষিত রাক্ষসের

১ উপায়, ১৩৩১ বৈশাখ-শ্রাবণ। দ্র. প্রবাসী, ১৩৩১ অগ্রহায়ণ, পৃ. ২৩৭।

২ Red Oleanders, Visva-Bharati Quarterly, Vol. II, No II 1924 ; Special Number—Dedicated to L. K. Elmhirst।

মতো। আমার মুখের এই বচনটি কবি তাঁর রূপকের ঝুলিতে লুকিয়ে আত্মসাৎ করেছেন, সেটা প্রণিধান করলেই বোঝা যায়। নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের বক্ষসংলগ্ন সীতাকে স্বর্ণপুরীর অধীশ্বর দশানন হরণ করে নিয়েছিল সেটা কি সেকালের কথা, না এ-কালের? সেটা কি ত্রেতাযুগের ঋষির কথা, না আমার মতো কলিযুগের কবির কথা? তখনো কি সোনার খনির মালিকরা নবদূর্বাদলবিলাসী কৃষকদের ঝুঁটি ধরে টান দিয়েছিল?

"আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে। কৃষি যে দানবীয় লোভের টানে আত্মবিস্মৃত হচ্ছে, ত্রেতাযুগে তারি বৃত্তান্তটি গা-ঢাকা দিয়ে বলবার জন্যেই সোনার মায়ামৃগের বর্ণনা আছে। আজকের দিনে রাক্ষসের মায়ামৃগের লোভেই তো আজকের দিনের সীতা তার হাতে ধরা পড়েছে; নইলে গ্রামের পঞ্চবটীছায়াশীতল কুটির ছেড়ে চাষীরা চটকলে মরতে আসবে কেন? বাল্মীকির পক্ষে এ সমস্তই পরবর্তীকালের, অর্থাৎ পরস্ব। ·· রত্নাকর রাস্তায় ছিলেন দস্যু, তারপরে· দস্যুবৃত্তি ছেড়ে ভক্ত হলেন রামের। অর্থাৎ ধর্ষণবিদ্যার প্রভাব এড়িয়ে কর্ষণবিদ্যায় যখন দীক্ষা নিলেন তখনি সুন্দরের আশীর্বাদে তাঁর বীণা বাজল। এই তত্ত্বটা তখনকার দিনেও লোকের মনে জেগেছে। এককালে যিনি দস্যু ছিলেন তিনিই যখন কবি হলেন, তখন আরণ্যকদের হাতে স্বর্ণলঙ্কার পরাভবের বাণী তাঁর কণ্ঠে এমন জোরের সঙ্গে বেজেছিল। হঠাৎ মনে হতে পারে, রামায়ণটা রূপকথা। বিশেষত যখন দেখি রাম রাবণ দুই নামের বিপরীত অর্থ। রাম হল আরাম, শান্তি; রাবণ হল চীৎকার, অশান্তি। একটিতে নবাঙ্কুরের মাধুর্য: পল্লবের মর্মর, আর-একটিতে শান-বাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে দৈত্যরথের বীভৎস শৃঙ্গধ্বনি।"

আধুনিক যুগের কলীয়তা কবিকে যে কি নিদারুণভাবে আঘাত করিয়াছে— তাহা তাঁহার বহু রচনায় পরিব্যক্ত। সমস্ত সমাজ সভ্যতা শাসন এই নৈর্ব্যক্তিক যান্ত্রিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত। কবির অভিযোগ— মানুষের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত এই শাসন ও শোষণনীতির কার্যকুশলতায় মানবাত্মা আজ উৎক্ষিপ্ত— অন্তরে অন্তরে বিদ্রোহী। যক্ষপুরীর এই ভীষণ কর্মশালায় মানুষ নাই, আছে কর্মী— নৈর্ব্যক্তিক তাদের রূপ, সংখ্যার দ্বারা অভিহিত তাদের ব্যক্তিত্ব।

সেখানে আসিয়াছে নন্দিনী। "রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি নন্দিনী বলে একটি মানবীর ছবি। চারিদিকের পীড়নের ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ। ·· মাটি খুঁড়ে যে পাতালে খনিজ ধন খোঁজা হয় নন্দিনী সেখানকার নয়, মাটির উপরিতলে যেখানে প্রাণের, যেখানে রূপের নৃত্য, যেখানে প্রেমের লীলা, নন্দিনী সেই সহজ সুখের, সেই সহজ সৌন্দর্যের।"

রবীন্দ্রনাথ 'যাত্রী'র এক অংশে রক্তকরবীর মর্মকথাটি স্বয়ং ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[১] নরনারীর সম্বন্ধে ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তিনি বলিতেছেন, "নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায় তাহলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে, তখন মানুষ আপনার সৃষ্ট যন্ত্রের আঘাতে কেবলি পীড়া দেয়, পীড়িত হয়।" ·· "যক্ষপুরে পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে আনচে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য সেখান থেকে নির্বাসিত। সেখানে জটিলতার জালে আপনাকে আপনি জড়িত ক'রে মানুষ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সে ভুলেচে সোনার চেয়ে আনন্দের দাম বেশি। ভুলেচে প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নেই, প্রেমের মধ্যে পূর্ণতা। সেখানে মানুষকে দাস করে রাখবার প্রকাণ্ড আয়োজনে মানুষ নিজেকেই নিজে বন্দী করেচে।" ·· "এমন সময়ে সেখানে নারী এল, নন্দিনী এল;

১ অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী বিস্তৃতভাবে রক্তকরবীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কৌতূহলী পাঠক তাহার দীর্ঘ আলোচনা পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন— বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৮ম বর্ষ ২য় সংখ্যা ১৩৫৬, পৃ. ১১২-২৫। এ বিষয়ে বহুকাল পূর্বে শ্রীভোলানাথ সেন 'রক্তকরবীর মর্মকথা' নামে একখানি পুস্তিকা লেখেন। এ ছাড়াও বহু সাহিত্যিক এই নাটক লইয়া আলোচনা করিয়াছেন।

প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপর, প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধন-জালকে। তখন সেই নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় কী ক'রে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন, এই নাটকে তাই বর্ণিত আছে।"[১]

রক্তকরবী রবীন্দ্রনাথের শেষ রূপক বা রূপকীয় নাটক। শারদোৎসব (১৯০৮), রাজা (১৯১০), ডাকঘর (১৯১২), অচলায়তন (১৯১২), ফাল্গুনী (১৯১৬), অরূপরতন (১৯২০), [মুক্তধারা (১৯২২)] ও তারপর রক্তকরবী (১৯২৬) প্রকাশিত হয়। কবি বলিয়াছেন "শারদোৎসব থেকে আরম্ভ ক'রে ফাল্গুনী পর্যন্ত যতগুলি নাটক লিখেছি, যখন বিশেষ করে মন দিয়ে দেখি তখন দেখতে পাই প্রত্যেকের ভিতরকার ধুয়োটা ওই একই।"[২]

ফাল্গুনীর দশ বৎসর পরে রক্তকরবী প্রকাশিত হয়। আমরা এই নাটকগুলির মধ্যে একটি বিষয়ের সাদৃশ্য দেখিতে পাই— সকলটিতেই রাজা বা গুরু বা সর্দার অন্তরালে অদৃশ্যভাবে বা ছদ্মবেশের আবরণে বিচরণ করিতেছেন। শারদোৎসবে ছদ্মবেশী রাজা উৎসবে সকলের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য এবং আপনার স্বরূপটি আবিষ্কারের জন্য বাহির হইয়াছেন; নাটকের শেষে তাঁহার আত্মপ্রকাশ। অচলায়তনে গুরুর আবির্ভাব রুদ্রবেশে নাটিকার শেষাংশে; তিনিই দাদাঠাকুর, গোঁসাই— শোণপাংশু ও দর্ভকপল্লীতে তাঁহার আনাগোনা। ডাকঘরে রাজার পত্রের জন্য অমলের আকুতি। রাজা অন্ধকার ঘরের দুয়ার ভাঙিয়া নাটকের শেষে অবতীর্ণ হইলেও তিনি অদৃশ্য আছেন। 'রাজা' ও 'রক্তকরবী'র রাজা— একজন আপনার কুৎসিত স্বরূপ লুকাইত রাখিবার জন্য অন্ধকারে গোপনচারী— অপরজন আপনার দুর্জয় শক্তি সঞ্চয় করিয়া লৌহময় জালের অন্তরালে স্বেচ্ছায় আবদ্ধ। ফাল্গুনীতে অন্ধকার গুহা হইতে সর্দারের নিষ্ক্রমণ। রাজা ও রক্তকরবীর রাজাকে রঙ্গমঞ্চে নাটকের শেষাংশে অবতীর্ণ হইতে দেখি। বরাবর তাঁহাদের কথা অন্তরাল হইতে শোনা গিয়াছে, শেষাংশে তাঁহারা পথের পথিক।

এই কয়টি নাটকের মধ্যে রাজা ও ডাকঘরের কোনো জাত নাই, অর্থাৎ ইহারা দেশ-কাল নিরপেক্ষ সৃষ্টি। সেইজন্য পাশ্চাত্যদেশে ডাকঘর ও রাজা সুধীসমাজে এমন সমাদৃত হইয়াছিল।

অচলায়তন ও রক্তকরবীর সেরূপ কোনো বিশ্বজনীন আবেদন (appeal) নাই, অচলায়তনে ধর্মীয়তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম বর্তমানযুগে তাহা প্রায় অর্থহীন; তাছাড়া ইহার মধ্যে বিশেষ ধর্মাচারের পক্ষে ও বিপক্ষে সংলাপ ও মন্ত্রণাদি থাকায় ইহার বিশ্বজনীনতা ব্যাহত। অচলায়তন বিশেষভাবে হিন্দুসমাজের সমস্যা; এবং তাহাকে আঘাত করিবার জন্যই ইহার রচনা; সেইজন্য উহা purposive বা উদ্দেশ্যমূলক রচনা বলিয়া অভিহিত হইতে পারে।

রক্তকরবী শ্রেণীসংঘাত, শোষিত ও শোষকের দ্বন্দ্বকেন্দ্রিক বলিয়া ইহারও আবেদন বিশ্বজনীন হইতে পারে নাই; তবে লৌকিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামের তথ্যরাশি ছাড়াইয়া রঞ্জন-নন্দিনীর প্রেমাবেগই নাটকটিকে অপরূপত্ব দান করিয়াছে, যেমন ঘটিয়াছে 'চার অধ্যায়ে'র কাহিনীতে— অন্তু-এলার প্রেমতত্ত্বে।

এই নাটকগুলিতে সকলেই আপন হাতে-গড়া বস্তুভারাক্রান্ত প্রতিষ্ঠানকে স্বহস্তে ভাঙিয়া চূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। অচলায়তনে গুরু স্বয়ং আয়তনের প্রাচীর ভাঙিবার আদেশ দিলেন; তিনি আয়তনে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, তাঁহারই শিষ্যেরা তাঁহার বিরুদ্ধাচারী, তাঁহাকে অপমান করিতে উদ্যত। আজ খ্রীষ্টের শিষ্যেরা জানে না যে তাহারা প্রতিনিয়ত যীশুকে ক্রুসে বিদ্ধ করিতেছে। কিন্তু অচলায়তনে শেষ পর্যন্ত গুরুরই জয়, সত্যেরই জয়; সে-জয়ের পর

১ যাত্রী, পৃ. ২৯-৩০।

২ আমার ধর্ম, সবুজ পত্র ১৩২৪। দ্র. আত্মপরিচয় (১৩৫০), পৃ. ৬৬।

মহাপঞ্চক ও পঞ্চক— দুই বিরুদ্ধ শক্তি মিলিয়া নূতন আয়তন রচনায় প্রবৃত্ত হইল। সকল বিরুদ্ধ শক্তির সমবায়ে নবসৃষ্টির আয়োজন, ধ্বংসের অন্তে নূতন আয়তনের অভ্যুদয়।

রক্তকরবীতে রাজা শেষকালে আপন সৃষ্টি চূর্ণ করেন— পূজার ধ্বজা স্বহস্তে ভাঙিয়া দিলেন। এখানেও অচলায়তনের ন্যায় তাঁহারই সেবক সর্দারগণ বিদ্রোহী; যে পাপ এতকাল রাজার প্রশ্রয়ে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল— যাহা আকাশচুম্বী হইয়া সূর্যালোককে আচ্ছন্ন করিয়া ছিল— সেই পাপের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ফলিল। তখন রাজা বিদ্রোহী জনতার সহিত মিশিয়া বন্দীশালা ভাঙিতে বাহির হইলেন। রক্তকরবীতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবের অন্তে কোনো স্পষ্ট সমাধানে উপনীত হইতে না দেখিলেও আমরা বুঝিতে পারি যে শোষণযন্ত্রের ধ্বংসকার্য সম্পন্ন হইয়াছে।

দক্ষিণ-আমেরিকার পথে

কবি যখন জাপানে (১৯২৪ মে) সেই সময়ে তিনি দক্ষিণ-আমেরিকার পেরু রাজ্য হইতে তথাকার স্বাধীনতা শতবার্ষিকী উৎসবে যোগদানের আমন্ত্রণ পান। দেশে ফিরিবার পর পেরু যাইবার আলোচনা চলিতেছে। বিদেশের আমন্ত্রণে কবির মন স্বভাবতই উৎফুল্ল হয়; কিন্তু এবার শান্তিনিকেতন ত্যাগের পূর্বে আশ্রমবাসীদের সম্মুখে প্রদত্ত ভাষণ নৈরাশ্যভাবপূর্ণ। বিদেশে চীন-জাপান ভ্রমণকালেও প্রত্যাবর্তনের পর দেশে বাসকালে— এমন কি নিজের আশ্রমে আসিয়া বিশ্বভারতীর মধ্যে এতসব বিরুদ্ধ শক্তি সত্যকে আচ্ছন্ন করিতে দেখিতেছেন যে, তাহাতে কবির মন অত্যন্ত বিষণ্ণ। তিনি আশ্রমবাসীদের বলিলেন, "আমি যে বিশ্বভারতীকে এই ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত করতে পারিনি, সে আমার নিজের দৈন্য— আমি যদি সাধক হতুম, সে-একাগ্রতার শক্তি যদি আমার থাকত, তবে সব আপনিই হত। আজ অত্যন্ত নম্রভাবে সানুনয়ে আপনাদের জানাচ্চি— আমি অযোগ্য, তাই একাজ আমার একলার নয়, এ-সাধনা আপনাদের সকলের। এ আপনাদের গ্রহণ করতে হবে।

"বিদেশে যখন যাই, তখন সর্বমানুষের সম্বন্ধে আমাদের দেশে চৈতন্যের যে ক্ষীণতা আছে তা ভুলে যাই, ভারতের যজ্ঞক্ষেত্রে সকলকে আহ্বান করি। ফিরে এসে দেখি, সে বৃহৎ ভূমিকা কোথায়, বৃহৎ জগতের মাঝখানে যে আমরা আছি. সে-দৃষ্টি কোথায়! আমার শক্তি নেই, কিন্তু মনে ভরসা ছিল, বিশ্বের মর্মস্থান থেকে যে-ডাক এসেছে তা অনেকেই শুনতে পাবে, অনেকে একত্র মিলিত হবে। সেই বোধের বাধা আমাদের আশ্রম থেকে যেন সর্বপ্রযত্নে দূর করি, রিপুর প্রভাবজনিত যে-দুঃখ তা থেকে যেন বাঁচি। . . ছোটো ছোটো মতের অনৈক্য স্বার্থের সংঘাত ভুলে গিয়ে সাধনাকে আমরা বিশুদ্ধ রাখব, সেই উৎসাহ আমাদের আসুক। আমার নিজের চিত্তের তেজ যদি বিশুদ্ধ ও উজ্জ্বল থাকৃত, তা হলে আমি গুরুর আসন থেকে এই দাবি করতুম— কিন্তু আমি আপনাদের সঙ্গে এক-পথেরই পথিকমাত্র; আমি চালনা করতে পারিনে, চাইনে।"[১]

পরদিন প্রাতে বুধবারের মন্দিরে কবি যে ভাষণ[২] দেন তাহাতে বলেন, "মানুষ ঘরছাড়া জীব, মানুষ পথিক। . .

১ যাত্রার পূর্বকথা। দক্ষিণ-আমেরিকা যাইবার জন্য কলিকাতায় আসিবার পূর্বরাত্রে (১৭ ভাদ্র ১৩৩১ ॥ ২ সেপ্টেম্বর ১৯২৪) শান্তিনিকেতনে কথিত। প্রবাসী ১৩৩১ কার্তিক, পৃ. ১-৩।

২ দক্ষিণ-আমেরিকা যাত্রার পূর্বদিন (১৮ ভাদ্র ১৩৩১ বুধবার, শান্তিনিকেতন-মন্দিরে বক্তৃতা)। প্রবাসী ১৩৩১ অগ্রহায়ণ, পৃ. ১৪৫-৪৭।

সে যে চিরপথিক।" কবি নিজে বিশ্বপথিক— তাই বলিলেন "যে-জাতির চলার পাথেয় ফুরোল, চলার সাধনায় যার জড়ত্ব এল, সে-জাতি তার গতির শেষে দুর্গতিতে এসে ঠেকল। ভয়ে-ভয়ে সে-জাতি তার সঞ্চয়ের খোঁটায় নিজেকে বাঁধলে— সেই বন্ধনে তার বিনাশ।" এই ভাষণ তাঁহার নিরন্তর চলিয়া-ফিরিয়া দেশ দেখিবার ইচ্ছার সমর্থনে কথিত হইলেও পাশ্চাত্য জাতিসমূহের অফুরন্ত গতির সমলোচনায় পূর্ণ। পশ্চিম পৃথিবী জানার পথে মুক্তির অন্বেষণ করিয়া বিশ্বজয়ী হইয়াছে— সে বস্তুজগৎকে পাইয়াছে ; কিন্তু বস্তুরাশির সংগ্রহণে ও সংরক্ষণে তাহাদের মধ্যে যে গৃধ্নুতার বিষ সঞ্চিত হইতেছে তাহাতে তাহাদের জয়যাত্রার পথ অবরুদ্ধ ; "যে ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা সে বন্ধন ছেদন করবে কথা ছিল, সেই অস্ত্র নিয়ে সে আজ নিজেকেই মারবে।" বিশ্বপথিক কবির চিরন্তন বাণী "চলতে-চলতে আমরা পাই, আবার ছেড়ে দিতে দিতেই আমরা অগ্রসর হতে পারি।"

শান্তিনিকেতন হইতে ৩রা সেপ্টেম্বর কবি কলিকাতায় আসিলেন— মন বিদেশযাত্রার জন্য উদ্বিগ্ন থাকিলেও 'অরূপরতন' অভিনয়ের কোনো বাধা হইল না। ইতিপূর্বে বর্ষাকালে দুই বৎসর কলিকাতায় বর্ষামঙ্গল ও শরৎকালে শারদোৎসব ও চীনযাত্রার পূর্বে বসন্তোৎসব হইয়াছিল। এবার দক্ষিণ-আমেরিকা যাত্রার পূর্বে অ্যালফ্রেড থিয়েটরে অরূপরতনের মূকাভিনয় হইল (১৪ সেপ্টেম্বর)।

অরূপরতন রাজা নাটকেরই রূপান্তর ; ১৩২৬ সালে ইহা যখন রচিত হয়, কবি তখন সুর-রাজ্যের মধ্যে বাস করিতেছেন ; তাই এই নাটকে গানের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি। গানগুলি নাটকের প্রধান অঙ্গ— সেগুলি না-থাকিলে এই রচনা অসম্পূর্ণ লাগিত, কারণ মূল নাটকের অনেক অংশ এখানে বাদ পড়িয়াছে এবং উহাকে তত্ত্বমূলক রূপক রূপ দান করায় গানই ইহাকে অর্থপূর্ণ ও সরস করিয়াছে। গানগুলি মূকাভিনয়ে রূপ দেওয়া হয়। এই অভিনয়ের দেহভঙ্গিতে কোথাও কোথাও একটু নাচের আমেজ দেখা না গিয়াছিল তা নয়। কবি নাটকের সংলাপাংশ রঙ্গমঞ্চে বসিয়া পাঠ করেন : গানের দল ছিল পিছনে। এই সময় হইতে মেয়েদের মধ্যে সামান্য একটু নাচের চর্চা শুরু হয়— কাঠিয়াবাড়ের ও গুজরাটের লোকনৃত্যের স্পর্শ তাহাতে ছিল।[১]

অরূপরতন অভিনয়ের পরেই কবি ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হন ; শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হইবার পূর্বেই দক্ষিণ-আমেরিকা চলিলেন (১৯ সেপ্টেম্বর)। মাদ্রাজ হইয়া সিংহল কলম্বো পৌঁছিয়া য়ুরোপগামী জাহাজ ধরিবেন।

কবির সঙ্গী হইলেন রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী ও তাঁহাদের তিন বৎসরের পালিতা কন্যা নন্দিনী। আর চলিলেন সুরেন্দ্রনাথ কর। কথা হইল সুরেন্দ্রনাথ ইতালিতে শিল্পকলা পরিদর্শন করিবেন— রথীন্দ্রনাথরা য়ুরোপ বেড়াইবেন। ইতিপূর্বে ১৯১২-১৩ ও ১৯২০-২১ সালের দুই সফরেই রথীন্দ্রনাথ সস্ত্রীক কবির সঙ্গী ছিলেন, এবার পালিতা কন্যাটিকেও লইয়াছেন। স্থির হইয়াছে য়ুরোপ হইতে এবার দক্ষিণ-আমেরিকা সফরে কবির সঙ্গী হইবেন এলমহার্স্ট। এলমহার্স্ট চীন হইতে মে মাসে আমেরিকা ঘুরিয়া ইংলন্ডে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। তিনি ফ্রান্সে কবির সহিত মিলিত হইলেন।

দক্ষিণ-আমেরিকায় কবির গন্তব্যস্থান পেরু। পেরু যাইবার কথা হইলে, কবির ইচ্ছা হইয়াছিল য়ুরোপ হইতে কিউবা হাভানা হইয়া পানামা-খালের মধ্য দিয়া প্রশান্তমহাসাগরে পড়িবেন ও কলোয়া বন্দরে নামিয়া আন্দিজ পর্বতমালা পার হইয়া রাজধানী লিমা-য় পৌঁছিবেন। কিন্তু এপথ নানা অসুবিধার জন্য পরিত্যক্ত হয়। কবির কল্পনাবিলাস মন একবার রাশিয়া হইতে প্যান্-সাইবেরিয়ান রেলপথ দিয়া ভ্রমণের জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল।

১ দ্র. শান্তিদেব ঘোষ, রবীন্দ্রসংগীত (২য় সংস্করণ), পৃ. ২৫০।

যৌবনে গোরুর গাড়ি করিয়া গ্রাণ্ডট্রাংক রোড (শেরশাহ্-সড়ক) ধরিয়া উত্তরভারত ভ্রমণের ইচ্ছা এখানে স্মরণীয়।

পথের কথা বলিবার পূর্বে পেরু-রাজ্যে কবি কি জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছেন সে সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

পেরু দক্ষিণ-আমেরিকার অন্যতম স্বাধীন রিপাবলিক ; প্রায় তিন শত বৎসর মেক্সিকো হইতে আর্জেন্টিনা পর্যন্ত বিশাল ভূভাগ ছিল স্পেনের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যভুক্ত। একমাত্র ব্রাজিল ছিল পোর্তুগীজদের দেশ। উনবিংশ শতকের গোড়ায় এই লাতিন আমেরিকান জাতিরা য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়। সেই স্বাধীনতা স্মরণের প্রথম বৎসর হয় ১৯১০ সালে।

পেরু-রাজ্য স্বাধীনতা লাভ করে ১৮২১ সালের ২৮ জুলাই ; কিন্তু স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধ চলে আরও তিন বৎসর। এই স্বাধীনতা-সমরে সাইমঁ বলিভার (১৭৮৩-১৮৩০) ছিলেন তাহাদের নেতা।

স্পেনের সঙ্গে শেষযুদ্ধ হয় আয়াকুচো-তে[১] ১৮২৪ ডিসেম্বর ৯ : পেরুবাসীরা এই যুদ্ধের দিনটিকে স্বাধীনতার শতবার্ষিকী উৎসবের দিনরূপে উদ্‌যাপন করিতেছে। এই উৎসব উপলক্ষ্যে পেরুসরকার পৃথিবীর বহু বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন— রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদেরই অন্যতম।

রবীন্দ্রনাথ য়ুরোমেরিকার অ্যাংলো-স্যাক্সন ও নর্ডিক জাতির দেশে ঘুরিয়াছেন, ফ্রান্স ছাড়া অন্য কোনো লাতিন জাতির দেশ এখন পর্যন্ত দেখেন নাই। স্পেনীশ সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্পর্শ পান নাই। বিরাট দক্ষিণ-আমেরিকা এশিয়াবাসীর কাছে সম্পূর্ণ অজানা। কবির আরও কৌতূহল, নূতন দেশ নূতন মানুষ দেখিবার জন্য। তাই সাদরে পেরুর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কলিকাতা হইতে মাদ্রাজের পথে কলম্বো গিয়া য়ুরোপগামী জাহাজ ধরিতে হইবে। পথের ঘটনা বিশেষ কিছু নাই এক অভ্যর্থনার উপদ্রব ছাড়া। কবির সহযাত্রী সুরেন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, "দিনরাত্রি যখনই হোক্ বড়ো স্টেশন এলেই লোকের ভিড় এসে গুরুদেবকে ফুল মালা খাদ্য উপহার দিয়েছে ; শেষটা বড়ো অসহ্য হয়ে উঠেছিল ; সব জানালা বন্ধ করে দিতাম যে রাত্রে আর কেউ জ্বালাবে না ; কিন্তু গভীর রাত্রি হোক আর শেষ রাত্রিই হোক ঠিক লোকেরা এসে দরজা ধাক্কা দিয়ে ঘুম থেকে গুরুদেবকে উঠিয়ে মালা, খাবার দিয়ে তবে ছাড়ত ; মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙ্গে দেখি ঘরের ভিতর যত পারে লোক ঢুকেছে। গুরুদেব দাঁড়িয়ে অকূল পাথারে ভাসচেন। গাড়ি না ছাড়লে নিস্তার পেতেন না।"[২]

এবার শরীর খুবই খারাপ লইয়া কবি বিদেশ যাত্রা করিয়াছেন। মাদ্রাজ হইতে লিখিতেছেন, "ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা

১ আয়াকুচো Ayacucho ; Town in Peru : 200 miles SE of Lima (capital ; founded 1539 by Pizarro and known as Guamanga or Huamanga, until 1825 ; decisive battle on small plain of Ayacucho near the village of La Ruinna December 9, 1824 in which the spanish viceroy La Serna was defeated by General Sucre, war of independence for Peru (see Webster's Geographical Dictionary : adapted) ।

"After four months of marching and counter-marching, the two armies met near Ayacucho, a place on the road between Lima and Cuzco, 9,200 ft. above the sea. The Royalists were considerably stronger than the Republicans, who now included detachments from all parts of South America (9310 against 5786) ; but the viceroy [spanish La Serna] was out-manouvered and out-matched by the brilliant generalship of Sucre, and suffered an overwhelming defeat. Ayacucho was the end of Spainsh power in South America.—J. B. Trend, *Bolivar and the Independence of Spainsh America* (1946). p. 184 ।

২ জাহাজের চিঠি, শান্তিনিকেতন ৫ম বর্ষ ১৩৩১, ১১শ সংখ্যা, পৃ. ২১৩-১৪।

ও নানা ঘূর্নিপাকের আঘাতে দেহ মন ভেঙে ছিড়ে বেঁকেচুরে গিয়েছিল, ক্লান্তি ও অবসাদের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে এসে বেরিয়েছিলুম।” কিন্তু এই অবসন্ন দেহে কাব্যলক্ষ্মীর যে অনুগ্রহ লাভ করিলেন, তাহা সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে ; সে হইতেছে কাব্যে ‘পূরবী’ ও গদ্যে ‘পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি’ (যাত্রী)।

কলম্বো হইতে কবি সঙ্গীগণসহ য়ুরোপগামী জাপানী জাহাজ ‘হারুনা-মারু’তে উঠিলেন (২৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৪)। তিনি লিখিতেছেন, “অনেকবার দূরদেশে যাত্রা করেছি, মনের নোঙরটা তুলতে খুব বেশি টানাটানি করতে হয় নি। এবার সে কিছু যেন জোরে ডাঙা আঁকড়ে আছে। · · তবু মনে জানি, ঘাটের থেকে কিছু দূরে গেলেই এই পিছুটানের বাঁধন খসে যাবে। তরুণ পথিক বেরিয়ে আসবে রাজপথে।”—যাত্রী, পৃ. ৬।

কলম্বোতে তখন খুব বর্ষা। “আকাশে ঘন মেঘ, দিগন্ত বৃষ্টিতে ঝাপসা, বাদলার হাওয়া · · কিছুতেই শান্ত হতে চাচ্ছে না। · · যাত্রার মুখে এই রকম দুর্যোগকে কুলক্ষণ বলে মনটা ম্লান হয়ে যায়।”—যাত্রী, পৃ. ৫। “আচ্ছন্ন সূর্যের আলোয় আমার চৈতন্যের স্রোতস্বিনীতে যেন ভাঁটা পড়ে গেছে। জোয়ার আসবে রৌদ্রের সঙ্গে সঙ্গে।”—যাত্রী, পৃ. ২৬। কবির সেই মনের জোয়ার আসিল ‘সাবিত্রী’ কবিতায় (২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৪। পূরবী)। ঐ দিনকার ডায়ারিতে মনের সেই কথাটাই পাই “সূর্যের আলোর ধারা তো আমাদের নাড়ীতে নাড়ীতে বইছে। · · আমার দেহের কোষে কোষে ঐ তেজই তো শরীরী, আমার ভাবনার তরঙ্গে তরঙ্গে ঐ আলোই তো প্রবাহমান। বাহিরে ঐ আলোরই বর্ণচ্ছটায় মেঘে মেঘে পত্রে পুষ্পে পৃথিবীর রূপ বিচিত্র ; অন্তরে ঐ তেজই মানসভাব ধারণ ক’রে আমাদের চিন্তায় ভাবনায় বেদনায় রাগে অনুরাগে রঞ্জিত। সেই এক জ্যোতিরই এত রঙ্‌, এত রূপ, এত ভাব, এত রস। · · সেই জ্যোতিই তো আমার গানে গানে সুর হয়ে পুঞ্জিত হল।”—যাত্রী ২য় সংস্করণ, পৃ. ২৬। ইহার সঙ্গে ‘সাবিত্রী’ কবিতা পঠনীয়।[১]

> তেজের ভাণ্ডার হতে কী আমাতে দিয়েছ যে ভরে
> কেই বা সে জানে।
> কী জাল হতেছে বোনা স্বপ্নে স্বপ্নে নানা বর্ণডোরে
> মোর গুপ্ত প্রাণে।

কলম্বো হইতে যাত্রার পূর্বে একটি বাঙালি মেয়ে[২] তাঁহাকে পত্র দিয়া বলে, তিনি যেন ডায়ারি লেখেন। একটি ক্ষুদ্র বালিকার এই সামান্য অনুরোধ বা দাবিকে কেন্দ্র করিয়া কবিমানস আপন গহন মনের নানা গলি-ঘুঁজিতে ঘুরিয়া বিচিত্রকে দেখিতেছে। কবি লিখিতেছেন, “মনে হল, বাঙালি মেয়ের এই শুভ-ইচ্ছা আমার আজকের দিনের এই বদমেজাজি ভাগ্যটাকে অনুকূল করে তুলবে।”—যাত্রী, পৃ. ৩৯। ইহা হইতে নরনারীর জীবনাদর্শের ভাবনা মনে উদিত হইতেছে। কিন্তু ডায়ারিতে যাহা লিপিবদ্ধ করিতেছেন তাহাকে নিছক নৈর্ব্যক্তিক সাহিত্যিক জল্পনা বলা যায় না ; মনের গুহার অনেক ভাবনা তাঁহার অজ্ঞাতেই প্রকাশ পাইয়া গিয়াছে। মনের মধ্যে যে

১ আমরা লৌকিক ভাষায় যাহাকে ‘গায়ত্রী’ বলি আসলে তাহা বৈদিক এক ছন্দের নাম। এই ছন্দে ‘সবিতৃ’ দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত ঋকমন্ত্র ঋকবেদের ৩ মণ্ডলের (৬২।১০) অন্তর্গত। বহুযুগ হইতে এই ঋকমন্ত্রটি ব্রাহ্মণদের নিকট গায়ত্রীছন্দের একমাত্র পরিচায়ক ; তাই এই মন্ত্রের সাবিত্রী ঋক্‌ নাম প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়া গায়ত্রী নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায় গায়ত্রীছন্দে উদ্‌গীত ‘সাবিত্রী’ মন্ত্রের কথা বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায় “সর্বলোক প্রকাশক, সর্বব্যাপী পূর্ণমঙ্গল জগৎ-প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি”র ধ্যান করিলেন। শান্তিনিকেতন উপদেশমালায় ‘গায়ত্রীর’ ব্যাহৃতি ওঁ, ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ-এর ব্যাখ্যান আছে।

২ পূরবীর ‘শিলঙের চিঠি’ কবিতায় উল্লিখিত শ্রীমতী নলিনী দেবী কবিকে এই পত্র লিখিয়াছিলেন। দ্র. যাত্রী, গ্রন্থ-পরিচয় পৃ. ৩৩৬।

নিঃসঙ্গতা কিছুকাল হইতে তাঁহাকে পীড়িত করিতেছে, তাহার প্রতিঘাতে মন বারে বারে পিছনের দিকে ফিরিতে যায়। অতীত দিনের স্মৃতি থাকিয়া থাকিয়া মনকে ভারাক্রান্ত করে; কিন্তু বিরহ মধুর হয়— স্মৃতির মধ্যে বিচরণেই মনের তৃপ্তি। তাই প্রেমতত্ত্ব লইয়া দীর্ঘ আলোচনা চলে মনে ও ব্যক্ত হয় ডায়ারির পৃষ্ঠায়। বলিতেছেন, "আপন পূর্ণতার জন্যে প্রেম ব্যক্তিবিশেষকে চায়। এই ব্যক্তিবিশেষ জিনিসটি অত্যন্ত বাস্তব জিনিস।" কিন্তু বাস্তব বলিয়া কোনো জিনিস আছে কি না তাহাতেই কবির সন্দেহ। তাঁহার মতে নারী একটা বাস্তবের পিণ্ড মাত্র নহে, সে একটি অনির্বচনীয় সুসমাপ্তির মূর্তি। "অন্তরে বাহিরে হৃদয়ের রাগরঞ্জিত লীলা নিয়ে পুরুষের জগতে নারী মূর্তিমতী কলালক্ষ্মী হয়ে এল। রস যেখানে রূপ গ্রহণ করে সেই কলামূর্তির গুণ হচ্ছে এই যে, তার রূপ তাকে অচল বাঁধনে বাঁধে না" (পৃ. ৫৮)। বিরহলোকেই প্রেম উজ্জ্বল। "নারীর প্রেমে মিলনের গান বাজে, পুরুষের প্রেমে বিচ্ছেদের বেদনা।"

কবিচিত্তের সেই বিচ্ছেদ-বেদনা 'পূর্ণতা' ও 'আহ্বান' (১ অক্টোবর ১৯২৪) কবিতাদ্বয়ে অপরূপ ভাব ও ভাষায় ব্যক্ত। নারী চায় প্রেমের মিলন: সে বলে—

> তুমি দূরে যাও যদি, নিরবধি
> শূন্যতার সীমাশূন্য ভারে
> সমস্ত ভুবন মম, মরুসম
> রুক্ষ হয়ে যাবে একেবারে।
> আকাশবিস্তীর্ণ ক্লান্তি সব শান্তি
> চিত্ত হতে করিবে হরণ—
> নিরানন্দ নিরালোক স্তব্ধ শোক
> মরণের অধিক মরণ।

আর পুরুষ কহে—

> বিরহ বিচিত্র খেলা সারা বেলা
> পাতিবে আমার বক্ষে চোখে।

নারীর বিরহে শোক—পুরুষের বিরহে সৃষ্টি—এরূপ কোনো সাধারণ সিদ্ধান্ত করা যায় কিনা জানি না; তবে পুরুষের বিরহ বেদনায় sublimited হয়। রবীন্দ্রসাহিত্যে বিরহ তাই এত বিচিত্ররূপী।

রবীন্দ্রনাথ একা কেন, সকল দেশেরই ভাবুকচিত্ত এই বিরহেরই কাব্য রচিয়াছেন— তাহার আবেদন বিশ্বজনচিত্ত-মাঝে— তাই তাঁহাদের সংগীত কাব্য এখনো মানবের কণ্ঠহারে শোভমান।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মানসসুন্দরীকে কত নামে কতদিন হইতে কত ছন্দেই না আহ্বান করিয়াছেন। আজও বুঝি সেই মানসী নবরূপে মনোরাজ্যে দেখা দিল। তাই কি লিখিলেন—

> আমারে যে ডাক দেবে, এ জীবনে তারে বারম্বার ফিরেছি ডাকিয়া।
> সে নারী বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার থাকিয়া থাকিয়া।· ·
> নিদ্রাহীন বেদনায় ভাবি, কবে আসিবে পরানে চরম আহ্বান।
> মনে জানি, এ জীবনে সাঙ্গ হয় নাই পূর্ণ তানে মোর শেষ গান।
> কোথা তুমি, শেষবার যে ছোঁয়াবে তব স্পর্শমণি আমার সংগীতে।
> মহানিস্তব্ধের প্রান্তে কোথা বসে রয়েছ রমণী, নীরব নিশীথে। —আহ্বান, পূরবী।

বেদনায় সে ভাবে "কবে আসিবে পরানে চরম আহ্বান"। প্রত্যেক চিন্তাশীল ভাবুকচিত্ত এই চরম আহ্বানের জন্য প্রতীক্ষমান।[১]

চলমান জাহাজের সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াও মনে আজ কিসের আহ্বান— কাহার আহ্বানের জন্য যেন উদ্‌গ্রীব। বাহিরে সমুদ্রের দিকে তাকাইয়া বলে ঐখানেও সেই বিরহ। মহাসাগর দিনরাত্র কাহার অপেক্ষায় যেন আছে! কাহার আহ্বান-লিপি আসিতেছে— তাই যেন প্রশ্ন—

হে ধরণী, কেন প্রতিদিন তৃপ্তিহীন একই লিপি পড় বারে বারে।

'লিপি' (৪ অক্টোবর) কবিতাটি লিখিবার প্রেরণা সম্বন্ধে ডায়ারিতে (৩ অক্টোবর) দীর্ঘ আলোচনা আছে। এই কবিতাটি পড়িতে পড়িতে বহুকাল পূর্বে লেখা 'সমুদ্রের প্রতি' (১৮৯৩ মার্চ) ও কিছুকাল পূর্বে লেখা 'বলাকা'র 'বলাকা' ও 'রূপ' (১৯১৫) কবিতাগুলির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ধরিত্রীকে বিরহিণী কল্পনা করিয়া কবি বিরহিণীর হিয়ার কথাই সামান্যত প্রকাশ করিতেছেন এই কবিতায়। বিরহিণী সে-লিপির যে-উত্তর লিখিতে উন্মনা, 'আজো তাহা সাঙ্গ হইল না'।

কত শিল্পী কত কবি তোমার সে লিপির লিখনে বসে গেছে একমনে।
শিখিতে চাহিছে তব ভাষা, বুঝিতে চাহিছে তব অন্তরের আশা।

সকলেই অব্যক্ত বা নিরুক্ত ভাবকে ভাষা বা রূপ দানে উৎসুক। বিরহ-বেদনা জাগে জীবনের নানা স্মৃত-বিস্মৃত অভিজ্ঞতাপুঞ্জের ক্ষণিক আবির্ভাবে। কবির বিরহী মন হঠাৎ আজ নিরুদিষ্ট 'ক্ষণিকা'র জন্য উতলা হইল— "দিগন্তের কোন্ পারে চলে গেল আমার ক্ষণিকা।" আজ 'বলাকা'র সুরে বলিতেছেন—

ভেবেছিনু গেছি ভুলে ; পদচিহ্নগুলি
পদে পদে মুছে নিল সর্বনাশী অবিশ্বাসী ধূলি।

সে কে, কবি যাকে বলিতেছেন—

হে আত্মবিস্মৃত, যদি দ্রুত তুমি না যেতে চমকি, . .
তা হলে পরমলগ্নে, সখী,
সে ক্ষণকালের দীপে চিরকাল উঠিত আলোকি।

তাই কবি আকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—

খোলো খোলো হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা।
খুঁজিব তারার মাঝে চঞ্চলের মালার মণিকা।

মানুষ চিরদিন এই সাথীর খোঁজে আছে। মনে পড়ে তার বাল্যের খেলার সাথী, তার কৈশোরের কল্পনার

১ রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী'পর্বের কয়েকটি কবিতা প্রবাসীতে (পৌষ ১৩৩১) বাহির হইবার পর সাহিত্যিক জীবনময় রায় 'বীণার নব ঝংকার' নামে কবি-উদ্দেশে যে কথা কয়টি ছন্দে গাঁথিয়া বলিয়াছিলেন তাহা হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্‌ধৃত করা গেল।—প্রবাসী ১৩৩১ পৌষ, পৃ. ৪০৭।

ছন্দের মৃদঙ্গাঘাতে, হে কবীন্দ্র, আবার সহসা প্রাণের হিল্লোলে,
বহুদিন-মৌন বীণা মন্দ্রিল কী গম্ভীর নিঃস্বনে সিন্ধুর কল্লোলে?
যৌবন কি মঞ্জুরিল? বসন্তের সঞ্জীবনী রসে জাগিল আবার
মঞ্জুল-গুঞ্জন ছন্দ, মঞ্জীর-শিঞ্জিত মঞ্জু তান সংগীত মন্দার।

সঙ্গিনী; তার যৌবনের অভিসারিণী, বার্ধক্যের সেবিকাদের কথা। 'খেলা' কবিতায় তাহার রূপ। 'ক্ষণিকা' ও 'খেলা'র মধ্যে যাহা বলিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে একদিনের ডায়ারিতে (৫ অক্টোবর ২৪)—

"· · কিশোর বয়সে যারা আমাকে কাঁদিয়েছিল, হাসিয়েছিল, আমার কাছ থেকে আমার গান লুঠ করে নিয়ে ছড়িয়ে ফেলেছিল, আমার মনের কৃতজ্ঞতা তাদের দিকে ছুটল। তারা মস্ত বড়ো কিছুই নয়; তারা দেখা দিয়েছে কেউ বা বনের ছায়ায়, কেউ বা নদীর ধারে, কেউ বা ঘরের কোণে, কেউ বা পথের বাঁকে। তারা স্থায়ী কীর্তি রাখবার দল নয়, · · তারা চলতে চলতে দুটো কথা বলেছে, সব কথা বলবার সময় পায় নি: তারা কালস্রোতের মাঝখানে বাঁধ বাঁধবার চেষ্টা করেনি, · · অনেকেই এসেছিল ক্ষণকালের জন্য, আধো-স্বপ্ন আধো-জাগার ভোরবেলায় শুকতারার মতো, প্রভাত না হতেই অস্ত গেল। মধ্যাহ্নে মনে হল তারা তুচ্ছ; বোধ হল, তাদের ভুলেই গেছি। তার পরে সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন নক্ষত্রলোক সমস্ত আকাশ জুড়ে আমার মুখের দিকে চাইল তখন জানলুম, সেই ক্ষণিকা তো ক্ষণিকা নয়; তারাই চিরকালের।"— এই উদ্ধৃতাংশ 'যাত্রী'র ৫ অক্টোবর লিখিত (১৯২৪) ডায়ারির (পৃ. ৭৭-৭৮)। 'ক্ষণিকা' লিখিত ৬ অক্টোবর। (তু. স্মরণ, সেঁজুতি)।

কবি আছেন হারুনা-মারুতে। দেড়শত মাইল দূরে 'সুয়ামারু'[১] নামে আর একখানি জাপানী জাহাজ হইতে বেতারে কবির শুভকামনা জানাইয়া খবর আসিল; ধন্যবাদ দিয়া জবাব দিতে হইল। পরদিন সুয়ামারু খুব কাছ দিয়া গেল; সুরেন্দ্রনাথ লিখিতেছেন 'সমস্ত জাহাজ শুদ্ধ লোক গুরুদেবকে cheer করল।'

ইতিমধ্যে স্থির হইয়াছে যে কবি পোর্টসৈয়দে নামিয়া ফিলিস্তানের নূতন ইহুদী রাজ্যের রাজধানী জেরুসালেম যাইবেন। ইহুদীরা রেডিও মারফত জেরুসালেম হইতে স্বাগত জানাইলেন; সৈয়দ বন্দরে আসিয়া খবর পাইলেন ২২ অক্টোবরের মধ্যে ফ্রান্সে পৌঁছিতে, না পারিলে দক্ষিণ-আমেরিকাগামী জাহাজ ধরা যাইবে না। ঐ পথে জাহাজও কম, অবিলম্বে তাঁহাকে ফ্রান্সে পৌঁছিতেই হইবে। নতুবা পেরুতে ডিসেম্বরের উৎসবে উপস্থিত হইতে পারিবেন না। সুতরাং জেরুসালেম যাওয়া বন্ধ হইল। অথচ ফ্রান্সে গিয়া দক্ষিণ-আমেরিকাগামী জাহাজের জন্য অপেক্ষা করিতে হইল।

১১ অক্টোবর (১৯২৪) হারুনা-মারু মার্সাই বন্দর পৌঁছিল। কবি সপরিবারে প্যারিসে চলিয়া গেলেন; সেখানে তাঁহারা কাহ্‌ন-এর অতিথি। ইংলন্ড হইতে এলম্‌হার্স্ট আসিয়া গেলে রথীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ লণ্ডনে চলিয়া গেলেন; প্রতিমা দেবী নন্দিনীকে লইয়া প্যারিসে আঁদ্রে কার্পেলেসের বাড়িতে থাকিলেন। কার্পেলেসের সহিত ঠাকুর-পরিবারের ঘনিষ্ঠতা বহুকালের। কলাভবনের সহিত তিনি কিছুকাল যুক্ত ছিলেন; উহার অন্তর্গত 'বিচিত্রা' নামে কারুসংঘ তাঁহারই চেষ্টায় স্থাপিত হয়।[২]

আঁদ্রের কাছে অবস্থান কালে প্রতিমা দেবী য়ুরোপীয় পটারির (Pottory) কাজ শিক্ষা করেন; পরে দেশে ফিরিয়া তিনি কুটিরশিল্প হিসাবে 'পটারি'র কাজ করেন; শ্রীনিকেতনের শিল্প-ভবনে যে পটারি বিভাগ খোলা হইয়াছিল তাহার পথ-প্রদর্শক প্রতিমা দেবী।

১ জাপানী সুয়ামারু জাহাজে কবি ১৯২৪ সালে ভারতে বোধ হয় ফেরেন। সেই সময়ে জাপানী যাত্রীদের নিকট The Soul of the East নামে ভাষণ দেন। Visva-Bharati Quarterly, Vol. III, no. I, 1925, April-June।

২ শান্তিনিকেতন ১৩২৯ চৈত্র, পৃ. ৩১-৩২। Vichitra. by Andre Karpeles।

সাত দিন প্যারিসে থাকিয়া ১৮ অক্টোবর (১৯২৪) কবি ও এলমহার্স্ট শেরবুর্গ বন্দর হইতে 'আণ্ডেস' জাহাজে উঠিলেন। কবি লিখিতেছেন, "লম্বায় চওড়ায় জাহাজটা খুব মস্ত, কিন্তু আমার শরীরের বর্তমান অবস্থায় আরামের পক্ষে যে-সব সুবিধার প্রয়োজন ছিল, তা পাওয়া গেল না। জাপানী জাহাজের আতিথ্যের প্রচুর দাক্ষিণ্যে আমার অভ্যাসটাও কিছু খারাপ করে দিয়েছিল। সেইজন্য এখানে ক্যাবিনে প্রবেশ করেই মনটা অপ্রসন্ন হল।" —যাত্রী, পৃ. ১২৯।

আণ্ডেস জাহাজে সম্পূর্ণ নূতন পারিপার্শ্বিক, পথ নূতন, গন্তব্যস্থল অজানা, নূতন দেশ, নূতন মানুষের সঙ্গসুখের কল্পনায় কবিমানস উতলা। মনের এই পরিবেশের কথা কবি লিখিতেছেন 'জাভাযাত্রীর পত্রে'—"এবার চলল সমুদ্রযাত্রা সুদীর্ঘ; পরিচিত সঙ্গী কেবলমাত্র একজন, এলমহার্স্ট, বাংলাভাষায় তার কান ছিল না। ডাঙার কোলাহল বহুদূরে। তার উপর শরীর হল অসুস্থ, তাতে ক'রেও সংসারের দায়িত্ব আরো অনেক দূরে দিলে সরিয়ে। বহু বৎসর পরে তাই ছুটি পাওয়া গেল, অল্প বয়সের হালকা জীবনের ছুটি। অমনি কলম আপনি ছুটল কবিতার চেনা রাস্তায়। ক্যাবিনে বসেও কবিতা লেখা চলে, এইবার তার প্রথম আবিষ্কার। ক্যাবিনের খাঁচা বাইরের খাচা, সেটা ভুলতে বেশিক্ষণ লাগে না যদি মনের মধ্যে পর্দা উঠে যায়, যদি ছুটির আকাশ থেকে হু হু করে হাওয়া ছুটে আসে।"

তাই দেখি মধ্যধরণী সাগর পর্যন্ত মনের যে ভাব ছিল, অতলান্তিকে আসিয়া তাহার বেশ পরিবর্তন হইয়াছে; এই পথে রচিত কবিতাগুচ্ছর সুর পূর্বের গুচ্ছ হইতে একটু স্বতন্ত্র, জ্ঞাতিত্ব আছে ভ্রাতৃত্ব নয়। শেরবুর্গ হইতে আর্জেনটাইনের রাজধানী বুয়নোস এয়ারিস তিন সপ্তাহের পথ। এই দীর্ঘকাল জাহাজের অননুকূল পরিবেশে বদ্ধ ক্যাবিনের মধ্যে বাস কবির মন ও শরীরের পক্ষে ভালো হয় নাই। তবে কাব্যলক্ষ্মী দেখা দিলেন— এই কয়দিনে ২৩টি কবিতা (পূরবী) লেখেন, গদ্য রচনা নাই; ডায়ারি লেখা বন্ধ হয় ফ্রান্স পৌঁছিবার পূর্বেই; পুনরায় গদ্য শুরু হয় ফিরতি পথে যখন কবিতা লেখায় ভাঁটা পড়ে। জাহাজের ক্যাবিনে অনভ্যস্ত পরিবেশে মনও অতীত জীবনের মধ্যে বিচরণ করিতে সুখ পায়; সে-সুখ বেদনায় খচিত বলিয়া আরও বেশি করিয়া উপভোগ্য— কারণ জীবনের বেদনাবোধ স্মৃতিতে, বাস্তবে নহে।

শেরবুর্গ হইতে আণ্ডেস জাহাজ ছাড়িল ১৮ অক্টোবর; সেইদিন সাগরের উপরে লিখিলেন 'অপরিচিতা' ও 'আনমনা'। কবির কথা— দূরের ও ভবিষ্যতের অপরিচিতারা তাঁহাকে একদিন স্মরণের মধ্যে আনিতেও পারে— তাহারই সুখকল্পনায় মন তাঁহার নিমগ্ন; সেই অপরিচিতাদের উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—

তোমার পথের ধারে ধারে তাই এবারের মতো
রেখে গেলাম গান গাঁথিলাম যত। · ·
এ গানগুলি তোমার বলে চিনবে কখনো কি।
ক্ষতি কি তায়, নাই চিনিলে সখী!
তবু তোমায় গাইতে হবে, নাই তাহে সংশয়—
তোমার কণ্ঠে বাজবে তখন আমার পরিচয়; · ·
সেদিন আমি আসব না তো নিয়ে আমার দান,
তোমার লাগি রেখে গেলাম গান।

কিন্তু "কতবার ভাবি, গান তো এসেছে গলায়, কিন্তু শোনাবার লগ্ন রচনা করতে তো -পারিনে; কান যদি-বা

খোলা থাকে আন্‌মনার মন পাওয়া যাবে কোথায়। সে-মন যদি তার গদি ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে পারে তবেই-তো যা বলা যায় না তাই সে শুনবে, যা জানা যায় না তাই সে বুঝবে।"[১] এই মনে লিখিয়াছেন—

আন্‌মনা গো, আন্‌মনা
তোমার কাছে আমার বাণীর মালাখানি আনব না।
বার্তা আমার ব্যর্থ হবে— সত্য আমার বুঝবে কবে।
তোমারো মন জানব না, আন্‌মনা গো, আন্‌মনা।

অপরিচিতার জন্য গান রচিতেছেন, এ কথা সত্য কিন্তু যে আনমনা বা অন্যমনস্ক তাহার কানে তাহার বাণী কি পৌঁছিবে। এই কবিতা দুইটি পরস্পরের পরিপূরক বলা যাইতে পারে।

পরদিনে লেখা 'বিস্মরণ' (১৯ অক্টোবর ১৯২৪)— সেখানেও মনের সেই বেদনাকাতর অভিমান। যদি সত্যই ভুলিয়া যাওয়া যায়—

এই সমাদর করো তাহার প্রতি— সময় যখন গেছে তখন তারে ভুলো একেবারে।

আন্‌মনার কাছে তাঁহার বাণীর মাল্য যদি না পৌঁছায় অনাদরে অবহেলায় তাকে গ্রহণ করা কেন?

শুকিয়ে-পড়া পুষ্পদলের ধূলি এ ধরণী যায় যদি বা ভুলি —
সেই ধূলারি বিস্মরণের কোলে নূতন কুসুম দোলে।[২]

মনের এই দ্বন্দ্ব চলে নিরন্তর। তখন বেদনাভরা মনে জাগে অন্তরের অন্তর্নিহিত আশা। জগৎ-সভায় নাম হইবে অমর, সবার কণ্ঠে সংগীত তাহার জড়াইয়া রহিবে নিরন্তর এই ছিল কল্পনা।

কিন্তু সব তো বিস্মৃতিসাগরে ডুবিতে পারে। "নাইবা মনে রাখলে তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাই বা আমায় ডাকলে।" এ তো কবির কথা। আজ সেই কথা অন্য ভাষায় রূপায়িত হইতেছে—

বহুদিন মনে ছিল আশা—
ধরণীর এক কোণে রহিব আপন মনে ;
ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা করেছিনু আশা।. .
. . ধেয়ানের ভাষা করেছিনু আশা।. .
. . কিছু ভালোবাসা করেছিনু আশা।

কবি-মানসের এ যেন চরম আকাঙ্ক্ষা— 'কিছু ভালোবাসা' পাইবার আশা 'যাত্রী'র ডায়ারীতে এই প্রেমেরই তর্কই অনেকখানি জুড়িয়া ; মানুষ জীবনে এই ভালোবাসারই প্রার্থী— 'ধন নয়, মান নয়, শুধু ভালোবাসা।'— কবির নিঃসঙ্গতার আকাঙ্ক্ষা।

শেরবুর্গ হইতে বাহির হইবার দিন চার-পাঁচ পরে "বিষুব রেখা পার হয়ে চলেছি, এমন সময় হঠাৎ কখন শরীর

১ যাত্রী, ক্রাকোভিয়া জাহাজ, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫, পৃ. ১১৪।

২ "মানুষ আর মানুষের কীর্তির মধ্যে সামঞ্জস্য ভেঙে গিয়েছে বলেই আজ মানুষ খুব সমারোহ করে আপনার গোরস্থান তৈরি করতে বসেছে।"—যাত্রী ; ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৪। তু. পঞ্চাশোর্ধ্বে প্রবন্ধ।

গেল বিগড়ে, বিছানা ছাড়া গতি রইল না,— শান্তিহীন দিন আর নিদ্রাহীন রাত। আপনার বুকের দুর্বলতার বিষম একটা বোঝা চাপিয়ে রেখে দিলে— মাঝে মাঝে মনে হত, এটা স্বয়ং যমরাজের পায়ের চাপ।"[১]

এই অবস্থায় 'বিছানায় প'ড়ে প'ড়ে কবিতা লেখা চলল। এই ভাবেই লেখা 'ঝড়' কবিতা—

অন্ধ কেবিন আলোর আঁধার গোলা, বন্ধ বাতাস কিসের গন্ধে ঘোলা। · ·
বিশ্বধারার বক্ষ হতে বিপুল দুঃখের প্রবল বন্যাধারা ;
এক নিমেষে আমারে সে করলে আত্মহারা।

মনের যে বেদনা হইতে কেবিনে 'অসুখের সময় দেশের জন্য ব্যাকুলতা' দেখা দিয়াছিল, তাহারই কাব্যময় রূপ পাই 'দোসর' 'অবসান' 'তারা' ও 'কৃতজ্ঞ' কবিতার মধ্যে। প্রথমে যা ছিল সাধারণ জীবন— দেবতার জন্য আকুলতা, তাহা শেষ হইয়াছে কোন্ বিদেশের জন্য যেন।

দোসর আমার, দোসর ওগো, কোথা থেকে
কোন্ শিশুকাল হতে আমায় গেলে ডেকে।
তাই তো আমি চিরজনম একলা থাকি।

এই প্রসঙ্গে পঠনীয়— "জন্মকাল থেকে আমাকে একখানা নির্জন নিঃসঙ্গতায় ভেলার মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে।"— যাত্রী, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫।

রবীন্দ্রনাথের ন্যায় নিঃসঙ্গ জীবন খুব কম লোকেরই ; লোকজন ভক্ত সেবক-সেবিকাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াও তিনি থাকিতেন পরম বিজনে। কারণ সে ব্যক্তিগত নিবিড় সম্বন্ধ লোকে পায় বলিয়া মনে করে ও তৃপ্তি পাইয়াছে বলিয়া কল্পনা করে, কবির সে প্রকার কোনো মিথ্যাবোধ (illusion) ছিল না। সবার নিকটে থেকেও অসীম দূরে থাকেন। তিনি যেন জলের মাঝারে বাস করিয়া চিরতৃষ্ণার্ত ; এই তৃষ্ণার আকুলিত ধ্বনি ছন্দে ও সংগীতে চিরদিনই মূর্ত হইয়াছে। তাই এক অজানা, এক অপরিচিতা, এক চির-নিরুদ্দিষ্টার জন্য তাঁহার বিরহ-বেদনা সাহিত্যে নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এই নিঃসঙ্গ জীবনে মন সন্ধান করে জীবনের ধ্রুবতারাকে, যে পথহারা হইতে দেয় নাই কোনোদিন। তাই মন বলে (তারা)—

আকাশ-ভরা তারার মাঝে আমার তারা কই।

সমস্ত কবিতাটির মধ্যে একটি আবেগভরা দীর্ঘশ্বাস— কাহার স্মৃতি, কাহার কথা অবরুদ্ধ ভাষার অন্তরাল হইতে দেখা দেয়— 'কানে-কানে কথাটি তার অনেক সুখে দুখে বেজেছে মোর বুকে।' স্পষ্ট হইল মনের বেদনা— কৃতঘ্ন শোক নূতন ভাবে দেখা দিল (কৃতজ্ঞ)—

বলেছিনু 'ভুলিব না' যবে তব ছলছল আঁখি
নীরবে চাহিল মুখে। ক্ষমা কোরো যদি ভুলে থাকি।
সে যে বহুদিন হল। · ·
তবু জানি, একদিন তুমি দেখা দিয়েছিলে বলে
গানের ফসল মোর এ জীবনে উঠেছিল ফলে,

১ "পদধ্বনি, কার পদধ্বনি। দিনশেষে কম্পিত বক্ষের মাঝে এসে কী শব্দে ডাকিছে কোন্ অজানা রজনী।" পদধ্বনি, ২৪ অক্টোবর ১৯২৪— পূরবী।

আজো নাই শেষ ; · · তোমার পরশ নাহি আর,
কিন্তু কী পরশমণি রেখে গেছ অন্তরে আমার · ·

একি বাস্তব ! এ কি সত্য না কবি-কল্পনা ! মনের বিচিত্র ভাবনা রূপ লইতেছে নানা কবিতায় ; জীবনদেবতা বা 'জীবনের ধ্রুবতারা'র স্বপ্ন— তাহার সঙ্গে আছে রোগযন্ত্রণা ও মানসিক অবসাদ। তাই 'মৃত্যুর আহ্বান'কে মনে হইতেছে 'মৃত্যু সে যে পথিকের ডাক'।— ৩ নভেম্বর ১৯২৪। "তখন দুঃখের দন্তটা একটা দীপ্ত আনন্দের মশাল হয়ে জ্বলে ওঠে।"— যাত্রী, পৃ. ১৩১। 'দুঃখ, তব যন্ত্রণায় যে-দুর্দিনে চিত্ত ওঠে ভরি, · · তখন সে মহা-অন্ধকারে অনির্বাণ আলোকের পাই দেখা অন্তর-মাঝারে'।—দুঃখসম্পদ।

আর্জেণ্টিনা

ফ্রান্সের বন্দর শেরবুর্গ ত্যাগের প্রায় তিন সপ্তাহ পরে 'আণ্ডেস' জাহাজ আর্জেন্টিনার বন্দর-রাজধানী বুয়েনোস-এয়ারিস (Buenos Aires)-এ পৌঁছিল। অভ্যর্থনার বন্যা পার হইয়া কবি ও এলমহার্স্ট নগরীর এক হোটেলে উঠিলেন। কিন্তু জাহাজে কবির যে শরীর খারাপ হইয়াছিল, তাহা এখানে আসিবার পর বাড়িয়া চলিল। স্থানীয় চিকিৎসকরা কবির শরীর পরীক্ষা করিয়া পেরুযাত্রা নিষেধ করিলেন ; গম্যস্থল বহু দূরে— ট্রেনকে উচ্চতম গিরি-রেলপথে যাইতে হয়। কবির হৃদ্‌যন্ত্রের যেরূপ অবস্থা তাহাতে এই দীর্ঘপথ অতিক্রমে বিপদের সম্ভাবনা আছে। অতঃপর বুয়েনোস-এয়ারিস হইতে ২০ মাইল দূরে San Isidoro নামক শহরতলীর একটি সুন্দর উদ্যান-বাটিকায় কবির থাকিবার ব্যবস্থা হইল। সমস্ত পাবলিক কাজ বন্ধ করিয়া কবি নিরিবিলিতে বাস করিতে লাগিলেন। কবিকে বুঝানো হইল যে পেরুতে যে শতবার্ষিকী উৎসব হইতেছে তাহা স্বাধীনতা লাভের দিন নহে, উহা আসলে একটি যুদ্ধের স্মরণদিন মাত্র। ইহার মধ্যে কোনো আদর্শবাদ নাই। এই সব ঘটনার মধ্যে ইংরেজের কোনো রাজনীতিক চালবাজি ছিল কিনা, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রয়োজন— কারণ কবির তদারক করিতে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত মাঝে মাঝে আসিতেন।

দক্ষিণ-আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম ও শেষ আসা ; কিন্তু মনসা বা মনোলোকে তিনি লা-প্লাটা নদীর তীরে, পাটাগোনিয়ার তৃণপ্রান্তরে ও আমাজোনের অববাহিকায় দুর্ভেদ্য অরণ্যে বিচরণ করিয়াছেন— হাড্‌সনের বইগুলি পাঠ করিয়া। Hudson-এর *Naturalist in La Plata, Idle-days in Patagonias, Green Masions* বইগুলি কবির ভালো করিয়া পড়া ছিল ; এই বইগুলি তিনি আমাদেরও পড়িবার জন্য উৎসাহী করিয়াছিলেন। কবির সেই স্বপ্নলোকের লা-প্লাটা তীরস্থিত বুয়েনোস এয়ারিস-এ যখন আসিলেন, তখন দেখিলেন তাহা বৃহত্তর য়ুরোপের প্রতিবিম্বমাত্র— হাড্‌সনের লা-প্লাটা অন্তরের দৃষ্টিমাঝেই রহিয়া গেল।

আর্জেন্টিনা স্পেনীশভাষী দেশ। কবির প্রায় সকল গ্রন্থই স্পেনীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে— সুতরাং তিনি অপরিচিত দেশে যে আসেন নাই, তাহা চারিদিকের হৃদ্যতা হইতে বুঝিতে পারিলেন। আর্জেন্টিনা ভারতীয় কবিকে রাজসম্মান দিয়াছিল— এ কথা সমসাময়িক পত্রিকাসমূহ অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করিয়াছিল। বুয়েনোস এয়ারিসে কবি

ছিলেন প্রায় দুইমাস (৭ নভেম্বর - ৪ জানুয়ারি ১৯২৫)। এই সময়ের মধ্যে কবি 'পূরবী' কাব্যের ২৬টি কবিতা লেখেন।[১]

অতলান্তিক মহাসাগরের উপর চলমান জাহাজের কেবিনে বসিয়া মনের যে অবসাদ-ক্লান্ত অবস্থায় 'পূরবী'র কবিতাগুলি লিখিত হয়— সে-পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই লেখনীতে নবীন সুরের ধারা উচ্ছ্বলিত হইল। মানুষ স্থলের জীব— জলবাস তাহার স্বভাববিরুদ্ধ— মন সেখানে ক্লান্ত হয়; পদ্মার উপর নৌকাবাসের সহিত এই অর্ণবপোতে কেবিন মধ্যে আবদ্ধ অবস্থার তুলনা হইতে পারে না। নদীপথে ভ্রমণকালে শ্যামল ধরণীর বিচিত্রশোভা মনকে পুলকিত রাখে— কিন্তু সমুদ্রে— 'জল শুধু জল, দেখে দেখে চিত্ত তার হয়েছে বিকল'।

নূতন দেশে, নূতন পরিবেশের মধ্যে সহজ জীবনানন্দে কাব্যধারা উছলিয়া উঠিল— তাহার সুর সমুদ্র 'পরে লিখিত কবিতা হইতে পৃথক— ইহাতে মানবীয়তার রঙ লাগিয়াছে— করুণ আত্মকেন্দ্রিয়তার ধ্বনি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, মরীচিকার স্বপ্ন নাই— অবাস্তবের জন্য হাহাকার নাই। মন গাহিয়া উঠিল—

স্বর্ণসুধা-ঢালা এই প্রভাতের বুকে যাপিলাম সুখে,
পরিপূর্ণ অবকাশ করিলাম পান।

বুয়েনোস এয়ারিসের শহরতলী সান-ইসাডোরায় পৌঁছিবার চারিদিন পরে লিখিত 'প্রভাত' (১১ নভেম্বর) কবিতা— যখন নূতন পরিবেশের সহিত দেহ ও মনের একটা সহজ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে।

আর্জেন্টিনায় আসিবার পর কবিকে পরম যত্ন করিতেছেন Signore Vittoria da Estrada বা ভিক্টোরিয়া ও ওকম্পু। এই মহীয়সী নারী কবির সঙ্গিনী— তাঁহার অসুস্থ দেহমনের নিত্য সেবিকারূপিণী। এই ভিক্টোরিয়া বা 'বিজয়ার করকমলে' পূরবী কাব্যখণ্ড উৎসর্গ করিয়া কবি ইঁহাকে অমর করিয়া গিয়াছেন। 'অতিথি' কবিতায় লিখিয়াছেন—

প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করি দিলে নারী,
মাধুর্য সুধায়; কত সহজে করিলে আপনারি
দূরদেশী পথিকেরে; · ·

"ভিক্‌টোরিয়া ইংরেজি খুব ভাঙা-ভাঙা বলতেন, ফরাসী ভাষাতেই তাঁর দক্ষতা ছিল বেশি। তাঁকে সুন্দরী বলা চলে না। কিন্তু বুদ্ধির প্রখরতা তাঁর মুখে একটি সৌন্দর্যের দীপ্তি এনে দিত। তাঁর বড়ো বড়ো কালো পল্লব-ঢাকা গাঢ় নীল চোখে একটি স্বপ্নময় আকর্ষণী ক্ষমতা ছিল। তাঁর দীর্ঘ দেহ গৌরবময় আভিজাত্যের পরিচয় দিত। তিনি যখন নতজানু হয়ে বাবামশায়ের পায়ের কাছে বসতেন, মনে হোত ক্রাইস্টের পুরানো কোনো ছবির পদতলে তাঁর হিব্রু ভক্ত মহিলার নিবেদন-মূর্তি।"[২]

নূতন পরিবেশের মধ্যে কবির লেখনীতে যৌবনের জোয়ার-সংগীত অকস্মাৎ দেখা দিল; কয়দিন পূর্বে 'আশা' করিয়াছিলেন 'ধন নয়, মান নয়, শুধু ভালোবাসা'। আজ সেই ক্লান্ত দেহমন নারীর স্নেহসিক্ত সেবায় যেন পুনর্জীবিত হইয়া উঠিল। যাত্রীর ডায়ারিতে একস্থানে লিখিয়াছেন, "এবার ক্লান্ত দুর্বল শরীর নিয়ে বেরিয়েছিলুম, তাই অন্তরে যে নারী-প্রকৃতি অন্তঃপুরবাসিনী হয়ে বাস করে, ক্ষণে ক্ষণে সে আপন ঘরের দাবি জানাবার সময় পেয়েছিল।"

১ 'শীত' হইতে 'পথ' কবিতা। ১০ নভেম্বর হইতে ২৯ ডিসেম্বর ১৯২৪।

২ প্রতিমা ঠাকুর, নির্বাণ। প্রতিমা দেবী ইঁহাকে দেখেন ১৯৩০ সালে ফ্রান্সে।

পুনরায় বলিতেছেন, "ভালোবাসার পূর্ণতা আত্মিক, সে হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিস্বরূপের (Personality) পরম প্রকাশ।" কিন্তু আত্মিক বলিয়াও কহিতেছেন "ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে অপরিমেয়কে পাওয়া এবং স্বীকার করাই অপরিমেয়কে সীমার মন্দিরে জাগিয়ে তোলবার শক্তি। · · এই ব্যক্তিগত প্রেমের বাহন নারী।" এইভাবে কবির মনে প্রেমের অশেষ লীলা চলিতেছে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রেম কোনোদিনই বিশেষের মধ্যে শেষ-আশ্রয় পায় নাই। চিরদিনই কবি ভালোবাসিয়াছেন, কিন্তু আমরা লৌকিক ভাব হইতে যাহাকে 'প্রেম' আখ্যা দিই— সেই শ্রেণীর প্রেম তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে পারে নাই। আজ নূতন পরিবেশে পুলকিত মনে কবির স্মরণ হইতেছে 'কিশোর প্রেমে'র কথা—

অনেক দিনের কথা সে যে অনেক দিনের কথা ; · ·
এই জীবনে সেই তো আমার প্রথম ফাগুন মাস।
ফুটল না তার মুকুলগুলি,
শুধু তারা হাওয়ায় দুলি
অবেলাতে ফেলে গেছে চরম দীর্ঘশ্বাস—
আমার প্রথম ফাগুন মাস। · ·
পুরানো এই ঘাটের ধারে
ফিরে এলো কোন্ জোয়ারে
পুরানো সেই কিশোর-প্রেমের করুণ ব্যাকুলতা ?
সে যে অনেক দিনের কথা।

কোন্ অতীতের স্মৃতি জাগে নবীন প্রেমের অভিঘাতে— কে তা জানে ? অবচেতনের গহন তল হইতে ক্ষণে ক্ষণে জাগে পরিবেশের অনুকূল বা প্রতিকূল অভিঘাতে। "আমার ভোলা সামগ্রীগুলো চৈতন্যের রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে নীচের তলায় নেপথ্যে এসে জড়ো হয় ; সেখানে নতুন-নতুন বেশ-পরিবর্তনের সুযোগ ঘটে ! আমার মনটাকে বিধাতা নাট্যশালা করতে ইচ্ছা করেছেন, তাকে তিনি জাদুঘর বানাতে চান না। তাই, জমা করে পাওয়া আমার লোকসান, হারিয়ে হারিয়ে পাওয়াই আমার লাভ।"—২৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৪, যাত্রী পৃ. ৩১। সেই বিরহই তাঁহার মনে জাগায় দুঃখের আনন্দ ; সেই দুঃখের আনন্দ হইতেই হয় কবিতার জন্ম। যাহাকে ভালোবাসা যায় তাহাকে দুঃখের ভাগী না করিয়া নিজেই সেই সুমধুর বিরহকে ভোগ করিবার জন্য কবিচিত্ত ব্যাকুল।

পাছে আমার একলা প্রাণের ক্ষুব্ধ ডাকে
রাত্রে তোমায় জাগিয়ে রাখে,
সেই ভয়েতেই মনের কথা কই না খুলে—
ভুলতে যদি পার তবে
সেই ভালো গো, যেয়ো ভুলে।

আর নিজের জন্য থাকিল—

তোমার দেখা স্মৃতি নিয়ে
একলা আমি যাব ফিরে। —আশঙ্কা, পূরবী।

এই প্রেমাদর্শ কবির আবাল্যের সম্পদ ; তাঁহার প্রেম নিরাসক্ত— কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক নহে— বিশেষকে কেন্দ্র করিয়াই

তো অশেষের সম্ভোগ। তিনি যাহাকে প্রেম নিবেদন করিয়াছেন— সে হইতেছে নারী— বিশেষ নারী উপলক্ষ্য মাত্র—

রাত্রি যবে হবে অন্ধকার বাতায়নে বসিয়ো তোমার।
সব ছেড়ে যাব, প্রিয়ে, সমুখের পথ দিয়ে,
ফিরে দেখা হবে না তো আর।
ফেলে দিয়ো ভোরে-গাঁথা ম্লান মল্লিকার মালাখানি।
সেই হবে স্পর্শ তব, সেই হবে বিদায়ের বাণী। — শেষ বসন্ত, পূরবী।

যৌবনের প্রারম্ভ দিনে এই কথাই অন্য ভাষায় বলিয়াছিলেন 'দুদিন' কবিতায় (ভারতী ১২৮৭ জ্যৈষ্ঠ)।

আজ 'বিদেশী ফুল' উপলক্ষ্যে বিদেশিনীর উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—

হাসিয়া দুলাও মাথা ; জানি জানি, মোরে ক্ষণে ক্ষণে
পড়িবে যে মনে।
দুই দিন পরে চলে যাব দেশান্তরে,
তখন দূরের টানে স্বপ্নে আমি হব তব চেনা—
মোরে ভুলিবে না।

কবি যে-প্রেমের কথা বলিতেছেন— তাহার রূপ —

মৌমাছির মতো আমি চাহি না ভাণ্ডার ভরিবারে
বসন্তের ব্যর্থ করিবারে।· ·
পাখির মতন মন শুধু উড়িবার সুখ চাহে
উধাও উৎসাহে। —মধু[১], পূরবী।

আত্মবিশ্লেষণ দ্বারা কবির সদা সজাগ চিত্ত জানে তাঁহার মনের গতির কথা ; তিনি জানেন তাঁহার মনের গহনে কেহ প্রবেশ করিতে পারে নাই— 'বহু-কক্ষে-ভাগ-করা হর্ম্যের মতন'— 'চাবি' তার কোথায় কেহ জানে না ; তবুও ভাবেন—

দূরে চেয়ে থাকি একা—
মনে করি যদি কভু পাই তার দেখা

১ শেষের কবিতায় 'বিপাশা'য় কবি বলেন—

আমার কথা শুধাও যদি— চাবার তরে চাই,
পাবার তরে চিত্তে আমার ভাবনা কিছু নাই।...
চাই না তোমায় ধরতে আমি মোর বাসনায় ঢেকে—
আকাশ থেকেই গান গেয়ে যাও, নয় খাঁচাটার থেকে।

যে পথিক একদিন অজানা সমুদ্র উপকূলে
কুড়ায়ে পেয়েছে চাবি ;
খুলিবে সে গুপ্তদ্বার কেহ যার পায় নি সন্ধান।[১]

'পথ' কবিতায় বলিতেছেন—

জীবনের সৌধ-মাঝে কত কক্ষ, কত-না মহলা,
তলার উপরে কত তলা।
আজন্মবিধবা তারি একপ্রান্তে রয়েছি একাকী,
সবার নিকটে থেকে তবুও অসীম দূরে থাকি।
লক্ষ্য নহি উপলক্ষ্য, দেশ নহি আমি যে উদ্দেশ—
মোর নাহি শেষ। · ·
তাই আমি চিররিক্ত, কিছু নাহি থাকে মোর পুঁজি—
কিছু নাহি পাই, নাহি খুঁজি ![২]

কবির এই চিররিক্ত মনে যাহারা ক্ষণিকের আশ্রম পায়, তাহারা কবির ছন্দে বাঁধা পড়ে চিরকালের মতো কবিতারূপে—

কতবার খেয়ার তরণী
এসেছিল এই ঘাটে আমার এ বিশ্বের আলোতে। · ·
যে সুন্দর বসেছিল মোর পাশে এসে
ক্ষণিকের ক্ষীণ ছদ্মবেশে,
হে চিরমধুর
দ্রুতপদে চলে গেল নিমেষের বাজায়ে নূপুর,
প্রলয়ের অন্তরালে গাহে তারা অনন্তের সুর। — বৈতরণী, পূরবী।

আপনার মনোলোকে স্বপনে-বাস্তবে গড়া প্রেমলীলা ছন্দে মুখরিত হইতেছে ; কিন্তু বাস্তব জগতের স্পর্শও তো লাগে।

দেশের সংবাদ এই সুদূর স্পেনীশভাষীদের রাজ্যে প্রকাশিত ইংরেজি পত্রিকায় বিশেষ-কিছুই থাকে না। দেশের যাহা-কিছু সংবাদ পান, তাহা পত্র মাধ্যমে ; সেসব পত্র আসিতেও মাসাধিক কাল লাগে— বিমানপথে ডাক-চলাচল তখনো অজ্ঞাত।

কবির দেশ ছাড়িবার পর তিন মাসের মধ্যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বহু ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে।

১ তু. স্বপন-পারের ডাক শুনেছি ; জেগে তাই তো ভাবি—
কেউ কখনো খুঁজে কি পায় স্বপ্নলোকের চাবি॥ ···
খুঁজে যারে বেড়াই গানে, প্রাণের গভীর অতল-পানে
যে জন গেছে নাবি,
সেই নিয়েছে চুরি করে স্বপ্নলোকের চাবি॥ — গীতবিতান, পৃ. ৫৫৩।

২ তু. জন্মদিনে (২১ জানুয়ারি ১৯৩৯)। সব চেয়ে দুর্গম যে-মানুষ আপন অন্তরালে। তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।

বোধ হয় ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট হইতে এক পত্রে জানিতে পারিলেন যে গত ২৪ অক্টোবর অর্ডিনান্স জারি করিয়া বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট বহু যুবককে অন্তরীণাবদ্ধ করিয়াছে। এই আলোচ্যপর্বে বাংলাদেশে চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে পরিচালিত স্বরাজ্য দল অত্যন্ত প্রবল। সেই দল কাউন্সিলের মধ্যে ও বাহিরে নানাভাবে গবর্মেণ্টকে সর্বদা বিব্রত করিতেছিল। এই স্বরাজ্যদলকে দমন করিবার জন্য এই অর্ডিনান্স পাস হয়। এই সংবাদ পাইয়া কবি ২০ ডিসেম্বর দিনেন্দ্রনাথকে এক কবিতা-পত্র পাঠান—

ঘরের খবর পাইনে কিছুই, গুজব শুনি নাকি
কুলিশপাণি পুলিশ সেথায় লাগায় হাঁকাহাঁকি।
শুনছি নাকি বাংলাদেশে গান হাসি সব ঠেলে,
কুলুপ দিয়ে করছে আটক আলিপুরের জেলে।

এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টার ন্যায় বলিলেন—

প্রতাপ যখন চেঁচিয়ে করে দুঃখ দেবার বড়াই,
জেনো মনে, তখন তাহার বিধির সঙ্গে লড়াই।
দুঃখ সহার তপস্যাতেই হোক বাঙালির জয়—
ভয়কে যারা মানে তারাই জাগিয়ে রাখে ভয়,
মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে,
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে।

এই পত্র-কবিতা লেখার দুই দিন পরে সাতই পৌষ (১৩৩১), শান্তিনিকেতন হইতে দূরে, বহুদূরে থাকিয়াও সে-দিনটির কথা ভুলেন নাই; ৬ পৌষ এন্‌ড্রুজকে লিখিতেছেন, "Tomorrow I shall join your festival from a distance and try to fill my heart with my yearly provision of *Shanti*"। খ্রীষ্টজন্মদিনে সান-ইসাডোরার নিরালায় এলমহার্স্ট প্রভৃতি কয়েকজনকে লইয়া উপাসনা করিলেন; কবি এই শুভদিনের মর্মকথাটি বলিলেন।[১]

ইতিমধ্যে চাপাড মালাল নামক স্থান ঘুরিয়া আসেন; বোধ হয় এই স্থানপরিবর্তন হইতে কবিতার সুরের মধ্যেও পরিবর্তন আসিয়াছে। বুয়েনোস এয়ারিস বাসকালে শেষ কয়দিনের মধ্যে রচিত পূরবীর কবিতাগুলি পাঠ করিলে এই হাওয়া-বদলের আভাস পাওয়া যাইবে।

এই বিচিত্র জীবনধারা ও অনুভূতির মধ্যে মানুষ রবীন্দ্রনাথের মনে পড়ে 'তিন বছরের প্রিয়া'র কথা— যাহাকে ফ্রান্সে ফেলিয়া আসিয়াছেন।[২] বুয়েনোস এয়ারিসে রচিত শেষ কবিতার মধ্যে বলিলেন "'শুধু শিশু বোঝে মোরে, আমারে সে জানে ছুটি ব'লে, ঘর ছেড়ে আসে তাই চলে।" রবীন্দ্রসাহিত্য ও তাঁহার পত্রধারা যাঁহারা স্থিরচিত্তে পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন শিশুর প্রতি কবির কী অনুকম্পা।

আর্জেন্টিনা হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় হইল: ৩০ ডিসেম্বর (১৯২৪) আর্জেন্টিনা-রিপাবলিকের প্রেসিডেণ্ট

১ Visva-Bharati Quarterly, Vol. III, 1925 July-September; pp. 172-180: Notes and comments (spoken in South America on the significance of Christmas anniversary)।

২ তৃতীয়া (৪ ডিসেম্বর); বিরহিণী (২০ ডিসেম্বর); পথ (২৯ ডিসেম্বর)— পূরবী। কবির পুত্র ও পুত্রবধূর পালিতাকন্যা নন্দিনী। "পৃথিবীতে আমার প্রেয়সীদের মধ্যে যিনি সর্বকনিষ্ঠ তাঁর বয়স তিন।" ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫। যাত্রী ২য় সংস্করণ, পৃ. ১১০।

অলবিয়ার (Dr. Marcelo Torcuato de Alvear, 1922-28)-এর সহিত কবি সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন ; ৪ জানুয়ারি (১৯২৫) ইতালীয় জাহাজ জুলিয়ো চেজারে (Giulio Cessara) য়ুরোপ যাত্রা করিলেন।

কবি পেরু গবর্মেণ্টের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিলেন না বলিয়া তিনি তাঁহার জন্য ব্যয়িত অর্থ স্টেটকে ফিরাইয়া দিবার প্রস্তাব পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু পেরু-সরকার তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন, কারণ কবি তো তাহাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিলেন ; সুতরাং অর্থ প্রতিগ্রহণের প্রশ্ন উঠে না। আর্জেন্টিনা-সরকারও তাঁহার প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিলেন।

কবির এই প্রত্যাবর্তন ও 'বিজয়া' সম্বন্ধে প্রতিমা দেবী তাঁহার 'নির্বাণ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, তাহা উদ্‌ধৃত হইল— "বাবামশায় দক্ষিণ-আমেরিকার গল্প প্রায়ই করতেন · · 'যদি বা ফেরবার জাহাজ পাওয়া গেল কিন্তু ভিক্‌টোরিয়া আমাকে কিছুতেই ছাড়তে চায় না। [এলমহার্স্ট] সাহেবের সঙ্গে তাঁর ছিল একটু রেষারেষির সম্পর্ক, কারণ সাহেব সর্বদা আমার কাছাকাছি থাকত, সেটা সে সইতে পারত না। অবশেষে সে ভাবলে সাহেব আমাকে নিজের স্বার্থের জন্য এত তাড়াতাড়ি ইংলণ্ডে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে ; গেল সাহেবের উপর খাপ্পা হয়ে। স্প্যানিসরা ভাবপ্রবণ জাত, ওদের সামলানো বড় কঠিন, তবে এই জাতই আবার পারে আবেগের উদ্দীপনায় আত্মোৎসর্গ করতে। এই বিদেশিনীর মধ্যে দেখেছিলুম সেই অনুরাগের আগুন।'

"এই মহিলাটি তাঁর জন্যে কতদূর ত্যাগ স্বীকার করতে পারতেন তার পরিচয় পরে পাওয়া গিয়েছিল। এদিকে অনেক হাঙ্গামা করে জাহাজ তো ঠিক হল, ভিক্‌টোরিয়া cabin de luxe রিজার্ভ ক'রে দিলেন, পাছে বাবামশায়ের সমুদ্রপথে কোনো কষ্ট বা অসুবিধে হয়। তাতেও তিনি সন্তুষ্ট হোতে না পেরে তাঁর নিজের ড্রইংরুমের একখানি আরামচেয়ার জাহাজে তুলে দিলেন ; এই নিয়ে জাহাজের ক্যাপটেনের সঙ্গে তাঁর আরেকবার তর্ক লাগল। কিন্তু ভিক্‌টোরিয়াকে কেউ পেরে উঠত না। অত বড়ো চেয়ার জাহাজের দরজায় প্রবেশ করবে না, এই ছিল ক্যাপটেনের আপত্তি ; কিন্তু শেষকালে ম্যাডামেরই জয় হল : মিস্ত্রী ডাকিয়ে দরজা খুলে সেই চেয়ার কেবিনে দেওয়া হল।

"সেই চৌকিখানি নানাদেশ ঘুরে অবশেষে উত্তরায়ণে পৌঁছেছিল। অনেকদিন আর তিনি ওই চৌকি ব্যবহার করেননি, আমাদের কাছেই পড়ে ছিল। আজ আবার ব্যামোর মধ্যে দেখলুম ওই চৌকিখানিতে বসা তিনি পছন্দ করছেন, সমস্ত দিনই প্রায় ঘুম বা বিশ্রামান্তে ওই আসনের উপর ব'সে থাকতেন।"

এই চৌকি সম্বন্ধে তাঁহার 'শেষলেখা'-য় দুইটি কবিতা আছে[১]।—

রৌদ্রতাপ ঝাঁঝাঁ করে
জনহীন বেলা দুপহরে।
শূন্য চৌকির পানে চাহি,
কোথায় সান্ত্বনালেশ নাহি।
বুক ভরা তার
হতাশের ভাষা যেন করে হাহাকার।

১ ৪ সংখ্যক (২৬ মার্চ, ১৯৪১), ৫ সংখ্যক (৬ এপ্রিল ১৯৪১)।

শূন্যতার বাণী ওঠে করুণায় ভরা
মর্ম তার নাহি যায় ধরা। . .
চৌকির ভাষা যেন আরো বেশি করুণ কাতর,
শূন্যতার মূক ব্যথা ব্যাপ্ত করে প্রিয়হীন ঘর।

অপর কবিতাটির শেষ দুই স্তবক উদ্ধৃত হইতেছে।

বিদেশের ভালোবাসা দিয়ে
যে প্রেয়সী পেতেছে আসন
চিরদিন রাখিবে বাঁধিয়া
কানে কানে তাহারি ভাষণ।

ভাষা যার জানা ছিল নাকো,
আঁখি যার কয়েছিল কথা,
জাগায়ে রাখিবে চিরদিন
সকরুণ তাহারি বারতা।

বুয়েনোস এয়ারিস বন্দর ত্যাগের (৪ জানুয়ারী) পর সমুদ্রবক্ষে কবি চারটি কবিতা লেখেন— মিলন, অন্ধকার প্রাণগঙ্গা ও বদল। শেষ কবিতা 'বদল' বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার : বিদেশী 'নিদয়া সে মনোহরা'র কথাই সুস্পষ্ট—

হাসির কুসুম আনিল সে ডালি ভরি,
আমি আনিলাম দুখবাদলের ফল। . .
সে লইল তুলে আমার ফলের ডালা, . .
আমি লইলাম তাহার ফুলের মালা। . .
'মোর হল জয়' হেসে হেসে কয়,
দূরে চলে গেল ত্বরা। . .
সন্ধ্যায় দেখি তপ্তদিনের শেষে
ফুলগুলি সব ঝরা।[১]

কবির নিরাসক্ত মনের কথা ব্যক্ত হইয়াছে একদিনের পত্রের একটি পংক্তিতে 'পেয়েচি মনে করার মতো হারানো আর নেই।' ইহাই কবির পাওয়া-না-পাওয়ার মূল তত্ত্বকথা।

১ 'বাদল' কবিতাটি গানে রূপায়িত করেন 'তার হাতে ছিল হাসির ফুলের হার— কত রঙে রঙ-করা।'— গীতবিতান, পৃ. ৬৬৯। তু. ইতিপূর্বে রচিত গান— 'তোমার বীণায় গান ছিল আর আমার ডালায় ফুল ছিল গো' (গীতবিতান, পৃ. ৬৬৮)। ইহা রচিত হয় ২৯ চৈত্র, ১৩২৯ ॥ ১২ এপ্রিল ১৯২৩।

ইতালিতে পক্ষকাল

জুলিয়ো চেজারে ইতালীয় জাহাজ— গন্তব্যস্থান ইতালির বন্দর জেনোয়া। বুয়েনোস এয়ারিসে বাসকালে কবি ইতালিতে নামিয়া যাইবার নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলেন। এনড্রুজকে এক পত্রে লিখেন (২২ ডিসেম্বর ১৯২৪), "I know that in Italy I shall have a welcome; for from various sources I have heard that the people there are eagerly expecting me, and that my books are very widely read"। ইতালি সম্বন্ধে কবির এই উদ্ভাসিত ধারণার উৎস কী, তাহা আমরা জানি না। আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথের কবিসুলভ সরলতা হইতে অনেক সময়ে সামান্য বিষয়কে আপনার মনের রঙে রঙাইয়া বিপুল করিয়া দেখিতেন।

রবীন্দ্রনাথ যখন ইতালিতে পদার্পণ করিলেন তখন ইতালির সর্বময় কর্তা মুসোলীনি। ইতালিতে রাজা আছেন ইমানুয়েল: কিন্তু যুদ্ধের পর রুশীয় বিপ্লবের সাফল্যে সোস্যালিস্টরা উৎসাহিত হইয়া উঠে। কিন্তু বিপ্লবের জন্য তাঁহাদের প্রস্তুতি ছিল না। তার পর ১৯২১ হইতে তাহারা পরস্পরের নিন্দায় রত নানা ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। সোস্যালিস্টদের এই সুযোগ হারাইবার পরই প্রতিপক্ষীয় ফাসিস্তদের অভিযান শুরু হয়। ১৯২১ হইতে মুসোলীনি ফাসিস্তদের একটা সুসংবদ্ধ দলে পরিণত করিয়া তোলেন; এবং ১৯২২ অক্টোবর মাসে সদলবলে রোমে উপস্থিত হইলে ইতালির রাজা শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় মুসোলীনিকেই প্রধানমন্ত্রীর পদাভিষিক্ত করিলেন। এইভাবে ফাসিস্তদলের উপর ইতালির শাসনভাব আসিল। য়ুরোপে এই প্রথম ডিক্টেটরশীপ বা একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় (১৯২২)।

রবীন্দ্রনাথ যখন ইতালিতে আসিলেন, তখন মুসোলীনি দুই বৎসরের উপর রাজ্যের সর্বময় কর্তারূপে বিরাজিত। এই দুই বৎসরের মধ্যে তিনি ফাসিস্তবিরোধীদের প্রায় নিশ্চিহ্ন করিয়া দেশকে আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। মিলানের ডিউক Scottie-র সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়; তৎসম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন— 'Duke Scottie of Milan, told me that his mouth was shut. Formichi told me that Duke Scottie was an incorrigible anti-fascist. While I had been talking with the Duke, from time to time, he got extremely nervous so that I did not get an opportunity of having a quiet talk with the Duke"।

এই সামান্য ঘটনা হইতে ইতালির রাজনৈতিক পরিবেশের আভাস পাওয়া যায়। ইতালির এই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ জেনোয়া বন্দরে উপস্থিত হইলেন।

কবি ও এলমহার্স্ট জেনোয়া পৌঁছিলেন ২১ জানুয়ারি— জাহাজে ১৮ দিন কাটে। জেনোয়ায় রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী তাঁহাদের য়ুরোপ সফর শেষ করিয়া কবির সহিত মিলিত হইলেন। এখান হইতে তাঁহারা ৭৬ মাইল দূরে মিলান শহরে উপস্থিত হইলেন (২২ জানুয়ারি)। মিলান ইতালির অন্যতম প্রাচীন শহর, এখানকার ডিউকরা ইতালির ইতিহাসবিশ্রুত পরিবার। ১৮৬০ অব্দে এই ডাচি (Duchy) নবগঠিত ইতালি রাষ্ট্রভুক্ত হইলেও ডিউকরা একেবারে হৃতসর্বস্ব হন নাই। মিলানের ডিউক Scottie-র সভাপতিত্বে সেই দিন অপরাহ্ণে Circolo filologico Milaneso নামক হলে রবীন্দ্রনাথের প্রথম বক্তৃতা হইল। কবির দোভাষীর কাজ করিবার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আসিয়াছেন অধ্যাপক ফর্মিকি (Formichi); ইনি রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বৌদ্ধশাস্ত্রের অধ্যাপক— ইংরেজি বেশ ভালোই জানেন।

সভায় তিলার্ধ স্থান ছিল না; ভারতের কবি-মনীষীকে দেখিবার জন্য কী অভূতপূর্ব জনতা। বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ

বলেন যে সতেরো বৎসর বয়সে য়ুরোপের সহিত তাঁহার পরিচয় ইতালির মধ্য দিয়া। এই বলিয়া তিনি ব্রিন্দিসিতে[১] ১৮৭৮ সালের প্রথমদিনের অভিজ্ঞতার কথা বলেন। তার পর তাঁহার পঞ্চাশ বৎসর বয়সে তিনি আসেন য়ুরোপে তীর্থদর্শন উদ্দেশ্যে। ভাষণ প্রসঙ্গে কবি পূর্ব ও পশ্চিমের রাষ্ট্রবোধের তুলনা করিয়া বলেন, য়ুরোপ যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতিশীল সে বিষয়ে তিনি তাহাকে বিন্দুমাত্র হেয় করিতে চাহেন না। কিন্তু পাশ্চাত্যের পর্যবেক্ষণশক্তি ও মননশক্তির উচিত ছিল মানুষের বিকাশের সহায়তা করা। কিন্তু তাহা না হইয়া বিজ্ঞান সভ্যতার ধ্বংসের আয়োজনে ব্যস্ত; য়ুরোপ আজ শান্তিহারা; শান্তিরক্ষার নামে সৃষ্ট নূতন যন্ত্র ভীষণতায় কিছু কম না। কবি মানবের অন্তর্নিহিত সততায় শ্রদ্ধাশীল এবং তিনি বিশ্বাস করেন— মানুষ একদিন আরও পরস্পরের নিকট আসিবে। কবি ইতালিবাসীকে সেই দিকে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া সচেতন হইবার জন্য বলিলেন।[২]

পরদিন (২৩ জানুয়ারি) মিলানে পীপলস্ থিয়েটর গৃহে কবি-সম্বর্ধনা। নগরীর প্রায় চারি সহস্র বালকবালিকা সমবেত হইয়া কবিকে অভিনন্দিত করে। সেই চারি সহস্র কণ্ঠের মিলিত সংগীতে প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত হয়। কবি এই অভ্যর্থনায় খুবই মুগ্ধ হইয়া সংক্ষেপে কিছু বলিয়া বিদায় গ্রহণ করেন।[৩]

অপরাহ্লে ডিউকের প্রাসাদে ইতালির অন্যতম বিখ্যাত চিত্রশিল্পী Rietti কবির আলেখ্য প্রস্তুত করেন।

গত কয়েক মাসই কবির শরীর খুব খারাপ যাইতেছে; ইতালিতে আসিয়া পুনরায় অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তুরিন (Turin)-এ তাঁহার যাইবার কথা ছিল, তাহা নাকোচ করিয়া দিতে হইল। ডিউক মিলানের দুইজন প্রখ্যাত চিকিৎসককে কবির স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন।

মিলানের বক্তৃতার পর নানা শহর ও প্রতিষ্ঠান হইতে কবির কাছে পত্র টেলিগ্রাম আসিতেছে— কিন্তু কবি তখন শয্যাশায়ী। সকল নিমন্ত্রণই প্রত্যাখ্যান করিতে হইল। এই মিলান বাসকালে তিনি 'ইটালিয়া'র[৪] উদ্দেশে একটি কবিতা লিখিয়া দেন, তাহা ইতালীয় ভাষায় অনূদিত হইয়া সাময়িক পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হইল।

যুগে যুগে ইতালি ছিল য়ুরোপীয় কবিদের স্বপ্নলোকের দেশ— কবিতীর্থ; আজ ভারতের কবি বলিলেন—

'ওগো রানী,
কত কবি এল, চরণে তোমার উপহার দিল আনি।
এসেছি শুনিয়া তাই,
উষার দুয়ারে পাখির মতন গান গেয়ে চলে যাই।'

মিলানে কয়েকদিন বিশ্রামের পর কবি ভেনিস যাত্রা করিলেন (২৯ জানুয়ারি)। পথিমধ্যে স্টেশনে গাড়ি থামিলে শত শত ছাত্রছাত্রী Viva la Indian, Viva Tagore ধ্বনি করিয়া ভিড় করে। পাদুয়া (Padua) স্টেশনে একদল ছাত্র ট্রেনের কামরায় উঠিয়া কবির autograph লইবার জন্য ভেনিস পর্যন্ত চলিল।

১ য়ুরোপযাত্রী কোনো বঙ্গীয় যুবকের পত্র (প্রথমপত্রের ২য় কিস্তি)— ভারতী ১২৮৬ জ্যৈষ্ঠ [১৮৭৯ মে] পৃ. ৮৭-৯৪। দ্র. য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র, ১৮০৩ শকাব্দ [১৮৮১]।

২ Voice of Humanity ; Visva-Bharati Quarterly Vol. III. Part I. 1925 April-June, pp. 1-10 (also with introductory remarks by Prof. Formichi)। কবির বক্তৃতার চুম্বক ইতালীয় ভাষায় ফর্মিকি করিয়া দেন। অনুবাদ— মনুষ্যত্বের জাগরণ, প্রবাসী ১৩৩২ শ্রাবণ, পৃ. ৫০৬-৫০৮।

৩ Farewell to Milan : Visva-Bharati Quarterly 1925, p. 80।

৪ ইটালিয়া (মিলান, ২৪ জানুয়ারি ১৯২৫ ॥ ১১ মাঘ ১৩৩১)— পূরবী কাব্যের শেষ কবিতা।

ভেনিসের রয়েল কমিসারিস (বিলাতের লর্ড মেয়রের সমতুল্য— তবে গবর্মেণ্ট হইতে নিযুক্ত)— স্বয়ং স্টেশনে আসিয়া কবিকে স্বাগত করিলেন। মোটরবোটে করিয়া ভেনিসের বিখ্যাত গ্রাণ্ড কেনাল বা জলপথ দিয়া নগরীর শ্রেষ্ঠ হোটেলে লইয়া তোলা হইল। ভেনিসের জলময় রাজপথ, উভয় পার্শ্বে পুরাতন যুগের স্থাপত্যনিদর্শনসমূহ কবির ভালোই লাগিতেছে। পরদিন স্থানীয় রবীন্দ্র-সংবর্ধনা সভায় সভাপতি ডাক্তার-অধ্যাপক জোলা আসিয়া কবির শরীর পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে কবির পক্ষে বিশ্রাম করা নিতান্ত প্রয়োজন। যাহাই হউক, ভেনিস দেখিবার বিশেষ ব্যবস্থা হইল; একদিন উদ্যোক্তারা তাঁহাকে একটি দ্বীপে অবস্থিত আর্মেনিয়ান ভ্রাতৃসংঘের (Armenian Friar) আয়তনে লইয়া গেলেন। সেখানকার পাদরীরা কবিকে বিশেষভাবে সমাদৃত করিলেন। এ ছাড়া ভেনিসের বিখ্যাত কাঁচ ও লেস শিল্পের কাজ কবি দেখিয়া আসিলেন। কবি বলিয়া যে কেবল প্রাকৃতিক শোভায় তিনি মুগ্ধ, তাহা নহে— মানুষ যেখানে কর্মী স্রষ্টা— সেখানেও তাঁহার দরদ আন্তরিক ও কৌতূহল অপরিসীম।

দিন-চার ভেনিসে থাকিয়া (২ ফেব্রুয়ারি) স্টীমার পথে তাঁহারা ব্রিন্দিসি পৌঁছিলেন (৪ ফেব্রুয়ারি)। রবীন্দ্রনাথ ব্রিন্দিসি আসিতেছেন— এ সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া যায়— তাই বন্দরে পৌঁছিয়া দেখেন জেঠিতে বেশ ভিড়। একটি মেয়ে একরাশ ফুল ও আঙুর আনিয়া কবিকে দিয়া বলিলেন যে এগুলি সেই বাগানের জিনিস— যেখানে তিনি সতেরো বৎসর বয়সে প্রথম আসিয়াছিলেন। তাঁহার মিলানের বক্তৃতা কিভাবে প্রচার লাভ করিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলেন।

ইতালীয় সরকারের নৌবিভাগের লোকে রবীন্দ্রনাথকে মোটরবোট যোগে সাগর ভ্রমণের প্রস্তাব লইয়া আসিলেন। কিন্তু সরকারী আমলাদের পাল্লায় পড়িবার তাঁহার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ একখানি ঘোড়ারগাড়ি ভাড়া করিয়া শহর দর্শনে চলিলেন। ম্যুজিয়ামের নিকট গাড়ি দাঁড় করানো মাত্র রটিয়া গেল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গাড়িতে আছেন। স্থানীয় পাদরী আসিলেন ও অল্পকালের মধ্যে ছোটখাটো একটি ভিড় জমিয়া গেল। পাদরী ইংরেজি না-জানিয়া হাতমুখ নাড়িয়া কথা চালাইল।

ব্রিন্দিসির পালা শেষ হইল। পথে মিশরের বন্দর পোর্টসৈয়দে প্রবাসী ইতালীয়রা জাহাজে আসিয়া কবিকে অভিনন্দন পাঠ করিয়া শুনাইল ও পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিল।

এইবার কবির ইতালিতে থাকা হয় পক্ষকাল মাত্র— ২১ জানুয়ারি হইতে ৪ ফেব্রুয়ারি (১৯২৫)। রবীন্দ্রনাথকে ইতালায় জনতা আগ্রহের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিল; কিন্তু সরকারী মহল কবি সম্বন্ধে তেমন উৎসাহ প্রকাশ করে নাই। মিলানের বক্তৃতায় শান্তিবাদ, আন্তর্জাতিকতা, য়ুরোপীয় রাজনীতির, বিশেষত বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে কবির স্পষ্ট নিন্দাবাদ— ইতালির তৎকালীন জবরদস্ত ফাসিস্ত সরকারের মূলগত শাসননীতির বিরোধী। সুতরাং সরকার-পক্ষ হইতে কবি অভিনন্দিত হইলেন না। ডক্টর সুধীন্দ্রনাথ বসু সমসাময়িক এক পত্রে লেখেন (১৭ জুন) যে বর্তমান ফাসিস্ত গবর্মেণ্ট which is operating without the check of an intelligent Italian public opinion, international altruism as preached by Tagore cannot live"[১]। আমেরিকার নেশন্ পত্রিকায় একজন সাংবাদিক ইঙ্গিত করিয়া বলেন যে রবীন্দ্রনাথের তাড়াতাড়ি ইতালি ত্যাগের অন্যতম কারণ— ফাসিস্ত সরকার

১ Forward, 22 July 1925।

তাঁহার মতামত পছন্দ করেন নাই।[১] সরকারপক্ষীয়ের উদাসীনতা সত্ত্বেও কবি ইতালিতে যে অভিনন্দন পাইয়াছিলেন তাহার বর্ণনা প্রত্যক্ষদর্শী সুধীরকুমার লাহিড়ী সমসাময়িক কাগজে প্রকাশ করেন।[২]

ভেনিস হইতে (২ ফেব্রুয়ারি) 'ক্রাকোভিয়া' জাহাজে আসিতেছেন। ৭ই ফেব্রুয়ারি হইতে কবিকে পুনরায় তাঁহার ডায়ারি লিখিতে দেখিতেছি— চারি মাস পরে (শেষ লেখেন ৭ অক্টোবর) আরম্ভ হইল এবং ১৫ই পর্যন্ত ডায়ারি লেখা চলে। ১৭ ফেব্রুয়ারি কবি দেশে ফিরিলেন।

এই ডায়ারির পাতায় রাজনীতি সমাজনীতি আর্ট সাহিত্য প্রভৃতি কত বিষয়ের যে গভীর আলোচনা আছে তাহা গ্রন্থখানি শান্তভাবে পাঠ না করিলে হৃদয়ঙ্গম হইবে না। 'পূরবী' কাব্যের মধ্যে যেসব ভাবতরঙ্গ প্রবাহিত, তাহার অনেকগুলি অর্থচাবি এই ডায়ারির মধ্যে পাওয়া যায়।

আর পাই 'সে' গল্পের বহির পটভূমি, কবির তিন বৎসরের নাতিনী নন্দিতার চিত্তবিনোদনের জন্য. তাহার সূত্রপাত হয় এইখানে। ডায়ারিতে যে গল্প আছে (১৫ ফেব্রুয়ারি), তার একটি কবিতা—

এক যে ছিল বাঘ, তার সর্ব অঙ্গে দাগ। · ·

'সে' গ্রন্থে হয় 'একছিল মোটা কেঁদো বাঘ গায়ে তার কালো কালো দাগ · · ইত্যাদি।

সুতরাং 'যাত্রী' বইটি যে কেবল তত্ত্বকথায় আচ্ছন্ন তাহা ভাবিবার কারণ নাই।

প্রত্যাবর্তনের পরে

ভারতের বাহিরে এবার রবীন্দ্রনাথের পাঁচ মাস কাটে; কাল হিসাবে দীর্ঘ না হইলেও এই কয়মাসে জীবনের বহু অভিজ্ঞতা ও সম্পদ লাভ হইয়াছিল। এই পাঁচ মাসের মধ্যে সমুদ্রবক্ষেই অতিবাহিত হয় প্রায় আড়াই মাস। বুয়েনোস এয়ারিসে প্রায় দুই মাস; অবশিষ্ট সময় ফ্রান্সে ও ইতালিতে।

এই পাঁচ মাসের মধ্যে (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৪ - ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫) কবির অনুপস্থিতিকালে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে অনেক-কিছুই ঘটিয়াছে। এখন কন্‌গ্রেসের মধ্যে তথাকথিত বামপন্থী বা স্বরাজ্যদলই প্রবল। ইহাদের দমন করিবার জন্য বাংলাসরকার (২৪ অক্টোবর ১৯২৪) এক অর্ডিনান্স ঘোষণা করিয়া কলিকাতা শহরেই 'স্বরাজ্য' দলের ৭২ জন বিশিষ্ট কর্মীকে অন্তরীনাবদ্ধ করেন; এই দলে কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন। ৩০ অক্টোবর গভর্নর লর্ড লিটনের এই আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা ও পরদিন বাংলাদেশে হরতাল ঘোষিত হয়। গান্ধী তাঁহার 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' নামে সাপ্তাহিকে লিখিলেন, 'আজ রাউলট অ্যাক্ট মরিয়াছে, কিন্তু যে-ভাব হইতে রাউলট্ অ্যাক্টের জন্ম দেয়, তাহা এখনও অক্ষুণ্ণ ও অম্লান রহিয়াছে।' ইহার কয়েকদিন পরে গান্ধী, মতিলাল নেহরু ও চিত্তরঞ্জন দাশ মিলিত হইয়া আপনাদের ভবিষ্যৎ কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে এক ইস্তাহার প্রস্তুত করিলেন। কন্‌গ্রেস ও স্বরাজ্যদলের মধ্যে আপোসের শর্তগুলি ১৯২৪ সালের বেলগাঁও কন্‌গ্রেস অধিবেশনে

১ Nation, New York, 15 April, 1925।

২ Forward, 25 July 1925; Modern Review, August 1925, p. 25।

গৃহীত হইল। এই কংগ্রেসে গান্ধী সভাপতি— এই একবারই তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হন। গত তিন বৎসর কন্‌গ্রেসের কর্মতন্ত্ররূপে যে অসহযোগনীতি প্রচলিত ছিল— তাহা স্থগিত করা হইল; অর্থাৎ ব্রিটিশসরকারের সহিত তাঁহারা যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা হইতে, দেশের পরিস্থিতি বুঝিয়া তাঁহারা প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। চরকা-কাটা ও খদ্দর পরিধান হইল কন্‌গ্রেসের নবনীতি; কন্‌গ্রেসকর্মীদের সমস্ত মনোযোগ গেল এই নীতিপ্রচারে। চরকা কাটিলে দেশ স্বাধীন হইবে— ইহাই সকলে বুঝিল! দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা চরকা বা তকলি কাটায় লাগিয়া গেল— স্বাধীনতালাভের এমন সহজ সুযোগ দুর্লভ!

রবীন্দ্রনাথ পাঁচ মাস পরে আসিয়া দেখেন শান্তিনিকেতনেই ৯০ খানা চরকা-তকলি চলিতেছে— বিধুশেখর শাস্ত্রী শ্রীনন্দলাল বসু প্রমুখ অনেকেই চরকা কাটিতেছেন! রবীন্দ্রনাথ সমস্ত দেখিলেন, শুনিলেন— কোনো মতামত প্রকাশ করিলেন না।

কবি যখন দেশে ফিরিলেন (৫ ফাল্গুন ১৩৩১) তখন ভরা বসন্তকাল। তাঁহার মনে 'পূরবী'র সুর এখনো ধ্বনিতেছে। এতদিন ভাবনারাশি ছন্দের মধ্যে বদ্ধ ছিল, এবার মন মুক্তি পাইল গানের মাঝে। বসন্ত বৃথায় তাহার অর্ঘ্য বহিয়া চলিয়া গেল না। বসন্তউৎসবে 'সুন্দরে'র[১] আবাহন হইবে— পূর্ণিমার সন্ধ্যায় (২৬ ফাল্গুন) আম্রকুঞ্জে আয়োজন হইয়াছে। অসময়ে আকস্মিক ঝড়-বৃষ্টি ক্ষণকালের মধ্যে সমস্ত আয়োজন নিশ্চিহ্ন করিয়া চলিয়া গেল। কিছু পরেই আকাশে পূর্ণচন্দ্র নির্বিকারভাবে উদিত হইল— কোথাও কিছু দুর্দৈব ঘটে নাই। কবি আপন গৃহকোণে আবদ্ধ, গান লিখিলেন—

রুদ্রবেশে কেমন খেলা, কালো মেঘের ভ্রূকুটি।
সন্ধ্যাকাশের বক্ষ যে ওই বজ্রবাণে যায় টুটি॥
সুন্দর হে, তোমায় চেয়ে ফুল ছিল সব শাখা ছেয়ে,
ঝড়ের বেগে আঘাত লেগে ধুলায় তারা যায় লুটি॥
মিলনদিনে হঠাৎ কেন লুকাও তোমার মাধুরী।
ভীরুকে ভয় দেখাতে চাও, এ কী দারুণ চাতুরী।
যদি তোমার কঠিন ঘায়ে বাঁধন দিতে চাও ঘুচায়ে
কঠোর বলে টেনে নিয়ে বক্ষে তোমার দাও ছুটি॥[২]

১ সুন্দর [২৬ ফাল্গুন ১৩৩১]। গানের তালিকা—

১. আজ কি তাহার বারতা, গীতবিতান পৃ. ৫১৯। ২. তোমায় চেয়ে বসে আছি, গীতবিতান পৃ. ২১০। ৩. নাই যদি বা এলে, গীতবিতান পৃ. ৩৭৭। ৪. ফিরে ফিরে ডাক্ দেখি রে, গীতবিতান পৃ. ৩৭৭। ৫. ফাগুন-হাওয়ায় রঙে রঙে, গীতবিতান পৃ. ৫০৯। ৬. এ কী মায়া, লুকাও কায়া, গীতবিতান পৃ. ৪৯৮। ৭. মোরা ভাঙব তাপস, গীতবিতান পৃ. ৪৯৮। ৮. ওহে সুন্দর, মরি মরি, গীতবিতান পৃ. ২০৯। ৯ লহো লহো, তুলে লহো নীরব বীণা, গীতবিতান পৃ. ২০৮। ১০. ওকি এল, ওকি এল না, গীতবিতান পৃ. ৫৮১। ১১. কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন, গীতবিতান পৃ. ৪২৮। ১২. যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়, গীতবিতান পৃ. ৫৮০। ১৩. রুদ্রবেশে কেমন খেলা, গীতবিতান পৃ. ২১১।

৩, ৫, ৮ সংখ্যক গান পুরাতন। ৩নং কাশীতে ১৩২৯ ফাল্গুনে রচিত। ৪নং বোধ হয় ঐ সময়েই লেখা।

গীতবিতান ১ম সংস্করণ ৩য় খণ্ডে (১৩৩৯ শ্রাবণ), সুন্দর [১৩৩২ সাল] পৃ. ৭১২-৭১৬। এখানে ১০টি গান আছে। গীতবিতান নূতন সংস্করণে গানগুলি বিক্ষিপ্তভাবে আছে।

ঋতু-উৎসব (বিশ্বভারতী সংস্করণ ১৩৩৩), পৃ. ১২৯-১৪৩ সুন্দর। এখানে ২৪টি গান আছে।

২ দ্র. শান্তিদেব ঘোষ, রবীন্দ্রসংগীত ২য় সংস্করণ, পৃ. ১৪১। গীতবিতান, পৃ. ২১১।

আম্রকুঞ্জের পরিত্যক্ত বসন্তোৎসব সম্পন্ন হইল কলাভবনে— তখন কলাভবন ছিল বর্তমান গ্রন্থভবনের দ্বিতলে। কবি তাঁহার সদ্যরচিত গানটি গাহিলেন। উৎসবে যে কয়টি গান গীত হয়— তাহার কয়েকটি পুরাতন— অধিকাংশই নূতন— গত কয়েক দিবসের মধ্যে রচিত (৫ - ২৬ ফাল্গুন ১৩৩১)।

কবি আছেন শান্তিনিকেতনের উত্তরে মাঠের মধ্যে তাঁহার পর্ণকুটিরে। বিশ্বভারতীর কাজকর্ম উৎকণ্ঠা উদ্বেগ তাঁহার প্রতিদিনের সাথী। সাহিত্যসৃষ্টিতে গান ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। চিরদিনই দেখা গিয়াছে একটা নিবিড় কাব্যপর্বের পর মন সমে আসিয়া থামে— আর গল্প বা কাহিনী রচিয়া মানুষের সঙ্গ খোঁজে তাহার কল্পনাবিলাসী মন। সেই নবপ্রেরণা এবার পাইতেছেন না। কবির মন চায় মানুষের বিচিত্র সমস্যাসংকুল জীবনের রূপায়ণ। কিন্তু নূতন রূপের প্রেরণা আসিতেছে না ; তাই পুরাতন রচনায় নূতন রসস্পর্শ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কয়েক বৎসর পূর্বে মানসিক এই অবসাদপর্বে বহু পুরাতন 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক ভাঙিয়া 'মুক্তধারা' লিখিয়াছিলেন। এবার দশ বৎসর পূর্বে লিখিত সবুজ পত্র যুগের 'শেষের রাত্রি' (১৩২১) গল্পটি কেন্দ্র করিয়া 'গৃহপ্রবেশ'[১] নাটক রচিলেন।

এমন সময়ে জানিতে পারিলেন কলিকাতায় স্টার থিয়েটরে অহীন্দ্র চৌধুরী কবির 'চিরকুমার সভা' মঞ্চিত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। চিরকুমার সভা নামেমাত্র 'গল্প' হইলেও ইহার অধিকাংশই সংলাপময় ; কবি কয়েকটি গান অভিনয়ের জন্য যোজনা করিয়া দিলেন।

ইহার পর তাঁহার 'কর্মফল' নামে সংলাপপূর্ণ গল্পটিকে 'শোধ-বোধ' নামে নাটকে রূপায়িত করিলেন।[২]

এই নাটকগুলির মধ্যে শেষ দুইটি অভিনয়ের জন্য রচিত— খানিকটা ফরমাইসিই বলিব। কিন্তু ফরমাইসি লেখা শুরু করিয়া আপনার আভ্যন্তরীণ তাপের বেগে যে রচনা আগাইয়া চলে— যেমন তপতী— এ দুইটিকে সে-শ্রেণীর অন্তর্গত করা যায় না। পাবলিক রঙ্গালয়ে মঞ্চিত হইবে বলিয়া লোকরঞ্জনের দিকে কবির দৃষ্টি ছিল বেশি।

গৃহপ্রবেশ নাটকের মূল আখ্যায়িকা 'শেষের রাত্রি'। এইটি রচনাকালে রঙ্গমঞ্চেরই কথা মনের মধ্যে হয়তো বড় করিয়াই ছিল, তাই মূল গল্প হইতে নাটকের ঘটনা বিস্তারিত ও পাত্রপাত্রীর সংখ্যা বর্ধিত দেখা যায়। যতীনের ভগ্নী হিমি সম্পূর্ণ নূতন চরিত্র ; তাহার মুখে অনেকগুলি গান দিয়াছেন— তার মধ্যে দুইটি নূতন—

যৌবন সরসীনীরে মিলন শতদল (গীতবিতান পৃ. ৪১৭)।
আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে (গীতবিতান পৃ. ৩৯৭)।

অখিল উকিলের চরিত্র, বাড়িবন্ধকের কাহিনী নূতন সংযোজন। কলিকাতা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় উপলক্ষ্যে আরও কয়েকটি চরিত্র ও ঘটনা সংযোজিত হইয়াছিল ; যেমন বোস্টমী, টুকরি প্রভৃতির চরিত্র। অবশ্য এই সংযোজনাংশ নাটকে মুদ্রিত হয় নাই। মূল গল্প 'শেষের রাত্রি', ইংরেজি অনুবাদ Mashi ও 'গৃহপ্রবেশ' এবং অভিনয় উপলক্ষ্যে সংযোজন অংশ প্রভৃতি লইয়া একটি তুলনামূলক আলোচনা কেহ করিতে পারেন।[৩]

১ গৃহপ্রবেশ, প্রকাশিত ১৯২৫ অক্টোবর (১৩৩২ আশ্বিন)। চিরকুমার সভা, প্রকাশিত ১৯২৬ মার্চ (১৩৩২ ফাল্গুন)। শোধবোধ, প্রকাশিত (১৯২৬ জুন ॥ ১৩৩৩ আষাঢ়)।

২ শোধ-বোধ ১৩৩২ সালের পূজার সময় [১৯২৫ অক্টোবর] বার্ষিক বসুমতীতে নাটকটি প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে ১৯২৬ জুলাই। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭।

৩ শেষের রাত্রি, সবুজ পত্র ১৩২১ আশ্বিন [১৯১৪]; 'গল্প দশক' নামক গল্পগুচ্ছের অন্তর্গত হয় [১৩২৯]। দ্র. গল্পগুচ্ছ ৩। গৃহপ্রবেশ ১৩৩২ আশ্বিন [১৯২৫ অক্টোবর]। দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭, গ্রন্থপরিচয় অংশ, পৃ .৪৪০-৪৫১।।

বিচিত্র কর্ম[১] রচনার মধ্যে বর্ষশেষ হইল ও নববর্ষ (১৩৩২) আসিল ; কবি যথারীতি মন্দিরে ভাষণাদি দেন, তবে তাহার লিখিত বিবৃতি পাই না। নববর্ষের দিন ইন্দিরা দেবীকে লিখিত এক পত্রে লঘুভাবে অনেক কথাই লিখিতেছেন,[২] তিনি তিন বছরের প্রিয়া নন্দিনীর আকর্ষণে শান্তিনিকেতনে আছেন। এই কন্যাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার অনেক রচনার উদ্ভব পূর্বেই আমরা তাহার আভাস দিয়াছি।[৩]

এবার পঁচিশে বৈশাখ (১৩৩২) কবির জন্মোৎসব বেশ জাঁকাইয়াই হইল। সেইদিন উত্তরায়ণের উত্তরদিকে পথের ধারে 'পঞ্চবটি' প্রতিষ্ঠা জন্মোৎসবের বিশেষ অঙ্গ। বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় এই উৎসব উপলক্ষ্যে একটি শ্লোক রচনা করিয়া দেন—

পান্থানাং চ পশূনাং চ পক্ষিণাং চ হিতেচ্ছয়া
এষা পঞ্চবটী যত্নান রবীন্দ্রেণেহ রোপিতা।[৪]

বৃক্ষরোপণ উপলক্ষে যেদিন কবির সদ্যরচিত গান 'মরু বিজয়ের কেতন উড়াও' গীত হয়। এইবারকার জন্মোৎসবে কলিকাতা হইতে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। সন্ধ্যার সময়ে উত্তরায়ণে 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' ছাত্রীরা অভিনয় করে।[৫]

জন্মদিনের কয়েকদিন পরে ইন্দিরা দেবীকে[৬] লিখিত পত্রমধ্যে জন্মদিনের কথাই আছে— তাঁহার নিগূঢ় আন্তরজীবনের নানা কথায় পূর্ণ।

জন্মোৎসবের পর বিদ্যালয় গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বন্ধ হইয়া গেল, কবি কোথাও গেলেন না। শরীর কিছুকাল হইতে খারাপ— দক্ষিণ-আমেরিকা যাত্রার পূর্ব হইতে সূত্রপাত। দেশে ফিরিয়াও যেন এবার বল পাইতেছেন না। আশ্রম প্রায় জনহীন ; কবি লিখিতেছেন, "সমস্তদিন কিছুই করিনে, কেবল সামনে চেয়ে আছি— দেখি পূর্ণতা

১ ১৩৩২ বৈশাখে 'কল্লোলে' রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তি' কবিতাটি ছাপা হয়। কল্লোলের সামান্য পুঁজি থেকে তার জন্যে দক্ষিণাও দেওয়া হয় বিশ্বভারতীকে।

যে দিন বিশ্বের তৃণ মোর অঙ্গে হবে রোমাঞ্চিত
আমার পরান হবে কিংশুকের রক্তিমা-লাঞ্ছিত
সেদিন আমার মুক্তি, যেই দিন হে চির বাঞ্ছিত
তোমার লীলায় মোর লীলা
যে দিন তোমার সঙ্গে গীতরঙ্গে তালে-তালে মিলা।

কল্লোলযুগ, পৃ. ১৬১। পূরবী, মুক্তি। আণ্ডেস জাহাজ। ২২ অক্টোবর ১৯২৪ [৫ কার্তিক ১৩৩১] এই কবিতাটির শেষ ৫ পংক্তি— পাঠে সামান্য পরিবর্তন আছে।

২ এই সময়ে বিশ্বভারতীর ভিজিটিং-প্রফেসার রূপে আসিয়াছেন নরওয়ের অধ্যাপক স্টেন কোনো (Sten Konow)। ইনি অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যার অধ্যাপক। সংস্কৃত, প্রাকৃত ও মধ্য-এশিয়ার লুপ্ত ভাষায় ইনি বিশেষজ্ঞ। ইনি ১৯২৪-২৫ সালে শান্তিনিকেতনে ছিলেন।

৩ চিঠিপত্র ৫, পত্র ১৫। ১ বৈশাখ, ১৩৩২।

৪ প্রবাসী ১৩৫০ আশ্বিন, পৃ. ৪২৯।

৫ জন্মোৎসবের বিস্তৃত বিবরণ। দ্র. প্রবাসী ১৩৩২ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ২৯৮।

৬ চিঠিপত্র ৫, পত্র ১৩। ২৯ বৈশাখ ১৩৩২। পৃ. ৪৮-৫২।

সেই শূন্যে।"[১] কিছুকাল পরে সবুজ পত্র পুনর্প্রকাশের প্রস্তাব করিয়া প্রমথ চৌধুরী পত্র লিখিলে কবি তাঁহাকে লেখেন "রস জুগিয়ে পত্রোদ্‌গমের সহায়তা করতে পারি, আজকাল আমার মধ্যে শক্তির তেমন দাক্ষিণ্য নেই।"[২]

ইতিমধ্যে জানা গেল গান্ধীজি কলিকাতায় আসিয়াছেন চরকা-খদ্দরনীতি প্রচার উদ্দেশ্যে। ২৫ মে ১৯২৫ তিনি কবির সহিত দেখা করিতে শান্তিনিকেতনে আসিলেন— সঙ্গে সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত সস্ত্রীক, মহাদেব দেশাই, প্যারীলাল প্রভৃতি। কবির সহিত চরকানীতি লইয়া আলোচনাই প্রধান উদ্দেশ্য, তবে তিনি জানিতেন রবীন্দ্রনাথ ইহার সমর্থক নহেন। গান্ধীজির বিশ্বাস ছিল যুক্তি দ্বারা তিনি কবিকে আপন মতে আনিতে পারিবেন। দুই দিন তাঁহাদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা চলে— বলা বাহুল্য কেহ কাহাকেও নিজমতে আনিতে পারেন নাই। পাঠকের স্মরণ আছে চারি বৎসর পূর্বে অসহযোগ আন্দোলন লইয়া আলোচনা হইয়াছিল (১৯২১ সেপ্টেম্বর ৬); সেবারও কেহ কাহাকে টলাইতে পারেন নাই। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিয়া রাখি মতের পার্থক্য সত্ত্বেও উভয়ের প্রীতির সম্বন্ধ চিরদিন অক্ষুণ্ণ ছিল।

গান্ধীজি যখন শান্তিনিকেতনে আছেন, সেই সময়ে কলিকাতার মেথডিস্ট চার্চের বিশপ ফিশার (F. Bohn Fisher, 1882-1938) গান্ধীজির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন; ইনি আমেরিকার বিখ্যাত সমাজসংস্কারক পুসিফুট জনসন (যাঁহার চেষ্টায় মার্কিনী সংবিধানের ধারা পরিবর্তিত করিয়া সে দেশে মাদক নিবারণ ব্যবস্থা হয়)-এর বিশেষ বন্ধু। ফিশারের উদ্দেশ্য গান্ধীজিকে ভালো করিয়া জানা ও বুঝা।[৩]

রবীন্দ্রনাথের সহিত ফিশারের পরিচয়ের ফলে বিশ্বভারতীর পক্ষে আমেরিকান মেথডিস্ট সম্প্রদায় হইতে নানাভাবে সহায়তা পাওয়া গেল; বয়েড্ টাকার (Boyd Tucker) নামে একজন উচ্চশিক্ষিত পাদরী বিশ্বভারতীতে অধ্যাপকরূপে আসিলেন— এই সমাজের অর্থানুকুল্যে। এই বিশপ ফিশার খৃষ্টীয় ধর্মপ্রচার হইতে খৃষ্টীয় সংস্কৃতি প্রচারে অধিক আস্থাবান ছিলেন; খৃষ্টীয় নীতি যাহাতে হিন্দুদের দ্বারাও প্রচারিত হইতে পারে— এই ভরসায় তিনি শান্তিনিকেতনের অন্যতম কর্মী সুধাকান্ত রায়চৌধুরীকে নিযুক্ত করেন। খৃষ্টীয় অ-খৃষ্টীয় সমাজের মধ্যে বহুকালের বদ্ধমূল সংস্কার ভেদ যতদূর সম্ভব নিরাকৃত করিবার চেষ্টায় সুধাকান্ত ব্রতী হন।[৪]

গান্ধীজির আগমনের উত্তেজনা-অন্তে কবি আবার আপনার কাজের মধ্যে নিবিষ্ট হইবার চেষ্টা করিতেছেন। একটি লেখার জন্য ফরমাইস আসিয়াছে জারমেনি হইতে, কাউন্ট কাইসারলিঙ 'ভারতীয় বিবাহ সম্বন্ধে' তাঁহার কাছে একটি লেখা চান। 'ইংরেজিতে দেরি হবে ভয় করে বাংলায়' লিখিতে শুরু করিয়া দিলেন। 'পরে তর্জমা করে তাঁকে পাঠাতে হবে।'[৫] বর্তমান সভ্যসমাজে বিবাহসমস্যা সম্বন্ধে নানাদেশের মনীষীদের মতামত সংগ্রহ করিয়া কাইসারলিঙ একখানি গ্রন্থ সম্পাদন করিতেছেন।[৬]

১ চিঠিপত্র ৫, পৃ. ৫০।

২ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৯১। ৩২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২ ॥ ১৪ জুন ১৯২৫।

৩ Fisher, F. Bohn (1882-1938) : Bishop of Calcutta Methodist Church 1920-30। Author of *That Strange Little Brown Man Gandhi* (1932)।

৪ সুধাকান্ত রায় চৌধুরী সুসমাচারের কিছু কিছু সুললিত বাংলায় অনুবাদ করেন, রবীন্দ্রনাথ ঐ অনুবাদের প্রশংসা করিয়াছিলেন।

৫ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৯৬। ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২।

৬ রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ভারতীয় বিবাহের আদর্শ, প্রবাসী ১৩৩২ শ্রাবণ। সমাজ ১৩৪৪ সংস্করণ। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২, সমাজ অংশে নাই। ইংরেজি অনুবাদ The Indian Ideal of Marriage, Visva-Bharati Quarterly Vol. III. part II. 1925 July September।

বিবাহের ন্যায় জটিল ব্যক্তিক ও সামাজিক প্রশ্ন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মনীষী বৃদ্ধবয়সে কী মত পোষণ করিতেন তাহা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ যৌবনে বিবাহ সম্বন্ধে গদ্যে-পদ্যে নানাভাবে আপন মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন; গোলামচোর অকালবিবাহ হিন্দুবিবাহ প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি এখনকার সমাজজীবনের সমস্যা হইতে বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে। শতাধিক বৎসরে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রচণ্ড স্পর্শ ভারতের চিত্তে ও বিত্তে যে যুগান্তর আনিয়াছে তাহা কেবল সংখ্যাগত বা quantitative নহে, তাহা গুণগত বা qualitative বিপর্যয়।

আধুনিক যুগের মানুষের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ মানবের এই আদিমতম সংস্কার (institution) সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

বিবাহের উদ্ভব সম্বন্ধে দুইটি দিকের কথা তুলিয়া কবি বলেন যে একটির উদ্ভব ব্যক্তিগত ভাবাবেগ হইতে, অপরটি হইতেছে সমাজগত কর্তব্যবুদ্ধি হইতে। ভারতে বিবাহপ্রথার ইতিহাস হইতে কবি দেখাইলেন যে, এ দেশেও ভাবাবেগ ও অন্যান্য নানা প্রকার উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়-যুক্ত বিবাহপ্রথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারতীয় স্মৃতিকার বা আইন-প্রণেতারা দেখিয়াছিলেন যে বিবাহবন্ধনের দ্বারা সুসন্তান হইবে এই যদি লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে কামনা-প্রবর্তিত ভাবাবেগ-অনুসৃত পথকে নিষ্ঠুরভাবে বাধা না দিলে চলে না। পাশ্চাত্য জগতে আজকাল সৌজাত্য (eugenics) লইয়া যে আলোচনা চলিতেছে তাহার উদ্দেশ্য এই। "বিজ্ঞান বলে, স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যেখানে কোনো বংশসঞ্চারী দৈহিক রোগ বা মানসিক বিকার আছে সেখানে রাজদণ্ডের বা সমাজশাসনের সাহায্যে বিবাহকে বাধা দেওয়া কর্তব্য। এ কথা স্বীকার করলেই বিবাহকে ভাবাবেগের টান থেকে সরিয়ে এনে বুদ্ধির এলাকায় দাঁড় করাতে হয়। . . ভারতবর্ষ নির্মমভাবে তাকে [ভাবাবেগকে] দূরে সরিয়ে রেখেছিল।"[১]

রবীন্দ্রনাথের মতে কালিদাসের সময়ে প্রাচীন ভারতীয় সমাজে অপজনন (degeneracy) ঘটিয়াছিল; "কালিদাসের রঘুবংশই হোক, কুমারসম্ভবই হোক, আর ভরতজন্মের আখ্যানমূলক অভিজ্ঞানশকুন্তলা নাটকই হোক, তিনের মধ্যেই বিবাহ সম্বন্ধে ভারতীয় কবির মনের কথাটি ব্যক্ত হয়েছে। বিবাহকে তিনি তপস্যা বলেছেন— এই তপস্যার পন্থা কিম্বা এর লক্ষ্য আত্মসুখ-ভোগ নয়। এই পন্থা হচ্ছে কামনা দমন এবং এর লক্ষ্য হচ্ছে কুমারসম্ভব, যে-কুমার সমস্ত কু, সমস্ত মন্দকে মারবে, স্বর্গরাজ্যকে ব্যাঘাতশূন্য ক'রে দেবে।"— সমাজ, পৃ. ৬৯। সেইজন্য ভারতীয় মহাকবি সুজননের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেন কুমারসম্ভব কাব্যে; "সংসারে পাপবিজয়ী কুমারকে আনতে গেলে কামনার উদ্দাম বেগকে নিরস্ত করে দিয়ে নিবৃত্তিপূত সাধনাকে আশ্রয় করতে হবে।"

পূরবী-প্রবাহিনী (১৩৩২) পর্বে কবিতা ও গানের মধ্য দিয়া এবং 'যাত্রী'র ডায়ারির পাতায়-পাতায় প্রেমের যে ভাবব্যাখ্যা রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা বুদ্ধি বিচারের দ্বারা বিশ্লেষণ করিলেন এই প্রবন্ধে। এই বিষয়টির একটি দিক আরও পরিষ্কার করিয়া ব্যাখ্যান করেন 'আনন্দলহরী' প্রবন্ধে (প্রবাসী ১৩৩২ শ্রাবণ)। পরে এই রচনার বিষয়বস্তু 'ভারতীয় বিবাহের আদর্শে'র সঙ্গে যোগ করিয়া দেন। বিবাহের শারীরগত বা জৈব দিকটা সর্বজীবের মধ্যেই সাধারণ। কিন্তু মানুষের বেলায় নারীর দুইটি রূপ স্পষ্ট— একটি মাতৃরূপ, অপরটি প্রেয়সীরূপ। মাতৃরূপে সে ফল, প্রেয়সীরূপে সে ফুল— একজন বর্তমানের জন্য, অপরজন ভবিষ্যতের জন্য। "প্রেয়সীরূপে তার সাধনায়

p. 89-108 Das Ehe Buch ইংরেজি অনূদিত গ্রন্থের নাম *The Book of Marriage*। ইংরেজি গ্রন্থে বাংলা প্রবন্ধের অনুবাদ ও জারমান গ্রন্থে ইংরেজি অনুবাদের অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

১ সমাজ, পৃ. ৬৫-৬৬।

পুরুষের সর্বপ্রকার উৎকর্ষ-চেষ্টাকে প্রাণবান্ করে তোলে।" এই গুণ কবির মতে 'মাধুর্য'— স্পষ্ট করিয়া বলিলেন 'লালিত্য' নহে। মাধুর্য অন্তরের রূপ— লালিত্য বাহিরের।

"প্রেয়সীস্বরূপিণী নারীর এই আনন্দ-শক্তিকে পুরুষ লোভের দ্বারা আপন ব্যক্তিগত ভোগের পথেই বিক্ষিপ্ত করেছে, বিকৃত করেছে; তাকে বিষয়সম্পত্তির মতো নিজের ঈর্ষাবেষ্টিত সংকীর্ণ ব্যবহারের মধ্যে বদ্ধ করেছে। তাতে নারীও নিজের অন্তরে আপন যথার্থ শক্তির পূর্ণ গৌরব উপলব্ধি করতে বাধা পায়। সামান্য সীমার মধ্যে মনোরঞ্জনের লীলায় পদে-পদে তার ব্যক্তিস্বরূপের মর্যাদাহানি ঘটেচে।"[১]

কবির মতে নারীর এই অমর্যাদাই তাহার বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। রবীন্দ্রনাথের কবিমানসে ও কাব্যসাহিত্যে নারীর স্থান অনেকটা জুড়িয়া আছে। জীবজগতে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি হইতে নারীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না। তাহারা মাতৃবেশে প্রেয়সীবেশে সেবিকাবেশে নরসমাজকে ঘিরিয়া আছে। কবির পক্ষে এই বিরাট শক্তির প্রতি উদাসীন থাকা সম্ভব নহে। আমাদের মনে হয় কবির মনে এই-যে বিচিত্র প্রশ্নের উদয় হইতেছে— তাহারা কিছুকাল পরেই 'যোগাযোগ' ও 'শেষের কবিতা' উপন্যাসদ্বয়ের মধ্যে রূপ লইয়াছিল এবং 'মহুয়া'য় তাহার পরিপূর্ণ কাব্যময় অনুভূতিরূপে উৎসারিত হইয়াছিল।

ভারতের বিবাহ ও সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ লিখিলেন কাইসারলিঙের গ্রন্থের জন্য। সম্পূর্ণ ভিন্ন অভিঘাতে ও অনুরোধে কবিকে এসময়ে আরেকটি প্রবন্ধ লিখিতে হইল— সেইটি হইতেছে ক্ষিতিমোহন সেনের 'দাদূ' গ্রন্থের ভূমিকা। প্রবন্ধটির নাম 'মরমিয়া'। কবি লিখিতেছেন, "ক্ষিতিবাবুর কাছে শুনেছি, আমাদের দেশে এঁদের দলের লোককে ব'লে থাকে 'মরমিয়া'। এঁদের দৃষ্টি, এঁদের স্পর্শ মর্মের মধ্যে; এঁদের কাছে আসে সত্যের বাহিরের মূর্তি নয়, তার মর্মের স্বরূপ।[২]

"ভারতের মরমিয়া কবিরা শাস্ত্রনির্মিত পাথরের বেড়া থেকে ভক্তের মনকে মুক্তি দিয়েছিলেন।· · ভারত-ইতিহাসের নিশীথরাত্রে ভেদের পিশাচ যখন বিকট নৃত্য করছিল তখন তাঁরা সেই পিশাচকে স্বীকার করেন নি।· ·

"যেহেতু ভারতীয় সমাজ ভেদবহুল, যেহেতু এখানে নানা ভাষা, নানা ধর্ম, নানা জাতি, সেইজন্যেই ভারতের মর্মের বাণী হচ্ছে ঐক্যের বাণী। সেইজন্যেই যাঁরা যথার্থ ভারতের শ্রেষ্ঠপুরুষ তাঁরা মানুষের আত্মায় আত্মায় সেতু নির্মাণ করতে চেয়েছেন।· · পরম্পরাক্রমে ভারতবর্ষের মহাপুরুষদের আশ্রয় করে এই সাধনার ধারা চিরদিনই চলেছে।· · ভারতীয় এই সাধকদেরই সাধনাধারা বর্তমানকালে প্রকাশিত হয়েছে রামমোহন রায়ের জীবনে।"

এই প্রবন্ধে কবি হিন্দীভাষার মরমিয়াদের সহিত বাঙালি পাঠকদের পরিচিত করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন; এইটি হইলে "ভারতের এই চিরকালের সাহিত্যে আপন উত্তরাধিকার-গৌরব ভোগ করতে পারে।"

১৩৩২ গ্রীষ্মাবকাশের পর শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর উত্তরবিভাগ বা বিদ্যাভবন ও আদিবিভাগ বা পূর্বতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয় খুলিল। আশ্রম ছাত্রছাত্রীদের কলকোলাহলে পূর্ণ হইল— প্রান্তরে বর্ষা নামিতেছে। মেঘোদয়ে কবির মনেও সাড়া পড়িল। বর্ষামঙ্গলের উৎসব (৩ শ্রাবণ) যথারীতি অনুষ্ঠিত হইল।[৩] উৎসবে গীত সকল গানই যে এই সময়ে রচিত তাহা নহে।

১ তু. যাত্রী ২য় সংস্করণ, পৃ. ১৩২। প্রেম সম্বন্ধে বহু বিচার আছে।

২ প্রবাসী ১৩৩২ ভাদ্র, পৃ. ৬০৯-১৪।

৩ বর্ষামঙ্গলে গীত গান (১৩৩২ শ্রাবণ ৩)—

১. আকাশ তলে দলে দলে। ২. ধরণী, দূরে চেয়ে। ৩. আষাঢ় কোথা হতে। ৫. ছায়া ঘনাইছে বনে বনে। ৬. শ্রাবণবরিষন

বর্ষা উৎসবের পর কবি কলিকাতায় গেলেন, সেখানে স্টার থিয়েটরে তাঁহার 'চিরকুমার সভা' অভিনীত হইতেছে। প্রথম দিনের অভিনয়ে (২ শ্রাবণ) কবি উপস্থিত ছিলেন না। "২৫শে জুলাই শনিবার [৯ শ্রাবণ] দ্বিতীয় অভিনয় রজনীতে স্বয়ং বিশ্বকবি স্টার থিয়েটরে পদার্পণ করেন ও অভিনয় দর্শন করেন।" এই অভিনয় অহীন্দ্রের চেষ্টায় হইয়াছিল।[১]

চিরকুমার সভার অভিনয় দর্শন উপলক্ষ্যে কবি যখন কলিকাতায় আসিয়াছেন, তাহার প্রায় দেড় মাস পূর্বে দার্জিলিঙে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্বে চিত্তরঞ্জন তাঁহার সমস্ত বিষয়সম্পত্তি 'সেবাসদনের' জন্য দিয়া যান। ডাক্তার বিধানচন্দ্র ভাবিলেন যে দেশবন্ধুর একটি ছবির নীচে রবীন্দ্রনাথের একটি ক্ষুদ্র কবিতা থাকিলে ঐ ছবি বিক্রয়ের সুবিধা হইবে। বিধানচন্দ্রের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ চিত্তরঞ্জনের উদ্দেশ্যে এই দুইটি পংক্তি লিখিয়া দেন—

এনেছিলে সাথে ক'রে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।[২]

চিত্তরঞ্জনের সহিত এককালে রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট সৌহার্দ্য ছিল— যাওয়া-আসা চলিত। বঙ্গচ্ছেদের সময়ে 'বাংলার মাটি' গানটির পাণ্ডুলিপি তিনি চিত্তরঞ্জন-পত্নী বাসন্তী দেবীকে দিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জনের সহিত বিরোধের সৃষ্টি হয় ১৯১৭-১৮ সাল হইতে— রাজনৈতিক ও সাহিত্যবিষয়ে মতান্তর হইতে ইহার উদ্‌ভব। চিত্তরঞ্জনের ব্রাহ্মপরিবারে

পার হয়ে। ৭. ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে। ৮. পুব-হাওয়াতে দেয় দোলা। ৯. এই শ্রাবণ-বেলা বাদল-ঝরা। ১০. গহন-রাতে শ্রাবণধারা। ১১. আজি কিছুতেই যায় না। ১২. আজি ওই আকাশ-'পরে সুধায় ভরে। ১৩. যেতে দাও গেল যারা। ১৪. জানি, হল যাবার আয়োজন। ১৫. বজ্রমাণিক দিয়ে গাঁথা।

১ শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী লেখকের পত্রের উত্তরে উক্ত পত্রখানি লিখিয়া পাঠান ১ অক্টোবর ১৯৫৯। "সংগঠনী পত্র লেখা ছিল, স্বয়ং কবি ও শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সুরলয়ে গঠিত, শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক পরিকল্পিত দৃশ্যপটে মহাসমারোহে প্রথম অভিনয়।"

চিরকুমার সভা। 'উপন্যাস' রূপে ভারতী পত্রিকার জন্য লিখিত; ধারাবাহিকভাবে ১৩০৭ বৈশাখ হইতে ১৩০৮ জ্যৈষ্ঠ (১৯০০ এপ্রিল-১৯০১ মে) প্রকাশিত হয়। ১৩১১ (১৯০৪ অগস্ট) হিতবাদী কাযালয় হইতে প্রকাশিত 'রবীন্দ্রগ্রন্থাবলী' মধ্যে 'রঙ্গচিত্র' বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়। অতঃপর ১৩১৪ সালে (১৯০৮) গদ্যগ্রন্থাবলীর ৮ম খণ্ডে 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' নামে উপন্যাস ও গল্প বিভাগে প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থখানির কোনো কোনো অংশ পরিবর্তন করিয়া এবং নূতন লিখিত অংশ যোগ করিয়া রবীন্দ্রনাথ ১৯২৫ এপ্রিলে (১৩৩১ চৈত্র) অনেকগুলি গান সংযোগ করিয়া 'চিরকুমার সভা'র নাটক রূপ দান করেন। গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এক বৎসর পরে ১৯২৬ (১৩৩২)। চিরকুমার সভার অনেকগুলি গান আছে 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' 'উপন্যাসে'ও (২৪টি) গান ছিল। চিরকুমার সভা নাটকে পূর্বের ২৩ গান ছাড়া [নাই ওগো হৃদয়বনের শিকারী] আরও ১০ গান সংযোজিত হয়।

১. না ব'লে যায় পাছে সে; গীতবিতান, প্রেম পৃ. ৩২৯। ২. না, না গো না, কোরো না ভাবনা; গীতবিতান, প্রেম পৃ. ৩১২। ৩. জয়যাত্রায় যাও গো; গীতবিতান, ৩০৩। ৪. ওগো, তোরা কে যাবি পারে, প্রেম পৃ.; গীতবিতান, বিচিত্র পৃ. ৫৭৪। কাব্যগ্রন্থাবলী পৃ. ১১০৩। ৫. যেতে দাও গেল যারা; গীতবিতান, প্রকৃতি, বর্ষা পৃ. ৪৪৭ [শেষ ৩ পংক্তি বাদ]। ৬. ও আমার ধ্যানের ধন; গীতবিতান, প্রেম পৃ. ৩৪৪ [শেষ কয় পংক্তি বাদ]। ৭. জ্বলে নি আলো অন্ধকারে; গীতবিতান, প্রেম পৃ. ৩৭৫। ৮. ওরে সাবধানী পথিক; গীতবিতান বিচিত্র ৫৭২। ৯. তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়; গীতবিতান, বিচিত্র পৃ. ৫৭২। ১০ তোমায় চেয়ে বসে আছি; গীতবিতান, প্রেম পৃ, ২১০।

২ ১৩৫৫, ২৫ বৈশাখ জোড়াসাঁকো [মহর্ষিভবনে] রবীন্দ্রজন্মোৎসবে বিধানচন্দ্র রায়ের ভাষণ। দ্র. সমসাময়িক সংবাদপত্র। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র রায় [হরিদাস নামানন্দ] প্রণীত 'স্মৃতিপূজা' (১৩৫৫) গ্রন্থ দ্রষ্টব্য, পৃ. ৫৪-৫৫।

জন্ম, ব্রাহ্মমতে অসবর্ণ বিবাহও করেন। কিন্তু এই সময় হইতে তিনি ব্রাহ্মবিদ্বেষী ও রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অত্যন্ত critical হইয়া উঠেন, তাঁহার সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকা হইয়া উঠে ইহার মুখপত্র। কিন্তু 'স্বরাজ্য' দল গঠিত হইলে কবি যে তাঁহাকে সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা আমরা পূর্বে করিয়াছি। তৎসত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে আর তেমন প্রীতি স্থাপিত হয় নাই— চিত্তরঞ্জন রাজনীতিতে আত্মসমর্পণ করিলেন; রবীন্দ্রনাথ আন্তর্জাতিকতার বাণী বহন করিয়া বিশ্বপথিক হইলেন।

কলিকাতায় 'চিরকুমার সভা' অভিনয় দেখিয়া কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন। বর্ষাগানের ঝরণাধারা এখনো মনোমধ্যে বহিতেছে; আসিয়া 'শেষবর্ষণ'এর পালাগান রচিলেন। এই পালাগান কলিকাতায় অভিনীত হইবে।

শেষবর্ষণ নাটিকায় রাজা, পারিষদবর্গ, নটরাজ, নাট্যাচার্য, গায়ক-গায়িকা আছেন; নাটিকার ব্যাখ্যাতা নটরাজ— এ নটরাজ একজন কবি। নটরাজই যেন 'শেষবর্ষণ'-পালার লেখক। রাজা, পারিষদ সভাকবি প্রভৃতিদের লইয়া গান শুনিতেছেন— নটরাজের দলের গায়ক-গায়িকারা গাহিতেছে— উহার ব্যাখ্যা করিতেছেন কবি-নটরাজ। পালা শেষ হইয়া গেলে, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি! একেবারে শেষ হয়ে গেল নাকি? কেবল দু দণ্ডের জন্যে গান বাঁধা হল, গান সারা হল! এত সাধনা, এত আয়োজন, এত উৎকণ্ঠা— তার পরে?"

নটরাজ বলেন, " 'তার পরে' প্রশ্নের উত্তর নেই, সব চুপ। এই তো সৃষ্টির লীলা।·· মুকুল ধরেও যেমন, ঝরেও তেমনি! বাঁশিতে যদি গান বেজে থাকে সেই তো চরম। তারপরে? কেউ চুপ করে শোনে, কেউ গলা ছেড়ে তর্ক করে, কেউ মনে রাখে, কেউ ব্যঙ্গ করে— তাতে কী আসে যায়।"

এই 'শেষবর্ষণে' যে ২৪টি গান গীত হয়, তার মধ্যে ১৯টি সদ্যরচিত।[১] এই নাটিকার অভিনয় হয় বিচিত্রাভবনে ভাদ্র মাসে। অভিনয়ের সময়ে কেবল গীতপত্র মুদ্রিত হয়; অবশ্য সংলাপশুদ্ধ পালাটি সবুজ পত্রে প্রকাশিত হয়।[২]

চরকা ও যন্ত্রযুগ

নূতন নূতন গানের পালা লিখিয়া, অভিনয়ের জন্য নাটক রচিয়া দিন কাটাইতে পারিলে, কবিজীবনকে লৌকিক ভাষায় 'আদর্শ' বলা যাইতে পারিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মনীষী ও জীবনশিল্পীর পক্ষে জীবনসংগ্রাম-বিচ্ছিন্ন তুরীয়তার মধ্যে আত্মসর্জন করা কোনো দিনই সম্ভব হয় নাই, আজও সম্ভব হইল না।

আমাদের আলোচ্যপর্বে দেশের সম্মুখে সব থেকে বড় জিজ্ঞাসা— চরকা-খদ্দরনীতি মানিয়া দেশের মুক্তি কেমন ভাবে আসিবে। পাঠকের স্মরণ আছে, ১৯২৪ ডিসেম্বর মাসে গান্ধীজির সভাপতিত্বে বেলগাঁও কন্‌গ্রেসে প্রত্যক্ষ সংগ্রামনীতি স্থগিত করিয়া 'খদ্দর'নীতি গৃহীত হয়। বাংলাদেশে ইতিপূর্বেই একদল যুবক চরকাকে কেন্দ্র করিয়া গ্রামোদ্যোগে ব্রতী হইয়াছিল; তাহাদেরই কয়েকজন সুরুলে আসিয়া এই কর্মে ব্রতী হন।

১ ২টি গান গত বর্ষামঙ্গলে (৩ শ্রাবণ ১৩৩২) গীত হইয়াছিল।

২ "আগামী কাল [২৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৫] সোমবার, রথী কলকাতায় যাচ্চে। তার হাতে শেষবর্ষণের সংশোধিত কপি দিচ্ছি।" চিঠিপত্র ৫, পত্র ৯৬, পৃ. ২৮০। শান্তিনিকেতন, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৫। সবুজ পত্র, ৯ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ১৩৩২ কার্তিক পৃ. ১৫১-১৭৬। দ্র. ঋতুউৎসব, বিশ্বভারতী সংস্করণ ১৩৩৩ [১৯২৬] পৃ. ৩-২৯। গীতবিতান ১ম সংস্করণ, পৃ. ৭১৭-২৪। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ. ১২৭-১৪৩।

আমাদের এই আলোচ্যপর্বে বিজ্ঞান কলেজের রসায়নবিভাগের অধ্যক্ষ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই চরকা-খদ্দর নীতির সমর্থক হওয়ায় গান্ধীজির এই আন্দোলন নূতন প্রাণ লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ এতাবৎকাল গান্ধীজির চরকানীতি সম্বন্ধে কোনো মতামত ব্যক্ত করেন নাই। 'মহাত্মাজি অতি শীঘ্র' কবির 'একটা অভিমত দাবী' করিয়া পত্র দেন।[১] কিন্তু তৎসত্ত্বেও কবি মতামত ব্যক্ত করেন নাই। ইতিমধ্যে প্রফুল্লচন্দ্র খদ্দর-প্রচারকল্পে কোনো বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথের ও ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের চরকাবিরোধী মনোভাবের জন্য তাঁহাদিগকে তিরস্কার করেন। রবীন্দ্রনাথের 'চরকা'[২] সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিবার প্রত্যক্ষ কারণ হইল প্রফুল্লচন্দ্রের তিরস্কার।

প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞানী হইয়া চরকা কাটিতেছেন ও আপামর সাধারণের সঙ্গে বিজ্ঞানীদেরও ঐ কার্যে নিযুক্ত হইবার জন্য উপদেশ দিতেছেন দেখিয়া কবি বিস্মিত। তাঁহার প্রশ্ন, বিজ্ঞানীর গবেষণায় দেশ অধিক উন্নীত হইবে, না, বিজ্ঞানী কত গজ সুতা চরকায় কাটিলেন তাহার হিসাবে দেশের সমস্যাসমূহ নিরাকৃত হইবে! "সকল মানুষ মিলে মৌমাছির মতো একই নমুনার চাক বাঁধবে, বিধাতা এমন ইচ্ছে করেন নি। কিন্তু সমাজ-বিধাতারা কখনো সেই রকম ইচ্ছা করেন। তাঁরা কাজ সহজ করবার লোভে মানুষকে মাটি করতে কুণ্ঠিত হন না।" রবীন্দ্রনাথ অকুণ্ঠিতচিত্তে রাজনীতিক তথা অর্থনীতিক ক্ষেত্রে চরকার ব্যর্থতা কোন্‌খানে তাহা যেন দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইয়া তাঁহার মত প্রকাশ করিলেন। 'স্বরাজ সাধন'[৩] শীর্ষক আর-একটি প্রবন্ধে এবিষয়ে আরও গভীরভাবে আলোচনা আছে।

চরকা প্রবন্ধে কবি বলেন, "আমাদের দেশ আচারনিষ্ঠতার দেশ ব'লেই ··বাহিরকে ঘুস দিয়ে অন্তরকে তার দাবি থেকে বঞ্চিত করতে পারি— এমনতরো বিশ্বাস আমাদের ঘোচে না। আমরা মনে করি, দড়ির উপরে যদি প্রাণপণে আস্থা রাখি, তাহলেই সে নাড়ী হয়ে ওঠে। এই বাহ্যিকতার নিষ্ঠা মানুষের দাসত্বের দীক্ষা। আত্মকর্তৃত্বের উপর নিষ্ঠা হারাবার এমন সাধনা আর নাই। এমন দেশে দেশ-উদ্ধারের নাম করে এল চরকা। ঘরে ঘরে বসে বসে চরকা ঘোরাচ্ছি, আর মনে বলছি স্বরাজ-জগন্নাথের রথ চলছে।··কিন্তু মানুষের সমগ্র জীবনযাত্রা থেকে তার একটিমাত্র ভগ্নাংশকে ছাড়িয়ে তারই উপর বিশেষ ঝোঁক দিলে সুতোও মিলবে, কাপড়ও মিলবে; কেবল মানুষের জীবনের সঙ্গে জীবনের মিল লক্ষ্যের বাইরে পড়ে থাকবে।" কবি অতি স্পষ্ট করিয়া বলিলেন। "চরকার সঙ্গে স্বরাজকে জড়িত ক'রে স্বরাজ সম্বন্ধে দেশের জনসাধারণের বুদ্ধিকে ঘুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে।··বহুল পরিমাণ সুতো ও খদ্দরের ছবি দেশের কল্যাণের বড়ো ছবি নয়। এ হল হিসাবী লোকের ছবি, এতে সেই প্রকাণ্ড বেহিসাবী শক্তিকে জাগিয়ে দিতে পারে না যা বৃহতের উপলব্ধিজনিত আনন্দে কেবল-যে দুঃখকে মৃত্যুকেও স্বীকার করতে প্রস্তুত হয় তা নয়, লোকের প্রত্যাখ্যান ও ব্যর্থতাকেও গ্রাহ্য করে না।" রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিলেন তাহা হইতেছে সামুদায়িক বিপ্লবের ইঙ্গিত। তাই তিনি বলিলেন, দেশের কল্যাণকে "অত্যন্ত বাহ্যিক ও অত্যন্ত সংকীর্ণ করার দ্বারা আমাদের শক্তিকে ছোটো ক'রে দেওয়া হয়। আমাদের মনের উপর দাবি কমিয়ে দিলে অলস মন নির্জীব হয়ে পড়ে। দেশের কল্যাণসাধনায় চরকাকে প্রধান স্থান দেওয়া অবমানিত

১ চিঠিপত্র ৫, পত্র ২৪। শান্তিনিকেতন, ৬ জুলাই ১৯২৫।

২ চরকা, সবুজ পত্র, ৯ম বর্ষ ১৩৩২ ভাদ্র, পৃ. ১১-৩১। দ্র. কালান্তর ১৩৫৫ সংস্করণ, পৃ. ২৫৯-২৭৭। The Cult of Charka; Modern Review, 1925 September।

৩ স্বরাজ সাধন, সবুজ পত্র, ৯ম বর্ষ ১৩৩২ আশ্বিন, পৃ. ১৩৬-৫৩। কালান্তর, পৃ. ২৭৮-৯০। Striving for Swaraj, Modern Review 1925 December।

মনকে নিশ্চেষ্ট ক'রে তোলবার উপায়।···পৃথিবীতে যারা দেশের জন্যে মানুষের দুঃসাধ্য ত্যাগ স্বীকার করেছে, তারা দেশের বা মানুষের কল্যাণছবিকে উজ্জ্বল আলোয় বিরাট রূপে ধ্যাননেত্রে দেখেছে। মানুষের ত্যাগকে যদি চাই, তবে সেই ধ্যানের সহায়তা করা দরকার।"

কবি-যে কেবল চরকার নেতিধর্মী-সমালোচনা করিলেন তাহা নহে, দেশে বিচিত্র শক্তি কিভাবে সংহত করা যাইতে পারে, সে-সম্বন্ধেও তাঁহার মত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, "কয়েক বছর পূর্বে যেদিন সমবায়মূলক জীবিকার কথা প্রথম শুনি, আমার মনে জটিল সমস্যার একটা গাঁঠ যেন অনেকটা খুলে গেল। মনে হল যে, জীবিকার ক্ষেত্রে **স্বার্থের স্বাতন্ত্র্য** মানুষের সত্যকে এতদিন অবজ্ঞা করে এসেছিল, সেখানে **স্বার্থের সম্মিলন** সত্যকে আজ প্রমাণ করবার ভার নিয়েছে। এই কথাই বোঝাতে বসেছে যে, দারিদ্র্য মানুষের অসম্মিলনে, ধন তার সম্মিলনে। সকল দিক থেকেই মানবসভ্যতার এইটেই গোড়ার কথা।[১]

চরকার ব্যর্থতা সুনিশ্চিত জানিয়া কবি যে প্রবন্ধ লিখিলেন, তাহা পাঠ করিয়া অধিকাংশ লোকই প্রীত হইল না; কিন্তু কবি যে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা তাহা আজ সুপ্রমাণিত হইলেও— তাহা স্বীকার করিবার বিনয় লোকের মধ্যে কমই দেখা গিয়াছিল।

'স্বরাজসাধন' প্রবন্ধে কেবল চরকা-খদ্দরের সমালোচনা মাত্র নহে— সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থার ও মনোভাবেরও বিস্তৃত সমালোচনা বটে। কিছুকাল হইতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে নানা সংগত কারণে, বা নানা তুচ্ছ কারণে— বিরোধ দাঙ্গায় পরিণত হইতেছিল। খিলাফত আন্দোলনে হিন্দুরা এক সময়ে যোগ দিয়াছিল। কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যেই দেখা গেল মিলন সম্পূর্ণ ও সহজ হয় নাই। নানাস্থানে বিভীষিকাময় ঘটনা ঘটিতে লাগিল। হায়দরাবাদ রাজ্যে গুলবার্গা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কোহাট প্রভৃতি স্থানে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় হিন্দুদের উপর নির্মমভাবে উৎপীড়ন করিল— এবং ব্রিটিশসরকারের শাসনসংস্থা প্রায় নির্লিপ্ত-উদাসীনভাবে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা উপভোগ করিতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথ এইসব সমস্যার আলোচনা করিয়া লিখিলেন, "খুব সহজে এবং খুব শীঘ্র স্বরাজ পাওয়া যেতে পারে, এই কথা কিছুদিন থেকে দেশের মনকে মাতিয়ে রেখেছে। বহুকাল থেকে আমাদের ধারণা ছিল স্বরাজ পাওয়া দুর্লভ; এমন সময় যেই আমাদের কানে পৌঁছিল যে, স্বরাজ পাওয়া খুব সহজ এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই পাওয়া অসাধ্য নয়, তখন এসম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে বিচার করতে লোকের রুচি রইল না। তামার পয়সাকে সন্ন্যাসী সোনার মোহর ক'রে দিতে পারে, এ কথায় যারা মেতে ওঠে— বুদ্ধি নেই বলেই যে মাতে, তা নয়, লোভে প'ড়ে বুদ্ধি খাটাতে ইচ্ছে করে না ব'লেই তাদের এত উত্তেজনা।"[২]

হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা যাহা আজ উৎকট হইয়া দেখা দিতেছে, সেসম্বন্ধে কবি বলিলেন, "হিন্দু-মুসলমানের মিলন হোক— বাহিরের দিক থেকে এই পরোয়ানা বাহির করা কঠিন নয়।··কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের মিলনের উদ্দেশে পরস্পরের মনের চিরাগত সংস্কারের পরিবর্তন করা সহজ নয়। সমস্যা সেইখানে ঠেকেচে। হিন্দুর কাছে মুসলমান অশুচি— আর মুসলমানের কাছে হিন্দু কাফের— স্বরাজ-প্রাপ্তির লোভেও এ কথাটা ভিতর থেকে উভয় পক্ষের কেউ ভুলতে পারে না। ···ধর্ম নিয়মের আদেশ নিয়ে মনের যে-সকল অভ্যাস আমাদের অন্তর্নিহিত, সেই

১ তু. রবীন্দ্রনাথের সমবায় (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ) সম্বন্ধে গ্রন্থ দ্রষ্টব্য 'সমবায়নীতি'।

২ কয়েকখানি পত্র, প্রবাসী ১৩৩৪ চৈত্র, পৃ. ৭৪৬-৪৭ ; পত্র ৪, ৫। আলোচনা, ক্ষিতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, প্রবাসী ১৩৩৫ বৈশাখ, পৃ. ১৫২।

অভ্যাসের মধ্যেই হিন্দু-মুসলমান বিরোধের দৃঢ়তা আপন সনাতন কেল্লা বেঁধে আছে, খিলাফতের আনুকূল্য বা আর্থিক ত্যাগ স্বীকার সেই অন্দরে গিয়ে পৌঁছয় না।

"আমাদের দেশের এইসকল সমস্যা আন্তরিক বলেই এত দুরূহ। বাধা আমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যেই আছে; সেটা দূর করবার কথা বললে আমাদের মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এই কারণে একটা অত্যন্ত সহজ বাহ্যিক প্রণালীর কথা শুনলেই আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। চরকা সেইরূপ একটা বাহ্যিক ক্রিয়া। চরকার সঙ্গে স্বরাজকে জড়িত করে স্বরাজ সম্বন্ধে দেশের জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে।"

হিন্দু-মুসলমানের মিলনসাধনের জন্য একটি মধ্যযুগীয় অলীক ধর্মরাজতন্ত্রের সমর্থনের ফলে, ভারতের মুসলমানদের মধ্যে স্বধর্মীয় স্বাজাত্য চেতনা উদ্রিক্ত করিয়া যে ধর্মোন্মত্ততাকে আহ্বান করিয়া আনা হইল, তাহারই অবশ্যম্ভাবী পরিণামের দিকে ভারতের রাজনীতি দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিল। অপর দিকে আধুনিক যুগের বিজ্ঞান ও যন্ত্রীয়তাকে অস্বীকার করিয়া আদিমযুগের আবিষ্কৃত যন্ত্রকে আশ্রয়—স্বরাজলাভের একমাত্র পন্থা বলিয়া ঘোষিত হইতেছে। আদিমযুগের যন্ত্রীয়তা ও মধ্যযুগের ধর্মীয়তা স্বরাজলাভের পন্থা—এ কথা কবি স্বীকার করিতে পারিলেন না। গান্ধীজির এই দুই আন্দোলনেরই বিরোধী কবি।

যন্ত্রকে সমর্থন করিলেও অতি-যন্ত্রীয়তা বা কলীয়তার তীব্র সমালোচনা তিনি বরাবর করিয়া আসিতেছেন। সমস্তের মধ্যে মধ্যপথ অনুসরণই রবীন্দ্র-জীবনদর্শনের মূল কথা। তাই যন্ত্ররাজ বিভূতির ব্যর্থতার কথা ব্যাখ্যান ও গান্ধীজির যন্ত্রবিরোধী মনোভাবের নিন্দার মধ্যে কোনো অসংগতি নাই—কারণ কবি ছন্দহীন আতিশয্য ও প্রগতিহীন মতবাদের সমর্থন করিতে অপারগ। এই সব চিন্তা যখন কবির মনে আলোড়িত হইতেছে, ঠিক সেইসময়ে তাঁহার কাছে অনুরোধ আসিল রমঁ্যা রলঁ্যার ষষ্টিতম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে তাঁহার বাণীর জন্য। এবার অতি-যন্ত্রীয়তার বিরুদ্ধে মত প্রকাশের সুযোগ মিলিল। কবি লিখিলেন (৫ অক্টোবর ১৯২৫)—

"আমেরিকায় অবস্থানকালে যন্ত্রসংঘসমূহ (organisations) ব্যক্তিগত (personal man) মানুষকে একেবারে নির্বাসন দিয়া যন্ত্রগত মানুষকে প্রকাণ্ড পদ্ধতি-পিণ্ডের মধ্যে সংহত করিয়া প্রচণ্ড শক্তি অর্জন করিয়া দ্রুত ও বিপুল প্রসার লাভ করিতেছে দেখিয়া আমার মন পীড়িত হইয়াছিল এবং সে-সম্বন্ধে দুই-একটি কথা আমি কয়েকবার বলিয়াছিলাম—মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, তাহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় প্রাণ ও অনুভূতির অভাব প্রতিদিন বাড়িয়া চলিয়াছে এবং মানুষ ধীরে ধীরে এই যন্ত্রেরই অংশমাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া কর্তব্য ও দায়িত্ববোধের প্রয়োজন সে অনুভব করে না। প্রাণশক্তিকে পরিহার করাতে এই যন্ত্রবদ্ধ জড়শক্তির দোহাই দিয়া আজিকার দিনে ভয়াবহ অত্যাচার ও অবিচার করা সহজসাধ্য হইয়াছে—কারণ জড়শক্তি অন্য সকল বিচার-বিবেচনাকে পদদলিত করিয়া আপন উদ্দেশ্যসাধনে দ্বিধাহীন নির্মম-গতিতে অগ্রসর হয়। যে-ধর্ম প্রেম ও করুণায় কমনীয় সেই ধর্মের নামে কী কদর্য রক্তলোলুপ ধর্মতন্ত্র গড়িয়া উঠে তাহা আমরা দেখিয়াছি। দেখিয়াছি, ব্যবসায়ের দোহাই দিয়া কী বিরাট প্রবঞ্চনা চলিতেছে! অথচ এই সকল প্রতিষ্ঠানের পরিচালক যাহারা তাহাদের সম্মান অক্ষুণ্ণ! নিরীহ প্রজাকে লাঞ্ছিত করিবার জন্য রাজতন্ত্রের নামে কী বীভৎস মিথ্যাবাদ প্রচারিত হইতেছে দেখিতেছি, অথচ যাঁহারা এই রাজতন্ত্রের কর্ণধার তাঁহারা সকলেই আচার আচরণ ও বংশগরিমায় ভদ্র! ইহার কারণ এই যে, মানুষ যখন এই সকল বিপুল যন্ত্রসংঘকে নির্বিচারে মানিতে শুরু করে, তখন তাহারা এই যন্ত্রকেই দেবতা বলিয়া মানিয়া লইয়া অশেষ গৌরব অনুভব করে এবং অন্ধ ভক্তের মত এই যন্ত্রের নামে ভয়াবহ অবিচার সাধনেও কুণ্ঠিত হয় না। এই আধুনিক জড়পৌত্তলিকতার (Fettish worship) প্রভাবে অন্যসব মানবীয়

ধর্ম লোপ পাইতে বসিয়াছে, মানুষ ও মনুষ্যত্ব বলির অসংখ্য উপায় এই পৌত্তলিকতাই দিন দিন জোগাইয়া যাইতেছে।”[১]

রল্যাঁ-প্রশস্তির মধ্যে কবি Foreign Affairs পত্রিকার সম্পাদক, কৃষ্ণাঙ্গ জাতির বন্ধু, উৎপীড়িতদের সহায় মহাপ্রাণ E. D. Morel-এর[২] কথা বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করিয়া বলেন, রম্যাঁ রল্যাঁর জীবন ও সাধনা বিশ্বমানবতার একটি প্রকৃত প্রমাণ।

নানা কথা

পূজাবকাশের জন্য শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় বন্ধ হইলে কবি সেখানেই আছেন; একবার ভাবিতেছেন ওয়ালটেয়ার ‘দৌড়’ মারিবেন, ‘সেখানে একটা ভালো বাড়ির সন্ধান’ পাইয়াছেন।[৩] কিন্তু সেখানে যাওয়া হইল না— বোধ হয় সঙ্গীর অভাবে। কবির কাছে এই সময়ে না-আছেন কন্যা মীরা, না পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী। কেহ আহমদাবাদে, কেহ রাজস্থানে। “এমন সময়ে বিধাতা দর্পহরণ করবার জন্যে শরীর দিলেন ভেঙে।” কে দেখাশুনা করে। কলিকাতায় গেলেন। আছেন জোড়াসাঁকোর বাড়ির “তেতলার কোণের ঘরে, · · সুখে দুঃখে দিন চলে যাচ্চে”।[৪] দিনেন্দ্রনাথের পত্নী কমলা দেবী দেখাশুনা করেন— এ বাড়িও প্রায় জনশূন্য।

এই পরিবেশে নিরালায় ‘নামঞ্জুর গল্প’টি[৫] বোধ হয় লেখেন। ক্ষুদ্র-পরিধি গল্পটির মধ্যে কবি অনেকগুলি সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছেন। একদল নারীর কাছে দেশপ্রেম যে কী পরিমাণে অবচ্ছিন্ন ও অবাস্তব হইয়া উঠিয়াছে গল্পটি তাহারই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ও মৃদু তিরস্কারে পূর্ণ। নারীর মন সহজসেবায় স্বভাবতই উৎসুক হয়; কিন্তু রাজনীতির উত্তেজনা নারীর মনুষ্যত্বকে যে কতখানি খর্ব করে তাহার রেখাঙ্কন পাই এই গল্পের মধ্যে। অসহযোগ আন্দোলনে ‘পিকেটিং’ করিয়া লোকে দলে দলে জেলে গিয়াছে। কিন্তু তারপর জেলে বসিয়া পরস্পরের মধ্যে কাহাকে কোন্ শ্রেণীর কয়েদী করা হইল— গবর্মেণ্ট কোন্ শ্রেণীর জন্য কী ব্যবস্থা করিতেছেন— তাহা লইয়া আলোচনা চলে। গল্পের নায়ক বলিতেছে, “জেলখানাকে জেলখানা বলেই গণ্য করে নিয়েছিলেম। সেখানে কোনোরকম দাবি-দাওয়া আবদার-উৎপাত করিনি। সেখানে সম্মান সৌজন্য সুহৃৎ ও সুখাদ্যের অভাবে অত্যন্ত বেশি বিস্মিত হই নি। কঠোর নিয়মগুলিকে কঠোরভাবেই মেনে নিয়েছিলেম। কোনোরকম আপত্তি করাটাই লজ্জার বিষয় বলে মনে করতেম।”

এই গল্পের মধ্যে আছে যে অমিয়া “নবযুগের উপযোগী ভাইফোঁটার একটা নূতন ব্যাখ্যা · · লিখেছে। সেইটে ইংরেজিতেও সে প্রচার করতে চায়— আমার কাছে তারই সাহায্য আবশ্যক। সেই লেখাটির ওরিজিন্যাল আইডিয়াতে ভক্তদল খুব বিচলিত— এই নিয়ে তারা একটা ধুমধাম করবে বলে কোমর বেঁধেছে।”

১ অনুবাদ। দ্র. প্রবাসী ১৩৩২ কার্তিক, পৃ. ১১৫। মূলটি আছে Rolland and Tagore (1945) গ্রন্থে। রল্যাঁর জন্ম তারিখ ২৯ জানুয়ারি ১৮৬৬। ১৯২৬-এ তাঁহার ষাট বৎসর পূর্ণ হইবে। মৃত্যু-১৯৪৪, ৩০ ডিসেম্বর।

২ E D. Morel (1878-1924), English writer and politician ; author of *The Blackman's Trial.*

৩ চিঠিপত্র ৫, পত্র ১৬। [২৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৫] ১১ আশ্বিন, ১৩৩২।

৪ চিঠিপত্র ৫, পত্র ১৮। [১৭ অক্টোবর ১৯২৫] ৩১ আশ্বিন, ১৩৩২।

৫ নামঞ্জুর গল্প, প্রবাসী ১৩৩২ অগ্রহায়ণ। গল্পগুচ্ছ ৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪ ।

গল্পের এই ঘটনা নিছক কল্পনা নয়। কবি কলিকাতায় ইন্দিরা দেবীকে এক পত্রে লিখিতেছেন, "এরই মধ্যে রোগশয্যায় স [-রলা দেবী] দূত পাঠিয়েছিল আমাকে ধরবার জন্যে। সে কালীপুজোর নতুন ব্যাখ্যা ক'রে হিন্দুসমাজের চমক লাগাবার আয়োজন করচে, তার ইচ্ছে আমি হই সভাপতি।··ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখিয়ে খালাস পেয়েছি।"[১] গল্পের শেষাংশ বা উপসংহার হাস্যকরই বলিব। কেননা অনিল অমিয়াকে দেবীজ্ঞানে ভক্তি করিত; কিন্তু বিবাহের প্রস্তাব করিয়া যখন জানিতে পারিল যে অমিয়া হীনকুলোদ্ভবা অর্থাৎ দাসীকন্যা, তখনই অস্পৃশ্যতা জাতিভেদ দূরীকরণ প্রভৃতি বিষয় লইয়া তাহার এতো-যে উৎসাহ— সমস্তই দপ্ করিয়া নিবিয়া গেল। অনিল গেল অন্যত্র চাকুরি লইয়া; অমিয়া পুনরায় কলেজে পড়িতে গেল।

কবির শরীর ভাঙিতেছে, বিশেষত এই সময়ে কানের অসুখ দেখা দিয়াছে; কয়েকদিন পরে ইন্দিরা দেবীকে লিখিতেছেন (৯ কার্তিক), "কানে শুনচি খুব কম,··আমার সেই তেতালার ঘরে আবদ্ধ হয়ে পড়ে আছি। মনটা উড়ু উড়ু করে কিন্তু কানটা আছে ডাক্তারের হাতে। কতদিনে যে খালাস করে নিতে পারব তার ঠিকানা নেই। বোলপুর থেকে মরিসকে [পার্সি যুবক] আনিয়ে নিয়েছি··।"

এই চিঠিখানিতে ব্যাধির কথা থাকিলেও, তাহার মধ্যে হাস্যরসের অভাব নাই।

'নামঞ্জুর গল্প'[২] ছাড়া কবিকে আমরা এই সময়ে আরও দুইটি রচনা লিখিতে দেখি— একটি প্রবন্ধ, অপরটি গ্রন্থ সমালোচনা।

প্রবন্ধটির নাম 'শূদ্রধর্ম'।[৩] আমাদের হিন্দুসমাজে সকল বৃত্তিকেই ধর্ম বলা হইয়াছে— অর্থাৎ যে যেখানে জন্মিয়াছে সেখানে তাহার বৃত্তিগত কর্তব্য আছে, তাহাকেই বলে ধর্ম। শাস্ত্রোক্ত 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্ম ভয়াবহ'— কথাটি এই লৌকিক অর্থে প্রয়োগ করিয়া সত্যই তাহা ভয়াবহ করিয়া তোলা হইয়াছে। বিদেশী শাসকের অধীন যখন তাহারা দাস্যবৃত্তি করে, তখনো তাহাকেও ধর্ম রূপেই দেখে। আমাদের মনে হয় কবির মনে এই শূদ্রধর্মের প্রশ্ন জাগিতেছে, দেশীয় পুলিস ও রাজকর্মচারীদের 'স্বদেশী' দলনের অতি-উৎসাহ কর্ম-তৎপরতা; ক্ষত্রিয় জানে নিধন করাই তাহার ধর্ম— কাহাকে নিধন করিতেছে সে প্রশ্ন গৌণ, কারণ যাহার নিমক খাইতেছে অর্থাৎ ব্রিটিশরাজের — তাহার জন্য জান্ কবুল করিয়া সে বলিবে স্বধর্মে হননং শ্রেয়ঃ, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ। কবি বলেন "শূদ্রের এই তো বহুযুগের দীক্ষা। তার কাজে স্বার্থও নেই সম্মানও নেই, আছে কেবল স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ এই বাণী।·· মানুষের বড়ো দুর্গতি··যখন সে পরের স্বার্থের বাহন হয়ে পরের সর্বনাশ করাকেই অনায়াসে কর্তব্য ব'লে মনে করে। অতএব এতে আশ্চর্যের কথা নেই যে, যদি দৈবক্রমে কোনোদিন ব্রিটানিয়া ভারতবর্ষকে হারায় তা হলে নিশ্বাস ফেলে বলবে— I miss my best servant."।

রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ রচনার প্রত্যক্ষ কারণ চীনের সমসাময়িক একটি ঘটনার সংবাদপাঠ। এ ছাড়াও বোধ হয় ভারতের মধ্যে অতি-উৎসাহী দেশীয় রাজপুরুষ ও দেশীয় পুলিস স্বদেশীদের উপর যে অত্যাচার ও অন্যায় ব্যবহার করিতেছে তাহাও কবিকে এই প্রবন্ধ লিখিতে প্ররোচিত করিয়া থাকিবে।

১ চিঠিপত্র ৫, পত্র ১৮, পৃ. ৫৬। ৩১ আশ্বিন ১৩৩২ [১৭ অক্টোবর, ১৯২৫]।

২ বঙ্গবাণী ১৩৩২ পৌষ, 'নামঞ্জুর গল্প' সম্বন্ধে লিখিতেছেন, "পড়িতে পড়িতে কবিকে শতবার নমস্কার করিতে হয়। ভাষা দাসীর মত কবির অনুবর্তিনী। অন্য কোনো গদ্যপ্রবন্ধ বা পুস্তকাদি না লিখিলেও মাত্র এই একটি গল্পের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ গল্পলেখক বলিয়া পরিচিত হইতেন"। পৃ. ৬৪৯। সমসাময়িক মত হিসাবে ইহা উদ্‌ধৃত হইল।

৩ শূদ্রধর্ম, প্রবাসী ১৩৩২ অগ্রহায়ণ। কালান্তর ২য় সংস্করণ।

'শূদ্রধর্ম' প্রবন্ধের যে অংশ পত্রিকায় আছে, তাহা কালান্তরে নাই, আমরা নিম্নে সেই বর্জিত অংশ উদ্‌ধৃত করিলাম।

"শাংহাই শহরে চীনীয়দের যে ধর্মঘট[১] চলছে তার সম্বন্ধে একজন আমেরিকান লেখক আমেরিকার The Nation পত্রে একটি প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন। তাতে একজন চীনা ভদ্রলোকের যে সাক্ষ্য প্রকাশিত হয়েছে তা নিম্নে উদ্‌ধৃত করি—

"8. *A Chinese Graduates of Glasgow. His English is faultless. His labor library is the best I have seen in the East. His pictures are hung in international exhibitions.*

"I am a pacifist. But I shall tell you a story that will show you how I feel about this strike.[১] It will show you how hard it is to be a pacifist in China today.

"There is a park here in Shanghai which is paid for chiefly by Chinese taxpayers, but no Chinese person is allowed to enter it. One day I was walking by this park when I saw a Sikh policeman chase away a group of ricksha men from the gate, curse them and deliberately tip over one of the rickshas. He had lost his temper because one of the men had come too close to the forbidden territory. He took the license of one of the ricksha men away from him while the poor fellow stood here in the road with the tears streaming down his face. I walked over to the Sikh policeman and said: 'If I were hired by the British to police India for them, I would never treat your countrymen as you are treating these rickshamen'.

"He cooled down very quickly and was about to give the license back to the rickshaman when two Englishmen came up. They said to me, 'What are you doing here interfering with this policeman? Don't argue with us. You have no business here. You're nothing but a damned Chinaman. Get out of here.'

"They said that to me in China".[২]

গ্রন্থ সমালোচনা করিলেন পরশুরামের 'গড্ডলিকা'র। রাজশেখর বসু সাহিত্যক্ষেত্রে তখনো নূতন; রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে অকুণ্ঠিত ভাষায় অভিনন্দিত করিয়া আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে এক পত্রে লেখেন (১৩৩২, অগ্রহায়ণ ১৮) "আমি রস যাচাইয়ের নিকষে আঁচড় দিয়ে দেখলেম বেঙ্গল কেমিক্যালের এই মানুষটি একেবারেই কেমিক্যাল গোল্ড নন, ইনি খাঁটি খনিজ সোনা।" তখন রাজশেখর বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের বিশিষ্ট কর্মকর্তা।[৩]

রবীন্দ্রনাথ 'গড্ডলিকা' পড়িয়া লিখিলেন, "ভয় ছিল, পাছে নামের সঙ্গে বইয়ের আত্মপরিচয়ের মিল থাকে, কেননা সাহিত্যে গড্ডলিকা-প্রবাহের অন্ত নাই। কিন্তু সহসা ইহার অসামান্যতা দেখিয়া চমক লাগিল।·· লেখাটার

১ Sentiment against the 'unequal treaties' and against the British who used gunfire to disperse dangerous student demonstrations at Shanghai (May 30) and Canton (June 23), found effective expression in a strike and boycott of British goods and shipping, until October 1926.—see *An Encyclopaedia of World History*, Edited by William L. Langer (1952)। p, 1118.

২ প্রবাসী, ১৩৩২ অগ্রহায়ণ, পৃ. ২১৫।

৩ তিন মাস পূর্বে রবীন্দ্রনাথ 'চরকা' প্রবন্ধে প্রফুল্লচন্দ্রের সমালোচনা করেন : কিন্তু এখন সে পটভূমি মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে।

উপর কোনো চেনা হাতের ছাপ পড়ে নাই। নূতন মানুষ বটে সন্দেহ নাই, কিন্তু পাকা হাত।"[১] সমস্ত প্রবন্ধটি তুলিয়া দিতে পারিলে ভালো হইত— সাহিত্যবিচারের অসাধারণ শক্তিবলে রবীন্দ্রনাথ বাংলাসাহিত্যের এই নবাগতের অসামান্যতা সহজেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তখনও তিনি রাজশেখরের সহিত পরিচিত হন নাই।

পূজাবকাশের পর বিদ্যালয় খুলিবার মুখেই বোধ হয় কবি নভেম্বরের গোড়ায় শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসেন। 'দিনরাত লোকজন, কথাবার্তা কাজকর্ম,' কবির ইচ্ছা "কর্তব্যকর্ম টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে স্বপ্নলোকে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে পড়তে, . . খ্যাতিহীন উদ্দেশ্যহীন সাবেক দিনগুলোর ঠিকানা খুঁজে বের করতে।"[২] কিন্তু মুক্তি নাই। আপনার সৃষ্ট কর্মজালে আপনি আবদ্ধ; ইতিমধ্যে (২১ নভেম্বর) ইতালি হইতে বিশ্বভারতীর অভ্যাগত-অধ্যাপক কার্লো ফর্মিকি আসিয়া গিয়াছেন। দক্ষিণ-আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তন-পথে কবি কয়েক দিন ইতালিতে ছিলেন, সেই সময়ে অধ্যাপক ফর্মিকি কবির দোভাষী ও সঙ্গীরূপে সহায়তা করেন; তখনই কবি তাঁহাকে বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনার জন্য আহ্বান জানাইয়া আসেন। ফর্মিকি রোমের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও প্রাচ্য সংস্কৃতির অধ্যাপক, অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' ইতালীয় ভাষায় অনুবাদক।

ফর্মিকির সহিত আসিলেন তরুণ অধ্যাপক তুচ্চি (Guissope Tucci); ইনি বহু ভাষাবিদ্, সংস্কৃত ছাড়া চীনা ও তিব্বতী ভাষা এবং বৌদ্ধ দর্শনাদি বিষয়ে সুপণ্ডিত। ইঁহার ব্যয় ইতালীয়সরকার বহন করিয়াছিলেন। ফর্মিকির সহিত মুসোলিনী বিশ্বভারতীর জন্য অতি মূল্যবান ইতালীয় গ্রন্থরাজি প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইতালিতে তখন মুসোলিনী সর্বময় কর্তা। তবে ১৯২৪-২৫ সালে নানা রাজনৈতিক কারণে তাঁহার এককর্তৃত্ব ক্ষুণ্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছিল; ফর্মিকির এই আমন্ত্রণকে কেন্দ্র করিয়া মুসোলিনী ভারতের সহিত সৌহার্দ্য স্থাপনের প্রথম সুযোগ গ্রহণ করিলেন। তিনি ফর্মিকিকে এক পত্রে লিখিলেন— Illustrious Professor, While I express my lively satisfaction to you on account of the invitation you have received from the Visva-Bharati University, an institution which honours an Italian savant, the Italian science and the University of Rome, I am glad to entrust you with the charge of bringing in my name as a gift to that Institution which is the greatest centre of Indian culture, the books...with the wish that this offering may always render more and more intense the cultural relations between Italy and the classic land of India, the cradle of the civilization of the world.

এই পত্রখানি ফর্মিকির নামে লিখিত হইলেও ইহার ভাষা দেখিয়া বেশ বুঝা যায় যে ভারতকে তোষণ করিবার মত ভাষাবোধ ইতালির ডিপ্লোমেটিক সার্বিসের জানা ছিল।

রবীন্দ্রনাথ মুসোলিনীকে ধন্যবাদ দিয়া তার পাঠাইলেন— "Allow me to convey to you our gratitude in the name of the Visva-Bharati for sending us, through Prof. Formichi, your cordial appreciation of Indian civilization, and deputing Prof. Tucci of the University of Rome for acquainting our scholars with Italian history and culture and working with us in various departments of oriental studies, and also for the generous gift of books in your name, showing a spirit of magnanimity worthy of the traditions of your great country."

১ "গড্ডলিকা", প্রবাসী ১৩৩২ অগ্রহায়ণ, পৃ. ২১৫-১৬।

২ চিঠিপত্র ৫, পত্র ২০। ২ ডিসেম্বর ১৯২৫।

মুসোলিনী যে গ্রন্থরাজি উপহার দিয়াছিলেন, তাহা সত্যই মূল্যবান ; ইতালীয় শিল্পকলার চিত্রসম্বলিত গ্রন্থগুলি কেবল মূল্যবান নহে, তাহারা অধুনা দুষ্প্রাপ্য।

ফর্মিকিরা আসিবার কয়েকদিন পর (২৪ নভেম্বর) বাংলার গভর্নর লর্ড লিটন সিউরীতে সরকারী দরবার করিতে যাইবার পথে শান্তিনিকেতনে কবির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গেলেন ; এইটি তাঁহার ব্যক্তিগত সফর। কবি যথারীতি অতিথিসৎকার করিলেন ; কিছুকাল পূর্বে ঢাকায় পুলিস প্যারেডের সময়ে লিটনের প্রদত্ত ভাষণ লইয়া কবির সহিত পত্র-পত্রোত্তর দ্বারা যে তিক্ততা সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাই কি শমিত করিবার জন্য আসেন ?

কিন্তু কোনো কোনো সাময়িক পত্রিকা লিটনের শান্তিনিকেতনে আগমন উপলক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথের নিন্দাবাদে মুখর হইয়া উঠেন ; রবীন্দ্রনাথ লিটনের সহিত একত্র ভোজন করিয়াছেন বলিয়াও তাহারা তীব্র মন্তব্য করে।[১]

শান্তিনিকেতনে বাসকালে ইন্দিরা দেবীকে এক পত্রে লেখেন (২ ডিসেম্বর), "দিনরাত লোকজন, কথাবার্তা, কাজকর্ম, তার উপরে এক অভিভাষণ [প্রথম দর্শন-কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণ] কাঁধে চেপেছে। মনটা ভিতরে ভিতরে লেখা সম্বন্ধে হরতাল নেবার পরামর্শ করচে। . . লেখার তাগিদ মনের মধ্যে নেই।" কথাটা আংশিকভাবে সত্য ; কারণ দিলীপ রায়ের এক পত্র পাইয়া যে দীর্ঘ উত্তর লিখিলেন তাহাতে মনের আনন্দই প্রকাশ পাইয়াছে।

দিলীপ রায় তাঁহার পত্রের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের একখানি পত্র কবিকে পাঠাইয়া দেন। সুভাষচন্দ্র তখন বর্মার মান্দালয় জেলে অন্তরীণাবদ্ধ। পাঠকের মনে আছে ১৯২৪ অক্টোবরের অর্ডিনান্স অনুসারে তিনি বন্দী হন। কবি দিলীপকে[২] লিখিতেছেন (১০ ডিসেম্বর) . . "সুভাষের চিঠি[৩] বড়ো সুন্দর-- এই লেখার ভিতর দিয়ে তাঁর বুদ্ধি ও হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে তৃপ্তিলাভ করেছি। সুভাষ আর্ট সম্বন্ধে যা লিখেচেন তার বিরুদ্ধে বলবার কিছুই নেই। যেখানে আর্টের উৎকর্ষ, সেখানে গুণী ও গুণবত্তুদের ভাবের উচ্চশিখর। সেখানে সকলেই অনায়াসে পৌঁছবে এমন আশা করা যায় না— সেইখানে নানা রঙের রসের মেঘ জমে ওঠে— সেই দুর্গম উচ্চতায় মেঘ জমে বলেই তার বর্ষণের দ্বারা নিচের মাটি উর্বরা হয়ে ওঠে। অসাধারণের সঙ্গে সাধারণের যোগ এমনি করেই হয়, উপরকে নিচে বেঁধে রেখে দিলে হয় না। যারা রসের সৃষ্টিকর্তা তাদের উপর যদি হাটের ফরমাশ চালানো যায়, তা হলেই সর্বনাশ ঘটে। ফরমাশ তাদের অন্তর্যামীর কাছ থেকে। সেই ফরমাশ অনুসারে যদি তারা চিরকালের জিনিস তৈরি করতে পারে, তাহলেই আপনিই তার উপরে সর্বলোকের অধিকার হবে। . . কবিকে আমরা যেন এই কথাই বলি তোমার যা সর্বশ্রেষ্ঠ তাই যেন তুমি নির্বিচারে রচনা করতে পারো ; কবি যদি সফল হয়, তবে সাধারণকে বলব যে

১ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এ-বিষয়ে লিখিতেছেন, 'রবিবাবুর সহিত কলিকাতায় কথাপ্রসঙ্গে লাট-সাহেবের শান্তিনিকেতন দর্শন সম্বন্ধে তিনি যাহা বলেন, তাহা লিপিবদ্ধ করিবার অনুমতি আমরা পাই নাই। অনুমতি থাকিলে প্রমাণ করা সহজ হইত যে, এই দর্শন-ব্যাপারটা তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু ছিল না। ইহার বেশি কিছু লিখিব না।'

লিটন সম্বন্ধে লোকের বিরক্তির কারণ ঢাকায় পুলিস-প্রশংসা ও সে-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের পত্র ব্যবহার। রামানন্দবাবু লিখিতেছেন, 'কোন কোন খবরের কাগজ পাঠকদের বিশেষ দর্শনীয় স্থানে ও বড় অক্ষরে প্রচার করে যে, রবিবাবু লিটনের অনুরোধে তাঁহাকে প্রথম চিঠি লেখেন ; কিন্তু যখন ঐ কথা মিথ্যা বলিয়া প্রতিবাদ হয়, তখন প্রতিবাদ ছোট অক্ষরে, সহজে চোখে পড়ে না, এরূপ এককোণে ছাপা হইয়াছিল। এরূপ লোকদের কাছে তিনি ন্যায়বিচার পাইবেন না, জানি।'—প্রবাসী ১৩৩২ পৌষ, পৃ. ৪২৬-২৭।

২ সেইদিন প্রমথ চৌধুরীকে এক পত্রে লিখিতেছেন (১০ ডিসেম্বর) "এইমাত্র দিলীপকে একখানি চিঠিতে আর্ট সম্বন্ধে দুচার কথা আলোচনা করে লিখেছি।" চিঠিপত্র ৫, পত্র ৯৭।

৩ সুভাষের চিঠি। দ্র. দিলীপ রায়, অনামী, পৃ. ৩৫১-৫৪। রবীন্দ্রনাথের চিঠি, অনামী, পৃ. ৩৫৪-৫৫।

জিনিস শ্রেষ্ঠ তুমি যেন সেটি গ্রহণ করতে পারো। যারা রূপকার, যারা রসস্রষ্টা, তারা আর্টের সৃষ্টি সম্বন্ধে সত্য ও অসত্য, ভালো ও মন্দ এই দুটি মাত্র শ্রেণীভেদই জানে— বিশিষ্ট কতিপয়ের পথ্য ও ইতর সাধারণের পথ্য বলে কোনো ভেদ তাদের সামনে নেই।· · সর্বসাধারণকে আমরা মনে অশ্রদ্ধা করি বলেই রসের নিমন্ত্রণসভায় আমরা বাইরে আঙিনায় তাদের জন্য চিঁড়ে-দইয়ের ব্যবস্থা করি— সন্দেশগুলো বাঁচিয়ে রাখি যাদের বড়ো লোক বলি তাদের জন্যেই।"

ইতিমধ্যে কবির আহ্বান আসিয়াছে ভারতীয় দর্শন-সম্মেলনের সভাপতিত্ব গ্রহণের জন্য। ইহাই Indian Philosophical Congress-এর অধিবেশন। রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক নহেন, অর্থাৎ যে-অর্থে দর্শন শব্দের সংজ্ঞা স্থির করা আছে, তদনুসারে তাঁহাকে কখনই দার্শনিকদের গোষ্ঠীবদ্ধ করা যায় না। পৃথিবীর কোনো ভাবস্রষ্টা বা ধর্মসাধক দর্শনের গ্রন্থ লেখেন নাই বা দার্শনিক পরিভাষা-কণ্টকিত রচনার দ্বারা নিজ মত ব্যক্ত করেন নাই। অথচ তাঁহাদের আত্মানুভূতিকেই কেন্দ্র করিয়া পৃথিবীর বহু দর্শনশাস্ত্রের উদ্ভব।[১] সুতরাং ভারতের দর্শনশাস্ত্রী অধ্যাপকগণ রবীন্দ্রনাথকে ভারতীয় দর্শন-সম্মেলনের প্রথম সভাপতি মনোনীত করিয়া যোগ্যকর্মই করিয়াছিলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় দর্শন-সম্মেলনের অধিবেশনে (১৯ ডিসেম্বর) রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করেন। ভাষণ দিয়া পরদিনই কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসেন—২২ ডিসেম্বর সাতই পৌষের উৎসব।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অভিভাষণে[২] ভারতের প্রাকৃত লোকের মধ্যে যে-গূঢ় আধ্যাত্মিকতা আছে, তাহারই কথা বিস্তারিত করেন। মানুষের মনকে মুক্তিদানই যদি দর্শনের অভিপ্রায় হয়, তাহার দৃষ্টিকে স্বচ্ছ করা যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে কবি ছাড়া কে সে-দৃষ্টি খুলিয়া দিতে পারে। সাধারণলোকের ধর্মচেতনার মধ্যে মুক্তির যে তত্ত্ব নিহিত, সংস্কৃত শাস্ত্রে তাহা কী আকার লইয়াছে, এই ভাষণে তাহার আলোচনা দেখি। ভারতীয় মুক্তিতত্ত্বের সহিত পাশ্চাত্য খ্রীষ্টান মুক্তিতত্ত্বের পার্থক্য কোথায় তাহাও অল্প কথায় কবি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রবন্ধের প্রারম্ভভাগে কবি বলেন যে, পাশ্চাত্য জগতে কবিতা ও দর্শন পৃথক বিষয়; সেই জন্য প্লাতুন (Plato) তাঁহার আকাশকুসুম বা রামরাজ্য রিপাবলিক হইতে কবিদের নির্বাসনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। কিন্তু ভারতে কাব্য ও দর্শন মিশিয়া আছে; শঙ্করাচার্যের নামে অনেক কাব্য আরোপিত হয়। মধ্যযুগে সন্তসাধকদের দার্শনিকতত্ত্ব কাব্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। বাংলায় বাউল ও ঐ শ্রেণীর নানা সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি দেখান যে ইহারা তত্ত্বকথা কত সহজ ও সরল কবিতায় প্রকাশ করিয়াছে। সেইসব জটিল তত্ত্ব শুনিতে শুনিতে লোকে রাত ভোর করে। ভারতের এই উপেক্ষিত ও স্বল্প পরিচিত জনতার আধ্যাত্মিক সাধনার প্রতি রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম শিক্ষিত ভদ্রদের গোচরীভূত করিয়াছিলেন।

দর্শন-সম্মেলনের ভাষণ প্রদান করিবার পরদিনই কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া যান— সেখানে ২২ ডিসেম্বরের

১ দর্শনশাস্ত্রী ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ তাঁহার ত্রিশ বৎসর বয়সে ১৯১৮ সালে *The Philosophy of Rabindranath Tagore* নামে গ্রন্থ লেখেন। ইঁহার পূর্বে রবীন্দ্রসাহিত্যে যে কোনো 'দর্শন'তত্ত্ব আছে তাহা কেহ স্পষ্ট ভাষায় লেখেন নাই।

২ The Philosophy of Our People—Visva-Bharati Quarterly vol III, 1926 Jan-March, p. 295-311; also Calcutta Review 1926; Modern Review 1926 January, see also the Silver Jubilee Issue of Indian Philosophical Congress 1950। বাংলা অনুবাদ— বঙ্গবাণী ১৩৩২ মাঘ, পৃ. ৭৮৫-৯১। প্রবাসী ১৩৩২ মাঘ, পৃ. ৫৪১-৫১।

সাতই পৌষের উৎসব : এই দিন প্রাতের ভাষণের নাম 'শুভ ইচ্ছা'।[১] এই দিন মন্দিরে তাঁহার নবরচিত গান 'ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর' গীত হয়।[২]

দুই দিন পরে ২৪ ডিসেম্বর (৯ পৌষ ১৩৩২) বিশ্বভারতী পরিষদের বাৎসরিক সভায় রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠাতা-আচার্যরূপে ভাষণ দান করেন। একদিন তিনি কবিরূপে ভাবিয়াছিলেন যে তিনি কমিটি প্রভৃতির সহিত কার্য করিতে পারিবেন না ; কিন্তু কর্মীরূপে দেখিলেন তাহা অনিবার্য। এই ভাষণের এক স্থানে তিনি বলেন, "এই প্রতিষ্ঠানের বাহ্যায়তনটিকে সুচিন্তিত বিধিবিধান দ্বারা সুসম্বদ্ধ করবার ভার আপনারা [অর্থাৎ পরিষদের জীবনসদস্য ও সাধারণ সদস্যগণ] নিয়েছেন। · · অঙ্গ-বন্ধনের প্রয়োজন আছে। জলের পক্ষে জলাশয়ের উপযোগিতা কে অস্বীকার করবে ? সেই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখা চাই যে চিত্ত দেহে বাস করে বটে কিন্তু দেহকে অতিক্রম করে। দেহ সীমায় বদ্ধ, কিন্তু চিত্তের বিচরণ-ক্ষেত্র সমস্ত বিশ্বে। দেহ-ব্যবস্থা অতি-জটিলতার দ্বারা চিত্ত-ব্যাপ্তির বাধা যাতে না ঘটায় এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে।"[৩] অর্থাৎ ব্যবস্থা ও খবরদারির চাপে তোতাকাহিনীর পুনরাবৃত্তি না হয়।

শীতকালে শান্তিনিকেতনে দেশবিদেশ হইতে বহু অতিথি অভ্যাগত আসিয়া থাকেন। এইবার জানুয়ারি মাসে F. S. Marvin নামে একজন খ্যাতনামা লেখক আশ্রমে আসিলেন। তিনি লীগ অব্ নেশনসের প্রতিনিধিরূপে দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন ; তিনি 'লীগ্' পৃথিবীর শান্তিরক্ষার জন্য কী করিতেছে, সেই বিষয়ে বলেন। কিন্তু তাঁহার ভাষণ বিষয়ের গুরুত্বের অনুপাতে, আদৌ মনোজ্ঞ হয় নাই— কারণ শ্রোতারা বেশ ক্রিটিক্যাল ও দুনিয়ার রাজনীতিক ঘটনাদি সম্বন্ধে ভালো রকম ওয়াকিবহাল ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সহিত মার্ভিন সাহেবের সাক্ষাৎ হইলে তিনি লীগ অব্ নেশনসের কথাই পাড়েন ; তখন কবি বলেন যে, পরিতাপের বিষয় প্রাচ্যদেশে য়ুরোপ হইতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা আসেন না : যেসব ইংরেজ আসেন তাঁহাদের মধ্যে দার্শনিক বা artistic type বা শিল্পী-মেজাজী লোক খুবই কম। ইংরেজদের ব্যবসা এদেশে শুরু, শাসনকার্যে তাহার সমাপ্তি। এই শ্রেণীর লোকই অধিক সংখ্যায় এদেশে আসে। কিন্তু শাসনকার্যটি পরিচালনাই য়ুরোপীয় সভ্যতার চরম কথা নয়। সংস্কৃতির দিকটা এ দেশে অজ্ঞাত থেকে যায়। সেইটি হইলে পশ্চিমের সহিত প্রাচ্যের যথার্থ যোগবন্ধন সার্থক হইবে।

দেশে ফিরিয়া মার্ভিন সাহেব ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানে (২৩ জুন) লেখেন, 'He (Tagore) is the attraction and the stimulus, and one can see but a doubtful prospect for the settlement [Santiniketan] if these were withdrawn.'

রবীন্দ্রনাথ নাই, কোনো মহাপুরুষই নাই ; কিন্তু তাই বলিয়া কি তাঁহাদের বাণী তাঁহাদের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই লুপ্ত হইয়াছে ?

১ শুভ ইচ্ছা। প্রবাসী ১৩৩২ ফাল্গুন, পৃ. ৬৮৯-৯২।

২ প্রবাসী ১৩৩২ মাঘ, পৃ. ৪৩৩।

৩ বিশ্বভারতী পরিচয় (বিশ্বভারতী বার্ষিক পরিষৎ— ৯ পৌষ, ১৩৩২, বক্তৃতা)। ইন্দ্রকুমার চৌধুরী কর্তৃক অনুলিখিত। শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, ১৩৩২ ফাল্গুন। দ্র. প্রবাসী ১৩৩২ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ৩০০-৩০৩।

লখনৌ হইতে পূর্ববঙ্গে

লখনৌতে নিখিলভারত সংগীত-সম্মেলন। রবীন্দ্রনাথকে সংগীত সম্বন্ধে ভাষণদানের জন্য নিমন্ত্রণ আসিয়াছে। সে সময়ে লখনৌ আর্টস স্কুলে (বর্তমানে College of Arts and Crafts) অধ্যক্ষ শ্রীঅসিতকুমার হালদার। ১৯২৫ সালের গোড়ায় তিনি অধ্যক্ষ হইয়া আসিয়াছেন— ইনি প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ এই আর্ট স্কুলে। কবি ১৯২৬ সালের জানুয়ারির মাঝামাঝি লখনৌ পৌঁছান— তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা হয় সেখানকার 'ছত্রমঞ্জিল'— আউধের নবাবদের এক প্রাসাদ।

লখনৌ-এ কবি সংবাদ পাইলেন শান্তিনিকেতনে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যু হইয়াছে (৪ মাঘ ১৩৩২ ॥ ১৮ জানুয়ারি)। কবিকে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিতে হইল। দ্বিজেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে আছেন ১৯০৬ সাল হইতে। মহর্ষি যতদিন জীবিত (১৯০৫ জানুয়ারি পর্যন্ত) ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ পিতার সহিত থাকিতেন। তাঁর মৃত্যুর পর কিছুকাল রায়পুরে থাকিয়া নিচুবাংলার বাড়ি নির্মিত হইলে, তিনি সেখানে আসেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের সহিত বিদ্যালয়ের কোনো আপিসী সম্বন্ধ ছিল না সত্য, কিন্তু আশ্রম-জীবনের সহিত তাঁহার নিবিড় যোগ ছিল। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শন অধ্যয়ন ও সমন্বয়ন করা ছিল তাঁহার তপস্যা। তাঁহার অধীত কাণ্ট, হেগেল ও বেদান্তের গ্রন্থগুলি আমরা দেখিয়াছি; কী তন্ন তন্ন করিয়া সেগুলি অধীত, তার নিদর্শন প্রতি পৃষ্ঠা সাক্ষ্য দেয়। বড়ই আশ্চর্যের বিষয় বাঙালী পাঠকসমাজ তাঁহার প্রাপ্য সম্মান দেন নাই; অথচ তাঁহার 'গীতাপাঠের ভূমিকা'র ন্যায় গ্রন্থ যে-কোনো ভাষায় দুর্লভ; এই বইখানি তিনি আশ্রমের আলোচনা-সমিতিতে পাঠ করিয়াছিলেন। গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে ইনি গান্ধীজিকে দেশের মুক্তিদাতা বলিয়া অভিনন্দিত করেন; গান্ধীজি তাঁহাকে রবীন্দ্রনাথের সূত্রে 'বড়ো দাদা' বলিতেন।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে হয় যে, দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ— এই ভ্রাতৃত্রয়ের একটি সুষ্ঠু আলোচনা বাংলায় হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়: ইহারা নানাভাবে রবীন্দ্রনাথের পথিকৃৎ, রবীন্দ্রনাথের জীবনের পটভূমি হিসাবে এই ত্রয়ীর কথা আলোচ্য।

রবীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতনে ফিরিতে হইল; দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর যেসব সামাজিক, সাংসারিক ও বৈষয়িক কাজকর্ম ছিল তাহা কবিকে অগ্রবর্তী হইয়া করিতে হইল— কারণ দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের মৃত্যু ইতিপূর্বে হইয়াছে।

শান্তিনিকেতনে মাঘোৎসব (২৫ জানুয়ারি) যথাবিধি তিনি নিষ্পন্ন করেন। সেইদিনের একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য; গুরুপল্লীতে আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে সন্ধ্যার পর মাঘোৎসবের একটি ঘরোয়া উপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম; কবিকে সাধারণভাবে সংবাদটি প্রাতে দিয়াছিলাম। বাড়িতে যখন উপাসনাদি হইতেছে, তখন হঠাৎ সংবাদ পাইলাম, কবি আসিয়াছেন এবং উত্তরের বারান্দায় মাটিতে বসিয়া আছেন। আমি তাঁহাকে ভিতরে আনিয়া কিছু বলিতে বলি; তিনি সানন্দে ভাষণ দিলেন; তবে তিনি বলেন যে এই ভাবের আয়োজনের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার সম্ভাবনা আছে কিনা ভাবিবার বিষয়।

ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (স্থাপিত ১৯২১) হইতে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণ আসিল— সেই সঙ্গে অধ্যাপক ফর্মিকি ও তুচ্চিরও আহ্বান আসে। ঢাকায় যাইবার এই সুযোগ উপলক্ষ্যে কবি পূর্ববঙ্গ সফর করিবেনও স্থির হইল। ঢাকা সম্বন্ধে কবির অভিজ্ঞতা সামান্যই; বহু বৎসর পূর্বে (১৮৯৮ এপ্রিল) প্রাদেশিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে সেখানে আসেন। জগৎব্যাপী খ্যাতিলাভের পর ঢাকা তথা পূর্ববঙ্গের এই প্রথম ও শেষ পরিচয়।

কবির সঙ্গে চলিলেন রথীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ, কালীমোহন ঘোষ, হিরজিভাই মরিস; এ ছাড়া ফর্মিকি ও তুচ্চি। ইতিপূর্বে পথিকৃৎরূপে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক নেপালচন্দ্র রায়কে পূর্বাহ্নে প্রেরণ করা হইয়াছিল।

কবি ও তাঁহার সঙ্গীরা ২৪ মাঘ ১৩৩২ (৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬) ঢাকা পৌঁছিলেন। নারায়ণগঞ্জ স্টীমারঘাটে জাহাজ পৌঁছিলে দেখা গেল বিপুল জনতা কবিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উপস্থিত। অভ্যর্থনাসমিতির সদস্যগণ নারায়ণগঞ্জ হইতে মোটরযোগে কবিকে ঢাকায় লইয়া চলিলেন। শহরের পূর্ব সীমান্তে স্কাউট্ ও স্বেচ্ছাসেবকগণ কবিকে স্বাগত করিল। বিরাট শোভাযাত্রা রাজসম্মানে কবিকে লইয়া বুড়ীগঙ্গা নদীতীরে উপস্থিত হইল— কবি থাকিবেন নদীবক্ষে নবাব বাহাদুরের 'তুরাগ' নামে নৌকাগৃহে। সেইদিন অপরাহ্নে নর্থব্রুক হলে কবি-সংবর্ধনা; ম্যুন্সিপালিটি ও পিপলস্ অ্যাসোসিয়েশনের তরফ হইতে এই আয়োজন। কবি যাহা বলেন, তাহার নির্গলিত অর্থ হইতেছে যে ভারত চিরদিনই সকলকে আহ্বান করিয়াছে, ভারতের বাণী শান্তির বাণী। শান্তির মন্ত্র ভারত চিরদিন দেশ-বিদেশে প্রচার করিয়াছে— ভবিষ্যতেও করিবে। বিশ্বভারতী ভারতের সেই যজ্ঞশালা, যেখানে দেশ-বিদেশ হইতে অতিথিরা আসিয়াছেন, বিশ্বভারতী সর্বভারতের সামগ্রী, ইহার দায়িত্ব সর্বসাধারণের।

প্রথম সংবর্ধনা-সভার পর করোনেশন পার্কে সাধারণের অভিনন্দন সভা। জনসাধারণ রেট্‌পেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন ও হিন্দু-মুসলমান সেবকসমিতির তরফ হইতে অভিনন্দন-পত্র পঠিত হইল; কবি সংক্ষেপে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, কোনো বিশেষ ভাষণ দেন নাই।

কবি নদীবক্ষে থাকিলেও দর্শনপ্রার্থী লোকের অভাব সেখানে হয় নাই। পরদিন (৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬) সন্ধ্যায় 'দীপালি' সংঘের আয়োজনে ঢাকার ব্রাহ্মসমাজ মন্দির প্রাঙ্গণে প্রায় দুই হাজার মহিলাদের নিকট কবি প্রায় একঘণ্টা কাল বক্তৃতা করেন।·· "এত মহিলা এমন শান্তভাবে আমাকে কোথাও অভ্যর্থনা করে নাই।"[১]

তৃতীয় দিনের সন্ধ্যায় ঢাকা ইন্‌টারমিডিয়েট কলেজ-প্রাঙ্গণে জনসভায় কবির বক্তৃতা হয়। প্রতিপাদ্য বিষয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার স্বরূপ ব্যাখ্যান। কবি বলেন আমাদের দেশের সভ্যতা সংস্কৃতিমূলক— কোথাও উহা পুঞ্জীভূত হয় নাই, সমগ্র দেশময় উহা বিস্তৃত। সংস্কৃতি বা কাল্‌চার মানুষকে মিলিত করে: সংস্কৃতির সংহত রূপ প্রকাশ পায় সভ্যতা বা সিভিলিজেশনে। এইটি তার পরিণত রূপ; কিন্তু পরিণতির মধ্যেই মৃত্যুর বীজ রোপিত হয়; সংস্কৃতি বা কালচার জৈব বা creative, সভ্যতা যান্ত্রিক বা constructive; সংস্কৃতির মূলে আছে ধর্ম ও নীতি, সভ্যতার মূলে রহিয়াছে বিজ্ঞান— একটি আত্মীয়তামূলক, অপরটি নৈর্ব্যক্তিক। কবি হিন্দু-মুসলমান সমস্যার কথাও বক্তৃতা প্রসঙ্গে উত্থাপন করিয়া বলেন যে দারিদ্র্য বা অভাব বিরোধের অন্যতম প্রধান কারণ। যেদিন প্রাচুর্য আসিবে, সেদিন এই বিরোধেরও অবসান হইবে। কৌশলের দ্বারা মিলন সম্ভবে না— চাকুরী বণ্টনাদি সাময়িকভাবে সমস্যাকে দূরগত করিতে পারে, স্থায়ীফলপ্রসূ হয় না। সুবিধাগত মিলন হয় দেশে দেশে— যাহাকে বলা হয় political alliance; একদেশের অধিবাসীদের মধ্যে এ শ্রেণীর মিলন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। ঘুস দিয়া আত্মীয়তা হয় পুলিসের সঙ্গে, দস্যুর সঙ্গে। তাই বঙ্গবিচ্ছেদের সময় হিন্দু-মুসলমানে মিলন হয় নাই। এই সমস্যার সমাধান হইবে গ্রামে, যেখানে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি আছে— সেইখানে সেবার দ্বারা মিলন সম্ভব। ক্ষুদ্র সীমার

১ কবির ভাষণ, দীপালি সংঘ, সবুজ পত্র ১৩৩২ চৈত্র, পৃ. ৫৭২-৭৮। দ্র. প্রবাসী, ১৩৩২ মাঘ, পৃ. ৫৯২। বিবিধ প্রসঙ্গ। দীপালি সংঘ ঢাকার বিশিষ্ট নারী প্রতিষ্ঠান। শ্রীলীলাবতী নাগ, বর্তমানে লীলা রায় নামে খ্যাত, জয়শ্রী পত্রিকার সম্পাদিকা, (জন্ম ১৯০০) ১৯২১-এ এম. এ. পাস করিয়া জনসেবায় ব্রতী হন। ১৯২৩-এ এই সংঘ স্থাপিত হয় মাত্র বারো জন সদস্য লইয়া। বঙ্গের অন্তঃপুর হইতে অন্ধকার দূর করাই ইহার উদ্দেশ্য। এই সংঘ রবীন্দ্রনাথকে সর্বপ্রথম অভিনন্দনপত্র দেন।

মধ্যে আত্মশক্তি যদি সত্য হয়, তাহাতেই ভারতের মুক্তি হইবে। পল্লীর প্রাণ শুধু অন্নবস্ত্রের দ্বারা সজীব হয় না— সেখানে শিক্ষার আবশ্যক। পূর্বেও কবি বহুস্থানে সে কথা বলিয়াছিলেন, আজও সেইকথা বলিলেন— আত্মীয়তার জন্য আত্মীয়তা করো— কোনো রাজনৈতিক অভীষ্টসিদ্ধির জন্য নহে।[১]

১০ ফেব্রুয়ারি সকাল হইতেই বিচিত্র কর্মসূচী শুরু হইল। প্রথমে পূর্ববঙ্গ-ব্রহ্মসমাজ মন্দিরে বক্তৃতা, দ্বিপ্রহরে কলেজিয়েট স্কুল পরিদর্শন ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংঘের অভিনন্দন গ্রহণ, অপরাহ্নে মোস্‌লিম হলে সংবর্ধনা। সন্ধ্যা-বেলায় কর্জন-হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্‌সেলর মিঃ ল্যাংলি শেষোক্ত সভায় সভাপতি। কবির ভাষণের বিষয়— আর্টের অর্থ। এই ভাষণের মধ্যে, নূতন কথা কম ছিল, ইতিপূর্বে সাহিত্যে *Personality* গ্রন্থের What is Art প্রভৃতি প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই কয়েকটি উদাহরণ দিয়া স্পষ্টতর করিলেন। তিনি বলেন, "মানব তাহার প্রাচুর্যের প্রভাবেই আপনাকে অভিব্যক্ত করে, যেটুকু নিজের পক্ষে অত্যাবশ্যক, সেটুকুতে মানবের আত্মা তৃপ্ত থাকিতে পারে না। সৃষ্টির ভিতরে আপনাকে অভিব্যক্ত করিয়াই ব্রহ্ম আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন; অথচ সে-সৃষ্টির আবশ্যকতা তাঁহার পক্ষে কিছুই নাই। সুতরাং এই সৃষ্টি তাঁহার প্রাচুর্য প্রকট করিতেছে। মানুষও তেমনি সৃষ্টিতেই আনন্দ উপভোগ করে। এ সৃষ্টি তাহার আতিশয্য বা অমিতব্যয়িতার প্রমাণ— কার্পণ্যের নহে, দৈন্যের নহে। মানব পূর্ণস্বরূপে আপনাকে মিলিত করিতে চায়, সেই মিলনে যে অপূর্ব স্বাধীনতার আনন্দ আছে, সে তাহারই সন্ধানে ফিরিতেছে। আর্ট মানবজীবনের সম্পদকে অভিব্যক্ত করে। আর্টের এই যে সাধনা, নিজেই সেই সাধনা ফলরূপী; এই সাধনার ভিতরেই সিদ্ধির আনন্দ রহিয়াছে। আনন্দই সৃষ্টির মূলে— এই তত্ত্বটি ব্যাখ্যাত হয়। আর্ট ও বিজ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ কী তাহাও স্পষ্ট করেন। যাহা আছে বিজ্ঞান তাহাকে অপরিসীম আগ্রহের সহিত গ্রহণ করে, বাছাই করে না; শিল্পী বাছাই করিয়া বুঝে; এই বাছাই-এর বেলা তাহার অদ্ভুত খেয়ালের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে আসে রুচির প্রশ্ন, শিক্ষার প্রশ্ন, ঐতিহ্যের প্রশ্ন।"

এই ভাষণে সংগীত সম্বন্ধেও আলোচনা ছিল, কারণ সংগীতও আর্ট। বিজ্ঞানে গণিতের যে স্থান, আর্টে সংগীতের সেই স্থান; ইহা সম্পূর্ণ বস্তুনিরপেক্ষ। সংগীতের যে ঝংকার তাহা মুক্ত, অবাধ— বস্তুবিচারের বাঁধন, চিন্তার বাঁধন সংগীতকে বাঁধিতে পারে না। সংগীত যেন আমাদিগকে সকল জিনিসের আত্মার মধ্যে লইয়া যায়।

ইহার পর কবি ভারতীয় ভাস্কর্যাদি আর্টের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে কবি বলেন, অপূর্ণতার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য অপূর্ণের সংগ্রাম হইতেছে প্রতীচ্য আর্টের ধর্ম; পক্ষান্তরে প্রাচী স্বভাবতই অন্তর্দৃষ্টি-পরায়ণ; পূর্ণতার দিক হইতে তাহার প্রেরণা আসে। সেইজন্য ভারতশিল্পীরা বাহির হইতে নানা উপকরণ গ্রহণ করিয়াও আপনার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছেন। প্রতিভার অন্যতম লক্ষণ— গ্রহণ করিবার অসাধারণ ক্ষমতা। কবি স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, "কোনো রকমে ভারতীয় আর্টের লেবেল যাহাতে জুড়িয়া দেওয়া যায় এমন জিনিস মাপিয়া-জুখিয়া দেখিয়া-শুনিয়া তৈয়ারি করিলেই হইল— এই যুক্তি আমাদের শিল্পীরা যেন তাহা মানিয়া না লন।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাষণ দানের পর দুই-একদিন কবি কোনো সাধারণ অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে পারেন নাই— উপর্যুপরি কয়েকদিনের গুরুতর পরিশ্রমে শরীর খুব ক্লান্ত। ১৩ই অপরাহ্নে ভাইস-চান্‌সেলরের পার্টি ও সন্ধ্যার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বক্তৃতা হইল; এ দিনের ভাষণের বিষয় ছিল The Rule of the Giant।[২]

১ আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩ ফাল্গুন ১৩৩২ (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬)।

২ The Rule of the Giant, Visva-Bharati Quarterly Vol. IV. Part II. 1920 July-September।

বর্তমান যুগে মানুষের এত ঐশ্বর্যের মধ্যেও তাহার যে শান্তি নাই, সুখ নাই— ইহারই কারণ বিশ্লেষণ এই বক্তৃতার মূল কথা। মানুষ যন্ত্র সৃষ্টি করিয়া এখন যন্ত্র-দৈত্যের দাস হইয়াছে; যন্ত্রকে সে আজ নিয়ন্ত্রিত করিতেছে না, যন্ত্রই তাহাকে চালনা করিতেছে— পিষিয়া মারিতেছে, তাহারই সৃষ্ট অপদেবতাকে সংহত করিবার শক্তি সে হারাইয়াছে। জগতে মহত্ত্বের বেদিতে স্থূলত্বের পূজা হইতেছে (The idolatory of bigness has occupied the altar of greatness)।

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান ও স্বাচ্ছন্দ্যের বিরোধী নহেন— তাঁহার মন প্রতিক্রিয়াশীল বা প্রাচীনপন্থী নহে। তিনি আধুনিক বিজ্ঞান ও শিল্পের পক্ষপাতী; তবে সেই বিজ্ঞান যখন মানুষের মনুষ্যত্বকে বিনাশ করিতে উদ্যত হয়, তখনই কবিচিত্ত বিদ্রোহী হইয়া তাহাকে আঘাত করে।

১৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা-বাসের শেষদিন। সেদিনও দুই-একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া রাত্রির গাড়িতে কবি ময়মনসিংহ যাত্রা করিলেন। ময়মনসিংহ রেলস্টেশনে মুক্তাগাছার জমিদারগণ ও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে স্বাগত করিতে উপস্থিত ছিলেন। কবি মহারাজ শশিকান্তের অতিথি হইলেন।[১]

সন্ধ্যায় (১৫ ফেব্রুয়ারি) মুন্সিপালিটির টাউন-হলে কবি-সংবর্ধনা; কবি অভিনন্দনের উত্তরে বলেন যে, এই দ্রুত যানবাহনের যুগে মানুষে-মানুষে প্রকৃত ঘনিষ্ঠতা বা আত্মীয়তা দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ববঙ্গের প্রতি কবির শ্রদ্ধা চিরদিনের। "পূর্ববঙ্গের শ্যামলক্ষেত্রের মধ্যে বঙ্গমাতার একটি পীঠস্থান আছে, কিন্তু দেবীকে সহজে দেখিতে পাওয়া যায় না। · · দেশমাতার পূজাবেদির সম্মুখে ঈর্ষা, অশুচি ও বিদ্বেষ জর্জরিত হইতেছে বলিয়া তাঁহার পরিপূর্ণতা আবরণ ভেদ করিয়া প্রকাশিত হইতেছে না।" রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে দেশের সেই প্রকৃত রূপ দেখিবার জন্য আহ্বান করিলেন।[২]

১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬ (৫ই ফাল্গুন) প্রাতে রবীন্দ্রনাথকে স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরে অভিনন্দিত করা হয়। উত্তরে কবি বলেন, "আজকের দিনে যে বাণী সকলের চেয়ে আকাশ বাতাস পূর্ণ করে আছে সে হচ্ছে মুক্তির বাণী। মানুষের মধ্যে এমন একটি আশ্চর্য শক্তি আছে যা দ্বারা সে বর্তমান অবস্থাকে আপনার বন্ধন ব'লে জ্ঞান ক'রে সেই বন্ধনকে নিয়ত ছেদন করতে চেষ্টা করে। মানুষের ইতিহাস মুক্তির ইতিহাস। ভারতবর্ষ সেই মুক্তি চেয়ে বারবার পৃথিবীকে জয় ক'রে, লক্ষ্মী লাভ করেও বলেছে 'ততঃ কিম্'। ঐশ্বর্য্য, প্রতাপ— সেও বন্ধন ব'লে সে ঘোষণা করেছে। মানুষের আকাঙ্ক্ষা অসীমের জন্য, 'ভূমৈব সুখং'। নানাপ্রকার কামনাদ্বারা প্রবৃত্তিদ্বারা আমরা কর্ম করে থাকি। জীবনের অর্থই হচ্ছে নিয়ত কর্মচেষ্টা; আকাঙ্ক্ষা দিয়ে তার অভিব্যক্তি।"

ইহার পর তিনি আকাঙ্ক্ষা ও কামনার মধ্যে যে সূক্ষ্ম ভেদ রহিয়াছে তাহাই ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, "কামনার দ্বারা জীবনের শারীরিক ধর্ম রক্ষিত হয়, তার পশুধর্ম সার্থক হয়। কিন্তু এতে মানুষের তৃপ্তি নাই। মানুষের প্রাণ পশুর প্রাণ নয়— তার আধ্যাত্মিক যে জীবন, সে পশুর জীবন থেকে মুক্তি চাচ্ছে। যে সত্যকে দেখে, সে এই পশুধর্মকে ত্যাগ করে।

"বড়ো রূপ দেখলেই ত্যাগধর্ম আসে। এই ত্যাগের অর্থ সন্ন্যাস নয়, কৃচ্ছ্রসাধন নয়। বাইরের দিক থেকে

১ মুক্তাগাছা পূর্বপাকিস্তান বা পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ হইতে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত গণ্ডগ্রাম। তখনকার আচার্য চৌধুরীরা এককালে পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত জমিদারদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন।

২ আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ ফাল্গুন, ১৩৩২ (16 February 1926); ৬ ফাল্গুন (18 February)।

বাসনাকে ছিন্ন করলে অন্তরের যথার্থ যে আবরণ তা ছিন্ন হয় না। আনন্দই যথার্থ সমস্ত কামনাকে পরিপূর্ণতায় নিয়ে আসে। পরিপূর্ণ উপলব্ধি হলেই বাইরের দিকে চেয়ে থাকতে হয় না। মানুষ বলছে মুক্তি চাই; যে যে-পরিমাণ ত্যাগ করতে পারে সে সেই পরিমাণে ধন্য।"[১]

সেইদিন অপরাহ্ণে মুক্তাগাছার 'ত্রয়োদশী সম্মিলনী' হইতে রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার ময়মনসিংহে আগমন উপলক্ষ্যে মুক্তাগাছার অন্যতম জমিদার সুধেন্দুনারায়ণ আচার্য চৌধুরীর ময়মনসিংহস্থ ভবনে অভিনন্দিত করা হয়। তথায় মুক্তাগাছার সমস্ত জমিদার ও ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। রাজা শশিকান্তও রবীন্দ্রনাথের সহিত আসেন। জমিদারগণ রবীন্দ্রনাথকে দেড় হাজার টাকার একটি তোড়া উপহার দেন।

পরদিন ময়মনসিংহের নগরবাসীদের পক্ষ হইতে এবং সাহিত্যসভার পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথকে অপরাহ্ণে সংবর্ধিত করা হয়। কবি ইহার উত্তরে যাহা বলেন তাহা সংক্ষেপে এই— জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির সেবা-নিষ্ঠার প্রভাবেই জাতির ঐক্য এবং সংহতি সাধিত হইয়াছে। কবি দেশবাসীকে সেই ঐক্যের জন্য অনুরোধ করিয়া বলিলেন, জাতীয় কল্যাণের ফসল শুধু ফাঁকা কথার বক্তৃতা, ভাবপ্রবণতা এবং চিন্তার বিলাস বশেই অর্জন করিতে পারা যায় না; ইহা নিদারুণ আত্মপ্রবঞ্চনা। আবার গ্রামে ফিরিতে হইবে; সেখানে গিয়া দারিদ্র্য, অজ্ঞতা এবং ব্যাধির বিরুদ্ধে বীরোচিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। সংক্ষেপে গ্রামসংস্কার সম্বন্ধে তিনি জোর দিয়া এই বক্তৃতা প্রদান করেন।[২]

একদিন স্থানীয় আনন্দমোহন কলেজের ছাত্রগণ তাঁহাকে অভিনন্দিত করে এবং তিনি তাহাদের নিকট দীর্ঘ বক্তৃতায় বর্তমান শিক্ষার দুর্গতি কোথায় তাহাই ব্যাখ্যা করেন। বহুবার পূর্বে তিনি যে-কথা বলিয়াছেন, সেদিনও সেই কথা আরও জোর দিয়া বলিলেন; জ্ঞান আমাদের অন্তরকে উদ্বোধিত করে নাই, জ্ঞান আমাদের বোঝার মত হইয়া রহিয়াছে। শিক্ষা অর্থে পুঁথির বোঝা বহন হইয়াছে; আমাদের চিন্তা করিবার সাহস জাগিয়া উঠে নাই। তাহাতে চিত্তের দৈন্য ঘটিয়াছে। দেশকে জানিতে ও চিনিতে হইবে জ্ঞানের দ্বারা, তথ্যের দ্বারা— এই কথাই সেদিনও ছাত্রদের সম্মুখে বিশদভাবে বলিলেন।[৩]

সেইদিন অপরাহ্ণে স্থানীয় মহিলা-সমিতিতে রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা করেন। ইহার পূর্বে তিনি স্থানীয় বিদ্যাময়ী স্কুলের ছাত্রীবৃন্দকে এবং পরে সিটি স্কুলের ছাত্রবৃন্দকে উপদেশ দেন। সিটি স্কুল-প্রাঙ্গণের মহিলা-সমিতিতে বলেন, "সকল মঙ্গল কর্ম মেয়েদের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। মাতৃভাষার যথার্থ যে বাণী তা মেয়েদের কাছে যেমন সত্য হয়ে পৌঁছায়, এমন আর কোথাও নয়। মেয়েরা এতদিন নিজের নিকট-আত্মীয়দের সেবায় সান্ত্বনায় সহায়তা করেছেন, আজকের দিনে যখন সমস্ত পৃথিবী অতিথিরূপে দ্বারে এসেছে— তার সম্মানের ভার যদি মেয়েরা না নেন তাহলে অতিথিসৎকার হয় না। কর্মক্ষেত্রে কেবলমাত্র পুরুষেরই যে স্থান আছে— তা নয়; মেয়েদেরও সেখানে স্থান আছে। পল্লীর সেবাতে, দেশের সেবাতে আজ পুরুষ মেয়ে কর্মক্ষেত্রে একত্র মিলিত হোক, এই আমি আশা করে রয়েছি। এতদিন পুরুষেরা যে কাজ করেছে তাতে একটা অসম্পূর্ণতার ভাব দেখা গিয়েছে। তাই মেয়েদের আজ এগিয়ে এসে পুরুষদের সাথে মিলতে হবে— সেই অসম্পূর্ণতার ভাব দূর করে দিতে।"[৪]

১ আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭ ফাল্গুন ১৩৩২।

২ আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ ফাল্গুন, পুনরায় ১১, ১২ ফাল্গুন ১৩৩২।

৩ আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩, ১৪ ফাল্গুন ১৩৩২ ॥ 25th, 26th February 1926।

৪ বিস্তারিত বক্তৃতা শ্রীসুধেন্দুরঞ্জন হোম দ্বারা অনুলিখিত। দ্র. *Tagore cutting* Vol. 11; পূর্ববঙ্গের বক্তৃতা, প্রবাসী ১৩৩২ বৈশাখ

১৯ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার রাত্রে, রবীন্দ্রনাথ সদলে কুমিল্লায় পৌঁছান; কবির সঙ্গে ছিলেন— রথীন্দ্রনাথ প্রতিমা দেবী, তাঁহাদের কন্যা নন্দিনী, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীমোহন ঘোষ ও মিঃ মরিস্। ফর্মিকি ও তুচ্চি কুমিল্লা যান নাই। কুমিল্লায় 'অভয়-আশ্রমে' কবিকে লইয়া যাওয়া হয়। পূর্বাহ্ণে ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাকে 'অভয়-আশ্রমে'র তরফ হইতে নিমন্ত্রণ পাঠাইয়াছিলেন। আশ্রমের তৃতীয় বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ সভাপতি।

অভয়-আশ্রম কুমিল্লায় ১৩২৯ সালে (১৯২৩) স্থাপিত হয়; ইহার প্রধান-কর্মী ছিলেন সর্বত্যাগী ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আশ্রমের আদর্শ— মাতৃভূমির সেবাদ্বারা ভগবান লাভ; অপর কোনো দেশের অনিষ্ট না করিয়া সত্য ও ভগবানের সেবাই মাতৃভূমির সেবা। আশ্রমের উদ্দেশ্য স্বরাজলাভ; এই স্বরাজলাভের জন্য হিন্দু-মুসলমানের প্রেম অত্যন্ত আবশ্যক। অস্পৃশ্যতা ও জন্মগত জাতিভেদ হিন্দুসমাজের অকল্যাণকর। খদ্দর উৎপাদন ও পরিধান স্বরাজ সেবকদের কর্তব্য। সংক্ষেপে এই কয়টি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহারা জনসেবার কাজে চিকিৎসালয়, খদ্দর শিল্পবিভাগ ও শিক্ষাবিভাগাদি স্থাপন করেন। কর্মীদের অদম্য চেষ্টায় তিন বৎসরের মধ্যে অভয়-আশ্রমের নাম শুধু এই জেলায় নয়, সমগ্র বাংলাদেশে বিস্তারিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ ইঁহাদের কর্মনিষ্ঠা একাগ্রতা ও পল্লীসেবার আদর্শে মুগ্ধ হইয়া বার্ষিক উৎসবে সভাপতি হইতে স্বীকৃত হইয়া কুমিল্লায় আসিলেন।

২০, ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি আশ্রমের উৎসব। প্রথম দিন আশ্রমের উপাসনার পর কর্মীরা রবীন্দ্রনাথকে এক মানপত্র দেন। তিনি উত্তরে বলেন, "আত্মাই শক্তির উৎস, এই শক্তির সহিত পরিচয় লাভ করতে হলে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিতে হবে। অভয়-আশ্রমের কর্মীরা এইরূপে আত্মত্যাগ করছেন ব'লে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও আমি এখানে এসেছি।"

দিনব্যাপী বিচিত্র উৎসব অনুষ্ঠানের অনেকগুলিতে কবি যোগদান করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি রবিবার প্রাতে শহরের বহু গণ্যমান্য লোক ও মহিলা কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। দ্বিপ্রহরে ক্রীড়াকৌতুক প্রতিযোগিতা ও সার্বজনিক ভোজ হয়, ইহাতে ভদ্রলোক ও মেথরেরা এক পংক্তিতে ভোজন করেন। দুইটার পর চরকা প্রতিযোগিতা চলে।

সেইদিন দ্বিপ্রহরেই কুমিল্লার মহিলা-সমিতি কবিকে এক অভিনন্দন দেন। বৈকালে এক বিরাট জনসভায় প্রায় ৬।৭ হাজার লোক অভয়-আশ্রমের প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। এইদিন আশ্রমের বার্ষিক সভা। রবীন্দ্রনাথ সভাপতি; সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কার্যবিবরণী পাঠ করেন। অভিভাষণকালে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "বৈচিত্রের ভিতর সৃষ্টিরহস্য নিহিত। বিভিন্ন মত থাকা ও বিভিন্ন পথে কাজ করা জাতির দৌর্বল্য সূচিত করে না। কর্মধারাকে শতদল পদ্মের মতো ফুটাইয়া তোলাই কাজের সার্থকতার মূলমন্ত্র।" সেইদিন সন্ধ্যার পর সুরেশচন্দ্রের রচিত 'গৌরাঙ্গ' নাটকের অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন।

২২শে প্রাতে উপাসনার পর রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কিছু উপদেশ প্রদান করেন। দ্বিপ্রহরে তিনি মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রতিষ্ঠিত 'রামমালা ছাত্রাবাসে' যান, সেখানে ছাত্রেরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করে। সেখান হইতে ভিক্টোরিয়া কলেজে যান। নমঃশূদ্র কন্‌ফারেন্সে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যার পর মহেশ-প্রাঙ্গণে এক সভায় তিনি

১৮-২০। [এই বক্তৃতাগুলি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সংশোধন করিয়া ও স্থানে স্থানে স্বয়ং লিখিয়া দিয়াছেন—১. ময়মনসিংহে মুন্সিপালিটির অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর। ২. ময়মনসিংহ জনসাধারণের অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর। ৩. ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের ছাত্রগণের অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর। ৪. শিক্ষার ক্ষেত্র। ভিক্ষা— ভারতী ১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠ। দ্র. প্রবাসী ১৩৩৩ শ্রাবণ, পৃ. ৬২৪-২৫।

বক্তৃতা করেন; অভয়-কর্মীদের কথা এখানে তিনি খুব প্রশংসার সহিত বলেন। এই দিন রাত্রে কবি আগরতলা রওনা হন।

আগরতলায় কবি ইতিপূর্বে কয়েকবারই আসিয়াছেন। বর্তমান (১৯২৬) মহারাজার পিতা বীরচন্দ্র মাণিক্য কবির বন্ধু ছিলেন; তাঁহার পিতা কবির কাব্যজীবনের প্রত্যুষে যে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন, তাহার কথা কবি কোনো দিন ভুলেন নাই। ২৪ ফেব্রুয়ারি (১৯২৬) স্থানীয় কিশোর সাহিত্য-সমাজ কর্তৃক আহূত জনসভায় কবির সংবর্ধনা হইল, ত্রিপুরার তরুণ মহারাজ সভাপতি।

কবি যে চারি দিন আগরতলায় ছিলেন, উৎসবে নগরী মুখরিত ছিল। কবির জন্য মণিপুরী নৃত্য দেখাইবার বিশেষ ব্যবস্থা হয়। কবি এই নৃত্য দেখিয়া এতই মুগ্ধ হইলেন যে, এই নৃত্য প্রবর্তনার জন্য নবকুমার সিংহ নামে এক মণিপুরী শিক্ষককে শান্তিনিকেতনের জন্য নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করিয়া আসিলেন। এই নবকুমারের শান্তিনিকেতনে আগমন একটি বিশেষ ঘটনাই বলিব। কারণ এই নবকুমার হইতে শান্তিনিকেতনে নৃত্যকলা নূতন রূপ পরিগ্রহ করিল; এতদিন পরে যথার্থ নৃত্যশিক্ষক আসিল। এই নবকুমার পরে আমেদাবাদে সরাভাইদের গৃহবিদ্যালয়ে নৃত্যশিক্ষক নিযুক্ত হন এবং গুজরাটেও মণিপুরী নৃত্যের ঠাঠ তাঁহার শিক্ষার ফলে বিস্তারলাভ করে।

আগরতলায় কবি দুইটি গান রচনা করেন— 'দোলে প্রেমের দোলন চাঁপা' ও 'ফাগুনের নবীন আনন্দে'।[১]

আমাদের মনে হয়, এই ভ্রমণকালে নিম্নলিখিত গান কয়টিও লিখিত হয়— 'বনে যদি ফুটল কুসুম' (গীতবিতান পৃ. ৭৮৯), 'এসো আমার ঘরে' (পৃ. ৭৮৬)'আপনহারা মাতোয়ারা' (পৃ. ৭৮৮), 'ওগো জলের রানী (পৃ. ৭৮৮)।

আগরতলা হইতে ফিরিবার পথে রবীন্দ্রনাথকে কিয়ৎকালের জন্য চাঁদপুরে থাকিতে হয়। শহরের বহু গণ্যমান্য লোক রবীন্দ্রনাথের সাদর অভ্যর্থনার জন্য স্টেশনে উপস্থিত হন। নীরদ পার্কে তাঁহার সংবর্ধনা হয়; জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে বহু নরনারী রবীন্দ্রনাথের দর্শনমানসে উপস্থিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ বাংলার পল্লীগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য সকলকে আহ্বান করিলেন; বলিলেন, বাংলাদেশের আজ এই গুরুতর সমস্যা।

২৮ ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথ স্টীমারযোগে নারায়ণগঞ্জে ফিরিয়া আসেন। সেখানকার ছাত্রসংঘ তাঁহাকে মানপত্র দান করে। প্রতি-অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গের চরিত্রবল ও কর্তব্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে বলেন। এখানেও পল্লীমঙ্গল সম্বন্ধে বলিলেন এবং অভয়-আশ্রমের আদর্শ দেশময় প্রচারিত হয় সেইজন্য সকলকে আহ্বান করিলেন। যারা সমাজে অশুদ্ধ বলিয়া অপাংক্তেয় তাহাদিগকে সেবার দ্বারা অভয়-আশ্রম 'মানুষ' বলিয়া পরিচয় দেবার সাহস বাড়াইয়াছেন। তাহাদের মধ্যে আত্মসম্মান জাগাইয়া অভয়-আশ্রম যে মহৎ আদর্শ দেখাইতেছেন কবি সকলকে সেই আদর্শ গ্রহণ করিতে বলিলেন।

১ ১৫ ফাল্গুন ১৩৩২। দ্র. সবুজ পত্র, ১৩৩২ চৈত্র।

বৈকালী ও নটীর পূজা

পূর্ববঙ্গ সফর করিয়া কবি কলিকাতায় ফিরিলেন মার্চের গোড়ায়। কয়েকদিন পরে বিচিত্রা ভবনে কার্লো ফর্মিকির বিদায়-সভা (৯ মার্চ); রবীন্দ্রনাথ যথোপযুক্ত ভাষণ[১] দান করিলেন। ফর্মিকি মাস-চারের জন্য আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হইল— অধ্যাপক তুচ্চি রহিয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে সিউড়িতে আহূত বঙ্গীয়-সাহিত্যসম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য কবির আমন্ত্রণ আসিয়াছিল; ইস্টারের ছুটিতে (৪-৫ এপ্রিল) অধিবেশন। কবি ভাষণও লিখিলেন; কিন্তু পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের ক্লান্তি কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না— সিউড়ি যাওয়া হইল না। নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু সভাপতির কার্য করেন। কবি ভাষণ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহাই পঠিত হইল।

আমাদের আলোচ্যপর্বে (১৩৩২-৩৩) বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মনোমালিন্য নানাভাবে প্রকট হইতেছে। বাংলাদেশের দ্বৈরাজ্যিক শাসন ব্যবস্থাকে বানচাল করিবার জন্য চিত্তরঞ্জন দাশ মুসলমানদের সহিত তাঁহার স্বরাজ্য-পার্টির যে প্যাক্ট করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবিতকাল (১৯২৫ জুন) পর্যন্ত কোনোরূপে টিঁকিয়াছিল। কিন্তু রাজনৈতিক প্রেমের বন্ধন চোরাবালির উপর সৌধনির্মাণ সমান। বাংলাদেশে ফাটল দেখা দিল। রাজনীতির রেশারেশি একদিন ভাষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। বাংলাদেশের বাহিরে উত্তর-ভারতে হিন্দু ও মুসলমানের ভাষা ও লিপি যথাক্রমে হিন্দী ও উর্দু বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে; একমাত্র বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমানের ভাষা বাংলা, লিপি বাংলা। আজ সেখানে সাম্প্রদায়িকতার বিষ প্রবেশ করিল: মুসলমানদের মধ্যে একদল বলিলেন— বাংলা তাঁহাদের মাতৃভাষা নহে, উর্দু তাঁহাদের জাতীয় ভাষা!

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যসম্মেলনের ভাষণে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলেন যে, চীনদেশে মুসলমানদের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে: কিন্তু সেখানে আজ পর্যন্ত এমন অদ্ভুত কথা কেহ বলে নাই যে, চীনাভাষা ত্যাগ না করিলে তাহাদের মুসলমানিত্ব খর্ব হইবে। "সাহিত্যে বাংলাদেশে যে একটি বিপুল মিলনযজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে, যাহার বেদী আমাদের চিত্তের মধ্যে। সত্যের উপরে ভাবের উপর যাহার প্রতিষ্ঠা— সেখানেও হিন্দুমুসলমানকে যাঁহারা কৃত্রিম বেড়া তুলিয়া পৃথক করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা মুসলমানেরও বন্ধু নহেন। দুই প্রতিবেশীর মধ্যে একট স্বাভাবিক আত্মীয়তার যোগসূত্রকেও যাঁহারা ছেদন করিতে চাহেন তাঁহাদের অন্তর্যামীই জানেন, তাঁহারা ধর্মের নামে দেশের মধ্যে অধর্মকে আহ্বান করিবার পথ খনন করিতেছেন।· · বাংলাদেশের সাধনা একটি সত্যবস্তু পাইয়াছে, সেটি তাহার সাহিত্য। এই সাহিত্যের প্রতি আন্তরিক মমত্ববোধ না হওয়াই হিন্দু বা মুসলমানের পক্ষে অসংগত।"[২]

কবির জিজ্ঞাসা জাগে, বাংলার মুসলমানরা কি বাংলাদেশে প্রবাসী! বাংলার ভাষা ও সাহিত্য তাহাদের মনে সাড়া দেয় না! তাহারা কি হিন্দুবাঙালি, খ্রীষ্টানবাঙালি, বৌদ্ধবাঙালি হইতে এতই পৃথক যে তাহারা

১ Farewell Address to Prof. Carlo Formichi। Visva-Bharati Quarterly, vol IV. Part I. 1926 April-June।

২ সাহিত্য সম্মেলন, প্রবাসী ১৩৩৩ বৈশাখ, পৃ. ৭০-৭৩। দ্র. সাহিত্যের পথে পৃ. ১৯৩।... বহু বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ একবার সিউড়ি গিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়। সুধীরচন্দ্র কর, প্রতিবেশী রবীন্দ্রনাথ; মাসিক বসুমতী ১৩৫৭ অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন, সংখ্যা দ্রষ্টব্য। ১৯৪০ ফেব্রুয়ারি, বড়বাগানের মেলার উদ্বোধন করিবার জন্য যান।

আপনাদের 'বাঙালি' বলিতেও কুণ্ঠিত! তাহারা 'মুসলমান', অন্যেরা 'বাঙালি'— এই লৌকিক প্রয়োগ গ্রামাঞ্চলেও প্রচলিত।

কবির মনে এই প্রশ্ন হইতেই বোধ হয় 'প্রবাসী' নামে কবিতাটি লিখিত হয়। প্রবাসী পত্রিকার ২৫ বৎসর পূর্ণ হইলে রজত-জয়ন্তী সংখ্যার জন্য সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কবির নিকট হইতে আশীর্বাদ চাহিয়াছিলেন; কারণ এই পত্রিকা যখন এলাহাবাদ হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়, তখনও (১৩০৮) কবি 'প্রবাসী' নামেই একটি কবিতা লিখিয়া দেন।[১] আজ যে কবিতাটি লিখিলেন, তাহার মধ্যে দেশের সমসাময়িক মনোভাবের চিত্রই ফুটিয়াছে—

পরবাসী, চলে এসো ঘরে
অনুকূল সমীরণভরে।
বারে বারে শুভদিন
ফিরে গেল অর্থহীন,
চেয়ে আছে সবে তোমা-তরে।
ফিরে এসো ঘরে।...
কোথা যাবে সে কি জানা নেই।
যেথা আছে ঘর সেখানেই।
মন যে দিল না সাড়া,
তাই তুমি গৃহ ছাড়া,
পরবাসী বাহিরে অন্তরে।[২]

দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া— ঘনায়মান দুর্দিনকে সূচিত করিতেছে। কবি কলিকাতায় আছেন: জানিতে পারিলেন হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা অকস্মাৎ কলিকাতায় আরম্ভ হইয়াছে (১৯২৬ মার্চ)। কবি স্বচক্ষে দেখিতেছেন ভীতত্রস্ত লোক প্রাণভয়ে জোড়াসাঁকোর বাটীতে আশ্রয়ের জন্য আসিতেছে।

আকস্মিকভাবে এই দাঙ্গা কেন বাঁধিল— তাহার পটভূমি সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন। এই সময়ে পঞ্জাবে ও উত্তরপ্রদেশে আর্যসমাজীরা শুদ্ধি আন্দোলন দ্বারা অচ্ছুৎ হিন্দু, এমন-কি অল্পকাল পূর্বে যাহারা মুসলমান সমাজভুক্ত হইয়াছিল— সেই অর্ধমুসলমান-অর্ধহিন্দুদের শুদ্ধিদ্বারা 'আর্য' করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। হিন্দু-মুসলমানের প্রীতির বাঁধ এই ব্যাপারের পর হইতে ধ্বসিতে আরম্ভ করে। কলিকাতায় অ-বাঙালি আর্যসমাজীরা এই সময়ে একটি ধর্মীয় মিছিল বাহির করে এবং তাহারা মস্‌জিদের সম্মুখে আসিয়াও বাদ্যাদি বন্ধ করে নাই— ইহাই হইল দাঙ্গার প্রত্যক্ষ কারণ। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্‌ভাব রক্ষার ভরসায় সরকার হইতে শোভাযাত্রাকালে মসজিদের সম্মুখে গীতবাদ্যাদি নিষিদ্ধ ছিল। মুসলমানদের মতে ধর্মের বিশুদ্ধিতা রক্ষার পক্ষে এইটির একান্ত প্রয়োজন। ঠিক সেই কারণেই আর্যসমাজীদের পক্ষে সেই ধর্মস্থানেই বাজনা বাজানোর প্রয়োজনটাও অনিবার্য হইয়া উঠে। তৃতীয় পক্ষ ইংরেজ সরকার মুসলমানদিগকে অনুকূলে টানিবার জন্য এই আইন পাস করিয়াছিলেন। এখন হইতে মুসলমানের নূতন

১ সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া। দ্র. উৎসর্গ।

২ প্রবাসী, ১৩৩৩ বৈশাখ। পরিশেষ, পৃ. ২০০। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫। এই কবিতার সংক্ষিপ্তরূপ একটি গান "পরবাসী, চলে এসো ঘরে" (গীতবিতান পৃ. ৫৯২); গানটি ১০ পংক্তির, কবিতাটি ৫০ পংক্তি।

বুলির সূত্রপাত— Islam in danger। হিন্দু-মুসলমানদের এই দাঙ্গায়[১] উভয় ধর্মের ভক্তবৃন্দ মানুষকে মারিয়া বা জখম করিয়া ধর্মবোধের যে দৃষ্টান্ত দেখাইল, তাহাতে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত মর্মাহত হন।

শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া কবি (২৩ চৈত্র) ৬ এপ্রিল, প্রমথ চৌধুরীকে লিখিতেছেন,—"হিন্দু-মুসলমান সমস্যার কুল পাওয়া যায় না। লাঠালাঠির দ্বারা কোনো জিনিসের সমাধান হয় না। যে রীতিমত জ্ঞানশিক্ষা দ্বারা ধর্মান্ধতার আরোগ্য ঘটে তা ছাড়া উপায় নেই।"[২]

কয়েকদিন পরে মন্দিরে ভাষণদানকালে বলিয়াছিলেন,[৩] "আমরা নাকি ধর্মপ্রাণ জাতি! তাই তো আজ দেখছি ধর্মের নামে পশুত্ব দেশ জুড়ে বসেছে। বিধাতার নাম নিয়ে একে অন্যকে নির্মম আঘাতে হিংস্র পশুর মতো মারছে! এই কি হলো ধর্মের চেহারা? এই মোহমুগ্ধ ধর্মবিভীষিকার চেয়ে সোজাসুজি নাস্তিকতা অনেক ভালো। ঈশ্বরদ্রোহী পাশবিকতাকে ধর্মের নামাবলী পরালে যে কী বীভৎস হয়ে ওঠে তা চোখ খুলে একটু দেখলেই বেশ দেখা যায়। আজ মিছে-ধর্মকে পুড়িয়ে ফেলে ভারত যদি খাঁটি-ধর্ম, খাঁটি-আস্তিকতা পায়, তবে ভারত সত্যই নবজীবন লাভ করবে। নাস্তিকতার আগুনে তার সব ধর্মবিকারকে দাহ করা ছাড়া, একেবারে নূতন ক'রে আরম্ভ করা ছাড়া আর কী পথ আছে, বুঝতে তো পাচ্ছি নে।" এই সুরেই কয়েকদিন পরে লেখেন 'ধর্মমোহ'।[৪]

ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে,
অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে।
নাস্তিক সে-ও পায় বিধাতার বর,
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো—
শাস্ত্র মানে না, মানে মানুষের ভালো।· ·
ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।

চৈত্র মাসের শেষে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়াছেন প্রায় দুই মাস পরে। পূর্ববঙ্গ যাত্রা করেন ফেব্রুয়ারির গোড়া ও আশ্রমে ফিরিলেন এপ্রিলের গোড়ায় (১৩৩২)। পূর্ববঙ্গ ভ্রমণকালে গানের সুর আসিয়াছিল— অত ঘোরাঘুরির মধ্যেই কয়েকটি উৎকৃষ্ট গান রচনা করেন। কলিকাতার ধর্মোন্মত্ততা দেখিয়া মন উদ্বিগ্ন নিঃসন্দেহে; কিন্তু কোথা হইতে সুর-ফল্গু উচ্ছ্বসিত হইয়া আসিতেছে— সমস্ত বাহিরের ঘটনা কোথায় বিলীন হইয়া গেল।

১ কলিকাতার এই হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা রাজনৈতিক দিক হইতে psychological moment-এ ঘটে। এই সময়ে (১৯২৬) ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে 'স্বরাজ্য' দল দাঁড়াইতেছে— তাহারা হিন্দু-মুসলমানের মিলন-প্রয়াসী ব্রিটিশসরকারী শাসন অচল করার পক্ষপাতী। তারপর জালিনবালাবাগের স্মরণ সপ্তাহ (৬-১৩ এপ্রিল) আগত। অল্প কয়েকদিন পরে বোম্বাইতে হিন্দু-মুসলমান সর্বদলের সম্মিলিত বৈঠক। পূর্বেও দেখা গিয়াছে বিশেষ কোনো রাজনৈতিক প্রোগ্রাম গ্রহণের মুখেই হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাঁধিয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহা আকস্মিক ঘটনা নহে।

২ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৯৮ ; পৃ. ২৮১। শান্তিনিকেতন, ৬ এপ্রিল ১৯২৬।

৩ ধর্ম ও জড়তা। ৮ বৈশাখ ১৩৩৩ [২১ এপ্রিল ১৯২৬], শান্তিনিকেতন মন্দিরে ব্যাখ্যান; ক্ষিতিমোহন সেন কর্তৃক অনুলিখিত ও কবির দ্বারা সংশোধিত। প্রবাসী ১৩৩৩ আষাঢ়, পৃ. ৪৪৬-৪৭।

৪ ধর্মমোহ, ৩১ বৈশাখ ১৩৩৩ [১৪ মে, রেলপথে]; পরিশেষ পৃ. ১৯২। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫।

বর্ষশেষের ও নববর্ষের (১৩৩৩) উৎসব শান্তিনিকেতন মন্দিরে উদ্‌যাপিত হইল। নববর্ষের দিন কয়েকটি গান ও কবিতা লেখেন, যেমন—

তুমি কি এসেছ মোর দ্বারে (গীতবিতান পৃ. ৪২)
আপনারে দিয়ে রচিলি রে কি এ (গীতবিতান পৃ. ৮৪)
হে চির নূতন, আজি এ দিনের প্রথম গানে (গীতবিতান পৃ. ১১৭)
বাঁধন-ছেঁড়ার সাধন হবে (গীতবিতান পৃ. ৮৪)।

এ ছাড়া 'লীলা' নামে একটি কবিতা লেখেন; কবিতা হিসাবে ইহা সুপরিচিত নহে, কিন্তু তত্ত্বহিসাবে বিশেষভাবেই স্মরণীয়, নববর্ষের দিন ধ্যানেরও বিষয় বটে—

আঁধারের লীলা আকাশে আলোকলেখায় লেখায়,
ছন্দের লীলা অচল-কঠিন-মৃদঙ্গে।
অরূপের লীলা অগোণা রূপের রেখায় রেখায়,
স্তব্ধ অতল খেলায় তরল তরঙ্গে।
আপনারে পাওয়া আপনা-ত্যাগের গভীর লীলায়,
মূর্তির লীলা মূর্তিবিহীন কঠোর শিলায়.
শান্ত শিবের লীলা যে প্রলয়রুদ্রভঙ্গে॥
শৈলের লীলা নির্ঝরকলকলিত রোলে
শুভ্রের লীলা কত-না রঙ্গে বিরঙ্গে।
মাটির লীলা যে শস্যের বায়ু হেলিত দোলে,
আকাশের লীলা উধাও ভাষার বিহঙ্গে।
স্বর্গের খেলা মর্তের ম্লান ধুলায় হেলায়,
দুঃখের লয়ে আনন্দ খেলে দোলন-খেলায়,
শৌর্যের খেলা ভীরু মাধুরীর আসঙ্গে।

এই কবিতায় বিশ্বের সমস্ত আপাতবিরুদ্ধ বস্তু ও ভাব, সকল বিচ্ছিন্ন— ভালো ও মন্দ, সাদা ও কালো, তাপ ও স্নেহ, অঙ্গাঙ্গীভাবে ওতপ্রোত-অচ্ছেদ্যরূপে লীলায়িত। সেই মিলিত রূপের মধ্যে অশেষের ধ্যানও যেমন সত্য, খণ্ডবিশেষকে রসের মধ্যে অনুভবের সাধনাও তেমনই সত্য। কবির এ কল্পনা যেন মহাদেবের অর্ধনারীশ্বর রূপের ধ্যান।

(গানের সুরে যখন মন ভরিয়া আছে, তখন শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া দেখেন তাঁহার পঁচিশে বৈশাখ জন্মোৎসবের জন্য 'কথা ও কাহিনী'র পূজারিনী কবিতাটির মূকাভিনয়ের আয়োজন চলিতেছে। দেখিয়া-শুনিয়া কবি স্বয়ং সেটিকে নাটকে রূপায়িত করিতে বসিয়া গেলেন। ১৪ বৈশাখ এক পত্রে লিখিতেছেন, "তাগিদে পড়ে লিখতে শুরু করেছিলেম, কিন্তু এখন লেখার আভ্যন্তরীণ তাগিদে তার বাহ্য তাগিদকে অতিক্রম করেছে। তার ফল হয়েছে সময়মত নাওয়া-খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে।"[১])

১ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৯৯। ১৪ বৈশাখ ১৩৩৩ [২৭ এপ্রিল ১৯২৬], পৃ. ২৮২।

এই নাটকের নাম 'নটীর পূজা'-'পূজারিণী' কাহিনীর ক্ষীণসূত্র ধরিয়া রচিত। একটি নূতন নাটক লিখিত হইতেছে এই সংবাদ পাইয়া 'ভারতী' পত্রিকার পক্ষ হইতে কবির ভাগ্নেয়ী সরলা দেবী "একশো টাকার চেক্ ও আত্মীয়তা-খেলাপের খোঁটা দিয়ে ঐ নাটকটা দাবী" করেন। কিন্তু অর্থের অভাব মেটাবার জন্য কবি নাটকটা ভাগ্নেয়ীকে না-দিয়া মাসিক বসুমতী পত্রিকা-কর্তাদের হস্তে দিলেন; তাঁহারা বোধ হয় ৪।৫ শত টাকা দিয়া থাকিবেন; কবি লেখেন, "টাকাটা পেলে নিজের ভোগে সে-টাকার অপব্যয় হবে না। তহবিল শূন্য অথচ ভিক্ষা মেলে না বলেই আমাকে ব্যবসাদারী করতে হয়।"[১]

স্বল্পপরিসর ক্ষুদ্র "এই নাটিকার মধ্যে যে বিশ্ববাণী উদ্‌গীত, ত্যাগের যে মহিমা কীর্তিত— তাহা তুলনাহীন।) বিশেষ idea বা আদর্শের জন্য লোকে আত্মাহুতি দিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল নহে। কিন্তু অহিংসাকে ধর্ম হিসাবে গ্রহণ ও পালনের উদাহরণ দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় কয়দিন পূর্বে হিন্দু-মুসলমানের যে ধর্মোন্মত্ততা ও হিংস্রতা দেখিয়াছিলেন এবং যাহার জের এখনো সেখানে মিটে নাই— তাহার অভিঘাত-প্রেরণা এই রচনার মধ্যে আছে বলিয়া আমাদের মনে হয়— আত্মচেতন অবস্থায় না থাকিতে পারে, তবে অবচেতনে নিঃসন্দেহেই ছিল।

নাটকখানি পড়িয়া মনে হয়, ঘটনাবলীর মধ্যে একখানি পূর্ণাঙ্গ নাটকের প্রচুর উপকরণ ছিল। কিন্তু তাড়াতাড়িতে, বিশেষ দিনের মধ্যে অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত করিবার তাগিদে বিষয়টির প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিবার অবসর পান নাই। তাহার উপর কেবলমাত্র নারীভূমিকা মধ্যে নাটকের সংলাপ সীমিত রাখিতে হইবে, ইহাও ছিল ফরমাইস; তাহাতেও নাটকের অব্যাহত গতি বাধাগ্রস্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আরেকটি কথাও ভাবিবার মত: প্রাচীনভারতে বুদ্ধের সদ্‌ধর্মের আহ্বানে সাড়া দিয়াছিল সে-যুগের যুবপ্রাণ— যেমন যুগে যুগে তাহারা সকল মহৎ-আহ্বানে সাড়া দিয়া আসিয়াছে। পুরুষের এই গৃহত্যাগের জন্য নিঃসন্দেহেই দুঃখ পাইয়াছিল নারী— জননী ভগিনী স্ত্রী ও প্রেয়সী। কিন্তু যে-পুরুষ সেদিন সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া সকল সুখ বিসর্জন দিয়া দারিদ্র্যকে বরণ করিয়াছিল, তাহাদের বেদনার কথা, তাহাদের ত্যাগ-মাহাত্ম্যের কথা বলিবার মত কিছুই কি কবি পান নাই? তিনি কি কেবল নারীর দুঃখই দেখিলেন— পুরুষের না? কেবলমাত্র নারীচরিত্র দিয়া নাটক রচনার ফরমাইস তামিল করিতে গিয়া এইটি অপরিহার্য হইয়া পড়ে।[২]

('নটীর পূজা' কবির জন্মদিনে সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতনে উত্তরায়ণে কোনার্কে প্রথম অভিনীত হয়।) নন্দলাল বসুর বালিকা কন্যা গৌরী নটীর ভূমিকায় নামেন; তাঁহার নৃত্যে একটি অপরূপ অপার্থিব সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠে; শান্তি-নিকেতনের নৃত্যের ইতিহাসে এইটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। ইতিপূর্বে কলিকাতায় 'অরূপরতনে'র মূকাভিনয় কালে সাহসভরে নৃত্যের ছন্দ দেখাইবার মত প্রস্তুতি তখনো হয় নাই। গৌরীর নৃত্য দেখিবার পর কবির সন্দেহ থাকিল না যে, নৃত্যকলায় শান্তিনিকেতনের দিবার মত কিছু আছে।

শান্তিনিকেতনের এই নূতন নৃত্যচেতনা মণিপুরী নৃত্যকুশলী নবকুমার ঠাকুরের দ্বারাই উদ্বোধিত হয়। পাঠকের স্মরণে আছে কবি পূর্ববঙ্গ সফরকালে আগরতলায় গিয়াছিলেন; সেইখানে নবকুমারের মণিপুরী নৃত্য দেখিবার সুযোগ পান; তখনই কবি ইহাকে শান্তিনিকেতন কলাভবনে নৃত্যশিল্পীরূপে আনাইবার ব্যবস্থা করেন; নবকুমার 'নটীর পূজা'র নৃত্যকে নবরূপ দান করিয়াছিলেন।

১ চিঠিপত্র ৫, পত্র ১০০। ১৮ বৈশাখ ১৩৩৩ [১ মে ১৯২৬], পৃ. ২৮৩।

২ বহু বৎসর পূর্বে 'ধর্মপ্রচার' কবিতায় মুক্তিফৌজ সন্ন্যাসীর উক্তি স্মরণীয় (১৩ জুন ১৮৮৮। মানসী)।

পঁচিশে বৈশাখ (১৩৩৩) কবির ৬৫তম[১] জন্মোৎসব। সেদিন প্রাতে আম্রকুঞ্জের উৎসবক্ষেত্রে দেশবিদেশের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত হন। যথাবিধ মাঙ্গল্য অনুষ্ঠানের পর বিদেশী অতিথিরা একে একে কবিকে সংবর্ধিত করেন। প্রথমে ফরাসী কন্সাল বক্তৃতা প্রসঙ্গে য়ুরোপে ও বিশেষভাবে ফ্রান্সে কবির প্রভাব সম্বন্ধে বলেন। ইতালীয় কন্সাল কবির প্রস্তাবিত ইতালি গমন সম্ভাবনায় আনন্দ প্রকাশ করিলেন। মিঃ জেমস্ কাজিন্‌স এই সময়ে মাসেককালের জন্য আশ্রমে সস্ত্রীক আসিয়াছেন, তিনি আইরিশ জাতির পক্ষ হইতে কবির আয়ুর্বৃদ্ধি কামনা করিলেন। বিশ্বভারতীর চীনা অধ্যাপক ঙো লিম (Ngo Lim) চীন দেশের পক্ষ হইতে কবিকে উপঢৌকন দিলেন; ইনি রেঙ্গুনে চীনা স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন— কবির সহিত সেখানে পরিচিত হইবার পর বিশ্বভারতীতে আসেন। অতঃপর এন্‌ড্রুজ দক্ষিণ-ও পূর্ব-আফ্রিকার প্রবাসী-ভারতীয়দের হইয়া কবিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। কবির জন্মদিন স্মরণ করিয়া কাঠিয়াবাড়-পোরবন্দরের মহারাজা বিশ্বভারতীর ধনভাণ্ডারে কয়েক সহস্র টাকা দান পাঠাইয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ এই উৎসবে যে ভাষণ দেন, তাহার মধ্যে দেখি পঁয়ষট্টি বৎসরের বৃদ্ধের মন কী সতেজ। তিনি এক স্থানে বলিতেছেন, "মন তো বলে না, সকল প্রত্যাশার প্রান্তে এসেছি। এখন কি কেবলি পুরাতন, অভ্যাসের দ্বারা বাঁধা, সংস্কারের দ্বারা কঠিন, নিত্য ব্যবহারের দ্বারা অসাড়? এখনো জীবনে অভাবনীয় কি কিছু নেই? তা তো বলতে পারিনে। অজানার ডাকে এখনো প্রাণ সাড়া দেয়, নূতনের ভাষা এখনো বুঝতে পারি।"[২]

বাহিরের উৎসব আনন্দের মধ্যে কবির মন জন্মদিনকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে দেখিতেছে। চারি দিকের কল-কোলাহলে মন যেন বিদ্রোহী— সেদিন লিখিলেন 'দিনাবসান' কবিতাটি—

বাঁশি যখন থামবে ঘরে, নিববে দীপের শিখা,
এই জনমের লীলার 'পরে পড়বে যবনিকা,
সেদিন যেন কবির তরে ভিড় না জমে সভার ঘরে,
হয় না যেন উচ্চস্বরে শোকের সমারোহ।
সভাপতি থাকুন বাসায়, কাটান বেলা তাসে পাশায়,
নাই-বা হল নানা ভাষায় 'আহা উহু ওহো'—
নাই ঘনালো দল-বেদলের কোলাহলের মোহ।[৩]

উৎসব-উত্তেজনার মধ্যেও কর্তব্য করিতে হয়; সেদিন শান্তিনিকেতনের সংগীত-অধ্যাপক ভীমরাও হাস্থরকার শাস্ত্রীর 'রাগশ্রেণী' নামক বই-এর ভূমিকা লিখিয়া দিলেন। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে ইনিই সর্বপ্রথম মার্গসংগীতের শিক্ষকরূপে আসেন। বহুবৎসর আশ্রমের সহিত ভীমরাও যুক্ত ছিলেন।

পাঠকের স্মরণ আছে কবি কিছুকাল হইতে গান লিখিতেছেন, আগরতলায় নিরালার মাঝে গানের সুর অন্তরে নামিয়া আসে। তারপর নববর্ষ হইতে যে গানগুলি লেখেন, তাহা 'বৈকালী' নামে প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়।

১ জন্মোৎসবের বিস্তৃত বিবরণ। দ্র. প্রবাসী, ১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠ পৃ. ২৮৫-৮৮।

২ জন্মদিনে (১৩৩৩ সালের ২৫শে বৈশাখ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ। শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক অনুলিখিত এবং কবির দ্বারা সংশোধিত)— প্রবাসী ১৩৩৩ আষাঢ়, পৃ. ৪১৪-১৫। দ্র. শান্তিনিকেতন উপদেশমালা (২য় সংস্করণ) ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৪২-৪৪ (সংক্ষেপিত)।

৩ দিনাবসান; পরিশেষ (২য় সংস্করণ), পৃ. ১০৫-১০৭। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫।

মাসেক কালের মধ্যে রচিত 'বৈকালী' গানগুচ্ছ কোনো জলসায় বা উৎসবক্ষেত্রে গীত হয় নাই বলিয়া আমরা তাহার সমগ্র রূপটি পাই না। ইতালি যাত্রার পূর্বদিনে (১১ মে) বৈকালীর পাণ্ডুলিপি কবি রামানন্দবাবুর হস্তে দিয়া যান।[১] তিনি প্রবাসীতে সেগুলি পর্যায়ক্রমে প্রকাশ করেন (১৩৩৩ আষাঢ় - কার্তিক)। কবির হাতের লেখায় 'বৈকালী' য়ুরোপে মুদ্রণের চেষ্টা হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। গীতাবিতানের মধ্যে অনির্দিষ্টভাবে বিন্যস্ত থাকায় এই কাব্যখণ্ডের সমগ্ররূপটি পাই না।[২]

নটীর পূজা লেখার "ধাক্কাটা কেটে গিয়ে প্রকৃতিস্থ হবামাত্র সব প্রথমে রায়তের কথা নিয়ে" পড়বেন বলে প্রমথ চৌধুরীকে পত্র লেখেন ১৪ বৈশাখ (১৩৩৩)। দিন চারেকের মধ্যে লেখাটি শেষ করিয়া 'রেজিস্ট্রি ডাকে' পাঠালেন ১৯-এ (১ মে) সবুজ পত্রের জন্য। এই প্রবন্ধটি প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা' নামে একটি পুস্তিকা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত।

আমাদের আলোচ্যপর্ব অসহযোগ আন্দোলনে ভাঁটার টান লাগিয়াছে— স্বরাজ্যদলের কর্মীরা জেলে বা অন্তরীনে আবদ্ধ; আর যাহারা বিশুদ্ধ গান্ধীপন্থী, তাঁহারা বিশ হাজার গজ সুতা কাটিয়া কংগ্রেস সদস্যপদ রক্ষার যোগ্যতা অর্জন করিতেছেন; এবং মুসলীম লীগ দেশের মধ্যে নানাভাবে আপনার প্রতিপত্তি কায়েম করিতেছে। এই সময়ে মুসলীম লীগের চেষ্টায় প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইন পরিবর্তনের আন্দোলন শুরু হইয়াছে। বাংলাদেশের প্রজা

১ প্রবাসী ১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ৩৮৮।

২ বিশ্বভারতী হইতে 'বৈকালীর' খণ্ডিত অংশ মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবাসীতে প্রকাশিত গানের তালিকা—

আষাঢ় ১৩৩৩— ১ চপল তব নবীন আঁখি দুটি (গীতবিতান পৃ. ৩০৩), ২ নূপুর বেজে যায় (গীতবিতান পৃ. ৩১৩), ৩ *তুমি কি এসেছ মোর দ্বারে (গীতবিতান পৃ. ৪২), ৪ জানি তোমার অজানা নাহি গো (গীতবিতান পৃ. ৩০১)।

শ্রাবণ ১৩৩৩— ৫ শেষ বেলাকার শেষের গানে (গীতবিতান পৃ. ৩৩৬), ৬ পাতার ভেলা ভাসাই নীরে (গীতবিতান পৃ. ২২৬), ৭ তপস্বিনী হে ধরণী (গীতবিতান পৃ. ৪৩৬), ৮ বিরস দিন বিরল কাজ (গীতবিতান পৃ. ২৮১), ৯ বিনা সাজে সাজি (গীতবিতান পৃ. ৩৯৮), ১০ আমার লতার প্রথম মুকুল (গীতবিতান পৃ. ৩২১), ১১ আমার প্রাণের গভীর গোপন (গীতবিতান পৃ. ১৪১), ১২ কী ফুল ঝরিল বিপুল অন্ধকারে (গীতবিতান পৃ. ৩৮২), ১৩ এ পথে আমি যে গেছি বারবার (গীতবিতান পৃ. ৩৮১)।

ভাদ্র ১৩৩৩— ১৪ অনেক কথা যাও যে বলে (গীতবিতান পৃ. ৩২৯), ১৫ লিখন তোমার ধুলায় (গীতবিতান পৃ. ৩৮২), ১৬ দে পড়ে দে আমায় তোরা (গীতবিতান পৃ.৩০০), ১৭ কাঁদার সময় অল্প ওরে (গীতবিতান পৃ. ৩৩০), ১৮ এবার এলো সময় রে তোর (গীতবিতান পৃ. ৫০৪), ১৯ কেন রে এতই যাবার ত্বরা (গীতবিতান পৃ. ৩৩৭), ২০ আধেক ঘুমে নয়ন চুমে (গীতবিতান পৃ. ৫৮৪)।

আশ্বিন ১৩৩৩— ২১ দিন পরে যায় দিন (গীতবিতান পৃ. ৩৮০), ২২ বনে যদি ফুটল কুসুম (গীতবিতান পৃ. ৩৭৪), ২৩ এসো আমার ঘরে (গীতবিতান পৃ. ২৯৭), ২৪ *নিশীথে কী কয়ে গেল মনে (গীতবিতান পৃ. ৩২০), ২৫ *হার মানালে, ভাঙিলে গো অভিমান (গীতবিতান পৃ. ২২৪)।

কার্তিক ১৩৩৩— ২৬ *বাঁধন ছেঁড়ার সাধন হবে (গীতবিতান পৃ. ৮৪), ২৭ *পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে (গীতবিতান পৃ. ৫৩), ২৮ আপনারে দিয়ে রচিলি রে কি এ (গীতবিতান পৃ. ৮৪), ২৯ *হে মহাজীবন, হে মহামরণ (গীতবিতান পৃ. ৫৩), ৩০ মরণসাগরপারে তোমরা অমর (গীতবিতান পৃ. ২৪০)। * চিহ্নিত ৬টি গান নটীর পূজায় আছে। নটীর পূজার অন্য গানগুলি এই সময়ে রচিত মনে হয়— পূর্বগগনভাগে দীপ্ত হইল সুপ্রভাত (গীতবিতান পৃ. ১১৪), বাঁধন কেন ভূষণবেশে তোরে ভোলায় (গীতবিতান পৃ. ৭১৫), আর রেখো না আঁধারে আমারে (গীতবিতান পৃ. ৮৭), হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি (গীতবিতান পৃ. ১৬৭), আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো (গীতবিতান পৃ. ৫৪৩)।

প্রবাসীতে প্রকাশিত ৩০টি গান ও নটীর পূজার ৫টি গান এই মোট ৩৫টি গান ছাড়াও নববর্ষের দিনে রচিত কয়েকটি গান আছে। এবং তাবও পূর্বে পূর্ববঙ্গ সফরকালে গান লেখেন।

বা রায়তদের অধিকাংশই মুসলমান ও হরিজন। বাংলার 'রায়তের কথা' লইয়া প্রায় সকল পত্রিকাই আলোচনায় রত। প্রমথ চৌধুরীও এই বিষয়ে পুস্তিকা লেখেন।

রবীন্দ্রনাথ এই পুস্তিকা সম্বন্ধে তাঁহার মত এক পত্র-প্রবন্ধে ব্যক্ত করেন। আমাদের রাজনীতির মধ্যে যে অনুকরণপ্রিয়তা আসিয়াছে, তাহার কথা উল্লেখ করিয়া কবি বলেন যে আমাদের নকল-নিপুণ মন ফ্যাসিজম বলশেভিজম প্রভৃতি মতবাদ দেশের সমাজদেহে আমদানি করিবার জন্য আন্দোলনে প্রবৃত্ত। তিনি লিখিতেছেন, "আজ যখন শুনে এলুম সাহিত্যে ইশারা চলছে— মহাজনকে লাগাও বাড়ি, জমিদারকে ফেলো পিষে, তখন বুঝতে পারলুম, এই লালমুখো বুলির উৎপত্তি এদের নিজের রক্ত থেকে নয়; এ হচ্ছে বাঙালির অসাধারণ নকল-নৈপুণ্যের নাট্য, ম্যাজেণ্টা রঙে ছোবানো। এর আছে উপরে হাত-পা ছোঁড়া, ভিতরে চিত্তহীনতা।"

এককালে ব্যক্তিগত বুদ্ধি শক্তি মিতব্যয়িতা প্রভৃতি নানাগুণের বলে মানুষ ধনসম্পদ সৃষ্টি করিয়াছিল। আজ সংঘশক্তি পশুবলে তাহাকে বঞ্চিত করিতে উদ্যত। তাই রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, "যারা সেই অধিকার কাড়তে চায় তাদের যে বুদ্ধি, যারা সেই অধিকার রাখতে চায় তাদেরও সেই বুদ্ধি, অর্থাৎ কোনোটাই ধর্মবুদ্ধি নয়, ওকে বিষয়বুদ্ধি বলা যেতে পারে।" কবির আসল কথা— রায়ত বা মানুষের মনে যদি পরিবর্তন আনা না যায়, তবে কেবলমাত্র বাহিরের সাজসজ্জার (form) অদলবদলে কোনো স্থায়ী ফল ফলিবে না। তিনি লিখিতেছেন, "আমার জন্মগত পেশা জমিদারি, কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আশমানদারি। এই কারণেই জমিদারির জমি আঁকড়ে থাকতে আমার অন্তরের প্রবৃত্তি নেই। আমি জানি জমিদার জমির জোঁক, সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব।" কিন্তু কবির প্রশ্ন, জমি কাকে ছেড়ে দেবেন? "প্রজাকে ছেড়ে দেব? তখন দেখতে দেখতে এক বড়ো জমিদারের জায়গায় দশটা ছোটো জমিদার গজিয়ে উঠবে।" রায়ত আত্মরক্ষা করতে জানে না। "এই রায়ত-খাদক রায়তের ক্ষুধা যে কত সর্বনেশে" তার পরিচয় কবির জানা ছিল। এই ক্ষুদ্র রায়ত বা জোতদারদের মত ভীষণ জীব সমাজে আর নাই। তাহা হইলে প্রশ্ন থাকিয়া গেল রায়তের অর্থ প্রয়োজন হইলে সে তো জমি বিক্রয় করিবেই, সেই হস্তান্তর করিবার ব্যবস্থা আছে বলিয়া সে আবার ঋণ পায়; এবং ঋণ করে বলিয়া সে সর্বস্বান্ত হয়। সুতরাং সমাজের বা গ্রাম্য অবস্থার আমূল পরিবর্তন ব্যতীত কেবলমাত্র প্রজাস্বত্ব আইনের দ্বারা কিছু সম্ভব নহে। "যে-মানুষ নিজেকে বাঁচাতে জানে না, কোনো আইন তাকে বাঁচাতে পারে না। নিজেকে এই-যে বাঁচাবার শক্তি, তা জীবনযাত্রার সমগ্রতার মধ্যে— কোনো একটা খাপছাড়া প্রণালীতে নয়।· · পল্লীর মধ্যে সমগ্রভাবে প্রাণ সঞ্চার হলে তবেই সে প্রাণের সম্পূর্ণতা নিজেকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করবার শক্তি নিজের ভিতর থেকেই উদ্ভাবন করতে পারবে।"[১]

১ রায়তের কথা (পুস্তিকা), প্রমথ চৌধুরী। দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র-প্রবন্ধ সবুজ পত্র ১৩৩৩ আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

এই প্রসঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনপর্বে জমিদারি সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত এক পত্রে লেখেন— "যাঁরা বাংলাদেশের জমিদার তাঁরা যতক্ষণ সদর খাজনা জুগিয়ে নিজের জীবিকা ও আরামের সংস্থান করতে চান ততক্ষণ অন্যলোককে ত্যাগ স্বীকার করতে বলতেই পারেন না। আমি আমার এক চিঠিতে বড় দাদাকে এই কথাটা স্মরণ করিয়েছিলেম। বাংলাদেশে জমিদারের চেয়ে গবর্মেণ্টের বড় কর্মচারী আর কে আছে।"— চিঠিপত্র ৫, পত্র ৮৭। ১৮ কার্তিক ১৩২৮।

ইতালি ১৯২৬

শান্তিনিকেতনে জন্মোৎসবের (৮ মে) কয়েকদিন পরে (১২ মে) কবি বোম্বাই হইয়া ইতালি চলিলেন। সঙ্গে এবার বহু লোক— রথীন্দ্রনাথ প্রতিমা দেবী ও তাঁহার তিন বৎসরের পালিতা কন্যা, শ্রীনিকেতনের সচিব প্রেমচাঁদ লাল, শান্তিনিকেতনের শিক্ষক গৌরগোপাল ঘোষ। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ও তাঁহার স্ত্রী নির্মলকুমারীর কবির সঙ্গে যাইবার কথা ছিল ; এই স্টীমারে স্থান না-হওয়ায়, তাঁহারা পরবর্তী স্টীমারযোগে ইতালি পৌঁছিয়া রোমে কবির সহিত মিলিত হন। ইঁহারা দুইজন এবার কবির য়ুরোপভ্রমণের নিত্যসঙ্গী ছিলেন। প্রশান্তচন্দ্র আকৈশোর রবীন্দ্রভক্ত ; বিশ্বভারতীর আরম্ভ হইতে ইনি ইহার সহিত যুক্ত। শুধু যুক্ত বলিলে যথেষ্ট বলা হয় না— বিশ্বভারতীর ব্যবহারিক ও সাংবিধানিক মূর্তি দানে তাঁহার দান চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ১৯২২ সালের ১৪ মে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানরূপে গঠিত হয়। সেই সময় হইতে ১৯২৬এর ১৪ মে পর্যন্ত রথীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র ইহার যুগ্ম-কর্মসচিব ছিলেন। কবির সহিত উভয় সচিব য়ুরোপযাত্রা করিলে কর্মসচিবের কাজ বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক ডক্টর দেবেন্দ্রমোহন বসুর উপর গিয়া বর্তায়।[১]

রবীন্দ্রনাথ ফাসিস্ত ইতালিসরকারের অতিথিরূপে, না য়ুরোপীয় বন্ধুদের আমন্ত্রণে যাইতেছেন— এই কথাটা অত্যন্ত অস্পষ্ট ও ঘোলাটে ঠেকিল। আমন্ত্রণটা পাঠান বন্ধুভাবে অধ্যাপক ফর্মিকি।[২] কিন্তু আসলে কবিকে ইতালিতে লইয়া যাইবার ব্যবস্থাটা করেন মুসোলিনী তথা ইতালীর ফ্যাসিস্ত সরকার। সুতরাং কথাটা আংশিকভাবে সত্য যে কবি মুসোলিনীর নিমন্ত্রণেই যাইতেছেন।

দক্ষিণ-আমেরিকা হইতে ফিরিবার পথে কবি দিন-পনেরো ইতালিতে ছিলেন। তাঁহার কথাবার্তা ও বক্তৃতাদি শুনিয়া কট্টর ফাসিস্তরা আদৌ খুশি হইতে পারে নাই। মুসোলিনী সাংবাদিকদের এসব আলোচনা অধিক দূর অগ্রসর হইতে না দিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার ব্যক্তিগত প্রীতির পরিচয়স্বরূপ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের জন্য বহু অতিমূল্যবান ইতালীয় পুস্তক উপঢৌকন পাঠাইয়াছিলেন এবং অধ্যাপক তুচ্চিকে বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য এইসব ঘটনা রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথকে ইতালি যাইতে দেখিয়া এদেশের ও বিদেশের চিন্তাশীল ও কবি-অনুরাগী ব্যক্তি মাত্রই বিস্মিত

১ ১৯২২ মে - ১৯২৬ মে— প্রশান্তচন্দ্র ও রথীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর কর্মসচিব।
১৯২৬ মে - ১৯২৭ জুলাই—দেবেন্দ্রমোহন বসু বিশ্বভারতীর কর্মসচিব।
১৯২৭ - ১৯৩১ অক্টোবর— প্রশান্তচন্দ্র বিশ্বভারতীর কর্মসচিব।
১৯৩১ - ১৯৫১ মে ১৪— রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতীর কর্মসচিব।
শ্রীনিকেতন-সচিব প্রেমচাঁদ লাল য়ুরোপ গেলে (১৯২৬ মে), সন্তোষচন্দ্র মজুমদার সচিব হন (১৯২৬ অক্টোবর মৃত্যু পর্যন্ত)।
১৯২৭ - ১৯৩১ রথীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতন-সচিব।
১৯৩১ - ১৯৪০ গৌরগোপাল ঘোষ।

২ কার্লো ফর্মিকি (Carlo Formichi) জন্ম ১৮৭১ ফেব্রুয়ারি - মৃত্যু ১৯৪৩ ডিসেম্বর ২৩। বোলগ্না, পিসা ও রোমের সংস্কৃতভাষার অধ্যাপক। ইতালীয় ভাষায় অশ্বঘোষের 'বুদ্ধ চরিত'-এর অনুবাদক। ১৯২৫ সালে বিশ্বভারতীর তৃতীয় ভিজিটিং-প্রোফেসাররূপে শান্তিনিকেতনে আসেন। ১৯৩৩-এ পুনর্বার ভারতে ও ১৯৩৯-এ জাপানে যান।

হইয়াছিলেন। উত্তরপ্রদেশের Pioneer পত্রিকার জনৈক লেখক অতি সুনিপুণভাবে এই দুই বিপরীত প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ পুরুষের সাক্ষাৎকারের পর একটি বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন।[১]

ফর্মিকি যখন বিশ্বভারতীর অধ্যাপক তখন তিনি কবির কাছে ইতালি-ভ্রমণের প্রস্তাব করিলে তিনি সম্মত হন। ফর্মিকি কবির এই সংকল্পের কথা রোমে জানাইলে Sig. Mussolini at once replied extending the hospitality of the Italian Government to him [Tagore] and his retinue.[২] রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গীদের জন্য ইতালীয় জাহাজ Aquileja-য় ছয়টি দ্য-লুক্স ক্যাবিনের ব্যবস্থা হইল। বোম্বাইতে জাহাজে উঠিয়া তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারিলেন যে সত্যই তাঁহারা ইতালীয় সরকারের অতিথিরূপে চলিয়াছেন; কারণ জাহাজের অধস্তন ভৃত্য হইতে কাপ্তেন পর্যন্ত সকলেই ইঁহাদিগকে যেরূপ সমাদর করিতে লাগিলেন, তাহা কখনো সাধারণ যাত্রীর প্রাপ্য নহে।

ইতালি যাত্রার আয়োজন দেখিয়া অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিল যে, কী করিয়া মুসোলিনীর উগ্রজাতীয়তাবাদ ও একনায়কত্ববাদের সহিত রবীন্দ্রনাথের বিশ্বশান্তিবাদের মিলন সম্ভব! যদিও রবীন্দ্রনাথ ও মুসোলিনী ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি-অধিকার ব্যক্তিত্ববিকাশেরই সহায়ক মনে করেন, তথায় রবীন্দ্রনাথ কখনই মুসোলিনীর উগ্রপন্থাকে সমর্থন করিতে পারেন না।[৩]

আমাদের আলোচ্য পর্বে ইতালিতে ফাসিস্তদের উপদ্রবে রাজনীতিক্ষেত্রে লোকেরা সন্ত্রস্ত। কবি যখন প্রথমবার মিলানে যান, ডিউক স্কোটি তাঁহাকে সে-বিষয়ে অতিস্পষ্ট আভাসই দিয়া বলেন যে তাঁহার মুখ বন্ধ।

কিন্তু যাহারা মুখর হইবার চেষ্টামাত্র করিয়াছিল তাহাদের মূক করিবার জন্য মুসোলিনীর ঘাতকদল সর্বপ্রকার পন্থা অবলম্বন করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। প্রায় দুই বৎসর পূর্বে ইতালির ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও সংযুক্ত সমাজতন্ত্রীদলের সেক্রেটারি মাত্তিওত্তি (Giacomo Mattootti, 1885)-কে মুসোলিনীনিযুক্ত গুপ্তঘাতকদল হত্যা করে (১০ জুন ১৯২৪)। এই ঘটনায় নিখিল য়ুরোপের সমাজতন্ত্রী ও উদারনীতিক দলের লোকে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া

১ The meeting between the great Bengali poet and the Italian Duce at Rome is a piquant incident in the international life today. Not so many years ago Dr. Rabindranath Tagore condemned Mr. Gandhi's policy of non-cooperation as 'making of India a prison'. Togore's poems and teachings breathe the very spirit of freedom and it is difficult to realise how the Indian and Italian could find common ground, except perhaps in their individual greatness of vision. Mussolini's greatness has yet to receive the final verdict of history. He depends for immortality on the ultimate success of his vehement assertion of the right of a strong man to rule without consideration of ethical precepts. Tagore has already been assured of immortality by reason of his sublimation of ethics above all material facts, although he is not blind to the reality of those facts and their possible power of conquest. It is not beyond the imagination to see in the interchange of views between the two men a portent which might have significance for Italy and the world. The dreamer is often the tyrant in embryo. The poet in Tagore may see much that is admirable in the wonderful work which Mussolini has done for his country. The colour of it will fill his artist's eye. The dogmatism will appeal to him as a teacher. But he will not fail to see the danger ahead. How can the present rule dependent on the personality of one man be eventually consolidated with violent reaction into a real freedom? For, to use Tagore's words, Italy must in some respects be a prison. The transcendent vision of the poet-philosopher may find for Mussolini the bridge which will carry him back safely and his country to the literary world which the great Dictator still desires, but fear to regain." (8 June 1926)।

২ দ্র. Manchester Guardian, 1926 August 14: Formichi Letter in reply to Tagore's Letter।

৩ Amrita Bazar Patrika, 30 May 1926: Tagore as the Guest of Mussolini by G. C. Shah।

উঠে ; কারণ তখন পর্যন্ত শাসন পরিচালনা ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্টির বিরুদ্ধবাদীদের হত্যা করাটা রাজনীতিক্ষেত্রে লোকের গা-সওয়া হইয়া যায় নাই ; পার্লামেণ্টারি প্রথায় শাসনব্যবস্থা অচল ও ডিক্টেটরশীপই শাসনসংস্থা পরিচালনার আদর্শপ্রথা— এই সকল কথা তেমন চালু হয় নাই। যাহাই হউক এইসব কারণে সভ্যজগতে মুসোলিনীর একটা বদ্‌নাম রটিয়া যায়। আমাদের বোধ হয়, তাঁহার সেই বিনষ্ট গৌরব উদ্ধারকল্পে জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের প্রশংসাপত্র সাময়িকভাবে সংগ্রহ করিয়া শিক্ষিতসমাজের সমক্ষে পেশ করিবার উদ্দেশ্যেই রবীন্দ্রনাথকে এই জালে টানার ব্যবস্থা হয়।

জাহাজ মিশরের সৈয়দ বন্দরে (Port-Said) পৌঁছিলে, সেখানে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন শ্রীমতী ফ্লাউম (Shulamith Flaum)। এই ইহুদী বিদুষী শান্তিনিকেতনে কিছুকাল ছিলেন (১৯২৪-২৫) ; এখন তিনি ফিলিস্তানের তেল-অল-আবাবে (ইসরায়েল) জিওনিস্টদের ইহুদীরাজ্য গড়ার কাজে নিযুক্ত। মিস্ ফ্লাউমের একান্ত ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথ ইহুদীদের নূতন দেশ দেখিয়া যান ; হীব্রু বিশ্ববিদ্যালয় ও গালিলীতীরের নূতন কৃষি-সংঘ দেখিবার সাধও কবির বহু দিনের। ইহুদীরা পূর্ব ও পশ্চিমের সেতুস্বরূপ ; জিওন আন্দোলনের ভাবাত্মক দিকের প্রতি কবির বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু ইতালীয় জাহাজ হইতে নামিয়া ফিলিস্তানে যাওয়া সম্ভব হইল না।

৩০ মে একুলিয়া জাহাজ নেপলসে পৌঁছিলে দেখা গেল রোম হইতে অধ্যাপক ফর্মিকি ও স্থানীয় রাজকর্মচারীরা মুসোলিনীর আমন্ত্রণ লইয়া কবিকে স্বাগত করিবার জন্য উপস্থিত। সেই দিনই স্পেশাল ট্রেনযোগে কবিকে রোমে লইয়া যাওয়া হইল। নেপলসে কবির সহিত দেখা করিবার জন্য এল্মহার্স্ট ও আঁদ্রে কার্পেলেস আসিয়াছিলেন।

রোমের গ্রাণ্ড হোটেলে গবর্মেণ্টের ব্যয়ে কবির থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। পরদিন (৩১ মে) মুসোলিনীর সহিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ— প্রকৃতিগত সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই ব্যক্তির মোলাকাত।[১] মুসোলিনী কবিকে বলেন যে, যাঁহারা কবির প্রত্যেকখানি গ্রন্থ ইতালীয় ভাষায় পড়িয়াছেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। কবি তাঁহাকে ইতালির বদান্যতা ও অধ্যাপক তুচ্চিকে বিশ্বভারতীতে প্রেরণের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। অধ্যাপক ফর্মিকি কবির দোভাষীর কার্য করিবার জন্য আছেন।

ইতালির সাময়িক পত্রিকাসমূহে রবীন্দ্রনাথের আগমনবার্তা বড় বড় হেডলাইনে মুদ্রিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ। ফাসিস্তদের মুখপত্র ত্রিবুনা (Tribuna, 2 June)-র প্রতিনিধিকে কবি বলেন, "রোমে আমার আগমন স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতেছে। আমি এখনো বিশ্বাস করিতে পারি না যে, যে-দেশকে শেলি, কীট্স, বাইরন, ব্রাউনিং ও গ্যেটের কাব্যের মধ্য দিয়া দেখা— সেই দেশে আসিয়াছি।" কিভাবে যে কবি এই কথাগুলি বলিলেন তাহার হেঁয়ালি স্পষ্ট হইল না। মুসোলিনী সম্বন্ধে কবি বলিলেন, His Excellency Mussolini seems modelled body and soul by the chisel of a Michael Angelo, whose very action showed intelligence and force. I see a great future for your country, a future as great as her past after she rises glorious and beneficent to herself and also to others from the courage that shook the whole world"। কবিকে কিছু লিখিয়া দিতে বলা হইলে তিনি লিখিয়া দিলেন, "Let me dream that from the fire bath the immortal soul of Italy will come out clothed in quenchless light"[১]।

মুসোলিনীর সহিত কথাবার্তা কহিয়া ও রোমের নানা স্থান পরিদর্শন করিয়া ফাসিস্তদের যে রূপটি কবির নিকট উদ্‌ঘাটিত হইল, আপাতদৃষ্টিতে— তাঁহাকে যাহা দেখানো হইতেছে ও ফর্মিকি যাহা তাঁহাকে বুঝাইতেছেন— তাহার

১ Visva-Bharati Quarterly 1926 October. p. 280-281।

মধ্যে নিন্দনীয় কিছু পাইলেন না। দুর্বল রাষ্ট্রের পক্ষে জবরদস্ত একনায়ক-শাসন যে কতখানি প্রয়োজন, তাহা বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ অনুভব করিতেছিলেন ; কবির নিজের মধ্যেই দ্বন্দ্ব আছে— benevolent (?) autocracy ও পার্টি-পরিচালিত democracy (?)-র মধ্যে কর্মক্ষেত্রে কোন্‌টি আশুফলপ্রদ। যাহা হউক. মোটের উপর সমস্তটা বেশ efficient বা কার্যকুশলই মনে হইতেছে। কিন্তু ফাসিস্তবাদ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, "It is for me to study and not criticise from outside. I am glad of the opportunity to see for myself the work of one, who is assuredly a great man and a movement that will certainly be remembered in history."[১]

রবীন্দ্রনাথের এই সামান্য প্রশংসাবাণী পৃথিবীর সর্বত্র তারে বেতারে বিতরিত হইল— মুসোলিনী ইহাই চাহিয়াছিলেন। বাহিরের লোকে অবাক হইয়া ভাবে এই কয়দিনে কবি ইতালির আভ্যন্তরীণ অবস্থার কী জানিতে পারিয়াছেন— যাহা দ্বারা তাঁহার পক্ষে ইতালির বর্তমান শাসনপ্রণালী ও শাসক সম্বন্ধে এই প্রশস্তি করা সম্ভব হইল। সুখের বিষয়, ইতালিতে আসিয়া তিনি যত শীঘ্র প্রশংসাবাণী উচ্চারিলেন, ইতালি পরিত্যাগের পর তত দ্রুতই মত পরিবর্তন করেন। এ কথা ভুলিলে চলিবে না রবীন্দ্রনাথ কবি, স্পর্শচেতন মন মুগ্ধ হইতেও যতক্ষণ, বিমুখ হইতেও ততক্ষণ। রবীন্দ্রনাথ যদি পাকা রাজনীতিক হইতেন, তবে মুসোলিনীর মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পাশবদ্ধ হইতেন না ; কয়েক বৎসর পরে মুসোলিনী জবহরলাল নেহরুকে নানাভাবে আকর্ষণের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন।

রোমে এক সপ্তাহ কাটিল নানা শ্রেণীর লোকের সহিত মোলাকাতে ; অবশ্য সরকারের মনোনীত ব্যক্তি ও সাংবাদিকরা থাকিতেন— এবং কথাবার্তা ফর্মিকির মাধ্যমেই হইত। অধিকাংশ ইতালীয় পত্রিকা রবীন্দ্রপ্রশস্তিতে পঞ্চমুখ। কিন্তু দুই-একজন লেখক রবীন্দ্রনাথের পূর্ব-পশ্চিম মিলনস্বপ্ন সম্বন্ধে সন্দিহান। Alessandro Chippelli নামে ইতিহাসের এক বৃদ্ধ অধ্যাপক ও বর্তমানে সিনেটর স্পষ্ট করিয়া রবীন্দ্রদর্শনের প্রতিবাদ করিয়া লিখিলেন, 'We donot belong to the civilization of pantheism, but to that of Christian creationism, which does not accept philosophy of a God-nest, in Tagore's own phrase, but what boasts of a God-eagle using a strong Biblical expression, which carries on its wings the children of the people ; a living God, creator of creatures, who in their turn are creators of valorous will and life'[২]

আর-একজন লিখিলেন, 'To appreciate our nature, it is necessary to come into contact with our world and our life. The civilization of Europe is essentially dynamic, while the civilization of India is essentially static and Tagore's idea of meeting of the two [East and West] is absolutely Utopian'[৩]

রোমে উপনীত হইবার এক সপ্তাহ পরে রোমের গভর্নর ক্যাপিটোলে[৪] নগরীর বিশিষ্ট ভদ্রদের আহ্বান করিয়া

১ Daily News, London, 1926 June 11.

২ Il Messagero, 1926 June 9.

৩ La Voce Republicana, 1926 June 4.

৪ Capitol (L. Capitolium), the great national temple of ancient Rome, situated on the *mons capitolimus*....The modern capitol (campidoglio) built on the site and part of the ancient capitol, was designed by Michelangelo.

রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধিত করিলেন। সেইদিন ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের বাটিতে চা-মজলিশে কবির আপ্যায়ন হইল। পরদিন (৮ জুন) Unione Intellectuale Italiana নামে সমিতির উদ্যোগে আহূত জনসভায়— কুইরিনল থিয়েটরে— রবীন্দ্রনাথ 'দি মিনিং অব আর্ট' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। এই সভায় মুসোলিনী ও শাসন পরিষদের প্রবীণ ও নবীন বহু সদস্য ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন; বহু লোক স্থানাভাবের জন্য ফিরিয়া যায়।[১]

এইদিন প্রাতে Orti di pace (শান্তিকানন) নামে ছোট ছেলেমেয়েদের একটি স্কুল দেখিতে গিয়াছিলেন; শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের বেশ মিল। ছাত্রদের বাগান-করা ও সংগীতচর্চায় উৎসাহ দেখিয়া কবির নিজ আশ্রমের কথাই মনে পড়িতেছে। কবির আগমনকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থায় উদ্যানে একটি জলপাই (olive) চারা তাঁহাকে রোপন করিতে হইল।[২]

পরদিন (১০ জুন) প্রাচীন রোমের বিরাট মুক্ত রঙ্গালয় কলোসিয়ামে শিশুদের সমবেত-সংগীতের বাৎসরিক উৎসব (Annual Choral Concert of School Children) পরিদর্শনের জন্য রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত হইয়া যান। কলোসিয়ামের[৩] গ্যালারিতে প্রায় ২৫-৩০ হাজার লোক। কবি তথায় প্রবেশ করিলে সেই বিপুল জনতা হর্ষধ্বনি করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। সহস্রাধিক বালক-বালিকার মুক্তকণ্ঠ সংগীতে আকাশ মুখরিত হইয়া উঠিল।

সেইদিন সন্ধ্যায় রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি-সম্বর্ধনা।[৪] বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর Prof. Del Vechio স্বাগত করিয়া যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে— You are no stranger to Rome, for Rome is the seat of the Universal spirit, and she considers nothing which is human, strange to her. Your great humanistic poetry, which is at the same time humanistic philosophy, has found a profound echo in our hearts. You have affirmed in mystic and sublime words this eternal truth that above the material life, above the desire of wealth, of pleasure, and of power, there exists the Kingdom of spirit, of goodness, of love... Your message however terminates in no vein of asceticism; it is essentially the poetry and philosophy of action—action which gathers strength from wisdom, from justice, from the harmony of love. This is, if I understand right, is your supreme idea, which is also ours.

১ Il Resto del Carlino, 1926 June 10: Visva-Bharati Quarterly, 1926 October, p. 286.

২ Visva-Bharati Quarterly, 1926 October, p. 289.

৩ Colosseum—amphitheatre in Rome, a stone structure, begun by Emperor Vespasian (AD 72) and completed by Titus (AD 80). The arena and its surrounding structure form an ellipse about 600 ft. long and 500 ft. broad. The colosseum was used for gladiatorial and wild beast fights; and here many christians met their death.

৪ The crowd was so great near the front entrance that the Poet and the ladies had to be taken by a backdoor. There was a tremendous ovation when the Poet stood up on the platform and throughout his speech there was constant bursts of applause and cheers. But the climax of the demonstration was reached when at the request of a student the Poet put on the academic cap of the University. The long galleries outside the Hall were filled with students, and a huge crowd was standing in the immense courtyard below to catch a glimpse of the Poet as he passed....From Prof. P. C.Mahalnobis' Notes. See Visva-Bharati Quarterly, Tagore Brithday Number 1941, p. 278.

কয়েকদিন পূর্বে অধ্যাপক Chippelli ও অন্য এক সাংবাদিক কবির দর্শনকে যে-ভাবে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিয়েছিলেন, আজ রেক্টর Del Vechio কবির দর্শন ও ইতালির আদর্শ একই বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

এই সভায় অধ্যাপক ফর্মিকি কবির আদর্শের প্রশংসা করিয়া কবিকে King of Poets আখ্যা দান করিলেন। তিনি বলেন যে বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথকে যুবকরা কী শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে তাহা তিনি ঢাকায় স্বয়ং দেখিয়াছিলেন। Vera Certa নামে এক মহিলাছাত্রী রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতে গবেষণা করিয়া ডক্টরেট পাইয়াছেন, তিনি রোমের ছাত্রদের পক্ষ হইতে কবিকে পুষ্প-অর্ঘ্য দিয়া একটি সংস্কৃত শ্লোক বলিলেন—

ভদন্ত তানি পুষ্পানি অস্মাকম্ স্নেহম্ মানম্ চ।
পুষ্পানি এতানি তু ম্লানম গামিষ্যন্তি ন তু অস্মৎ স্নেহম্ মানম্ চ॥

রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, তাহারা তাঁহার চিরদিনই প্রিয়, তা তাহারা যে দেশেরই হউক; "Students everywhere belong to a country of their own, which has no distinction of nationality or race, a band of human hope, a band of young minds seeking life and light; and in this band guidance and leadership belong to the Poet!" রবীন্দ্রনাথের ভাষণ ছাত্রদের খুবই ভালো লাগে, তাহারা উচ্ছ্বসিত আবেগে আনন্দ প্রকাশ করে।

ইতালির রাজা তৃতীয় ভিক্টর ইমানুয়েলের[১] সহিত কবি একদিন সাক্ষাৎ করিতে যান (১১ জুন)। এই সাক্ষাৎকারের সময়ে অপর কেহ উপস্থিত ছিলেন না; রাজা বেশ ভালো ইংরেজি জানেন সুতরাং সংলাপ সহজভাবেই চলে। রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি রোমের সকল দর্শনীয় স্থান দেখিয়াছেন কি না। কবি তাঁহাকে বলেন "I was enjoying everything but not in a perfectly natural way; there were always too many people near me. I often wish I could go back to my former obscurity"। এই কথা শুনিয়া রাজা হাসিয়া বলিলেন, "That will never happen, you will never get an opportunity of enjoying things in your own way!" এ কি রাজার নিজ অভিজ্ঞতার দীর্ঘনিঃশ্বাস! এখন রাষ্ট্রপরিচালনার সকল ক্ষমতা মুসোলিনীর করতলগত— রাজা তো শোভামাত্র!

১৩ই সন্ধ্যায় আর্জেন্টিনা থিয়েটরে ইতালীয়ান ভাষায় ডাকঘর অভিনয় হয়, কবি উপস্থিত ছিলেন।

রোম হইতে বিদায় লইবার পূর্বে কবির সহিত মুসোলিনীর শেষবারের মত সাক্ষাৎ হইল (১৩ জুন)। এইবার কথাবার্তা আরও আন্তরিকভাবে হয়। কবি ইতালির সর্বময় কর্তাকে বলিলেন, "Material wealth and power cannot make a country immortal, she must contribute something which is great and which is for everybody, and which does not merely glorify her own self"। এ কথার কোনো জবাব মুসোলিনী দেন নাই, কারণ তিনি জানেন আদর্শবাদীরা এই ধরণের কথাই বলিয়া থাকে!

কবি সর্বশেষে মুসোলিনীকে বলেন যে তিনি দার্শনিক ক্রোচের[২] সহিত দেখা করিতে চান। ফর্মিকি সেখানে ছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'অসম্ভব, অসম্ভব'। মুসোলিনী বলিলেন— ক্রোচে তো রোমে নাই। কবি বলিলেন,

১ Victor Emanuel (1869-1947); রাজা ১৯০০-৪৬। ঐ বৎসর সিংহাসন ত্যাগ করেন।

২ Benedetto Croce (1866-1952): Italian philosopher, statesman, literary critic and historian. ইঁহার সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্বন্ধে বাংলায় কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সহিত ইঁহার কতকগুলি বিষয়ে মিল পাওয়া যায়। এ বিষয়ে একটি সুন্দর ও ব্যাপক আলোচনার ক্ষেত্র আছে।

"রোমে না হইতে পারে, ইতালিতে আছেন তো।" এই সংলাপের সময়ে সেখানে একজন তরুণ কাপ্তেন ছিলেন— তিনি ক্রোচের প্রাক্তন ছাত্র— অন্তরে তিনি ফাসিস্তবিরোধী। তিনি সেই রাত্রেই নেপ্‌লসে চলিয়া যান ও পরদিন প্রাতে ক্রোচেকে সঙ্গে করিয়া কবির হোটেলে উপস্থিত হন। ফর্মিকি ক্রোচেকে কবির সহিত কথাবার্তা বলিতে দেখিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন— কারণ ক্রোচে মুসোলিনীর সুনজরে ছিলেন না, এবং নেপ্‌লসে তিনি প্রায় গৃহ-বন্দীরূপেই বাস করিতেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ক্রোচের দার্শনিক ও সাহিত্যিক মতামত সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে ওয়াকিবহাল ছিলেন। সাক্ষাৎ হইলে কবি বলেন, ইতালি আসিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া যদি চলিয়া যাইতাম, তবে তাহা অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার হইত। আপনি নেপলসে আছেন জানিলে আমি নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ করিতাম। জানিলেও যে মুসোলিনীর অজ্ঞাতে সাক্ষাৎকার হইতে পারিত না, তাহা কবি এখনো ভালো করিয়া বুঝিতে পারিতেছেন না; কারণ কোনো অবাঞ্ছিত ব্যক্তি, কোনো ভিন্ন মতপোষক ব্যক্তি কবির সান্নিধ্যে আসিতে পায় নাই। কবি ও দার্শনিকের মধ্যে ইতালীয় জাতির মনোভাবের বৈশিষ্ট্য ও গত বিশ বৎসরের মধ্যে দেশের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন হইয়াছে— এই সকল সম্পর্কে কথাবার্তা হইল। রবীন্দ্রনাথের কাব্য, ক্রোচে বলেন, তাঁহার খুবই ভালো লাগে। তাহার কারণ, তাঁহার মতে, চিন্তার মহত্ত্বে নহে, উহার ক্ল্যাসিকাল ফর্মের গুণে। 'This is quite different from our ideas of oriental poetry which we usually think of as steeped in fancies।' তিনি আরও বলেন 'My idea of divinity is similar to yours. God is not a Being amongst Beings, but Being of Beings'।

পনেরো দিন রোমে থাকিয়া (৩০ মে - ১৪ জুন) রবীন্দ্রনাথ মুসোলিনী সম্বন্ধে যাহা শুনিলেন ও দেখিলেন, বা তাঁহাকে যাহা দেখানো ও শোনানো হইল— তাহাতে এই জবরদস্ত লোকটির ব্যক্তিত্ব কবিকে আকৃষ্ট করে। এই কথাটি তিনি বহুবার ফর্মিকিকে ও সাংবাদিকগণকে বলেন; এমনকি প্রায় একমাস পরে ৎস্যুরিকে যখন শ্রীমতী সালভাদোরি কবির নিকট ফাসিস্তদের উৎপীড়ন কাহিনী বলিতে আসেন, তখনও কবি তাঁহাকে বলিতেছেন, "About Mussolini himself, I must say, that he did interest me as an artist. His personality was striking. As a poet the human element— even in politics— touches me more deeply than abstract theories. Modern civilization is too impersonal for me. The expression of the personal man in his work may or may not be good, may even be terrible, but when it makes itself powerfully evident it is fascinating....Mussolini struck me as a masterful personality"।

মুসোলিনী সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিলেও তিনি ফাসিস্ত শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে কোনো মতামত দেন নাই। কিন্তু ইতালীয় সাংবাদিকদের নিকট মুসোলিনীর ব্যক্তিত্বের প্রশংসা ও ফাসিস্‌মোর প্রশংসা প্রতিশব্দবাচক। সুতরাং ইতালীয় পত্রিকাসমূহে ঘোষিত হইতে লাগিল যে, রবীন্দ্রনাথ ইতালির ফাসিস্তশাসনের সমর্থক। এইসকল সংবাদের প্রতিক্রিয়া ইতালির বাহিরে কি হইতেছে, তাহা কবি কিছুই এখনো বুঝিতে পারিতেছেন না।

রোম হইতে কবি ফ্লোরেন্স আসেন (১৬ জুন); ফ্লোরেন্স লিওনর্দ দ্য ভিন্‌চির স্থান। পৃথিবীর যে কয়টি লোক মনীষাবলে জাতির প্রণম্য— দ্য ভিনচি তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার নামে গঠিত সোসাইটি কবির সংবর্ধনা করিলেন। এই সভার সভাপতি Marchese Corsini; কর্সিনি পরিবার ফ্লোরেন্স ও ইতালির ইতিহাসে সুপরিচিত; এই বংশের সাধু Andrea, পোপ ১২শ ক্লেমেণ্ট ও কার্দিনাল নেরি মারিয়া জন্মগ্রহণ করেন। মার্চেজে কর্সিনি রবীন্দ্রনাথকে স্বাগত করিয়া বলিলেন যে, আপনি আমাদের দেশে অপরিচিত রূপে আসেন নাই, আপনার

খ্যাতি আপনার আসিবার পূর্বেই আসিয়াছে— Leonardo da Vinci stands for whatever is great in art and creative impulse in Italy and therefore in the whole world, and in association with this name we greet you. We welcome you as a *Master*—what you call in your own language *Gurudeva*— of our society. You represent the unity of life in the midst of a diversity of activities, and we feel proud of having you in our midst today। এইদিনকার সভা বেশ ঘরোয়াভাবে বসে ; কথাবার্তাও ঘরোয়াভাবেই চলে।

পরদিন ফ্লোরেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে কবির বক্তৃতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহৎ হলঘর— সভা আরম্ভের বহুপূর্বেই জনপূর্ণ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গার্ড অব্ অনার্ দিবার জন্য সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়ায় ; সভামঞ্চে দুইজন ছাত্রসৈনিক বিশাল পতাকা লইয়া দণ্ডায়মান। সমস্ত মিলিয়া সে-এক অপরূপ দৃশ্য। কবির বক্তৃতার বিষয় ছিল My School। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতির অধ্যাপক Pavolini কবির বক্তৃতার সারাংশ ইতালীয় ভাষায় বলিয়া দিলেন ; তিনি মুখবন্ধে বলেন, 'He would now change gold of the poet's words into flimsy paper of a poor resume'।

ফ্লোরেন্স ত্যাগ করিবার সময়ে বহুলোক স্টেশনে উপস্থিত হন ; অধ্যাপক প্যাভোলিনী নিজরচিত সংস্কৃত একটি শ্লোক কবিকে উপহার দিলেন—

পুষ্পপুরমিতি খ্যাতম্ শ্রুত্বা বাক্যমমৃতম্ গুরোঃ
এষ্যত্যভিনবম্ সঙ্গম্ ফলপুরমতঃ পরম্ ॥

'ফ্লোরেন্স' শব্দের অর্থ পুষ্পপুর ; কবি ফ্লোরেন্সের কলা-ঐশ্বর্য উত্তমরূপে দেখিবার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ফ্লোরেন্স হইতে কবি তুরিন (Turin) আসিলেন। গতবার যখন ইতালিতে আসেন তখনই এখানকার Pro Coltura Femminille নামে মহিলাসমিতি কবিকে আমন্ত্রণ পাঠান ; কিন্তু শরীর অসুস্থ হওয়ায় তিনি সেখানে যাইতে পারেন নাই।

এবার তুরিনে সেই মহিলাসমিতি কবিকে প্রথম সংবর্ধনা করিল। Dr. Amelia Allan Civita ইংরেজিতে কবি-স্বাগত করিয়া বলেন— We tenderly love your *Chitra*, sweet *Mashi* and passionate *Bimala*, and the sensitiveness of their souls finds a deep echo in our own. You possess a flame which brings warmth to us all, and especially to us Italians, who have much in common with the people of the East। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে বলেন যে, ভারতে কোনো গৃহে আসিবার সময়ে, বা বিদায়কালে নারীদের 'বরণ' করিবার রীতি আছে। আজ ইতালি হইতে বিদায়ের ক্ষণে তুরিনের নারীরা তাঁহাকে সেই বরণ করিলেন। কবির এই ভাষণ ফর্মিকি অনুবাদ করিয়া দিলে মহিলারা খুবই প্রীত হন।

প্রো-কোলচুরার মহিলা সদস্যেরা একদিন (১৯ জুন) কবিকে Casa del Sole (সূর্যঘর) নামে অনাথ-আশ্রমে লইয়া যান ; অনেকটা শ্রীনিকেতনের আদিযুগের শিক্ষাসত্রের মত।

পরদিন সন্ধ্যায় (২০ জুন) Licoo musicalle-এর হলে কবির City and Village সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতা। ফর্মিকি প্রথমেই ভাষণটির চুম্বক ইতালীয় ভাষায় করিয়া দেন এবং তার পর কবি ইংরেজিতে প্রবন্ধটি পড়েন।

ভাষণাদি হইয়া গেলে শ্রীমতী Mlada Lipovetzka কবির তিনটি গানের ইতালীয় তর্জমা বাংলা সুরে গাহিলেন। এই গান কয়টি— 'হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ' 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে' 'যদি তোর ডাক শুনে'। ইহার পর কবি তাঁহার দুইটি বাংলা কবিতা আবৃত্তি করিলে সভার কার্য শেষ হয়।

তুরিনবাসের শেষদিন (২০ জুন) বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের নিকট কবির বক্তৃতা। কবি বলেন যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে চিরদিন ভয় করিয়া আসিয়াছেন, তিনি স্কুল-পলাতক। এই কথা শুনিয়া ছাত্রেরা খুব খুশি— কারণ তখন তাহাদের বাৎসরিক পরীক্ষা চলিতেছিল এবং পরীক্ষার প্রতি ছাত্রদের মনোভাব সর্বদেশে সর্বকালেই সমান। তাই কবির কথায় তাহারা ভারি প্রফুল্ল।

সেইদিন কবি, প্রশান্তচন্দ্র ও রানী দেবী এবং অন্যান্যদের সহিত ইতালি ত্যাগ করিয়া সুইস দেশে চলিলেন।

সুইস দেশে

মধ্যয়ুরোপ সফর শুরু হইল— কবি চলিলেন সুইস দেশের ভিলেন্যুভে— রম্যাঁ রলাঁ্যারা সেখানে থাকেন। ২২ জুন কবি সদল তুরিন হইতে মন্‌ত্রো (Montreau) পর্যন্ত রেলে আসিয়া মোটর করিয়া ভিলেন্যুভে পৌঁছিলেন। রলাঁ্যা তাঁহাদের জন্য হোটেল বাইরন-এ কামরার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে হোটেলের সেই ঘরটি দেওয়া হইয়াছিল, সেখানে ভিক্টর হুগো বহুকাল বাস করিয়াছিলেন— গৃহের গবাক্ষ হইতে অদূরবর্তী হ্রদটি তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িত।

রলাঁ্যাদের বাড়ি অদূরেই— রঁল্যা প্রায়ই আসেন— কবির সহিত নানা বিষয় আলোচনা হয়— সাহিত্য শিল্প সংগীত ছাড়াও গান্ধীজির অহিংস আন্দোলন সম্বন্ধেও কথাবার্তা হয়। দোভাষীর কাজ করিতেন রলাঁ্যার ভগ্নী— তিনি ভালো ইংরেজি জানেন। রলাঁ্যার নিকট কবি ফাসিস্ত-ইতালির কথা কিছু কিছু জানিতে পারেন; ইতালীয় কাগজেপত্রে মুসোলিনী ও ফাসিস্‌মো সম্বন্ধে কবির মত বলিয়া যাহা প্রচারিত হইয়াছে, তাহার যথাযথ অনুবাদ কবির সম্মুখে পেশ করিলে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে ইতালীয় সংবাদ ও তাঁহার মূল অভিপ্রায়ের মধ্যে কত পার্থক্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সরাসরি কোনো প্রতিবাদ এখন প্রকাশ করিলেন না; কারণ, এখনো তিনি মুসোলিনীর প্রভুত্ব-ব্যঞ্জক বলিষ্ঠ দৃপ্ত মূর্তিকে শিল্পীর চোখে দেখিতেছেন। যাহা হউক, ভিলেন্যুভে বাসকালে কবি ভারতে এন্‌ড্রুজকে যে পত্র লেখেন, তাহা বোধ হয়, তিনি রলাঁ্যাকে দেখান; সে পত্র পড়িয়া রলাঁ্যা খুশি হইতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথ এই পত্রে অবশ্য লেখেন যে তিনি ইতালীয় সাংবাদিকদের নিকট বারে বারে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছিলেন যে রাজনীতির কোনো সমালোচনা করিবেন না। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যদোষে মুসোলিনীর প্রশংসাই যে ফাসিস্‌মোর প্রশস্তি তাহা তাঁহার কাছে স্পষ্ট হয় নাই। কবি ঐ পত্রে লিখিতেছেন, "My interviews, as published in Italy, were the products of three Personalities,— that of the reporter, the interpreter and mine.···Being ignorant of Italian I had no means of checking the result of this concoction. The only precaution which I could take was to repeat emphatically to all my listeners that I had no opportunity to study the history and character of Fascism"।[১]

ভিলেন্যুভেতে প্রায় দুই সপ্তাহ কাটে; এখানে এই সময়ে য়ুরোপের কয়েকজন মনীষী বাস করিতেছিলেন; যেমন

১ Visva-Bharati Quarterly, 1926 October, p. 274.

নৃতত্ত্ববিদ ফ্রেজার (J. G. Frazer)[১], জেনেভার রুশো ইন্‌স্টিটিউটের অধ্যাপক বোভে (Bovet), অশীতিপর বৃদ্ধ প্রাণীতত্ত্ববিদ ফোরেল (A. H. Forel)[২], ডাক্তার-সাহিত্যিক শান্তিবাদী দুহামল (Duhamal)[৩] ও রনিজার (Roniger) এখানে ১ জুলাই আসিলেন। কবির সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। রলঁ্যা কবিকে ৎসুরিকে ৮ জুলাই যে পত্র দেন তাহা পাঠ করিলে জানা যায় দুহামল রবীন্দ্রনাথকে কী শ্রদ্ধা করিতেন।

Never forget the magic power of your name and all it respects for an elite of Europe. Undoubtedly it knows you only partially by imperfect translation (who indeed know you, even among those who are near to you). But Duhamal has just told me those last days that there is something more essential than the direct effect of books—it is their 'fragrance'—these mysterious emanations of a God-pervaded soul. There a multitude of poets whom one reads and whose art is admired. But very few radiate this enchantment which awakens and exalts the forces of life. You are one of these good genii.[৪]

৬ই জুলাই কবি ভিলেন্যুভে ত্যাগ করিয়া ৎসুরিক আসেন। সেখানে কবি যথেষ্ট সমাদর লাভ করেন; সাধারণ সভায় বক্তৃতা হইল। তার পর তাঁহার জন্য অভ্যর্থনাসভার আয়োজন হয়; সেখানে ৎসুরিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা অধ্যাপকগণের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

এইখানে কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন ইতালীয় অধ্যাপক সালভাদোরির স্ত্রী; অধ্যাপক অসুস্থ ছিলেন। ইঁহারা ইতালীয়, ফাসিস্ত উৎপীড়নে দেশত্যাগী। কবিকে এই মহিলা ফাসিস্‌মোর অত্যাচার কাহিনী কিছুটা বিবৃত করেন। তিনি বলেন যে, তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন স্ত্রী ও পুত্র-কন্যার সম্মুখে পিতাকে হত্যা করা হইয়াছে, পিতার সম্মুখে পুত্রকে নির্যাতিত করা হইতেছে! এ কথা বলা বাহুল্য যে এইসকল কাহিনী শুনিয়া কবির স্পর্শচেতন মন সহজেই উত্তেজিত হইবে। কিন্তু এখনো তিনি মুসোলিনীর ব্যক্তিত্বের মহত্ত্ব সম্বন্ধে মুগ্ধ। তিনি ৭ জুলাই ফর্মিকিকে এক পত্রে জানান যে তিনি মুসোলিনীর প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ, কিন্তু তিনি ফাসিস্‌মোকে কখনো সমর্থন করিতে পারেন না—"That I should be made to appear to sanction a career of unscrupulous crime in any political body for the sake of the self-aggrandisement of a people is extremely repugnant for me"।

ইহার পর কবি ৎসুরিক হইতে ১০ জুলাই ভিয়েনা যান; সেখান হইতে ফর্মিকিকে তিনি ২০ জুলাই দ্বিতীয় পত্র লেখেন। ইতিপূর্বে এন্‌ড্রুজকে কবি যে পত্র দেন তাহার অনুলিপি তিনি ফর্মিকিকে পাঠাইয়াছিলেন। এই চিঠি বিলাতের ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানে (৪ অগস্ট) প্রকাশিত হইলে ফর্মিকি ঐ পত্রিকায় তাহার উত্তর দেন। তিনি বলেন তিনি কবির সঙ্গে ইতালিতে বরাবর ছিলেন—একদিনের জন্যও তিনি তাঁহাকে ত্যাগ করেন নাই; তিনিই তাঁহার দোভাষীর কাজ করেন এবং ইতালির কাগজপত্রে যাহা প্রকাশিত হইত, তাহা তাঁহাকে অনুবাদ করিয়া

১ J. G. Frazer (1854-1941), British anthropologist; author of the *Golden Bough*.

২ A. H. Forel (1848-1931), Swiss Psychiatarist and entomologist.

৩ George Duhamal (1884—), French writer; a physician by profession; a pacifist and one of Rolland's most trusted friends.

৪ Letter, 8 July 1926. See *Rolland and Tagore* 1945, p. 63.

শোনানো হইত। রবীন্দ্রনাথ মুসোলিনীর কার্যকলাপ দেখিয়া একাধিকবার তাঁহার সম্মুখে মন্ত্রীবরের প্রশংসা করিয়াছিলেন।

ইহার মাসাধিক কাল পরে বার্লিন হইতে ২০ সেপ্টেম্বর কবি শেষ যে পত্র লেখেন তাহাতে তিনি স্পষ্ট করিয়াই বলেন যে মুসোলিনীর আতিথ্য ও সৌজন্য তিনি যাহা পাইয়াছিলেন, তাহা প্রচুর ও আন্তরিক। তাঁহাকে যেটি আকর্ষণ করিয়াছিল সেটি হইতেছে মুসোলিনীর ব্যক্তিত্ব। আজকালকার দিনে রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে একটা যোগ্য মানুষের অন্তর দেখিতে পাইলে আনন্দ হয়; সেই আনন্দই তাঁহাকে ইতালির মহত্ত্বের দিকে আকর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু ইহার দ্বারা এ প্রমাণ হয় না যে, তিনি ফাসিস্‌মোকে সমর্থন করিয়াছেন। কবি অনুভব করিয়াছেন যে ইতালিতে স্বাধীনতা নিষিদ্ধ।

ইতালির কোনো পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের এই পত্রের অনুবাদ প্রকাশিত হয় নাই— হইবার জো ছিল না। ইতালীয়রা জানিতে পারে নাই রবীন্দ্রনাথ কী বলিয়াছেন; কেবলমাত্র ইতালীয় কাগজে কবি সম্বন্ধে গালাগালি বাহির হইল, যেহেতু তিনি ফাসিস্‌মোর সমর্থন করেন নাই।

এই বিতর্কের সময়ে জনৈক ইংরেজ লেখক ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানে যাহা লেখেন তাহা নিম্নে উদ্‌ধৃত হইতেছে— 'Dr. Tagore...thinks that Italy's supreme gifts to mankind have been the gifts of the spirit. And for that reason if we read his reflections aright he does not foresee a long life for this experiment or a history which will serve Europe for example'[১]

কবির সহিত মুসোলিনীর এই মতান্তরের জন্য বিশ্বভারতী হইতে অধ্যাপক তুচ্চিকে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইবার আদেশ হইল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল রবীন্দ্রনাথকে যে উদ্দেশ্যে মুসোলিনী ব্যবহার করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা ব্যর্থ হইল— সভ্য পৃথিবী জানিতে পারিল ফাসিস্ত ইতালির নগ্নমূর্তি কী ভীষণভাবে কদাকার!

য়ুরোপের নানাদেশে

ভিলেনুভে কবি ও তাঁহার সঙ্গীরা দিন-পনেরো ছিলেন (২২ জুন-৬ জুলাই); সেখান হইতে ৎস্যুরিক যান। ৎস্যুরিক হইতে ভিয়েনা যাত্রার পথে লুসার্ন শহরে একদিনের জন্য থামেন, কারণ সেখানে বক্তৃতা দিবার আহ্বান ছিল। লুসার্ন হইতে তাঁহারা ভিয়েনা পৌঁছান ১০ জুলাই।

ভিয়েনায় কবির সহিত কয়েকজন উপদ্রুত বিতাড়িত বা পলাতক ইতালীয়ের সাক্ষাৎ হয়। Dr. Angelica Balbanoff নামকরা সমাজতন্ত্রবাদী নেতা— তিনি Modigliani নামে রোমের এক এডভোকেটকে কবির সহিত পরিচিত করিতে আনেন। ইনি মাত্তিওতি হত্যায় অভিযুক্ত আসামীদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালান; সেই অপরাধে তাঁহার জীবন অসহ্য ও আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিলে তিনি দেশত্যাগী হন। তিনি ফাসিস্তশাসনের স্বরূপ কবিকে বলেন। ইহার পর কবির পক্ষে আর নীরব থাকা সম্ভব হইল না এবং তিনি ফাসিস্তশাসন সম্বন্ধে তাঁহার পূর্বোল্লেখিত পত্র লেখেন।

১ Quoted in Visva-Bharati Quarterly 1926, p. 866.

জুলাই মাসের শেষ দিকে কবি ভিয়েনা ত্যাগ করিয়া প্যারিসে আসেন; সেখানে তাঁহার পূর্বপরিচিত অতিথিবৎসল M. Kahn-এর অতিথিশালায় কয়েকদিন থাকিলেন। অধ্যাপক লেভি ও তাঁহার পত্নী, অধ্যাপক জুল ব্লক (Bloch) ও কয়েকজন পুরাতন বন্ধু কবির সহিত দেখা করিতে আসেন। কোনোপ্রকার পাবলিক সভাসমিতিতে কবিকে যাহাতে যাইতে না হয় কবি সে-অনুরোধ বন্ধুদের করেন; কারণ মুসোলিনীর ব্যাপার লইয়া তাঁহার মন অত্যন্ত বিচলিত।

প্যারিস হইতে কবি লণ্ডন আসিলেন অগস্ট মাসের গোড়ার দিকে। পুরাতন বন্ধুদের মধ্যে রোদেনস্টাইনরা, ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানের সম্পাদক স্কট্ (C. P. Scott), ব্রেল্সফোর্ড, আর্নেস্ট রীহ্‌স প্রভৃতি কবির সহিত দেখা করিতে আসেন।

লণ্ডন হইতে মোটরযোগে ডিভনশায়ারে টট্‌নেস[১]-এ এল্মহার্স্টদের নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যায়তন (Dartington Hall)[২] দেখিবার জন্য গেলেন। সেখানে একদিন থাকিয়া কর্নওয়াল কাউন্টির করবিস্-বে (Carbis Bay) নামক স্থানে এক সপ্তাহ থাকেন। এইখানে এই সময়ে বার্টারান্ড রাসেল ও তাঁহার পত্নী ডোরা রাসেল বাস করিতেছিলেন; তাঁহারা কবির সহিত দেখা করিতে একদিন আসেন।

করবিস-বে হইতে লণ্ডনে ফিরিবার পথে কবি আর-একদিন টট্‌নেসে থাকিয়া আসিলেন। লণ্ডনে আসিলে রাজকবি রবার্ট ব্রিজেস কবিকে অক্সফোর্ডে একদিনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। পাঠকের মনে আছে ১৯২১ সালে অক্সফোর্ডের এক সভায় ব্রিজেস সভাপতিত্ব করিতে রাজি হইয়া শেষমুহূর্তে উপস্থিত হন নাই; বোধ হয় সেই বেদনা মুছিয়া ফেলিবার জন্য এই নিমন্ত্রণ। লণ্ডনে কয়েকটা সভাসমিতি হইতে আমন্ত্রণ আসে বক্তৃতার জন্য, কিন্তু য়ুরোপের মহাদেশে তাঁহার সফরপঞ্জিকা প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে বলিয়া সেসব প্রত্যাখ্যান করিতে হইল।

লণ্ডন বাসকালে কবির সহিত শিল্পী এপ্‌স্টাইনের[৩] পরিচয় হয়; তিনি কবির এক আবক্ষ (grand bust) মূর্তি প্রস্তুত করেন। এই মহাশিল্পীর কলারীতি কবিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। কয়েক বৎসর পরে (১৯৩৫) কবিকে এপ্‌স্টাইন সম্বন্ধে একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ পাঠ ও নন্দলাল বসুর সহিত আলোচনা করিতে দেখিয়াছিলাম।

য়ুরোপ মহাদেশ ভ্রমণের মোটামুটি একটা সংকল্প খাড়া করিয়া রবীন্দ্রনাথ মহলানবিশ-দম্পতি ও লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ইংলণ্ডের বন্দর নিউকাস্‌ল হইতে স্টীমারযোগে নরওয়ে যাত্রা করিলেন। অস্‌লো (Oslo)-তে অধ্যাপক স্টেন কোনো (Konow) এবং ডক্টর ও মিসেস্ মর্গেনস্টিয়ের্ন প্রভৃতি বন্ধুবান্ধবদের অভ্যর্থনা পাইয়া কবি খুবই প্রীত; নরওয়েতে কবির এই প্রথম আগমন। গত বৎসর অধ্যাপক স্টেন কোনো বিশ্বভারতীর অভ্যাগত অধ্যাপকরূপে আসিয়াছিলেন।

অস্‌লো পৌঁছিবার পরদিন নরওয়ের রাজা সপ্তম হাকোন (১৯০৫ হইতে রাজা)-এর সহিত কবির সাক্ষাৎ হয়। ২৫ অগস্ট ওরিয়েন্টাল আকাদেমিতে কবির যে বক্তৃতা হয়, তাহাতে রাজা হাকোন উপস্থিত ছিলেন।

১ Totnes, Municipal borough, Devonshire, S. W. England : 20 miles from Exeter.

২ 'The school at Dartington Hall was founded in the first place of a general experiment in the reconstruction of rural life and rural industries.' *Dartington Hall* by the Headmaster W. B. Curry in the *Modern Schools Handbook* by Trevor Blewitt with an introduction by Amabel Williams-Bliffs. Gollanez 1934, pp. 56-70.

৩ Epstein, Jacob (1880) : American sculptor of Russo-Polish descent ; settled in London (1905), author of *The Sculpto Speaks.* Worked in New York and other American cities. His work includes 18 symbolical figures decorating British Medical Association building, tomb of Oscar Wilde, lifesize bronze Christ, etc.

বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে একদিন পাবলিক বক্তৃতা হইল, এ ছাড়া সমাবর্তন উৎসবে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়া তিনি উপস্থিত হন। একদিন কবিকে নরওয়ের স্থপতি-ভাস্কর গুস্তাফ বিগেলান্ড-এর[১] রচিত বিখ্যাত জীবন-উৎস (Fountain of Life) দেখিতে যান। অস্‌লোর শহরতলীতে বিশাল পার্কে তাঁহার ভাস্কর্য গত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া নির্মিত হইতেছে; তিনি কাহাকেও সেখানে সাধারণত আসিতে দেন না, রবীন্দ্রনাথকেই বিশেষভাবে আহ্বান জানাইয়া লইয়া আসেন।

যে-কয়দিন অস্‌লোয় কবি ছিলেন, পার্টি বা ভোজের অন্ত ছিল না। এইসব স্থানে নরওয়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ হয়। মেরু-পর্যটক বিজ্ঞানী ন্যানসেন, ঔপন্যাসিক ব্রুক, প্রধানমন্ত্রী লীচ (Lyche), ঐতিহাসিক হোয়ার (Hooyer), নাট্যকার ব্যোর্নসনের পুত্র জাতীয় থিয়েটরের অধিকর্তা ও অন্য বহু নরনারীর সহিত পরিচিত হন।

নরওয়ে দেশে রবীন্দ্রনাথ এই প্রথম আসিলেও নরওয়েজন সাহিত্যের সহিত (অনুবাদের মধ্য দিয়া) তাঁহার পরিচয় বহু কালের; ইব্‌সেন রবীন্দ্রনাথের প্রিয় নাট্যকার। অনেকে কবির কোনো কোনো রচনার উপর ইব্‌সেনের প্রভাবও কল্পনা করেন। ব্যোর্নসন, জন্ বোয়ার প্রভৃতি খ্যাতনামা সকল লেখকেরই গ্রন্থ কবির কাছে অল্পবিস্তর পরিচিত। অস্‌লো বাসকালে জন্ বোয়ার একদিন আসিয়া কবির সহিত কাটাইয়া যান। এইভাবে নরওয়ে সফর শেষ হইল।

সুইডেনে যাইবার কথা ছিল না; শেষ মুহূর্তে স্টকহলমে যাইবেন স্থির করিলেন। সুইডিশ পর্যটক স্বোন্ হেডিন[২] বিশেষ সমাদর করিয়া কবিকে এক লাঞ্চপার্টিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। সেখানে সুইডিশ আকাদেমির কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য রবীন্দ্রনাথের সহিত মিলিত হইবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। আর-একটি পার্টিতে সুইডেন রাজকুমার Wilhelm উপস্থিত হন।

অতঃপর ৬ সেপ্টেম্বর ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে কবি উপস্থিত হইলেন। রয়েল নটিক্যাল ক্লাবের এক ডিনারে দার্শনিক হেফডিং[৩] ও অধ্যাপক টুক্সোন (Tuxon)-এর সহিত দেখা হইল। বিখ্যাত সাহিত্যশাস্ত্রী জর্জ ব্রানডিস[৪] তখন অসুস্থ, মৃত্যুশয্যায় বলা যাইতে পারা যায়, কবি তাঁহার সহিত দেখা করিয়া আসিলেন।

এইবার স্কান্দানেবিয়ার তিনটি রাষ্ট্রে প্রায় পক্ষকাল ভ্রমণ হইল। কোপেনহেগেন হইতে কবি বালটিক সাগর পার হইয়া জারমেনি চলিয়াছেন। হঠাৎ দেখি সেই সাগর'পরে স্টীমারে বসিয়া কবি গান লিখিতেছেন (৮ সেপ্টেম্বর)—

> সে কোন্ পাগল যায় পথে তোর,
> যায় চলে ওই একলা রাতে—
> তারে ডাকিস নে তোর আঙিনাতে॥
> সুদূর দেশের বাণী ও যে
> যায় বলে, হায়, কে তা বোঝে—
> কী সুর বাজায় একতারাতে॥

১ Adolf Gustav Vigeland (1869-1943) : Norwegian sculptor, Vigeland's park of sculptures, just outside Oslo. The *Monolith*, 50 ft. high with 121 intertwined human figures, is the centre of attraction.

২ Sven Ander Hedin (1863-1952).

৩ Harold Heffding (1843-1931).

৪ George Brandis (1842-1927).

কাল সকালে রইবে না তো,
বৃথাই কেন আসন পাত।
বাঁধন-ছেঁড়ার মহোৎসবে
গান যে ওরে গাইতে হবে
নবীন আলোর বন্দনাতে॥[১]

এই গানে কবি কি নিজের কথাই বলিলেন— তাঁহার অন্তরের অভিপ্রায়! দেশ হইতে বাহির হইবার পূর্বে কবি 'বৈকালী'গুচ্ছ গান রচেন; প্রায় চারি মাস পরে অন্তঃসলিলা ফল্গু আজ হঠাৎ উৎসরিত হইল উত্তরয়ুরোপের বাল্টিক সাগরের পরিবেশ মাঝে!

হামবুর্গ উত্তর-জারমেনির বৃহত্তম বন্দর-নগরী ও শিল্পকেন্দ্র। কবি সেখানকার হোটেলে উঠিলেন; পাবলিক বক্তৃতার বিষয় ছিল Culture and Progress। এই হোটেলে বাসকালে কবি দুইটি গান রচেন—

কার চোখের চাওয়ার হাওয়ায় দোলায় মন (৯ সেপ্টেম্বর)— গীতবিতান, পৃ. ৩২৮
রয় যে কাঙাল শূন্য হাতে, দিনের শেষে (১০ সেপ্টেম্বর)— গীতবিতান, পৃ. ৫৯১

হামবুর্গ হইতে ১১ সেপ্টেম্বর বার্লিন পৌঁছাইলেন— Kaiser Hoff নামে হোটেলে তাঁহারা উঠিলেন। বার্লিনে কবি যে পাঁচ দিন ছিলেন— নানা প্রতিষ্ঠানে যাওয়া-আসায়, নানা শ্রেণীর লোকদের সহিত দেখাসাক্ষাতে কাটিয়া গেল। একদিন জারমেনির প্রেসিডেন্ট ফন্ হিনডেনবার্গের আমন্ত্রণে কবি তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান। উভয়ের মধ্যে প্রায় একঘণ্টাকাল নানা কথার আলোচনা হয়। সমসাময়িক পত্রিকাদিতে বলে যে, এমন দুই বিভিন্ন প্রকৃতির ব্যক্তি ইতিপূর্বে এমন সমানভাবে কখনো কথোপকথন করেন নাই। হিনডেনবার্গ সৈনিকপুরুষ, প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে জারমান সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। যুদ্ধশেষে তিনি কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। যুদ্ধান্তে ১৯১৮ সালের শেষভাগে রাজতন্ত্র ধ্বংস করিয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম প্রেসিডেন্ট এবার্ট-এর মৃত্যুর পর ১৯২৫ সালে হিনডেনবার্গ সভাপতি হন।

বার্লিন থাকাকালে কবির জারমান গ্রন্থপ্রকাশক কুর্ট-উলফ (Kurt Wolff) তাঁহার বাড়িতে কবি-সম্বর্ধনা করেন; সেইখানে বাভারিয়ার রাজকুমার (ইনি হৃতসর্বস্ব) ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন। মাঝে একদিন জারমেনির শিক্ষামন্ত্রী ডঃ বেকার[২] ও আর-একদিন অধ্যাপক আইনস্টাইনের সহিত সাক্ষাৎ হয়। আইন-স্টাইনের সহিত কবির কথাবার্তার কোনো প্রতিবেদন আমরা পাই নাই।

বার্লিনের বৃহত্তম বক্তৃতাগৃহ ফিলহারমোনিকে কবি ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিলেন, তাহাতে শ্রোতার অভাব হয় নাই, একখানি টিকিটও অবিক্রীত ছিল না। কিন্তু ১৯২১ সালের ন্যায় জনতার বীরপূজার উৎসাহ এখন স্পষ্টতই ক্ষীণ। জারমান পত্রিকাদিতে কবি সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইতেছে, তাঁহার অনবদ্য ভাষা, তাঁহার কথা বলিবার অতুলনীয় ভঙ্গী সম্বন্ধে অনেক কথাই সাংবাদিকরা বলিতেছেন— কিন্তু কবির বক্তব্য শুনিবার বা বুঝিবার উৎসাহের বড়ই অভাব। ছয় বৎসর পূর্বের জারমেনি হইতে এখনকার জারমেনির অনেক পার্থক্য এবং এই পরিবর্তনটা অত্যন্ত দ্রুততালে সংঘটিত হইতেছে তাহার আভাস কবিও পাইতেছেন।

১ গীতবিতান, পৃ. ৫৯১।

২ C. H. Becker (1876-1933), German Oriental scholar and politician; Professor; Secretary of Prussia 1919-1925; Member of Political Cabinet 1921; Author of *Islam Studies* etc.

গতবার (১৯২১) জারমেনি প্রথম মহাযুদ্ধের পরাজয়ে অপমানিত, পরিশ্রান্ত। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতা, গান্ধীজির অহিংসাবাদ, বুদ্ধদেবের মৈত্রীর বাণী তাহাদের রণশ্রান্ত, শোকসন্তপ্ত মনকে শান্তি ও সান্ত্বনা দিয়াছিল। কিন্তু গত কয়েক বৎসরের মধ্যে জারমেনিতে হিটলারের নাৎসিদলের সংগঠন শুরু হইয়াছে; রণকামীদল ভিতরে ভিতরে প্রবল হইয়া উঠিয়া জারমানজাতির পরাজিত মনোভাবকে শক্তিতে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তুলিবার প্রয়াসী। প্রাচ্যের শান্তির বাণী শুনিয়া তারিফ করিবার মনোভাব তাহারা এখন নির্বীর্যতা, অন-আর্য, নন্-নর্ডিক বলিয়া ঘোষণা করিতেছে।

জারমেনি রবীন্দ্রনাথকে সম্মান দেখাইতেছে দেখিয়া ব্রিটিশ পত্রিকাওয়ালারা ইহার মধ্যে জারমানদের কুট অভিসন্ধি আবিষ্কার করিয়া বলিল যে রবীন্দ্রনাথের প্রতি সম্মান দেখাইয়া জারমানরা তাহাদের বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া লইবে।[১] ভারতেও ইংরেজসম্পাদিত 'মাদ্রাজ মেল্' (১৮ সেপ্টেম্বর) মন্তব্য করিল কয়েকদিন পূর্বে ইতালি রবীন্দ্রনাথকে তাহাদের স্বার্থের জন্য নানাভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল, এখন জারমেনির পালা। তবে ইহারা আর-কোনো অভিসন্ধি জারমেনির উপর আরোপ করে নাই; তবে তাহারা স্বীকার করিল যে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ figure among the best sellers অর্থাৎ জারমেনিতে রবীন্দ্রনাথের বই-এর বিক্রয় সব থেকে বেশি।

বার্লিনে পাঁচ দিন থাকিয়া কবি চলিলেন বাভারিয়ার প্রধান শহর ম্যুনিকে; সেখানে দুইদিন থাকেন, তার মধ্যে দুইটি গান-রচনার তারিখ পাই, আরও দুইটি গান এখানেই রচিত বলিয়া অনুমান করি। গানগুলি—

ছুটির বাঁশি বাজল যে ওই নীল গগনে (১৭ সেপ্টেম্বর)— গীতবিতান, পৃ. ২৭৯
নাই নাই ভয়, হবে হবে জয় (১৮ সেপ্টেম্বর)— গীতবিতান, পৃ. ২৫০
আকাশ, তোমায় কোন্ রূপে মন চিনতে পারে— গীতবিতান, পৃ. ৫৮৪
তোর ভিতরে জাগিয়া কে যে— গীতবিতান, পৃ. ৬৯

ম্যুনিক হইতে বাভারিয়ার শিল্পনগরী ন্যুনবুর্গে আসিলেন— যথাবিধি বক্তৃতা চলিতেছে। এখানেও গান লিখিতেছেন—

আমার মুক্তি গানের সুরে (১৯ সেপ্টেম্বর) পাঠান্তরে 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয়'— গীতবিতান, পৃ. ১৪১
সকালবেলার আলোয় বাজে (২০ সেপ্টেম্বর)— গীতবিতান, পৃ. ৩৩৬

ন্যুনবুর্গ হইতে কবি আসিলেন উরটুমবুর্গ রাজ্যের প্রধান শহর স্টুটগার্টে। সেখানে লিখিলেন 'মধুর তোমার শেষ যে না পাই' (২১ সেপ্টেম্বর)— গীতবিতান, পৃ. ২৩৭। তখন ইহার পাঠ ছিল 'ভালো লাগার শেষ যে না পাই'।

অতঃপর কল্যোনে লিখিলেন—

চাহিয়া দেখো রসের স্রোতে (২৪ সেপ্টেম্বর)— গীতবিতান, পৃ. ৫৯০
তুমি উষার সোনার বিন্দু (২৪ সেপ্টেম্বর)— গীতবিতান, পৃ. ৫৮৩

ড্যুসেলডর্ফে লিখিলেন—

আপন গানের টানে তোমার (২৫ সেপ্টেম্বর), পাঠান্তরে 'গানে গানে তব বন্ধন যাক টুটে'— গীতবিতান, পৃ. ৯

১ Daily Telegraph, London; 1926 September 18.

নিরন্তর ঘোরাঘুরি বক্তৃতা মোলাকাত দর্শনীয় স্থানগুলি দেখা— তার মধ্যে কবির মুক্তিবাণী গানের সুরে ধ্বনিত হইতেছে।

এমন সময়ে কবি জানিতে পারিলেন বার্লিনে রথীন্দ্রনাথের অস্ত্রোপচার হইয়াছে— তিনি কাহাকেও এ বিষয়ে পূর্বাহ্ণে জানান নাই। শুনিয়াছি আইনস্টাইন চিকিৎসকাদির ব্যবস্থায় সহায়তা করেন।

রবীন্দ্রনাথ ২৬ সেপ্টেম্বর ড্যুসেলডর্ফ হইতে বার্লিনে ফিরিয়া আসেন। রথীন্দ্রনাথকে একটু সুস্থ দেখিয়া অক্টোবরের গোড়ায় ড্রেসডেন চলিয়া যান। সেখানে, সভা বক্তৃতা কবিতা পাঠ। বক্তৃতার পর সন্ধ্যায় 'ডাকঘর' নাটকের অভিনয় দর্শন (৪ অক্টোবর)।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়[১] সেই সময়ে ড্রেসডেনে— তিনি লিখিতেছেন যে বক্তৃতা-সভা হইতে অতি কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া দেখেন ফুটপাথ জনাকীর্ণ। অতঃপর থিয়েটরে— যেখানে ডাকঘর অভিনীত হইতেছে— সেখানেও তিলার্ধ স্থান নাই।[২] ড্রেসডেন হইতে বোধ হয় পরদিনই বার্লিনে ফিরিয়া আসেন; ৬ই কবিকে একটি মাত্র গান লিখিতে দেখি— আপনি আমার কোন্‌খানে বেড়াই তারি সন্ধানে (গীতবিতান, পৃ. ২২৯)।

বার্লিন হইতে প্রাগ্ (প্রাহা) যান ৯ অক্টোবর। সেখানে পাঁচ দিন অবস্থান। সেখানে পুরাতন বন্ধুদের মধ্যে অধ্যাপক বিনটারনিটস্ ও চেক-অধ্যাপক লেসনীর ব্যবস্থায় বক্তৃতাদির আয়োজন হয়। নূতন জারমান থিয়েটরে Bach-এর রচিত সংগীত শুনিতে একদিন গেলেন। সেদিন Zemlinsky নামে একজন সংগীতকার রবীন্দ্রনাথের গান হইতে গৃহীত গান চেক্‌ভাষায় গাহিলেন। প্রাগ্ বাসকালে কবি একটি গান লেখেন—

কোথায় ফিরিস পরম শেষের অন্বেষণে (১২ অক্টোবর)— গীতবিতান, পৃ. ৫৯০

প্রাগে জারমান ও চেক্‌ভাষায় অভিনীত 'ডাকঘর' নাটক দেখিতে যান।

প্রাগ্ হইতে ভিয়েনা যেদিন পৌঁছিলেন, সেইদিনই বক্তৃতা (১৬ অক্টোবর)। এত ঘোরাঘুরির পর এইবার বুঝিতেছেন যে শরীরে আর সহিতেছে না; বাধ্য হইয়া এইখানে দশ দিন বিশ্রাম করিবার জন্য রহিয়া গেলেন। এখানে গানের সুর স্তিমিত হয় নাই, লিখিলেন—আকাশে তোর তেমনি আছে ছুটি (২০ অক্টোবর) — গীতবিতান, পৃ. ৫৯০।

এইবার কথা হয় কবি পোলাণ্ড ও রুশিয়া যাইবেন, কিন্তু শরীরের জন্য যাওয়া স্থগিত হইল— পরে অবশ্য রুশিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু পোলাণ্ড যাওয়া আর হয় নাই।

ভিয়েনা প্রবাসকালে শান্তিনিকেতন হইতে তেজেশচন্দ্র সেন লিখিত গাছপালা সম্বন্ধে কতকগুলি রচনা তিনি পাইলেন। কবি ২৩ অক্টোবর তেজেশচন্দ্রকে লিখিতেছেন, "তোমার লেখাগুলি শান্তিনিকেতনের গাছপালাগুলির মর্মরধ্বনি ক'রে উঠেচে। তাতেই আমার মন পুলকিত ক'রে দিল।"[৩] এই পত্রখানি পরিশুদ্ধ করিয়া পরে 'বনবাণী'র ভূমিকারূপে প্রকাশিত হয়।

১ এই সময়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লীগ অব্ নেশনসের আমন্ত্রণে জেনেভা আসেন ও মধ্যয়ুরোপ ভ্রমণকালে কবির সহিত সাক্ষাৎ হয়। বিস্তৃত বর্ণনার জন্য 'সম্পাদকের চিঠি'— প্রবাসী ১৩৩৪ আষাঢ় ও শ্রাবণ দ্রষ্টব্য।

২ Rabindranath Tagore at Dresden, by Ramananda Chatterjee, Calcutta Municipal Gazette, Tagore Memorial Special Number 1941 September, pp. 22-25.

৩ গাছপালার প্রতি ভালোবাসা, প্রবাসী ১৩৩৪ বৈশাখ, পৃ. ২-৩।

শরীরের অবস্থা ভালো করিয়া না বুঝিয়াই কবি পুনরায় সফরে বাহির হইলেন; ২৬ অক্টোবর হাঙ্গেরির রাজধানী বুডাপেস্ত আসিলেন, বক্তৃতাও দিলেন। কিন্তু তার পর শরীর এমনই বিকল হইল যে ডাক্তাররা তাঁহাকে সকলপ্রকার কাজকর্ম বন্ধ করিয়া পরিপূর্ণ বিশ্রামের জন্য সনির্বন্ধ উপদেশ দিলেন। চিকিৎসকদের পরামর্শে হাঙ্গেরির বিখ্যাত স্বাস্থ্যকেন্দ্র বালাতন হ্রদের তীরে আশ্রয় লইলেন। বুডাপেস্ত বাসকালে কবি একটি কবিতা "পথ এখনো শেষ হল না (২৭ অক্টোবর, গীতবিতান পৃ. ২২৯) ও একটি গান 'দিনের বেলায় বাঁশি তোমার' (৩০ অক্টোবর, গীতবিতান পৃ. ২৩৭) বালাতনে গিয়া আর-একটি গান 'পান্থপাখির রিক্ত কুলায় বনের গোপন ডালে' (৯ নভেম্বর, গীতবিতান পৃ. ৩৪৯) লেখেন। এই যাত্রায় এই শেষ রচনা।[১]

ভ্রমণকালে নূতন নূতন পরিবেশের মধ্যে এই-যে আকস্মিক গানের সুর থাকিয়া থাকিয়া উছলিয়া উঠিতেছে—তাহার কারণ বিশ্লেষণ করা কঠিন; তবে তেজেশচন্দ্রকে লিখিত পত্রমধ্যে বলেন, "অন্তরে অন্তরে অসহ্য চঞ্চলতা অনুভব করি নিজের কাছ থেকেই উদ্দামবেগে পালিয়ে যাবার জন্যে। পালাব কোথায়? কোলাহল থেকে সংগীতে।"

বালাতনের হোটেলে প্রশান্তচন্দ্র কবিকে একটি নূতন ধরণের কাজে প্রবৃত্ত করিলেন; "জারমেনিতে গিয়ে দেখা গেল, এক উপায় বেরিয়েছে তাতে হাতের অক্ষর থেকেই ছাপানো চলে। বিশেষ কালি দিয়ে লিখতে হয় এল্যুমিনিয়ামের পাতের উপরে; তার থেকে বিশেষ ছাপার যন্ত্রে ছাপিয়ে নিলেই কম্পোজিটারের শরণাপন্ন হবার দরকার হয় না।"[২] এইভাবে 'লেখন' নামে বই ছাপা হইল।

লেখনের উৎপত্তি সম্বন্ধে কবি উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় লেখেন, "এই লেখনগুলি শুরু হয়েছিল চীনে জাপানে। সেথায় কাগজে রুমালে কিছু লিখে দেবার জন্য লোকের অনুরোধে এর উৎপত্তি। তারপরে স্বদেশে ও অন্যদেশেও তাগিদ পেয়েছি। এমনি করে টুকরো লেখাগুলি জমে উঠল।"[৩]

বুডাপেস্তে বাসকালে কবি পাবলিক অনুষ্ঠানাদিতে খুব কমই যোগদান করেন; একদিন হাঙ্গেরির সর্বময় কর্তা Admiral Horthy-র সঙ্গে দেখা করিতে যান। অন্য একদিন সাহিত্যিক কারোলি কিসফালোদির[৪] মর্মরমূর্তির নিকট একটি বৃক্ষরোপণ করেন; এবং আর-একদিন ঔপন্যাসিক জোকাই-এর[৫] স্মৃতিস্তম্ভে মাল্যদান করিতে যান। বালাতনেও কবি একটি বৃক্ষরোপণ করেন।

১ গীতবিতানে গানগুলি অত্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে মুদ্রিত।

২ প্রবাসী ১৩৩২ কার্তিক।

৩ *Fireflies*: Decorated by Boris Artzybaschoff. The author's note: '*Fireflies* had their origin in China and Japan where thoughts were very often claimed from me, in my handwriting on fans and pieces of silk'— The Macmillan Company, New York; 1928। তু. *Straybirds*; Epigrams; 1916। এই শ্রেণীর দুই-চারি পংক্তির কবিতা রবীন্দ্রনাথ লেখেন তাঁহার 'কণিকা' কাব্যে। এই প্রবচন শ্লোক লেখার পদ্ধতি ভারতে প্রাচীন; চাণক্যশ্লোক উদ্ভটশ্লোক ও সুভাষিত সংগ্রহ প্রভৃতি দুইচারি পংক্তির কবিতা। চীনা ও জাপানী কবিতা অনুকরণে লিখিত নহে।

৪ Karoly Kisfaludy (1788-1830): Hungarian author. His tragedies and more successful comedies marked the beginning of Hungarian drama. He also wrote the earliest short stories.

৫ Mor Jokai (1825-1904): The most widely read Hungarian author. From 1845 until his death he proved to be a popular and prolific writer, whose fame spread throughout Europe.

শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ করিলে কবি হাঙ্গেরি লইতে গেলেন যুগোস্লাবিয়া— পুরাতন সার্বিয়া মণ্টেনিগ্রো বসনিয়া প্রভৃতি দেশ লইয়া দক্ষিণীস্লাভদের এই নূতনরাজ্য প্রথম মহাযুদ্ধের পর গঠিত। যুগোস্লাবিয়ায় তখন রাজতন্ত্র চলিতেছে।

কবি মহলানবিশ-দম্পতির সহিত বেলগ্রেডে পৌঁছিলেন ১৫ নভেম্বর। বেলগ্রেড বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই দিন বক্তৃতা; বক্তৃতার টিকিট নিঃশেষে বিক্রীত হইয়া যায়। দ্বিতীয় দিনে লোক বাহিরের দরজা ভাঙিয়া বক্তৃতাগৃহে প্রবেশ করে ভারতীয় কবির বাণী শুনিবার জন্য, অথবা তাঁহাকে দেখিবার জন্য। কবি বলিয়াছেন এইবার এমন উৎসাহ আর কোথাও দেখেন নাই; কবির ইংরেজি ভাষণ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পাসকরা একজন সার্বিয়ান দোভাষীর কাজ করেন।

যুগোস্লাবিয়া হইতে কবি সদলে বুলগেরিয়ায় চলিলেন; এবার সঙ্গে মহলানবিশ-দম্পতি ছাড়া রথীন্দ্রনাথরাও আছেন— তাঁহারা বার্লিন হইতে বেলগ্রেডে আসিয়া কবির সহিত মিলিত হন।

কবিকে সোফিয়া রাজধানীতে আনিবার জন্য একদল সাহিত্যিক সীমান্ত পর্যন্ত গিয়াছিলেন; তার পর সোফিয়া আসিলে বিপুল জনতা তাঁহাকে স্বাগত করিল। হোটেলের সম্মুখে জনতা জয়ধ্বনি করিতে থাকে। সোফিয়ায় কবি একদিনই বক্তৃতা করেন ও তাঁহার বাংলা কবিতা আবৃত্তি করিয়া শোনান। বুলগেরিয়ান ভাষায় কবির কয়েকখানি বই ইতিপূর্বে অনূদিত হইয়াছিল, সম্প্রতি Stavrev নামে একজন লেখক কবির *Sadhana* অনুবাদ করিয়াছেন— ঐ গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন বুলগেরিয়ার সুসাহিত্যিক নিকোলাই রায়নভ[১]।

বুলগেরিয়া হইতে কবি ও তাঁহার সঙ্গীরা এবার আসিলেন বুখারেস্ট— রুমানিয়ার রাজধানী। এখানেও বিজয়যাত্রা। রুমানিয়ার রাজা ফার্দিনান্দ (১৯১৪-২৭) ও তাঁহার পরিবারের সকলের সহিত কবি একদিন মধ্যাহ্ন-ভোজন করিলেন। কবি বুখারেস্টে পাঁচ দিন ছিলেন, আদর-আপ্যায়নের অন্ত ছিল না।

বুখারেস্ট হইতে ইঁহারা কৃষ্ণসাগর (Black sea) তীরস্থ বন্দর কন্‌সটান্‌জায় আসিয়া জাহাজ ধরিলেন; এই জাহাজ বসপরাসতীরস্থ তুর্কীর পূর্বতন রাজধানী কনস্টান্টিনোপল বা ইস্তাম্বুলে আসিয়া থামিল; দুই দিন সেখানে জাহাজ রহিল— কবি খুবই ক্লান্ত বলিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন না; যদিও বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হইতে তাঁহার আমন্ত্রণ আসিয়াছিল। তাঁহার সঙ্গীরা ইস্তাম্বুল দেখিয়া আসিলেন।

এবার জাহাজ ভিড়িল গ্রীসের বন্দর পিরাসে (Piraeus)। বন্দরে নামিয়া মোটরযোগে আথেন্স গেলেন, আক্রোপলিস ও আথেন্সের বিশিষ্ট স্থানগুলির উপর চোখ বুলাইয়া আসিলেন; এই অল্প সময়ের মধ্যে গ্রীক সরকার হইতে প্রতিনিধিরা আসিয়া কবিকে Commander of the Order of the Redeemer উপাধি দান ও গ্রীক্ সাহিত্যিকরা সমবেত হইয়া কবিকে সংবর্ধনা করিলেন। দেশে তাড়াতাড়ি ফিরিতে হইবে বলিয়া আথেন্সে থাকা হইল না; তা ছাড়া গ্রীসের রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক, জেনারেল প্যাংগালোসের হামলা-গবর্মেণ্ট মাত্র দুই মাস অবসান হইয়াছে— শাসনসরকার নানা ভাবে বিপর্যস্ত।

১ Nikolay Raynov (born Sofia 1889): Bulgarian poet and philosopher. He travelled extensively throughout the middle East and India....He has a lasting imprint on the development of Bulgarian literature with his unusually powerful style and beauty of language. His output is enormous, and covers over 100 volumes of fiction, non-fiction and poetry, including *A History of World Art* in 12 volumes.

আথেন্স হইতে প্রশান্তচন্দ্র ও রানী দেবী কবির কাছ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন— তাঁহারা ইংলণ্ডে যাইবেন। এবারকার দীর্ঘ ভ্রমণপর্বে কবির সহায় ছিলেন প্রশান্তচন্দ্র ও তাঁহার পত্নী রানী দেবী। এই সময় 'অসুস্থদশায় রথীন্দ্রনাথ বন্দী ছিলেন বার্লিনে আরোগ্যশালায়'। কবি 'পথে ও পথের প্রান্তে'র ভূমিকায় রানী দেবী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন— "সমস্ত ভার বিনাবাক্যে কখনো বা প্রবল বাক্যব্যয়ে তিনিই নিয়েছিলেন নিজের হাতে। ভ্রমণকালীন ব্যবস্থার কাজে পুরুষ দুজনের অঘটন-ঘটানো অপটুতা সংশোধন করে চলতে হয়েছিল তাঁকে।· ·ঐ কয়েক মাসে রানীর অসামান্যতার পরিচয় পাওয়া গেছে; নতুন নতুন রেলের কামরায়, জাহাজের ক্যাবিনে, হোটেলের প্রকোষ্ঠে, বারবার ব্যবস্থা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নতুন নতুন লোকের সঙ্গে ব্যবহার করে চলেছি; তার নানাপ্রকার অভাবনীয় সমস্যাসমাধানের ভার তাঁর হাতে দিয়ে নির্লজ্জ নিশ্চিন্ত মনে অজস্র সেবা ও শুশ্রূষায় দিন কাটিয়েছিলাম। অবশেষে য়ুরোপে ভ্রমণের পালা শেষ করে যখন আমরা গ্রীসের বন্দর থেকে ঘরমুখো জাহাজে চড়ে বেরিয়ে পড়লুম তাঁরা রয়ে গেলেন বিদেশে।"

প্রত্যাবর্তনের পথে

পিরাস বন্দর থেকে জাহাজে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, তাঁদের কন্যা নন্দিনী এবং গৌরগোপাল ঘোষ। গৌরগোপালকে রথীন্দ্রনাথ য়ুরোপে লইয়া যান সমবায় প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে দেখাশুনা করার জন্য।

কন্‌সটান্‌জা বন্দর থেকে ইঁহারা যে রুমেনিয়ান জাহাজের যাত্রী তাহার গম্যস্থল মিশরের আলেকজেন্দ্রিয়া বন্দর। ২৭ নভেম্বর জাহাজ পৌঁছিল, কবি সোয়ারেস নামে এক ইতালীয় ব্যাংকারের অতিথি হন। সমুদ্রতীরে অতিসুন্দর বাগানবাড়ি, বাড়ির 'বারান্দাগুলো খুব দিলদরিয়া', সমস্ত দিন নির্জন অবকাশের অভাব নাই। মনটা গভীর বিশ্রামের মধ্যে আছে।

"পরদিন কায়রোর পালা। ঘণ্টা-চারেক গেল রেলগাড়িতে। এবার হোটেল।· ·খুব মস্ত খাঁচা। পৌঁছলেম মধ্যাহ্নে। বৈকালেই সেখানকার সর্বোত্তম আরবি কবির বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ।· ·সেখানে ইজিপ্টের সমস্ত রাষ্ট্রনায়কের দল উপস্থিত ছিলেন।· ·কানুন ও বেহালাযন্ত্রযোগে আরবি গান শোনা গেল— স্পষ্টই বোঝা গেল ভারতের সঙ্গে আরব-পারস্যের রাগরাগিনীর লেনদেন এক সময় খুবই চলেছিল।" · ·

"পাঁচটার সময় [মিশরীয়] পার্লামেন্ট বসবার সময়। আমার খাতিরে একঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমাকে জানানো হল এমন বিপর্যয় আর কখনো আর কারো জন্যে হতে পারত না।"

কায়রো ম্যুজিয়াম প্রাচীন মিশরের মূর্তি, মামি, বিচিত্র শিল্পকলার সম্ভারে পূর্ণ। কবি ২৯ নভেম্বর সেইটি দেখিতে যান। কবি লিখিতেছেন "এইসব কীর্তি দেখে মনে মনে ভাবি যে, বাইরে মানুষ সাড়ে তিন হাত কিন্তু ভিতরে সে কত প্রকাণ্ড।"— পথে ও পথের প্রান্তে, পত্র ৫।

মিশরের রাজা তখন ফুয়াদ— কবির সঙ্গে তাঁহার দেখা হয় একদিন। বিশ্বভারতীতে নানা জ্ঞানের আলোচনা-কেন্দ্র হইয়াছে জানিতে পারিয়া তিনি শান্তিনিকেতন গ্রন্থাগারে মূল্যবান আরবি-গ্রন্থরাজি প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়া

দিলেন। রাজা ফুয়াদ জ্ঞানপ্রিয় ছিলেন ; তাঁহার উদ্যোগে মিশরীয় বিশ্ববিদ্যালয় (পরে ফুয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়, বর্তমানে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়) স্থাপিত হইয়াছিল। ফুয়াদকে বলা যায় মিশরের প্রথম স্বাধীন রাজা।[১]

সুয়েজ বন্দরে আসিয়া কবি ভারতীয় ডাকে যে পত্রাদি পাইলেন, তাহার মধ্যে সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের মৃত্যুসংবাদ ছিল। সন্তোষচন্দ্র তাঁহার সুহৃৎ শ্রীশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র, রথীন্দ্রনাথের সহিত এণ্ট্রান্স পাস করিয়া আমেরিকায় যান ও প্রত্যাবর্তনের পর ১৯১০ হইতে ১৯২৬ পর্যন্ত এই সতেরো বৎসর অনন্যমনা হইয়া কবির ও প্রতিষ্ঠানের সেবা করিয়াছিলেন। এইরূপ কবিগতপ্রাণ ভক্ত আর কাহাকেও দেখিয়াছি বলিয়া তো মনে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথ এই সংবাদ পাইয়া রানী মহলানবিশকে বিলাতে লিখিতেছেন, · · "মনে পড়ছে এই সেইদিন এল আমেরিকার শিক্ষা শেষ ক'রে [১৯১০], শান্তিনিকেতনের কাজের মধ্যে এসে জায়গা করে নিলে।[২] · · সন্তোষ তার তরুণ হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধা নিয়ে এই কাজের ক্ষেত্রে তার সম্পূর্ণ জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।" আর-একদিনের পত্রে আছে— "সন্তোষের প্রতি আমার একটি যথার্থ নির্ভর ছিল কেননা আমার গৌরবে সে একান্ত গৌরব বোধ করত— আমার প্রতি কোনো আঘাত তার নিজের পক্ষে সবচেয়ে বড়ো আঘাত ছিল। যে-একজন ব্যক্তি বাইরের দিক থেকে শ্রদ্ধার দ্বারা আমাকে ডাক দিতে পারত সে রইল না।"[৩]

ভারতবর্ষের যতই নিকট আসিতেছেন, দেশের নানা কথা, বিশ্বভারতীর বিচিত্র সমস্যার কথা এখন মনে হইতেছে। যে অবাস্তব উত্তেজনার আবর্তে ও ক্ষণস্থায়ী সম্মান-সম্মোহনের ছায়ালোক মধ্যে এই কয়মাস বাস করিয়া আসিয়াছেন তাহাকে দূরে ফেলিয়া আবার বাস্তবজীবনের দৈনন্দিন সংগ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে! কলম্বো পৌঁছিবার পূর্বদিন রানী দেবীকে লিখিতেছেন—

"দূরের থেকে শান্তিনিকেতন আমার কাছে যতখানি, কাছের থেকে ঠিক ততখানি না হতেও পারে— কিন্তু তার থেকে কী প্রমাণ হয়। দূরের দৃষ্টিতে যে-সমগ্রতা আমরা এক ক'রে দেখতে পাই সেইটাই বড়ো দেখা, কাছের দৃষ্টিতে যে খুঁটিনাটিতে মন আবদ্ধ হয়ে সমষ্টিকে স্পষ্ট দেখতে দেয় না, সেইটেই আমাদের শক্তির অসম্পূর্ণতা। · · শান্তিনিকেতনের আকাশ ও অবকাশে পরিবেষ্টিত আমাদের যে জীবন তার মধ্যে সত্যই একটি সম্পূর্ণ রূপ আছে, যা কলকাতার সূত্রছিন্ন জীবনে নেই। · · শান্তিনিকেতনের ভিতর দিয়ে মোটের উপর আমি নিজেকে কী রকম ক'রে প্রকাশ করেছি সেইটের দ্বারাই প্রমাণ হয় শান্তিনিকেতন আমার পক্ষে কী— মাঝে মাঝে

১ মিশর নামমাত্র তুর্কী-সুলতানের সাম্রাজ্যভুক্ত দেশ ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ১৯১৪ ডিসেম্বর মাসে জাবমান তুর্কীদের প্রতি সহানুভূতিশীল সন্দেহে শাসক আব্বাস দ্বিতীয়কে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার খুল্লতাত হুসেন কামলকে 'সুলতান' পদে বরণ করে ; কিন্তু মিশর ব্রিটিশ প্রটেক্টরেট বা আশ্রিত রাজ্য হয়। ইহার কনিষ্ঠভ্রাতা আহম্মদ ফুয়াদ ১৯১৭ অক্টোবরে সুলতান হন। ১৯৩৬ এপ্রিলে ফুয়াদের মৃত্যু ঘটে। তৎপুত্র ফারুক (জন্ম ১৯২০) ১৯৩৬ হইতে ১৯৫২ পর্যন্ত রাজত্ব করেন ; ঐ বৎসর তিনি সিংহাসনচ্যুত হন। ১৯৫৩ সালে ১৮ জুন মিশর রিপাবলিক ঘোষিত হয়— Jamhueyat Misr। নাজীব প্রথম প্রেসিডেণ্ট। অতঃপর ১৯৫৬ জুন ২৩-এ গামেল আবদল নাসের প্রেসিডেণ্ট হন।

২ ১৯১০ সালে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কাজে সন্তোষচন্দ্র যোগ দেন— মাসিক ২০০৲ টাকা বেতন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত ঐ বেতনই ছিল। অধ্যাপন ছাত্রপরিচালন ক্রীড়াব্যবস্থাপন অতিথিপরিচর্যা সকল কর্মেই তিনি আমাদের সহযোগী ছিলেন। ১৯২৩ হইতে ১৯২৬ অক্টোবরে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি শ্রীনিকেতনের সহিত যুক্ত ছিলেন। শান্তিনিকেতনে তাঁহার গৃহের নিকটে শিক্ষাসত্রের প্রথম পত্তন হয়। পরে তাহা শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত হয়।

৩ পথে ও পথের প্রান্তে, পত্র ৩, ৪, ৬।

কী রকম নালিশ করেছি, ছটফট করেছি তার দ্বারা নয়। শুধু আমি নই, শান্তিনিকেতনে অনেকেই আপন আপন সাধ্যমতো একটি সুসংগতির মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করবার সুযোগ পেয়েছেন। এটা যে হয়েছে সে কেবল আমার জন্যেই হয়েছে এ কথা যদি বলি তাহলে অহংকারের মতো শুনতে হবে, কিন্তু মিথ্যা বলা হবে না। আমি নিজের ইচ্ছার দ্বারা বা কর্মপ্রণালীর দ্বারা কাউকে অত্যন্ত আঁট করে বাঁধি নে; তাতে ক'রে কোনো অসুবিধে হয় না তা বলি নে— আমি নিজেই তার জন্যে অনেক দুঃখ পেয়েছি কিন্তু তবু আমি মোটের উপর এইটে নিয়ে গৌরব করি।··স্বাধীনতা ও কর্মের সামঞ্জস্য-সংঘটিত এই যে ব্যবস্থা এটি আমার একটি সৃষ্টি— আমার নিজের স্বভাব থেকে এর উদ্ভব। আমি যখন বিদায় নেব, যখন থাকবে সংসদ, পরিষদ ও নিয়মাবলী, তখন এ জিনিসটিও থাকবে না। অনেক প্রতিবাদ ও অভিযোগের সঙ্গে লড়াই করে এতদিন একে বাঁচিয়ে রেখেছি— কিন্তু যারা বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ তারা একে বিশ্বাস করে না। এর পরে ইস্কুল-মাস্টারের ঝাঁক নিয়ে তারা অতি বিশুদ্ধ জ্যামিতিক নিয়মে চাক বাঁধবে— শান্তিনিকেতনের আকাশ ও প্রান্তর ও শালবীথিকা বিমর্ষ হয়ে তাই দেখবে ও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবে। তখন তাদের নালিশ কি কোনো কবির কাছে পৌঁছবে।"[১]

রবীন্দ্রনাথের ঋষিদৃষ্টি দূরকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল— তা না হইলে ঐ কয় পংক্তি তাঁহার লেখনী নিঃসৃত হইত না।

কবির সহযাত্রীদের একজন জারমান ভূতত্ত্ববিদ সস্ত্রীক ভারতে আসিতেছিলেন। এই পণ্ডিতের নাম Christoph Von Furor Heimondorf— ইনি হায়দরাবাদ ও দক্ষিণ-ভারতে দীর্ঘকাল বাস করিয়া অন্ত্যজ উপজাতিদের সম্বন্ধে গবেষণা করেন। পরযুগে গবেষণার জন্য হাইমেনডোর্ফ সুপরিচিত হন। একটি পত্রে এই দম্পতির কথা আলোচিত দেখি (পত্র ৭)। কবির মুখে বহুবার ইঁহাদের নিষ্ঠার কথা শুনিয়াছিলাম।

য়ুরোপে প্রায় সাত মাস সফর করিয়া কবি দেশে ফিরিলেন; কালের দিক হইতে দীর্ঘ না হইলে বৈচিত্র্যের দিক হইতে এবারকার সফরের সহিত পূর্বের তুলনা হয় না; কারণ এত বিচিত্র দেশের এত বিভিন্ন পরিবেশের সহিত ইতিপূর্বে তাঁহার পরিচয় হয় নাই। এত ভিন্নপ্রকৃতির লোকের সহিতও পূর্বে কখনো সাক্ষাৎ-কথাবার্তাও হয় নাই। কিন্তু এইবারকার 'অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে নিরন্তর যে তর্কবিতর্ক আলোচনা চলেছিল তারই বাক্যালাপের বেগ' 'পথে ও পথের প্রান্তে' নামে রানী দেবীকে লিখিত পত্রমধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু য়ুরোপ-ভ্রমণের বৃত্তান্ত 'যা কোথাও প্রকাশ পেল না তার দাম খুব বেশি।'

এইটি কবি লেখেন পত্রধারা রচনার বারো বৎসর পরে। কবির মনে ধারণা হয় যে তাঁহার এবারকার সফর সম্বন্ধে কোনো বিস্তারিত তথ্যপূর্ণ ইতিহাস রচিত হয় নাই। পনেরো বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস পূর্বে বহুদিনসঞ্চিত ক্ষুব্ধ অভিমান রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত এক পত্রমধ্যে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তিনি ৬ এপ্রিল ১৯৪১ লিখিতেছেন—"এই আশ্চর্য ইতিহাসটিকে লিপিবদ্ধ করবার জন্যে বাইরের সাক্ষ্যের প্রয়োজন আছে। মনে আছে এই সময়ে কৌতূহলবশত লর্ড সিংহ একবার আমার সঙ্গ নিয়েছিলেন (১৯২৬), জানি তিনি বলেছিলেন যদি তাঁর এ রকম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না ঘটত তা হলে সমস্ত ব্যাপারটাকে তিনি বিশ্বাস করতে পারতেন না। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময়ে রথীন্দ্রনাথ বার্লিনে আরোগ্যশালায় শয্যাগত ছিলেন এবং এই অভিজ্ঞতা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করবার শুভ অবসর হারিয়ে গেল। আর আমার অন্য স্বদেশবাসী যাঁরা সঙ্গে ছিলেন তাঁরাও উন্মুক্ত হৃদয়ের যে

১ পথে ও পথের প্রান্তে, পত্র ৮। [১৫ ডিসেম্বর ১৯২৬]।

অভ্যর্থনা য়ুরোপের সর্বত্র লাভ করেছিলেন তাও আর-কোনো ভারতবাসী এত অন্তরঙ্গভাবে করতে পারে নি।· · এই রকম নীরবতার জন্য কাউকে দোষ দেওয়া যায় না।· ·তাঁরা যদি য়ুরোপের রাস্তাঘাট থেকে আমার খ্যাতির ছিন্ন চিহ্নগুলো কুড়িয়ে নিয়ে না সংগ্রহ করে থাকেন তবে সেজন্য অনুশোচনা প্রকাশ করতে আমি নিরতিশয় লজ্জা বোধ করি।" পুনরায় ১০ এপ্রিল ১৯৪১-এ লিখিতেছেন "এই ভ্রমণ ব্যাপারে আমার সঙ্গী যাঁরা ছিলেন তাঁরা সাক্ষ্য দিতে পারতেন এবং দিলে সেটা শোভনও হত। আজ পর্যন্ত দেন নি।"[১]

কিন্তু কবিকে অল্পদিন পরে এ বিষয়ে যথার্থ কথা অবগত করায় তিনি তাঁহার ভ্রম সংশোধন করিয়া ২৪ জুন (মৃত্যুর দেড়মাস পূর্বে) রামানন্দবাবুকে লিখিলেন—

"আমার পাশ্চাত্য মহাদেশে ভ্রমণকালে যাঁরা আমার সঙ্গী ও সঙ্গিনী [প্রশান্তচন্দ্র ও তদীয় পত্নী রানী দেবী] ছিলেন, তাঁদের অসাবধানতা বা ঔদাসীন্যবশত সাধারণের অবগতির জন্য আমার ভ্রমণবৃত্তান্ত সংগ্রহ ও রক্ষা করেন নি— এমন একটি অন্যায় অপবাদ প্রবাসীতে আমার দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। এ আমার পক্ষে অত্যন্ত লজ্জা ও অনুতাপের বিষয়। আমি আবিষ্কার করলাম তাঁরা সমস্ত বিবরণ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করে বিশ্বভারতীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু যে-কোনো কারণে [কি কারণে ?] হোক এতদিন সেই বিস্তারিত রিপোর্ট অগোচরে রয়ে গেছে। আজ তার আবিষ্কার হওয়াতে আমি আমার ভ্রমণ-সহচরদের নিকটে আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এখন তাঁদের এই সংগৃহীত বিবরণের যথোচিত ব্যবহার হোতে কোনো বাধা ঘটবে না।"[২]

কিন্তু বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লিতে ১৯২৬ সালে যেসব তথ্য প্রকাশিত হয়, তাহা ছাড়া আর কোনো তথ্য এখনো প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।[৩]

নটরাজ

সাত মাস য়ুরোপের সফর শেষে দেশে ফিরিয়া দেখেন কোনো দিকে কোনো শান্তি নাই। এই কয় মাসের (১৯২৬ মে - ডিসেম্বর) মধ্যে ভারতে বহু ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনো ঐক্যের আভাস নাই। ১৯২১ হইতে ১৯২৫ পর্যন্ত কন্‌গ্রেসের সহিত যুক্তভাবে মুসলীমলীগের বার্ষিক সভার অধিবেশন হইয়া আসিতেছে। ১৯২৬ হইতে মুসলমানরা তাহাদের ব্যক্তিসত্তা রক্ষার জন্য পৃথকভাবেই লীগের কার্যকলাপ গঠন করিয়া তুলিতেছে। কংগ্রেসের নেতারা সাম্প্রদায়িক মিলনের জন্য কত কথা ভাবিতেছেন— কিন্তু মূঢ় হিন্দু-মুসলমান জনতার কাছে স্বাধীনতা লাভ হইতে স্বধর্ম রক্ষার ভাবনাই উগ্র।

গৌহাটিতে কন্‌গ্রেস অধিবেশন হইতেছে— সভাপতি শ্রীনিবাস আয়াঙ্গর ; নেতারা সকলেই সেখানে। ঠিক সেই সময়ে দিল্লিতে স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে এক মুসলমান যুবক রিভলবার দিয়া হত্যা করিল।[৪] যে দিল্লিতে পাঁচ বৎসর

১ প্রবাসী ১৩৪৮ জ্যৈষ্ঠ পৃ. ২২৯-৩০। পৃ. ২৩১।

২ প্রবাসী ১৩৪৮ শ্রাবণ পৃ. ৪০৭।

৩ অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র আমাকে লিখিয়াছিলেন যে এইসব তথ্যাদি তাঁহার পত্নী রানী দেবী পুস্তকাকারে লিখিবেন।

৪ রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্মবীর শ্রদ্ধানন্দ (১৩৩৪)।

পূর্বে (১৯২১) হিন্দু-মুসলমানের মিলন-প্রহসন জুমা মসজিদে নাটকীয় রূপ লইয়াছিল, যেখানে জমায়েত হিন্দু-মুসলমান স্বামীজির বাণীই স্তব্ধ হইয়া শুনিয়াছিল, আজ সেই দিল্লিতে তিনি মুসলমানের হস্তে নিহত হইলেন। স্বামীজি কিছুকাল হইতে হিন্দুসমাজকে সুদৃঢ় করিবার জন্য আর্যসমাজী পদ্ধতি 'শুদ্ধি' আন্দোলন প্রবর্তন করেন। হিন্দুসমাজের অচ্ছুত ও যাহারা হিন্দুসমাজের বাহিরে এবং মুসলমানসমাজের দ্বারে দাঁড়াইয়া— তাহাদের পুনরায় হিন্দু (আর্য)-সমাজ মধ্যে আনয়নের চেষ্টাকে বলে শুদ্ধি আন্দোলন। ইহা গোঁড়া মুসলমানের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নহে ; কারণ অন্যধর্ম হইতে আপনার ধর্মভুক্ত করিবার সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ছিল মুসলমান এবং খ্রীষ্টানদের। আর্যসমাজ এখন হইল তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। মুসলমান এই শরিকীয়ানায় বিশ্বাস করে না। তাহারই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হইল শ্রদ্ধানন্দের হত্যা।

স্বামীজির হত্যাসংবাদ বিদ্যুৎবেগে ভারতের সর্বত্র রাষ্ট্র হইয়া গেল। শান্তিনিকেতনবাসীরা এই সংবাদে খুবই মর্মাহত, কারণ কিছুকাল পূর্বে স্বামীজি আশ্রম পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, প্রত্যক্ষভাবে তাঁহাকে জানিবার সুযোগ তাহাদের হয়।

রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপ সফর করিয়া সাত দিন পূর্বে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়াছেন। শ্রদ্ধানন্দের হত্যার সংবাদে শান্তিনিকেতনের চতুষ্পার্শ্বস্থ বহুলোক সেদিন আশ্রমে কবিগুরুর নিকট উপদেশের জন্য উপস্থিত হইয়াছিল (১০ পৌষ ১৩৩৮ ॥ ২৫ ডিসেম্বর)। সমবেত জনমণ্ডলীর উদ্দেশে কবি যাহা বলিলেন তাহা হিন্দুসমাজের আত্মরক্ষা সম্বন্ধে চরম কথা। তিনি বলিলেন, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে ভেদবুদ্ধি জাগিয়াছে, ইহার জন্য হিন্দুসমাজ মুখ্যত দায়ী কি না, তাহা গভীরভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন। মুসলমানসমাজ ঈশ্বরের নামে সধর্মীদের ডাক দিলে সমস্ত মুসলমান সাড়া দেয়, সমবেত হয়, প্রতিকারের জন্য প্রাণ দেয়। কিন্তু হিন্দু যখন ডাকে, হিন্দু এসো— তখন কেহ আসে ? "যে দুর্বল সেই প্রবলকে প্রলুব্ধ ক'রে পাপের পথে টেনে আনে। পাপের প্রধান আশ্রয় দুর্বলের মধ্যে। অতএব যদি মুসলমান মারে, আমরা পড়ে পড়ে মার খাই— তবে জানব এ সম্ভব করেছে শুধু আমাদের দুর্বলতা।· · দুর্বলতা পুষে রেখে দিলে সেখানে অত্যাচার আপনিই আসে— কেউ বাধা দিতে পারবে না।"[১] এতদ্‌সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে শান্তভাবে সমস্যাসমাধান সম্বন্ধে চিন্তা করিতে বলিলেন।

ইংরেজের কূটরাজনীতি প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে এই অশান্তিতে ইন্ধন জোগাইতেছে। দেশের শিক্ষিত যুবজনের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্ফুরণের বা মনোবিকাশের সঙ্গে আনন্দের পথ চারিদিক হইতে অবরুদ্ধ। বাঙালি আজ নিরাশার চরম সীমায় উপনীত ; গবর্মেন্ট তাহাদের বেদনার উপর অপমানের বোঝা নিত্য যোগ করিয়া চলিয়াছে। অর্ডিনান্সের সাহায্যে কত যুবক যে বন্দী তাহার সঠিক খবর পর্যন্ত লোকে পায় না। অপরাধী বলিয়া তাহারা বন্দী — কিন্তু কী অপরাধে তাহারা আবদ্ধ তাহা পাবলিক জানে না। বিচারালয়ে তাহাদের অপরাধ প্রমাণ করিবার জন্য সকল শ্রেণীর লোকের অনুরোধ উপেক্ষিত হইতেছে।

এই ব্যাপার লইয়া রবীন্দ্রনাথ নীরব থাকিতে পারিলেন না ; তিনি সরকারের এই দমননীতির প্রতিবাদ করিয়া এক 'খোলা চিঠি' দৈনিক কাগজে প্রকাশ করিলেন (৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৭)—

"আজকালকার বিধিবিশারদদের মত অনুসারে যেসব দেশবাসীকে বিনাবিচারে শাস্তি দেওয়া হইতেছে, তাহারা কোনো অপরাধে অপরাধী ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহে। আইনের পথ সংক্ষেপ করাটা হইল—

১ স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, প্রবাসী ১৩৩৩ মাঘ, পৃ. ৫৪১-৪৩।

আহারের জন্য মাংস ঝলসাইবার প্রয়োজনে সারা বাড়িতে আগুন লাগানোর মতো— ইহা যথেচ্ছাচারের আদিম রূপ। আমাদের উপর যে এই অনাচার ঘটিতেছে, তাহাতে যে আমরা বিস্মিত হইতেছি— তাহা ব্রিটিশ শাসনের মর্যাদারই প্রমাণ। কারণ, আমরা জানি পাশ্চাত্যদেশে এমন শাসনসংস্থাও আছে, যেখানে আইনের বাধা না মানিয়া রাজভক্তি জোর করিয়া আদায় করিবার জন্য অন্ধভাবে লোকদিগকে শাস্তি দিতে দ্বিধাবোধ করে না। শারীরিক বলে দুর্বলদের উপর যে শাসকগোষ্ঠীর শাসন করিবার দুর্ভাগ্য ঘটিয়াছে, তাহাদের মন দিনে দিনে দুর্নীতির গভীর অতলে নিমজ্জিত হইয়া যাইতেছে। পর্যাপ্ত প্রতিরোধের অভাবে এই শাসকবর্গ শাসনকার্যকে সহজ করিবার জন্য প্রলুব্ধ হইয়া আপনাদের রচিত আইনের বাধা ভঙ্গ করে; ইহাতে যে কেবল তাহাদের প্রজাদের প্রতি অবিচার হইতেছে, তাহা নহে, আপনাদের উপর আরও অধিকতর জমিতেছে। ইংরেজ শাসকশ্রেণী তাহাদের বিবেকের প্রতীক বিচারালয়কে আংশিকভাবে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া, আমাদিগের পক্ষে ব্রিটিশজাতির মহত্তর স্বভাবের নিকট আবেদন করা ছাড়া গত্যন্তর নাই— আর তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে হয় যে অসীম দুঃখের ভিতর দিয়া সভ্যতার সার্থকতা প্রমাণ করিতে হয়— উচ্চ আদর্শের প্রদীপালোক যেন নির্বাপিত না হয়। সেইজন্যই কোনো অপরাধী যদি আইনের ফাঁকে মুক্ত হয় হউক— কিন্তু কোনো নিরপরাধ যাহাতে শাস্তি না পায় সেজন্য তাহার এতো সতর্ক।

"আমরা শাসকজাতির নিকট হইতে আত্মীয়-উচিত সহানুভূতি দাবি করিতে পারি না; অপর দিকে আমরা যখন প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উত্তেজিত হই, তখন আমাদের ক্লীবতা হাস্যকর হইয়া উঠে। আমাদের একমাত্র দাবি মানবতার দাবি; তাহা যদি অগ্রাহ্য হয়, তবে তাহা তাহাদিগকেই গোপনে আঘাত করিবে।" বলা বাহুল্য তস্করে কখনো ধর্মকথা শুনিতে চাহে না।

প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিক কর্মে জড়িত লোক ব্যতীত সাহিত্যিক বা লেখকগোষ্ঠীর লোকও ইংরেজসরকারের কোপাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিলেন। সরকার হইতে নিষিদ্ধ পুস্তকের যে তালিকা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়া প্রত্যেক গ্রন্থাগারে প্রেরিত হইয়াছিল, তালিকায় প্রদত্ত গ্রন্থ বা পুস্তিকা যেন গ্রন্থাগারে না-রাখা হয় ইহাই ছিল আদেশ।

আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি তখন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী' উপন্যাস বাংলাসরকার বাজেয়াপ্ত করেন। বই বাজেয়াপ্ত হইলে লোকের ক্ষতি হয়— এ কথা সত্য, অনেক সময় লেখককে কারাবরণাদি শাস্তিও ভোগ করিতে হয়। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এক পত্রে শরৎচন্দ্রকে লেখেন যে, লেখকরা উত্তেজক গ্রন্থ লিখিবেন অথচ তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে আশাও করিবেন যে, ইংরেজসরকার তাঁহাদের শাস্তি দিবে না, এরূপ মনোভাব স্বাস্থ্যকর নয়। কবির মতে লেখকের কর্তব্যের হিসাবে সেটা দোষের না হইতে পারে— কেননা লেখক যদি ইংরেজ-রাজকে গর্হিত মনে করেন, তাহা হইলে চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না। কিন্তু চুপ করিয়া না থাকার যে বিপদ আছে সেটুকু স্বীকার করাই চাই। ইংরেজ-রাজ ক্ষমা করিবেন এই জোরের উপরেই ইংরেজ-রাজকে আমরা নিন্দা করিব, সেটাতে পৌরুষ নাই। নিজের জোরে নয়, পরন্তু সেই পরের সহিষ্ণুতার জোরেই যদি আমরা বিদেশী রাজত্ব সম্বন্ধে যথেচ্ছ আচরণের সাহস দেখাইতে চাই তবে সেটা পৌরুষের বিড়ম্বনামাত্র— তাহাতে ইংরেজ-রাজের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়, নিজের প্রতি নয়। সকল দেশেই শাস্তিকে স্বীকার করিয়াই কলম চালাইতে হইতেছে, যে-কোনো দেশেই রাজশক্তিতে-প্রজাশক্তিতে সত্যকার বিরোধ ঘটিয়াছে— সেখানে এমনিই ঘটিয়াছে— রাজবিরুদ্ধতা আরামে নিরাপদে থাকিতে পারে না এই কথাটা নিঃসন্দেহে জানিয়াই ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বারবার দেশের কর্মীদের বলিয়াছেন শক্তিকে আঘাত করিলে তার প্রতিঘাত সহিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে— এই কারণেই সেই

আঘাতের মূল্য— আঘাতের গুরুত্ব লইয়া বিলাপ করিলে সেই আঘাতের মূল্য একেবারেই মাটি করিয়া দেওয়া হয়।[১]

মনের নানা কোঠায় নানা কাজ চলে; রাজনীতি আছে তারই একটি কোঠায়— কিন্তু মনের মণিকোঠায় আছে রসের উৎসটুকু। তাহারই প্রকাশ হইল 'নটীর পূজা'র অভিনয়ে।

মাঘোৎসবের পর কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর বাটিতে অভিনয়।[২] কবি স্বয়ং উপালির ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করিলেন; এই একমাত্র পুরুষ চরিত্র যাহা এই সময়ে নাটকখানিতে সংবলিত হয়; গত বৎসর শান্তিনিকেতনে জন্মোৎসবের সময় উপালি ছিল না।

নটীর পূজায় শ্রীমতীর ভূমিকায় বালিকা গৌরীর "সংযত ভক্তির শুভ্র শুচিতা অভিনয়টিকে এমন মর্মস্পর্শী করিয়া তুলিয়াছিল যে অনেকেই ভাবাশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই।"[৩]

বাংলাদেশের নৃত্যকলার ইতিহাসে এই ঘটনাটি বিশেষভাবে স্মরণীয়; কারণ ভদ্রবংশীয় মেয়েদের পক্ষে সর্বসাধারণের সমক্ষে নৃত্য এই প্রথম। এককালে গান ছিল সমাজের 'অন্ত্যজ' শ্রেণীর আশ্রয়ে, নৃত্যও ছিল সেখানে। ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণে ধর্মের নামে গান ভদ্রসমাজের নারীকণ্ঠে স্থান লাভ করিয়াছিল। আজ রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় আর্টের নামে সমাজজীবনে নৃত্যকলা মর্যাদা লাভ করিল। বাংলার সমাজজীবনে এই ঘটনাটি বহুদূর প্রসারী।

প্রাচীন ভারতে নটনটীরা ছিল ধনিক ও বণিকের চিত্তবিনোদনের পাত্রপাত্রী— সমাজে নিম্নস্তরের 'পতিত' তাহারা। সংস্কৃত নাটকে ইহাদের উল্লেখ আছে; কোষকার অমরসিংহ ইহাদের বলিয়াছেন— শৈলালী শৈলূষ জায়াজীব কৃশাশ্বী ও ভরত।[৪] হেমচন্দ্র তাহাদের আখ্যা দিয়াছেন—সর্ববেশী ভরতপুত্রক ধাত্রীপুত্র রঙ্গজীব রঙ্গাবতারক। স্মৃতিকাররা নটনটীদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত দিয়াছেন; মনু বলেন ইহারা ব্রাত্যায়া ক্ষত্রিয়াজ্জাত; পরাশর মুনিও ইহাদের নীচ বর্ণসঙ্কর পর্যায়ে শ্রেণীত করিয়াছেন।

মুসলমান যুগে নটনটীদের বৃত্তি যায়, দারিদ্র্যদোষে তাহাদের শত গুণও বিনষ্ট হয়; নট লেটুয়া নামে তাহারা উপজাতিভুক্ত হয়। যাহারা মুসলমান হইল, তাহাদের মধ্যে লোটো বা নোটোর গান চলিত থাকিয়া গেল। আমরা ভাষায় নটদের নিকট হইতে নাট্য, নাটক লইলাম— 'নাট্যাচার্য' বলিয়া অভিনেতাদের সম্মান দিলাম— কিন্তু নটনটীরা রহিয়া গেল অচ্ছুত, অপাংক্তেয়। আজ রবীন্দ্রনাথ সেই 'নটী'কে গৌরবোজ্জ্বলে সাহিত্য মধ্যে স্থান দিলেন। প্রসঙ্গত এইখানে একটি কথা বলি যে, গান্ধীজি প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন দ্বারা কর্মক্ষেত্রে ও রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নৃত্যকলা দ্বারা আনন্দক্ষেত্রে নারীর স্থান সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনার একটি ক্ষেত্র আছে।

কলিকাতা থাকাকালে ৩ ফেব্রুয়ারি কবি বিনাবিচারে অন্তরীণাবদ্ধ রাখার বিরুদ্ধে যে পত্র লেখেন তাহার কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি।

শান্তিনিকেতনে ফিরিয়াছেন। শ্রীনিকেতনের সাংবৎসরিক উৎসব (৬ ফেব্রুয়ারি), কবি সেদিনকার উৎসবে ভাষণ প্রসঙ্গে গ্রাম-উদ্যোগের কথাই বলেন; গ্রাম ধ্বংসমুখী, লোকে পল্লীগ্রাম পরিত্যাগ করিতেছে— এসব অতি সত্য

১ শরৎচন্দ্রকে লিখিত পত্র দ্রষ্টব্য। রবীন্দ্রসদনের ফাইলে মূল পত্রখানি আছে।

২ ১৪, ১৫, ১৭ মাঘ ১৩৩৩ ॥ ২৮, ২৯, ৩১ জানুয়ারি ১৯২৬।

৩ আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ মাঘ ১৩৩৩।

৪ দক্ষিণ-ভারতে ভরতমুনি এই নটপর্যায় পড়েন, এবং নটদের ভরতপুত্রক বলা হয়। ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র বিখ্যাত। দক্ষিণ-ভারতে শিবের নাম নটরাজ, নটেশ্বর।

পুরাতন কথা। কিন্তু কবির প্রশ্ন, এ সমস্যা দূর হইবে কিসে। তিনি বলিলেন বাহির হইতে গবর্মেণ্ট বা জনকল্যাণ সমিতি সমূহের আনুকূল্যের দ্বারা দুর্গতি দূর হইবে না। "বাইরের থেকে একটা একটা অভাবের তালিকা প্রস্তুত করে দেখা সমস্যাকে খণ্ড ক'রে দেখা। যে-মূলের থেকে তারা সকল অভাব শাখায়-প্রশাখায় ছড়াচ্ছে, সে হচ্ছে প্রতিহত চিত্তধারার শুষ্কতা। মানুষের চিত্ত যেখানে সবল থাকে সেখানে সে আপনার নিহিতার্থকে আপন শক্তির যোগে উদ্বোধিত করে।··এতেই তার সকলের চেয়ে বড়ো আনন্দ, কেননা মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো পরিচয় হচ্ছে, সে স্বষ্টিকর্তা।" মানুষের মনের মধ্যে বিদ্রোহের অগ্নি না জ্বালাইতে পারিলে, তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লইয়া টানাটানি করিলে সে নড়িবে না; আবার সেই দেহকে পুষ্ট করিবার জন্য ব্যবহারিক জগতের বিজ্ঞানকে তার সহায়রূপেও গ্রহণ করিতে হইবে। এই দুইটি যুগপৎ চাললেই মানুষের মন মুক্ত ও দেহ সবল হইবে।[১]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনটা কাব্যও নহে, বিশ্বভারতীর কার্যও নহে। সংসারের আর-পাঁচজন সাধারণ লোকের মতই তাঁহাকে অর্থকৃচ্ছ্রতা ও সাংসারিক দুঃখতাপ সহিতে হয়। মন নানা কারণে ভিতরে ভিতরে উদ্‌বিগ্ন; জমিদারি বন্যায় অন্নাভাবে পীড়িত— সেখান হইতে ধনাগমের পথ আপাতত রুদ্ধ। সাংসারিক দুশ্চিন্তা কনিষ্ঠা কন্যাকে লইয়া; নানা কারণে তাঁহার পারিবারিক জীবন সুখের হয় নাই। অথচ কবি নিরুপায়। তিনি জানেন "দুঃখভোগ সকলের ভাগেই আছে। মনকে সেই দুঃখের উপর নিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। আপনার মধ্যে যে মানুষটা দুঃখ পায় তাকে দূরে বাইরে সরিয়ে রাখার অভ্যাস করতে হয়।"[২] মনের এই সাধনা কবি চিরদিন করিয়াছিলেন; বাহিরের আঘাত প্রতিঘাত অপরিহার্য দুঃখ বেদনার ঊর্ধ্বে তিনি আপনাকে উত্তীর্ণ করিতে পারিতেন; তাই দেখি সমস্ত উত্তেজনা অন্তর্বেদনা কোথায় অন্তর্হিত হইল— যেমন মনের গহনে কাব্যের রসনির্ঝর উছলিয়া উঠিল।

নটীর পূজার অভিনয় ও উহার নৃত্যলীলা কবিচিত্তে নূতন ভাবোদয় আনিল। নটীর নৃত্যগীত-সমন্বিত সাধনা মনকে নৃত্যের গভীর তত্ত্বলোকে উপনীত করিল। কবিমানসে নটী তাহার লৌকিক হীনসজ্জা ত্যাগ করিয়া মহীয়সী সাধিকা। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কবির প্রশ্ন— নটীর পূজার অর্ঘ্য কাহার উদ্দেশ্যে নিবেদিত? কিসের জন্য সাধনা তাহার? নটীর পূজা তো একটা অবচ্ছিন্নতার (abstraction) নিকট আত্মাহুতি। নটীর সাধনা তো পরিপূর্ণ জীবনানন্দের সাধনা নহে। নেতিনেতির শেষ কোথায়? জীবনশিল্পী কবির কাছে এই সাধনা অবচ্ছিন্ন নঙাত্মক আনন্দহীন— সর্বশূন্যতার প্রতীকতলে আত্মোৎসর্জন কখনই সৌন্দর্যসাধক কবির পরম কাম্য হইতে পারে না। পূর্ণস্বরূপের বিচিত্র ঐশ্বর্যকে সর্ব ইন্দ্রিয় দিয়া, মন প্রাণ আত্মা দিয়া সম্ভোগের মহোৎসবে যে আত্মসমর্পণ তাহাই কবির ধর্মে মুক্তি— উহাই জীবনের সাধ্য ও সাধনা। বন্ধনকে স্বীকার করিয়াই কবির মুক্তি। তাই কবির পূজা গিয়া পৌঁছিল নটের গুরু নটরাজের সৌন্দর্যলীলানিকেতনের উৎসববেদিতলে। নটীর পূজার পর নটরাজের ধ্যান আরম্ভ। ইহাই হইল কবির নবচেতনা, নবতম সাধনা।

কবি এবার 'নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা'র জন্য নূতন স্তব রচিলেন—

নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ, ঘুচাও সকল বন্ধ হে।
সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও মুক্ত সুরের ছন্দ হে।

নটরাজ দক্ষিণ-ভারতের নৃত্যময় শিবকল্পনা।

১ শ্রীনিকেতন ··· কথিত বক্তৃতার সারমর্ম— বক্তা কর্তৃক লিখিত, প্রবাসী ১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ১৫৮-৫৯।
২ চিঠিপত্র ৪, পত্র ৫৪; ১১ মার্চ ১৯২৭ ॥ ২৭ ফাল্গুন ১৩৩৩।

দক্ষিণ-ভারতে শিল্পীরা নটরাজ বা নটেশ্বরের রূপ কতভাবে যে কল্পনা করিয়াছেন, তাহা গণনাতীত। শিবের তাণ্ডবনৃত্যের বর্ণনা লৌকিক কাব্যে সুপরিচিত। কিন্তু নটরাজের কোনো ভাবময় ব্যাখ্যা বাংলা কাব্যসাহিত্যে ইতিপূর্বে হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না।[১] রবীন্দ্রনাথ নটরাজ সম্বন্ধে যে বিরাট কল্পনাকে কাব্যে রূপদান করিলেন, তাহার প্রেরণা দক্ষিণী নটরাজের মূর্তি ও দক্ষিণী ভারতনাট্যম্ নৃত্য দেখিয়া উদ্‌বোধিত হইয়াছিল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। নটীর পূজার নৃত্যে মণিপুরী পেলব নৃত্যছন্দ ও নটরাজের মধ্যে ভারতনাট্যমের রুদ্রশিবের পৌরুষনৃত্য মূর্তি লইয়াছে। মাধুর্যে ও বীর্যে উভয়ই সুন্দর।

রবীন্দ্রনাথ রুদ্রকে আহ্বান করিয়াছেন নানা সময়ে গদ্যে পদ্যে ছন্দে সুরে। প্রকৃতির মধ্যে রুদ্র ও শান্ত, ভীষণ ও মধুরের লীলাতরঙ্গ তাঁহার সাহিত্যের মধ্যে নানা স্থানে লিখিতভাবে প্রকাশ পাইয়াছে; এই ভাবগুলিকে বিশ্লেষিত ও সমন্বিত করিয়া একটি ভালো রকমের গবেষণার কার্য হইতে পারে। যাহা-কিছু আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধ, তাহারা জীবনে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত— যেমন যুক্ত গ্রীষ্ম-বর্ষা, শীত-বসন্ত— যেমন যুক্ত জন্ম-মৃত্যু, যেমন যুক্ত রূপ-অরূপ— কেহ কাহারও বিরুদ্ধ নহে— এক অপরের পরিপূরক— পরস্পরের মধ্যে 'আবির্ভাব ও অন্তর্ধানের পর্যায় চলমান। এই সমন্বয়বাদ রবীন্দ্রনাথের জীবন তথা সাহিত্যের মর্মকথা, ইহাই রবীন্দ্রদর্শন।

"নটরাজের তাণ্ডবে তাঁহার এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হয়ে প্রকাশ পায়, তাঁর অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস-উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়। 'নটরাজ' পালাগানের এই মর্ম।"

এই সময় হইতে কবির একশ্রেণীর গান বিশেষভাবে নৃত্যাশ্রয়ী হয়। আর নৃত্য ও সংগীত-অপেক্ষী হয়। সেই দিক হইতে নটরাজ (১৩৩৩ ফাল্গুন) রচনা বাংলাসাহিত্যে বিশেষ ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হইবে।

একজন তত্ত্ববিদরসজ্ঞ শিল্পশাস্ত্রী নটরাজের নৃত্যমূর্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমরা উদ্ধৃত করিতেছি—

We behold the solemn, terrible yet marvelously reposeful dance of Siva Natesvara, the divine creator and destroyer of the Universe, whose operations in time, ...are but the phenomenal reflex of a supernal state of timeless peace. There is no dramatic exhibition of the deity's divine frenzy, only a slow musicality of gesture: an overwhelming state of permanently supreme serenity, which is beyond the fluctuations of time and would easily baffle any attempt to do it.[২]

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতত্ত্বের মূলে আছে এই নৃত্যছন্দ— a slow musicality of gesture। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অণুপরমাণুর কল্পনা এই ছন্দেরই আঙ্গিক রূপ। 'বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে কাঁপে নৃত্যের ছায়া'। পুনরায় বলিতেছেন 'নৃত্যের বশে সুন্দর হল বিদ্রোহী পরমাণু, পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে বাজিল চন্দ্র ভানু।' রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে 'বিশ্বনৃত্য' কল্পনা ও নানাস্থলে নটরাজের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আলোচনাগুলি এখানে স্মরণীয়। নটরাজ কাব্যের উদ্বোধন

১ অরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়, বঙ্গবাণী ১৩৩৩ কার্তিক সংখ্যায় 'নটরাজ' নামে একটি কবিতা লেখেন। দ্র. তৎপ্রণীত আকাশগঙ্গা পৃ. ১০০-১০৪। এই লেখক মনে করেন যে তাঁহার রচিত 'নটরাজ', রবীন্দ্রনাথের নটরাজের পূর্বে রচনা; কারণ রবীন্দ্রনাথের নটরাজ লিখিত হয় ১৩৩৩ সালের ফাল্গুন মাসে ও বিচিত্রায় ১৩৩৪ আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

২ Heimrich Zimmer, *The Art of Indian Asia*, vol I. p. 298. এলুরের রামেশ্বর গুহাস্থিত নটরাজের মূর্তি সম্বন্ধে এই বক্তব্যটি হইলেও সাধারণভাবে নটরাজের বর্ণনা।

কবিতার মধ্যে মুল কথাটি বলা হইয়াছে ও তাহারই পরের 'গান' ও 'মুক্তিতত্ত্ব' সম্বন্ধে কবিতা উদ্‌বোধনের পরিপূরক ও এক হিসাবে ব্যাখ্যান।

কবি 'মুক্তির প্রয়াসী', নাচের অঙ্গনে মুক্তিমন্ত্রের প্রার্থী—

তোমার তাণ্ডবতালে কর্মের বন্ধনগ্রন্থিগুলি
ছন্দোবেগে স্পন্দমান পাকে পাকে সদ্য যাবে খুলি।

কাব্যখণ্ডের ভূমিকায় যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই কবিতায় রূপায়িত করিলেন—

যে-নটরাজ নাচের খেলায়
ভিতরকে তার বাইরে ফেলায়,
কবির বাণী, অবাক মানি
তারি নাচের প্রসাদ যাচে।
শুন্‌বি রে আয়, কবির কাছে—
তরুর মুক্তি ফুলের নাচে,
নদীর মুক্তি আত্মহারা
নৃত্যধারার তালে তালে।

এই মুক্তির আনন্দ সদাই ভাব হইতে রূপের মধ্যে নিয়ত চলমান— 'ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ, রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।' প্রকৃতির মধ্যে বন্ধন ও মুক্তি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত; সমস্ত জড় ও প্রাণের মধ্যে কোথাও ছেদ নাই। পুরাতন ও জীর্ণকে সে বহন করিয়া চলে না, নূতনকেও অমর করে না। মুক্তি ও বন্ধন অলখসূত্রে বাঁধা—

প্রাণের মুক্তি মৃত্যুরথে নূতন প্রাণের যাত্রাপথে,
জ্ঞানের মুক্তি সত্য-সুতার নিত্য বোনা চিন্তাজালে।

এই দৃষ্টির আলোকে কবির চক্ষে সকল ঋতুগুলির প্রবহমানতা বা পুনরাবর্তন স্পষ্টতর হইতেছে; এতাবৎকাল পৃথক পৃথক ঋতুসম্বন্ধে কবি কত কবিতা কত গান কত ভাষণ দিয়াছেন! বর্ষামঙ্গল শারদোৎসব বসন্তোৎসবে বিভিন্ন ঋতুর বন্দনা-গান করিয়াছেন; নাটকেও রূপায়িত হইয়াছে— শারদোৎসব অচলায়তন রাজা ফাল্গুনীর মধ্যে। 'নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা'য় সকল ঋতুকে একটি নিরবচ্ছিন্ন স্থিতি-গতি, বন্ধন-মুক্তির পারম্পর্যর মধ্যে সমন্বিত করিয়া মুক্তিতত্ত্বরূপে কবি দেখিতেছেন। এইসব ঋতুউৎসবে পাত্র-পাত্রী বা নট-নটীর মধ্যে আছে শিশুতরুর দল। ফাল্গুনীর সময় হইতে নানা ফুল ফল নদী গিরির মাধ্যমে কবি গান গাহিয়াছেন। 'বসন্তে' ঋতুপূজার বিকাশ ও 'নটরাজে' তাহার পূর্ণতা। ঋতুরঙ্গশালার বৃক্ষবন্দনা অচিরকালের মধ্যে পরিপূর্ণ 'বনবাণী'রূপে উদ্‌গীত হইবে।[১]

রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের নানা তত্ত্বকে কিভাবে কাব্যরসে রূপায়িত করিয়াছেন, তাহা গভীরভাবে আলোচনার একটি বিষয়। যৌবনে লিখিত 'সমুদ্রের প্রতি' 'বসুন্ধরা' প্রভৃতিতে যে তত্ত্ব নিহিত তাহা পার-ডারউইনী পর্বের বিশ্বতত্ত্ব। বলাকা কাব্যগুচ্ছে আর-এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক সত্যের রূপ দেখি। নটরাজের মধ্যে পাই আধুনিক পদার্থবিদ্যার বিজ্ঞানসম্মত জড়বাদ ও সৃষ্টিবাদের আভাস।

১ তু. শৈশবসংগীতের কয়েকটি কবিতা; সেখানে তরু লতা পুষ্পের কাহিনী ও সংলাপ দেখা যায়।

দোলপূর্ণিমার পরদিন (১৩৩৩ চৈত্র ৪ ॥ মার্চ ১৮) শান্তিনিকেতনে 'নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা'[১] অভিনীত হয়। জনৈকা সূক্ষ্মদর্শী লিখিতেছেন, "নৃত্যকে যেন দেবীরূপে নূতন আলোকে মণ্ডিত দেখলাম। ··এত রূপ, এমন পবিত্র নীরন্ধ্র সৌরভ, এমন হৃদয়-আলোকরা বিমল জ্যোতি কোথায় কোন গভীর গহ্বরে আড়ালে পড়েছিল।"[২]

নটরাজের ৩০টি কবিতা ও গান ১৩৩৩ ফাল্গুন ১৪ হইতে ৩ চৈত্রের মধ্যে রচিত। কবিমানসে ঠিক যে ঋতুপর্যায় অনুসারে গানের সুর জলিয়াছিল, তাহা নহে— 'শীতের বিদায়' ও 'আসন্নশীত' কবিতার খসড়া করেন চৈত্র মাসে। আমরা যে 'নটরাজ' বনবাণী ও রবীন্দ্র-রচনাবলীর মধ্যে মুদ্রিত পাই তাহাতে ১৩৩৪ সালে রচিত কয়েকটি গান আছে।[৩]

নটরাজের অভিনয়ের পর কবির মন ঋতুরঙ্গশালার নটনটী বা তরুলতাদের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। যাহারা ছিল সমষ্টির মধ্যে নামহীন 'বৃক্ষ' রূপে বর্ণিত, তাহারা আপন-আপন নামের মান পাইল নব নব কবিতায়। 'নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা'র উদ্‌বোধন কবিতায় (২ চৈত্র ১৩৩৩) কবি বলিয়াছিলেন—

যে-নৃত্যের অশান্ত স্পন্দনে
ধূলিবন্দিশালা হতে মুক্তি পায় নবশস্পদল, · ·
যে-নৃত্যের আন্দোলনে মরুর পঞ্জরে কম্প আনে,
ক্ষুব্ধ হয় শুষ্কতার সজ্জাহীন লজ্জাহীন সাদা,
উচ্ছিন্ন করিতে চায় জড়ত্বের রুদ্ধবাক্ বাধা,
বন্ধ্যাতার অন্ধ দুঃশাসন ; শ্যামলের সাধনাতে
দীক্ষা ভিক্ষা করে মরু তব পায়ে—

এই শ্যামলের স্তরে বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে তরুর স্থান কোথায় তাহা বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে কবি ব্যক্ত করেন। 'বৃক্ষবন্দনা' (৯ই চৈত্র ১৩৩৩) দিয়া 'বনবাণী'র সূত্রপাত। অতঃপর বিশেষ তরুর নামে অর্ঘ্য রচিয়া চলিলেন ; যে-তরু যে-পুষ্পকে কোনোদিন কোনো কবি প্রশস্তি রচিবার উপযুক্ত মনে করেন নাই, সেইসব পথপার্শ্বস্থ অবহেলিত অকুলীন পুষ্পদের কবি আপন কাব্যডালিতে ভরিয়া তুলিলেন।

কিন্তু কবির সকল রচনা সকল শ্রেণীর সাহিত্যিকের ভালো লাগে না, যুগ পরিবর্তন হইতেছে। এমন কথাও সাহিত্যে শোনা যাইতেছে 'পথ রুধি' রবীন্দ্রনাথ বসিয়া আছেন। নানাদিক হইতে নানা কথা কানে আসে— 'মনে ব্যক্তিগত ক্ষোভ জন্মে' ; কিন্তু তখনই 'তার তীব্রতাটা ভিতরে ভিতরে' তাঁর 'পক্ষে লজ্জার কারণ হয়ে ওঠে।' কবি এক পত্রে লিখিতেছেন, "ভালো করে আত্মবিশ্লেষণ করলে একটা জিনিস আমার নজরে পড়ে, সে হচ্ছে আমার

১ ১৩৩৩ চৈত্র ৩। ঋতুরঙ্গশালা। শান্তিনিকেতনে প্রথম অভিনয়।

১৩৩৪ আষাঢ়। বিচিত্রা, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৩৩৪ আষাঢ়, পৃ. ৯-৭০। নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা (সচিত্র : নন্দলাল বসু কৃত)।

১৩৩৪ অগ্রহায়ণ ২২। জোড়াসাঁকোর বাটিতে 'ঋতুরঙ্গ' নামে অভিনীত। ৪৪ পৃষ্ঠা পুস্তিকা।

১৩৩৪ পৌষ। মাসিক বসুমতী, 'ঋতুরঙ্গ' নামে প্রকাশিত।

১৩৩৮ আশ্বিন। বনবাণী, পৃ. ৪৫-১৩২। নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা বিচিত্রায় মুদ্রিত 'নটরাজ' ও মাসিক বসুমতীতে 'ঋতুরঙ্গ' একত্রীভূত ও পুনঃসজ্জিত হইয়া নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা নামে সংকলিত হয়। দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫, পৃ. ১৯১-২৪৮। দ্র. গ্রন্থপরিচয় অংশ।

২ সাহানা দেবী, নৃত্য ; বিচিত্রা ১৩৩৪ আশ্বিন, পৃ. ৬৬৫-৬৯।

৩ বনবাণী ১৩৫৩ সং। গ্রন্থপরিচয় পৃ. ১৭৭-৭৮ দ্রষ্টব্য।

কর্তব্য-বুদ্ধিটা আসলে সৌন্দর্যবোধ। যখন বাইরের সঙ্গে মন কলহ করতে উদ্যত হয় তখন সেই ইতরতায় আমি নিজেকে অসুন্দর দেখি। তাতেই কষ্ট পাই।"[১]

সমসাময়িক সাহিত্যের অতি-প্রগতিবাদকে নিন্দা করিয়া এই সময়ে শ্রীসজনীকান্ত দাস রবীন্দ্রনাথকে যে পত্র লেখেন ও কবি ২৫ ফাল্গুন তাহার যে উত্তর দেন, 'সাহিত্যে দ্বন্দ্ব' পরিচ্ছেদে তাহার আলোচনা আমরা করিব। কবির মন এখন নটরাজের মধ্যে ডুবিয়া আছে— তবুও বোধ হয় কোনো পত্রিকার তাগিদে 'দীপিকা' (২৫ ফাল্গুন ১৩৩৩)[২] কবিতাটি লেখেন। আর ১১ চৈত্র 'লেখা'[৩] নামে কবিতাটি বোধ হয় সমসাময়িক তরুণ সাহিত্যিকদের 'পথরুধি রবীন্দ্রঠাকুর'-এর উত্তর—

সব লেখা লুপ্ত হয়, বারম্বার লিখিবার তরে
নূতন কালের বর্ণে। জীর্ণ তোর অক্ষরে অক্ষরে
কেন পট রেখেছিস পূর্ণ করি। হয়েছে সময়
নবীনের তুলিকারে পথ ছেড়ে দিতে। হ'ক লয়
সমাপ্তি রেখাদুর্গ। নব লেখা আসি দর্পভরে
তার ভগ্নস্তূপরাশি বিকর্ণ করিয়া দূরান্তরে
উন্মুক্ত করুক পথ, স্থাবরের সীমা করি জয়,
নবীনের রথযাত্রা লাগি।. .
কালের মন্দিরে পূজাঘরে
যুগবিজয়ার দিনে পূজার্চনা সাঙ্গ হলে পরে
যায় প্রতিমার দিন। —পরিশেষ

১৩৩৩ ফাল্গুন সংখ্যার 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকায় কবি একটি কবিতা দেন— "পুরানো জানিয়া চেয়ো না আমারে আধেক আঁখির কোণে অলস অন্যমনে"— গীতবিতান, প্রেমপর্যায়, পৃ. ৩০২। এই কবিতা-গানে কি এই সময়ের মনোভাব প্রকাশ পাইতেছে না? "আপনারে আমি দিতে আসি যেই জেনো জেনো সেই শুভক্ষণে জীর্ণ কিছু নেই কিছু নেই, ফেলে দিই পুরাতনে।"[৪]

১ পথে ও পথের প্রান্তে, পত্র ১১। ১৮ ফাল্গুন ১৩৩৩॥ ২ মার্চ।
২ পরিশেষ ১। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫, পৃ. ১৮৬। দীপিকা পত্রিকার জন্য।
৩ লেখা, ১১ চৈত্র ১৩৩৩ [২৫ মার্চ ১৯২৭]। পরিশেষ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫, পৃ. ১৮৭-৮৮। 'লেখা' পত্রিকার জন্য।
৪ ১৪ ফাল্গুন ১৩৩৩- ১৪ বৈশাখ ১৩৩৪ (মার্চ-এপ্রিল ১৯২৭) রচিত কবিতা ও গীতগুচ্ছের তালিকা—

১৩৩৩ ১৪ ফাল্গুন শেষ মিনতি (নটরাজ)
১৫ ফাল্গুন লীলা
১৬ ফাল্গুন শরতের ধ্যান
১৭ ফাল্গুন হায় হেমন্তলক্ষ্মী
১৮ ফাল্গুন স্তব। আবাহন
১৯ ফাল্গুন বিলাপ (পুনর্লিখিত ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ। অহৈতুক)
২০ ফাল্গুন বৈশাখ-আবাহন। মাধুরীর ধ্যান। প্রার্থনা
২১ ফাল্গুন নৃত্য (পুনর্লিখিত ২৫ ফাল্গুন)। শিউলি ফুল (পুনর্লিখিত ২৫ ফাল্গুন)

ভরতপুরে ও পরে

শান্তিনিকেতনের নিরবচ্ছিন্ন জীবনধারা হঠাৎ নাড়া পড়িল। য়ুরোপ হইতে প্রত্যাবর্তনের কিছুকাল পরে রাজপুতানার অন্যতম দেশীয় রাজ্য ভরতপুরের তরুণ মহারাজা কিষণসিংহের নিকট হইতে তাঁহার দূত আসেন কবিকে হিন্দী সাহিত্যসম্মেলনের সভাপতিত্ব করিবার অনুরোধ লইয়া। প্রথমে স্থির হয় ফেব্রুয়ারি মাসে সম্মেলন বসিবে; পরে স্থির হয় মার্চ মাসের শেষে। দারুণ গরমে যাইবেন কিনা তাহা স্থির করিতে পারেন নাই— শেষকালে যাওয়াই স্থির হইল।

এই দারুণ গ্রীষ্মে এই দীর্ঘপথ বাহিয়া ভরতপুর কেন যাইতেছেন, সে-সম্বন্ধে এক পত্রে কবি লিখিতেছেন (২৮ মার্চ ১৯২৭) — "আজ (১৪ চৈত্র ১৩৩৩) রাত্রে এগারোটার গাড়িতে আমি ভরতপুর রওনা হচ্ছি।· · বিশ্বভারতীর দাবি, দয়ামায়া নেই। অথচ বিশ্বভারতী জিনিসটা যে কোন্ শূন্যে আছে, তার চিহ্নও দেখতে পাচ্ছিনে। যে-মানুষদের নিয়ে কাজ করছি তাদের নিষ্ঠার মধ্যে নেই— তাদের স্বপ্নের মধ্যেও আছে কিনা সন্দেহ। বস্তুত বিশ্বভারতীর মর্মকথাটা কোনো একটা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দানা বাঁধ্বার মতো পদার্থ নয়— এখন ওটা নানা দেশে নানা লোকের হৃদয়ের মধ্যে কাজ করছে। · · লোকে যে সহায়তা করছে না তার কারণ এর মধ্যে তা'রা সত্যের মূর্তি দেখতে পাচ্ছে না। · · এখন সত্য উপলব্ধির আনন্দ আমাদের কাছ থেকে দূরে, অথচ তার উপকরণের দীনতা প্রতিদিনই আমাদের পীড়ন করছে। দুঃখের ভার প্রায় একলা আমারই মাথায়।

"মানুষকে নিকটে টানবার শক্তি আমার নেই, কারণ আমি একেবারে অন্তরের দিক থেকে একঘরে। যারা আমার কাছে আসতেও পারত, তারা আমাকে পেলে আসত— কিন্তু আমার নিজের একটা সামাজিকতার অভাব-

১৩৩৩ ২৫ ফাল্গুন	দীপিকা (পরিশেষ)। দীপালি (নটরাজ, পুনর্লিখিত ২৮ ফাল্গুন)
২৭ ফাল্গুন	চঞ্চল
২৮ ফাল্গুন	বসন্ত। দোল
২৯ ফাল্গুন	শেষের রঙ। শীত। হেমন্ত
১ চৈত্র	মুক্তিতত্ত্ব (খসড়া)। বৈশাখ। ব্যঞ্জনা। বর্ষামঙ্গল। শরৎ (নটরাজ)
২ চৈত্র	যায় রে শ্রাবণকবি। শান্তি। বসন্তের বিদায়। উদ্বোধন (খসড়া)
৩ চৈত্র	মনের মানুষ। শীতের বিদায় (পুনর্লিখিত ৯ চৈত্র)
৯ চৈত্র	বৃক্ষবন্দনা (বনবাণী)
১১ চৈত্র	লেখা (পরিশেষ)
১৭ চৈত্র	নীলমণিলতা (বনবাণী)
— চৈত্র	মধুমঞ্জরী। কুটীরবাসী (বনবাণী)
৩০ চৈত্র	বর্ষশেষ (পরিশেষ)
১৩৩৪ ১ বৈশাখ	হাসির পাথেয় (বনবাণী)।
৭ বৈশাখ	আসন্ন শীত (নটরাজ)। বিচিত্রা (পরিশেষ)
৮ বৈশাখ	প্রথম পাতায় (পরিশেষ)
১০ বৈশাখ	কুরূচি (বনবাণী)
— বৈশাখ	গৃহলক্ষ্মী (পরিশেষ)।

বশতই তারা আমাকে পায় না— শুধু কাজটা পায়, সেটা বিশুদ্ধ বোঝা হয়ে ওঠে। তার থেকে সকলেই একে একে পালিয়ে যায়, শুধু আমারই পালাবার পথ বন্ধ।”[১] এই পত্রখানি পাঠ করিয়া কবির যৌবনে লিখিত ‘রাহুর প্রেমে’র কথা মনে পড়ে।

বোলপুর দিয়া যে মেলগাড়ি দিল্লি যায়, সেই রাতের গাড়ি কবি পছন্দ করিলেন। এবার কবির সঙ্গী হইলেন জীবনী-লেখক[২] ও কবির পুরাতন সেবক নীলমণি।

আগ্রা স্টেশনে নামিয়া ভরতপুর রাজার এক প্রাসাদে কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া মোটরযোগে ধূসরপথে রাজধানী রওনা হওয়া গেল। ভরতপুরে বিরাট সভাক্ষেত্র— তাহার পাশে একটি বাড়িতে একধারে কবির জন্য বিশেষ স্থান নির্দেশ করা ছিল। চারি দিকে লোকের ভিড়— কোলাহল— যেন একটা সরাইখানা। কিছুক্ষণ সেখানে থাকিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে এই পরিবেশ কবির কাছে অসহ্য। তখনই মহারাজার নিকট সংবাদ পাঠানো হইল। কবি যে অল্পক্ষণ সেখানে ছিলেন, তাহার মধ্যে অনেকেই দেখা করতে আসেন; বিশেষভাবে মনে-রাখার মতো লোক গৌরীশঙ্কর ওঝা। কবি এই পণ্ডিতের কথা পূর্বেই জানিতেন, বহুক্ষণ উভয়ের মধ্যে রাজস্থানের ইতিহাস লইয়া কথাবার্তা হইল। এদিকে কবির অসুবিধা হইতেছে জানিতে পারিয়া মহারাজা কিষণসিংহ স্বয়ং চলিয়া আসিলেন ও কবিকে এবং আমাদের তখনই নিজ প্রাসাদে লইয়া গেলেন। সেই বিরাট প্রাসাদে কবি পাঁচ দিন ছিলেন।

আমরা যেদিন পৌঁছিলাম, সেই দিন অপরাহ্নে হিন্দী সাহিত্যসম্মেলন। বিরাট মণ্ডপ— বহু সহস্র শ্রোতা ও দর্শক। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভাষণ ইংরেজিতেই দেন। তিনি বলেন যে, হিন্দীভাষা ভাবী রাষ্ট্রভাষা বলিয়া ঘোষিত হইতেছে। রাষ্ট্রভাষা কেবল রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনীয়তায় সিদ্ধ হয় না, সাহিত্যের দিক হইতে তাহাকে তাহার উপযোগিতা দেখাইতে হইবে। ইংরেজিভাষা যে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে, সে তাহার বাণিজ্যবিস্তার ও রাজ্য জয়ের জন্য নহে, সে-ভাষায় বহু কবি সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব দাবি কেবল সাহিত্যের দাবি পূরণ করিয়া মিটানো যায়।

ভরতপুরে বাসকালে কবি দুই দিন বেড়াইতে বাহির হন; একদিন যান ভরতপুরের প্রাচীন রাজধানী দিগ্ দেখিতে। ভরতপুরের জাঠসর্দারগণ আগ্রা লুণ্ঠন করিয়া একটি পাথরের প্রাসাদের প্রত্যেকখানি প্রস্তর খুলিয়া আনিয়া পুনরায় প্রাসাদটি এখানে নির্মাণ করে! অপর একদিন একটি বৃহৎ জলাশয় বা বিল দেখাইবার জন্য লইয়া যাওয়া হইল। সত্যই মনোরম স্থান— নানা জাতির পাখি জলে ও জলের আশে পাশে খেলা করিতেছে। কবির ভালোই লাগিতেছে। এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়িল একটি কাষ্ঠফলকের উপর; কোন্ ইংরেজ কত শত পাখি মারিয়াছেন— তাহাদের নাম ও নিহত পাখির সংখ্যা খোদিত। কবির মন হঠাৎ কঠিন হইয়া উঠিল— বলিলেন, এখান হইতে এখনই চলো! নিরীহ পাখি মারার মধ্যে কোনো পৌরুষ নাই বলিয়া তিনি তাঁহার জমিদারীর মধ্যে কাহাকে পক্ষীশিকার করিতে দিতেন না।

ভরতপুরের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন একজন পারসি যুবক; তাঁহার সহিত বিশ্বভারতী সম্বন্ধে কথা বলিলাম। কিন্তু

১ রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত চিঠির খাতা নং ১, পৃ. ৩৯-৪০। পাণ্ডুলিপি।

২ “এবার আমার সঙ্গে প্রভাতকুমার যাবে, কারণ, ভিক্ষা করা সম্বন্ধে সে নির্লজ্জ” (চিঠিপত্র ৪, পত্র ৫৪; ১১ মার্চ ১৯২৭)। ভরতপুর হইতে অর্থসচিব দূতরূপে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত কথাবার্তা বলিবার ভার আমার উপর প্রদত্ত হয়। আমি বিশ্বভারতীর অর্থসংকটের কথা তাঁহাকে বলিয়াছিলাম। বোধ হয় সেইজন্যই কবি আমাকে সঙ্গে লন।

তিনি অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইলেন সেবার রাজকোষের অবস্থা খুবই মন্দ, ভবিষ্যতে বিশ্বভারতীর কথা তাঁহাদের স্মরণ থাকিবে। রাজপ্রাসাদে কয় দিন থাকিয়া বুঝিয়াছিলাম যে এই দরিদ্রদেশে শোষিত প্রজার অর্থ কিভাবে অপব্যয়িত হয়।

ভরতপুর রাজপ্রাসাদে কবিকে একটিমাত্র কবিতা লিখিতে দেখি— 'নীলমণিলতা' (১৭ চৈত্র ১৩৩৩)—

আমি আজ কোথা আছি, প্রবাসে অতিথিশালা-মাঝে।
তব নীললাবণ্যের বংশীধ্বনি দূর শূন্যে বাজে।
আসে বৎসরের শেষ,
চৈত্র ধরে ম্লান বেশ,
হয়তো বা রিক্ত তুমি ফুল ফোটাবার অবসানে—
তবু, হে অপূর্ব রূপ, দেখা দিলে কেন যে কে জানে।

আট দিন পূর্বে— শান্তিনিকেতনে 'বৃক্ষবন্দনা' (৯ চৈত্র) লিখিয়াছিলেন— ইহা তাহারই রেশ— অশেষ হইতে বিশেষে প্রয়াণ। এই ধারা বহুদিন চলে।

ভরতপুর হইতে মোটরে ফিরিলেন আগ্রা, সেখানে আওয়াগড়ের মহারাজার অতিথিরূপে দুই দিন যাপন করেন। এই সময়ে কবির ভাগ্যগুণে এই এক অকৃত্রিম সুহৃদের সঙ্গে পরিচয় হয়। বিশ্বভারতীতে তিনি বহু সহস্র টাকা শর্তহীনভাবে দান করেন ও তাঁহার নির্মিত অট্টালিকাটি বিশ্বভারতীকে দান করিয়া যান; সেই 'আওয়াগড় হাউস' এখন বিশ্বভারতীর উপাচার্যদের বাসগৃহ।

আওয়াগড় মহারাজার বাটিতে অনবরত অতিথির ভিড় শুরু হইল; কবির সহিত সাক্ষাৎপ্রার্থীদের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য ব্যক্তি আসেন আগ্রা কলেজের অধ্যক্ষ ক্যানন-ডেভিস ও রাধাসোয়ামি কলেজের অধ্যক্ষ নারায়ণ দাস। বৈকালে বাঙালিরা কবিকে সংবর্ধিত করেন।

পরদিন (৩ এপ্রিল) প্রাতে তাজমহল দেখিতে গেলেন, কিন্তু তোরণ পর্যন্ত গিয়া শরীর খুব ক্লান্তবোধ করায় ফিরিয়া আসিলেন, তোরণ হইতে তাজমহলের উপর দৃষ্টিপাত করিলেন মাত্র। সেইদিন অপরাহ্নে রাজপুত স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ সভায় কবি সভাপতি— আগ্রার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অনেকেই সেদিন উপস্থিত হন। রবীন্দ্রনাথ এখানে বিশ্বভারতীর কথাই সবিস্তার বলেন।

সেইদিন রাত্রে আগ্রা পরিত্যাগ করিয়া পরদিন প্রাতে (৪ এপ্রিল) জয়পুর পৌঁছানো গেল। আশ্রমের প্রাক্তন শিক্ষক ও সেই সময়ে জয়পুর স্টেটের বড় চাকুরে সুবোধচন্দ্র মজুমদার[১] স্টেশনে আসিয়া কবিকে তাঁহার গৃহে লইয়া উঠাইলেন। এখানে ওঠানোতে কবি মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। প্রাতে জয়পুরের কাউন্সিলের কয়েকজন সদস্য কবির সহিত লৌকিকভাবে দেখা করিতে আসেন, এছাড়া বলিবার মতো কোনো ঘটনাই নাই।

জয়পুর হইতে আহমদাবাদ চলিলেন— যাইবার যে কোনো প্রয়োজন বা আহ্বান আছে তাহা নহে; তবে পশ্চিমভারতে আসিয়াছেন আর তাঁহার বিশেষ গুণগ্রাহী ও সুহৃৎ অম্বালাল সরাভাই-এর বাড়ি না-হইয়া ফিরিয়া যান কেমন করিয়া। শ্রীমতী সরলা সরাভাই কবির গৃহবিদ্যালয়ের অনুরূপ স্বগৃহে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া আপনার

১ সুবোধচন্দ্র মজুমদার, কবি সুহৃৎ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের জ্ঞাতি ভ্রাতা। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদিযুগে শিক্ষক ছিলেন। ইহার নিকট রবীন্দ্রনাথের স্বহস্ত লিখিত কতকগুলি মূল্যবান কাগজপত্র ছিল। সুবোধচন্দ্রের পুত্র সমীরচন্দ্র (তথাকার এককালীন ছাত্র) সেগুলি রবীন্দ্রসদনকে ব্যবহারের জন্য দেন। মূল সমীরচন্দ্রের কাছে, ফোটোস্টাট কপি এখানে আছে।

সন্তানদের সেখানেই শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। হিরজিভাই মরিস বোম্বাই হইতে এখানে কবির সহিত মিলিত হন।

আহমদাবাদে রবীন্দ্রনাথ আসিয়াছেন এই সংবাদ প্রকাশ পাইলে শহরের নানা প্রতিষ্ঠান হইতে কবির আমন্ত্রণ আসিল। একদিন গুজরাটি সাহিত্যসভায় কবি-সংবর্ধনা হইল।

এইখানে বাসকালে টমসন্ লিখিত কবিজীবনী[1] কবির হাতে পড়ে। নিজের জীবন অন্যে কীভাবে লেখে ও ব্যাখ্যা করে, তাহা জানিবার কৌতূহল স্বাভাবিক। বইখানি পড়িয়া কবি আদৌ প্রীত হইতে পারেন নাই। একখানি সমসাময়িক পত্রে মনের ক্ষোভ প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। একথা অতিসত্য যে টমসনের বাংলাভাষার জ্ঞান খুব গভীর ছিল না; অনুবাদে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কবির যেটা অভিযোগ সেটা হইতেছে টমসনের রচনাভঙ্গী। কবি লিখিতেছেন, "এমন উদ্ধত নিঃসংশয়তার সঙ্গে তিনি আমার রচনা সম্বন্ধে রায় দিয়াছেন যেন বাংলাভাষায় তাঁর দৃষ্টির কোনো বাধা নেই।··ইংরেজ লেখক যখন আমাদের বিচার করেন, তখন অধিকাংশ সময়ে তাঁদের অগোচরেও এ কথাটা মনে থেকে যায় যে অবিচারে বিশেষ কিছু আসে যায় না। এই বইয়ে Thompson অনেক জায়গাতে খুব flippant এবং dogmatic-ভাবে তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন— যাতে তাঁর অন্তর্নিহিত ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেয়েচে।··অথচ মোটের উপর তিনি যে আমাকে নিন্দা করেছেন তা নয়, যেভাবে ভালো ছেলেকে স্কুলমাস্টার উৎসাহ দিয়ে থাকেন কতকটা সেই সুরে।··যেখানে তিনি আমার ইংরেজি লেখা নিয়ে আলোচনা করেচেন সেখানে তাঁর অবজ্ঞা আমি স্বীকার করে নিতে পারি।··কিন্তু যেখানে ভাষা বাংলা সেখানে তিনি যদি ভোলেন এ-ভাষা আমার, এ-ভাষার অনেকখানি আমার নিজের হাতে-গড়া, তা হলে বুঝব তার একমাত্র কারণ তিনি ইংরেজ, আমি বাঙালি। সমসাময়িক কোনো ফরাসী বড় লেখকের সম্বন্ধে তাঁর বিচারে ও ভাষায় এরচেয়ে অনেক বেশি সতর্ক ও সংযত হতেন।··টমসন তাঁর নিজের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ সংস্কারের কুহেলিকা থেকে দূরে থেকে যদি লিখতেন তা হলে আমাকে ভালোই বলুন আর মন্দই বলুন এই একটা অবজ্ঞা ও মুরুব্বিয়ানা মিশ্রিত স্বাদ ওর মধ্যে থাকত না।··একদিকে আমাদের ভাষায় তাঁর নিতান্তই অগভীর অভিজ্ঞতা এবং অন্যদিকে আমাদের দেশের সম্বন্ধে তাঁর সুগভীর অবজ্ঞা— এই দুই-এর মিশালে তাঁর বই এমন অস্পষ্ট এবং ভঙ্গী এমন উদ্ধত হয়েচে।"[2]

কিছুকাল পরে রোটেনস্টাইনকে লিখিত এক পত্রে কবি কঠোরভাবে টমসনের সমালোচনা করেন। এই পত্র পাঠ করিয়া টমসন খুবই মর্মাহত হন, কারণ তিনি সত্যই রবীন্দ্রনাথের গুণগ্রাহী ছিলেন, স্তাবক নহেন। আহমদাবাদ হইতে বোলপুরে ফিরিয়া 'বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়' ছদ্মনামে 'প্রবাসী' মাসিকপত্রে কবি এই গ্রন্থের এক তীব্র সমালোচনা[3] লিখিয়া পাঠান।

আহমদাবাদ হইতে ১১ এপ্রিল (২৮ চৈত্র ১৩৩৩) বোলপুরে কবি ফিরিলেন; যথাসময়ে বর্ষশেষ ও নববর্ষ

১ Edward Thompson (Lecturer in Bengali, University of Oxford), *Rabindranath Tagore, Poet and Dramatist*, Oxford University Press 1926।

২ রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত চিঠির খাতা নং ২, পৃ. ১০-১১।

৩ শ্রীবাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রেঃ টমসনের বই; প্রবাসী ১৩৩৪ শ্রাবণ, পৃ. ৫১৩-১৮। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখিত রেভারেণ্ড টমসনের পণ্ডিতমন্যতা প্রবন্ধ, প্রবাসী ১৩৩৪ শ্রাবণ। শ্রীনীহাররঞ্জন রায় লিখিত সমালোচনা, বিচিত্রা ১৩৩৪ ভাদ্র।

(১৩৩৪) উদ্‌যাপনও করিলেন। মনের মধ্যে এখনো ছন্দের খেলা চলিতেছে, বর্ষশেষের দিন লিখিলেন 'বর্ষশেষ'[১] কবিতা (পরিশেষ)—

যাত্রা হয়ে আসা সারা,—আয়ুর পশ্চিমপথশেষে
ঘনায় মৃত্যুর ছায়া এসে। • •
আলোকিত ভুবনের মুখপানে চেয়ে নির্নিমেষ
বিস্ময়ের পাই নাই শেষ।

সমগ্র কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অন্তরের বাণী প্রকাশ পাইয়াছে। পরদিন নববর্ষে (১৩৩৪) মন্দিরের উপাসনার[২] পর রানী মহলানবিশকে যে পত্রখানি লেখেন তাহা পূর্বদিন লিখিত কবিতার প্রতিধ্বনি—

"এবার আমার জীবনে নূতন পর্যায় আরম্ভ হল। একে বলা যেতে পারে শেষ অধ্যায়। এই পরিশিষ্টভাগে সমস্ত জীবনের তাৎপর্যকে যদি সংহত করে সুস্পষ্ট করে না তুলতে পারি, তা হলে অসম্পূর্ণতার ভিতর দিয়ে বিদায় নিতে হবে। আমার বীণায় অনেক বেশি তার— সব তারে নিখুঁত সুর মেলানো বড়ো কঠিন। আমার জীবনে সবচেয়ে কঠিন সমস্যা আমার কবিপ্রকৃতি। হৃদয়ের সব অনুভূতির দাবিই আমাকে মানতে হল— কোনোটাকে ক্ষীণ করলে আমার এই হাজার সুরের গানের আসর সম্পূর্ণ জমে না।"[৩]

কিন্তু কবিধর্মই যে তাঁহার একমাত্র ধর্ম নয়, সে-কথাও এই পত্রে স্পষ্ট— "রসবোধ এবং সেই রসকে রসাত্মক বাক্যে প্রকাশ করেই আমার খালাস নয়। অস্তিত্বের নানা বিভাগেই আমার জবাবদিহি। • • আমার আপনার মধ্যে এই নানা বিরুদ্ধতার বিষম দৌরাত্ম্য আছে বলেই আমার ভিতরে মুক্তির জন্যে এমন নিরন্তর এবং এমন প্রবল কান্না।"

সেই নববর্ষের দিনেই 'হাসির পাথেয়'[৪] নামে যে-একটি কবিতা লেখেন, তাহাতে জীবন-প্রত্যুষের একদিনের কথা অকস্মাৎ মনে পড়িয়া গেল।

হিমালয় গিরিপথে চলেছিনু কবে বাল্যকালে,
মনে পড়ে। • • সেই ছবিখানি রহিল স্মরণে
চিরদিন মনোমাঝে।
সেদিনের যাত্রাপথ হ'তে
আসিয়াছি বহুদূরে ; আজি ক্লান্ত জীবনের স্রোতে
নেমেছে সন্ধ্যার নীরবতা।

এই কবিতার ভূমিকায় কবি যে ইতিহাসটুকু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন— তাহা স্মৃতিবেদনায় জড়িত না হইলেও

১ বর্ষশেষ, ৩০ চৈত্র ১৩৩৩ [১৩ এপ্রিল ১৯২৭]। প্রবাসী ১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ১৫৩-৫৫। পরিশেষ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫, পৃ. ১৮০-৮৩।

২ নববর্ষ (শান্তিনিকেতন)। প্রবাসী ১৩৩৪ আষাঢ়, পৃ. ২৯৭-৯৮।

৩ পথে ও পথের প্রান্তে, পত্র ১৩। ১ বৈশাখ ১৩৩৪ [১৪ এপ্রিল ১৯২৭]।

৪ হাসির পাথেয়, নববর্ষ ১৩৩৪। বনবাণী, পৃ. ৪৪-৪৬। হেমলতা ঠাকুর সম্পাদিত 'বঙ্গলক্ষ্মী'র নববর্ষের (১৩৩৪ বৈশাখ) জন্য 'গৃহলক্ষ্মী' নামে কবিতা লেখেন। পরিশেষ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫, পৃ. ৩০১-০২।

পুরাতন ঘটনার স্মরণ নিশ্চয়ই ; প্রায় এই অভিঘাতে 'বিচিত্রা' (৭ বৈশাখ ১৩৩৪)[১] কবিতার ছন্দে পুরাতন কথাই আসিয়াছে।

ছিলাম যবে মায়ের কোলে
বাঁশি বাজানো শিখাবে ব'লে
চোরাই করে এনেছ মোরে তুমি,
বিচিত্রা হে, বিচিত্রা,
যেখানে তব রঙের রঙ্গভূমি।

বহু বৎসর পূর্বে (১৩০২) 'চিত্রা' কবিতায় কহিয়াছিলেন—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।

আজ বলিতেছেন—

বুকের শিরা ছিন্ন ক'রে ভীষণ পূজা করেছি তোরে,
কখনো পূজা শোভন শতদলে,
বিচিত্রা হে, বিচিত্রা,
হাসিতে কভু, কখনো আঁখিজলে।

চন্দননগর হইতে শিলঙে

বৈশাখ (১৩৩৪) মাসের মাঝামাঝি সময়ে বিদ্যালয় বন্ধ হওয়া পর্যন্ত কবি শান্তিনিকেতনে আছেন ; দুই চারটা কবিতাও লিখিতেছেন। কিন্তু জুতার ভিতর কাঁকর ঢুকিলে যেমন প্রতি পদক্ষেপে সেই ক্ষুদ্র বস্তুটির অস্তিত্ব জানাইয়া রাখে, কবির জীবনে আর্থিক দৈন্য তেমনই পীড়াদায়ক হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বে এক পত্রে লেখেন, "বিচিত্রা নাম দিয়ে একটি কাগজ বের করবার উদ্যোগ চলচে— যাঁরা উদ্যোগী তাঁরা উৎসাহী ও ধনী। . . আমি তাঁদের ফাঁদে কতকটা ধরা দিয়েছি, অভাবের দায়ে, লোভের তাড়নায়। আমার দৈন্য যে কত কঠিন হয়ে উঠেচে সে তোমরা অনুমান করতে পারবে না।"[২]

কবির যেমন অর্থকষ্ট, বিশ্বভারতীরও তদবস্থা। এই সময়ে অধ্যাপক ও কর্মীরা স্বেচ্ছায় তাঁহাদের সে-যুগের সেই স্বল্পবেতনেরও শতকরা দশ টাকা কমাইয়া লইলেন। ব্যয়সংকোচের জন্য এবং কর্মপরিচালনার সুবিধার আশায় পাঠভবন ও শিক্ষাভবন (অর্থাৎ পুরাতন স্কুল এবং নূতন কলেজ, যাহা ১৯২৬ সালে মাত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে)— এক করিয়া শিক্ষাবিভাগরূপে গঠিত হইল।[৩]

১ বিচিত্রা, ৭ বৈশাখ ১৩৩৪ [২০ এপ্রিল ১৯২৭]। পরিশেষ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫. পৃ. ১৬৩-৬৫ ; গ্রন্থপরিচয়ে অন্য পাঠ, পৃ. ৫২৯।

২ চিঠিপত্র ৫, পত্র ১০৩। ১২ চৈত্র ১৩৩৩ ॥ ২৫ মার্চ ১৯২৭।

৩ 'Towards the end of 1926 the Visva-Bharati was faced with a very acute financial crisis'. Annual Report 1927, p. 21।

গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বিদ্যালয় বন্ধ হইলে কবি কলিকাতায় গেলেন। চন্দননগর প্রবর্তকসংঘের প্রতিষ্ঠাতা মতিলাল রায়ের নিকট হইতে আমন্ত্রণ আসিয়াছে; সেখানে অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন ১৩৩০ সাল হইতে প্রতিবৎসর উৎসব হইয়া আসিতেছে। এইবার (৪ মে) ঐ উৎসবের সভাপতি ও তদুপলক্ষে অনুষ্ঠিত জাতীয় মেলা ও প্রদর্শনীর উদ্বোধকরূপে রবীন্দ্রনাথ আহূত হইয়াছেন।

উৎসবক্ষেত্রে কবিকে অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হইলে তিনি তাহার উত্তরে একটি সুন্দর ভাষণ দিলেন। মধ্যাহ্নে কবি সংঘের মন্দিরে যান; এই মন্দিরে কোনো মূর্তি বা লৌকিক প্রতীক নাই— কেবলমাত্র 'ওঁ' প্রতিষ্ঠিত। মন্দির-প্রাঙ্গণে সংঘ-জননীর সহিত সংঘ-কন্যারা কবিকে ঘিরিয়া বসে ও ঘরোয়াভাবে কথাবার্তা চলে। অবশেষে তাহাদের অনুরোধে কবিকে গানও গাহিতে হয়।

সন্ধ্যায় উৎসবের মেলা ও প্রদর্শনীর দ্বার-উদ্‌ঘাটন অনুষ্ঠান; তদুপলক্ষে কবি এক দীর্ঘ ভাষণ দান করেন।[১]

প্রবর্তকসংঘের অনুষ্ঠানে যোগদান ব্যতীত তাঁহাকে চন্দননগরের দানপতি হরিহর শেঠ প্রতিষ্ঠিত 'কৃষ্ণভামিনী বালিকা বিদ্যালয়' পরিদর্শন করিতে যাইতে হয়। তদনন্তর ফরাসী[২] অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটরের বাটিতে চা-পার্টি; সেখানে নগরীর বহু গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। ইহার পর প্রবর্তকসংঘের উদ্বোধন; যাহার কথা পূর্বে বলিয়াছি। এই অনুষ্ঠান শেষে 'নিত্যগোপাল স্মৃতিমন্দির' নামে পাবলিক হল ও গ্রন্থাগারে জনসাধারণের পক্ষ হইতে কবি-সংবর্ধনা— নগরীর মেয়র নারায়ণচন্দ্র দে বিশ্বভারতীর জন্য এক সহস্র মুদ্রা দান করিলেন।[৩]

চন্দননগর হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া কবি সপরিবারে চলিলেন শিলঙ। আহমদাবাদের ধনী অম্বালাল সরাভাই এবার সপরিবারে শিলঙ যাইতেছেন— তাঁহাদের অনুরোধে ও ব্যবস্থায় কবি এবার শিলঙ চলিয়াছেন। শিলঙে সরাভাইরা পাশাপাশি দুইটি বাড়ি ভাড়া করেন— একটি কবির জন্য নির্দিষ্ট হয়। এবার শান্তিনিকেতনের দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জাহাঙ্গীর বকীল ও লেখক সপরিবারে শিলঙ পাহাড়ে গিয়াছিলেন।

শিলঙ বাসকালে কবির জন্য কোনো পাবলিক সংবর্ধনা বা সভাদি হয় নাই; সরাভাইদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা আসা-যাওয়া করে— তিনিও সেখানে যান। বাহিরের লোকের মধ্যে ময়ূরভঞ্জের মহারানী-মাতা সুরুচিদেবী (কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা) এই সময়ে শিলঙে ছিলেন বলিয়া কবি তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইতেন ও তিনিও আসিতেন। তৎসত্ত্বেও লিখিতেছেন "কলকাতার চেয়ে এখানে সময় আরো কম।" এই কথা লিখিবার একটা কারণ এই সময়ে কবি তাঁহার নূতন উপন্যাস তিনপুরুষ (যোগাযোগ) রচনা শুরু করিয়াছেন। শিলঙ হইতে ২০ মে ইন্দিরা দেবীকে লিখিতেছেন— "বিচিত্রার জন্যে একটা গল্প লেখা চাই। গল্প বিচিত্রার গরজে ততটা নয় যতটা আমার নিজের গরজে। অর্থাগমের আর কোনো রাস্তা জানিনে, কলমের জোরে যা পারি।"[৪]

শিলঙে যে উপন্যাস শুরু করিলেন তাহা 'বিচিত্রা' নামে নূতন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তিনপুরুষ[৫] নামে

১ মতিলাল রায় মহাশয়ের সহিত পরিচয় থাকায় তাঁহাকে কবির এই উদ্বোধন সম্বন্ধে তথ্যাদি চাহিয়া পাঠাই। তাঁহার নির্দেশে শ্রীরেণুকণা ঘোষ আমাকে বিস্তারিত তথ্য ও অভিনন্দনপত্র, কবির ভাষণ প্রভৃতি অনুলেখন করিয়া পাঠাইয়া দেন (৯ নভেম্বর ১৯৫০)।

২ চন্দননগর তখন ফরাসীদের শহর। ১৬৭৩ অব্দে ফরাসীরা এখানে প্রথম কুঠি স্থাপন করে। ১৯৫৪, ২ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গ ভুক্ত হয়। তৎপূর্বে উহা ফরাসী সরকার কর্তৃক শাসিত হইত।

৩ সমসাময়িক দৈনিক পত্রিকা দ্রষ্টব্য।

৪ চিঠিপত্র ৫, পত্র ২৩। শিলং, ২০ মে ১৯২৭।

৫ বিচিত্রা, ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ১৩৩৪ আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যায় তিনপুরুষ নামে প্রকাশিত হয়।

— পরে নূতন নামকরণ হয় 'যোগাযোগ'। নাম বদলের কারণ, কবি জানিতে পারেন 'তিনপুরুষ' নামে আর-একটি উপন্যাস কাহার আছে। তাই বৃহত্তর ভারত ভ্রমণকালে বিচিত্রা-সম্পাদককে (৪ অক্টোবর ১৯২৭) লেখেন[১] নূতন উপন্যাসের নাম হইবে 'যোগাযোগ'। তিনি লেখেন, "সাহিত্যে যখন নামকরণের লগ্ন আসে দ্বিধার মধ্যে পড়ি। সাহিত্যরচনার স্বভাবটা বিষয়গত না ব্যক্তিগত এইটে হলো গোড়ার তর্ক। বিজ্ঞানশাস্ত্রে বিষয়টাই সর্বেসর্বা সেখানে গুণধর্মের পরিচয়ই একমাত্র পরিচয়। মনস্তত্ত্বঘটিত বইয়ের শিরোনামায় যখনই দেখব 'স্ত্রীর সম্বন্ধে স্বামীর ঈর্ষা' বুঝব বিষয়টিকে ব্যাখ্যা দ্বারা নামটি সার্থক হবে। কিন্তু 'ওথেলো' নাটকের যদি ঐ নাম হতো, পছন্দ করতুম না।·· 'বিষবৃক্ষ' নামটাতে আমি আপত্তি করি। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' নামে দোষ নেই— কেননা ওনামে গল্পের কোনো ব্যাখ্যাই করা হয় নি।" যাই হোক এই 'যোগাযোগ' প্রকাশিত হইলে, আমরা ঐ গ্রন্থ লইয়া আলোচনা করিব। আপাতত শিলঙে 'তিনপুরুষ' নামেই তাহার পত্তন হইল এবং আমরা, যাহারা তখন শিলঙবাসী, তাহারাই ইহার প্রথম শ্রোতা হইলাম।

উপন্যাস ছাড়া কয়েকটি কবিতাও লেখেন ; যেমন 'নূতন'[২] ও 'শুকসারী'[৩] ; আর 'সুসময়'[৪] ও 'দেবদারু'[৫]। শুকসারী ও দেবদারু রচিত হয় নন্দলাল বসুর চিত্র দৃষ্টে— শিল্পীর চিত্রলিপির উত্তরে কবির কাব্যলিপি। কবিতার ভূমিকার একস্থানে আছে, "মহাকালের চরণপাতে হিমালয়ের প্রতিদিন ক্ষয় হচ্ছে, কিন্তু দেবদারুর মধ্যে যে প্রাণ, নবনব তরুদেহের মধ্যে দিয়ে যুগেযুগে এগিয়ে চলবে।"— বনবাণী। 'নূতন' কবিতাটি ভাঙিয়া পরে গান লেখেন, "দূর রজনীর স্বপন লাগে আজ নতুনের হাসিতে'— গীতবিতান পৃ. ৫৭৫। প্রসঙ্গত বলি 'নূতন' কবিতাটি কবি 'কল্লোলে' পাঠাইয়া দেন ; এই পত্রিকা কবির সমালোচনায় ও ব্যঙ্গস্তুতিতে তখন পূর্ণ হইত।

বৃহত্তর ভারত : সিঙাপুরে

শিলঙ বাসকালে রবীন্দ্রনাথের দ্বীপময় ভারত বা জাভাদ্বীপাদি ভ্রমণের ইচ্ছা হয়। ১৯২৬ সালে য়ুরোপ সফরের সময় কবির সহিত যেসব বিশিষ্ট ওলন্দাজ ও জাভানীর সাক্ষাৎ হয়, তাঁহারা কবিকে পূর্বদ্বীপাবলীর প্রাকৃতিক শোভা ও ঐতিহাসিক স্থাপত্যকীর্তি দেখিয়া আসিবার অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। য়ুরোপ হইতে ফিরিয়া মালয় উপদ্বীপ (স্ট্রেট্‌স্ সেটলমেণ্ট) হইতেও আমন্ত্রণলিপি পান।

শিলঙ পাহাড় ছাড়িবার কয়েকদিন পূর্বে কবি প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে এক পত্রে লেখেন (২৮ মে) যে, বিড়লাদের নিকট হইতে পাথেয়াদির জন্য সাহায্য না-পাইলেও যেমন করিয়াই হউক তিনি জাভা-বলীদ্বীপে যাইবেন। এই পত্র হইতে বুঝিতে পারা যায় যে কিছুকাল হইতেই পূর্বদ্বীপাবলী যাইবার কথাবার্তা বিড়লাদের সহিত চলিতেছিল। দ্বীপময় ভারতে যাইবার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন, "সেখান থেকে ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ এবং এ সম্বন্ধে গবেষণার স্থায়ী ব্যবস্থা করা ছাড়া আমার অন্য কোনো উদ্দেশ্যই নেই।

১ তিনপুরুষ (নামান্তর), বিচিত্রা ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ, পৃ. ৭৮৯।

২ নূতন, ৩০ বৈশাখ ১৩৩৪ [১৩ মে ১৯২৭], শিলঙ। কল্লোল পত্রিকা ১৩৩৪ বৈশাখ। পরিশেষ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫, পৃ. ২৯৭।

৩ শুকসারী, ৩১ বৈশাখ ১৩৩৪, শিলঙ। উত্তরা ১৩৩৮ আশ্বিন। পরিশেষ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫, পৃ. ২৯৯।

৪ সুসময়, ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪, শিলঙ। বিচিত্রা ১৩৩৫ আষাঢ়। পরিশেষ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫, পৃ. ৩০০ ও পৃ. ৫৩৯।

৫ দেবদারু, ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪, শিলঙ। বিচিত্রা ১৩৩৪ কার্তিক, পৃ. ৬৩৭। বনবাণী, পৃ. ৯। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫, পৃ. ১২০।

আমি নিজে বোধ করি অতি অল্প দিনই থাকব এবং যদি সাধ্যে কুলোয় তবে কোনো উপযুক্ত ব্যক্তিকে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের জন্য রেখে দিয়ে আসব। কাজটাকে আমি গুরুতর প্রয়োজনীয় বলে মনে করি, এবং এ-ও জানি আমার দ্বারা কাজটা সহজসাধ্যও হতে পারে। জাভা গবর্মেণ্ট আমাকে নিমন্ত্রণ করেন নি। সেখান থেকে যাঁদের উৎসাহ পেয়েছি তাঁরা পুরাতত্ত্ববিৎ— আমাদের দেশের পণ্ডিতদের সহযোগিতা পেলে তাঁদের সন্ধানকার্যের সুবিধা হতে পারবে।"[১]

জুন মাসের শেষে কবি শিলঙ হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন। দ্বীপময় ভারত যাইবার কথাবার্তা ও আয়োজন চলিতেছে। দানবীর ঘনশ্যামদাস বিড়লা ইতিপূর্বে যেমন চীন সফরের জন্য অর্থ দিয়াছিলেন, এবারও তিনি দশ সহস্র মুদ্রা দান করিলেন। নারায়ণ দাস বিজোরিয়া নামে আর-এক জন মাড়বারী-দানপতিও এক সহস্র টাকা দিলেন। শ্রীঘনশ্যামদাস জানিতে পারিয়াছিলেন যে বলীদ্বীপে হিন্দুধর্ম ও জাভাদ্বীপে বৌদ্ধ স্থাপত্য-ভাস্করাদি এখনো বিদ্যমান। তাঁহার হৃদগত ভাব ছিল ভারতের সহিত এই দূর প্রাচ্যের বৃহত্তর ভারতের সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। চীন হইতে প্রত্যাবর্তনের পর কবির সে-যাত্রার অন্যতম সঙ্গী ডক্টর কালিদাস নাগের চেষ্টায় কলিকাতায় Greater India Society স্থাপিত হয়; রবীন্দ্রনাথ এই 'বৃহত্তর ভারত পরিষদে'র প্রথম সভাপতি হন।[২]

কলিকাতায় ফিরিয়া পূর্বদ্বীপাবলী সফরের আয়োজন ও উত্তেজনার মধ্যে কবিকে দুইটি কবিতা লিখিতে দেখি। এই কবিতা দুইটি[৩] নৈবেদ্যের কবিতার ন্যায় প্রার্থনাপূর্ণ—

> আমারে সাহস দাও, দাও শক্তি, হে চিরসুন্দর,
> দাও স্বচ্ছ তৃপ্তির আকাশ, দাও মুক্তি নিরন্তর
> প্রত্যহের ধূলিলিপ্ত চরণপতনপীড়া হতে,
> দিয়ো না দুলিতে মোরে তরঙ্গিত মুহূর্তের স্রোতে,
> ক্ষোভের বিক্ষেপ বেগে।

দ্বিতীয় কবিতার শেষে বলিতেছেন—

> ∙ ∙ আত্মদানে
> আমারে বাহির করো, শূন্যে শূন্যে পূর্ণ হ'ক সুর,
> নিয়ে যাক পথে পথে হে অলক্ষ্য, হে মহাসুদূর।

'সুদূরের পিয়াসী' কবির অন্তরের বাণী বহন করিয়া আকস্মিকভাবে কবিতা দুইটির আবির্ভাব হইয়াছিল। কবির সে-সময়ের রচিত কবিতার ছন্দের সহিত ইহার মিল নাই। তবে মনের কথাটি প্রকাশ পাইয়াছে— 'নিয়ে যাক পথে পথে' 'আত্মদানে আমারে বাহির করো।'

দ্বিতীয় কবিতাটি যেদিন লেখেন, সেইদিন কবিকে একটি সভাতে উপস্থিত হইতে হয়। এই সময়ে কলিকাতায়

১ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র (২৮ মে ১৯২৭)। প্রবাসী ১৩৪৮ আশ্বিন, পৃ. ৬৬১।

২ দেশ ১৩৬৭ (১৯৬০), শ্রীনির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত পত্র তুলনীয়। কবিমনের একটা বিশেষ অবস্থায় লিখিত।

৩ মুক্তি (১), ১ জুলাই ১৯২৭। মুক্তি (২), ২ জুলাই ১৯২৭। পরিশেষ, পৃ. ৪৬-৪৭। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫, পৃ, ১৮৪। কবিতা দুইটি ১৪ লাইনের করিয়া।

আন্তর্জাতিক সমবায় উৎসব পালিত হইতেছে (২ জুলাই) ; রবীন্দ্রনাথ সভাপতিরূপে যে ভাষণ দান করেন, তাহা 'সমবায় নীতি' গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে।[১]

দ্বীপময় ভারত যাত্রার পূর্বে একদিন কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে বৃহত্তর ভারত পরিষদ-এর উদ্যোগে পরিষদের স্থায়ী সভাপতি বলিয়া রবীন্দ্রনাথের বিদায় উপলক্ষে এক সভা আহূত হয়। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার ঐ দিনের সভাপতিরূপে প্রদত্ত ভাষণে কবিকে পূর্বতন ঋষিদের স্থানাভিষিক্ত অধুনাজীবিত ব্যক্তি বলিয়া অভিহিত করেন। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে বলেন, "আজ একটা আকাঙ্ক্ষা আমাদের মধ্যে জেগেছে, যে-আকাঙ্ক্ষা ভারতের বাহিরেও ভারতকে বড়ো ক'রে সন্ধান করতে চায়। সেই আকাঙ্ক্ষাই বৃহত্তর ভারতের প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে রূপ গ্রহণ করেছে। সেই আকাঙ্ক্ষাই আপন প্রত্যাশা নিয়ে আমাকে অভিনন্দন করছে। সেই প্রত্যাশা আমার চেষ্টাকে সার্থক করুক।"

বৃহত্তর ভারতে হিন্দুদের উপনিবেশ যে নিছক হিন্দুব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধশ্রমণদের দ্বারা গঠিত হয় নাই— এ-তত্ত্ব কবি জানিতেন। তিনি এই ভাষণে বলেন, "আমাদের দেশেও দিগ্‌বিজয়ের পতাকা হাতে পরাজিতের দেশ জয় করবার কীর্তি হয়তো সেকালে অনেকে লাভ করে থাকবেন, কিন্তু ভারতবর্ষ অন্য দেশের মতো ঐতিহাসিক জপমালায় ভক্তির সঙ্গে তাঁদের নাম স্মরণ করে না। বীর্যবান দস্যুদের নাম ভারতবর্ষের পুরাণে খ্যাত হয়নি।"

ভারত-ইতিহাসের মূল তত্ত্ব ও তথ্য এই বাক্যগুলির মধ্যে নিহিত। কবি বলিলেন, "ভারতবর্ষের যে বাণী আমরা পাই সে-বাণী যে শুধু উপনিষদের শ্লোকের মধ্যে নিবদ্ধ তা নয়। ভারতবর্ষ বিশ্বের নিকট যে মহত্তম বাণী প্রচার করেছে তা ত্যাগের দ্বারা, দুঃখের দ্বারা, মৈত্রীর দ্বারা, আত্মার দ্বারা— সৈন্য দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে, পীড়ন লুণ্ঠন দিয়ে নয়।"[২]

কয়েকদিন পরে একখানি পত্রে কবি লিখিতেছেন, "ভারতবর্ষের বিদ্যা একদিন ভারতবর্ষের বাইরে গিয়েছিল। ··বাইরের লোক তাকে স্বীকার করেছে। তিব্বত মঙ্গোলিয়া মালয়দ্বীপসকলে ভারতবর্ষ জ্ঞানধর্ম বিস্তার করেছিল মানুষের সঙ্গে মানুষের আন্তরিক সত্যসম্বন্ধের পথ দিয়ে। ভারতবর্ষের সেই সর্বত্র-প্রবেশের ইতিহাসের চিহ্ন দেখবার জন্যে আজ আমরা তীর্থযাত্রা করেছি।··সেদিনকার ভারতবর্ষের বাণী শুষ্কতা প্রচার করেনি। মানুষের ভিতরকার ঐশ্বর্যকে সকল দিকে উদ্‌বোধিত করেছিল, স্থাপত্যে ভাস্কর্যে চিত্রে সংগীতে সাহিত্যে; তারই চিহ্ন মরুভূমি অরণ্যে পর্বতে দ্বীপে দ্বীপান্তরে, দুর্গম স্থানে দুঃসাধ্য কল্পনায়।··এ জরাজীর্ণ কৃশপ্রাণ বৃদ্ধের বাণী নয়, এর মধ্যে পরিপূর্ণপ্রাণ বীর্যবান যৌবনের প্রভাব।"[৩]

কলিকাতা হইতে কবি রেলপথে মাদ্রাজ যাত্রা করিলেন ১২ জুলাই। এবার কবির সঙ্গে অনেকে আছেন— শান্তিনিকেতনের কলাভবনের সহকারী-অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ কর ও অন্যতম অধ্যাপক তরুণ-শিল্পী ধীরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মণ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক আরিয়াম উইলিয়মস (অধুনা আর্যনায়কম্) ইতিপূর্বেই মালয় যাত্রা করিয়া গিয়াছেন ; আরিয়াম সিংহলদেশীয় জাফনার তামিল,

১ ১৯২৭ সালের '২রা জুলাই আন্তর্জাতিক সমবায় উৎসবের দিনে কলিকাতায় [অ্যালবার্ট হলে] বঙ্গীয় সমবায়-সংগঠন সমিতি কর্তৃক অনুষ্ঠিত উৎসবের সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা দেন', শ্রীহিরণকুমার সান্যাল ও শ্রীসজনীকান্ত দাসের লিখিত তাহার অনুলিপি বক্তা-কর্তৃক সংশোধিত হইয়া 'ভাণ্ডার' পত্রে 'ভারতবর্ষে সমবায়ের বিশিষ্টতা' নামে মুদ্রিত হয় [১৩৩৪ শ্রাবণ] দ্র. সমবায়নীতি, পৃ. ২০-৩১।

২ বৃহত্তর ভারত, প্রবাসী ১৩৩৪ শ্রাবণ পৃ. ৫৮৩-৮৭। দ্র. কালান্তর, পৃ. ৩০৪-১৩।

৩ যাত্রী [জাভাযাত্রীর পত্র], ১ শ্রাবণ ১৩৩৪ [১৭ জুলাই]।

খ্রীষ্টান ; ইনি শ্রীরামপুরের B. D. অর্থাৎ ব্যাচেলার অব্ ডিভিনিটি। ইনি কয়েক বৎসর বিলাতে YMCA-র সহিত কার্য করেন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা আদর্শ তাঁহাকে দুই বৎসর পূর্বে শান্তিনিকেতনে আকর্ষণ করিয়া আনে। মালয় উপদ্বীপে বহু সহস্র তামিলের বাস, আরিয়ামের পরিচিত বন্ধু ও আত্মীয়স্থানীয় লোকও সেখানে ছিলেন ; রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর কথা প্রচার ও প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে সেখানে সফর করিবেন— তাহারই পথিকৃৎরূপে আরিয়াম গিয়াছেন।

মালয় সফরের পরে রবীন্দ্রনাথ ওলন্দাজী-ভারত (Netherlandishe Indo) বা জাভা বালী দ্বীপাবলী যাইবেন— সেইজন্য পথিকৃৎরূপে গেলেন মিঃ বাকে (Bake) ও তাঁহার পত্নী। বাকে-রা ডাচ্, ভারতীয় সংগীত বিষয়ে গবেষণা করিবার জন্য কার্ন (Korn Institute) পরিষদ হইতে বৃত্তি পাইয়া শান্তিনিকেতনে কয়েক বৎসর আছেন। তাঁহারা জাভা রওনা হইয়া গেলেন।

কলিকাতা হইতে মাদ্রাজের পথে কবি সদল চলিলেন (১২ জুলাই) ; সারাপথ দর্শনপ্রার্থী ও সহি-সংগ্রাহকের উপদ্রব ছাড়া পথের ঘটনা কিছু নাই।

রবীন্দ্রনাথের এইবারকার দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ভ্রমণের বিস্তারিত বর্ণনা আমরা পাই কবির সঙ্গী সুনীতিকুমারের গ্রন্থ, 'দ্বীপময় ভারত' হইতে ও কবির 'জাভাযাত্রীর পত্র'ধারা হইতে— যাহা 'যাত্রী' গ্রন্থভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

কবির সঙ্গে অনেকেই ইতিপূর্বে ও ইতঃপরে সফরে গিয়াছেন, কিন্তু এরূপ তথ্য কেহই সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেন নাই ; অথবা করিয়া থাকিলেও সমকালীন তথ্যরূপে প্রকাশ করেন নাই। সুনীতিকুমারের তথ্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জাভাযাত্রীর পত্র (যাত্রী) মধ্যে লিখিতেছেন,[১] "আমি তাঁকে (সুনীতিকে) নিছক পণ্ডিত বলেই জানতুম। অর্থাৎ, আস্ত জিনিসকে টুকরো করা ও টুকরো জিনিসকে জোড়া দেওয়ার কাজেই তিনি হাত পাকিয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এবার দেখলুম, বিশ্ব বলতে যে-ছবির স্রোতকে বোঝায়, যা ভিড় করে ছোটে এবং মুহূর্ত স্থির থাকে না, তাকে তিনি তালভঙ্গ না করে মনের মধ্যে দ্রুত এবং সম্পূর্ণ ধরতে পারেন আর কাগজে-কলমে সেটা দ্রুত এবং সম্পূর্ণ তুলে নিতে পারেন।" এই পর্ব সম্বন্ধে যাঁহারা তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহেচ্ছু তাঁহাদের কাছে সুনীতিকুমারের 'দ্বীপময় ভারত' একটি আকর গ্রন্থ।

মাদ্রাজে কবি শ্রীটি. ভি. রামস্বামীর গৃহে অল্পকালের জন্য অতিথি হইলেন ; রামস্বামী মাদ্রাজ হাইকোর্টের যশস্বী আইনজীবী, রবীন্দ্রসাহিত্য অনুরাগী ও অতিথিবৎসল ; ইতিপূর্বেও তিনি ইঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৪ জুলাই মাদ্রাজ হইতে ফরাসী জাহাজ আঁবোয়াজ (Amboise)-এ কবি ও তাঁহার সঙ্গীরা সিঙাপুর রওনা হইলেন। এই জাহাজ ফ্রান্স হইতে আসিতেছে— গম্যস্থল ফরাসী-ইন্দোচীন। জাহাজের ফরাসী মালিকরা কবির জন্য একখানি ভালো ক্যাবিন বন্দোবস্ত করিয়া দেন। জাহাজে উঠিয়া কবি আপন মনে পত্রধারা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তবে এই সকল পত্র মধ্যে কবিমানসের সম্পূর্ণ রূপটি বোধ হয় ফুটিয়া উঠে না। এই শ্রেণীর পত্র ব্যক্তি-বিশেষের নামে লিখিত হইলেও, কবির ব্যক্তিপুরুষটি ইহাতে আবৃত থাকিয়া যায় ; কারণ এইগুলি অল্পকাল মধ্যে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে জানিয়াই রচিত হইত।

পত্র লেখা ছাড়া দুইটি কবিতা লেখেন— একটি ১৭ জুলাই সমুদ্র 'পরে, অপর ২০ জুলাই সিঙাপুর বন্দরে।

১ জাভাযাত্রীর পত্র, ৩ শ্রাবণ ১৩৩৪ ; নাগপঞ্চমী [১৯ জুলাই ১৯২৭]। শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত। বিচিত্রা ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ। দ্র. যাত্রী, ১৩৬৩ সংস্করণ, পৃ. ২০২।

'দিনান্তে' কবিতাটি (১ শ্রাবণ ১৩৩৪) মহুয়া কাব্যখণ্ডে ও 'আহ্বান' (৪ শ্রাবণ) পরিশেষ কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। 'দিনান্তে' অতীতের কোনো বেদনার সুখস্মৃতি আর 'আহ্বানে' ভবিষ্যতের দিকে প্রগতির ব্যাকুলতা।

আঁবোয়াজ জাহাজ ছয় দিন পরে সিঙাপুর ভিড়িল (২০ জুলাই)— ঘাটে মিঃ আরিয়াম কবিকে স্বাগত করিলেন। তিন বৎসর পূর্বে চীন যাইবার পথে এইখানে জাহাজ বদল করিবার জন্য নামিয়াছিলেন। আরিয়াম জাহাজে আসিয়া কবিকে জানাইলেন যে, মালয় উপদ্বীপের ব্রিটিশ গবর্নর সার্ হিউ ক্লিফোর্ড-এর ইচ্ছা কবি যেন মালয়বাসের প্রথম তিন দিন তাঁহার অতিথি হইয়া লাটপ্রাসাদে থাকেন। সুনীতিকুমার লিখিতেছেন, "লাটবাড়ির মর্যাদার মধ্যে থাকবেন— কবিকে কিন্তু এতে খুশী-খুশী ভাব দেখাল না।" তারপর জেটিতে কবির সংবর্ধনা করা হইল, সেসব কথা সুনীতিকুমারের গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে লেখা আছে।

কবি তিন দিন লাটসাহেবের অনুরোধে তাঁহার সরকারী প্রাসাদে বাস করিয়া তাঁহার সহযাত্রীরা যেখানে ছিলেন, তথায় চলিয়া গেলেন ; শহর হইতে আট মাইল দূরে সমুদ্রতীরে সিগ্‌লাপ নামক স্থানে মোহম্মদ আলী নামাজীর বাগানবাড়িটি অতিথিদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।

সিঙাপুর পৌঁছিবার পরদিন (২১ জুলাই) গার্ডেন ক্লাবে কবি-সম্বর্ধনার পার্টি। এই ক্লাব শিক্ষিত ও ধনী চীনা এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মজলিসী সভা। কবি সদস্যদের সমক্ষে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে চীনাভাষা ও চীনদেশের বিদ্যায়তনে ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির অনুশীলন যে কত প্রয়োজন, সে-সম্বন্ধে কিছু বলেন। তিনি আরও বলেন যে, বৌদ্ধধর্মের বন্ধনের জন্য চীনের প্রতি তাঁহার যে আকর্ষণ তাহা আংশিকভাবে সত্য। বৌদ্ধধর্ম নিরপেক্ষ চীনের বুনিয়াদি সংস্কৃতি যে-সার্বভৌম মানবিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহারই জন্য কবির চীনের প্রতি শ্রদ্ধা।

বাইশে জুলাই ভিকটোরিয়া থিয়েটরে কবির বক্তৃতা ; গবর্নর স্যর হিউ ক্লিফোর্ড উপস্থিত হইয়া কবিকে সভায় পরিচিত করিয়া দিলেন— কবি তখনো লাটপ্রাসাদে তাঁহার অতিথি আছেন। কবির বক্তৃতার বিষয় ছিল Unity of Man। এই ভাষণের একস্থলে আছে—

"In order to know *Man*, even the most primitive of all people had to be known before one could know oneself. They had to have their connection with the great world-culture, for if they ignored it, they are doomed।[১] আত্মানং বিদ্ধি বা Know thyself— একথা অধ্যাত্মজীবন সংগঠনে যেমন প্রয়োজন, মানুষকে জানো বা Know man, অথবা Know thy neighbour— এই উক্তিও সুস্থ সমাজজীবন যাপনের পক্ষে তেমনই আবশ্যিক। বিচিত্র মানুষকে কবি নানা দেশে দেখিয়া ফিরিতেছেন— নিজ জীবনের সাধনারই অঙ্গরূপে। প্রকৃতির সৌন্দর্য যেমন দুই চক্ষু ভরিয়া পান করেন, মানুষকে বুঝিবার, জানিবার জন্য তাঁহার তৃষ্ণার শেষ নাই।[২]

সিঙাপুর মালয় উপদ্বীপে অবস্থিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহা ভূগোলশূন্য দেশ— আন্তর্জাতিক বন্দর। এখানকার ব্যবসায়ী ধনিক বণিক আইনজীবী চিকিৎসক চাকুরে অধিকাংশই চীনা ভারতীয় ও ব্রিটিশ— মালয়লোক খুব কম দেখা যায় এই সব পেশায়। ভারতীয়দের মধ্যে মাদ্রাজীতামিল ও সিংহলীতামিল, গুজরাটি খোজা বা বেনিয়ারাই প্রধান।

১ Visva-Bharati Quarterly 1927 October, p. 278.

২ তু. When Fan Ch'ih asked the meaning of virtue the Master (Confucius) replied 'Love your fellow men'. Upon his asking the meaning of knowledge, the Master said, 'Know your fellow men'.—G. Sarton, *The Life of Science*, p. 177.

২৪ জুলাই, আজ সিঙাপুরে কবির অনেকগুলি সভা। প্রথমে দুপুর বেলা প্যালেস গে থিয়েটরে চীনা শিক্ষক-ছাত্রদের কাছে ভাষণ। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন চীনা কন্সাল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভাষণে ভারতের সহিত প্রাচীন চীনের আধ্যাত্মিক সংযোগের কথা— তাঁহার সহিত গত কয়েক বৎসর পূর্বে চীনদেশের যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে, তাহার কথা তুলিয়া বলিলেন, যে-সকল মহাপুরুষ চীন আর ভারতের সংস্কৃতিকে এক সূত্রে গাঁথিয়া দিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন ; এশিয়াখণ্ডের এই দুই বিশাল জাতির একতা-বিধানরূপ বিরাট ব্যাপারের গুরুত্ব তাঁহাদের মতই তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন। কবির ইংরেজি বক্তৃতা চীনাভাষায় অনূদিত হইয়াছিল, কিন্তু কবির সঙ্গী সুনীতিকুমার মনে করেন যে দোভাষীর পক্ষে ব্যাপারটি ততো সহজসাধ্য হয় নাই।

বৈকাল বেলায় সিগ্‌লাপে উদ্যানবাটিকায় International Fellowship নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়িবার জন্য জনাব নামাজী বহু গণ্যমান্য লোকদের আহ্বান করিয়া আনেন। সেই সন্ধ্যায় ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন গৃহের আঙিনায় জনসভা। তামিল গুরুমুখী আর বাংলায় এই সভার বিজ্ঞাপনী বিতরিত হয়। কবি খুবই ক্লান্ত ছিলেন, তৎসত্ত্বেও তাঁহাকে উপস্থিত হইতে হয়। এই জনসভায় সত্যই সাধারণ শ্রেণীর ভারতীয়রাই আসিয়াছিল— ছোটো দোকানী ব্যবসায়ী মোটরগাড়ির চালক দ্বারবান প্রভৃতি— শিখ পাঠান পঞ্জাবী-মুসলমান তামিল হিন্দু-মুসলমান গুজরাটি ভাটিয়া খোজা বোরাহরা। এইসব লোক রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে কিছু জানিত তাহা নহে, ভারত থেকে একজন নামজাদা লোক আসিয়াছেন, ইহাতেই তাহাদের গর্ব। কবির ভাষণটি সুনীতিকুমার হিন্দীভাষায় অনুবাদ করিয়া দেন। তামিল তর্জমাও একটা করা হয়— এই দুটি অনুবাদই সভায় পঠিত হয়।[১]

সিঙাপুর বাসের পঞ্চম দিবসে (২৫ জুলাই) ভিক্‌টোরিয়া থিয়েটরে নগরীর সর্বজাতীয় ছাত্র আর শিক্ষকদের জন্য আহূত সভায় সভাপতিত্ব করেন কলোনিয়াল সেক্রেটারি E. C. M. Woolfe। সভায় খুবই ভিড় হয়। কবির ভাষণের বিষয় ছিল শান্তিনিকেতনে তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার কথা। কবি হইয়া তিনি কেন শিশুদের শিক্ষাদানে আনন্দ পান সে-সম্বন্ধে বলিলেন, "Fortunately for me as a poet I have the child fresh within myself ... Most adult people do not have that natural sympathy for children. They impose upon the children their own idea of the grown-up mind without realising the needs of the childhood।"

এই দিন সন্ধ্যায় সিগ্‌লাপে কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন Lim Boon Keng নামে এক চীনা শিক্ষাব্রতী। ১৯২৪ সালে কবি যখন চীনদেশে যাইতেছিলেন, তখন ইনি কবির সহিত দেখা করিয়া আময় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে আমন্ত্রণ জানাইতে আসেন। এবার কবিকে তিনি তাঁহার (Ch'u-yuan) ছ্যু-য়ুঅন্‌-এর (Li-Sao) লী-সাও বা 'আক্ষেপ' নামে চীনা কাব্যের অনুবাদ লইয়া উপস্থিত হন। কবিকে দিয়া উহার ভূমিকা লিখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। ডক্টর লিম্‌ বুন কেঙ লী-সাও-এর ইংরেজি অনুবাদ[২], টীকা-টিপ্পনী সমেত কপি রবীন্দ্রনাথকে তিনি ডাকযোগে পিনাঙে পাঠাইয়া দিলে কবি তাহার ভূমিকা লিখিয়া দেন।

এখানে চীনের এই প্রাচীন কবি ছ্যু-য়ুঅন্‌ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, কারণ কম্যুনিস্ট চীনে তথাকার আর-একজন কবি-সাহিত্যিক লী-সাও-এর অনুবাদ করিয়াছেন, এবং সে গ্রন্থ আমাদের দেশে প্রচারিত

১ দ্বীপময় ভারত, পৃ. ৭৩-৭৪।

২ *The Li-Sao*, an elegy on encountering sorrows, 1929।

হইয়াছে।[১] এই কবি-সাহিত্যিক (Kuo Mojo) কুও মুড়ো— ইহার কথাও আমরা পূর্বে বলিয়াছি। চ্যু-যুঅন্ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের লোক (৩৪০ - ২৭৮) বলিয়া প্রবাদ। ইনি চু-রাজ্যের রাজার অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন এবং কুংফুৎসুর আদর্শে রাজ্যের নানাবিধ সংস্কারের জন্য রাজাকে অনুপ্রাণিত করেন; কিন্তু তাঁহার দুষ্ট মন্ত্রী ও পারিষদদের চক্রান্তে চ্যু-যুঅনের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অবশেষে পার্শ্ববর্তী রাজারা চু-রাজ্য আক্রমণ করে। চ্যু-যুঅন্ তাঁহার 'বিলাপ' কবিতাগুলি (Li-fao) এই ঘটনার পর লেখেন। দীর্ঘকাল তিনি একান্তে বাস করেন ও অবশেষে দেশের ও দশের কোনো উন্নতি করিতে পারিলেন না বলিয়া হুনান দেশের মি-লো নদীতে আত্মবিসর্জন করেন।

চ্যু-যুঅন্ সম্বন্ধে ডক্টর লিম্ বুন কেঙের নিকট কবি এইসব তথ্য শুনিয়া উৎসাহিত হন এবং ভূমিকা লিখিয়া দেন।[২]

বৃহত্তর ভারত : মালয় উপদ্বীপে

সিঙাপুরে সাত দিন কাটিল। ২৬ জুলাই কবি সদলে মালাক্কা যাত্রা করিলেন; কবিকে বিদায় দিবার জন্য বন্দরে অভূতপূর্ব জনতা। মালাক্কা সে-সময়ে স্ট্রেট্স সেটেলমেণ্ট বা ব্রিটিশ ক্রাউন কলোনি। ষোড়শ শতকে য়ুরোপীয়রা মালাক্কায় সর্ব প্রথম আসে; ইংরেজদের হাতে যায় ১৮২৫ অব্দে। পরবৎসর মালাক্কা সিঙাপুর ও পেনাঙ ভারতীয় প্রদেশরূপে পরিগণিত ও ১৮৩০ - ৩৭ পর্যন্ত বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত থাকে; ১৮৩৭ হইতে ব্রিটিশ উপনিবেশ -সচিবের অধীনে যায়।

মালাক্কার বন্দরে কবিকে স্বাগত করিবার জন্য স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট ও মালাক্কাবাসীদের প্রতিনিধিরূপে ব্যারিস্টার শ্রীশচন্দ্র গুহ উপস্থিত (২৭ জুলাই), তাঁহারা তাঞ্জুঙ-ক্লিঙ নামক একটি স্থানে কবির থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখেন। স্থানটি সম্বন্ধে কবি ২৮ জুলাই লিখিতেছেন, "সামনে সমুদ্রের অর্ধচন্দ্রাকার তটসীমা। অনেক দূর পর্যন্ত জল অগভীর, জলের রঙে মাটির আভাস, সে যেন ধরণীর গেরুয়া আঁচল এলিয়ে পড়েছে।··এটা একজন চিনীয় ধনীর বাড়ি। আমরা তাঁর অতিথি। প্রশস্ত বারান্দায় বেতের কেদারায় বসে আছি।"[৩] এটি একজন চীনার বাড়ি; কবি তাঁহার অতিথি।

মালাক্কায় প্রথম দিনটা গবর্মেণ্ট হাউসে লাঞ্চ বিকালে টী-পার্টি প্রভৃতি নানা রকম গোলমালে ও সামাজিকতায় কাটে; সন্ধ্যায় বড় রকম ভোজসভার আয়োজন হয় কবির খাতিরে।[৪]

১ *Li Sao and other Poems of Chu Yuan*, translated by Yang Hsien-yi and Gladys Yang.—Foreign Languages Press, Peking, 1958।

Chu Yuan: Ancient China's Patriot-Poet, with Introduction by Kuo Mojo.—The Culture and Information Office, Embassy of the People's Republic of China, New Delhi, 1953।

Chu Yuan, a play in Five Acts by Kuo Mojo.—Foreign Languages Press, Peking, 1958।

কুও মুড়ো তাঁহার অনুবাদের ভূমিকায় ডঃ লিম্ বুন কেঙ-এর পূর্বঅনুবাদের উল্লেখ নাই। ইহার কারণ লিম বুন কেঙ কম্যুনিস্ট নহেন এবং তাহাতে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল।

২ দ্বীপময় ভারত, পৃ. ৪৯।

৩ যাত্রী [জাভাযাত্রীর পত্র, পত্র ৫], পৃ. ২০৪।

৪ দ্র. দ্বীপময় ভারত, পৃ. ৯৪।

পরদিন মালাক্কা হইতে কবি চলিলেন মুআর বা বন্দর মহারানী নামক স্থানে; এই বন্দর মালাক্কা প্রণালীর উপর মুআর নদীর মোহনায় অবস্থিত; ইহা জোহোর রাজ্যের প্রধান বন্দর। মালাক্কা হইতে এখানে পৌঁছিতে পথে পড়ে মুআর নদী; কবির মোটরগাড়ি খেয়া-স্টীমারে পার হইল। মুআরে কবির বক্তৃতা হয়। এই মুআরে জোহোরের সুলতানের এক পুত্র যাঁহার উপাধি Tungku তাঁহার অধিষ্ঠান। কথা ছিল তিনি সভায় সভাপতিত্ব করিবেন; হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় স্থানীয় মালাই ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার বদলে আসেন। কবির বক্তৃতার চীনা তর্জমা ও আরিয়াম কর্তৃক তামিল তর্জমা করা হইয়াছিল। সেইদিন সন্ধ্যার পরই তাঁহারা তাঞ্জুং-ক্লিঙএ ফিরিয়া আসেন।

পরদিন (২৯ জুলাই) মালাক্কায় দুইটি সভায় কবির বক্তৃতা— একটি ভারতীয় ও চীনদের সভায়, দ্বিতীয়টি রোমান-ক্যাথলিক স্কুল (Saint Francis' Institution) গৃহে। শেষোক্ত সভায় সভাপতি হন মালাক্কার কমিশনর মিঃ ক্রাইটন (Crichton)। এই সভায় মালাক্কার প্রায় সকল শিক্ষিত লোকের সমাগম হয়। মালাক্কায় বহু তামিল চেট্টিয়ারের বাস, তাঁহাদের অনেকেই সেদিন সভায় উপস্থিত হইয়া কবির প্রতি তাঁহাদের ভক্তি নিবেদন করেন।

এইবার কবির গম্যস্থল কুআলা-লুম্‌পুর। মোটরকারযোগে মাইল-পঁচিশ গিয়া তাম্‌পিন[১] নামক স্থানে ট্রেন ধরিয়া কুআলা-লুম্‌পুরে পৌঁছিলেন সন্ধ্যার দিকে। এই নগরটি সেলংগর নামে একটি স্টেটের রাজধানী— বর্তমানে মালয় ফেডারেশনের প্রধান নগর ও রাজধানী; স্টেশনে উপস্থিত হইলে মাল্যদানের পালা শেষ হইবার "সঙ্গে সঙ্গে চেট্টিমন্দিরের রৌশনচৌকি, বাদ্য বেজে উঠল— শাঁখ ঝাঁঝর ঢোলক মন্দিরা আর সানাই। কী কর্ণভেদী আওয়াজ সেই সানাইয়ের। বাদ্যের দল স্টেশনকে কাঁপিয়ে কাঁদিয়ে চলল আগে আগে, আর তারপরে কবির সঙ্গে আমরা, আর স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তির দল।"[২]

কবি ও তাঁহার সঙ্গীদের জন্য চীনা-বণিকদের ক্লাব-বাড়ি— 'চ্যন চুক কী লো' ছাড়িয়া দেওয়া হয়। লোকে ইহাকে দশলাখিয়া ক্লাব (millionaires' club) বলিত। কুআলা-লুম্‌পুরে কবি ৩০ জুলাই হইতে ৬ অগস্ট পর্যন্ত ছিলেন; এখান হইতে চারি দিকের শহরে শহরে সফর করিয়া ফেরেন।

পরদিন (৩১ জুলাই) সকাল হইতে কবিসন্দর্শনে লোকসমাগম শুরু হইল। বিকাল বেলায় ম্যুনিসিপালিটির তরফ হইতে কবির অভিনন্দন হইল স্থানীয় টাউনহলে। সেলাংগর রাজ্যের ব্রিটিশ রেসিডেন্ট মিঃ জে. লরনী (J. Lornie) সভাপতির আসন ও স্বাগতকারিণী সভার মিঃ লোক্ চাউ থাই (Loke Chow Thye) কবিপ্রশস্তি পাঠ করেন; একটি চমৎকার রৌপ্যাধারে মানপত্রখানি অর্পিত হয়।

২ অগস্ট কবির শরীর একটু খারাপ হওয়া সত্ত্বেও একটি থিয়েটর হলে বক্তৃতা করিতে হইল; এমন-কি রাত্রে ভ্যারাইটি এনটারটেন্‌মেণ্টে গিয়া কয়েকটি কবিতাও পড়িতে হয়। পরদিনও আর-একটি বিদ্যায়তনে বক্তৃতা হইল। সেইদিনই (৩ অগস্ট) মোটরযোগে নেগ্রি সেমবিলানের রাজধানী সেরেমবান (Seremban) যান; সেখানে বক্তৃতাদি করিয়া পরদিন মধ্যাহ্নে কুআলা-লুম্‌পুরে ফিরিয়া আসেন।

চারিপাশের নানা শহর হইতে আহ্বান আসিতেছে; কুআলা হইতে প্রায় বাইশ মাইল দূরে পোর্ট সোয়েটেনহামে যাইবার পথে রেলপথের উপর অবস্থিত ক্লাঙ (Klang) চলিলেন। সেখানে সার্ ম্যালকম ওয়াটসন নামে এক ধনী

১ Tampin—Town in South Negri Sembilan State, railroad junction on west-coast line।

২ দ্বীপময় ভারত, পৃ. ১০২।

রবার-বাগিচাওয়ালা থাকেন। ইনি পূর্বে ডাক্তার ছিলেন, এখন ব্যবসায়ী। বেশ শিক্ষিত লোক, রবীন্দ্রসাহিত্যের সহিত সুপরিচিত। ইহার সহিত পরিচিত হওয়ায় কবি খুবই খুশি। স্থানীয় অ্যাংলো-চাইনীস বিদ্যালয়ে সভা হইল— সার্ ম্যালকম কবিকে পরিচিত করিতে উঠিয়া অতি হৃদয়স্পর্শী ভাষায় কবির মহত্ত্ব, আর কিভাবে তিনি নিজে কবির কাছে ঋণী সে-কথা বলিলেন। কবি ভাষণদান ছাড়া তাঁহার ইংরেজি রচনা হইতে কিছু কিছু কবিতা পাঠ করেন।

পরদিন চীনাদের Confucian schoolএ বক্তৃতা হইল ; কাজঙ (Kajang) নামে আর-একটি ক্ষুদ্র শহরে ভাষণ দিয়া কবি কুআলা-লুম্‌পুরে ফিরিয়া আসিলেন (৬ অগস্ট)।

অতঃপর কুআলা-লুম্‌পুর ত্যাগ করিয়া (৭ অগস্ট) কবি সদলে পেরাক নামে আর-একটি রাজ্যের প্রধান শহর ইপোঃ আসিলেন— পথিমধ্যে স্টেশনে স্টেশনে কবিদর্শনপ্রার্থীদের রীতিমত ঠেলাঠেলি ভিড়। পেরাকের রাজবাড়িতে কবির থাকিবার ব্যবস্থা হয় ; সভা পার্টি ভোজসভার অন্ত নাই। শেষদিন পঞ্চাশ মাইল দূরে তেলোক আনসন (Telok Anson) নামক স্থানে মোটরকারে গিয়া বক্তৃতা করিয়া আসিলেন।

ইপোঃর পর গম্যস্থল তাই-পিঙ— পেরাকের রাজধানী ; এখানে সভায় কবির বক্তৃতার বিষয় ছিল Human Destiny ; বিশ্বভারতীর কথাও কবি সবিস্তারে বলেন।[১]

দুই দিন তাই-পিঙ থাকিয়া কবি চলিলেন পিনাঙ। পিনাঙ একটি দ্বীপে অবস্থিত শহর— লঞ্চে করিয়া খাড়ি পার হইতে হয়। সরকারী লঞ্চ ছিল। পিনাঙ শহরে হইতে আট মাইল দূরে তাঞ্জঞ-বুঙাঃ নামে একটি স্থানে সমুদ্রতীরে এক ধনী চীনার বাড়িতে কবি ও তাঁহার সঙ্গীদের থাকিবার ব্যবস্থা হয়। ১৪ ও ১৫ অগস্ট কবি পিনাঙে থাকেন— বহু সভা পার্টি। ১৫ই এম্পায়ার থিয়েটর হলে বক্তৃতা— পিনাঙের রেসিডেণ্ট-কাউন্সিলর মিঃ আর. স্কট সভাপতি। কবি 'ন্যাশনালিজম' সম্বন্ধে ভাষণ দিলেন। জাতীয়তাবাদের পরিণাম কী শোচনীয় রূপ লইতেছে, সে-কথা কবি স্পষ্ট করিয়া বলেন। ১৬ অগস্ট কবি মালয় ছাড়িলেন ; আরিয়াম বিশ্বভারতীর জন্য প্রতিশ্রুত অর্থসংগ্রহের কাজে রহিয়া গেলেন।

কবির মালয় উপদ্বীপের সফর শুরু হয় ২০ জুলাই, শেষ হইল ১৬ অগস্ট। পিনাঙ আসিবার দিনে তাই-পিঙ হইতে এক পত্রে লিখিতেছেন (১৩ অগস্ট ১৯২৭)—

"ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। দিনের মধ্যে দু-তিনরকমের প্রোগ্রাম। নতুন নতুন জায়গায় বক্তৃতা নিমন্ত্রণ ইত্যাদি। · · ফললাভের প্রত্যাশা যদি না থাকত, তাহলে পাল-তোলা নৌকার মতো জীবনতরণী তীর থেকে তীরান্তরে নেচে নেচে যেতে পাবত। চলেছি উজান বেয়ে, গুণ টেনে, লগি ঠেলে, দাঁড় বেয়ে ; পদে পদে জিব বেরিয়ে পড়ছে। আমৃত্যুকাল কোনোদিন কোথাও-যে সহজে ভ্রমণ করতে পারব সে আশা বিড়ম্বনা। পথ সুদীর্ঘ, পাথেয় স্বল্প ; অর্জন করতে করতে, গর্জন করতে করতে, হোটেলে হোটেলে ডলার বর্জন করতে করতে, আমার ভ্রমণ-গলা চালিয়ে পা চালানো। পথে বিপথে যেখানে-সেখানে আচমকা আমাকে বক্তৃতা করতে বলে, আমিও উঠে দাঁড়িয়ে বকে যাই— · ·। হাসিও পায় আর দুঃখও ধরে। · · ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই, শান্তি নেই, অবকাশ নেই— তারপরে সুদীর্ঘ রেলযাত্রা, তারপরে স্টেশনে মাল্যগ্রহণ, এড্রেস্-শ্রবণ, তদুত্তরে বিনতিপ্রকাশ, তারপরে নতুন বাসায় নতুন জনতার মধ্যে জীবন-যাত্রার নতুন ব্যবস্থা।"[২]

১ দ্বীপময় ভারত, পৃ. ১৩০-১৩১।

২ যাত্রী [জাভাযাত্রীর পত্র, পত্র ৮], পৃ. ২২১-২২৩।

মালয় উপদ্বীপ ভ্রমণের সবটাই যে নিছক প্রশংসায় পূর্ণ, তা বলা যায় না। মালয় ব্রিটিশদের খাস কলোনি— টিন্‌খনি ও রবারবাগিচার মালিকরা এ দেশের শোষক ও শাসক। বহির্ভারতের বহু স্থানে ভারতীয় ও 'কুলি' প্রায় প্রতিশব্দবাচক ; মালয়ের ব্রিটিশ খনিওয়ালা ও বাগিচাওয়ালাদের কাছে ভারতীয়দের প্রধান পরিচয় এই কুলিবৃত্তির। সেই ভারতীয়দের একজন কবির "ভ্রমণ যে একটা triumphal progress হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এটা অনেকের ভালো লাগছিল না। এই অস্বস্তি আর বিরূপ-ভাবকে প্রকাশ করলে সিঙাপুরের 'মালায়া ট্রিবিউন' কাগজ।‥ ২রা অগস্টের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বেরুল Dr. Tagore's Politics ; রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ imperialism-এর বিরুদ্ধে তাব্র সমালোচনা করেছেন, তিনি 'শাংহাই টাইমস্' সংবাদপত্রে ইংরেজদের দ্বারা চীনে ভারতীয় সৈন্য পাঠানোকে আর চীনদেশে ইংরেজ জাতের রাজনৈতিক কীর্তি-কলাপকে কঠোর কশাঘাত করেছেন, ইংরেজের বহু নিন্দাবাদ করেছেন এবং আরও ইঙ্গিত করে হুমকী দেখিয়েছেন যে এশিয়ার লোকেরা য়ুরোপের নানা অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্য তৈরী হচ্ছে। এইরূপ বহু কথা ব'লে, তাঁর কাছে এই সংবাদপত্রে কৈফিয়ৎ চাওয়া হয়। ‥ঐ দিনেরই কাগজে 'শাংহাই টাইমস্'-এর প্রবন্ধ ব'লে খানিকটা লেখা তুলে দেওয়া হয়।"[১]

রবীন্দ্রনাথ 'শাংহাই টাইমসে' চীন সম্বন্ধে কোনো পত্র কখনই লেখেন নাই। আসলে ১৯২৪ সালে যখন তিনি চীন সফরে যান, সেই সময়ে চীনের বন্দরে চীনাদের উপরে ইংরেজ কর্তৃক নিযুক্ত ভারতীয় শিখ সিপাহীদের অত্যাচার দেখিয়া 'শূদ্রধর্ম' নামে প্রবন্ধে বিদেশে ভারতীয় সৈন্যনিয়োগের প্রতিবাদ করেন[২] এই প্রবন্ধের অনুবাদ মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় ১৯২৪ মার্চ মাসে— অর্থাৎ মালয় উপদ্বীপে আসিবার চারি মাস পূর্বে— প্রকাশিত হয়। এই ইংরেজি প্রবন্ধ হইতে 'শাংহাই টাইমস্' ও তার থেকে 'মালায়া ট্রিবিউন'— সার্বিক পটভূমি-বিচ্যুত কয়েকটি অংশ উদ্‌ধৃত করিয়া রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিষ উদ্‌গার করিতে থাকে। ট্রিবিউন-এর এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধের কথা জানিতে পারিয়া কবি সিঙাপুরের সবচেয়ে প্রতিষ্ঠাপন্ন কাগজে প্রতিবাদ করিয়া তার প্রেরণ করেন। মডার্ন রিভিউ-এর প্রবন্ধ বিকৃত করিয়া যে ছাপা হইয়াছে, এই তথ্যটি সুনীতিকুমারের দৃষ্টিগোচর করেন কুআলা-লুম্‌পুরের এক তরুণ তামিল। তখন ভারতীয়দের সংবাদপত্র 'মালায়ান ডেলি এক্সপ্রেস'-এ (৬ অগস্ট) – Anti-Tagore bubble pricked — an object lesson in dishonest journalism— mischievous propaganda বলিয়া কড়া মন্তব্য প্রকাশিত হইল। শাংহাই টাইমসে কবির ইংরেজি প্রবন্ধের that-এর জায়গায় and ও একটা সেমি-কোলন দিয়া অর্থের উলট পালট করা হইয়াছিল. তাহাতেই বক্তব্যের অর্থও বিকৃত হইয়া যায়।

সুনীতিকুমার লিখিতেছেন, "একটা জিনিস দেখে আমরাই অবাক হয়ে গেলুম— বে-সরকারী ইংরেজ আর ইংরেজ কর্মচারীরা‥কেউ বিচলিত হয় নি। স্থানীয় কতকগুলি বিশিষ্ট ইংরেজ কবির সঙ্গে দেখা করতে এসে কার্ড দিয়ে গেলেন ; সিঙাপুরের সব চাইতে বড়ো ক্লাব থেকে কবির সেক্রেটারিহিসাবে আরিয়ামকে চিঠি লিখে জানালে যে, এই রকম ঘৃণ্য কলমবাজীর সঙ্গে ভদ্র ইংরেজের যোগ নেই।" মালয়দেশে আলোচনা চুকিয়া গেল, আরম্ভ হইল ভারতে ও বিশেষভাবে বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের 'পরে আক্রমণ ; শুনিয়াছি দেশে ফিরিয়া কবি কোনো বিশিষ্ট সাংবাদিকের নিকট তাঁহার মনের ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

১ দ্বীপময় ভারত, ১০৫।

২ প্রবাসী, ১৩৩২ অগ্রহায়ণ।

বৃহত্তর ভারত : বালিদ্বীপে

প্রায় মাসেক কাল মালয় উপদ্বীপে সফরের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বভারতীর কথা প্রচার ও সেই প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টা। সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই— বেশ ভালো অর্থই সংগৃহীত হয়। কবি এবার চলিলেন ইন্দোনেশিয়া— বালি ও জাভা দ্বীপে— ভারতের সহিত তাহার ছিন্ন সাংস্কৃতিক যোগসূত্র পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় কবিমন কল্পনায় রঙিন হইয়া উঠিল।

পিনাঙ বন্দর হইতে 'কুয়ালা' স্টীমার ছাড়িল ১৬ অগস্ট; সারারাত্রি স্টীমার চলিয়া সুমাত্রা দ্বীপের বন্দর বেলাবান (Belawan)[১] পৌঁছিল পরদিন প্রাতে (১৭ই)। এইখানে জাহাজ বদলাইয়া জাভাগামী জাহাজ ধরিতে হইবে। ইন্দোনেশিয়ায় কবির সফরব্যবস্থার জন্য মিঃ বাকে ইতিপূর্বে পথিকৃৎরূপে আসিয়াছিলেন; তিনি ও বহু ডাচ্ ভদ্র বন্দরে কবিকে স্বাগত করিতে উপস্থিত; রবীন্দ্রনাথকে দেখিবার জন্য ডাচ্ তামিল সিন্ধী সুমাত্রান প্রভৃতি নানা জাতির লোকের ভিড় দেখা গেল বন্দরে। জাভাগামী জাহাজ ছাড়িবে অপরাহ্ণে; তাই কবির বিশ্রামের জন্য মেদান (Medan)[২] শহরের এক উঁচুদরের হোটেলে (Hotel Deboer) ব্যবস্থা হয়। হোটেলেও কবিদর্শনপ্রার্থী অনেকেই আসেন।

বেলাবান বন্দর ছাড়িয়া প্লান্সিউস (Plancius) জাহাজ সিঙাপুরে একদিনের জন্য থামিল (১৯ অগস্ট); সিঙাপুরের পুরাতন বন্ধুদের অনেকেই কবির সহিত জাহাজে আসিয়া দেখা করিয়া গেলেন— কবি ডাঙায় আর নামিলেন না।

বহুদিন পরে এই সমুদ্রের 'পরে কাব্যলক্ষ্মী চকিতে দেখা দিলেন; কবি প্লান্সিউস জাহাজে বসিয়া 'নূতন শ্রোতা' (পরিশেষ) ও 'বিদায় সম্বল' (মহুয়া) কবিতা দুইটি লিখিলেন (১৯ অগস্ট)।

সিঙাপুর হইতে ১৯ অগস্ট প্লান্সিউস জাহাজ ছাড়িয়া দুই দিন পরে (২১ অগস্ট) যবদ্বীপের বন্দর তাঞ্জোঙ প্রিওক (Tandjong Priok) পৌঁছিল। এই জাহাজে বসিয়া রবীন্দ্রনাথ 'শ্রীবিজয়লক্ষ্মী' শীর্ষক কবিতাটি লিখেন (২১ অগস্ট)। এই দীর্ঘ কবিতার প্রথম ইংরেজি খসড়া-তর্জমা করিয়া জাহাজে বসিয়া সুনীতিকুমার কবিকে দেন; কবি সেটিকে নূতন ভাবে অনুবাদ করিয়াছিলেন। মিঃ বাকে ইহার ডাচ্ অনুবাদ ও জাভাদ্বীপে নামিবার পর এক জাভানী সাহিত্যিক ইহা জাভা-'ভাষা'য় অনুবাদ করিলেন। 'শ্রীবিজয়লক্ষ্মী' কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যে প্রশ্ন ছিল এই কবি তাহার একটি উত্তর কবিতায় রচনা করেন।[৩]

সুমাত্রা জাভা ও দ্বীপাবলী লইয়া এককালে বিরাট 'শ্রীবিজয়' নামে হিন্দু রাজ্য ছিল। সেই পুরাতন ইতিহাস শুনিয়া কবির মনে যে ভাবোদয় তাহাই তিনি এই কবিতায় প্রকাশ করেন।

> তোমায় আমায় মিল হয়েছে কোন্ যুগে এইখানে।
> ভাষায় ভাষায় গাঁঠ পড়েছে, প্রাণের সঙ্গে প্রাণে।· ·

১ Belawan—Town and seaport at the mouth of Deli river, Sumatra east-coast port of Medan।

২ Medan—Commercial city of Sumatra, the second largest city on river Deli; about 15 miles from its mouth and the port of Belawan: centre of rich agricultural region, with rubber and tobacco as principal products।

৩ দ্বীপময় ভারত, পৃ, ১৪৮-৪৯।

দুইজনেতে বাঁধনু বাসা পাথর দিয়ে গেঁথে,
দুইজনেতে বসনু সেথায় একটি আসন পেতে।

তার পর—

বিরহরাত ঘনিয়ে এল কোন্ বরষের থেকে।
কালের রথের ধুলা উড়ে দিল আসন ঢেকে।
বিস্মরণের ভাঁটা বেয়ে কবে এলেম ফিরে
ক্লান্তহাতে রিক্তমনে একা আপন তীরে।··

এবার আবার ডাক শুনেছি, হৃদয় আমার নাচে,
হাজার বছর পার হয়ে আজ আসি তোমার কাছে।··
আমি তোমায় চিনেছি আজ, তুমি আমায় চেনো,
নূতনপাওয়া পুরানোকে আপন বলে জেনো।

জাভাদ্বীপের বন্দর তাঞ্জোঙ প্রিওক কবি ও তাঁহার সঙ্গীরা প্লান্‌সিউস জাহাজ হইতে নামিয়া ছয় মাইল দূরে অবস্থিত বাতাবিয়া নগরে (বর্তমান জাকার্তা) মোটরযোগে গেলেন। কবি ও তাঁহার সঙ্গীরা হোটেলে (Hotel des Indes) উঠিলেন। সেই অপরাহ্ণে কবিসম্বর্ধনা ও সন্ধ্যায় ইংরেজ কন্সাল মিঃ ক্রসবির বাটিতে নৈশভোজ। "মিস্টার ক্রসবি একটি অতি সুন্দর আর মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দিয়ে··হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তাঁর ক্ষুদ্র বক্তৃতার আবেগময়ী ভাষা আর তার হার্দিকতা—সকলেরই খুব মনোজ্ঞ হয়েছিল।"[১] পরদিন ক্রসবি নেদারল্যাণ্ডস্ ইণ্ডিয়ার গবর্নর-জেনারেলের সহিত কবিকে পরিচিত করিয়া দেন। সেইদিন দ্বিপ্রহরে বাতাবিয়ার ভারতীয়রা কবির সহিত দেখা করিতে আসিলে কবি কথাপ্রসঙ্গে বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বন্ধে ও তাঁহার আর্থিক প্রয়োজন সম্বন্ধে কিছু বলেন; বিশ্বভারতীকে সাহায্যদানকল্পে স্থানীয় সিন্ধী-বণিকদেরই উৎসাহ দেখা গেল সমধিক।

বাতাবিয়া হইতে সেই অপরাহ্ণে তাঞ্জোঙ প্রিওকে ফিরিয়া কবি ও তাঁহার সঙ্গীরা বালিদ্বীপগামী জাহাজ 'রম্ফিউস'-এ উঠিলেন (২৩ অগস্ট)। বালিদ্বীপযাত্রী রম্ফিউস জাহাজে বসিয়া কবি 'নূতন কাল' নামে কবিতা ও 'সাহিত্যে নবত্ব' নামে প্রবন্ধ লিখলেন (২৩ অগস্ট)।

কয়েকদিন পূর্বে (১৯ অগস্ট) রচিত 'নূতন শ্রোতা' ও এইদিনে লিখিত 'নূতন কাল' কবিতাদ্বয় একই সুরে বাঁধা। 'নূতন শ্রোতা'য় কবি লেখেন—

আমি বললেম, 'যাও অমিয়, আজকে পড়া থাক্,
নন্দগোপাল এনেছে তার নতুনকালের ডাক।
আমার ছন্দে কান দিল না ও যে
কী মানে তার আমিই বুঝি আর যারা নাই বোঝে।··

বাংলাসাহিত্যে তরুণের দল সাহিত্যে যে নবত্ব আনিবার জন্য প্রয়াসী, তাহার আভাস কবি পাইয়াছেন।

১ দ্বীপময় ভারত, পৃ. ১৬৬।

'পথরুধি রবিঠাকুর' আছেন— এ কথা আজ কল্লোলগোষ্ঠী সরবে প্রচার করিতেছে। কবি জানেন আজ যাহারা তরুণ— সাহিত্যে যাহারা নামিতেছে— তাহারা নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করিবে।

তাই আর-একদিন লিখিলেন 'নূতন কাল'—

আমার কাছে নন্দগোপাল যখনি হার মানো
আমারি সেই হার,
লজ্জা সে আমার।
ধুলোয় যেদিন পড়ব যেন সেই জানি নিশ্চিত,
তোমারি শেষ জিত।

কবি জানেন দ্রোণাচার্যের গৌরব অর্জুনের বিক্রমে। যেদিন এই কবিতা লিখেন সেইদিনই 'সাহিত্যে নবত্ব' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেন। কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যে দুর্বল মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে— প্রবন্ধে তাহার লক্ষণ মাত্র নাই; সেখানে তিনি যোদ্ধা— তথ্য ও তত্ত্ব সমন্বিত যুক্তিবাদী। অন্য পরিচ্ছেদে আমরা সাহিত্যের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিব, এখন কবির দ্বীপময় ভারত পরিক্রমণ সম্বন্ধে ঘটনাবলীর মধ্যে প্রবেশ করা যাউক।

তবে কবির মনে যে সাময়িকীর মধ্যেই আবিষ্ট ছিল, তাহা নহে; 'বিদায়সম্বল' (১৯ অগস্ট। মহুয়া) ও 'আরেক দিন' (২৩ অগস্ট। পরিশেষ) কবিতাদ্বয়ে সাময়িকীর কোনো ছাপ নাই— তাহারা লিরিকধর্মী কবিতা।

কবি জাভাযাত্রীর পত্রে লিখিতেছেন, "জাভার রাজধানী বাটাভিয়ায় এসে পৌঁছনো গেল। আজকাল পৃথিবীর সর্বত্রই বড়ো শহর মাত্রই দেশের নয়, কালের শহর। সবাই আধুনিক।· · মুখ দেখা যায় না, মুখোশ দেখি। সেই মুখোশগুলো এক কারখানার একই ছাঁচে ঢালাই করা।· · হোটেলের খাঁচায় ছিলেম দিন-তিনেক; অভ্যর্থনায় ত্রুটি হয় নি।· · বাটাভিয়া থেকে জাহাজে করে বালিদ্বীপের দিকে রওনা হলুম। ঘণ্টা কয়েকের জন্য সুরবায়া শহরে আমাদের নামিয়ে নিলে। এও একটা আধুনিক শহর; জাভার আঙ্গিক নয়, জাভার আনুষঙ্গিক। আলাদিনের প্রদীপের মন্ত্রে শহরটাকে নিউজীলণ্ডে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলেও খাপছাড়া হয় না।"[১]

সুরবায়া পূর্বজাভার বিশিষ্ট শিল্পকেন্দ্র ও বন্দর; বহু লোক জেটিতে আসিয়া কবির প্রতি সম্মান দেখাইল। ২৬ অগষ্ট রম্ফিউস জাহাজ বালিদ্বীপের বন্দর বুলেলঙ[২] পৌঁছিল। কবির সঙ্গে আছেন সুনীতিকুমার, ধীরেন্দ্র দেববর্মণ, সুরেন্দ্রনাথ কর, মিঃ ও মিসেস বাকে এবং কয়েকজন ডাচ্। বালিদ্বীপ ভারতের বাহিরে একমাত্র দেশ যেখানে এখনো হিন্দুধর্ম জীবন্ত আছে; অধিবাসীর শতকরা নব্বই জনই হিন্দু; আশ্চর্যের বিষয় পার্শ্বস্থ দ্বীপ লম্বকের দশমাংশ মাত্র হিন্দু— আর সবই মুসলমান। জাভা ও সুমাত্রা বহুকাল ইসলামধর্ম গ্রহণ করিয়াছে।

বালিদ্বীপে কবির গন্তব্যস্থল বাঙ্‌লি[৩] নামক একটি স্থান; সেখানকার রাজা বা পুঙ্গবের কোনো আত্মীয়ের আদ্য শ্রাদ্ধ; সেই শ্রাদ্ধোৎসব দেখিতে সকলে চলিয়াছেন। পথের কিয়দ্দূর সমতল— 'ধরণী চিরযৌবনা মূর্তি'। কয়েক মাইল পরেই পথ পাহাড়ে। কিন্তামণি নামক স্থানে সকলে বিশ্রাম করিয়া লইলেন, বাঙ্‌লি পৌঁছাইতে বেলা দ্বিপ্রহর

১ যাত্রী [জাভাযাত্রীর পত্র, পত্র ৯], পৃ. ২২৭-২৮।

২ বুলেলঙ, Boeleleng, Buleleng : Seaport town north-coast of Bali, port of Singaradja—harbour unsafe during west monsoon.

৩ বাঙ্‌লি; বঙ্‌গ শব্দ দিয়া পূর্ব দ্বীপালীতে অনেকগুলি স্থান আছে। বঙ্গ শব্দের সঙ্গে কি কোনো যোগ আছে। বঙ্গ শব্দের একটি অর্থ রাং (tin)।

হইল। রাজবংশে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, শোকের চিহ্ন নাই। 'রাজার মৃত্যু হয়েছে অনেকদিন আগে, এতদিনে তাঁর আত্মা দেবসভায় উত্তীর্ণ, উৎসব তাই নিয়ে।' রবীন্দ্রনাথ সভাক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তন্ন তন্ন করিয়া উৎসবটি দেখিলেন; কবি লিখিতেছেন, "এখানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় এত অসম্ভব রকম ব্যয় যে সুদীর্ঘকাল লাগে তার আয়োজন।·· সর্বস্ব দিতে হচ্চে তার ব্যয় বহন করবার জন্যে।·· অতীতকাল যত বড়ো কালই হোক্, নিজের সম্বন্ধে বর্তমান কালের একটা স্পর্ধা থাকা উচিত।"

বাঙ্‌লির শ্রাদ্ধোৎসবের অঙ্গরূপে প্রাসাদের কাছে যাত্রাভিনয় হইতেছিল; কবি সেখানে কিছুক্ষণ বসিলেন, দেখিলেন বাংলাদেশের যাত্রার ঢঙ। অতঃপর রাজবাড়িতে গিয়া মধ্যাহ্নভোজ— বহুলোক উপস্থিত তাঁহাদের মধ্যে কারেন-আসেম-এর রাজা, পরিষদসহ বালির ডাচ্-গবর্নর প্রভৃতিও আছেন। ভোজ শেষ হইতে বেলা তিনটা; কবি লিখিতেছেন, "সকালে সাড়ে ছটার সময় জাহাজ থেকে নেমেছি; ঘাটের থেকে মোটরে আড়াই ঘণ্টা ঝাঁকানি ও ধুলো খেয়ে যজ্ঞস্থলে আগমন। এখানে ঘোরাঘুরি দেখাশুনা সেরে বিনা স্নানেই অত্যন্ত ক্লান্ত ও ধূলিম্লান অবস্থায় নিতান্ত বিতৃষ্ণার সঙ্গে খেতে বসেছি।·· আহার ও আলাপ আপ্যায়ন সেরে আমাদের নিমন্ত্রণকর্তা রাজার সঙ্গে তাঁর মোটরগাড়িতে চ'ড়ে আবার সুদীর্ঘ পথ ভেঙে চললুম তাঁর [কারেন-আসেম] প্রাসাদে।"[১]

"রাজপুরীতে প্রবেশ করেই দেখি, প্রাঙ্গণে একটি বেদির উপর বিচিত্র উপকরণ সাজানো, এখানকার চারজন ব্রাহ্মণ— একজন বুদ্ধের, একজন শিবের, একজন ব্রহ্মার, একজন বিষ্ণুর পূজারি।·· এঁরা চারজন পাশাপাশি ব'সে আপন-আপন দেবতার স্তবমন্ত্র পড়ে যাচ্ছেন।·· শোনা গেল, এই মাঙ্গল্যমন্ত্রপাঠ চলছিল রাজবাড়িতে আমারই আগমন উপলক্ষ্যে।"[২]

কারেন-আসেমের রাজা কবির আনন্দ-বর্ধনের জন্য বালিদ্বীপের নৃত্যের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। বালি ও পরে জাভার নৃত্যকলা কবি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে পরিদর্শন করেন এবং তার ভিতর হইতে অনেক-কিছুই মনের মধ্যে সঞ্চয় করিয়া লন। নৃত্যের দ্বারা অভিনয় বালিনী নৃত্যের বৈশিষ্ট্য। কবি এক পত্রে লিখিতেছেন, "এ দেশে উৎসবের প্রধান অঙ্গ নাচ।·· এক-একটি জাতির আত্মপ্রকাশের এক-একটি বিশেষ পথ থাকে।·· এখানে এদের প্রাণ যখন কথা কইতে চায় তখন সে নাচিয়ে তোলে। মেয়ে নাচে, পুরুষ নাচে। এখানকার যাত্রা অভিনয় দেখেছি, তার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চলায়-ফেরায়, যুদ্ধে-বিগ্রহে, ভালোবাসার প্রকাশে, এমন-কি ভাঁড়ামিতে, সমস্তটাই নাচ। সেই নাচের ভাষা যারা ঠিকমতো জানে তারা বোধ হয় গল্পের ধারাটা ঠিকমতো অনুসরণ করতে পারে।·· রাজবাড়িতে আমরা নাচ দেখছিলুম।·· এই নাচ-অভিনয়ের বিষয়টা হচ্ছে শাল্ব-সত্যবতীর আখ্যান। এর থেকে বোঝা যায়, কেবল ভাবের আবেগ নয়, ঘটনা-বর্ণনাকেও এরা নাচের আকারে গড়ে তোলে।·· এদের নাচের মধ্যে শুধু ছন্দ থাকলে তাতে আখ্যানবর্ণনা চলে না, সংকেতও আছে; এই দুইয়ের যোগে এদের নাচ। এই নাচে রসনা বন্ধ করে এরা সমস্ত দেহ দিয়ে কথা কইছে ইঙ্গিতে এবং ভঙ্গীসংগীতে।"[৩]

কারেন-আসেম রাজবাড়ির উৎসব-আতিশয্য অত্যন্ত ক্লান্তিকর হইয়া উঠায় কবি 'রাজপুরী থেকে পালিয়ে আম্পুল তীর্থাশ্রমেষু নির্বাসন গ্রহণ' করিলেন। স্থানটির নাম তাম্পাক-সিরিঙ— এক জলাধারের নাম। সুনীতিকুমার বালি-দ্বীপের ধর্ম সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য কারেন-আসেমে থাকিয়া গেলেন। তাম্পাক-সিরিঙ স্থানটি কবির

১ যাত্রী [জাভাযাত্রীর পত্র, পত্র ১০], পৃ. ২৪১।

২ যাত্রী [জাভাযাত্রীর পত্র, পত্র ১০], পৃ. ২৪৬।

৩ যাত্রী [জাভাযাত্রীর পত্র, পত্র ১১], পৃ. ২৫২-৫৩।

ভালোই লাগিতেছে; 'লোকের ভিড় নেই, অভ্যর্থনা পরিচর্যার উপদ্রব নেই।' চারি দিকে সুন্দর গিরিব্রজ, শস্যশ্যামলা উপত্যকা। এই নির্মল স্থানে দিন দুই বাস করিয়া শরীর মন বেশ প্রফুল্ল হইল।

এইবার কবির গম্যস্থল গিয়াঙা— সেখানেও রাজ-নিমন্ত্রণ। এই স্থানের বিস্তারিত বর্ণনা এক পত্রে লেখেন রানী দেবীকে; আর সুনীতিকুমারও পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়াছেন এখানকার উৎসবের। রাজবাটীর সংলগ্ন তোরণদ্বারের কাছে একটা প্যাভিলিয়নে কবির বিশ্রামের জন্য স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে; এইখানে বালির চারি দিকের লোকের চলাফেরা কাজকর্মের একটা স্পষ্ট ছবি কবির সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। রাত্রে কবির জন্য রাজা মুখোশ-পরা অভিনয় বা তোপেঙ-এর ব্যবস্থা করেন। মুখোশ-নৃত্য ও অভিনয়ের রীতি আসামে, ওড়িষার সরাইখেলে, বাংলাদেশের পুরুলিয়া অঞ্চলে— আবার সুদূর চীন ও জাপানে দেখা যায়; মাঝখানে জাভা ও বালিদ্বীপেও।

গিয়াঙা হইতে কবি এবার চলিলেন বাদুঙ (Badoeng)— এটি দক্ষিণ বালির বড়ো শহর; প্রসঙ্গত বলি এ-দ্বীপে রেলপথ নাই— সর্বত্রই মোটরগাড়ি করিয়া যাতায়াত করিতে হইতেছে। বাদুঙে কবি ও তাঁহার সঙ্গীদের জন্য একটি খালি সরকারী বাড়ি ছাড়িয়া দেওয়া হয়; বাড়িটি পরিপাটি, বেশ একটা বড়ো হাতার মধ্যে।

বাদুঙ-এর নিকট উবুদ নামে একটি স্থানে আর-একটি শ্রাদ্ধোৎসব ছিল— সেইটি দেখিবার জন্য সকলে এখানে আসিয়াছেন। এইখানকার নৃত্যশীলা মেয়েদের শোভাযাত্রা শিল্পী সুরেন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে; একদিন কবিও এই শোভাযাত্রা দেখিলেন। বালিদ্বীপের নৃত্যনাট্য ও নৃত্যশীলা মেয়েদের শোভাযাত্রা পরযুগে শান্তিনিকেতনের নৃত্য[১] ও উৎসবাদিকে কিভাবে প্রভাবান্বিত করে— সে-সম্বন্ধে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব।

বাদুঙ হইতে কবি মুণ্ডুক (Moendoeck) নামক স্থানে যান (৫ সেপ্টেম্বর)। অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিতেছেন (৮ই), "মুণ্ডুক বলে একটি পাহাড়ের উপর ডাকবাঙলায় আশ্রয় নিয়েছি।·· এখানে এসে পাহাড়ের গা-জুড়ে প্রাচীন অরণ্য দেখা গেল।"[২] তিনদিন মুণ্ডুকে থাকিয়া কবি সদলে ৮ সেপ্টেম্বর বুলেলঙ বন্দরে ফিরিলেন ও সেইখান হইতে জাহাজ ধরিয়া জাভাযাত্রা করিলেন।

মুণ্ডুকে বাসকালে কবির সহিত সুনীতিকুমারের যেসব বিষয়ের আলোচনা হয় তাহার মধ্যে মিস্ ক্যাথারিন মেয়ো লিখিত 'মাদার ইণ্ডিয়া' নামে গ্রন্থ ছিল অন্যতম। রবীন্দ্রনাথ মুণ্ডুকের ডাকবাঙলা হইতে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে এক পত্র লিখিয়া 'ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানে' পাঠাইয়া দেন। এই প্রবন্ধটি রেভা. জে. টি. সান্ডারল্যান্ডের 'আন্‌হ্যাপি ইণ্ডিয়া'[৩] গ্রন্থের ভূমিকারূপে ব্যবহৃত হয়।

বালিদ্বীপের স্মৃতি বহন করিয়া জাভাদ্বীপ ত্যাগের দিন (১ অক্টোবর) কবি 'বালি' নামে একটি কবিতা লেখেন।

সাগরজলে সিনান করি সজল এলোচুলে
বসিয়াছিলে উপল-উপকূলে।··

১ যাত্রী [জাভাযাত্রীর পত্র, পত্র ১১], পৃ. ২৬৩।

২ বৃক্ষরোপণ উৎসবে শান্তিনিকেতনে ছাত্রছাত্রীরা নৃত্যভঙ্গীসহকারে শোভাযাত্রা করে; তাহাতে এই বালিনী নৃত্যলীলার প্রভাব সুস্পষ্ট।

৩ J. T. Sunderland, *Unhappy India* মডার্ন রিভিউ অপিস হইতে প্রকাশিত হয়। ব্রিটিশ সরকার এই গ্রন্থ পরে নিষিদ্ধ (proscribe) করেন।

মকরচূড় মুকুটখানি পরি ললাট-'পরে
ধনুকবাণ ধরি দখিন করে
দাঁড়ানু রাজবেশী—
কহিনু, 'আমি এসেছি পরদেশী'।

এই কবিতাটি এখন মহুয়া কাব্যখণ্ডে 'সাগরিকা' নামে পরিচিত। 'পরিশেষ' কাব্যে দ্বীপময় ভারত সম্বন্ধে অন্য কবিতাগুলি আছে। কিন্তু এই কবিতাটির নাম পরিবর্তন ও পরিবেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া 'মহুয়া' কাব্যের মধ্যে দেওয়াতে কবিতাটির পটভূমি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

বৃহত্তর ভারত : জাভাদ্বীপে

বালিদ্বীপে প্রায় পক্ষকাল কাটাইয়া কবি বুলেলঙ বন্দর হইতে (৮ সেপ্টেম্বর) জাভাযাত্রা করিলেন ; ৯ সেপ্টেম্বর জাভার অন্যতম বন্দর-নগর সুরবায়া পৌঁছিয়া দেখেন জাহাজঘাটে স্থানীয় ভারতীয়রা স্বাগত করিবার জন্য উপস্থিত। কবির থাকিবার ব্যবস্থা হয় মংকুনগরো উপাধিযুক্ত এক রাজার বাড়িতে।

সুরবায়া চিনি উৎপাদন ও রপ্তানীর জন্য বিখ্যাত স্থান। আমাদের আলোচ্যপর্বে জাভা হইতে আমদানী চিনি ভারতের নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী ছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, "এমন এক কাল ছিল, পৃথিবীতে চিনি বিতরণের ভার ছিল ভারতবর্ষের।" এই প্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন, "দেশের প্রতি প্রেম জাগাবার জন্যে দেশের জিনিস ব্যবহার করব, এটা ভালো কথা ; কিন্তু দেশের প্রতি প্রেম জানাবার জন্যে দেশের জিনিস উৎপাদনের শক্তি বাড়াতে হবে, এটা হল পাকা কথা। এইখানে বিদ্যার দরকার ; সেই বিদ্যা বিদেশ থেকে এলেও তাকে গ্রহণ করলে আমাদের জাত যাবে না, পরন্তু জান রক্ষা পাবে।"[১]

কবি তিন দিন সুরবায়ায় থাকেন। প্রথম দিনে কবি-সংবর্ধনা সভায় ডাচ্ রেসিডেণ্ট, ব্রিটিশ ভাইস-কন্সাল, চীনা কন্সাল প্রভৃতি সরকারী-বেসরকারী বহু লোক উপস্থিত হন। ভাইস-কন্সালের ভাষণটি সকলেরই ভালো লাগে। কবিরও অদৃষ্ট ভালো বলিতে হইবে— তিনি সেদিন দেড় শো গিলডারের বা হাজার টাকার এক তোড়া নাগরিকদের নিকট হইতে দক্ষিণা পাইলেন।

পরদিন তাঁহার সঙ্গীরা সুরবায়ার নিকটস্থ মজপহিত (Madjapahit) নামে প্রাচীন স্থান দেখিতে গেলেন, কবি থাকিয়া গেলেন। সে-রাত্রে স্থানীয় কলাভবনে (Kunstkring) কবির আর্ট সম্বন্ধে ভাষণ হইল।

১২ সেপ্টেম্বর সুরবায়া ত্যাগ করিয়া কবি ও তাঁহার সঙ্গীরা শূরকর্তা নগরে চলিলেন। "জাভার সবচেয়ে বড়ো রাজপরিবারের এইখানেই অবস্থান। ওলন্দাজেরা এঁদের রাজপ্রতাপ কেড়ে নিয়েছে কিন্তু প্রতিপত্তি কাড়তে পারেনি। এই বংশের একটি পরিবারের বাড়িতে আছি। তাঁহাদের উপাধি মংকুনগরো, এঁদেরই এক শাখা সুরবায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। · · রাজা স্টেশনে গিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করে এনেছিলেন।"[২]

১ যাত্রী [জাভাযাত্রীর পত্র, পত্র ১৩] পৃ. ২৭৬।

২ যাত্রী [জাভাযাত্রীর পত্র, পত্র ১৩], পৃ. ২৭৯।

জাভার দিনগুলি কিভাবে কাটে, তাহা 'জাভাযাত্রীর পত্র'ধারায় কবি লিখিয়াছেন; সুনীতিকুমারও 'দ্বীপময় ভারতে' তাহা সবিস্তারে বলিয়াছেন। সুতরাং সেসব ঘটনার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

জাভার যে বিষয়টি কবিকে বিশেষভাবে স্পর্শ করিয়াছিল, সেটি জাভানী নৃত্য ও ছায়া-অভিনয়। কোনো কোনো দিন রাত্রি বারোটার পর পর্যন্ত এই নৃত্য কবি দেখেন।

জাভানী মেয়েদের নৃত্য দেখিয়া কবি লিখিতেছেন, "এমনতরো বাহুল্যবর্জিত সুপরিচ্ছন্নতার সামঞ্জস্য আমি কখনও দেখিনি।· · জাপানে ও জাভাতে যে-নাচ দেখলুম তার সৌন্দর্য যেমন তার শালীনতাও তেমনি নিখুঁত।" শূরকর্তার রাজপ্রাসাদে কবি-সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে যে নৃত্য হয়, তাহাতে রাজকন্যারা যোগদান করেন। একদিন রাজার ভ্রাতা একলা নাচিলেন; তিনি ঘটোৎকচের ভূমিকায় নামেন— নাচের বিষয় প্রিয়তমা ভার্গবীকে স্মরণ করিয়া বিরহী-উৎসুক্য।

"শূরকর্তার শহরে একটি নূতন সাঁকো ও রাস্তা তৈরি শেষ হয়েছে, সেই রাস্তা পথিকদের ব্যবহারের জন্য মুক্ত করে দেবার ভার" পড়ে কবির উপর। কবি লিখিতেছেন, "কাজটা আমার লাগল ভালো; মনে হল, পথের বাধা দূর করাই আমার ব্রত। আমার নামে এই রাস্তার নামকরণ হয়েছে" (Tagoro strat)।

১৮ সেপ্টেম্বর কবি শূরকর্তা ত্যাগ করিয়া যোগ্যকর্তা অভিমুখে চলিলেন; পথে প্রাম্বানান (পেরাম্বান); বোরোবুদুরের ন্যায়ই এই স্থানটি হিন্দুসভ্যতার এক উৎকৃষ্ট সৃষ্টি। এখানকার ভাঙা মন্দিরগুলি দেখিবার জন্য কবি নামিলেন; "জায়গাটা ভুবনেশ্বরের মতো মন্দিরের ভগ্নস্তূপে পরিকীর্ণ। ভাঙা পাথরগুলি জোড়া দিয়ে দিয়ে ওলন্দাজ গবর্মেণ্ট মন্দিরগুলিকে তার সাবেক মূর্তিতে গড়ে তুলছেন।"

যোগ্যকর্তায় পাকু-আলম উপাধিধারী রাজার বাটীতে ইঁহারা অতিথি। এখানকার প্রধান ব্যক্তি হইতেছেন সুলতান। সুলতানের মন্ত্রী তাঁহার নিজ বাড়ির ও সুলতানের বাড়ির ছেলেমেয়েদের লইয়া রামায়ণের জটায়ুবধের অভিনয় করাইলেন।

যোগ্যকর্তায় শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের অনুপ্রেরণায় বৎসর কয়েক পূর্বে স্বর্যলিঙ্ রাট্ নামে এক জাভানী ভদ্রলোক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এখানে কবিকে যাইতে হয়; "কবিকে স্বাগত করলে তাঁর নামে, যবদ্বীপীয় ভাষায় যে গান বেঁধেছিল তা ছাত্রছাত্রীরা গাইলে, ইংরেজিতে অভিনন্দন পাঠ করলে। কবিকে কিছু বলতে হল। এরা কবির আগমনে সত্য সত্যই খুবই খুশী হন।" জাভার শিক্ষিত লোকেরা ডাচ্ অনুবাদের মাধ্যমে কবির সাহিত্য বিষয়ে অনেকেই ওয়াকিবহাল, নোটো সোরোটো (Noto Soeroto) নামে বিখ্যাত জাভানী লেখক পিয়ার্সনের 'শান্তিনিকেতন' নামে ইংরেজি বই-এর অনুবাদক— *Opvoedings idealen* (open-air school)। কয়েক বৎসর পূর্বেই তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল।

তিন দিন যোগ্যকর্তায় থাকিয়া কবি ও তাঁহার সঙ্গীরা বোরোবুদুর স্তূপ দেখিতে গেলেন। "দুজন ওলন্দাজ পণ্ডিত ভালো করে ব্যাখ্যা করবার জন্য সঙ্গে ছিলেন।" কিন্তু স্তূপ দেখে কবিমানসে যে ভাবোদয় হয়, ক্রিটিক রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণী মনে তাহা যেন পরাস্ত হয়। কবি লিখিতেছেন "বোরোবুদুরের ছবি অনেকবার দেখেছি। তার গড়ন আমার চোখে কখনোই ভালো লাগেনি। আশা করেছিলুম হয়ত প্রত্যক্ষ দেখলে এর রস পাওয়া যাবে। কিন্তু, মন প্রসন্ন হল না। থাকে-থাকে একে এমন ভাগ করেছে, এর মাথার উপরকার চূড়াটুকু এর আয়তনের পক্ষে এমন ছোটো যে, যত বড়োই এর আকার হোক এর মহিমা নেই।· · এটা যেন কেবলমাত্র একটা আধারের মতো, বহুশত বুদ্ধমূর্তি ও বুদ্ধের জাতককথার ছবিগুলি বহন করবার জন্যে মস্ত একটা ডালি। সেই ডালি থেকে তুলে তুলে

দেখলে অনেক ভালো জিনিস পাওয়া যায়।⋯প্রতিদিনের প্রাণলীলার অজস্র প্রতিরূপ, অথচ তার মধ্যে ইতর অশোভন বা অশ্লীল কিছুমাত্র নেই।"[১]

প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার এই বিরাট কীর্তি দেখিয়া কবির মনে যে ভাবোদয় হয়, তাহা একটি কবিতায় প্রকাশ পায় (২৩ সেপ্টেম্বর) পরিশেষ —

কত যাত্রী কতকাল ধরে
নম্রশিরে দাঁড়ায়েছে হেথা করজোড়ে।
পূজার গম্ভীর ভাষা খুঁজিতে এসেছে কত দিন,
তাদের আপন কণ্ঠ ক্ষীণ।
ইঙ্গিতপুঞ্জিত তুঙ্গ পাষাণের সংগীতের তানে
আকাশের পানে
উঠেছে তাদের নাম,
জেগেছে অনন্ত ধ্বনি,— 'বুদ্ধের শরণ লইলাম।'
অর্থ আজ হারায়েছে সে-যুগের লিখা,
নেমেছে বিস্মৃতিকুহেলিকা।
অর্ঘ্যশূন্য কৌতূহলে দেখে যায় দলে দলে আসি
ভ্রমণবিলাসী—
বোধশূন্য দৃষ্টি তার নিরর্থক দৃশ্য চলে গ্রাসি।

বোরোবুদুর দেখিয়া কবি এবার প্রত্যাবর্তনের পথে বাতাবিয়া (জাকার্তা) অভিমুখে চলিলেন; পথে বাণ্ডুঙ (Bandoeng)। এই শহরে কবি তিন দিন কাটাইলেন। শহরের বাহিরে পাহাড়ের উপর নির্জন স্থানে ডি মন্ট নামে এক ভদ্রলোকের আতিথ্য লাভ করেন: নিভৃত 'বাড়িতে এসে বড়ো আরাম বোধ হচ্ছে।'

বাণ্ডুঙ হইতে (২৭ সেপ্টেম্বর) বাতাবিয়া ফিরিয়া তিন দিন কবিকে হোটেলে থাকিতে হয়; অতঃপর ৩০ সেপ্টেম্বর প্রাতে কবি বিপুল জনসমাগমের মধ্যে জাভাদ্বীপ হইতে বিদায় লইলেন; সিঙাপুর হইয়া সিয়াম চলিয়াছেন।

'মাইয়ার' জাহাজে কবি জাভা হইতে সিঙাপুর যাইতেছেন; দ্বিতীয় দিন জাহাজে বসিয়া 'বালি' নামে যে কবিতাটি লিখিলেন (১ অক্টোবর) তাহার কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। 'বালি'র উদ্দেশ্যে লিখিত হইলেও ইহা ইন্দোনেশিয়া পরিভ্রমণের পর তাঁহার মনে যে ভাবরাশির উদয় হয়, তাহারই প্রকাশ। জাভায় হিন্দুসভ্যতা ১৫ শতক পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল; তার পর স্বেচ্ছায় লোকে ইসলাম গ্রহণ করে। কবি সেই কথা স্মরণ করিয়া লিখিলেন—

সহসা বায়ু বহিল প্রতিকূলে
প্রলয় এল সাগরতলে দারুণ ঢেউ তুলে।
লবণজলে ভরি
আঁধার রাতে ডুবাল মোর রতনভরা তরী।

১ যাত্রী [জাভাযাত্রীর পত্র, পত্র ১৯], পৃ. ৩১৭।

আবার ভাঙা ভাগ্য নিয়ে দাঁড়ানু দ্বারে এসে
ভূষণহীন মলিন দীন বেশে।
দেখিনু আমি নটরাজের দেউলদ্বার খুলি,
তেমনি ক'রে রয়েছে ভরে ডালিতে ফুলগুলি।· ·

এবার মোর মকরচূড় মুকুট নাহি মাথে,
ধনুকবাণ নাহি আমার হাতে ;
এবার আমি আনি নি ডালি দখিন সমীরণে
সাগরকূলে তোমার ফুলবনে।
এনেছি শুধু বীণা,
দেখো তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পার কি না।

বৃহত্তর ভারত : সিয়ামে

কবি যখন শূরকর্তায়, সে সময়ে সিয়াম (থাইল্যাণ্ড, মুরুঙথাই, প্রদেশ থাই) হইতে আরিয়ামের টেলিগাফ পান (২০ সেপ্টেম্বর)— সিয়ামের লোকে কবিকে তাহাদের মধ্যে পাইতে চায়। সিঙাপুর হইতে 'কিস্তা' নামে জাহাজে উঠিয়া পিনাঙ যাত্রা করিলেন। এই জাহাজে বসিয়া তিনি 'বিচিত্রা' পত্রিকার সম্পাদককে এক পত্র লিখিয়া জানাইয়া দেন যে তাঁহার পত্রিকায় 'তিনপুরুষ' নামে যে উপন্যাস ধারাবাহিক প্রকাশিত হইতেছে তাহার নাম অতঃপর 'যোগাযোগ' হইবে। এই পরিবর্তন করার কারণ ঐ নামে একটি উপন্যাস বাজারে আছে।[১]

৫ অক্টোবর জাহাজ পিনাঙ পৌছিল ; কবির থাকিবার ব্যবস্থা হয় তাঙ্গোঙ-বাঙ্লি নামে শহরতলীর একটি বাড়িতে। পরদিন বিজয়া দশমী— কিন্তু কোথায় শারদশ্রী— ঝড়বৃষ্টি দুর্যোগের মধ্যে দিন কাটিয়া গেল।

পিনাঙ হইতে সমুদ্রের খাড় পার হইয়া অপর তীরে ওয়েলেসলি শহরের স্টেশন হইতে সিয়াম রাজকীয় রেলপথের আরম্ভ।

.কবি ও তাঁহার সঙ্গীরা ৮ অক্টোবর সিয়ামের রাজধানী বাংকক পৌঁছিলেন। স্থানীয় ভারতীয়রা কবির আতিথ্যভার গ্রহণ করিয়া ফিআ-থাই নামে নগরীর শ্রেষ্ঠ হোটেলে (Phya Thai Palace Hotel) কবির ও তাঁহার সঙ্গীদের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন।

বাংককে পৌঁছিবার মুহূর্ত হইতে নানা অনুষ্ঠানে যোগদানের আহ্বান আসিল। শিক্ষাসচিব প্রিন্স ধানী (Dhani)-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া শিক্ষা সম্বন্ধে কবি আলোচনা করেন। সেই দিনই Rajbopitar (রাজপবিত্র)

১ পত্র তিনপুরুষ (নামান্তর)। 'কিস্তা' জাহাজ। শ্যামের পথ। ৪ অক্টোবর ১৯২৭। বিচিত্রা ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ, পৃ. ৭৮৯-৯১। দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী ৯, গ্রন্থপরিচয় পৃ. ৫৪৪-৪৬। বিচিত্রায় ১৩৩৪ আশ্বিন ও কার্তিকের সংখ্যায় 'তিনপুরুষ' নামে এবং অগ্রহায়ণ হইতে 'যোগাযোগ' নামে প্রকাশিত হয়।

মন্দিরের প্রধান ধর্মগুরুর সহিত দেখা করেন। পরদিন সিয়ামের সমরসচিব কুমার নগরস্বর্গর সঙ্গে দেখা করেন; পথে স্বর্গীয় মহারাজ চূড়ালংকারের মূর্তিতে দেশের রীতি অনুসারে মাল্যাদি দান করিয়া কবি রাজপ্রাসাদে (তুষিত) উপস্থিত হন। সেখানে চূড়ালংকারের পত্নী নগরস্বর্গর জননী— মহারানী সুকুমার-মারশ্রী অগ্ররাজ দেবীর শবাধারে কবিকে মাল্যদান করিতে হয়। কবি অর্ঘ্যর সহিত এই প্রস্তাবটি লিখিয়া দান করেন—

পুণ্যচরিতায়াং মহারাজাধিরাজ শ্রীচূড়ালংকরণ দেব মহিষ্যাঃ অগ্ররাজ দেব্যা পুণ্যলোক বাসিন্যা শ্রীসুক্ষমাল্যশ্রিয়ঃ শ্রদ্ধোপায়নম্ মাল্যময়ম্ অর্ঘমেতৎ অর্পিতম্ কবিনা ভারতবর্ষাদাগতেন শ্রীরবীন্দ্রেন। বুদ্ধাব্দাঃ ২৪৭০ আশ্বিন পৌর্ণমাস্যাম।

এই দিন (১০ অক্টোবর) কবি প্রিন্স দামনোগ রাজানুভব-এর বাড়িতে তাঁহার বিখ্যাত আর্টসংগ্রহ দেখিবার জন্য যান।

পরদিন (১১ অক্টোবর) কবি Prince of Chantabun-এর সহিত মিলিত হন; ইনি থাইলিপিতে পালি ত্রিপিটক বহু খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন— বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারের জন্য উহা উপহার করিলেন।

এই দিন 'সিয়াম' সম্বন্ধে প্রথম কবিতাটি লিখিত হইল; ইহা বুদ্ধদেবেরই প্রশস্তি—

ত্রিশরণ মহামন্ত্র যবে
বজ্রমন্দ্ররবে
আকাশে ধ্বনিতেছিল পশ্চিমে পুরবে,
মরুপারে, শৈলতটে, সমুদ্রের কূলে উপকূলে,
দেশে দেশে চিত্তদ্বার দিল যবে খুলে · ·
সে-মন্ত্র অমৃতবাণী হে সিয়াম, তব কানে
কবে এল কেহ নাহি জানে · ·
সে-অর্চনা সেই বাণী
আপন সজীব মূর্তিখানি
রাখিয়াছে ধ্রুব করি শ্যামল সরস বক্ষে তব,—
আজি আমি তারে দেখি লব,
ভারতের যে-মহিমা
ত্যাগ করি আসিয়াছে আপন অঙ্গনসীমা
অর্ঘ্য দিব তারে
ভারত-বাহিরে তব দ্বারে। · ·

পরদিন (১২ অক্টোবর) বজ্রায়ুধ বিদ্যালয়ে কবির নিমন্ত্রণ; সেখানে শ্রেষ্ঠ-আসন— ধর্মাসন— তাঁহাকে প্রদান করা হয়। সেইদিনই চূড়ালংকরণ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার বক্তৃতা। পরদিন (১৩ই) সিয়ামের রাজা ও রানীর সহিত প্রাসাদে সাক্ষাৎ করিয়া 'সিয়াম' কবিতাটি কিংখাপে লিখাইয়া উপহার দিলেন। ১৪ই স্থানীয় ম্যুজিয়ামে কবির বক্তৃতায় অভূতপূর্ব জনসমাগম হয়। অতঃপর ১৫ অক্টোবর কবি বাংকক ত্যাগ করিয়া ভারতমুখে যাত্রা করিলেন।

সিয়াম হইতে ফিরিবার পথে আবার কবিতারচনায় কবির মন গিয়াছে; সিয়ামের ইণ্টারন্যাশনাল রেলওয়ে ভ্রমণকালে 'সিয়াম' সম্বন্ধে দ্বিতীয় কবিতাটি লিখিলেন (১৭ অক্টোবর)।

পরদিন পিনাঙে (১৮ অক্টোবর) কবি লিখিলেন 'চিরন্তন' কবিতা (পরিশেষ)। এই কবিতায় কবিকে পাওয়া যায়— কর্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত প্রশস্তিপূর্ণ কবিতা ইহা নয়।

আবা-মারু জাহাজে বসিয়া (২০ অক্টোবর) লিখিলেন 'অবুঝ মন', ২৪-এ লেখেন 'মোহনা', ২৬-এ 'দুর্দিনে' ও কলিকাতার কাছে আসিয়া এবারের মতো শেষ কবিতা 'নূতন শ্রোতা' (২৭-এ) লিখিলেন; সেইদিন আবা-মারু কলিকাতায় পৌঁছিল।

'অবুঝ মন' কবিতাটির এক গদ্যভূমিকা লেখেন[1] সেই সময়ে; জাহাজের ডেকে কোনো আয়া-র অঙ্কবিহারী শিশুর চাঞ্চল্য দেখিয়া কবির মনে যে ভাবোদয় হয় তাহাই এই কবিতায় মূর্ত হইয়াছে।

ওই যে শিশুর অবুঝ ভোলা মন
তরীর কোণে বসে বসে দেখছি তারি আকুল আন্দোলন।

এই ছবি হইতেই কবির মনে হইতেছে—

বিরাট অবুঝ এই সে আদিম মন,
মানব-ইতিহাসের মাঝে আপ্‌নারে তার অধীর অন্বেষণ।
ঘর হতে ধায় আঙন-পানে, আঙন হতে পথে,
পথ হতে ধায় তেপান্তরের বিঘ্ন বিষম অরণ্যে পর্বতে; · ·

কবি দেশের কাছে আসিতেছেন; তখন বাংলাসাহিত্যে তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া বেশ একটু আলোড়ন চলিতেছে; তাহারই কথা 'নূতন শ্রোতা' কবিতায় রূপ লইল; রবীন্দ্রনাথ কালাতিক্রম করিয়া নবীন সাহিত্যিকদের পথ রুধিয়া আছেন— এইরূপ কথা উঠিয়াছে।

নন্দ বললে, 'দাদামশায়, কী লিখেছ শোনাও তো এইবেলা।' · ·
পড়া আমার শেষ হল যেই, ক্ষণেক নীরব থেকে
নন্দগোপাল উৎসাহেতে বলল হঠাৎ ঝেঁকে,—
'দাদামশায়, শাবাশ।
তোমার কালের মনের গতি, পেলেম তারি ইতিহাসের আভাস।'
খাতা নিতে হাত বাড়াল, চাদরেতে দিলেম তাহা ঢাকা,
কইনু তারে, 'দেখ্‌ তো ভায়া, কোথায় আছে তোর অমিয়কাকা।'

সাহিত্যে শিল্পে দর্শনে সর্বত্রই কালবদলের চঞ্চল হাওয়া উদ্বেলিত— দেশে ফিরিয়া তাহা স্পষ্টতর হইল।

১ অবুঝ মন, বিচিত্রা ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ, পৃ. ৭৮৫-৮৭। দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫, গ্রন্থপরিচয় পৃ. ৫৩৭-৩৪।

সাহিত্যে দ্বন্দ্ব

মালয়-যাত্রার প্রাক্কালে রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যধর্ম' নামে এক প্রবন্ধ লিখিয়া যান, এবং বালিদ্বীপের পথে 'সাহিত্যে নবত্ব' শীর্ষক আর-একটি প্রবন্ধ প্রথমটির অনুক্রমণরূপেই লেখেন। দুইটি রচনাই সাহিত্যে বিচার। তবে নানাকারণে তাহা বিতর্কমূলক ও কিছুটা provocative ভাবেই রচিত। এই প্রবন্ধ প্রকাশের পর দীর্ঘকাল সাময়িক সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিষয়ক মতামত লইয়া আলোচনা চলে। রবীন্দ্রনাথ কেন 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধ লেখেন, তাহার পটভূমি একটু বিস্তারিয়া বলার প্রয়োজন— কারণ প্রথম যুদ্ধোত্তরপর্ব হইতে পৃথিবীর সর্বত্রই সাহিত্যের ও আর্টের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে কালবদলের যে হাওয়া উঠিয়াছিল, বাংলাদেশেও যুবমনকে সেই তপ্ত হাওয়াই চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারতীয়রা নানাভাবে সত্যকার য়ুরোপীয়তার স্পর্শলাভ করে। মহাযুদ্ধের সময় জারমেনির প্রচণ্ড প্রতাপ ও তাহার অবসান, মধ্যযুগীয় স্বৈরাচারী রুশিয়ার পতন ও নূতন ভাববাদী সোবিয়েতের উত্থান— ভারতের স্বাধীনতাকামী যুবমনকে বিশেষভাবে অভিভূত করে। যুদ্ধের পর আসে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন— মুক্তির সন্ধানে ভারতের নবচেতনা; দুর্বিষহ অতীতের ভার হইতে মুক্তি চাই। যাহা আছে তাহা ভাঙিবার, যাহা শাস্ত্রীয় আচার তাহা না-মানিবার, যাহা সুনীতিসম্মত তাহাকে তুচ্ছ করিবার— এক কথায় পুরাতন idol ও ideal-এর বিরুদ্ধে যৌবনের জেহাদ— সর্বক্ষেত্রে ঘোষিত হইল। বাঙালির মন যখন জাগে, তখন তাহার সর্বোদয় হয়; তখন সকল আঁধার কুঠরির সন্ধানে তাহার অভিযান চলে; রাজনীতির নূতন ক্ষেত্রে ছুটিল এক শ্রেণীর যুবক ভাঙনের নেশায়; অর্থনীতিক স্বরাজলাভের স্বপ্নবিভোর আদর্শবাদী ছুটিল গ্রামে গ্রামে চরকা কাঁধে; মূলধনী কারবারের জড় তাহারা উৎপাটন করিবে— পুরাতন অর্থনৈতিক ideal চূর্ণ করিবার অভিযান। সাহিত্যে, আর্ট বা এস্‌থেটিকসে সেই বিদ্রোহাগ্নি ধুমায়মান— এখন প্রোজ্জ্বলনের অপেক্ষা।

প্রথম-মহাযুদ্ধের সময় য়ুরোপ তথা পাশ্চাত্য সাহিত্য ও চিন্তাধারা সম্বন্ধে ভারতীয়রা যতই কুতূহলী হউক, সেই পর্বে য়ুরোপীয় মানসজগতের বাহন সাহিত্য ইহাদের হস্তগত হয় নাই। যুদ্ধশেষে য়ুরোপীয় সাহিত্য অনূদিত হইতে আরম্ভ করে এবং সেইসব গ্রন্থরাজিও ভারতের বাজারে আমদানী হইতে থাকে। সোবিয়েত রুশ হইতে নূতন আদর্শবাদের বাণী, সর্বদেশের সর্বহারা মূঢ় মূক জনতার জন্য তাহাদের অহেতুকী দরদ— স্পর্শচেতন ভাবপ্রবণ বাঙালিকেও বিচলিত করে— যেমন একদিন ফরাসী বিপ্লবের বাণী তাহাদের পূর্বপুরুষদের মনকে আকর্ষণ করিয়াছিল। শিল্পকেন্দ্রে ট্রেড্-ইউনিয়ন গঠন ও সর্বহারাদের পক্ষ লইয়া সংগ্রামরত ভাববাদী তরুণ-কম্যুনিস্টদের কাকলী এই সময়েই প্রথম শোনা গেল। পূর্বতন শিল্পধারার সংস্কারের জন্য বিপ্লবের প্রয়োজন। তাই শিল্পকেন্দ্রে আসিল ধর্মঘট বা স্ট্রাইক— 'ধর্মঘটে'র মধ্যে 'ধর্ম' ছিল প্রাচীনকালের সংস্কার— বর্তমানে তাহার স্থান লইল স্ট্রাইক— 'আঘাত হানো— পুঁজিপতিদের শিরদাঁড়া ভাঙো।' এখানে সেই অতিপুরাতন কথা— 'হেথা হতে যাও পুরাতন'। পুরাতন ideology বা ভাবধারার পরিবর্তে আসিল নূতন কথা, তাহার বলিবার ভাষা পৃথক, লিখিবার ভঙ্গী ভিন্ন। 'পথ রুধি' যাহা কিছু জীর্ণ, যাহা কিছু দীর্ণ আছে, তাহাদের পথ ছাড়িতেই হইবে!

ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধীজির একাধিপত্য— তাঁহারই আদেশে অসহযোগে সকলে মত্ত হইয়াছে। ১৯২৩ সাল হইতে সেখানে বিদ্রোহ— আরও অগ্রসর হইতে হইবে। চিত্তরঞ্জন দাশ 'স্বরাজ্য'দল গঠন করিয়া সক্রিয়ভাবে শাসন পরিষদে বাধা সৃষ্টির আন্দোলন আনিলেন। পুরাতন idol ভাঙার কাজ শুরু হইল— authority মানা হইবে না।

এই পটভূমি হইতে আমরা ভারতের নূতন সাহিত্যচেতনাকে বিচার করিব ; এখানেও নবীন লেখকদল ঘোষণা করিতেছে 'হেতা হতে যাও পুরাতন'। রবীন্দ্রনাথই একদিন বিশ্বের যৌবনকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন 'যৌবন তুই কি রবি সুখের খাঁচাতে' ; তিনি 'প্রমত্ত'দের শৃঙ্খল ভাঙিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন, আজ সেই নবীনের দল কবিরই শিক্ষিত বিদ্যায় দীক্ষিত হইয়া তাঁহাকেই বলিতেছে— 'হেথা হতে যাও পুরাতন'। তরুণ কবি অচিন্ত্য-কুমার বলিলেন—

এ মোর অত্যুক্তি নয়, এ মোর যথার্থ অহংকার
যদি পাই দীর্ঘ আয়ু, হাতে যদি থাকে এ লেখনী,
কারেও ডারি না কভু ; সুকঠোর হউক সংসার,
বন্ধুর বিচ্ছেদ তুচ্ছ, তুচ্ছতর বন্ধুর সরণি।
পশ্চাতে শত্রুরা শর অগণন হানুক ধারালো,
সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্রঠাকুর,
আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো
যুগ-সূর্য ম্লান তার কাছে। মোর পথ আরো দূর!

রবীন্দ্রনাথ যুবমনের এই ভাব লক্ষ্য করিয়া মালয় ভ্রমণান্তে ফিরিবার সময়ে 'নূতন শ্রোতা'দের সম্বন্ধে লেখেন—

বছর বিশেক চলে গেল, সাঙ্গ তখন ঠেলাগাড়ির খেলা ;
নন্দ বললে, 'দাদামশায় কী লিখেছ শোনাও তো এইবেলা।'
পড়তে গেলাম ভরসাতে বুক বেঁধে,
কণ্ঠ যে যায় বেধে ; · ·
ভয়ের চোখে যতই দেখি লেখা,
মনে হয় যে রস কিছু নেই, রেখার পরে রেখা।
গোপনে তার মুখের পানে চাহি,
বুদ্ধি সেথায় পাহারা দেয় একটু ক্ষমা নাহি।
নতুনকালের শানদেওয়া তার ললাটখানি খরখড়্গ-সম,
শীর্ণ যাহা, জীর্ণ যাহা তার প্রতি নির্মম।
তীক্ষ্ণ সজাগ আঁখি,
কটাক্ষে তার ধরা পড়ে কোথা যে কার ফাঁকি।
সংসারেতে গর্তগুহা যেখানে-যা সবখানে দেয় উঁকি,
অমিশ্র বাস্তবের সাথে নিত্য মুখোমুখি।
তীব্র তাহার হাস্য
বিশ্বকাজের মোহমুক্ত ভাষ্য।

'অমিশ্র বাস্তব' সাহিত্য আমদানী হইতেছে য়ুরোপের মহাদেশ ও সোবিয়েত রুশ হইতে ; এইসব অনুবাদ পড়িয়া ইংরেজি ভিক্টোরিয়ান সাহিত্য যুবকদের বিস্বাদ লাগিতেছে। ইংলণ্ডেও 'ভদ্র' সাহিত্যের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার ভাব দেখা দিয়াছে ; ১৯২২ সালে সেখানে The Beggar's Opera হঠাৎ আশ্চর্যভাবে ভদ্রসমাজে জনাদর লাভ

করিল! সেখানে ভব্যতা সম্ভ্রান্ততার বিরুদ্ধে শৌখীন বিপ্লব! উপরের মহলের বিত্তবান, শিক্ষিতসমাজ শৌখীনভাবে নিচের মহলের অভিনয় দেখেন!

পাশ্চাত্য সাহিত্য মানুষের দারিদ্র্য ও যৌনসমস্যা লইয়া অকস্মাৎ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে। গল্পে উপন্যাসে কবিতা নাটকে— দারিদ্র্য ও যৌনক্ষুধার নগ্নমূর্তি বিশদভাবে বর্ণনা হইল সাহিত্যে বাস্তবতা। কাসানোভা, বোকাশ্বিও লজ্জিত হইল। য়ুরোপের এই তরঙ্গ বাংলাদেশের তরুণ সাহিত্যিকদের মনকে তীব্রভাবে স্পর্শ করিল— কারণ ইহাদের অধিকাংশই দরিদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 'ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালস্'। আধুনিকতার তপ্ত হাওয়ায় উগ্র হইয়া ইহারা লেখনী ধারণ করিয়াছে। বিকৃতমনচিকিৎসক ফ্রয়েড ও মনস্তত্ত্ববিদ হ্যাভলক্ এলিসের বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের ও তাঁহাদের মতামতের অপব্যাখ্যা দ্বারা অসংযত যৌনজীবনের জয়গান করার মধ্যে তাঁহারা সৎসাহস দেখিলেন। য়ুরোপীয়দের পৌরুষপ্রবল জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা— দুর্বল অর্ধভুক্ত স্বাস্থ্যহীন বাঙালি জীবনে অনুকরণ করিতে গিয়া কেহ মরিল অকালে, কেহ অধঃপাতে গেল দুরারোগ্য কুৎসিত ব্যাধির কবলে পড়িয়া, কেহ মরিল পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে যক্ষ্মারোগে, কেহ অর্ধমৃত জড়পিণ্ডবৎ হইয়া রহিল। এই জীবনবিপ্লবের সংঘাত কাটাইয়া যাঁহারা উত্তীর্ণ হইলেন, তাঁহারা বাংলাসাহিত্যের নূতনসাহিত্যস্রষ্টারূপে আপনাদের আসন পাইয়াছেন।

বাংলাদেশে তরুণদল নূতন নূতন সাময়িক সাহিত্যমাধ্যমে আপনাদের মনের কথা অকুণ্ঠিত ভাষায় প্রকাশ করিয়া বিদ্রোহের ধ্বজা উড়াইল। এইসব পত্রিকা হইতেছে— কল্লোল (১৯২৩), সংহতি (১৯২৩), উত্তরা (১৯২৫), প্রগতি (১৯২৬। ১৩৩৩ আষাঢ়), কালিকলম (১৯২৬), লেখা (১৯২৭) ইত্যাদি।

সমসাময়িক সমালোচকদের মতে 'এই অতিআধুনিক কথাসাহিত্য প্রধানত কল্লোল ও কালিকলম নামক মাসিকদ্বয়েই জন্ম ও পরিণতি লাভ করিতেছে' (কল্লোল, ১৩৩৪ আষাঢ়)।

সাহিত্যের এই নূতন পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ classical লেখকদের পর্যায়ভুক্ত হইলেন, অর্থাৎ নবীনদের চোখে তিনি প্রাচীন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তরুণ সাহিত্যিকদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও, তাঁহাকে তাহাদের পুরানোদিনের লেখক মনে হইতেছে ; "যে-সকল শ্রেষ্ঠ লেখক যে-কোনো কালে বর্তমান থাকিয়াও বিশ্বসাহিত্যের সম্পদ অর্জন করিয়াছেন, তাঁহারাই classical রূপে পরিচিত। জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসও classical আবার রবীন্দ্রনাথও classical।"

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নবীনদের বহু অভিযোগ ; তাহাদের একটি হইতেছে এই যে, কবির 'সুচিত্রিত চরিত্রগুলির সকলেই যেন শুচিতায় ভরা ; এমন-কি বিনোদিনীর মধ্যেও পঙ্কিলতা নাই।' অর্থাৎ রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যে নারী যথেষ্ট পরিমাণে পঙ্কতিলক লিপ্ত হইয়া বর্ণিত হয় নাই। আর-একজন লেখকের অভিযোগ যে 'যাঁহারা কথাসাহিত্য লেখেন তাঁহাদের দরিদ্রজীবনের অভিজ্ঞতা নাই।' রবীন্দ্রনাথ 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা আজ বিশ্বের সেবায় নিয়োজিত— দারিদ্র্যের দুর্ভোগ বর্ণনায় তাহা রূপায়িত হয় না।

"রবীন্দ্র-সাহিত্যে দারিদ্র্য-আরতি ও পঙ্কিলতা-পোষণ হয়নি ব'লে তরুণ সাহিত্যিকগণ এই দুটি দিক দিয়ে সাহিত্যে নবত্ব আনতে প্রয়াসী হলেন।"[১]

আমাদের আলোচ্যপর্বে 'শনিবারের চিঠি' নামে এক সাপ্তাহিক প্রবাসী-পত্রিকার অন্যতম সহকারী-সম্পাদক সজনীকান্ত দাস কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইত। এই পত্রিকার লেখকগোষ্ঠী ও সম্পাদক কল্লোলাদি পত্রিকার রচনার মধ্যে অশ্লীলতাদুষ্ট অংশ চয়ন করিয়া 'মণিমুক্তা' নামে প্রকাশ করিতেন ; সাহিত্যে বে-আব্রুতা বন্ধ

১ ওহদেদার, পৃ. ১৫৫।

করার উদ্দেশ্যে ইহা তাঁহারা করিতেন সত্য, কিন্তু তাহার ফল হইত বিপরীত— বাংলা কথাসাহিত্যের সকল অশ্লীলাংশ পাঠকরা একস্থানে পাইয়া তাহা সাগ্রহে সম্ভোগ করিত।

সজনীকান্ত ১৩৩৩ সালে ফাল্গুন মাসে (১৯২৭ মার্চ)— কবির য়ুরোপ সফরের দুই মাসের মধ্যে সাময়িক সাহিত্যের বর্ণনা দিয়া একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়া পাঠান।[১] কবি তাহার উত্তরে লেখেন (২৫ ফাল্গুন ১৩৩৩)— "আধুনিক সাহিত্য আমার চোখে পড়ে না। দৈবাৎ কখনো যেটুকু দেখি, দেখতে পাই হঠাৎ কলমের আব্রু ঘুচে গেছে। আমি সেটাকে সুশ্রী বলি এমন ভুল কোরো না। কেন করিনা তার সাহিত্যিক কারণ আছে, নৈতিক কারণ এস্থলে গ্রাহ্য না হতেও পারে। আলোচনা করতে হ'লে সাহিত্য ও আর্টের মূলতত্ত্ব নিয়ে পড়তে হবে।··এখন বাগ্‌বাত্যার ধুলো দিগদিগন্তে ছড়াবার শখ একটুও নেই। সুসময় যদি আসে তখন আমার যা বলবার বলব।"[২]

এই সময়ে কবির মন 'ঋতুরঙ্গশালা'র মধ্যে ডুবিয়া আছে; তাই বোধ হয় বিতর্কমূলক রচনায় মন গেল না। তার পরই ভরতপুর সফর এবং শিলঙ বাস। শিলঙ হইতে ফিরিয়া দুই মাসের মধ্যে মালয় ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণে বাহির হন।

মালয়-যাত্রার পূর্বে অনুরোধেই হউক বা কর্তব্যবোধেই হউক কবি 'সাহিত্যধর্ম' নামে প্রবন্ধ লিখিলেন (বিচিত্রা ১৩৩৪ শ্রাবণ)।

কবির মতে বড়ো সাহিত্যের একটা গুণ হইতেছে অপূর্বতা বা originality। সাহিত্য যখন অক্লান্ত শক্তিমান থাকে, তখন সে চিরন্তন সত্যকেই নূতন করিয়া প্রকাশ করিতে পারে। ইহাই সাহিত্যের ও শিল্পের কাজ, উহার ওরিজিনালিটি বা অপূর্বতা। কবি লিখিলেন, "সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানি যে-একটা বে-আব্রুতা এসেছে সেটাকেও এখানকার কেউ কেউ মনে করছেন নিত্যপদার্থ। ভুলে যান, যা নিত্য তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না। মানুষের রসবোধে যে-আব্রু আছে সেইটেই নিত্য, যে-আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য। এখনকার বিজ্ঞানমদমত্ত ডিমোক্রেসি তাল ঠুকে বলছে, ঐ আব্রুটাই দৌর্বল্য, নির্বিচার অজুহাতই আর্টের পৌরুষ।" কবির বিশ্বাস যে সাহিত্যিক ও আর্টিস্ট যখনই 'আজগবিকে নিয়ে··ওরিজিনাল হ'তে চেষ্টা করে তখনি বোঝা যায় শেষ দশায় এসেছে। তারা বলে সাহিত্যধারায় নৌকো চলাচলটা অত্যন্ত সেকেলে; আধুনিক উদ্ভাবনা হচ্চে পাঁকের মাতুনি— তলিয়ে যাওয়াটা রিয়ালিটি। ভাষাটাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে, অর্থের বিপর্যয় ঘটিয়ে, ভাবগুলোকে স্থানে অস্থানে ডিগ্‌বাজি খেলিয়ে পাঠকের মনকে পদে পদে ঠেলা মেরে, চমক লাগিয়ে দেওয়াই সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ" (সাহিত্যে নবত্ব)। ইহাকে বলা যাইতে পারে stunt বা আকস্মিকতা ও অদ্ভুতত্বের আঘাত।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস যে য়ুরোপ অফুরন্ত প্রাণশক্তি-বলে তাহার কৃত্রিমতাকে কাটাইয়া উঠিবে, যেমন ইংরেজি সাহিত্য সার-পিউরিটানযুগের কদর্যতা হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার ভয়— দুর্বলকে যখন ছোঁয়াচ লাগে, তখন তাহার থেকে বাহিরে আসা কঠিন হয়। রিয়ালিটি বলিতে যাহা আজ সাহিত্যে বুঝায়, তাহা হইতেছে দারিদ্র্যের আস্ফালন ও লালসার অসংযম। কবির অভিযোগ ও আশঙ্কা যে এই দুইটি খুব সহজে বলা যায় এবং লোককে মাতানো যায়; ওটা অত্যন্ত সহজ পথ।

১ পত্রখানি 'কল্লোলযুগ'এ আছে, পৃ. ২০৬-০৭।
[২] কল্লোলযুগ, পৃ. ২০৮।

আধুনিক সাহিত্যিকদের তীব্র সমালোচনা করিয়াও কবি লিখিলেন, "কেউ কেউ বলেছেন, এই সব তরুণ লেখকের মধ্যে নৈতিক চিত্তবিকার ঘটেছে ব'লেই এই রকম সাহিত্যের সৃষ্টি হঠাৎ এমন দ্রুতবেগে প্রবল হয়ে উঠেছে। আমি নিজে তা বিশ্বাস করি না। · · কিছুই না-মানার আবেগে তারা ভুল ক'রে থাকে, সেই ভুলের বিপদ সত্ত্বেও তরুণের এই স্পর্ধাকে আমি শ্রদ্ধাই করি। কিন্তু সাহিত্যের নবত্ব, যেখানে না-মানাই হচ্ছে সহজ পন্থা সেখানে এই অশক্তের সস্তা অহংকার তরুণের পক্ষে সবচেয়ে অযোগ্য।"

রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম' প্রকাশিত হইবার পর, নরেশচন্দ্র সেন লিখিলেন 'সাহিত্যধর্মর সীমানা'; তার জবাব লেখেন দ্বিজেন্দ্র বাগচি 'সাহিত্যধর্মর সীমানা বিচার': তার পাল্টা জবাব দিলেন নরেশচন্দ্র 'সাহিত্যধর্মর সীমানা-বিচারের উত্তর' লিখিয়া। ইতিমধ্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই বিতর্কে অবতীর্ণ হইয়া লেখেন 'সাহিত্যের রীতিনীতি'। এইসব তর্ক যখন দেশে চলিতেছে, তখন কবি মালয় হইতে 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধটি লিখিয়া (২৩ আগস্ট ১৯২৭) প্রবাসীতে পাঠাইয়া দেন।[১]

মালয় সফর শেষে কলিকাতায় ফিরিয়া গত তিন মাসের সাহিত্যধর্ম লইয়া আলোচনার অতিরঞ্জিত বর্ণনা নিশ্চয়ই শুনিতে পাইলেন। অনুরোধে উপরোধে পড়িয়া বা অন্যকে oblige করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ অনেক সময়ে এমন-সব কাজ করেন বা মত ব্যক্ত করেন, যাহার জন্য তাঁহাকে বহুবার দুঃখভোগী হইতে হইয়াছে। কয়েকবৎসর পূর্বে একপত্রে তিনি নরেশচন্দ্র সেনের কোনো রচনাকে ভালো বলিয়াছিলেন; এই সব কথা লইয়া যখন জোড়াসাঁকোর বাটীতে কাথাবার্তা চলে, প্রসঙ্গত কবি বলেন যে তিনি নরেশচন্দ্রের প্রবন্ধের প্রশংসা করিয়াছিলেন, উপন্যাসের নহে। এই ব্যক্তিগত তুচ্ছ কথা কাগজে প্রকাশিত হইলে বিতর্কটা বিবাদে পরিণত হইয়া উঠিল। রবীন্দ্রনাথ উত্তেজিত মনে নরেশচন্দ্রকে একখানি পত্র দেন, তাহার ভাষা কবিজনোচিত হয় নাই।

এই সময়ে দিলীপ রায়কে কবি এক পত্র লিখিতেছেন, "সাহিত্যধর্ম ব'লে একটা প্রবন্ধ লিখেছি। তার কর্মফল চলছে। তার ভোগ ফুরোতে না ফুরোতেই 'সাহিত্যে নবত্ব' ব'লে আরও একটা লেখা হয়েছে। তোমার সঙ্গে বাক্যালোচনাতেও সাহিত্যতত্ত্বচর্চা কিছু পরিমাণে আছে— এতে করে একটা আলোড়ন জাগিয়েছে তাতে ক্ষতি নেই। কেননা · · সাহিত্যলোকে চাঞ্চল্যটার খুব প্রয়োজন আছে। সিদ্ধান্তে পৌঁছানোটা বেশি দরকারি নয়— দেখতে পাচ্ছি, একযুগের সিদ্ধান্ত আর-এক যুগে উলট-পালট হয়ে যায়, কেবল মনের মধ্যে নিয়তচিন্তার চাঞ্চল্যটাই থাকে। মানুষের মন শেষ কথায় এসে যখন পৌঁছয় তখন নীরবতার সমুদ্র।" এই পত্রে কবি বলেন (১০ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪), "বারে বারে সত্যসিদ্ধান্তকে মানুষ তার সংশয়ের খোঁচা মেরে বিপর্যস্ত করে তোলে— যুগেযুগে তাই চলছে। · · সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে সাবেককালের সঙ্গে হাল-আমলের যে ঝগড়া চলছে তার মূলে মানুষের এই স্বভাবটাই

১ রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্যের ধর্ম— বিচিত্রা ১৩৩৪ শ্রাবণ।
নরেশচন্দ্র সেন, সাহিত্যধর্মর সীমানা— বিচিত্রা ১৩৩৪ ভাদ্র।
দ্বিজেন্দ্র বাগ্‌চি, সাহিত্যধর্মর সীমানা বিচার— বিচিত্রা ১৩৩৪ আশ্বিন।
শরৎচন্দ্র, সাহিত্যের রীতিনীতি— বঙ্গবাণী ১৩৩৪ আশ্বিন।
রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্যে নবত্ব— প্রবাসী ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ।
নরেশচন্দ্র, কৈফিয়ৎ বা সাহিত্যধর্মর সীমানা-বিচারের উত্তর— বিচিত্রা ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ।

কাজ করছে, যাকে আশ্রয় করে তাকে সে আঘাত করে সন্দেহ ক'রে— তার পর আবার দ্বিগুণ জোরের সঙ্গে তার কাছে ফিরে আসে।"[১]

সাহিত্যে দ্বন্দ্বের উপর এখানেই যবনিকা পড়িতে পারিলে ভালোই হইত। কিন্তু কয়েক মাস পরে রবীন্দ্রনাথকে 'শনিবারের চিঠি'র ও 'কল্লোল-কালিকলম'-এর দুই দলের মধ্যে বুঝাপড়ার চেষ্টায় প্রবৃত্ত করাইলেন কয়েকজন অ-সাহিত্যিক— যাঁহাদের সহিত কোনো সাহিত্যগোষ্ঠীর সম্বন্ধ বা সাহিত্যসৃষ্টি বিষয়ে যাঁহাদের কোনো অবদান ছিল না। এই মধ্যস্থতায় প্রধান অংশ গ্রহণ করিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের দুই জন অধ্যাপক-- প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ও অপূর্বকুমার চন্দ। কলিকাতার বিশ্বভারতী সম্মেলনের উদ্যোগে জোড়াসাঁকোর বাটীতে এই বুঝাপড়া করার সভা বসিল দুই দিন (৪, ৭ চৈত্র ১৩৩৪)। রবীন্দ্রনাথই প্রধান বক্তা; তিনি দুই দিনই দীর্ঘ বক্তৃতা করেন ও পরে ভাষণ দুইটি লিখিয়া দেন।[২] রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতার উগ্র তামসিকতাকে আদৌ সমর্থন করিলেন না; সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলিলেন যে, সাহিত্যিক পদ্ধতিই অনুসৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়: "যে সমালোচনার মধ্যে শান্তি নাই, যা কেবলমাত্র আঘাত দেয়, কেবলমাত্র অপরাধটুকুর প্রতিই সমস্ত চিত্ত নিবিষ্ট করে, আমি তাকে ঠিক মনে করিনে। এরূপ সমালোচনার ভিতর একটা জিনিস আছে যা বস্তুত নিষ্ঠুরতা— এটা আমাকে পীড়ন করে। সাহিত্যিক অপরাধের বিচার সাহিত্যিকভাবেই হওয়া উচিত। অর্থাৎ রচনাকে তার সমগ্রতার দিক থেকে দেখতে হবে।..." এই সভার দ্বারা কোনোপক্ষেরই কোনো উপকার হইল না; 'কল্লোলযুগে'র লেখকের মতে এই সভায় 'সবচেয়ে লাঞ্ছনা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের' (পৃ. ৩২৫)।

বৃহত্তর ভারত ভ্রমণের পর

মালয় ও দ্বীপময় ভারত সফরের পরে দেশে ফিরিয়া (১০ কার্তিক ১৩৩৪) কবিকে যে সাহিত্যদ্বন্দ্বের মধ্যে অবতীর্ণ হইতে হয় তাহা কবিজীবনের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র; ইহার বাহিরে আছে— তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টি; আর আছে বিশ্বভারতীর চিরন্তন সমস্যাসমাধানের জন্য চেষ্টা। 'অর্থমনর্থে'র চিন্তা তো আছেই, তার উপর আছে আভ্যন্তরীণ পরিচালনা সমস্যা। কবি দেশে ফিরিয়াছেন ১৯২৭ সালের অক্টোবর মাসে; পথে কবি যে গান ও কবিতা রচনার ঝোঁকে ছিলেন, তাহার রেশ শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া গুঞ্জরিত হইতেছে। পাঠকের স্মরণ আছে নটরাজের[৩] আবাহন-গীতিকা গতবৎসর বসন্তোৎসবের দিন (১৩৩৩ চৈত্র ৪) নৃত্যছন্দে অভিনীত হইয়াছিল। মালয় হইতে ফিরিয়া সেটিকে বদলাইয়া, কাটিয়া-ছাটিয়া, নূতন গান সংযোগ করিয়া ঋতুরঙ্গ[৪] নাম দিয়া কলিকাতার স্টেজে অভিনয়ের ব্যবস্থা করিলেন (২২ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪।৮ ডিসেম্বর ১৯২৭)।

১ দিলীপকুমার রায়, অনামী (১৩৪০) পৃ. ৩৪৩। দ্র. সাহিত্যের পথে, গ্রন্থপরিচয় পৃ. ২৬৫-৬৬।

২ 'বাংলার কথা' ৬ চৈত্র ১৩৩৪ সাপ্তাহিকে একটি রিপোর্ট বাহির হয়। রবীন্দ্রনাথের রচনা— সাহিত্যরূপ, প্রবাসী ১৩৩৫ বৈশাখ। দ্বিতীয় দিনের— সাহিত্যসমালোচনা ১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠ। দ্র. সাহিত্যের পথে (১৩৬৫ চৈত্র সংস্করণ), পৃ. ২০২-২৩০।

৩ নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা— বিচিত্রা, ১৩৩৪ আষাঢ় [১ম বর্ষের প্রথম সংখ্যা]।

৪ ঋতুরঙ্গ, শান্তিনিকেতন, ২২ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪। বিশ্বভারতী, প্রকাশক শ্রীজগদানন্দ রায়। শান্তিনিকেতন প্রেস। পৃ. ৪২, পৃ. ৪৪। দুই অভিনয় দিনে দুইটি সংস্করণ বাহির হয়। মাসিক বসুমতী ১৩৩৪ সালের পৌষ সংখ্যায় 'ঋতুরঙ্গ' প্রকাশিত হয়।

এবারকার ঋতুরঙ্গের অভিনয়ে নৃত্যকলার বৈশিষ্ট্য ছিল। কয়েকমাস পূর্বে বালি ও জাভা দ্বীপে স্থানীয় নৃত্যকলা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিবার যে সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাহার প্রভাব এই অভিনয়ে সুস্পষ্ট। কবি পূর্ব দ্বীপাবলীর নৃত্য দেখিয়া তাহার বিস্তৃত বিবরণ ও সমালোচনাপূর্ণ যেসব পত্র প্রতিমা দেবীকে লিখিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় ফলপ্রদ হয়। কারণ শান্তিনিকেতনের মেয়েদের নৃত্যশিক্ষা দিবার জন্য মণিপুরী ও দক্ষিণী নর্তক নিযুক্ত থাকিলেও রবীন্দ্রনাথের গানের ভাব ভাষা ও সুরের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া নৃত্যভঙ্গীকে নবরূপায়ণ দানের শক্তি তাঁহাদের খুবই সীমিত ছিল; এই ব্যাপারে পরিচালনা করিতেন প্রতিমা দেবী। শান্তিনিকেতনে নৃত্যকলার উৎকর্ষতার জন্য প্রতিমা দেবীর নিষ্ঠা ও দানের কথা বিশেষভাবেই স্মরণীয়। তিনি ঋতুরঙ্গের নৃত্যকলা সম্বন্ধে লিখিতেছেন, "ঋতুরঙ্গের কিছু পূর্বে গুরুদেব জাভা যাত্রা করেছিলেন। জাভানী নৃত্যের নানাবিধ ছবি এবং নৃত্যসাহিত্য তাঁর সঙ্গে দেশে এসেছিল, আর এসেছিল সেখানকার কলা-নৈপুণ্যের প্ররোচনা। সেই সূত্রে আমাদের ছেলেমেয়েদের জাভানী নৃত্যপদ্ধতি আয়ত্ত করবার সুযোগ হয়েছিল। সেইজন্যে ঋতুরঙ্গের নাট্যসংযোজনা এবং সাজসজ্জার মধ্যে জাভানী আভাস বর্তমান ছিল এবং সুরেনবাবুর [সুরেন্দ্রনাথ কর] রচিত স্টেজের মধ্যেও জাভানী স্থাপত্যের প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।"[১]

এই অভিনয়ে নটরাজের ভূমিকায় নামেন বাসুদেব মেনন, কেরালার নৃত্যশিল্পী, বিশ্বভারতীর কলাভবনের এককালীন ছাত্র; গত বৎসর বাসুদেব শান্তিনিকেতনে দোলপূর্ণিমার উৎসবে 'নটরাজে'র ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবার অবনীন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহে দক্ষিণ-ভারত হইতে বাসুদেবকে আনানো হইল; বাসুদেব ব্রোন্‌জের মূর্তিটি যেন, ব্রোন্‌জের নটরাজ জীবন্ত হয়ে স্টেজে নেচে গেল।[২]

কলিকাতায় থাকিবার সময় কবির কাছে কোনো পত্রিকা (স্বরাজদলের) একটি লেখা চাহিয়া পাঠান। কবি লিখিলেন তাঁহার সময় অল্প, তাই তাহার বক্তব্য সংক্ষেপে লিখিলেন (৩ পৌষ ১৩৩৪)—

"শাসনকর্তাদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের মধ্যে যে-কিছু বিকৃতি স্বদেশকে উপলব্ধি করিবার পক্ষে বাধা, তাহাই দূর করিবার চেষ্টা বর্তমান ভারতবর্ষের পলিটিক্স। এই উপলক্ষ্যে আমাদের শিক্ষিতমণ্ডলী কখনো বা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগসাধন, কখনো বা বিচ্ছেদ ঘোষণার ব্যাপারে নিরতিশয় প্রবৃত্ত। এই চেষ্টার প্রয়োজন যতই থাক ইহারই উত্তেজনা একান্ত হইয়া গুরুতর প্রয়োজন হইতে আমাদের কর্মোদ্যমকে দীর্ঘকাল বিক্ষিপ্ত করিয়াছে।

"আমাদের নিজেদের পরস্পর সম্বন্ধের মধ্যে যেসকল গভীর বাধা বর্তমান, যাহার জটিল মূল আমাদের সমাজে, আমাদের সংস্কারে, আমাদের বুদ্ধির বিকারে, শক্তির জড়তায়, চিত্তের ঔদাসীন্যে, পরনির্ভরশীল মনোবৃত্তিতে, বিচারহীন গতানুগতিকতার দীর্ঘকালীন অভ্যাসে, তাহাই স্বদেশকে অন্তরে বাহিরে সত্যভাবে লাভ করিবার [স্ব-রাজ] সর্বাপেক্ষা প্রবল অন্তরায়। নিজেদের অন্তর্নিহিত এই অপূর্ণতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হই বলিয়াই চোরাবালিতে পলিটিক্সের ভিত্তি স্থাপন চেষ্টায় আমাদিগকে নানাপ্রকার অত্যুক্তি ও আত্মবঞ্চনায় প্রবৃত্ত করিয়াছে। মেকি টাকায় বিধাতার সঙ্গে কারবার চলে না : সিদ্ধির পথকে অবাস্তবের সাহায্যে সহজ ও সংক্ষিপ্ত করিবার কৌশল অবলম্বন করিলে নিজেকেই ফাঁকি দেওয়া হয়। **দেশের প্রজাসাধারণ** দেশকে আপন করিবে এই ইচ্ছাটি সাধারণের মধ্যে যখন সত্য হইবে, গভীর হইবে, ব্যাপক হইবে, এই ইচ্ছার বিচিত্র দুঃখসাধ্য ত্যাগপরায়ণ দায়িত্ববোধ যখন

১ প্রতিমা দেবী, নৃত্য (১৩৫৬), পৃ. ১২।

২ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রানী চন্দ, ঘরোয়া, পৃ. ১২৩।

অগভীর আবেগ-স্রোতে আন্দোলনের বিষয় না হইয়া সুসংযত বিচারবুদ্ধি ও সুশিক্ষিত সাধনার উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন বাহিরের প্রতিকূলতা আমরা উপেক্ষা করিতে পারিব।"

রবীন্দ্রনাথের এই পত্রখানি স্বরাজী-সম্পাদকের মনোমত না হওয়ায়— উহা তাঁহারা মুদ্রিত করিলেন না; উহা প্রবাসী পত্রিকায় ১৩৩৪ সালে মাঘ মাসে বাহির হইল। স্বরাজী-সম্পাদকের অপছন্দ হইবার কারণ ছিল। চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর স্বরাজদলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইয়াছে। সরকারকে obstruction বা বাধা দিবার পথ ছাড়িয়া এখন তাঁহারা responsive cooperation, অর্থাৎ প্রয়োজনবোধে গবর্মেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিয়া মন্ত্রীত্ব পদও গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের পত্রমধ্যে ইহার ইঙ্গিত এখনকার পাঠকদের নিকট অস্পষ্ট-বোধ হইলে সমকালীন লোকদের নিকট ইহার অর্থ-ইঙ্গিত খুবই স্পষ্ট ছিল। স্পষ্টকথার ইঙ্গিত থাকার জন্য পত্রিকা-সম্পাদক পত্রখানি প্রকাশ করিলেন না।

শান্তিনিকেতনে পৌষ উৎসবের পূর্বে ফিরিয়া যথাবিধি সাতই পৌষের উপাসনা ও বিশ্বভারতীর সভাসমিতির কার্যাবলী পরিচালনা করিলেন। ভাবিতেছেন সেখানেই চুপচাপ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু কলিকাতা হইতে আবার আহ্বান আসিল। কলিকাতায় 'সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল সমিতি' নামে এক প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎসবে কবি সভাপতি (৫ জানুয়ারি ১৯২৮)। সরোজনলিনী হইতেছেন সিবিলিয়ান ম্যাজিস্ট্রেট গুরুসদয় দত্তের স্ত্রী; এই মহীয়সী নারীর মৃত্যু হইলে গুরুসদয় তাঁহার স্ত্রীর নামে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।[১]

এই সময়ে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে রবীন্দ্র-পরিষদ হইতে কবি-সংবর্ধনার আয়োজন হয়। এই পরিষদের স্থায়ী সভাপতি অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। কবির বিদেশে সম্মানের বিবরণ দিয়া তিনি কবিকে অভ্যর্থনা করিলেন; প্রতিভাষণে কবি বলেন "বাইরের দিক থেকে বিদেশের কাছে আমার পরিচয় পরিমাণ হিসাবে অতি অল্প। আমার লেখার সামান্য এক অংশের তর্জমা তাঁদের কাছে পৌঁচেছে, সে তর্জমারও অনেকখানি যথেষ্ট স্বচ্ছ নয়।··সাহিত্যকে ঠিকভাবে যে দেখে, সে মেপে দেখে না— তলিয়ে দেখে; ··সে ডুব দিয়ে পরিচয় পায়, সেই পরিচয় অন্তরতর।"

সমসাময়িক সাহিত্যে যে নবত্বের উত্তেজনা আসিয়াছে, তাহার কথা এই ভাষণে ছিল। তিনি বলেন, "সাহিত্যে নতুন হয়ে ওঠবার জন্যে যাঁদের প্রাণপণ চেষ্টা তাঁরাই উচ্চৈস্বরে নিজেদের তরুণ ব'লে ঘোষণা করেন। কিন্তু আমি তরুণ বলব তাঁদেরই যাঁদের কল্পনার আকাশ চিরপুরাতন রক্তরাগে অরুণবর্ণে সহজে নবীন··। আমি সেই তরুণদের বন্ধু, তাঁদের বয়স যতই প্রাচীন হোক্। আর যে-বৃদ্ধদের মরচে-ধরা চিত্ত-বীণায় পুরাতনের স্পর্শে নবীন রাগিণী বেজে ওঠে না, তাঁদের সঙ্গে আমার মিল হবে না, ওঁদের বয়স নিতান্ত কাঁচা হলেও।"

কলিকাতা হইতে কবিকে ৬ জানুয়ারি ফিরিতে হইল— সেইদিনই অপরাহ্নে স্পেশাল ট্রেনযোগে নিখিল ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সদস্যগণ শান্তিনিকেতন দেখিতে আসিতেছেন; জ্ঞানীগুণীদের আতিথ্য পরিচর্যায় যেন কোনো ত্রুটি না হয় তজ্জন্য কবির উদ্বেগ— তাই এই তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসা।

১ *A Woman of India* (The Hogarth Press 1928), রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সমন্বিত হইয়া প্রকাশিত হয়। সরোজনলিনী সিবিলিয়ান বি. দে-র কন্যা; বি. দে একসময়ে বীরভূমের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন; তখন তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন। কবির সহিত তাঁহারও পরিচয় ছিল।

দুই-একদিন পরেই আন্তর্জাতিক যশমণ্ডিতা গায়িকা ক্লারা বাট্ (Dame Clara Butt)[১] শান্তিনিকেতনে আসিলেন; তিনি সংগীতক্ষেত্র হইতে বিদায় লইতেছেন— তাই তাহার পূর্বে রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার শেষ অর্ঘ্য দিয়া যাইতে চান। প্রথমদিন দিনেন্দ্রনাথের বাসগৃহ 'দেহলি'র সম্মুখে তাঁহার গান হইল; মিসেস বাকে (Bako) পিয়ানো বাজাইলেন। কিন্তু সে বাজনা তাঁহার পছন্দ না হওয়ায়, সেই রাতেই কলিকাতায় গ্রান্ড হোটেলে তাঁহার নিজস্ব পিয়ানিস্টকে টেলিগ্রাম করিলেন। পরদিন পিয়ানিস্ট মধ্যাহ্নে চলিয়া আসিলে অপরাহ্নে সিংহসদনে ডেম্ বাট-এর গান হইল; তাঁহার একটি গান ছিল 'Were you there when they crucified my Lord'।[২] সিংহসদনের বিরাট ঘর গায়িকার সুতীব্র কণ্ঠের বিচিত্র সুর-হিল্লোলে অনুরণিত হইয়াছিল। বাট্ তাঁহার আত্মজীবনী *My Life of Song* গ্রন্থে লিখিতেছেন—

"In India I met three of the most wonderful personalities of that wonderful country, Mrs Annie Besant, Gandhi and Sir Rabindranath Tagore. The last named lent me his villa, where he wrote many of those wonderful poems, which rank among the great classics of all literature.

"I have heard that he sometimes sang and once when he was complementing me after hearing me sing, I said, 'But you too are a singer; I should so much like to hear you'. He made excuses, deprecating any claim to having a voice, but said at last, 'I have had such pleasure from listening to your wonderful voice. that, since you wish it, I will sing to you'.

"With me alone for an audience, and without accompaniment of any kind, he then sang two or three songs of his own composition. Rarely have I been so moved by anybody's singing as by that of the stately and venerable Poet; he sang with exquisite feeling and his voice, though quite untrained, had a natural silvery sweetness"।[৩]

গান শুনিয়া ও গান গাহিয়া তো আর দিন যায় না; নানা কাজ, নানা কর্তব্যের টান— কতকগুলি করিতে ভালো লাগে— কতকগুলি কেবল কর্তব্যবোধে করিতে হয়। বিশ্বভারতীর শিক্ষাব্যাপারে নানা সমস্যা; সভা, উপসভা বসিয়াছে; অন্তবর্তী রিপোর্ট পেশ হইয়াছে— বহুবিধ অসুবিধা নিরাকরণের কত রকমের চেষ্টা চলিতেছে। অবশেষে কবি ফেব্রুয়ারি মাস হইতে স্বয়ং বিদ্যালয়ের কাজকর্ম দেখিতে শুরু করিলেন; তার কয়েক মাস পরে সেপ্টেম্বর মাসে সকল কাজ দেখিবার সম্পূর্ণ ভার ও দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। বলা বাহুল্য কবির এই বয়সে এ-দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া কাজ সুসম্পন্ন করা অসম্ভব।

মনের রুচিকর কাজ করিতে না পারিলে দেহমন সহজেই ক্লান্তিবোধ করে; দিলীপ রায়কে এক পত্রে লিখিতেছেন (১৮ ফেব্রুয়ারী)— "আমি কুক্ষণে 'যোগাযোগ' ব'লে একটা গল্প লিখতে বসেছিলেম, কুক্ষণে অক্সফোর্ডের থেকে বক্তৃতার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেম। গল্প লেখাটায়, বক্তৃতা লেখাটায় আমার ভিতরকার মনিবের তাড়া আছে। সেটা বাইরের কাজ নয়। কিন্তু দিনের পর দিন যাচ্ছে, কিছুতেই লেখার সময় পাচ্ছিনে। যখন ক্লান্তিতে অভিভূত

১ Dame Clara Butt (1873-1936): English contralto ballad and oratario singer; m. (1900) R. Kennerley Rumford, baritone: cycle *Sea Pictures* composed specially for her by Sir Edward Elgar (1899). In 1917 on account of the devotion of the proceeds of her many concerts to war-charities, she was made a Dame of the British Empire.

২ M. Sykes, *C. F. Andrews*, p. 234।

৩ Quoted from Visva-Bharati News, 1936 May-June, p. 85।

হয়ে থাকি, মন হাজার খুঁটিনাটি কাজের ধাক্কায় উদ্‌ভ্রান্ত তখন এ জগতের লেখা লিখতে বসলে লেখনীর ইজ্জত থাকে না— সে আমার পুরো মন দাবি করে।"[১]

কিন্তু অনুরোধে পড়িয়া মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন-এর 'বাউল-সংগীত' সংগ্রহের যখন ভূমিকা লিখিতে বসিলেন, তখন সে-লেখাটার মধ্যে ভিতরের মনিবের তাড়া দেখিতে পাই— কারণ বিষয়টাই তাঁহার রুচিকর। এই গ্রন্থের গান সংগ্রহকালে কবি মনসুরউদ্দিনকে অন্তরের সঙ্গে উৎসাহ দিয়াছিলেন। আমাদের আলোচ্যপর্বে বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ রাজনীতির স্তর হইতে নামিয়া অর্থনীতি ধর্মনীতি এমনকি সাহিত্য ও ভাষার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে। তাই এই ভূমিকায় কবি বলিতেছেন, "আমাদের দেশে যাঁরা নিজেদের শিক্ষিত বলেন তাঁরা প্রয়োজনের তাড়নায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনের নানা কৌশল খুঁজে বেড়াচ্ছেন। · · বাউলসাহিত্যে বাউল-সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি— এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই, একত্র হয়েচে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি। · · এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠ মিলেচে, কোরাণ-পুরাণে ঝগড়া বাধে নি। এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার সত্য পরিচয়, বিবাদে বিরোধের বর্বরতা।"[২]

কিন্তু অচিরেই কলিকাতায় এমন একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিল— যাহা লিপিবদ্ধ করিতেও সংকোচ হয়। তবে রবীন্দ্রনাথ ইহার সহিত জড়িত হইয়া পড়েন বলিয়াই আমরা এ বিষয়টির আলোচনা করিতে বাধ্য।

কলিকাতার সিটিকলেজ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন বিদ্যামন্দির। কলেজের সংলগ্ন ছাত্রাবাসের নাম 'রামমোহন হস্টেল'। সামান্য শিক্ষিত লোকও জানে যে ব্রাহ্মরা প্রতিমাদি পূজাবিরোধী এবং রামমোহন রায় পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। এতকাল পরে ছাত্রদের মধ্যে রামমোহন রায়ের নামাঙ্কিত হস্টেলে সরস্বতী পূজা করিবার জন্য আত্যন্তিক ধর্মভাব দেখা দিল; কর্তৃপক্ষও হস্টেলে পূজা জোর করিয়া বন্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন। এই ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দুসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যে বিরোধের সৃষ্টি হইল, তাহাতে ছাত্রগণকে রাজনৈতিক নেতারা যথেষ্ট ইন্ধন দিতে থাকেন। ব্রাহ্মবিদ্বেষী লোকের অভাব নাই। 'মাইনরিটি'র অধিকারের বুলি তোলায় বিষয়টি জটিল হইয়া উঠিল। হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মদের এই ব্যবহারকে 'উদারতা'র অভাব বলিয়া আখ্যাত করিলেন; অর্থাৎ সবকিছুকে মানিয়া চলার নামই সমন্বয় বা উদারতা। বিচারহীন শিথিল চিন্তার সঙ্গে আছে সাম্প্রদায়িকতার মনোবিকার।

রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধে ও একটি পত্রে এই বিষয়টির আলোচনা করিয়া বলিলেন, ধর্মের স্বাধীনতাই যদি কাম্য হয় তবে সে-স্বাধীনতা শুধু রামমোহন হস্টেলের হিন্দুছাত্ররা পাইবে এমন তো নহে, মুসলমানছাত্ররাও পাইবে। মুসলমানের পক্ষে গো-কোরবানি ধর্মের অঙ্গ, সুতরাং কর্তৃপক্ষ হস্টেলে সে-অধিকার দিতেও বাধ্য। সুতরাং এভাবে যুক্তি চলে না। একটা প্রতিষ্ঠিত সমাজের বিধিবদ্ধ কতকগুলি নিয়ম আছে, সেগুলিকে ভাঙিতে চেষ্টা করায় সৌজন্যের অভাব প্রকাশ পায়। সিটি কলেজ ব্রাহ্মদের, এবং ব্রাহ্মরা প্রতিমাপূজক নহেন, এ কথা প্রত্যেক ছাত্রই জানেন। কলেজ প্রতিষ্ঠার (১৮৮৯) পঞ্চাশ বৎসর পরে হঠাৎ সেখানে প্রতিমা পূজা করিবার জন্য জিদ্‌ অশোভন। ২৩ বৈশাখ (১৩৩৫) তারিখে লিখিত পত্রে[৩] কবি লিখিলেন "যাঁরা ভারতে রাষ্ট্রিক ঐক্য ও মুক্তিসাধনকে তাঁদের

১ দিলীপ রায়কে পত্র, পৌষ সংক্রান্তি [৫ ফাল্গুন ১৩৩৪ ॥ ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮], অনামী, পৃ. ৩৪৪।

২ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাউল গান। প্রবাসী ১৩৩৪ চৈত্র, পৃ. ৭৪৪-৪৫। তু. মরমিয়া, প্রবাসী ১৩৩২ ভাদ্র (১৯২৫ অগস্ট)।

৩ সিটি কলেজের ছাত্রাবাসে সরস্বতীপূজা— প্রবাসী ১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথের পত্র, প্রবাসী ১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠ।

সমস্ত চেষ্টার একমাত্র লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করেছেন, তাঁরাও যখন প্রকাশ্যে এই ধর্মবিরোধকে পক্ষপাত দ্বারা উৎসাহই দিচ্ছেন, তাঁরাও যখন ছাত্রদের এই স্বরাজনীতিগর্হিত আচরণে লেশমাত্র আপত্তি প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত, তখন স্পষ্টই দেখছি, আমাদের দেশের পলিটিক্স-সাধনার পদ্ধতি নিজের ভীরুতায় দুর্বলতায় নিজেকে ব্যর্থ করবার পথেই দাঁড়িয়েছে।"

সিটি কলেজকে বিব্রত করিবার অভিপ্রায়ে কোনো রাজনৈতিক নেতা [কে তিনি ?] ছাত্রদের উপর আপনার প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য তাহাদিগকে নানাভাবে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন ; আমহার্স্ট স্ট্রীটে কলেজের নূতন বাড়ি নির্মাণকালে কর্তৃপক্ষ কোনো ধনী হিন্দুরমণীর নিকট হইতে বাড়ি বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার করিয়াছিলেন। ঐ নেতার প্ররোচনায় ছাত্ররা সেই মহিলার বাড়িতে গিয়া সত্যাগ্রহ শুরু করে। অবশেষে সেই মহিলা কলেজের কর্তৃপক্ষের নিকট অবিলম্বে ঋণের টাকা পরিশোধের জন্য চাপ দিলেন। কলেজের এই আর্থিক দুর্গতি হইতে তাহাকে রক্ষা করেন বিশ্বভারতী। হায়দরাবাদ রাজ্যের নিজাম-বাহাদুর ইসলামিক বিদ্যাচর্চার জন্য যে লক্ষ টাকা বিশ্বভারতীকে দান করিয়াছিলেন, তাহা এইখানে তাঁহারা লগ্নী করিয়া কলেজটিকে রক্ষা করিলেন। বলা বাহুল্য, বিশ্বভারতীর আচার্যরূপে রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন ছাড়া ইহা সম্ভব হইত না।

সিটি কলেজে সরস্বতীপূজা লইয়া যখন গোলমাল তখন কবি শান্তিনিকেতনে। বসন্তকাল আগত। কবিহৃদয় ঋতুরাজের আহ্বানে সাড়া না দিয়া পারে না। অনেকগুলি কবিতা ও গান[১] এই সময়ের রচনা যেমন— 'মহুয়া'র অন্তর্গত—

বোধন— মাঘের সূর্য উত্তরায়ণ
বসন্ত— ওগো বসন্ত, হে ভুবনজয়ী (অন্য নাম 'বিজয়ী')
বরযাত্রা— আজি পবন দিগন্তের দুয়ার নাড়ে
মাধবী— বসন্তের জয়রবে

এ ছাড়াও কতকগুলি কবিতা এই সময়ে লিখিত, সেগুলি 'বনবাণী'র অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, যেমন—

আম্রবন (৫ ফাল্গুন ১৩৩৪) ; শাল (৮ ফাল্গুন) ; নারিকেল (১৬ ফাল্গুন)।

এবারকার বসন্তোৎসব-দিনে কবির বিশেষ ইচ্ছায় আশ্রমের তরুণ কবিরা আপন-আপন রচনার অর্ঘ্য নিবেদন করেন। কবিই তাহাদের কবিতা স্বয়ং আবৃত্তি করিলেন ; এই তরুণ কবিদের মধ্যে ছিলেন নিশিকান্ত রায়চৌধুরী,

১ প্রবাসী ১৩৩৫ বৈশাখ সংখ্যায় নিম্নলিখিত কবিতা প্রকাশিত হয়—
বিজয়ী— ওগো বসন্ত, হে ভুবনজয়ী (মহুয়ায় 'বসন্ত' নামে)
বাসন্তী— ১. বরযাত্রা— আজি পবন দিগন্তের দুয়ার নাড়ে (মহুয়া)
২. রূপান্তর— চাঁদেরে করিতে বন্দী
৩. ঝরাপাতা— ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে (গীতবিতান, পৃ. ৫৩৯)
৪. মুক্তি— বসন্তের আসরে ঝড়
৫. পাড়ি— নিবিড় অমা-তিমির হতে (গীতবিতান, পৃ. ৫২৩)
৬. মাধবী— বসন্তের জয়রবে দিগন্ত কাঁপিল যবে (মহুয়া)
৭. শাল— ক্লান্ত যখন আম্রকলির কাল (গীতবিতান, পৃ. ৫২৬)
নারিকেল— সমুদ্রের কূল হতে (বনবাণী)

সুকুমার সরকার। নিশিকান্ত বহুকাল পণ্ডিচেরী আশ্রমবাসী, সুকুমার বিদেহী। সেইদিন সন্ধ্যায় 'ফাল্গুনী' নাটক আম্রকুঞ্জে অভিনীত হয়— কবি স্বয়ং অন্ধ বাউলের ভূমিকা গ্রহণ করেন।[১]

বসন্তোৎসবের (২২ ফাল্গুন ১৩৩৪ ॥ ৬ মার্চ) কয়েকদিন পর কবি কলিকাতায় যান; সেখানে বিশ্বভারতী সম্মেলনের উদ্যোগে নবীন সাহিত্যিকদের মধ্যে যে বিবাদ চলিতেছিল তাহা শমিত করিবার জন্য যে সভা জোড়াসাঁকোর বাটীতে আহূত হয়, তাহার কথা আমরা পূর্বে 'সাহিত্যে দ্বন্দ্ব' পরিচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছি।

এই সভা দুই দিন বসে; দ্বিতীয় দিন প্রাতে (৭ চৈত্র ১৩৩৪) কবি লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন; অল্পকাল পূর্বে লর্ড সিংহের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি ১৯২৫ সালে কবির য়ুরোপভ্রমণের সময় কিছুকাল একত্র ছিলেন। বিশ্বভারতীর জন্য একবার এককালীন দশ সহস্র মুদ্রা দান করেন; সেই অর্থ দিয়া যে গৃহ নির্মিত হয়, তাহা এখনো 'সিংহসদন' নামে পরিচিত। শান্তিনিকেতনের পূর্ব মাঠে ল্যান্ড অ্যাক্যুজিশনের সময় তাঁহার সহায়তা না পাইলে বিশ্বভারতীর প্রচণ্ড আর্থিক ক্ষতি হইত।

কলিকাতার উত্তেজনা হইতে মুক্তি পাইয়া কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন। বর্ষশেষের দিন (১৩ এপ্রিল) সন্ধ্যার ভাষণে বলিলেন, "রাজধানীর জনসংঘের কোলাহল থেকে . . আজ এসে বর্ষশেষের যে রূপটি এখানে দেখলুম, রাজধানীতে থাকলে সেটি এমন প্রত্যক্ষ ক'রে দেখতে পেতুম না, সেখানে একটি ঘূর্ণিপাকের আচ্ছাদন চারিদিকে।" বর্ষশেষের দুই দিন পূর্বে (২৯ চৈত্র ১৩৪৪) 'অবশেষ' (মহুয়া) নামে যে কবিতাটি লেখেন, তাহার মধ্যে এই ক্লান্তির আভাস হয়তো আছে—

বাহির পথে বিবাগী হিয়া
কিসের খোঁজে গেলি,
আয় রে ফিরে আয়।
পুরানো ঘরে দুয়ার দিয়া
ছেঁড়া আসন মেলি
বসিবি নিরালায়। . .

নববর্ষের দিন (১৩৩৫) প্রাতে কবি শান্তিনিকেতন-মন্দিরে যে ভাষণ দান করিলেন, তাহার মধ্যে নিজ জীবনের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা ও সিদ্ধির অনেক কথা আছে।[২]

গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বিদ্যালয় বন্ধ (৩ মে) হইবার পূর্বে কবি কলিকাতায় যান; পঁচিশে বৈশাখ বিচিত্রাভবনে কবির জন্মোৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হইল; এইদিন তুলাদান হয়; অর্থাৎ কবির ওজনের পরিমাপ বিশ্বভারতী-প্রকাশিত গ্রন্থরাজি নানা পাবলিক লাইব্রেরি ও প্রতিষ্ঠানে দান করিবার জন্য উৎসর্গ করা হইয়াছিল।[৩]

১ দ্র. সুধীরচন্দ্র কর, রবীন্দ্রনাথের আসর, দৈনিক বসুমতী, ৫ শ্রাবণ ১৩৫৮।

২ নববর্ষ, প্রবাসী ১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠ। দ্র. শান্তিনিকেতন ২ (বিশ্বভারতী ১৩৪২ সংস্করণ), পৃ. ৬৪৬-৫০।

৩ Annual Report of Visva-Bharati 1928, p. 22।

দক্ষিণ-ভারতে

জন্মোৎসবের চারি দিন পরে ১২ মে য়ুরোপযাত্রার উদ্দেশ্যে মাদ্রাজের পথে রওনা হইলেন। ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হিবার্ট লেকচার দিবার জন্য তাঁহার নিমন্ত্রণ।

রবার্ট হিবার্ট (১৭৭০ - ১৮৪৯) নামে জামাইকা-প্রবাসী কোনো বণিক য়ুনিটেরিয়ান খ্রীষ্টানী সম্বন্ধে বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করিবার জন্য একটি তহবিল অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। ট্রাস্টিগণ দাতার অভিপ্রায়কে একটু ব্যাপকতর করিয়া উদারনীতিক ধর্মবিষয়ে আলোচনাদির ক্ষেত্র প্রশস্ততর করিয়া দেন। সেই সিদ্ধান্তমতে ১৮৭৮ সালে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলর ভারত ও প্রাচ্য ধর্মবিষয়ে বক্তৃতা করিবার জন্য আহূত হন। ইহার পঞ্চাশ বৎসর পর ১৯২৮ সালে প্রথম ভারতীয়কে ট্রাস্টিগণ আমন্ত্রণ করিলেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে কোনো ভারতীয় বা এশিয়ান এই বক্তৃতা দিবার জন্য আহূত হন নাই।

কলিকাতা হইতে জলপথে মাদ্রাজ হইয়া কলম্বোতে গিয়া জাহাজ ধরার কথা। সঙ্গে যাইবেন আরিয়াম ও এন্ড্রুজ। রথীন্দ্রনাথ কিছুকাল হইতে অসুস্থ ; তিনি, প্রতিমা দেবী ও তাঁহাদের পালিতা কন্যা য়ুরোপ যাইতেছেন ; তজ্জন্য তাঁহারা ৩ মে দক্ষিণ-ভারত যাত্রা করিয়া কোডাইকোনালে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন— কবিকে মাদ্রাজে অথবা কলম্বোতে গিয়া ধরিবেন।

কবির শখ কলিকাতা হইতে স্টীমারযোগে মাদ্রাজ যাইবেন। কিন্তু জাহাজের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাদির কথা শুনিয়া সমুদ্রপথে যাইবার উৎসাহ নিবিয়া গেল, রেলপথে মাদ্রাজ যাত্রা করিলেন। সঙ্গে চলিয়াছেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ও রানী দেবী— গ্রীষ্মাবকাশের ছুটিতে তাঁহারা বিলাত যাইতেছেন। কবির জিনিসপত্র লইয়া আরিয়াম ও এন্ড্রুজ সমুদ্রপথে মাদ্রাজ পৌঁছিয়া কবির জন্য অপেক্ষা করিবেন স্থির হইল।

মাদ্রাজের পথে কবি অকস্মাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন। ১৭ মে মাদ্রাজে বিলাতগামী জাহাজ ধরার কথা, সে জাহাজ ছাড়িয়া দেওয়া হইল। মাদ্রাজে পৌঁছিলে কবি অসুস্থ হইয়াছেন জানিতে পারিয়া মিসেস্ বেসাণ্ট কবিকে আদৈয়ে আসিয়া বিশ্রাম করিবার আহ্বান করিলেন। সেখানে ব্লাভাৎস্কি হাউসে কবি ও তাঁহার সঙ্গীরা আশ্রয় লইলেন।

আদৈয়ে পৌঁছিবার পরদিন (১৬ মে) সন্ধ্যায় আশ্রমের উদ্যানে মিসেস্ বেসাণ্ট কবি-সংবর্ধনার আয়োজন করিলেন। বেসাণ্টের ভাষণ কবির খুবই ভালো লাগে ; কবিও ধন্যবাদ দিতে যে ভাষণ দিলেন তাহা একটি বক্তৃতারই শামিল। আদৈয়ে আসিয়া বোধ হয় কবি 'সংস্কার' নামে একটি ছোটোগল্প লেখেন (১৫ মে)।

সংস্কার গল্পটি তাঁহার 'নামঞ্জুর' গল্পের ন্যায়ই। নারীদের রাজনীতিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যোগদানের ফলে তাহাদের স্বভাবের মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটিতেছে বলিয়া কবি মনে করিতেছেন— এই গল্প তাহারই মৃদু তিরস্কার।

রাজনীতির উচ্ছ্বাসে বড়ো-কথা কহা সহজ, কিন্তু বড়ো-কথা বাস্তবজীবনে মূর্ত করাই কঠিন। আদর্শবাদের সহজবুলি বাস্তবের রূঢ়স্পর্শে শীর্ণ হইয়া যায়। 'নামঞ্জুর' গল্পে অমিয়ার হীন জন্মের ইতিহাস জানিতে পারিয়া অনিলের আদর্শবাদ মুহূর্তে লুপ্ত হইয়া গেল। 'সংস্কার' গল্পেও উৎপীড়িত মেথরকে গাড়িতে তুলিতে সংস্কারে বাধিল খদ্দরধারিণী শ্রীমতী কলিকার। সে স্বামীকে বলে, "বর্ণভেদ তুমি মুখে অগ্রাহ্য করো · · আমরা খদ্দর প'রে প'রে সেই ভেদটার উপর অখণ্ড সাদা রঙ বিছিয়ে দিয়েছি, আবরণভেদ তুলে দিয়ে বর্ণভেদটার ছাল ছাড়িয়ে ফেলেছি।" তাহার স্বামী ভাবে "কাপড় দিয়ে বর্ণবৈষম্য ঢাকা দেওয়াটা বাহ্যিক, ওতে ঢাকা দেওয়াই হয়, মুছে দেওয়া হয় না।"

আদৈরে মে মাসের গরম আদৌ উপভোগ্য নয়। এমন সময়ে কুন্নুর হইতে পিঠাপুরম-রাজার[১] নিকট হইতে নিমন্ত্রণ আসিল— বোধ হয় এন্‌ড্রুজই রাজাকে লিখিয়া নিমন্ত্রণের ব্যবস্থাটি ঘটান।

কুন্নুর নীলগিরির অন্যতম শৈলাবাস; সেখানে বেশ শীত। পিঠাপুরম-রাজের নিজ বাড়ির নিকটেই কবির জন্য একটি বাড়ির ব্যবস্থা হয়। কবির সঙ্গে আছেন প্রশান্তচন্দ্র ও তাঁহার স্ত্রী রানী দেবী। এন্‌ড্রুজ ও আরিয়াম পরে আসিয়া জোটেন। রানী দেবী (নির্মলকুমারী মহলানবিশ) তাঁহার 'কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে' গ্রন্থে (পৃ. ৪৪-৪৬) কুন্নুর-বাসের নানা কৌতুকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

কুন্নুরে রানী দেবীর আগ্রহে ও উৎসাহে কবি সন্ধ্যার সময় যেসব গল্প মুখে মুখে বলিতেন, তাহা লিখিয়া ফেলিবার জন্য জিদ্ ধরেন। সেই জিদের ফলে কবি একটি গল্পে হাত দিলেন, যেটুকু লেখেন প'ড়িয়া শোনান। এইভাবে 'মিতা' নামে গল্পোপন্যাসের আরম্ভ হইল। রানী দেবী লিখিতেছেন, 'আমরা উৎসুক হয়ে অপেক্ষা ক'রে থাকতাম অমিট্ রায় ও লাবণ্যর জন্য।'

কুন্নুরে কবির ভালোই লাগিতেছে, কিন্তু য়ুরোপযাত্রার জন্য মাদ্রাজ যাইতেই হইল। মাদ্রাজ হইতে কলম্বোগামী জাহাজ ধরিলেন (২৮ মে)। এই জাহাজ দুই দিন পরে পণ্ডিচেরির ঘাটে আসিয়া থামে। পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ থাকেন। রবীন্দ্রনাথ এই পথে যাইতেছেন জানিতে পারিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইবার অনুরোধ জানাইয়া তিনি লোক পাঠাইলেন। বৎসর দুই হইল শ্রীঅরবিন্দ সাধারণ লোকজনের সহিত দেখাসাক্ষাৎ প্রায় বন্ধ করিয়া দিয়াছেন; বৎসরে নির্দিষ্টদিনে ভক্ত ও গুণগ্রাহীদের দর্শন দেন ও প্রয়োজনমত পত্র লিখিয়া তাঁহার বক্তব্য বা উপদেশ জ্ঞাপন করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইল।

পণ্ডিচেরী ঘাটে জেটি হইতে কিছু দূরে জাহাজ দাঁড়ায়; কবিকে একটি পিপের মধ্যে বসাইয়া কপিকল বা ক্রেনের সাহায্যে নীচে নামানো হয়; রানী দেবী তাঁহার গ্রন্থে ইহার খুব সরস বর্ণনা দিয়াছেন।[২]

কবির সহিত অরবিন্দের সাক্ষাৎ হইল বহু বৎসর পরে। প্রায় এক ঘণ্টাকাল উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা হয়— কী কথা হয়, তাহা প্রকাশিত হয় নাই; কারণ, বোধ হয় মাদার ছাড়া সেখানে আর কেহ উপস্থিত ছিলেন না।

কয়েক ঘণ্টা পরে জাহাজে ফিরিয়া আসিয়া কবি বলেন যে অরবিন্দকে দেখিয়া খুব আশ্চর্য লাগিয়াছে। এই সাক্ষাতে কবির মনে এমন নাড়া দিয়াছিল যে সমস্তদিন কাহারও সহিত বেশি কথাবার্তা বলেন নাই। সেই দিন (২৯ মে) অরবিন্দ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া কবি প্রবাসীতে পাঠাইয়া দিলেন।

পরদিন য়ুরোপ-প্রবাসী প্রতিমা দেবীকে কবি লিখিতেছেন, "পণ্ডিচেরিতে অরবিন্দের সঙ্গে দেখা করে আমার মনে এল আমারো কিছুদিন এই রকম তপস্যার খুবই দরকার। নইলে ভিতরের আলো ক্রমে ক্রমে কমে আসবে। প্রতিদিন যা তা কাজ করে, যা তা কথা বলে মনটা বাজে আবর্জনায় চাপা পড়ে যায়, নিজেকে যেন দেখতে

১ পিঠাপুরম— অন্ধ্ররাজ্যে পূর্ব গোদাবরী জেলার তালুক ও শহর। এখানকার রাজা (জমিদার) ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। ইহার দেওয়ান সার্ বেঙ্কটরমনের প্রেরণায় ইনি বহু জনকল্যাণকর কার্যে ব্রতী হন। কাকিনাদের কলেজ, অনাথআশ্রম প্রভৃতি ইঁহার স্থাপিত। বিশ্বভারতীতে তিনি দুই সহস্র টাকা দান করেন; তাহা দিয়া গ্রন্থভবনের দ্বিতল নির্মিত হয়।

২ "আমাকে যেভাবে জাহাজ থেকে ওঠা-নামা করেছিল তাতে মর্যাদা রক্ষা হয় না, ..."। চিঠিপত্র ৪, পৃ. ১৩৮। শ্রীমতী মহলানবিশের গ্রন্থে জাহাজ হইতে অবতরণের ছবি আছে।

পাইনে।"[১] সেইদিন কবি তাঁহার কন্যা মীরা দেবীকে লিখিতেছেন, "অরবিন্দকে দেখে আমার ভারি ভাল লাগল— বেশ বুঝতে পারলাম নিজেকে ঠিকমত পাবার এই উপায়।"[২]

শান্তিলি জাহাজ হইতে অরবিন্দ সম্বন্ধে কবি যে প্রবন্ধটি লেখেন, তাহা আমরা নিম্নে উদ্‌ধৃত করিতেছি। কবি লিখিতেছেন[৩]—

"অনেকদিন মনে ছিল অরবিন্দ ঘোষকে দেখব। সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল।··প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝলুম— ইনি আত্মাকেই সব চেয়ে সত্য করে চেয়েছেন, সত্য করে পেয়েছেন। সেই তাঁর দীর্ঘ তপস্যার চাওয়া ও পাওয়ার দ্বারা তাঁর সত্তা ওতপ্রোত। আমার মন বললে, ইনি এঁর অন্তরের আলো দিয়েই বাহিরে আলো জ্বালাবেন। কথা বেশি বলবার সময় হাতে ছিল না। অতি অল্পক্ষণ ছিলুম। তারি মধ্যে মনে হল, তাঁর মধ্যে সহজ প্রেরণাশক্তি পুঞ্জিত। কোনো খর-দস্তুর মতের উপদেশতার নৈবেদ্যরূপে সত্যের উপলব্ধিকে তিনি ক্লিষ্ট ও খর্ব করেন নি। তাই তাঁর মুখশ্রীতে এমন সৌন্দর্যময় শান্তির উজ্জ্বল আভা। মধ্যযুগের খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি জীবনকে রিক্ত শুষ্ক করাকেই চরিতার্থতা বলেননি। আপনার মধ্যে ঋষি পিতামহের এই বাণী অনুভব করেছেন, 'যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি'। পরিপূর্ণের যোগে সকলেরই মধ্যে প্রবেশাধিকার আত্মার শ্রেষ্ঠ অধিকার। আমি তাঁকে বলে এলুম— আত্মার বাণী বহন করে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন এই অপেক্ষায় থাকব। এই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে— 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে'।··অরবিন্দকে তাঁর যৌবনের মুখে ক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে যে তপস্যার আসনে দেখেছিলুম সেখানে তাঁকে জানিয়েছি— 'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার'। আজ তাঁকে দেখলুম তাঁর দ্বিতীয় তপস্যার আসনে, অপ্রগল্‌ভ স্তব্ধতায়, আজও তাঁকে মনে মনে ব'লে এলুম 'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার'।"

কয়েক মাস পরে দিলীপকুমার রায় শ্রীঅরবিন্দ-আশ্রমে আশ্রয়ের সংকল্প গ্রহণ করিয়া রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন ; তখন (২৮ ডিসেম্বর ১৯২৮) কবি যে কবিতাটি[৪] লিখিয়া পাঠান, তাহাতে অরবিন্দের কথাই রূপকছলে আছে।

> নিম্নে সরোবর স্তব্ধ হিমাদ্রির উপত্যকাতলে ;
> ঊর্ধ্বে গিরিশৃঙ্গ হতে শ্রান্তিহীন সাধনার বলে
> তরুণ নির্ঝর ধায় সিন্ধুসনে মিলনের লাগি
> অরুণোদয়ের পথে। সে কহিল 'আশীর্বাদ মাগি,
> হে প্রাচীন সরোবর।' সরোবর কহিল হাসিয়া,
> 'আশীষ তোমার তরে নীলাম্বরে উঠে উদ্‌ভাসিয়া,
> প্রভাতসূর্যের করে ; ধ্যানময় গিরি-তপস্বীর
> নিরন্তর করুণায় বিগলিত আশীর্বাদ-নীর

১ চিঠিপত্র ৩, পত্র ২৬। ৩০ মে ১৯২৮।

২ চিঠিপত্র ৪, পত্র ৬০। ৩০ মে ১৯২৮।

৩ শান্তিলি জাহাজ, ২৯ মে ১৯২৮। দ্র. প্রবাসী ১৩৩৫ শ্রাবণ, পৃ. ৫০৫-৫৮।

৪ কবিতাটি দিলীপকুমারের 'অনামী' গ্রন্থে কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত হয়। 'পরিশেষ' কাব্যখণ্ডে এই কবিতাটি কিছু কিছু ভাষার পরিবর্তন হইয়া উহাতে আছে। আমরা 'অনামী'র পাঠ উদ্‌ধৃত করিয়াছি।

তোমারে দিতেছে প্রাণধারা। আমি বনছায়া হতে,
নির্জনে একান্তে বসি, দেখি তুমি নির্বারিত স্রোতে
সংগীত-উদ্বেল নৃত্যে প্রতিক্ষণে করিতেছ জয়
মসীকৃষ্ণ বিঘ্নপুঞ্জ পথরোধী পাষাণ সঞ্চয়
গূঢ় জড় শত্রুদল। এই তব যাত্রার প্রবাহ
আপনার গতিবেগে আপনাতে জাগায় উৎসাহ।

পণ্ডিচেরী হইতে কবি সদল কলম্বো পৌঁছিলেন (৩১ মে)। তাঁহারা de Silva নামে এক ধনীর অতিথি হইলেন। কিন্তু শরীর ক্রমশই মন্দতর হইতেছে— ডাক্তার এ অবস্থায় য়ুরোপযাত্রা নিষেধ করিলেন। শেষ পর্যন্ত অক্সফোর্ডে গিয়া হিবার্ট লেকচার দেওয়া এবারকার মত স্থগিত হইল। এন্‌ড্রুজ ৫ জুন বিলাত চলিয়া গেলেন— মহলানবিশ-দম্পতি কবির সঙ্গে থাকিলেন। রথীন্দ্রনাথ সস্ত্রীক পালিতা কন্যাকে লইয়া ইতিপূর্বে য়ুরোপ রওনা দিয়াছিলেন।

বৈশাখী পূর্ণিমায় (৩ জুন) বুদ্ধদেবের জন্মদিন— সিংহলময় উৎসব। অনুরাধাপুরের বোধিদ্রুমতলে সহস্র সহস্র নরনারী সমবেত হয়। মহলানবিশ-দম্পতি উৎসব দেখিতে চলিয়া গেলেন; কিছুকাল পরে ডাক্তারের গাড়িতে করিয়া কবি সেখানে উপস্থিত হইলেন; সকলেই ভাবিয়াছিল এই ক্লান্তিকর পথে কবি হয়তো আসিবেন না; কিন্তু সিংহলের বুদ্ধোৎসবে যোগদান না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

কলম্বো বাসকালে কবি 'যোগাযোগ' উপন্যাসটির শেষ দিকটা লিখিতেছেন, মাঝে মাঝে 'মিতা' গল্পও চলিতেছে।

দিন দশ কলম্বোয় কাটাইয়া কবি ভারতে ফিরিয়া মাদুরাইতে একদিন থামিয়া মাদ্রাজে আসিলেন। এখানে আসিয়া স্থির করিলেন বঙ্গলুরে যাইবেন; সেখানে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য। ব্রজেন্দ্রনাথ একাই থাকেন; তাই রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্রদের পাইয়া খুব খুশি। কবিও এখানে আসিয়া বেশ আরাম বোধ করিতেছেন।

বঙ্গলুরের শান্ত পরিবেশে 'মিতা' গল্পটি বেশ আগাইয়া চলিতেছে। রানী দেবী লিখিতেছেন যে একদিন সারারাত্রি ধরিয়া কবি গল্পটি লেখেন। ২৫ জুন লেখা হইলে, পরদিন সমস্ত গল্পটি ব্রজেন্দ্রনাথ ও প্রশান্তদের নিকট পড়িয়া শুনাইলেন।

বঙ্গলুরে যোগাযোগ ও মিতা (শেষের কবিতা) রচনা শেষ হয়। কবি যোগাযোগ যখন আরম্ভ করেন তখন ভাবিয়াছিলেন যে তিনপুরুষের কাহিনী লিখিবেন। রথীন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন, "যোগাযোগটাকে মাঝখানে এক-জায়গায় থামিয়ে দেওয়া গেল। আবার যদি কখনো ইচ্ছা হয় তবে অন্য একটা নাম দিয়ে এর আর-একটা অংশ লেখবার চেষ্টা করা যাবে।"[১] সে-চেষ্টা আর হয় নাই।

যোগাযোগ ও শেষের কবিতার বিষয়বস্তু ভাষা রচনারীতি সম্পূর্ণ পৃথক— অথচ দুইখানি উপন্যাসই পালাক্রমে লিখিয়া যান। রানী দেবী ইহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিলে, কবি তাঁহাকে বলেন, "অসুবিধা হবে কেন? আমি যে

১ চিঠিপত্র ২, পত্র ৩১। ২৫ জুলাই ১৯২৮॥ ৯ শ্রাবণ ১৩৩৫।

সারাদিন ওদের দেখতে পাই, কথাবার্তা বলি ওদের সঙ্গে। কাজেই লিখতে বাধে না। কুমুর সঙ্গে যখন কথা বলি তখন বিপ্রদাস মধুসূদন ভিড় ক'রে এসে দাঁড়ায়। প্রত্যেকেরই মুখের কথা আপনিই আমার কলমে এসে যায়। আবার অমিট্ রায়দের নিয়ে যখন পড়ি তখন সিসি লিসি কেটি ওদের ফ্যাশনেবল্ সমাজ, সমস্ত অ্যাটমস্ফিয়ারটা মাথার মধ্যে জ'মে ওঠে। এর মধ্যে লাবণ্য, লাবণ্যর মাসি একেবারে অন্য জাতের মানুষ। লাবণ্যর সঙ্গে যেন আমার চেনাশোনা আছে, খুব যেন তাকে দেখেছি।"[১]

বৃক্ষরোপণ ও হলকর্ষণ - উৎসব

দক্ষিণ-ভারত ও সিংহলে মাস দুই কাটাইয়া কবি শান্তিনিকেতন ফিরিতেছেন ; বর্ধমান স্টেশনে ট্রেন বদলাইয়া ওভার-ব্রিজের উপর দিয়া চলিতে গিয়া কবি অনুভব করিলেন তাঁহার শরীর কী দুর্বল হইয়াছে। "পুরানো সেবকের প্রতি প্রকৃতির দয়ামায়া নেই। এক মুহূর্তে কোনো কারণ না দেখিয়া তাকে বরখাস্ত করতে তার [প্রকৃতির] একটুও বাধে না। কিন্তু··কর্মক্ষেত্র থেকে বরখাস্তের যোগ্য এ কথা"[২] কবি সহজে কবুল করিতে রাজি নহেন। তাই যখন বর্ধমানে চেয়ারে বসাইয়া কুলি দিয়া লইবার প্রস্তাব হয়, তখন বিরক্ত হইয়া অস্বীকৃত হন।

গ্রীষ্মাবকাশের পর বিদ্যালয় খুলিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কবি জুলাই মাসের গোড়ায় শান্তিনিকেতনে ফিরিয়াছেন। প্রান্তরে বর্ষা নামিয়াছে। কবি নিজ পরিবেশে আসিয়া তৃপ্ত। কিন্তু শরীর খারাপ। তার উপর বিশ্বভারতীর আর্থিক ও নানা প্রকারের উদ্বেগপূর্ণ সমস্যা। রথীন্দ্রনাথ সপরিবারে য়ুরোপ সফর করিতেছেন। প্রশান্তচন্দ্রও য়ুরোপ চলিয়া গিয়াছেন— বিশ্বভারতীর দুই কর্ণধারই বিদেশে।

কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া কয়েকদিন পরে (২৫ জুলাই) রথীন্দ্রনাথকে প্রবাসে লিখিতেছেন, "বিদ্যালয়ের পুনর্গঠন নিয়ে কেবলি আলোচনা আন্দোলন চলচেই—তর্কবিতর্কের অন্ত নেই—কিন্তু জিনিসটা যেখানে ছিল সেইখানেই থেকে যাচ্চে ব'লে বোধ হচ্ছে।"[৩] কয়েকদিন পরে কলিকাতা হইতে লিখিতেছেন (৩ অগস্ট)[৪] "শান্তিনিকেতনে পরিবর্তন প্রভৃতি ব্যাপার নিয়ে বেশ একটা কাণ্ড চলচে! এখন সেখানকার অধ্যাপকরা নিজেরাই দায়িত্ব নিয়ে আয়ব্যয়ের সামঞ্জস্য করবার উপায় চিন্তা করতে বসেচেন।··এই সময়ে তুই এখানে নেই এটা খুব ভালো হয়েচে। আমিও এর মধ্যে একটুও হাত দিচ্চি নে।" কয়েকদিন পরে লিখিতেছেন (৩০ অগস্ট) "আগাগোড়া নতুন করে গড়তে হবে।"[৫]

শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে এই ভাঙাগড়ার কাজ নূতন নহে, বরাবরই চলিতেছে। ভাঙাগড়া হইলেই যে তাহা নিন্দনীয়, এ কথা স্বীকার করা যায় না। নদীর বহতা আছে বলিয়া তার উভয় তীরে ভাঙাগড়া সমভাবে চলে।

১ কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে, পৃ. ৮৪-৮৫।
২ পথে ও পথের প্রান্তে, পত্র ১৬। ২০ আষাঢ় ১৩৩৫ ॥ ৪ জুলাই ১৯২৮।
৩ চিঠিপত্র ২, পত্র ৩১ ; পৃ. ৮৪।
৪ চিঠিপত্র ২, পত্র ৩২ ; পৃ. ৮৬।
৫ চিঠিপত্র ২, পত্র ৩৩ ; পৃ. ৮৮।

এই ভাঙাগড়ার সময়ে কখনো যে অন্যায় অবিচার হয় নাই, তাহা বলিতে পারি না। অনেক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পরিশুদ্ধ নির্লিপ্ততা রক্ষা করিতে পারেন নাই; এবং মাঝে মাঝে অনুগত প্রবল পক্ষের অনুকূলেই মত ব্যক্ত করিতে গিয়া অন্যায়কে সমর্থন করিতে হইয়াছে। বিদ্যালয়ের ইতিহাস আমরা এখানে আলোচনা করিব না। সংক্ষেপে বলি— সেপ্টেম্বর মাস হইতে কবির উপর বিশ্বভারতীর সমস্ত ক্ষমতা অর্পিত হইল।

এসব বাহ্য ঘটনা। দক্ষিণ-ভারত হইতে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া কবি 'মিতা' গল্পটি লইয়া মাজাঘসা করিলেন। অল্পকিছু বাড়িয়াও গেল; আশ্রমবাসীদের গল্পটি পড়িয়া একদিন শুনাইলেন।[১]

"বসে বসে কোনো একটা খেয়ালের কাজ করতে ইচ্ছে করছে— এই 'রৌদ্র মাখানো অলস বেলায়' গুন্ গুন্ করে গান করতে, কিংবা সৃষ্টিছাড়া ধরণের ছবি আঁকতে; অথচ দুটোর কোনোটাই করা হবে না,· · আমার ক্লান্তিভরা কুঁড়েমির ডিগ্রিটা অতটুকু কাজ করারও নীচে।"[২]

কিন্তু ক্লান্তি দূর হইয়া গেল. যেমন আগত বর্ষামঙ্গলের সহিত বৃক্ষরোপণ উৎসবের ভাবনা মনে উদিত হইল। গত দুই বৎসর হইতে কবির মনে বৃক্ষের রহস্যকথা কাব্যমধ্যে নানাভাবে মূর্ত হইতেছে। 'বৃক্ষবন্দনা' দিয়া ইহার সূত্রপাত (১৯২৭ মার্চ ২৩); তার পর বিশেষ বিশেষ তরুর বন্দনায় তাহার পরিশেষ হয়।

জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ যাহা কবিরূপে অন্তরে অনুভব করেন, ব্যবহারিক জীবনে 'মানুষের মাঝে' তাহার বিকাশ বা মূর্তি দেখিতে না পাইলে তাঁহার জীবনানন্দ পরিপূর্ণ হয় না। তাই বর্ষামঙ্গল আনন্দ-উৎসবের ব্যবহারিক রূপ প্রকাশ হইল বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে।

রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল পশ্চিমবঙ্গে আছেন, তিনি জানেন তরুহীনতার ফলে বারিপাতের অঙ্ক হ্রস্বমুখী। এককালে রাঢ় অঞ্চলে লৌহচুর আকর থাকায় নিষ্ঠুরভাবে বনচ্ছেদন চলিয়াছিল; যাহার ফলে শ্যামল ধরণীর কংকাল আজ উন্মুক্ত। কবির ইচ্ছা এই বৃক্ষরোপণ উৎসবের মধ্য দিয়া গ্রামে গ্রামে বনভূমির পত্তন হয়। অরণ্যীকরণ ছাড়া দেশের বারিপাত বৃদ্ধি পাইবে না, কৃষিসংকটও নিরাকৃত হইবে না।

বৃক্ষরোপণ উৎসব (১৪ জুলাই) সম্বন্ধে কবি য়ুরোপপ্রবাসী বধূমাতা প্রতিমা দেবীকে লিখিতেছেন, "তোমার টবের বকুল গাছটাকে নিয়ে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানটা হল। পৃথিবীতে কোনো গাছের এমন সৌভাগ্য কল্পনা করতে পার না। সুন্দরী বালিকারা সুপরিচ্ছন্ন হয়ে শাঁখ বাজাতে বাজাতে গান গাইতে গাইতে গাছের সঙ্গে যজ্ঞক্ষেত্রে এল। [বিধুশেখর] শাস্ত্রী মহাশয় সংস্কৃত শ্লোক আওড়ালেন— আমি একে একে ছ'টা কবিতা পড়লুম।"[৩]

কবি যে-ছয়টি কবিতা পাঠ করেন, সেগুলি পঞ্চভূতের উদ্দেশ্যে রচিত— ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম। ষষ্ঠটি মাঙ্গলিক।[৪]

১ "শেষের কবিতা নামক একটা মাঝারি সাইজের গল্প ইতিমধ্যে লিখেচি, পথে চলতে চলতে। বাঙ্গালোরে থাকতে ওটা শেষ করা গেছে। প্রবাসী হাজার টাকা দিয়ে ওটা কিনে নিয়েচে— আসচে মাস [১৩৩৫ ভাদ্র] থেকে বেরোবে।" — চিঠিপত্র ২, পত্র ৩১। জুলাই ২৫, ১৯২৮।

২ পথে ও পথের প্রান্তে, পত্র ১৭ ; ৮ জুলাই ১৯২৮। ১০ জুলাই 'অন্তর্ধান' ও 'বিবক্ত' কবিতা লেখেন। মূলে কবিতা দুইটি একত্র ছিল; প্রথমাংশ 'শেষের কবিতা'র অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেন। দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫, পৃ. ৫২১-২২।

৩ চিঠিপত্র ৩, পত্র ২৮। ৯ শ্রাবণ ১৩৩৫ ॥ ২৫ জুলাই ১৯২৮।

৪ বনবাণী, পৃ. ১৩৬-৩৮। কবিতাগুলি ১৩ জুলাই ॥ ২৯ আষাঢ় রচিত।

সভাস্থলে পঞ্চভূত মূর্তিমান হইয়া উপবিষ্ট হন ; প্রত্যেকের বেশ বিশেষ ভূতের প্রতীক-ব্যঞ্জক— ইঁহারা নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ করের তত্ত্বাবধানে সুসজ্জিত হন।[১]

গৌরপ্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান শেষে সিংহসদনে সভা হয়। সেখানে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সদ্যরচিত গল্প 'বলাই' পড়িয়া শুনাইলেন। গল্পটি[২] নিঃসন্তান ধনী খুল্লতাত কর্তৃক লালিত একটি পিতৃমাতৃহীন বালকের কাহিনী। বলাই তাহার নিঃসঙ্গ জীবনে উদ্ভিদের সহিত আত্মীয়তা অনুভব করিত। বাড়ির রাস্তার মাঝখানে জাত, তাহার স্নেহপালিত একটি শিমুল চারা অভিভাবকরা অপ্রয়োজনীয় বোধে কাটিয়া ফেলেন। তাহাতে বালকটির স্নেহময়ী কাকিমা দুঃখে মুহ্যমান হন, কারণ এই ক্ষুদ্র বৃক্ষটির সহিত বালকের অন্তরের একটি যোগ ছিল। কবি বলেন যে, বাল্যকালে উদ্ভিদজীবনের প্রতি তাঁহার হৃদয়-মনের ভাব ঐ বালকটির মতো ছিল।

শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের পরদিন (১৫ জুলাই) শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ-উৎসব। ইহার উদ্দেশ্য গ্রাম ও গ্রামবাসীদের সহিত বিচ্ছিন্ন ভদ্রজনতার সংযোগ স্থাপন। আমাদের আধুনিক জীবনে চিরাচরিত আচারনিবদ্ধ ধর্মানুষ্ঠানাদির প্রতি আন্তরিক অনুরাগ কালান্তরে ম্লান হইয়া আসিয়াছে। অথচ আচার-অনুষ্ঠান-উৎসব-আমোদ-প্রমোদ সমাজজীবনে না থাকিলে মানুষ শুষ্ক হইয়া যায়। এ কথা সুবিদিত যে রবীন্দ্রনাথ হিন্দুসমাজের আনুষ্ঠানিক সংস্কারাবদ্ধ ধর্মকর্মে বিশ্বাসহীন: অথচ আধুনিক ভারতীয়দের জীবনে নূতনভাবে অসাম্প্রদায়িক উৎসব অনুষ্ঠান প্রবর্তনের প্রয়োজন; ঋতুউৎসব এই শ্রেণীর অনুষ্ঠান। সাধারণ মানুষ ও কৃষিজীবীর দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ করিবার জন্য এই বৃক্ষরোপণ ও হলকর্ষণ উৎসব পরিকল্পিত হইল। হলকর্ষণ এদেশে বহুকাল নিন্দনীয়— ইহা শূদ্রের কর্ম; অথচ রামায়ণে আছে জনকরাজ হলচালনাকালে সীতাকে পাইয়াছিলেন। রামচন্দ্রের অহল্যা-উদ্ধার কৃষিপ্রশস্তি। শ্রীকৃষ্ণ-ভ্রাতা বলরামের এক নাম হলধর। রবীন্দ্রনাথ গ্রাম-উদ্যোগ কর্মে নামিয়া কৃষকদের 'চাষা' নামের প্রতি ভদ্রদের যে উন্নাসিকতা আছে তাহা দূর করিবার জন্য হলকর্ষণ বা সীতাযজ্ঞে সর্বশ্রেণীর লোককে আহ্বান করিলেন।

পণ্ডিত বিধুশেখর হলকর্ষণ-উৎসবে প্রাচীন সংস্কৃত হইতে কৃষিপ্রশংসা পাঠ এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং হলচালনা করিলেন। নন্দলালবাবুর পরিচালনায় সভামণ্ডপ নূতনভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত হইয়াছিল: গ্রামের বিবিধ সামগ্রী, নানা শস্য প্রভৃতি দিয়া যে আলিপনা অঙ্কিত হয় সেই ধারা এখনো চলিতেছে। এই দিনটিকে চিরস্মরণীয় করিবার উদ্দেশ্যে নন্দলাল বসু শ্রীনিকেতনের একটি প্রাচীরগাত্রে হলকর্ষণ উৎসবের ফ্রেস্কো রচনা করিয়া দিলেন। উন্মুক্তস্থানে প্রাচীরগাত্রে বৃহৎ পটভূমে এইরূপ চিত্রাঙ্কন শিল্পের ইতিহাসে অভিনব ঘটনা। প্রাচীনকালে ভারতীয়দের (ও অন্যান্য জাতিরও) শিল্পমানসের প্রকাশক্ষেত্র ছিল মন্দিরগাত্র বা গুহাভ্যন্তর। এইসব শিল্পশোভার নিদর্শনগুলি সাধারণ লোকের চক্ষে পড়িত। কালে এই চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি হিমালয়ের বৌদ্ধ মন্দিরের মধ্যে সীমিত হইল— ইহা এখনো সেখানে জীবন্ত। পাঠকের স্মরণ আছে জাপান ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ যেসব পত্র লেখেন, তাহার মধ্যে আর্ট সম্বন্ধে আলোচনা উপলক্ষ্যে বলিয়াছিলেন যে ভারতে বৃহৎ পটভূমে চিত্রাঙ্কনের প্রয়োজন। এতদিনে নন্দলাল তাহা

১ পঞ্চভূত : ক্ষিতি— সত্যেন্দ্রনাথ বিশী (কলাভবনের ছাত্র), অপ্— সুধীর খাস্তগীর (কলাভবনের ছাত্র), তেজ— প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, মরুৎ— মনোমোহন ঘোষ (কর্মবিভাগ), ব্যোম— অনাথনাথ বসু (পাঠভবনের শিক্ষক)। আরিয়াম ও বিনায়ক মাসোজি বৃক্ষবাহক। বৃক্ষরোপণ গৌরপ্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়: যে বকুলগাছটি পোতা হইয়াছিল— তাহা কি এখনো আছে? বনবাণী, বৃক্ষরোপণ ও বর্ষামঙ্গল। দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫।

২ প্রবাসী ১৩৩৫ ভাদ্র, পৃ. ৭৭৬-৭৯। রবীন্দ্র-রচনাবলী. ২৪। বলাই, গল্পগুচ্ছ।

সফল করিলেন। ইতিপূর্বে শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারে প্রাচীরচিত্র (ফ্রেস্‌কো) অঙ্কিত হইয়াছিল; তবে উহা অট্টালিকার বিভূষণরূপে প্রযুক্ত হয়। এইবারকার উন্মুক্ত স্থানে সম্পাদিত প্রাচীরচিত্রে জনতার দৃষ্টি গেল; এই জন্যই ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই বৃক্ষরোপণ-উৎসব শান্তিনিকেতনে প্রবর্তিত হইবার বাইশ বৎসর পর (১৯৫০ জুলাই) ভারতসরকার বনমহোৎসব আরম্ভ করেন। তখন বাংলাসরকার 'বনমহোৎসব' নামে যে পুস্তিকা প্রচার করেন, তাহাতে প্রচার-অধিকর্তা স্বীকার করিয়াছিলেন যে রবীন্দ্রনাথই দিব্যদৃষ্টিতে অনুভব করিয়াছিলেন যে, এই সভ্যতা-বিধ্বংসী গৃধ্নুতা, এই বনচ্ছেদ-নিবারণ করিতে না পারিলে দেশের সর্বনাশ। কবি বুঝিযাছিলেন যে, "অবিলম্বে প্রতিরোধ করতে হবে এই ধূমাবতীর গতি। নতুন করে ব্রত নিতে হবে অরণ্যরচনার।" তাই তিনি প্রবর্তন করলেন 'বৃক্ষরোপণ' উৎসব। কবির প্রবর্তিত এই উৎসব আজও শান্তিনিকেতনে সমস্ত অনুষ্ঠানমালার মধ্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে। ১৯৪২ হইতে কবির মহাপ্রয়াণের দিনে বৃক্ষরোপণ-উৎসব শান্তিনিকেতনে উদ্‌যাপিত হইতেছে।

মহুয়া

শান্তিনিকেতনে বর্ষামঙ্গল ও বৃক্ষরোপণ ও শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ উৎসব (১৪, ১৫ জুলাই) শেষে কবির কলিকাতা যাইবার কথা— শরীরের চিকিৎসার জন্য। রানী দেবীকে লিখিতেছেন (২৫ জুলাই): "যাই যাই করি, কিন্তু পা ওঠে না। তার কারণ এ নয় যে এখানকার শ্রাবণের টানে আটকা পড়েছি। কারণটা কিছু সূক্ষ্ম— সাইকোলজিকাল।"[১] আমাদের মতে কিছুটা ফিজিকালও, অর্থাৎ শারীরিক দুর্বলতাজনিত অবসাদ। প্রোস্টেট-গ্লান্‌ডজনিত নানারূপ উপসর্গ হইতে শরীরের ক্লান্তি ও তাহার অপরিহার্য পরিণাম মনের উপর তাহার স্পর্শ। কয়েকদিন পূর্বে ইন্দিরা দেবীকে কবি লিখিয়াছিলেন, "বস্তুত জরাটাই হলো ব্যাধি— সে-ব্যাধির অবসান সমস্তর অবসানে— সেটার বিরুদ্ধে যত আয়োজন করি— ওষুধ খাই ডাক্তার ডাকি, তাতে কেবল যমকে হাসানো হয়। তার পরিহাস আমি সইতে পারি নে কারণ আমি তাকে ভয় করি নে।"[২] কিন্তু পত্র লিখিয়া যদি ভয়-ভাবনাকে নিরাকৃত করা যাইত, তবে তো জীবনের কোনো সমস্যাই থাকিত না। কিন্তু অবিলম্বে ডাক্তারের উপদ্রবে "টেনে আনলে কলকাতায়, দুই দিন অন্তর তার [ডাক্তারের] বাড়িতে গিয়ে Diathermic উত্তাপ লাগাতে" হয়। "দেড় মাস ধরে এই দুঃখ পেতে হবে"।[৩]

জোড়াসাঁকোর বাড়ি তখন প্রায়-জনশূন্য। তবে কবি সেখানে আসিলেই বন্ধুবান্ধব ভক্ত স্তাবক সকলেই আসেন। প্রায়ই যাঁহারা সন্ধ্যার দিকে আসেন, তাঁহারা— প্রশান্তচন্দ্র ও তাঁহার পত্নী রানী দেবী, অপূর্বকুমার চন্দ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (মৃ. ১৯৬০ জুন) প্রভৃতি সাহিত্যামোদীগণ। এই সময়ে 'মিতা' গল্পটি 'শেষের কবিতা' নামে প্রবাসীতে প্রকাশিত হইতেছে (১৩৩৫ ভাদ্র)। সেই উপন্যাসের কাহিনী তত্ত্ব ও কবিতা লইয়া আলোচনা চলে। এই

১ পথে ও পথের প্রান্তে, পত্র ১৮। ৯ শ্রাবণ ১৩৩৫ ॥ ২৫ জুলাই।

২ চিঠিপত্র ৫, পত্র ২৫। শান্তিনিকেতন ৯ জুলাই ১৯২৮ পোস্টমার্ক। পত্রে লিখিত ৯ জুন ভুল।

৩ চিঠিপত্র ৩, পত্র ২৯। চিঠিপত্র ২, পত্র ৩১। ২৫ জুলাই ১৯২৮।

আলোচনার বাক্য মন্থনে দেখা গেল সকলেরই ইচ্ছা কবি তাঁহার কাব্যগ্রন্থ হইতে প্রেমের কবিতাগুলি বাছিয়া বিবাহে উপহার দিবার মত একটি কাব্যখণ্ড প্রস্তুত করেন। কত জল্পনাকল্পনা চলে এই 'বরণডালা' বা 'রাখী' প্রকাশনের জন্য। কবি তাঁহার কাব্যগ্রন্থ হইতে প্রেমের কবিতা বাছিয়া 'বরণডালা' সাজাইয়া তুলিলেন।[১]

কবি যখন কলিকাতায় আছেন, সে-সময়ে অধ্যাপক লেভি ও তাঁহার পত্নী জাপান হইতে ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তনের পথে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। এই সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন হইয়াছিল লেভির পক্ষ হইতে। উনিশ শ বিশ-একুশে লেভি সম্বন্ধে কবির যে মুগ্ধভাব ও আকর্ষণ ছিল তাহা গত কয়েক বৎসরের মধ্যে অত্যন্ত ম্লান হইয়া আসিয়াছে। শোনা যায়, কয়েকজন য়ুরোপপ্রত্যাগত ভারতীয় ছাত্রের কাছ হইতে কবি তাঁহার ও বিশ্বভারতী সম্পর্কে অধ্যাপকের বিরূপ মনোভাবের কথা জানিতে পারেন। এইসব কানভাঙানিতে কবির মন বিরূপ হয় এবং সেই খবরটিও অধ্যাপকের কাছে পৌঁছিয়া যায়। অধ্যাপক এইসব সংবাদে খুবই মর্মাহত হইয়াছিলেন। এইবার কবির সহিত দেখা করিয়া তাহার মীমাংসা করিয়া গেলেন। অতঃপর লেভি-দম্পতি দুই দিনের জন্য শান্তিনিকেতনে ঘুরিয়া আসেন (৯, ১০ অগস্ট)। কবি শান্তিনিকেতনে পত্র দিয়া অতিথিপরিচর্যার সকল ব্যবস্থা করিয়া দেন।[২]

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে সপ্তাহকাল থাকিতে না থাকিতে 'বর্ষাকালে সে বাড়ি ভারি বিরক্তিকর' মনে হইতেছে। সেখান হইতে ৮ অগস্ট (২৩ শ্রাবণ ১৩৩৫) চৌরঙ্গির উপর অবস্থিত আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ মুকুলচন্দ্র দে'র আমন্ত্রণে তাঁহার সরকারী আবাসে গিয়া উঠিলেন। মুকুলচন্দ্র কয়েকদিন পূর্বে (১১ জুলাই) আর্টস্কুলে অধ্যক্ষতাপদ পাইয়া এই সরকারী আবাসে আসিয়াছেন।[৩] এই সুন্দর অট্টালিকার "ঘরদুয়ার ভালো, চারিদিকে বাগান, সামনে মস্ত পুকুর আছে, বড় বড় গাছ, রাস্তা দূরে— কলকাতায় আছি বলে মনে হয় না। সামনে একটা বারান্দা সেখানে বসে গাছপালা আকাশ দেখতে খুব ভালো লাগে।"[৪] এইখানে কবি প্রায় তিন সপ্তাহ কাল (৮ - ৩১ অগস্ট)

১ প্রায় দেড় বৎসর পরেও এই বই ছাপাইবার ইচ্ছা কবির ছিল। ১৫ নভেম্বর ১৯২৯ শান্তিনিকেতন হইতে কবি রথীন্দ্রনাথকে কলিকাতায় লেখেন, "বরণডালা ওরফে রাখী একখানে যদি ছাপানো স্থির হয় তবে সে-সম্বন্ধে কি কর্তব্য নির্দিষ্ট করে জানাস। ছবিগুলো হয়তো কলকাতায় ছাপাতে হবে, কিন্তু লিখন অংশ সেখানে ছাপানো অপব্যয়। ছবিও এখানকার প্রেসে ছাপানো চলে কিনা ভেবে দেখিস।"— চিঠিপত্র ২, পত্র ৩৪। বরণডালা মুদ্রিত হয় নাই; রবীন্দ্রসদনে পাণ্ডুলিপি আছে।

২ চিঠিপত্র ২, পৃ. ৮৫।

৩ মুকুলচন্দ্র দে শান্তিনিকেতনের ছাত্র। ১৯১২ সালে স্কুলের পড়া ছাড়িয়া তিনি কলিকাতায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছাত্র হন। ১৯১৬-১৭ সালে রবীন্দ্রনাথ ইহাকে জাপান ও আমেরিকা সফরের সময়ে সঙ্গী করেন। কবি আমেরিকা হইতে রথীন্দ্রনাথকে ২৮ অক্টোবর ১৯১৬ এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "মুকুল সিকাগোতে একটা স্টুডিয়োতে etching শিখছে; etchingএ ওর একটু স্বাভাবিক দক্ষতা আছে। পিয়ার্সন ওর এই একটা এচিং লন্ডনে Muirhead-Boneএর কাছে পাঠিয়েছিলেন— তিনি খুব উৎসাহ দিয়ে প্রশংসা করে চিঠি লিখেছেন। ও যদি ভালোরকম করে এচিং শিখে যায় তা হলে আমাদের দেশের পক্ষে একটা নূতন জিনিস হবে"—চিঠিপত্র ২। আমেরিকা হইতে ফিরিয়া মুকুলচন্দ্র কলিকাতার 'বিচিত্রা' ভবনের সহিত যুক্ত হন; সেই সময়ে তিনি প্রধানত, 'এচিং' ছবি করিতেন। ১৯২০-১৯২৭ ইংলণ্ডে বাস করিয়া দেশে ফিরিবার এক বৎসরের মধ্যে তিনি কলিকাতা আর্টকলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন (১৯২৮ জুলাই ১১)। ইনিই আর্টকলেজের প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ। ১৯৪৩ সালে অধ্যক্ষতা ছাড়িয়া দেন ও সেই হইতে শান্তিনিকেতনের একপ্রান্তে নিজের গৃহনির্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। বিশ্বভারতীর সহিত তাঁহার কোনো সম্বন্ধ নাই।

৪ চিঠিপত্র ২, ৩০ অগস্ট ১৯২৮।

বাস করেন। তথা হইতে জোড়াসাঁকোয় কয়েকদিনের জন্য ফিরিয়া সেপ্টেম্বরের গোড়ায় শান্তিনিকেতনে চলিয়া গেলেন।[১]

(কলিকাতায় মাসেক কালের বাস পর্বটায় মহুয়া কাব্যর জন্ম হয়। উষা ও প্রদোষের অংশ ধরিলে এই কাব্যগুচ্ছের আরম্ভ হয় জুন মাসে বঙ্গলুরে 'মিতা' রচনা কালে এবং শেষ হয় অক্টোবরে।

শেষের কবিতা রচনাকালে প্রেমের কবি তার যে ফল্গুধারা মনে বহিতেছিল, তাহা 'রাখী'র জন্য পুরাতন প্রেমের কবিতা সংগ্রহ করিতে করিতে আকস্মিক প্লাবনে পরিণত হইল।) পাঠকের স্মরণ আছে ১৯০৩ সালে কবি তাঁহার কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনকালে 'শিশু'খণ্ড সংকলন-কার্যে নিযুক্ত হন। শিশু সম্বন্ধে পুরাতন কবিতা খুঁজিতে খুঁজিতে মন কখন শিশুরাজ্যে প্রবেশ করিয়া গিয়াছিল— কয়েকদিনের মধ্যে ৩০টি শিশু কবিতা লিখিয়া ফেলেন। (এবারও প্রেমের কবিতা বাছিতে বাছিতে মন কখন যৌবনরাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া গেল— কয়দিনের (৮ - ৩১ অগস্ট) মধ্যে ২৭টি কবিতা লিখিলেন। জোড়াসাঁকোয় ফিরিয়াও ৪টি লেখেন; শান্তিনিকেতনে আসিয়া 'নাগ্নী' কবিতাগুচ্ছ (ভাদ্র - আশ্বিন) ও আরও ১০টি কবিতা লেখেন।[২])

(আযৌবন কবি প্রেমের কবিতা লিখিতেছেন— কত ভাবে কত রীতিতে তাহার প্রকাশ। আজ কবির সাতষট্টি বৎসর বয়সে জরাশ্রিত দেহের মধ্যে যে-মনের বাস তাহা প্রেম-কাকলীতে আকস্মিকভাবে মুখর হইয়া উঠিল। এই কবিতাগুচ্ছ তাঁহার পাঠকসমাজকে অত্যন্ত বিব্রত করে; যাহারা রবীন্দ্রনাথকে কেবলমাত্র ভক্তসাধক রূপেই কল্পনা করিতে ভালোবাসেন, তাঁহারা কবির লেখনী হইতে এই বৃদ্ধ বয়সে এই শ্রেণীর কবিতা প্রত্যাশা করেন নাই।) এই অভিযোগ বোধ হয় নূতন নহে; মহাকবি ভবভূতি ইহার উত্তর দিয়াছিলেন—

> অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্বাস্ববস্থাসু
> যদ্‌বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্যো রসঃ।
> কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎ স্নেহসারে স্থিতং
> ভদ্রংতস্য সুমানুষস্য কথমপ্যেকং হি তৎ প্রাপ্যতে ॥

অনুবাদ—

> সুখে দুঃখে সমরূপ অনুকূল সর্ব অবস্থায়
> হৃদয়-বিশ্রাম-স্থল জরাতেও যা নাহি শুকায়
> কালক্রমে রূপ-মোহ আবরণ হইয়া বিগত
> রসটুকু মরি' যাহা স্নেহ-সারে হয় পরিণত
> সেই যে পবিত্র প্রেম পুণ্যবলে কদাচ কখন
> বহু সজ্জনের মাঝে কারও ভাগ্যে হয় সংঘটন।

১ রথীন্দ্রনাথকে আর্টস্কুলের বাড়ি থেকে লিখিতেছেন (৩০ অগস্ট), "কাল যাব জোড়াসাঁকোয়— তার দুই একদিন পরেই শান্তিনিকেতন রওনা হব।"—চিঠিপত্র, ২। দ্র. চিঠিপত্র ৫, পৃ. ৬৬—"কাল সকালে নটার গাড়িতে সেই পথেই যাচ্ছি।"

২ কবি লিখিয়াছেন, "এগুলি যখন লিখছিলুম, অপূর্বকুমার [চন্দ] প্রায় রোজ এসে শুনে যেত, সে যে-উত্তেজনা প্রকাশ করত সেটা অপূর্বতারই উত্তেজনা।"

এই কবিতার উৎস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কী কারণ ও কৈফিয়ত দিয়াছেন, তাহাও দেখা যাক। কিছুকাল পরে প্রশান্তচন্দ্রকে কবি এক পত্রে লেখেন, "লেখার বিষয়টা ছিল সংকল্প করা— প্রধানত প্রজাপতির উদ্দেশে— আর তাঁর দালালি করেন যে-দেবতা [মীনকেতন] তাঁকেও মনে রাখতে হয়েছিল। অতএব 'মহুয়া'র কবিতাকে ঠিক আমার হালের কবিতার সঙ্গে শ্রেণীবদ্ধ করা চলে না। ভেবে দেখতে গেলে এটা কোনো কালবিশেষের নয়। এটা আকস্মিক।"

আমাদের মতে কোনো ঘটনা, এমনকি কবিতাও আকস্মিক বলিয়া শ্রেণীত করা যায় না; কোথাও কার্য-কারণ স্পষ্টত দেখা যায়— কোথাও কার্য-কারণ এত দ্রুত চলে যে আমাদের চক্ষু বা মন গোচর হয় না, অথবা এত গভীর অবচেতনে নিমজ্জিত থাকে যে, তাহাকেও ধরা-ছোঁওয়া যায় না; প্রত্যক্ষগোচর হইলে— আমরা তাহাকে আকস্মিক বলি। কবি লিখিতেছেন, "মনের যে-ঋতুতে মহুয়া লেখা সে আকস্মিক ঋতুই, ফরমাশের ধাক্কায় আকস্মিক নয়, স্বভাবতই আকস্মিক।"

কিন্তু ইহার পর কবির মনে হইতেছে বাহিরের আঘাতে 'মহুয়া' প্রস্ফুটিত হইয়াছে; "ফরমাশ ব্যাপারটা মোটর গাড়ির স্টার্টার-এর মতো। চালনাটা শুরু করে দেয় কিন্তু তার পরে মোটরটা চলে আপন মোটরিক প্রকৃতির তাপে। প্রথম ধাক্কাটা একেবারেই ভুলে যায়। মহুয়ার কবিতাগুলিও লেখবার বেগে ফরমাশের ধাক্কা নিঃসন্দেহই সম্পূর্ণ ভুলেছে— কল্পনার আন্তরিক তড়িৎ-শক্তি আপন চিরন্তনী প্রেরণায় তাদের চালিয়ে নিয়ে গেছে।· · সচলতা শুরু হবামাত্রই লেখবার আনন্দই সারথি হয়ে বসে।"—মহুয়ার সূচনা। সেই আনন্দের প্রেরণায় কবিতাগুলি এত অল্প সময়ের মধ্যে লিখিত হয়। প্রশান্তচন্দ্রকে লিখিত পত্রে কবি এই কবিতাগুলিকে 'আকস্মিক' বলিয়াছেন, কিন্তু মহুয়ার সূচনা-উদ্ধৃত অংশ হইতে তাহা কি সমর্থিত হইতেছে?

কাব্যখণ্ডের সূচনায় কবি তাঁহার এই নূতন কবিতাগুলির মধ্যে দুইটি ধারার কথা বলিয়াছেন— "একটি হচ্ছে নিছক গীতিকাব্য, ছন্দ ও ভাষার ভঙ্গীতেই তার লীলা। তাতে প্রণয়ের প্রসাধনকলা মুখ্য। আর একটিতে ভাবের আবেগ প্রধান স্থান নিয়েছে, তাতে প্রণয়ের সাধনবেগই প্রবল।" অর্থাৎ প্রণয়ের মধ্যে সৌন্দর্য ও বীর্য উভয়েরই স্থান সুনির্দিষ্ট। কবি বলেন মহুয়ার অন্তর্গত 'মায়া' কবিতায় 'প্রণয়ের এই দুই ধারার পরিচয়' রূপ পাইয়াছে— 'প্রসাধনের বৈচিত্র্য' এবং 'উপলব্ধির নিবিড়তা'।

আমরা বারে-বারে দেখিয়াছি যে, কবির সাহিত্যজীবনে একটা ঝোঁকের মাথায় নূতন ঝাঁকের কবিতা আসিয়াছে। বারো মাসে পৃথিবীর ছয় ঋতুর ন্যায় তাঁহার কাব্যের পুনরাবর্তন হইয়াছে, কিন্তু পুনরাবৃত্তি ঘটে নাই।

জীবনের নব নব অভিজ্ঞতায়, বোধের গভীর স্পর্শে, চিরপুরাতন সত্য— বৃহত্তর পটভূমি পরিক্রমণান্তে নবকায়া ধারণ করে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস, মহুয়া কাব্যের মধ্যে নূতন-কিছু আছে; "নতুন লেখার ঝোঁক যখন চিত্তের মধ্যে এসে পড়ে তখন তারা পূর্বদলের পুরানো পরিত্যক্ত বাসায় আশ্রয় নিতে চায় না, নতুন বাসা না বাঁধতে পারলে তাদের মানায় না, কুলোয় না। ক্ষণিকার বাসা আর বলাকার বাসা এক নয়।" আমরাও বলি 'কড়ি ও কোমল' 'মানসী'র প্রেম আর 'মহুয়া'র প্রেম এক গোত্রের নয়।

মহুয়া কাব্য নামকরণের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে; "মহুয়া বসন্তেরই অনুচর, আর ওর রসের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে উন্মাদনা।· · অর্থের অত্যন্ত বেশি সুসংগতি নেই বলেই কাব্যগ্রন্থের পক্ষে এ নামটি উপযুক্ত বলে আমি বিশ্বাস করি।" মহুয়া নামে কবিতায় শেষ দুই পংক্তিতে আছে—

রে অটল, রে কঠিন,
কেমনে গোপনে রাত্রিদিন
তরল যৌবনবহ্নি মজ্জায় রাখিয়াছিলি ভরে।
কানে কানে কহি তোরে
বধূরে যেদিন পাব, ডাকিব মহুয়া নাম ধরে।

কবির শেষ কাব্য পূরবী উৎসর্গ করিয়াছিলেন বিজয়া বা ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে। মহুয়া কাব্য উৎসর্গীত হইল উদ্দেশহীন অজানার নামে—

শুধায়ো না, কবে কোন্ গান
কাহারে করিয়াছিনু দান।
পথের ধুলার 'পরে
পড়ে আছে তার তরে
যে তাহারে দিতে পারে মান।
তুমি কি শুনেছ মোর বাণী,
হৃদয়ে নিয়েছ তারে টানি!
জানি না তোমার নাম,
তোমারেই সঁপিলাম
আমার ধ্যানের ধনখানি॥

প্রেমের কবিতা সম্বন্ধ-প্রসঙ্গে প্রেম সম্বন্ধে কবির মনের কথার উল্লেখ হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হইবে না; কবি মংপুতে মৈত্রেয়ী দেবীকে একদিন বলিয়াছিলেন, "যাকে তোমরা ভালোবাসা বল, সেরকম ক'রে আমি কোনোদিন ভালো-বাসিনি। আমি বৃহৎ সংসারে বাস করেছি, প্রিয়জনের অন্ত ছিল না, আর আজ তো আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়ে তোমরা যারা পর, তারাই আমার বেশি আপনার হয়ে উঠেছে। কিন্তু এ কথা ঠিক, বন্ধুবান্ধব সংসার স্ত্রীপুত্র কোনো কিছুই কোনোদিনই আমি তেমন করে আঁকড়ে ধরিনি। ভিতরে একটা জায়গায় আমি নির্মম— তাই আজ যে জায়গায় এসেছি সেখানে আসা আমার সম্ভব হয়েছে। তা যদি না হত, যদি জড়িয়ে পড়তুম, তাহলে আমার সব নষ্ট হয়ে যেত। কোনো বন্ধনই আমায় শিকল হয়ে বাঁধে নি কোনোদিন। চিরদিন আমি মনে মনে উদাসী" (পৃ. ১৫১-৫২)। ইহা রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষা না হইলেও, ইহা তাঁহার ভাবধারার সহিত সংগত।

মহুয়ার প্রেমগুঞ্জন নৈর্ব্যক্তিক হইয়া অপরূপ সৌন্দর্যে মণ্ডিত। ইহার প্রেমকথার মধ্যে প্রাক্‌বিবাহ পর্বের অথবা বিবাহোত্তর পর্বের কোনো ভাবই প্রকাশ পায় নাই— ইহা কেবলমাত্র প্রেমকেই মূর্ত করিয়াছে; এ-প্রেম— সর্ববন্ধনমুক্ত, ব্যক্তিনিরপেক্ষ বিশুদ্ধ অনুভূতি মাত্র।) ইতিপূর্বে রচিত প্রেমবিষয়ক কবিতা হইতে এগুলি স্বতন্ত্র। লিরিকধর্মী উপন্যাস মিতা বা শেষের কবিতা রচনাকালে যে কবিতাগুলি স্বতঃস্ফূর্ত হইয়াছিল, সেগুলি হইতেই মহুয়ার সূত্রপাত। বঙ্গলুরে রচিত এই কবিতাগুলিকে উপন্যাস হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সমগ্র মহুয়া কাব্যখণ্ডের অন্তর্গত

করিয়া দেখিতে কোনোই বাধা ঠেকে না। আমরা ১৩৩৫ সালের আষাঢ় হইতে আশ্বিন এই কয় মাসকে মহুয়া রচনার নিবিড় পর্ব বলিব। কলিকাতায় ২৮ দিনে ৩০টি কবিতা রচিত হয়। মহুয়ার কয়েকটি কবিতা সংগীতের রূপ গ্রহণ করে।[১]

মহুয়াপর্ব

কবি কলিকাতায় আর্টস্কুলে মুকুলচন্দ্রের সরকারী আবাসে আছেন— মহুয়ার কবিতা লিখিতেছেন— মাঝে একদিন ছেদ পড়িল— ৬ ভাদ্র (১৩৩৫)। সেদিন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে প্রাতে কবিকে ভাষণ দিতে হয়। একশত বৎসর পূর্বে এই দিনে (২২ অগস্ট ১৮২৮) রামমোহন রায় 'ব্রহ্মসভা' স্থাপন করেন। কবির যে অংশ মৌখিক ভাষণ তাহা 'রুদ্রের আহ্বান ও আশীর্বাদ' নামে প্রকাশিত হয়; ইহার পর তিনি রামমোহন সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন।[২]

ইতিমধ্যে কবি য়ুরোপ হইতে রমাঁ৷ রলাঁ৷ মারফত পৃথিবীর শান্তিকামী লীগ-এর পক্ষ হইতে অধ্যক্ষর এক পত্র পাইলেন। তাঁহারা *The Golden Book of Peace* নামে এক গ্রন্থে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীদের শান্তিবাণী সংগ্রহ করিতেছেন— কবির নিকট হইতে কিছু না-পাইলে তাঁহারা খুব হতাশ্বাস হইবেন (a great disappointment if you donot consent to honour the *Golden Book of Peace* with some reflections from your great heart)।[৩]

১ মহুয়ার কয়েকটি কবিতার সংগীত রূপ—

বিজয়ী—বিরস দিন, বিরল কাজ (গীতবিতান, পৃ. ২৮১)
সন্ধান*—আমার নয়ন তোমার নয়নতলে (গীতবিতান, পৃ. ৩০৮)
মুক্তি—চপল তব নবীন আঁখি দুটি (গীতবিতান, পৃ. ৩০৩)
উদ্‌ঘাত—জানি তোমার অজানা নাহি গো (গীতবিতান, পৃ. ৩০১)
নিবেদন—কাহার গলায় পরাবি (গীতবিতান, পৃ. ২৭১)
গুপ্তধন—আরো একটু বসো তুমি (গীতবিতান, পৃ. ২১৩)
পুরাতন—অনেক দিনের আমার যে গান (গীতবিতান, পৃ. ২৭৮)
প্রত্যাশা—প্রাঙ্গণে মোর শিরীষশাখায় (গীতবিতান, পৃ. ৫৭৯)
সন্ধান*—আমার নয়ন তব নয়নের (গীতবিতান, পৃ. ২৯০)
বরণডালা—আজি এ নিরালা কুঞ্জে (গীতবিতান, পৃ. ২৮৭)
নিবেদন—অজানা খনির নূতন মণির (গীতবিতান, পৃ. ২৮৭)
গুপ্তধন*—আরো কিছুক্ষণ নাহয় বসিয়ো (গীতবিতান, পৃ. ২৯২)
নির্ভয়—আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা (গীতবিতান, পৃ. ২৯১)
অবশেষ—বাহির পথে বিবাগি হিয়া (গীতবিতান, পৃ. ৩৯৮)

* কবিতা ও গানের ভাষা তুলনীয়।

২ ১৩৩৫ ভাদ্র ৬ (১৯২৮ অগস্ট ২২) ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিক উৎসবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে প্রাতঃকালে মৌখিক ভাষণ— 'রুদ্রের আহ্বান ও আশীর্বাদ', প্রবাসী ১৩৩৫, পৃ. ৮৫৪-৫৭। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ কর্তৃক অনুলিখিত। দ্র. ভারতপথিক রামমোহন— পৃ. ৬১-৬৮। লিখিত ভাষণ— রামমোহন রায়, প্রবাসী ১৩৩৫ আশ্বিন, পৃ. ৮০৮-১১। দ্র. ভারতপথিক রামমোহন, পৃ. ৬৮-৭৬।

৩ Ligue mondialle pour la paix (World-League for Peace): Director Georges Dejean কবিকে লেখেন, "We have received up to the day, for this book, over 270 documents, among which are the autographs of Messrs Heriot, Briand, Paul Boncour, Brieux, Marcel Proust, Chamberlain, Stressmann, Henri Barbusse, Maurice Donnay, Vandervelde, Charles Richet, Quidd and others." — Modern Review 1928 October.

কবি তাঁহার বাণী সংঘপ্রেরিত ভেলাম্‌-পত্রের উপর স্বহস্তে লিখিয়া ইংরেজি ও বাংলায় সহি করিয়া দিলেন। তিনি যাহা লেখেন[১], তাহার মর্মকথা— আমাদের রাজনৈতিক যজ্ঞে এখনও আমরা নিজেদের সৃষ্ট উপজাতীয় দেবতার পূজা করি এবং মানুষের শোণিত দিয়া তাহাকে তৃপ্ত করিতে চেষ্টা করি। এই বিকৃত পূজা আদিম অন্ধতার পরিচায়ক; এবং ইহা সেই তত্ত্বকে সূচিত করে, সংগ্রামশীল মৃত্যুর মধ্যে যাহার গতি। আমাদের অনেকের কাছে এই রক্তাক্ত পৌত্তলিকতা মানবচরিত্রের স্থায়ী সম্পদ বলিয়া প্রতিভাত হয়। কিন্তু আমরা জানি, অতীত ইতিহাসে মসীকৃষ্ণ অবুদ্ধি -সঞ্জাত ভয়ের মরীচিকা ও সন্দেহের বিভীষিকায় বহু ঘটনার জন্ম হইয়াছে। রাত্রির সীমানার মধ্যে এগুলি বিরাট ও চিরস্থায়ী বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদের অনেকগুলিই ইতিমধ্যে অদৃশ্য হইয়াছে এবং সভ্যসমাজের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সার্থক সামাজিক জীবনকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে।

আমাদের বিশ্বাস বলে, আজ আমরা যেন প্রমাণ করিতে পারি যে, অদম্যভাবে প্রচণ্ড বৈসাদৃশ্যসমূহ থাকা সত্ত্বেও নরখাদক রাজনীতির আত্মঘাতী উন্মত্ততার দিনাবসান হইয়াছে।

এইটি আর্টস্কুলভবনে বাসকালেই লিখিত। 'মহুয়া' নামে কবিতাটি ঐ দিনেই (৩ সেপ্টেম্বর) রচিত। সেইদিন রানী মহলানবিশকে এক পত্রে লিখিতেছেন, "দীর্ঘকাল না করেছি কোনো কাজের মত কাজ, না পড়ার মতো পড়া।"[২] তবে প্রতিদিন যে মহুয়ার একটা-দুটা কবিতা লিখছেন— সেটা ঠিক কাজ নয়।

শান্তিনিকেতনে ফিরিতেই হইবে— বিশ্বভারতীর বিচিত্র সমস্যা, রথীন্দ্রনাথরা য়ুরোপ-সফরে আছেন। কবির শরীরও ভালো নয়— চিকিৎসার জন্যই কলিকাতায় আসা। ডাক্তার নীলরতন সরকার কবির দেহ পরীক্ষা করিয়া রায় দেন যে, "রক্ত ও শরীরযন্ত্র প্রভৃতিতে ৬৭ বৎসরের কোনো দাগ পড়েনি। দেহটা ভিতরে ভিতরে এখনো তরুণ আছে।"[৩] ডাক্তারের সার্টিফিকেট পাইয়া কবি সেপ্টেম্বরের গোড়ায় (১০ সেপ্টেম্বর) শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন।[৪] আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে সময়টা বিশ্বভারতীর পক্ষে নানা কারণে দুঃসময়। বিশ্বভারতী পুনর্গঠনের জন্য কমিটি বসিয়াছিল, কিন্তু কোনো সুষ্ঠু পরিকল্পনায় কেহই উপনীত হইতে পারেন নাই; অতঃপর সব কথার হাওয়া ও কাজের বোঝা সরাইয়া দিয়া সেপ্টেম্বর মাস হইতে কবি স্বয়ং বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করিলেন। যে কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন— তার জন্য একটা মনগড়া 'ফিলজফি' বা দার্শনিকতা খাড়া করিয়া পথে ও পথের প্রান্তে রানী দেবীকে লিখিতেছেন, "কবিত্বটাকে নিয়ে যোলো আনা মন ভরে না।... আমাকে কাজ করতেই হবে...।" মনের মধ্যে ছবির কথা বোধ হয় জাগিতেছে— "পাহাড়টা আছে তার উপরে। যদি রংবেরঙের মেঘের খেলা থাকে

১ "In our political ritualism, we still worship the tribal god of our own make and try to appease it with human blood. This fetishism is blindly primitive and augers truth that leads to death dealing conflicts. To many of us it seems that this blood-stained idolatry is a permanent part of human nature. But we know in our past history, there have been things born of dark unreason producing phantoms of fear in our mind and ferocity of suspicion. Within the bounderies of night they also had loomed large and appeared as everlasting. But a great many of them have already vanished, making the social life of a fruitful peace possible in civilized communities.

"Let us, today, by the strength of our own faith prove that the homicidal orgies of a cannibalistic politics are doomed, inspite of contradictions that seem overwhelmingly formidable."

২ পথে ও পথের প্রান্তে, পত্র ১৯; পৃ. ৪৮।

৩ চিঠিপত্র ৫, পৃ. ৬৬।

৪ পথে ও পথের প্রান্তে, পত্র ২০; ২৬ ভাদ্র ১৩৩৫ ॥ ১১ সেপ্টেম্বর ১৯২৮— "কাল খুব ক্লান্ত হয়েই এসেছিলুম।" তু. চিঠিপত্র ৫, পৃ. ৬৬— "কাল সকালে নটার গাড়িতে সেই পথেই যাচ্ছি ... ইতি ভাদ্র তারিখ জানিনে, ১৩৩৫।"

তা হলে দৃশ্যটা বেশ ভরপুর হয়— শুধু মেঘ নিয়ে দৃশ্য জমে না।" অর্থাৎ কবিত্ব দিয়ে মন ভরে না। এই দিনই 'রঙিন' কবিতা লিখিলেন—

ভিড় করেছে রঙমশালীর দলে।
কেউ-বা জলে কেউ-বা তারা স্থলে।[১]

শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া বিদ্যালয়ের দপ্তরের কাজকর্ম দেখিলেও মহুয়ার নেশা কাটে নাই— তাহা তো 'রঙিন' কবিতায় বুঝা গেল; কিন্তু আমাদের মনে হয় 'নাম্নী' নামে যে সতেরোটি কবিতাগুচ্ছ মহুয়ার মধ্যে আছে তাহা এই সময়ের রচনা (ভাদ্র - আশ্বিন ১৩৩৫)। স্থান ও পরিবেশের পরিবর্তনে কবিতার রূপেরও বদল হইয়াছে— তাহা কলিকাতায় রচিত মহুয়ার কবিতাগুলির সহিত তুলনা করিলেই স্পষ্ট হইবে। এই সময়ের রচিত কবিতাগুলি বিশেষ করিয়া 'নাম্নী' কবিতাগুচ্ছের মধ্যে কবির ছবি-আঁকার ইতিহাস হয়তো প্রচ্ছন্ন আছে।

পূজাবকাশের পূর্ব পর্যন্ত এই কয়দিন কবি মহা উৎসাহে অধ্যাপকদের সহিত মিলিত হন, স্কুল-কলেজের কাজকর্ম তদারক করেন, ছাত্রদের সভাসমিতি জলসায় উপস্থিত থাকেন। ছুটির পূর্বে 'গুরু' নাটক ছাত্র-শিক্ষকে মিলিয়া অভিনয় করিলেন, সেখানে তাঁহার প্রেরণা আছে— অভিনয়েও উপস্থিত হইয়া সকলের আনন্দবর্ধন করেন।

দীর্ঘকাল কবির পক্ষে এক ধরণের কাজের মধ্যে আবিষ্ট থাকা যেমন সম্ভব নহে, একই ভাবময় জগতের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিত হইয়া বহু দিন বাস করাও তেমনই কঠিন। মহুয়ার কাব্যসৃষ্টিতে ছেদ পড়িল। কিছুকাল মধ্যে মন আর্টের নূতনক্ষেত্রে মুক্তিলাভ করিল— সেটি চিত্রাঙ্কন। ইহা কবির professionও নহে, vocationও নহে— নিতান্ত আনন্দময় hobby। মহুয়াগুচ্ছের শেষ কবিতা 'গুপ্তধর্ম' (১৪ কার্তিক ১৩৩৫); সাত দিন পরে রানী দেবীকে লিখিতেছেন, "রেখার মায়াজালে আমার সমস্ত মন জড়িয়ে পড়েছে। অকালে অপরিচিতার প্রতি পক্ষপাতে কবিতা একেবারে পাড়া ছেড়ে চলে গেল। কোনোকালে যে কবিতা লিখতুম সে কথা ভুলে গেছি। এই ব্যাপারটা মনকে এত করে যে আকর্ষণ করছে তার প্রধান কারণ এর অভাবনীয়তা। কবিতার বিষয়টা অস্পষ্টভাবেও গোড়াতেই মাথায় আসে, তার পরে ·· কাব্যের ঝরনা কলমের মুখে তট রচনা করে, ছন্দ প্রবাহিত হতে থাকে। আমি যেসব ছবি আঁকার চেষ্টা করি তাতে ঠিক তার উলটো প্রণালী— রেখার আমেজ প্রথমে দেখা দেয় কলমের মুখে, তার পরে যতই আকার ধারণ করে ততই সেটা পৌঁছতে থাকে মাথায়। এই রূপসৃষ্টির বিস্ময়ে মন মেতে ওঠে। আমি যদি পাকা আর্টিস্ট হতুম তা হলে গোড়াতেই সংকল্প করে ছবি আঁকতুম, মনের জিনিস বাইরে খাড়া হত— তাতেও আনন্দ আছে। কিন্তু নিজের বহির্বর্তী রচনায় মনকে যখন আবিষ্ট করে তখন তাতে আরো যেন নেশা।"[২]

কয়েকদিন পরেও প্রায় এই কথাই লিখিতেছেন রানী দেবীকে, "রেখায় আমায় পেয়ে বসেছে। তার হাত ছাড়াতে পারছি নে। কেবলই তার পরিচয় পাচ্ছি নতুন নতুন ভঙ্গির মধ্য দিয়ে। তার রহস্যের অন্ত নেই। ·· ছবিতে যে আনন্দ, সে হচ্ছে সুপরিমিতির আনন্দ, রেখার সংযমে সুনির্দিষ্টকে সুস্পষ্ট করে দেখি— মন বলে ওঠে, নিশ্চিত দেখতে পেলুম।"[৩]

কবি বিদ্যালয়ের ভার লইয়া সেপ্টেম্বর হইতে দেখাশুনা করিতেছেন, আপন মনে ছবি আঁকিতেছেন, পত্র লিখিতেছেন। পূজাবকাশের সময়ে শান্তিনিকেতনে আসিলেন চীনদেশীয় অধ্যাপক ৎসু-সী-মো। পাঠকের স্মরণ আছে এই চীনা যুবক কবির চীন ভ্রমণকালে তাঁহার সঙ্গী ও দোভাষী ছিলেন। য়ুরোপ হইতে দেশে প্রত্যাবর্তনের

১ রঙিন (২৬ ভাদ্র ১৩৩৫), পরিশেষ, পৃ. ২১৪-১৫। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫, পৃ. ৩০৪।

২ পথে ও পথের প্রান্তে, পত্র ২৩। ২১ কার্তিক ১৩৩৫॥ ৭ নভেম্বর ১৯২৮।

৩ পথে ও পথের প্রান্তে, পত্র ২৭। ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৩৫।

পথে ভারত সফর করিয়া যাইতেছেন। বোম্বাইএ নামিলে সাংবাদিকগণকে তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিবার জন্য তাঁহার ভারত আগমন; তাঁহার মতে রবীন্দ্রনাথ চীন ও ভারতের সাংস্কৃতিক ও আত্মিক সম্বন্ধ পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথের চীন সফরের পূর্বে চীনারা ভারত সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল। কবির ব্যক্তিত্বে তাঁহাদের মনে সম্ভ্রম জাগ্রত হওয়ায়, ভারতের সহিত আগেকার মতো সভ্যতার যোগ স্থাপন করিতে উৎসুক।[১]

কিছুকাল পূর্বে চীনের গৃহবিবাদ শুরু হলে, ব্রিটিশ লিগেশনের স্বার্থরক্ষার জন্য ভারতীয় সৈন্য প্রেরণ করা হয়। রবীন্দ্রনাথ তাহার তীব্র সমালোচনাপূর্ণ পত্র লেখেন; সেইটি চীনা রেডিয়োর সাহায্যে প্রচারিত হইয়াছিল।

শান্তিনিকেতনে হ্‌সু-সী-মোর যথাবিধি অভ্যর্থনা হইল। এই চীনাভক্ত তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত কবির সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়াছিলেন।[২]

পূজাবকাশের সময় কবিকে একটি সাময়িক আলোচনা-আবর্তে পড়িতে হইল। আমাদের আলোচ্যপর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীত একটি শিক্ষণীয় বিষয় রূপে প্রবর্তনের প্রস্তাব লইয়া সাময়িক পত্রিকাদিতে নানা প্রকার বাদ-প্রতিবাদ চলিতেছে। সংগীত শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে গবর্মেণ্ট শিক্ষাবিভাগ কবির মত ও পরামর্শ চাহিয়া পত্র দেন। কবি উত্তরে লেখেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত শিক্ষার ব্যবস্থা গড়ে তোলবার পক্ষে অধ্যাপক ভাটখণ্ডেই যোগ্যতম।" আর বলেন যে, "বর্তমানে বাংলাদেশে গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ গায়ক।" কবির ভাগ্যদোষে এই অবিসম্বাদী সত্যটুকু প্রকাশ করায়, তাঁহাকে তর্ক-বিতর্কের জালে জড়িত হইতে হইল। তখন কবি 'বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীত শিক্ষা' নামে এক প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহার মত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিলেন; তিনি বলেন গোপেশ্বরই বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ গায়ক, তাহার কারণ যাহাকে হিন্দুস্থানী সংগীত বলা হয়, তাহার সহিত গোপেশ্বরের পরিচয় নিবিড়; এছাড়া বাংলাদেশের মার্গসংগীতের স্বরূপটিও তাঁহার আয়ত্তাধীন। তবে "বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীত শিক্ষা গ'ড়ে তোলবার কাজে · · যোগ্যব্যক্তি ভাটখণ্ডেই।" কারণ "তিনি গায়ক নন, তিনি গানশাস্ত্রের মহামহোপাধ্যায়।" লখনৌ ম্যারিস কলেজে "তিনি হিন্দুস্থানী গান শিক্ষার যে ভিত্তি রচনা করেছেন, বাংলাদেশেও যদি তাঁকে সেই ভিত্তি রচনার সুযোগ দেওয়া যায় তবে বিশ্ববিদ্যালয় যথার্থ সফলতা লাভ করবেন, এ কাজ তিনি ছাড়া আর কারো দ্বারা সুসম্পূর্ণ হতে পারবে না।"[৩] বলা বাহুল্য বাংলাদেশ কবির উপদেশ গ্রহণ করে নাই— আজ উত্তর-ভারতের হিন্দুস্থানী সংগীতের পীঠস্থান হইয়াছে লখনৌ-এর 'ভাটখণ্ডে সংগীত মহাবিদ্যালয়'; বাংলাদেশ এই গৌরব অর্জন করিতে পারিত।

পূজাবকাশের পর রথীন্দ্রনাথরা য়ুরোপ সফর করিয়া ফিরিলেন (৯ নভেম্বর ॥ ২৩ কার্তিক ১৩৩৫)। সকলকে পুনরায় কাছে পাইয়া কবির মন বেশ প্রসন্ন; রানী দেবীকে লিখিতেছেন, "রথীরা এসে পৌঁচেছে। বাড়ি ভরে উঠল, পুপু একটুখানি লম্বা হয়েছে। · · অসম্ভব রকমের বাঘের সম্বন্ধে ওর ঔৎসুক্য পূর্বের মতোই আছে। · · দাদা-মহাশয়ের কাছে এসে বসে, যা মুখে আসে একটা কোনো ভূমিকা করে কথা শুরু করে দেয়। · · দীর্ঘকাল আমার মন এই মাধুর্যটুকুর অপেক্ষায় ছিল। অথচ জিনিসটা খুব সহজ, হৃদয়ের মধ্যে এই শিশুর আবির্ভাব ভারি নির্মল স্নিগ্ধ

১ দ্র. শান্তিনিকেতনে চৈনিক সুধী হ্‌সু-সী-মোর অভ্যর্থনা, অনাথনাথ বসু, প্রবাসী ১৩৩৫ পৌষ, পৃ. ৪৬৮-৭০।

২ এলমহার্স্ট লিখিয়াছেন, 'Their love of literature, as well as of ideas of poetry, of phantasy and of fun helped to build permanent bridge between China and India, which should serve for generations to come to carry a traffic of mutual benefit, a traffic ··· symbolized in the China-Bhawana at Santiniketan.'—Quoted from *Tagore and China*, p. 68।

৩ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীত শিক্ষা, প্রবাসী ১৩৩৫ কার্তিক, পৃ. ১৮৬-৮৯।

এবং অনির্বচনীয়, মনকে হরণ করে অথচ মুক্ত রাখে।"[১] এই পত্র থেকে রবীন্দ্রনাথের আর-একটি রূপ পাই— যেখানে তিনি স্নেহশীল সংসারী মানুষ। কিন্তু এখানেও তিনি নিরাসক্ত নৈর্ব্যক্তিককই বলিব, কারণ চিরদিনই একটি শিশু বা বালিকা তাঁহার মনকে স্নেহসিক্ত করিয়াছে: ইরা ইন্দিরা অভিজ্ঞ রাণু নন্দিতা নন্দিনী অভিজিৎ তাঁহার সাহিত্যেও স্থান লাভ করিয়াছে। এইসব সম্বন্ধের মধ্যে নৈর্ব্যক্তিকতার সম্ভোগসুখ আছে, বাস্তব জীবনের দুর্ভোগ নাই। কর্ম যদি নিষ্কাম বা নৈর্ব্যক্তিক না হইয়া বিষয়কর্ম হয়— তখনই তার ভার হয় দুর্বিসহ; মানুষের সম্বন্ধের বেলায় ইহা প্রযোজ্য। পত্র-লেখা ছবি-আঁকা কবিতা-লেখা প্রভৃতি কাজ অপিসের কেরানীর খাতা-লেখা কাজ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। সেইজন্য কবি এক পত্রে লেখেন, "কর্ম যখন বিষয়কর্ম না হয়, তখন সেই কর্ম মানুষকে দূরের স্বাদ দেয়, দূরের বাঁশি বাজায়।" সাহিত্য ও আর্ট সৃষ্টির সঙ্গে 'বিদ্যালয়ের কাজ যোগ দিয়েছে' বলিয়া কবি এই কাজের মধ্যে মনের মুক্তি লাভ করিয়াছেন।[২]

ইতিমধ্যে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর ৭০তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে কবিকে কিছু লিখিবার জন্য অনুরোধ আসিল। কবি সে অনুরোধ রক্ষা করেন। জন্মোৎসব সভায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিজ্ঞানী বন্ধুকে যে কবিতা দ্বারা আজ অভিনন্দিত করিলেন, তাহা তাঁহার প্রথম অভিনন্দন নহে। মানুষ কীর্তিমান হইবার পর তাঁহার প্রশংসা ও তাঁহাতে বিশ্বাস ঘোষণা অনেকেই করে। কিন্তু কবি একত্রিশ বৎসর পূর্বে যখন জগদীশচন্দ্র এখনকার মতো খ্যাত হন নাই, তখন লিখিয়াছিলেন, 'বিজ্ঞানলক্ষ্মীর প্রিয়' কবিতাটি।[৩] এইবার যে কবিতাটি[৪] লিখিলেন সেটি 'বনবাণী'র অন্তর্গত— উদ্ভিদের প্রাণরহস্য উদ্‌গীত। এই কবিতার মধ্যে কবি উদ্ভিদজীবন সম্বন্ধে যে নবচেতনা অনুভব করিতেছেন, তাহাই রূপ হইয়াছে। কবিতার শেষ কয় পংক্তি ব্যক্তিগত।—

> তোমার তপস্যাক্ষেত্র ছিল যবে নিভৃত নিরালা
> বাধায় বেষ্টিত রুদ্ধ, সেদিন সংশয়সন্ধ্যাকালে
> কবি-হাতে বরমাল্য সে-বন্ধু পরায়েছিল ভালে;
> অপেক্ষা করেনি সে তো জনতার সমর্থন তরে,
> দুর্দিনে জ্বেলেছে দীপ রিক্ত তব অর্ঘ্যথালি-'পরে।
> আজি সহস্রের সাথে ঘোষিল সে, 'ধন্য ধন্য তুমি
> ধন্য তব বন্ধুজন, ধন্য তব পুণ্য জন্মভূমি।'

১ পথে ও পথের প্রান্তে, পত্র ২৫। ২৭ কার্তিক ১৩৩৫। পৃ. ৫২।

২ বিদ্যালয়ের মধ্যে পরিবর্তনটা থেকে থেকেই চলে— পুরাতন যায়, নূতন আসে। শিক্ষাভবন বা কলেজ ১৯২৬ সালে শুরু হইয়াছে; ইতিমধ্যেই ১৯২৭ জুলাই মাসে শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষ ও ইংরেজির অধ্যাপক জাহাঙ্গীর বকীলকে চলিয়া যাইতে হইয়াছিল; তাঁহার স্থলে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক প্রেমসুন্দর বসু অধ্যক্ষ হন। তখন কিছুকাল স্কুল কলেজ এক অধ্যক্ষর তত্ত্বাবধানে আনা হয়। প্রেমসুন্দর ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে য়ুরোপে চলিয়া গেলে অধ্যাপক নলিনচন্দ্র গাঙ্গুলি অধ্যক্ষ হইলেন। ইতিপূর্বে টাকার (B. G. Tucker) নামে মেথডিস্ট খ্রীষ্টান মিশনের পাদরা অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। ইঁহার খরচ উক্ত চার্চই বহন করিত। শ্রীনিকেতনের অধ্যক্ষতা রথীন্দ্রনাথ লইয়াছেন য়ুরোপ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর। সেখানে কোয়েকার খ্রীষ্টানদের প্রতিনিধি ডক্টর হ্যারি টিম্বার্স আসিয়াছেন। এই সকল ব্যাপারে এনড্রুজের হাত ছিল যথেষ্ট।

৩ প্রবাসী ১৩৩৫ পৌষ, পৃ ৪৪৫।

৪ জগদীশচন্দ্র (শান্তিনিকেতন, ১৪ অগ্রহায়ণ ১৩৩৫), প্রবাসী ১৩৩৫ পৌষ, পৃ. ৪০৭-০৯। কবির হস্তলিপি লিথো করা। দ্র. বনবাণী পৃ. ৬-৮।

শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য ; ১৭ ডিসেম্বর ভারতের বড়লাট ও ভাইসরয় লর্ড আরউইন শান্তিনিকেতন দেখিতে আসিলেন। বঙ্গদেশের গবর্নরগণ প্রায় সকলেই এখানে আসিয়াছেন। ব্রিটিশযুগের বড়লাটের এই প্রথম ও শেষ সফর। বোলপুরের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে বড়লাটের আগমন একটি অভাবনীয় ঘটনা। বহুদিন হইতে তাহার আয়োজন চলে। এতকাল আশ্রমে গবর্নরগণ আসিয়াছেন— আশ্রমের ভিতরে পুলিশের উপর কখনো কোনো ভার অর্পিত হয় নাই। কিন্তু এবার দেশের রাজনৈতিক অশান্তির কথা বিবেচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ সে-দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সাহসী হইলেন না, তিনি পুলিশবিভাগের উপর সমস্ত ভার ছাড়িয়া দিলেন। আশ্রমের কর্মীদের সনাক্ত হইবার জন্য একপ্রকার গেরুয়াবর্ণ আলখেল্লা পরিধান করিতে হইয়াছিল।

রাজপুরুষের আশ্রমপরিদর্শনের কয়েক দিন পরেই পৌষ-উৎসব কবি যথাবিধি নিষ্পন্ন করিলেন।[১] বড়দিনের ছুটিতে কলিকাতায় নিখিল-ভারত-গ্রন্থাগার সম্মেলন আহ্বানের আয়োজন হয় ; প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন সুশীলকুমার দত্ত ও লেখক। স্থির হয় মিসেস বেসাণ্ট সভানেত্রী, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইবেন রবীন্দ্রনাথ। আমরা আজ যে নিখিল-ভারত-গ্রন্থাগার সমিতি (All Indian Library Association) দেখিতেছি, তখন তাহা গঠিত হয় নাই। যাহা হউক, আমাদের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ একটি সুন্দর অভিভাষণ লিখিয়া দিলেন।

মাঘোৎসবের পর কবি কলিকাতায় আসিলেন ; পাঠকের মনে আছে কবি গত ১০ সেপ্টেম্বর (১৯২৮) শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া যান, তার পর একাদিক্রমে এই সাড়ে তিন মাস সেখানেই বাস করিয়াছিলেন। শান্তিদেব ঘোষ লিখিতেছেন, "১৯২৯-এ কলকাতায় মাঘোৎসবে গান করতে যাবার পর হঠাৎ স্থির হ'ল জোড়াসাঁকোয় নাচ-গানের আসর করা হবে টিকিট ক'রে।... এই অনুষ্ঠানের নাম দেওয়া হ'ল 'সুন্দর'। কিন্তু এই 'সুন্দর' ও ১৯২৫-এর 'সুন্দরে'র মধ্যে কোনো মিল ছিল না। অভিনয় হয় দুই দিন (১৩, ১৫ মাঘ ১৩৩৫)। শেষদিনে গুরুদেব শান্তিনিকেতন থেকে এসে পড়লেন এবং গানগুলির অদলবদল করে 'রানী' এবং তার সখী 'বাসন্তিকা' নামে দুটি চরিত্র এর মধ্যে যোগ করে দিলেন। তাদের কথাবার্তার ভিতর দিয়ে গানগুলির মর্মার্থ বোঝানো হয়েছিল।"[২]

তিনি কলিকাতায় আসিলেন না ; তখন কংগ্রেস কমিটির সভা উপলক্ষ্যে বহু লোক আসিয়াছেন— বোধ হয় সেই ভিড় এড়াইবার জন্য এইটি করেন। মিসেস বেসাণ্ট কংগ্রেসের কোনো কমিটিতে আটক পড়িয়া যান, তিনিও সভায় আসিলেন না। সভা বসিয়াছে সিনেট হলে ; আমরা তো প্রমাদ গণিলাম। তখন ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের শরণাগত

১ দীক্ষা, ৭ই পৌষ প্রদত্ত ভাষণ। প্রবাসী ১৩৩৫।

২ রবীন্দ্রসংগীত, পৃ. ২৫৩।

'সুন্দর'। অভিনয় স্থান— জোড়াসাঁকো, কলিকাতা। অভিনয় রাত্রি— ১৩ই মাঘ ১৩৩৫। এই পুস্তিকাখানি শান্তিদেব ঘোষ আমাকে দেখিবার জন্য দেন। গান— ১. নৃত্যের তালে তালে। ২. যদি তারে নাই চিনি গো। ৩. আজি দখিন দুয়ার খোলা। ৪. ওগো দখিন হাওয়া। ৫. এসো এসো বসন্ত ধরাতলে। ৬. কবে তুমি আসবে বলে। ৭. কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন। ৮. ও কি মায়া, ও কি ছায়া। ৯. ও দেখা দিয়ে চলে গেল। ১০. এনেছ ঐ শিরীষ বকুল।

দ্বিতীয় রাত্রের (২৮ জানুয়ারি) জন্য কবি নূতন গান যোজনা করেন। ১-এর পরে 'বিশ্ববীণা রবে'। ২-এর পরে 'তোমায় চেয়ে আছি বসে'। ৪-এর পরে 'একটুক ছোঁওয়া লাগে'। ৬-এর পরে 'শুকনো পাতা কে যে ছড়ায়'। ৮-এর পরে 'না যেয়ো না গো'। ৯-এর পরে 'লহ লহ তুলে লহ'।

হই— তিনি সভাপতির কার্য করিলেন ; আর রবীন্দ্রনাথের ভাষণ পড়িয়া দিলেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি প্রত্যেক শিক্ষাব্রতী ও গ্রন্থাগারিকের অবশ্য পঠনীয়।[১]

(উৎসবের পর একমাস কাটিয়া গেল— এ সময়ে মহুয়ার দুইটি কবিতা চোখে পড়ে— 'প্রত্যাগত' (২৭ পৌষ ১৩৩৫) ও 'পুরাতন'। 'পুরাতন' কবিতাটি পরে গান করা হয় 'অনেক দিনের আমার যে গান' (গীতবিতান পৃ. ২৭৮)।)

কলিকাতায় আদি ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসব— গান করিবার জন্য শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা গেল ; কবি আশ্রমেই মাঘোৎসব উদ্‌যাপন করিলেন— মন্দিরে যে ভাষণ দেন তাহা 'রামমোহন রায়' নামেই প্রকাশিত হয়।[২]

রবীন্দ্রনাথ ২৭ জানুয়ারি শান্তিনিকেতনে আসিলেন। সেইদিন ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ধর্ম-মহাসম্মেলনের (Conference of International Religions) উদ্‌বোধন তাঁহাকে করিতে হইল। ভারতের নানা ধর্মাবলম্বী খ্রীষ্টীয় সমাজের ইউনিটেরিয়ান কোয়েকার প্রভৃতি উদারনীতিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা সভায় উপস্থিত। প্রথম দিন (২৭ জানুয়ারি) রবীন্দ্রনাথ সভাপতিরূপে ক্ষুদ্র একটি ভাষণ পাঠ করেন।[৩]

পাঠকের স্মরণ আছে গত ৬ ভাদ্র (১৩৩৫) ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাদিবসের (২২ অগস্ট) শতবার্ষিকী উৎসবের সূচনা হয় ; কবি কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে 'রুদ্রের আখ্যান ও আশীর্বাদ' শীর্ষক ভাষণ ও 'রামমোহন রায়' সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই উৎসবের অনুক্রমণরূপে এই আন্তর্জাতিক ধর্ম-মহাসম্মেলন আহূত।

এ যাত্রায় কলিকাতায় বেশি দিন থাকা হইল না। কবিকে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া যাইতে হইল ; কারণ কয়েকদিন পরেই শ্রীনিকেতনের বাৎসরিক উৎসব (৬ ফেব্রুয়ারি)। উৎসবান্তে বর্ধমান বিভাগীয় সমবায় সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন (৯-১০ ফেব্রুয়ারি)। সম্মেলনের সভাপতি গোসবার সার্ ডেনিয়েল হ্যামিলটন, সভার উদ্‌বোধন করেন রবীন্দ্রনাথ। সার্ ডেনিয়েল বলেন If co-operation fails the hope of India will fail.

রবীন্দ্রনাথের ভাষণের বিষয় ছিল সমবায়নীতির সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথের গদ্য সাহিত্য— প্রবন্ধ ও পত্রাদির পাঠকরা সমবায়নীতির প্রতি কবির আস্থার কথা অবগত আছেন। শান্তিনিকেতনে সমবায় ভাণ্ডার (১৯১৮) ও শ্রীনিকেতনে 'বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল— এই সমবায়নীতির উপর একান্ত বিশ্বাস হইতে। কবির স্বপ্ন ছিল শান্তিনিকেতন সমবায় ভাণ্ডারের মাধ্যমে বিশ্বভারতীর যাবতীয় সামগ্রী, আশ্রমবাসীদের নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য ও অন্যান্য জিনিস সরবরাহ হইবে ; এবং বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে গ্রাম অঞ্চলে কৃষক ও শিল্পীদের ঋণদান ব্যবস্থা দ্বারা গ্রাম্য মহাজনের হস্ত হইতে তাহাদের উদ্ধার করা হইবে। এই কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক দেশের সম্মুখে যথার্থ দেশসেবার আদর্শ স্থাপন করিবে এবং দেশবাসীকে সমৃদ্ধি ও সুখের দিকে পথনির্দেশ করিবে। সমবায় ও সহযোগিতার উপর ভবিষ্যতের ভিত্তি গড়িয়া উঠিবে।

১ লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য, প্রবাসী ১৩৩৫ পৌষ, পৃ. ৪২৬-২৯। বাংলা মূল ও ইংরেজি অনুবাদ সহ পুস্তিকা পরে প্রকাশিত হয়। দ্র. শিক্ষা, ২য় সংস্করণ।

২ রামমোহন রায়, প্রবাসী ১৩৩৫ চৈত্র, পৃ. ৭৭৪-৭৮ (শান্তিনিকেতনে মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে ব্যাখ্যাত)। দ্র. ভারতপথিক রামমোহন, পৃ. ৪৯-৬২।

৩ Visva-Bharati Quarterly 1929, Vol. VII Notes 1-2।

দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য যে দুইটি পথকে লোকে বিবেচনা করিতেছে— তাহার একটি হইতেছে গান্ধীবাদ, অপরটি সোবিয়েত সাম্যবাদ। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দীর্ঘ লিখিত প্রবন্ধে পৃথিবীর ইতিহাসে সমবায়ের স্থান লইয়া আলোচনা করিয়া বলেন যে, বর্তমানে বিবিধ জ্ঞানের সমবায়ে পাশ্চাত্য দেশসমূহ প্রভূত শক্তিশালী হইয়াছে; বিজ্ঞানের নানা বিদ্যার সহায্যে ধন উৎপন্ন ও সমরশক্তি আকাশচুম্বী হইয়া উঠিতেছে; ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও এই সমবায়নীতি। পশ্চিমের এই অপ্রতিহত গতিকে শমিত করিবার জন্য প্রাচীন গ্রাম্য জীবনযাত্রাকে আদর্শ বলিয়া ঘোষিতও হইতেছে। কবি বলেন, "এ কথা মাঝে মাঝে শোনা যায় যে, এককালে আমাদের জীবনযাত্রায় যেরকম নিতান্ত স্বল্পোপকরণ ছিল তেমনি আবার যদি হতে পারে তা হলে দারিদ্র্যের গোড়া কাটা যায়। তার মানে, সম্পূর্ণ অধঃপাত হলে আর পতনের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু তাকে পরিত্রাণ বলে না।" ইহা গান্ধীবাদী অর্থনীতির স্থূল সমালোচনা মাত্র। অন্য মতবাদের সমালোচনায় বলেন যে, ধনকে খর্ব করিলেও যেমন সমস্যা সমাধান হয় না, তেমনি "ধনকে বলপূর্বক হরণ করেও নয়, ধনকে বদান্যতাযোগে দান করেও নয়। এর উপায় ধনকে উৎপন্ন করার শক্তি যথাসম্ভব সকলের মধ্যে জাগরূক করা, অর্থাৎ সমবায়নীতি সাধারণের মধ্যে প্রচার করা।" কবি স্পষ্টই বলিলেন, "এ কথা আমি বিশ্বাস করিনে, বলের দ্বারা বা কৌশলের দ্বারা ধনের অসাম্য কোনোদিন সম্পূর্ণ দূর হতে পারে। কেননা শক্তির অসাম্য মানুষের অন্তর্নিহিত। এই শক্তির অসাম্যের বাহ্য প্রকাশ নানা আকারে হতেই হবে।"[১]

এই প্রসঙ্গে কবির সমসাময়িক আর-একটি প্রবন্ধের কথা আসিয়া পড়িতেছে। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ এবং এই কৃষিসমস্যা লইয়া তিনি বহুকাল হইতে চিন্তা করিতেছেন। মিত-শ্রমিক যন্ত্রাদি ও আধুনিক বিজ্ঞানের সমবায়ে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং সঙ্কুচিত খাদ্যশস্য উৎপন্নোপযোগী জমির সমস্যা-সমাধানের কথা কবি নানাভাবে বলিয়া আসিতেছেন। কবি বলেন, 'এ কথা ভুলিলে বিপদ যে, উদ্‌বৃত্ত অন্নই আমাদের শক্তির পরিচয় ও শক্তির আশ্রয়, এই শক্তিই সকল সভ্যতার মূল।... আজ পৃথিবীতে সর্বত্রই ফসল ফলানোর ব্যাপার কেবলমাত্র চাষীর হাতে নাই। জ্ঞানী বুদ্ধিমান ও উদ্‌ভাবনপটু যান্ত্রিকদল ইহাতে মন দিয়াছেন, যাহা অন্ধ অভ্যাসের কাজ ছিল তাহাতে চিত্তের দৃষ্টি পড়িবামাত্র আশ্চর্য সফলতা ঘটিয়াছে। তাই আমাদের দেশের কৃষির পণ্য ও কৃষিফলের সহিত পাশ্চাত্য দেশের তুলনা করিলে মাথা হেঁট হইয়া যায়। যে অযোগ্যতার বিধিনির্দিষ্ট শাস্তি মৃত্যু, সেই শাস্তি স্বীকার করিয়াও দেশের বুদ্ধি এই কাজে একটুও লাগিল না। উপবাসে মরিতে মরিতেও নিরক্ষর চাষীর উপর নির্ভর করিয়া রহিলাম। যাহা যেমন আছে তেমনিই থাকিবে; স্বচেষ্টায় তাহার উন্নতি করিতে পারি এ শ্রদ্ধা নিজের উপর নাই— তাই জীর্ণ সাবেক কালকে দিয়া বর্তমান কালের বিপুল দায় মিটাইবার তাড়ায় প্রাণ বাহির হইল।"[২]

শ্রীনিকেতনের উৎসবের পক্ষকাল মধ্যে কবি কানাডা যাত্রা করেন (২৬ ফেব্রুয়ারি)। কানাডা সফরের কথা বলিবার পূর্বে এই পর্বে কবি যে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিব।

১ সমবায়নীতি, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, শততম সংখ্যা; প্রকাশ ১৩৬০। পৃ. ৩১-৪৭।

২ কৃষিবিৎ সন্তোষবিহারী বসু, প্রবাসী ১৩৩৫ পৌষ, পৃ. ৪২৮-২৯। সন্তোষবিহারী বর্ধমানের লোক, সরকারী কৃষিবিভাগে কাজ করিতেন পরে বিশ্বভারতীতে আসেন ও শ্রীনিকেতনের কৃষিবিভাগের বহু উন্নতিসাধন করেন।

যোগাযোগ, শেষের কবিতা ও মহুয়া

যোগাযোগ, শেষের কবিতা ও মহুয়া ১৯২৯ সালে বা যথাক্রমে ১৩৩৬-এর আষাঢ় ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হয়। পাঠকের স্মরণ আছে ১৯২৭ মে-জুন মাসে কবি যখন শিলঙ পাহাড়ে ছিলেন, সেই সময়ে 'যোগাযোগ' উপন্যাসের সূত্রপাত হয় 'তিনপুরুষ' নামে। উপন্যাস-রচনার প্রত্যক্ষ কারণ 'বিচিত্রা' নামে নূতন পত্রিকার তাগিদ।

নূতন পত্রিকা কবিকে চিরদিন নূতন রচনায় প্রবুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে— নূতন পাঠক নূতন লেখকদের সঙ্গে চক্ষের অন্তরালেও মনের একটা পরিচয় ঘটে। বারো বৎসর পূর্বে 'সবুজ পত্রে'র আবির্ভাবে 'ঘরেবাইরে' লেখেন (১৩২৩) তার পর 'বিচিত্রা' নামে এই নূতন পত্রিকার অভ্যুদয়ে তিনপুরুষ তথা যোগাযোগ উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হন।

'শেষের কবিতা' লেখা শুরু করেন দক্ষিণ-ভারত সফরের সময় ১৯২৮এ— তখন 'যোগাযোগ' লেখা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। শেষের কবিতার মধ্যেই— 'মহুয়া' নামে কাব্যখণ্ডে কল্পিত না হইলেও— ইহার প্রথমদিকের এক ঝাঁক কবিতার আবির্ভাব হয়। তাই আমাদের বক্তব্য— যোগাযোগ ও শেষের কবিতা উপন্যাসদ্বয় এবং মহুয়া কাব্যখণ্ড একটি নিরবচ্ছিন্ন এককরূপে অভিব্যক্ত ও সেইজন্য একত্র বিচার্য।

প্রথম উপন্যাসটি 'তিনপুরুষ' নামে প্রথম দুই মাস ও পরে 'যোগাযোগ' নামে বিচিত্রা মাসিক পত্রিকার প্রথম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যা (১৩৩৪ আশ্বিন) হইতে দ্বিতীয় বর্ষের নবম সংখ্যা (১৩৩৫ চৈত্র) পর্যন্ত (মোট ১৮ মাস), এবং দ্বিতীয় উপন্যাস 'মিতা' নামে যাহার খসড়া এবং 'শেষের কবিতা' নামে যাহার নূতন নামকরণ হয়— সেটি প্রকাশিত হয় ধারাবাহিক প্রবাসীতে ১৩৩৫ সালের ভাদ্র মাস হইতে চৈত্র মাস (৮ মাস)। ১৩৩৫ সালের শেষ আট মাস দুইটি উপন্যাস যুগপৎ দুইটি পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে থাকে। ইহারা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ সালের আষাঢ় ও ভাদ্র মাসে— ১৯২৯এর জুলাই ও আগস্ট মাসে— কবি তখন কানাডা জাপান প্রভৃতি সফর করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন (১৯২৯ জুলাই ৫)। মহুয়ার কবিতাগুলি লিখিত হয় প্রধানত ১৯২৮ জুন (১৩৩৫ আষাঢ়) হইতে অক্টোবর (আশ্বিন) মাসের মধ্যে; উহা গ্রন্থাকারে রূপগ্রহণ করে ১৩৩৬ সালের আশ্বিন মাসে। এই তারিখগুলি দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, এই তিনটি গ্রন্থই অবিচ্ছিন্নভাবে রচিত হইয়া চলিয়াছিল। আমাদের মতে উপন্যাস দুইটি পরস্পরের পরিপূরক ও মহুয়া কাব্য এই দুই গদ্য কাহিনীর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি; ইহাদের রূপের ভেদও যেমন ক্রমশ অভিব্যক্ত, গুণের ভেদও তেমনি পরিবর্তিত।

'যোগাযোগ' লিখিবার আশুপ্রেরণা যাহাই হউক, ইহার মনস্তাত্ত্বিক মূল এসব ঘটনার বাহিরে বা গভীরে অবচেতনে সুপ্ত ছিল, অল্প আঘাতেই কাহিনীর উৎসরূপে প্রকাশমান হইয়া চলিল। কবির যে-চিন্তাধারা কাহিনীর মধ্যে রূপায়িত, তাহার উৎসসন্ধানের জন্য হয়তো আমাদের কিছু দূর পিছাইয়া যাইতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথের মৌলিক সাহিত্যসৃষ্টি বহুকাল স্তব্ধ— গান ছাড়া বড় কিছু চোখে পড়ে না। দীর্ঘ ব্যবধানের পর পশ্চিম'যাত্রী'র ডায়ারি ও 'পূরবী'তে কবিমনের নূতন পরিচয় পাওয়া যায়; উভয় গ্রন্থ নরনারীর সম্বন্ধবিচারে ও প্রেমকাকলীতে পূর্ণ। 'যাত্রী'র পৃষ্ঠায় যাহা নরনারীর প্রেমতত্ত্বরূপে আলোচিত গদ্য, পূরবীতে তাহা কাব্য-রসসিক্ত পদ্য।

ঘটনার দিক হইতে সামান্য হইলেও মূল্যায়নের দিক হইতে অকিঞ্চিৎকর নহে, এমন বিষয়ের প্রতি চরিতকারের

দৃষ্টি যাওয়াই স্বাভাবিক। 'পূরবী'পর্বের পর কাউণ্ট ক্যাইসারলিঙের অনুরোধে 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ' সম্বন্ধে কবিকে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিতে হইয়াছিল— সে প্রবন্ধ লইয়া আমরা আলোচনাও করিয়াছি। এই প্রবন্ধ লিখিতে গিয়া নরনারীর যৌনসম্বন্ধকে সাধারণভাবে মানবীয় ও বিশেষভাবে ভারতীয় আদর্শের দিক হইতে অতি সূক্ষ্মভাবে বিচারের অবকাশ পান। 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'র মধ্যে নরনারীর প্রেমতত্ত্ব লইয়া যে আলোচনা আছে, তাহা কবিজনোচিত রচনা; কিন্তু বিবাহ বিষয়ে বিশেষভাবে প্রবন্ধ রচনা কালে সমগ্রের দৃষ্টিতে নরনারীর সামাজিক সম্বন্ধকে বিচার করিতে হয়; কেবল প্রেমের সূক্ষ্মতত্ত্ব চর্চা মানবসমাজে অচল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। কবির ভাবপ্রবণ মন নানা ভাবে নানা দিক হইতে সাড়া পায় ও সাড়া দেয়; সামাজিক প্রশ্নের সমাজতাত্ত্বিক (sociological) বিশ্লেষণ চলে মনস্বী কবির অতি-বিশ্লেষণী মনের গহনে। নূতন উপন্যাস রচনাকালে মনের অবচেতন লোকে এই সব সমস্যা-জাত নরনারীরা আবির্ভূত হয়। যাহা ছিল তত্ত্বমূলক গদ্য প্রবন্ধের বিষয়, তাহা উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার ব্যবহারে ও সংলাপে জীবন্ত হইয়া শাশ্বত সমস্যারূপে পাঠকদের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

'যোগাযোগ' উপন্যাসে নরনারীর সমস্যা বিবাহোত্তর গার্হস্থ্য ও সমাজজীবনে। আর 'শেষের কবিতা'র নরনারীদের সমস্যা মিলনের পূর্বরাগে— বিবাহের পর তাহাদের প্রেমস্বপ্ন কী রূপ লইয়াছিল— তাহা আলোচনার বিষয় নহে। 'মহুয়া' কাব্যে প্রেম সকল কিছু সহ্য করে, সবকিছুকে ক্ষমাও করে; কারণ ক্ষমা ও সহনশীলতা বীরের ধর্ম: পুষ্পধনুর উদ্দেশে কবি বলিলেন, 'হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু'।' বীরের ধর্ম প্রেম, পাষণ্ডের ধর্ম ভোগ।

যোগাযোগের পটভূমি ঠিক আধুনিক নহে; ইহার মানুষরা সেই যুগের, যেখান হইতে প্রাচীনকাল সরিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু নবীনযুগের আসন এখনো পাতা হয় নাই। ইহাদের দেহে ও মনে আধুনিকতার স্পর্শ সুস্পষ্ট নহে। এই আলো-ছায়ার যুগের মানুষ বিপ্রদাস ও নবীন— উভয়েই উনবিংশ শতকের পজিটিভিস্ট। তবে তাহাদের কেহই উগ্রভাবে আপনাদের মতামত লইয়া মত্ত নহে। তাহারা ধীর স্থির। মধুসূদন বস্তুবাদী 'বাণিয়া'— ধর্মাধর্ম তাহার নিকট আত্মোন্নতির পাদপীঠ মাত্র। এই উপন্যাসে তিনটি নারী চরিত্র: কুমুদিনী— বিপ্রদাসের ভগ্নী, শ্যামা— মধুসূদনের বিধবা ভ্রাতৃজায়া, নিস্তারিণী— নবীনের স্ত্রী বা মোতির মা নামে কাহিনীতে পরিচিত। সমস্ত বইটির মধ্যে কুমুকে কেন্দ্র করিয়া বিচিত্র সমস্যার উদ্ভব— ইহারই অন্তর্বেদনা উপন্যাসের প্রধান আলোচ্য বিষয়।[১]

কুমুকে অত্যন্ত স্পর্শচেতন করিয়া গড়া; বয়সের তুলনায় অস্বাভাবিকরূপে আধ্যাত্মিক করিয়া তুলিবার চেষ্টা পদে পদে। তাহার শিক্ষা আধুনিক কালের নয়; অথচ বিবাহকালে তাহার বয়স উনিশ বৎসর— যখন 'ইচ্ছা' নামক পদার্থটা বেশ স্পষ্ট করিয়া মনের মধ্যে বাসা বাঁধে। পিতৃমাতৃহীন একমাত্র ভগিনীর সম্পূর্ণ ভার পড়ে বিপ্রদাসের উপর। বিপ্রদাসও অদার। কুমু দাদার শিষ্য; দাদার সর্ববিদ্যা সে আয়ত্ত করে, সংস্কৃতকাব্য সে পড়ে, মীরার ভজন গায়, এসরাজ বাজায়, কালোয়াতি গান অভ্যাস করে, ফোটো তোলে, বন্দুক ছোড়ে, ঘোড়ার তদারক করে। এই অদ্ভুত শিক্ষাদানের ফলে কুমু বাস্তবসংসারকে ভালো করিয়া জানিবার অবসর পায় নাই। বাড়িতে সমবয়সী ছেলেমেয়ে না থাকায়, ঠিক স্বাভাবিক বা normal জীবনযাপনের সুযোগ তাহার কমই হয়। সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতও তাহার স্বল্প জানা। মোট কথা, বিপ্রদাসের শিক্ষার গুণে বা দোষে কুমু একটি অবাস্তব আবহাওয়ার মধ্যে লালিত হয়। ইহার উপর বুনিয়াদী ধনী পরিবারের কুলাচার ও ধর্মসংস্কারে তাহার মন আচ্ছন্ন। সংস্কৃত

১ যোগাযোগ সম্বন্ধে রাধারাণী দেবীকে কবির পত্র, ১৪ ভাদ্র ১৩৩৫। দ্র. বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬২ কার্তিক, পৃ. ৭৯-৮০।

কাব্য পড়িয়া তাহার মনে হয় উমার তপস্যা নারীধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ; আবার সংসারের মেয়েলি শিক্ষা হইতে সে জানিয়াছে শিবপূজা করিলে শিবতুল্য স্বামী পাওয়া যায়। মীরাবাঈ-এর ভজন গাহিয়া সে ভাবে মীরাবাঈ নারীজাতির আদর্শ।

বিবাহ সম্বন্ধে কুমুর আদর্শ কুমারসম্ভবের শিব-পার্বতীর সম্বন্ধ। স্বর্গচ্যুত দেবতাদের উদ্ধারের জন্য উমা তপস্যা করিয়া মহাদেব শিবকে পতিরূপে লাভ করেন। দাদাকে ঋণমুক্ত করিবার জন্য কুমুর মধুসূদনকে বিবাহের সংকল্প। সে শুনিয়াছিল মধুসূদন সুরূপ নহে, বয়সে সে অনেক বড়ো। এই বিবাহ-প্রস্তাবকে মানিয়া লইয়া সে বলে, 'যাঁর কথা বলছ, নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ঠিক হয়েই আছে।' সম্পূর্ণ প্রাচীন অন্ধসংস্কারের উপর এই মনোভাবের ভিত্তি— বাস্তবতাহীন জীবন-পরিবেশের মধ্যে বাসের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম মাত্র। সে জানে, "কুমারকে আনতে গেলে কামনার উদ্দাম বেগকে নিরস্ত ক'রে দিয়ে নিবৃত্তিপূত সাধনাকে আশ্রয় করতে হবে। সিদ্ধির এই কঠোর রূপই যথার্থ সুন্দর, শিব রূপবান নন্‌ ব'লে যখন উমার কাছে তাঁর নিন্দা হয়েছিল, তখন উমা এই ভাবেই উত্তর করেছিল।"[১]

মধুসূদনের সহিত কুমুদিনীর বিবাহ, যথার্থভাবে অসবর্ণ বিবাহ: কারণ, ইহারা দুই জাতের মানুষ— বিভিন্ন কাল্‌চারের স্তরে ইহারা লালিত। মধুসূদন ইংরেজ আমলের ব্যবসায়ী, ইংরেজি সংস্কৃতি বা সভ্যতা তাহার মনকে স্পর্শ করে নাই— সে পাইয়াছে ইংরেজের বণিকবুদ্ধি। প্রাচীন হিন্দু আদর্শ তাহার কাছে অর্থহীন, য়ুরোপীয় আধুনিক কাল্‌চারের সহিতও সে অপরিচিত। ফলে তাহার কাছে নারী প্রয়োজনীয় আসবাব মাত্র, সে শ্রদ্ধার পাত্র নহে, ভোগের সামগ্রীবিশেষ। 'সমাজের চক্রটি মেয়ে পুরুষকে নিয়ে' বাঁধা— এ ধারণা মধুসূদনের অজ্ঞাত। রবীন্দ্রনাথ পূর্বে এক প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন, নারীকে "পুরুষ লোভের দ্বারা আপন ব্যক্তিগত ভোগের পথেই আজ পর্যন্ত বহুল পরিমাণে বিক্ষিপ্ত করেছে, বিকৃত করেছে, তাকে বিষয়সম্পত্তির মতো নিজের ঈর্ষাবেষ্টিত সংকীর্ণ ব্যবহারের মধ্যে বদ্ধ করেছে।"[২]

কুমুর সঙ্গে মধুসূদনের এইখানেই বিরোধ। সে শুনিয়া আসিয়াছে স্ত্রী স্বামীর সঙ্গিনী, সে আনন্দদায়িনী শক্তিরূপিণী। শিবতুল্য স্বামীলাভের তপস্যা তাহার আবাল্যের। স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিবার শিক্ষায় সে অভ্যস্ত। দাদা বিপ্রদাসের সংসারে একক্ষেত্রে উভয়ে ভিন্নভাবে কাজ করিয়াছিল। কিন্তু মধুসূদনের ব্যবহারে কুমুর সমস্ত দেহমন বিবাহদিন হইতেই বিদ্রোহী হইয়া উঠিল কেন? সে তো আত্মসমর্পণ করিবার জন্যই প্রস্তুত। কিন্তু শ্রদ্ধার সহিত সংযমের সহিত স্ত্রীকে গ্রহণের শক্তি ছিল না স্বামীদেবতার! মধুসূদন স্ত্রীকে জানে ভোগের সামগ্রী, সহধর্মিণী শব্দ তাহার শব্দভাণ্ডারে অজ্ঞাত। কুমু অচিরেই বুঝিল সে স্বামীগৃহে দাসী মাত্র— স্বামীর তৈজসপত্র, ঐশ্বর্যের অন্যতম উপকরণ; কোথাও তাহার অধিকার নাই, কোনো বিষয়ে আপনার মত বা ইচ্ছা প্রকাশের ক্ষীণতম স্বাধীনতা নাই। এ সংসারে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নাই, এমনকি ব্যক্তিত্ববোধ পর্যন্ত দূষণীয়।

এই অভিঘাতে কুমুর সমস্ত দেহমন সংকুচিত, বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, এমনকি স্বামীকে ত্যাগ করিতেও সে প্রস্তুত। এই সংগ্রাম হইতেছে উপন্যাসের মর্মগত আলোচ্যবিষয়। কুমু যদি সাধারণ নারীর উপাদানে গঠিত হইত, অর্থাৎ মনবিকাশের শুভ অবকাশ সে প্রথমজীবনে না পাইত, তবে হয়তো সে সকল দুঃখ অপমান সহিয়া আপনার ব্যক্তিচেতনাকে অবলুপ্ত করিয়া স্বামীগৃহে সহজসুখে গৃহসজ্জারূপে বিরাজ করিতে পারিত; অথবা মৃত্যুমাঝে

১ ভারতবর্ষীয় বিবাহ, সমাজ ২য় সংস্করণ, পৃ. ৮০।

২ ভারতবর্ষীয় বিবাহ, সমাজ ২য় সংস্করণ, পৃ. ৮৬।

আপনাকে বিসর্জন দিত। কুমুকে লেখক সে-উপাদানে গড়েন নাই বলিয়া তাহার অসন্তোষকে বিদ্রোহে ও বলিষ্ঠ প্রত্যাখ্যানে ফুটাইয়া তুলিলেন। কুমুর মনের অব্যক্ত উক্তি—

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার . .।[১]

কুমুর আভিজাত্যে দুঃখ সহিবার শিক্ষা আছে, অপমান মানিবার মন সে পায় নাই। মনে পড়ে চিত্রাঙ্গদার কথা—

পূজা করি রাখিবে মাথায় সে-ও আমি নহি,
অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে পিছে, সে-ও আমি নহি।

মধুসূদনের আদর্শ— অবহেলার মধ্যে, স্বর্ণপিঞ্জরের মধ্যে পোষমানা পশুর মতো থাকিবে নারী। 'নারীর মনুষ্যত্ব'[২] তাহার শব্দজ্ঞানে অশ্রুত।

অতি-স্পর্শচেতন আদর্শবাদী কুমুর দেহমন যখন অত্যন্ত ক্লিষ্ট ও ক্ষিণ্ণ, তখন হঠাৎ জানা গেল কুমু অন্তঃসত্ত্বা। সেই মুহূর্ত হইতে পিতৃকেন্দ্রিক সমাজতন্ত্রে নারীর সমস্যা জটিল হইয়া উঠিল: পিতার পরিবারের, সমাজের সমস্ত দাবি গিয়া পড়িল ভাবী জননীর উপর— কারণ সন্তানের অধিকারী জনক, জননী নহে। পুরুষের গড়া ন্যায়ের বিধানে সন্তানের উপর জননীর কোনো দাবি নাই, লালনের দায় মাতার, পালনের ভার পিতার। এই সমস্যা সৃষ্টি করিয়া লেখক উপন্যাস শেষ করিয়াছেন। বিদ্রোহী নারীকে স্বামীগৃহে— মধুসূদন-শ্যামার অশুচি সংসারে ফিরিতে হইল। কারণ তাহার আর কোনো গতি নাই— নারী 'জননার্থং মহাভাগা'। এই ঘটনার দৃষ্টিতে আমরা যোগাযোগকে একটা বিরাট ট্রাজেডি ছাড়া আর কী বলিতে পারি? মানসিক যে অবস্থায় কুমুর গর্ভসঞ্চার হয়, তাহা তো এক হিসাবে legalized rape-এর নামান্তর মাত্র।[৩] কুমু অন্তরের আদর্শের সহিত এই আকস্মিক ঘটনার সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইতেছিল না। কোনো প্রতিকারের সম্ভাবনা কোথাও নাই। ক্ষুব্ধ নারীচিত্তে এই প্রশ্ন হয়তো উঠিয়াছিল—

শুধু শূন্যে চেয়ে রবো?
কেন নিজে নাহি লব চিনে সার্থকের পথ?

কিন্তু সে শক্তি তাহার কোথায়? অর্থনৈতিক কারণ, সামাজিক মতামত— তাহার অন্তরায়। প্রাচীন ধারায় শিক্ষিত মেয়ে আধুনিকযুগে অত্যন্ত অসহায়, তার উপর যখন গর্ভে তাহার সন্তান। পিতৃগৃহে অবাঞ্ছিত না হইলেও, সংস্কারগত বিধি ও বিশ্বাস অনুসারে সেখানে সে অনধিকারিণী— অর্থনৈতিক কোনো দাবি তাহার নাই— নির্ভর তাহার স্বামীর দাক্ষিণ্য—তাহা যত কৃপণ, যত নিষ্ঠুরই হউক। সুতরাং সমস্ত অন্যায় ও অপমানকে মানিয়া লইয়া

১ সবলা, মহুয়া; ৭ ভাদ্র ১৩৩৫ ॥ ২৩ অগস্ট ১৯২৮।

২ নারীর মনুষ্যত্ব শীর্ষক পত্র-প্রবন্ধ ১৫ বৈশাখ ১৩৩৫ (২৮ এপ্রিল ১৯২৮) লেখেন। বিচিত্রা ১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ৭৬৫-৭১। দ্র. সমাজ ২য় সংস্করণ, পৃ. ৮৮-১০৩ [রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫, সমাজ গ্রন্থে নাই]। এই পত্র-প্রবন্ধটি কবি যখন লেখেন, তখন 'যোগাযোগ' উপন্যাস রচনা চলিতেছে; প্রায় অর্ধেকে আসিয়াছেন।

৩ রবীন্দ্রনাথ একপত্রে লিখিতেছেন—"এতবড়ো অপমানকর সম্বন্ধ তার পক্ষে ব্যভিচারের সমতুল্য— এ যেন দেবতার অবমাননা— নিজের যা শ্রেষ্ঠ তাকে পঙ্কে বিলুণ্ঠিত করা।" রাধারাণী দেবীকে পত্র, ১৪ ভাদ্র ১৩৩৫। দ্র. বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬২ কার্তিক-পৌষ, পৃ. ৭৯,৮০।

স্বামীগৃহে প্রত্যাবর্তন ও বাস ছাড়া সে অনন্যগতি। এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ অর্থনৈতিক সমস্যা তোলেন নাই সত্য, কিন্তু অন্যত্র এ প্রশ্ন তুলিয়া আলোচনা করিয়াছেন।

নিষ্করুণ ঘটনার যোগাযোগে এই কাহিনী জটিল। বিচিত্র মানসিক সংগ্রাম আদ্যন্ত জুড়িয়া। কুমু মধুসূদন শ্যামা— কাহারো মানসিক যন্ত্রণা কম নহে। এতবড় গ্রন্থ মধ্যে কুমুকে একবার মাত্র স্বামীগৃহে হাসিতে দেখা যায়, তাহাও স্বামীর সহিত রঙ্গ রসিকতায় নহে। কুমুর প্রতি স্বাভাবিক সহানুভূতিবশত, মধুসূদনের উৎকণ্ঠিত বাসনার তীব্র জ্বালার প্রতি, ও ব্যর্থযৌবনা সুন্দরী শ্যামার অন্তর্দাহের প্রতি পাঠকের করুণা জাগ্রত হয় না। কিন্তু লেখক উভয়ের মানসিক সংগ্রামের যথাযথ স্থান দিয়াছেন। দেহমনের শুচিতা রক্ষিত হয় নাই বলিয়া কবি তাহাদের অস্পৃশ্য করিয়া রাখেন নাই— তাহাদের সংগ্রামের স্বরূপটি পাঠকদের নিকট পেশ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মধ্যে 'গোরা' ছাড়া এতবড় গ্রন্থ আর নাই; ঘটনার সমবায়ে, মনোবিশ্লেষণের কারুতায়, ও সর্বোপরি ভাষার চারুতায় এই গ্রন্থ অতুলনীয়। গল্পাংশের সহিত সমস্যা ও সমালোচনা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত— দীর্ঘ তর্ক ও সংলাপ ঘটনাস্রোতকে অবরুদ্ধ করে নাই; বাক্যের ও ভাবের কুহেলিকা রচিয়া সমস্যাকে পাশ কাটাইবার অবসর কাহাকেও দেন নাই, বিশেষ কোনো মতবাদ বা ধর্মমতের আলোচনায় রচনা ভারগ্রস্ত হয় নাই। উপন্যাসের ঘটনা ও সমস্যা পাঠকের মনকে পিষিয়া যেন ক্লান্ত করিয়া দেয়। একমাত্র নবীন ও মোতির মা থাকায় মনটা কিছুটা রিলিফ পায়। আমাদের মনে হয় কবির পক্ষে তাঁহার নিজসৃষ্টি নিষ্ঠুরতা সহ্য করাও যেন সম্ভব হইতেছিল না, তিনিও যেন রিলিফ খুঁজিতেছিলেন; তাই বোধ হয় দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণকালে, কুন্নুরে 'মিতা'র ন্যায় একটি গল্প সৃষ্টি করিয়া আপনার মনের রিলিফ খোঁজেন। প্রথমে গল্প করিয়া শোনান ও পরে তাহা লিখিয়া ফেলেন দক্ষিণ-ভারত সফরের মধ্যেই। শুনিয়াছি রমাঁ রলাঁ তাঁহার সুদীর্ঘ উপন্যাস জাঁ ক্রিস্তোফ্ রচনার পর খুব একটা হাস্যোজ্জ্বল নাটক (*Colas Breugen* 1918) রচনা করেন। সেখানেও রিলিফ বা মনের ভাব লঘু করিবার প্রয়াস ছিল। রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও বোধ হয় সেইজন্য যোগাযোগের শেষদিকে 'শেষের কবিতা' লেখা শুধু সম্ভব নয়, অনিবার্য হইয়াছিল।

যোগাযোগের পর 'শেষের কবিতা' এ-যেন মহাকাব্যের পর লিরিক রচনা। সত্যই এইটি লিখিতে আরম্ভ করিয়া কবি যেন মনের নিষ্কৃতি ও তৃপ্তি পাইতেছেন। শেষের কবিতাকে লিরিক ড্রামা বা নাটক বলা যাইতে পারে— উপন্যাসের ঢঙে লেখা— ইহা সংলাপে পূর্ণ— ঘটনাগুলি ড্রামাটিক।

'শেষের কবিতা'র পটভূমি অত্যন্ত আধুনিক। নরনারীদের অনেকেই বিলাতফেরত ও উচ্চশিক্ষিত। উপার্জনের ভাবনা কাহারও নাই, ব্যয়-অপব্যয়েও কৃপণতা নাই। ইহাদের ধরণ-ধারণ চলন-বলন সাধারণ বাঙালি হইতে পৃথক— ইহারা অন্য সমাজের জীব। তবে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে এ-শ্রেণীর জীব বাঙালি সমাজে আছে এবং উহাদিগকে অবলুপ্ত করা সহজ নয়, অবজ্ঞা করাও সম্ভব নয়; কারণ তাহারাই সমাজে নানাভাবে শক্তিমান। তাহাদের স্তরে উন্নীত হইবার জন্য অনেকেরই মনের বাসনা— সাধ হয়। সাধ্যে কুলায় না বলিয়া তাহারা ঈর্ষাপ্রণোদিত অবজ্ঞার পাত্র। সুযোগ ও সুবিধা পাইলেই তাহাদের স্তরে উন্নীত হইয়া সার্থকজীবন লাভের স্বপ্ন সকলেরই।

এই উপন্যাসে নরনারীর দ্বন্দ্ব সম্পূর্ণ অন্য প্রকারের; এখানে স্বামীত্ব বা অধিকার লইয়া দ্বন্দ্ব নাই, কামনায় স্থূলত্ব নাই, অবাস্তব আদর্শতার তুরীয়তায় কাহারও বসতি নহে। পাত্রপাত্রীদের সংগ্রাম আপনাদের রচিত ভাবের কুহেলিকার সঙ্গে, মাঝে মাঝে ভাবুকতা উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাবালুতায় গিয়াও উত্তীর্ণ হইয়াছে।

অমিট্ রয় মধুসূদনের পাল্টা রূপ— সে কোনো কিছুকেই পাইবার জন্য ব্যগ্র নহে, মনের মধ্যে আকাশকুসুম রচিয়া তাহার মধ্যে মধু আহরণের চেষ্টাতে তাহার আনন্দ।

আমার কথা শুধাও যদি— চাবার তরেই চাই,
পাবার তরে চিত্তে আমার ভাব্না কিছুই নাই। . .
চাই না তোমায় ধরতে আমি মোর বাসনায় ঢেকে—
আকাশ থেকেই গান গেয়ে যাও, নয় খাঁচাটার থেকে। — বিপাশা, পূরবী।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের রাজ্যে দুই নারীর বাস— 'একজন উর্বশী সুন্দরী, অন্য জনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী' (বলাকা); 'মেয়েরা দুই জাতের, একজাত প্রধানত মা, আর একজাত প্রিয়া' (দুইবোন)। রবীন্দ্রসাহিত্যে নারীমূর্তি নানাভাবে দেখা দিলেও প্রেয়সী নারীই প্রাধান্য পাইয়াছে— গানে কাব্যে কাহিনীতে। মাতৃরূপী নারীর চিত্র ফুটিয়াছে গোরার আনন্দময়ী ও শেষের কবিতার যোগমায়ার মধ্যে; এ ছাড়া স্পষ্ট মাতৃরূপী নারী অল্পই চোখে পড়ে। অনেক গল্পের নায়িকা মাতৃহীনা, পজিটিভিস্ট বিপত্নীক পিতার দ্বারা লালিত-পালিত। লাবণ্য সেইভাবে প্রতিপালিত। সেই লাবণ্য হইতেছে অমিতর প্রেয়সীরূপী নারী— অকস্মাতের আবিষ্কার। অমিত বাক্যে ও ব্যবহারে অবাস্তব ভাববিলাসী; প্রেম ও ভালোবাসার মধ্যে সূক্ষ্ম ভেদ সে কল্পনা করে; এমনকি ভালোবাসার অনিবার্য পরিণাম যে বিবাহ, এ মতও সে মানিতে প্রস্তুত নহে। অমিত যাহা-কিছু করে তাহা অ-মিত ও অপূর্ব।

অমিত-র মনে হয় লাবণ্য তাহার ভাবী জীবনসঙ্গিনী; কিন্তু অচিরেই লাবণ্য বুঝিল এ লোক নীড়বিলাসী নহে, এ আসমান-বিহারী। নারী স্বভাবতই নীড়মুখী; নারীর স্বভাব-অনুভূতি বলে লাবণ্য বুঝিতে পারে অমিতকে বিবাহ করিয়া সংসার গড়া যাইবে না। নারীর পক্ষে বাস্তবতাশূন্য জীবন শূন্যতারই নামান্তর। কিন্তু তাহার জীবনে প্রেমের নির্বাপিত প্রদীপ অমিতই জ্বালাইয়া দিল। যৌবনের প্রত্যূষে লাবণ্যর মনের মাঝে যে শোভনলাল ক্ষণিকের জন্য আবির্ভূত হইয়াছিল— আজ সে-ই ফিরিয়া আসিল তাহার জীবনে। শোভনলাল ভাববিলাসী নহে— সে ভাবুক; তাহার ভাবনা কর্মে রূপ লয়, তাহার মন আদর্শবাদী তথ্যাশ্রয়ী সত্যানুসন্ধানী। ধরণীতে 'স্বর্গ-খেলনা' গড়া তাহার জীবনাদর্শ নহে; লাবণ্য জানে নারী 'প্রেয়সীরূপে তার সাধনায় পুরুষের সর্বপ্রকার উৎকট চেষ্টাকে প্রাণবান করে তোলে' (ভারতবর্ষীয় বিবাহ)। অমিত-র প্রেম-দর্শন— 'চাবার তরেই চাই, পাবার তরে চিত্তে আমার ভাব্না কিছু নাই।' লাবণ্য বলে, 'জীবনের উত্তাপে কেবল কথার প্রদীপ জ্বালাতে আমার মন যায় না। . . আমার জীবনের তাপ জীবনের কাজের জন্যই।' শোভনলাল সেই জায়গাটি পাইয়াছে।

অমিত-র কথা বলা হইয়াছে 'নির্ঝরিণী' (মহুয়া) কবিতায়, যার ব্যাখ্যা কবি স্বয়ং করিয়াছেন শেষের কবিতার গ্রন্থপরিচয়ের অংশে— "তোমার অন্তরে পড়েছে আমার ছায়া, তার সঙ্গে মিলেছে তোমার আনন্দের দীপ্তি, তারই উপলব্ধিতে আমার অন্তরতম কবি উল্লসিত। পদে পদে তোমার আনন্দের ছটায় আমার প্রাণে করে ভাষার সঞ্চার। আমার মন জাগে তোমার ভালোবাসার প্রবাহ-বেগে, তার প্রেরণায় আমার যথার্থ স্বরূপকে জানি, তোমাতেই পাই আমি আমার প্রকাশরূপিণী বাণীকে।"[১]

অমিত-র ন্যায় মানুষ, যাহারা বস্তুতন্ত্রহীন ভাবুকতাচর্চাকে স্বভাবের অঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার সঙ্গে লাবণ্যর ন্যায় নারীর বিবাহ-সংঘটনের পরিণাম— ট্রাজেডি; মধুসূদনের সহিত ভাবুক ধার্মিকা কুমুর বিবাহে যেটি ঘটিয়াছে— সেইটি ঘটিত অমিত-লাবণ্যের বিবাহে— কারণ মধুসূদনের পালটা রূপ অমিত। অমিত ও লাবণ্য দুই 'জাতে'র মানুষ

১ শেষের কবিতা, গ্রন্থপরিচয় অংশ। ৩ ভাদ্র ১৩৪৩।

না হইলেও জীবনের প্রতি উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী এত বিসদৃশ যে মিলন ঘটাইলেও তাহা অ-সবর্ণ বিবাহের সমতুল হইত। লাবণ্য ভালো করিয়াই অমিতকে বুঝাইয়া দিল যে সে তাহার পত্নী হইতে পারে না; তাই সে থাকিল তাহার বান্ধবী। কেটি মিত্তির বা কেতকী-ই অমিতর উপযুক্ত জীবনসঙ্গিনী— তাহারা যথার্থই একজাতের মানুষ। অনেক ভাঙাচোরার পর সকলেরই আপন-আপন প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন ঘটিল; অমিত কেতকীকে, শোভনলাল লাবণ্যকে; এমনকি যতিশংকরের হাতে লিসিকে সমর্পণ করিয়া কবি গল্পের উপসংহার করিলেন। রবীন্দ্রনাথের আর কোনো রচনায়— প্রহসন ছাড়া— এমন ঘটা করিয়া জোড় মিলাইবার আয়োজন ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই।

শেষের কবিতাকে এইভাবে হাস্যোজ্জ্বল করিবার কারণ— আমাদের মতে মনের রিলিফের জন্য। যোগাযোগকে আমরা ট্রাজেডি ছাড়া আর কি বলিব? কুমুর মর্মন্তুদ জীবনসংগ্রাম-কাহিনী বর্ণিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাই তিনি রিলিফ খুঁজিতেছিলেন— যাহার অভিঘাতে এই নূতন উপন্যাসের জন্ম হইল।

কবিমানসে যে রসধারা নিত্য বহমান, তাহারই তরঙ্গাঘাতে নব নব কাব্য রূপ লইতেছে— কখনো গদ্যকাব্য, কখনো লিরিক। নদীপ্রবাহে তরঙ্গ উত্তাল হইলেই আমাদের দৃষ্টিভূত হয়, কিন্তু যখন সে আপাতদৃষ্টিতে স্তব্ধ তখনো নিরবধি তাহার গতি ফল্গুধারায় প্রবাহিত। যোগাযোগ, শেষের কবিতা, মহুয়া সেই নিরবধি চলমান মনোস্রোতের রূপতরঙ্গ। যোগাযোগে প্রেমের দ্বন্দ্ব, শেষের কবিতায় প্রেমের সংলাপ, মহুয়া প্রেমসংগীতে মুখর।

বিচিত্র প্রেমলীলা তরঙ্গে তরঙ্গে উদ্‌ভাসিত, নব নব রূপে প্রকাশিত— স্তরে স্তরে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, ও সূক্ষ্ম হইতে শীকরকণার অনির্বচনীয়তায় রূপায়িত।

শেষের কবিতার আখ্যানবস্তুর মধ্যে প্রেমের লীলাবাষ্প লিরিকধর্মী গদ্যের মধ্যে আপনাকে ধারণ করিতে না পারিয়া মুহুর্মুহু কবিতায় কথা কহিয়াছে। মনের বিশেষ অবস্থায় মানুষ সংগীতে বা ক্রন্দনে যেমন আত্মকথা ব্যক্ত করে, শেষের কবিতার কবিতাগুলি তেমনি স্বতঃপ্রণোদিত প্রকাশ। মহুয়া কাব্যের পাঠপরিচয়ে সম্পাদক বলিয়াছেন যে ভাবের মিল হিসাবে 'শেষের কবিতা'র কবিতাগুলি মহুয়ায় ছাপা হইয়াছে; আমরা বলি এই উপন্যাসের কবিতাগুলির অনিবার্য পরিণতি মহুয়ার কবিতাগুচ্ছ। শেষের কবিতা গদ্য কাব্যের কবিতাময় রূপ হইতেছে মহুয়া, যেমন 'যাত্রী'র কাব্যময় রূপ দেখিতে পাই 'পূরবী'র মধ্যে।

যোগাযোগ ও শেষের কবিতা রবীন্দ্রনাথের সাতষট্টি বৎসর বয়সে লেখা। বিশ বৎসর বয়সে রচিত 'বউ ঠাকুরানীর হাট'। পঁচিশ বৎসর বয়সে 'রাজর্ষি' বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্টিক উপন্যাসের ধারায় রচিত। চল্লিশ বৎসর বয়সের পর 'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি' গতানুগতিকের পথ হইতে প্রথম পদচারণ। অসামাজিক কোনো ঘটনা অবতারণ তখনও করিতে সাহসী হন নাই, অথবা তাঁহার মতের মধ্যে বিপ্লবের বাণী আসে নাই। আটচল্লিশ বৎসর বয়সে 'গোরা' লেখেন; সেখানে সমাজকে আঘাত করিয়াছেন, কিন্তু প্রকাশ্যে ভাঙিবার ইঙ্গিত দেন নাই। ইহার পর য়ুরোমেরিকার সফরান্তে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে তাহার পঞ্চাশ বৎসরে 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরেবাইরে' যুগান্তকারী উপন্যাসদ্বয় রচিত হইল। এই সময়ে তাঁহার কাব্যের রূপান্তর হইল 'বলাকা' কবিতাগুচ্ছে। এই দুই উপন্যাসে কবি নরনারী সম্বন্ধে যে জটিলতা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বাংলার হিন্দুসমাজকে আঘাতই করে। দামিনী ভালোবাসে শচীশকে, কিন্তু বিবাহ করিল শ্রীবিলাসকে। পরিণয়ই যে প্রেমের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, তাহা স্বীকৃত হইল না। ইহার পর 'ঘরে বাইরে'তে সমাজের চিরাচরিত নীতিবোধের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানিলেন সমাজজীবনে সতীত্বের পরীক্ষা দিয়া। ভাবে ও ভাষায় আধুনিকতার সূত্রপাত হইল 'সবুজ পত্র' যুগে।

ইহার তেরো বৎসর পরে কবির সাতষট্টি বৎসর বয়সে যোগাযোগ ও শেষের কবিতার আবির্ভাব। তখন

বাংলাদেশে 'নূতন' সাহিত্যের জন্য যুবমনে চাঞ্চল্যের আভাস দেখা দিয়াছে এমন সময়ে শেষের কবিতার আবির্ভাব; চকিত করিয়া তুলিল তাহাদের চঞ্চল মনকে। বুদ্ধদেব বসু তখন তরুণ ছাত্র; তাঁহার মনে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা তিনি চৌদ্দ বৎসর পরে এইভাবে লিখিয়াছিলেন, 'আমরা যা-কিছু করবার চেষ্টা করছিলাম অথচ ঠিক পারছিলাম না, সেই সবই রবীন্দ্রনাথ করেছেন— কী সহজে কী সম্পূর্ণ ক'রে কী অনিন্দ্যসুন্দর ভঙ্গীতে। মনে হলো বইটা যেন আমাদের অর্থাৎ নবীন লেখকদের উদ্দেশ্য করে লেখা। আমাদের শিক্ষা দেবার জন্য এটি গুরুদেবের তীব্র মধুর ভর্ৎসনা।'[১]

বাংলা গদ্য যে কত সাবলীল ও স্বচ্ছন্দগতি হইতে পারে, তাহার আদর্শ স্থাপন করিল এই উপন্যাস। তবে আমাদের মনে হয়, 'শেষের কবিতা'র লিরিক্যাল রূপে যেন একটু বেশি রঙ লাগানো-- অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রসাধন। 'চতুরঙ্গে'র মধ্যে লিরিসিজমের যে সংহত ও সহজ মূর্তি ফুটিয়াছে, তাহা এই উপন্যাসে অতি-কথন ও অতি-রঞ্জনে যেন আচ্ছন্ন।

'শেষের কবিতা' ও তৎপরবর্তী উপন্যাস গল্প ও নাটক পড়িতে পড়িতে আর একটি কথা মনে হয়— মাটির সঙ্গে কবির স্বাভাবিক বন্ধন যেন শিথিল হইয়া যাইতেছে। পদ্মার চর হইতে অনেক দূরে, এমনকি 'গোরা'র পরিবেশ হইতেও বহু দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন। 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে বাইরে'র মধ্যে সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর দূরাগত হইলেও দুর্বোধ হয় নাই। কিন্তু 'শেষের কবিতা' ও পরবর্তী যুগের কাহিনীগুলিতে আমরা যে রবীন্দ্রনাথকে পাই তিনি শিল্পী আর্টিস্ট— পায়ের তলার সহজ মৃত্তিকার স্পর্শ যেন ক্ষীণ। তাঁহার গল্পের নায়ক-নায়িকারা সাধারণের নাগালের বাহিরের লোক, তাহাদের সংলাপ তাহাদের ভাবভঙ্গী তাহাদের চালচলন সবই অ-সাধারণ অপূর্ব অ-ভাবিত। কবির শেষজীবনে যেসব নরনারী নানাভাবে নানা রসে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার পার্শ্বে আসিয়াছিল, তাহাদের ছায়া উপছায়া তাঁহার কাহিনীতে মূর্ত হইয়াছে; ইহারা তাঁহার অবচেতন চিত্তের গহন হইতে কোনো প্রসন্ন সুযোগে লেখনীকে আশ্রয় পাইয়া মুখর হইয়াছে।

১ কবিতা, ১৩৪৯ কার্তিক।

কানাডা ও জাপানে

সুদূর কানাডা (Canada) হইতে রবীন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণ আসিয়াছে। কানাডা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যান্তর্গত কলোনি[১] হইলেও বহু বিষয়ে তাহার স্বাধীনতা প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে সে পাইয়াছিল। কানাডা নূতন দেশ— এখনও শতাব্দীকাল উত্তীর্ণ হয় নাই— যখন সে তাহার সাম্প্রদায়িক বিবাদ ভাষাগত মতভেদ প্রভৃতি লইয়া বিব্রত ছিল। কয়েক দশকের মধ্যে তাহারা আশ্চর্য উন্নতি করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথকে যে প্রতিষ্ঠান আহ্বান করিয়াছে তাহার নাম National Council of Education— তিন বৎসর অন্তর এই সম্মেলন আহূত হয়। ১৯২৯এ চতুর্থ সম্মেলন। ১৯১৬-১৭ সালে রবীন্দ্রনাথ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বক্তৃতা-সফরে আসেন, এই প্রতিষ্ঠান বোধ হয় তার পরেই স্থাপিত হয়। তাহা ছাড়া, প্রথম মহাযুদ্ধে কানাডা য়ুরোপে সৈন্য প্রেরণ করিয়া বৃহত্তর পৃথিবীর একটু পরিচয়ও লাভ করে। বোধ হয় এইসব কারণে কানাডার শিক্ষাশাস্ত্রীরা মনে করিয়াছিলেন যে, বৃহত্তর জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্জিত হইয়া শিক্ষা কখনও তার সম্পূর্ণ ফললাভ করিতে পারে না। অপরের সঙ্গে সম্বন্ধ না রাখিয়া যে-শিক্ষার ব্যবস্থা হয়, তাহাতে বুদ্ধিগত দৈন্য এবং আদর্শের অভাব নিঃসন্দেহে দেখা দেয়। প্রত্যেক জাতিরই অপরকে দিবার মত সম্পদ কিছু আছে, এবং অপরের কাছ হইতে শিক্ষা করিবারও আছে। এইজন্যই সম্মিলিত আলোচনা সভায় অন্যান্য দেশের সহযোগিতা আহ্বান করা হইয়াছে।[২]

কানাডার এই শিক্ষাপরিষদ ও বিশ্বভারতীর শিক্ষাদর্শের মধ্যে একটা মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায়; বোধ হয়, সেইজন্য কানাডার জাতীয় শিক্ষাপরিষদ ভারতের শিক্ষাদর্শনের প্রতীকরূপে রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিনবার আসিয়াছেন— কানাডা হইতে আমন্ত্রণও পান; কিন্তু ভারতীয়দের সেদেশে প্রবেশাধিকার সম্বন্ধে বহু নিয়মনিষেধ থাকার জন্য উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন; তাহা লইয়া সে-সময়ে বিলাতী পত্রিকাদিতে ব্যঙ্গচিত্রও বাহির হয়। যুদ্ধোত্তরপর্বে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ নানাভাবে পরিবর্তিত হওয়ায় বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধে কবি কানাডার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। সকলেই বলিলেন কবি যে আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও মিলনের জন্য উৎসুক কানাডায় গমন করিলে তাহা সার্থক হইবে; তা ছাড়া সেখানে নানা দেশের শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষাসঞ্চালকগণ উপস্থিত হইবেন— তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবার অনুকূল পরিবেশ পাওয়া যাইবে।

কবির সঙ্গে চলিলেন অধ্যাপক টাকার (Boyd G. Tucker), অপূর্বকুমার চন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। টাকার সাহেব আমেরিকান, মেথডিস্ট মিশনের সহিত যুক্ত, কয়েক বৎসর হইল ঐ মিশন ইহাকে বিশ্বভারতীর কার্যে সহায়তা করিবার জন্য আসিয়াছেন। অপূর্বকুমার তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক— ইঁহার সহিত আমাদের পূর্বে দেখা হইয়াছে। সুধীন্দ্রনাথ তরুণ কবি, 'পরিচয়' নামে অভিজাত পত্রিকার সম্পাদক, কবির সুহৃৎ অ্যাটর্নী হীরেন্দ্র-

১ কানাডা। ১৯৩১ জুন ৩০ ওয়েস্টমিনিস্টার স্ট্যাটিউট অনুসারে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অংশীদাররূপে স্বীকৃত হয়। আমাদের আলোচ্য-পর্বে গবর্নর-জেনারেল ব্রিটিশ ক্যাবিনেট হইতে মনোনীত হইয়া যাইতেন। মাদ্রাজের ভূতপূর্ব গবর্নর লর্ড উইলিংডন এই সময়ে কানাডার গবর্নর-জেনারেল।

২ Education in any country must necessarily fail to achieve its full purpose unless it maintains the closest contact with the world at large. Isolation educationally will inevitably lead to intellectual stagnation and to dearth of ideal. Each nation has its contribution to make and each has much to learn from others. For this reason the co-operation of other countries at the conference is being sought.

নাথ দত্তের পুত্র ; হীরেন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল বিশ্বভারতীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সুধীন্দ্রনাথের মনস্বিতা ও রসগ্রাহিতায় রবীন্দ্রনাথ খুবই মুগ্ধ, তাহার প্রমাণ আমরা পরেও পাইব।

কবি ও তাঁহার সঙ্গীরা ২৬ ফেব্রুয়ারি (১৪ ফাল্গুন ১৩৩৫) কলিকাতা হইতে বোম্বাই যাত্রা করিলেন— সেখানে জাপানযাত্রী 'নলদেরা' জাহাজ ধরিবেন। ট্রেনে বসিয়া কবি সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'মহাভারত' নামে বইখানি সংক্ষিপ্ত করিয়া প্রকাশনের জন্য কাটাছাটা করিতেছেন। পরে (১৩৩৮, ২৫ বৈশাখ) উহা 'কুরুপাণ্ডব' নামে প্রকাশিত হয়।

বোম্বাইএর পথে রানী দেবীকে পত্র লিখিতেছেন[১]— "বোম্বাইএ পৌঁছিয়ে অম্বালালের আতিথ্যভোগ করছি। তিনি আমাদের হোটেলে রেখেছেন।" হোটেলে পৌঁছিয়া দেখেন তাঁহার বাক্স-পেঁটরার চাবি কলিকাতায় রহিয়া গিয়াছে। "হোটেলে এসে নতুন চাবি সংগ্রহের কাজে লেগেছি। তৎক্ষণকার মতো ভদ্রতা বাঁচিয়ে চলবার সরঞ্জাম কিছু কিছু আছে।" পরদিন প্রাতে তাঁহাদের বাড়ির নায়েব পুরাতন কর্মী গোপাল চাটুজ্জে চাবি লইয়া উপস্থিত হইলেন ; সেইদিন (১ মার্চ) অপরাহ্ণে 'নলদেরা' বোম্বাই ছাড়িল।

কবির জন্য 'যুগল ক্যাবিনের' ব্যবস্থা হওয়ায় খুশি আছেন। কানাডার লেকচার লেখা শুরু করিলেন।

কলম্বোতে জাহাজ অল্পকালের জন্য থামে (৪ মার্চ), তার পর পেনাঙেও (৮ মার্চ) বেশিক্ষণ নয়। সিঙাপুরে (১০ মার্চ) যখন পৌঁছিলেন, তখন আকাশ ঘনমেঘাচ্ছন্ন। তবুও স্থানীয় ভারতসমিতির সভাপতি জনাব আর. জুমাভাই ও অন্যান্য সদস্যেরা জাহাজে আসিয়া কবির সহিত দেখা করিয়া গেলেন। দ্বিপ্রহরে নেমাজী সাহেব কবির সম্মানার্থে যে ভোজসভা করেন, তাহাতে বহু ভারতীয় উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর হংকঙে জাহাজ আসিলে (১৫ মার্চ) নেমাজী-পরিবারের একজন ধনী ব্যবসায়ী কবি ও তাঁহার সঙ্গীদের অতিথিরূপে সাদরে গ্রহণ করিলেন। মধ্যাহ্নভোজ হইল মালয়ের গবর্নর সার্ সেসিল ক্লেমেন্টি (Clementi)-র সরকারী আবাসে। সেই অপরাহ্ণে সিন্ধী হিন্দু-বণিকদের সভায় কবি-সংবর্ধনা। কবি প্রতিমা দেবীকে লিখিতেছেন, "আমাকে হংকঙের ভারতীয়েরা একটা রুপোর বাক্সে ৮০০ টাকা উপহার দিয়েছে, বাক্সটা একদা তোমার ঘরেই পৌঁছবে। যদিও টাকাটা বিশ্বভারতীর।"[২] দাতাদের ইচ্ছা ঐ টাকা শান্তিনিকেতনের নারীবিভাগের জন্য ব্যয়িত হয়। তাই বোধ হয় প্রতিমা দেবীকে লিখিতেছেন, "শান্তিনিকেতনে মেয়েদের দেখবার কর্তৃত্ব তোমরা যদি নিতে পার তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হই।" আশ্রমবাসিনীরা এই ভার লইলে তিনি সুখী হইবেন এ কথা বহুবার বলিয়াছেন।

১৯ মার্চ শাংহাই বন্দরে জাহাজ ভিড়িল। "এখান থেকে নেমে দুদিনের জন্য · · সু[সীমো]-র বাড়িতে ছিলুম, ভালো লাগেনি, অত্যন্ত ক্লান্ত করেছিল, তার প্রধান কারণ নূতন জায়গায় মন তার গায়ে মাপ পায় নি, চার দিকে এখানে ঠেকে ওখানে ঠেকে আর তার উপর দিনরাত আদর অভ্যর্থনা গোলমাল।"[৩] মধ্যাহ্নে চীনা সেনাপতি Chiang Fang Chen-এর বাড়িতে আহার ও রাত্রিতে ভারতীয় বাসিন্দাদের ব্যবস্থায় ভোজ— এসব খুবই ক্লান্তিকর — তবুও হাসিমুখে সব মানিয়া লইতে হয়। ইহার উপর আছে সাংবাদিকদের মোলাকাত— তাহাদের প্রশ্নবাণের জবাব।

১ পথে ও পথের প্রান্তে, পত্র ২৮ ; ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯।

২ চিঠিপত্র ৩, পত্র ৩২ ; ৩ চৈত্র ১৩৩৫।

৩ পথে ও পথের প্রান্তে, পত্র ৩৩ ; ৯ই চৈত্র ১৩৩৫ [২৪ মার্চ ১৯২৯]।

জাপানের বন্দর মোজি[১] (২২-এ) হইয়া কবি কোবে পৌঁছিলেন ২৪ মার্চ এবং য়োকোহামা আরও দুই দিন পরে। কলিকাতা ছাড়ার ঠিক এক মাস পরে য়োকোহামা হইতে মোটরযোগে কবি টোকিয়ো মহানগরীতে পৌঁছিলেন। কবি লিখিতেছেন, "টোকিয়োতে এসে এক বিখ্যাত হোটেলে আশ্রয় নিয়েছি। বিখ্যাত হোটেলগুলি যে অর্থসম্বল কিংবা আরামের পক্ষে উপযোগী তা নয়, কিন্তু যেহেতু দুর্ভাগ্যক্রমে আমিও বিখ্যাত সেইজন্যে আমাকে আমার বিখ্যাত সমান মাপের উপদ্রব সহ্য করতে হয়। ছোটো জায়গায় লুকোনো সহজ, কিন্তু জগতে আমার লুকোবার পথ বন্ধ।"[২]

টোকিয়োতে দুই দিন ছিলেন। ২৭ মার্চ কবি লিখিতেছেন, "আজ টোকিওতে আমার তিনটে নিমন্ত্রণ আছে— বেলা একটা থেকে রাত্রে ডিনার পর্যন্ত গড়াবে।" দ্বিপ্রহরে Ashahi সংবাদপত্রমালিকদের, অপরাহ্ণে নিচি-নিচি কাগজের ও রাত্রে জাপানী মহিলা মহাবিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণে যথাবিধি লাঞ্চ চা ডিনার। সন্ধ্যায় আশাহিদের হল ঘরে কবি-সংবর্ধনা হয়। কবির ভাষণ দোভাষী জাপানীতে তর্জমা করিয়াছেন। সেই রাত্রে "মোটর করে য়োকোহামা"য় যান এবং তার পরদিন (২৮ মার্চ) "ভারতীয়দের নিমন্ত্রণে মধ্যাহ্নভোজন সেরে বেলা তিনটের সময় কানাডায় পাড়ি" দিলেন।[৩]

দশ দিনে প্রশান্তমহাসাগর অতিক্রম করিয়া এম্‌প্রেস অব্‌ এশিয়া স্টীমার ভিক্‌টোরিয়া বন্দরে পৌঁছিল (৬ এপ্রিল)। ভিক্‌টোরিয়া বোম্বাইএর মতো দ্বীপে অবস্থিত— কানাডা ফেডারেল স্টেটের অন্যতম প্রদেশ ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার রাজধানী। কিন্তু আসল মহানগরী হইতেছে সমুদ্রের খাড়ির অপর পারে— ভ্যান্‌কুভারে। কবি ভিক্‌টোরিয়া পৌঁছিলে স্থানীয় ভারতীয়— প্রধানত শিখরা— কবিকে স্বাগত করিল। সেইদিনকার Daily Times লিখিতেছে যে শিক্ষা-সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ আসিতেছেন এই সংবাদ রেডিয়ো মারফত প্রচারিত হয়, তার ফলে কানাডা ও মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের নানা বিশ্ববিদ্যালয়, সভাসমিতি হইতে টেলিগ্রাফ ও কেব্‌লে আমন্ত্রণের বন্যা আসিতে আরম্ভ করিল।[৪]

কবি যেদিন ভিক্‌টোরিয়া পৌঁছিলেন, সেইদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে এন্‌ড্রুজ আসিয়া কবির সহিত মিলিত হইলেন। পাঠকের স্মরণ আছে গত বৎসর কবি বিলাতযাত্রার পূর্বকালে মাদ্রাজের পথে অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাঁহাকে সিংহলে রাখিয়া এন্‌ড্রুজ বিলাত যাত্রা করেন (১৯২৮ জুলাই ৫)। তিনি ভারতীয় শ্রমিকসমস্যা ও প্রবাসন (emigration) বিষয়ে ব্রিটিশ কলোনিসমূহের 'জাতিভেদ' নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। এ ছাড়া আরও উদ্দেশ্য ছিল। মিস মেয়ো 'মাদার ইন্‌ডিয়া' নামে যে গ্রন্থ লিখিয়া জগতময় ভারতের কুৎসা এবং তাহার সংস্কারগত মূঢ় আচারসমূহের অতিরঞ্জিত ও বীভৎস বর্ণনা দ্বারা ভারতনিন্দা প্রচার করিতেছেন— তাহার প্রতিষেধকরূপে ভারতের শাশ্বতবাণী ও জীবন-আদর্শ প্রকাশ। এই সংকল্প লইয়া এন্‌ড্রুজ এবার ইংলণ্ডে যান। এন্‌ড্রুজের জীবনে আধুনিক ভারতের দুই প্রতীক রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী সমভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সেইজন্য

১ "কাল জাপানি বন্দরে এসেছি— নাম মোজি [Commercial seaport city on Shimonoseki strait, opposite the city of Shim.]। আগামী কাল পৌঁছব কোবে।" —পথে ও পথের প্রান্তে, পত্র ৩৩।

২ পথে ও পথের প্রান্তে, পত্র ৩৪।

৩ পথে ও পথের প্রান্তে, পত্র ৩৪ ; ২৭ মার্চ ১৯২৯।

৪ "He has been deluged with invitations by cable and telegraph to speak before various universities, clubs and literary organizations throughout Canada and the United States." — The Daily Times, Victoria B. C. 6 April 1929।

তিনি রবীন্দ্রনাথের ও গান্ধীর চিন্তাধারা প্রচারে ব্রতী হন। এন্‌ড্রুজ এই অল্প সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের *Letters to a Friend, Thoughts from Tagore Birthday Book* সম্পাদন করিয়া বিলাতে প্রকাশ করিলেন। আর *Mahatma Gandhi's Ideas* নামে গ্রন্থ লিখিয়া বিলাতী প্রকাশকদের নিকট দিয়া আসেন (১৯২৯)। আধুনিক জগতের দুই শ্রেষ্ঠ মনীষী রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর সরল অনাড়ম্বর কাহিনী শুনানো তাঁহার জীবনের ব্রত।[১]

মিস্ মেয়ো-র 'মাদার ইন্‌ডিয়া' গ্রন্থের পাল্টা জবাবে অনেকে য়ুরোমেরিকার সমাজের বীভৎসতার বর্ণনা দিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন; কিন্তু এন্‌ড্রুজের উত্তর হইয়াছিল পজিটিভ— ভারতের শাশ্বতবাণী— অহিংসা ও বিশ্বমানবতা।

ভিক্‌টোরিয়াতে ভারতীয় হিন্দু ও শিখরা কবিকে এবং এন্‌ড্রুজকে প্রথমদিনেই সংবর্ধিত করিল: রবীন্দ্রনাথ 'মেহমন' মহাকবি, তাঁহাকে তো সম্মান করিতেই হইবে, আর এন্‌ড্রুজ— শ্রমদরদী দীনবন্ধু, তাঁহাকে তো অন্তরের ভালোবাসা জানাতেই হইবে।[২]

কবি যেদিন ভিক্‌টোরিয়ায় পৌঁছিলেন, সেই দিন সন্ধ্যায় শিক্ষাপরিষদের সভা; কানাডার নানা প্রদেশ মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র অস্‌ট্রেলিয়া নিউজীলণ্ড ব্রিটেন জাপান প্রভৃতি দেশ হইতে প্রতিনিধিরা উপস্থিত। কানাডার রাজধানী অটোয়া হইতে গবর্নর-জেনারল লর্ড উইলিংডন সস্ত্রীক উপস্থিত। এবারকার শিক্ষাপরিষদের আলোচ্য বিষয় শিক্ষা ও অবসর (Education and Leisure); এই বিষয়টি কয়েকটি উপবিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, যেমন— (a) Literature, (b) Music and Drama, (c) Organised recreation, Hobbies, Handicrafts, (d) Health in relation to leisure, (e) Radio, (f) Cinema। রবীন্দ্রনাথের ভাষণের বিষয় ছিল অবসরতত্ত্ব।— The Philosophy of Leisure.

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য যে মানুষ কর্মপ্রবাহে নিরন্তর শ্রমরত; এই শ্রম উন্নতির বা প্রোগ্রেসের (progress) জন্য। প্রোগ্রেস বা উন্নতির প্রচেষ্টা সমভাবে জগতে দুঃখ ও সুখ আনিতেছে। প্রকৃতির স্তব্ধ শক্তিসমূহকে মুক্ত করাই মানুষের চরম লক্ষ্য। মানুষ সদাই কর্মরত, পুঞ্জীভূত বস্তুরাশি উৎপাদনই তাহার জীবনের লক্ষ্য। সংগ্রহ করিবার দিকে তাহার ব্যস্ততার ও গৃধ্নুতার শেষ নাই। কেবল এই নিরবচ্ছিন্ন কর্মপ্রবাহের মধ্যে নাই তাহার বিশ্রাম— মনের অবসর নাই, অন্তরের শান্তি নাই। মানুষ মনের যে শান্ত পরিবেশে বিশ্বকে আর্টিস্টের দৃষ্টিতে উপভোগ করিতে পারে, তাহা ক্রমশই সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। পশ্চিমের আধুনিক আদর্শ Time is money; কিন্তু কবি বলেন Leisure is wealth— অবসর হইতেছে ঐশ্বর্য।

কবি বলেন যে A true gentleman is the product of patient centuries of cultivated leisure— বহু শতাব্দীর সাধনলব্ধ অবসরের ফলে মানুষ 'ভদ্র' হইয়াছে। জাপানে তিনি মানবচরিত্রের দুইটি দিক লক্ষ্য করিয়াছিলেন— একটি প্রাচীন সমাজ-আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত— সৌন্দর্যপ্রিয়তা ও ব্যক্তিগত ব্যবহারনীতি; অপরটি তাহার অর্থগৃধ্নুতা। এক শতাব্দীর মধ্যে জাপানের এই পরিবর্তন— the mighty spirit of progress বা প্রোগ্রেসের উন্মাদনায় সে তাহার জাতীয় বুনিয়াদি হইতে বহুদূরে সরিয়া আসিতেছে। চীন তখন চরম দুর্গতির মধ্যে নিমজ্জিত— কবি বলিতেছেন— "China also has had her rousing through a series of helpless years, and I am sure she also will master before long the instrument which hurt her to the quick"। কবির এই ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছে— চীনের কেবল রূপান্তর হয় নাই, তাহার ভাবান্তর হইয়াছে।

১ দ্র. Sykes, *Life of C. F. Andrews*, p. 288।

২ Address to the Sikh community in Canada (Reported from memory by C. F. Andrews), Modern Review 1929।

অবসরতত্ত্ব সম্বন্ধে কবির মতের নানারূপ সমালোচনা হইল। এই ভাষণে কবি যাহা বলেন, তাহা তিনি নানাভাবে নানাসময়ে বাংলায় ও ইংরেজিতে বলিয়াছেন, মানুষের বিরামহীন কর্মপ্রচেষ্টার নিন্দা এই প্রথম নহে। এইবারকার ভাষণে কবি বলেন কর্মব্যস্ত অবসরহীন মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারার মধ্যে একটি সুষম আধ্যাত্মিক তথা ধর্মীয় ভাবের প্রয়োজনীয়তা আছে। একজন সমালোচক বলেন কবি তাঁহার ভাষণে grouped a wide variety of reflections on life। অপর একজন বলিলেন কবি যাহাই বলুন দুই পুরুষ পূর্বে সাধারণ লোকে যে পরিমাণ বিশ্রাম পাইত, বর্তমান যুগে মেশিনের কল্যাণে তাহার আরাম ও বিরাম অনেক বেশি। একজন বলিলেন যে যাঁহারা কবির বাণীতে উচ্ছ্বসিত হইয়াছেন, তাহারা কানাডার জীবনধারার পরিবর্তে ভারতের জীবনযাত্রা বিনিময় কি কখনো করিবেন? একখানি পত্রিকার সাংবাদিক কবির পাশ্চাত্য সভ্যতার সমালোচনা উদ্ধৃত করিয়া লিখিলেন, 'Perhaps the shadows are blocked into the picture too deeply'। তবে সমালোচক সার্ অলিভার লজ (Lodge)-এর যে মত উদ্ধৃত করিয়া দেন, তাহা রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যেরই অনুকূলে যায়। গ্যেটেও বলিয়াছেন, Intellectual emancipation, if it does not give us at the same time control over ourselves, is poisonous। আমাদের মনে হয় ভাষণের সংক্ষিপ্ততার জন্য কবির বহু কথা শ্রোতা-পাঠকদের সম্পূর্ণ বোধগম্য হয় নাই, he talked over nine-tenths of his audiences' head। এবং অনেকে অতি-ক্রিটিক্যাল ভাবে উহার কদর্থও করিয়াছিলেন।[১]

রবীন্দ্রনাথের জীবনকথা যাঁহারা জানেন, তাঁহারা কবি সম্বন্ধে এইটুকু সংবাদ রাখেন যে তিনি বিজ্ঞান বা আধুনিক যন্ত্রশিল্প ও মিতশ্রমিক যন্ত্রাদির নিন্দা কোনোদিনই করেন নাই; তাঁহার সমস্ত অভিযান অর্থগৃধ্নুতার বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে— যে শোষণের ফলে সাধারণ মানুষ বিপর্যস্ত এবং বিদ্রোহী; যেজন্য সে সমাজে যুগান্তরকারী বিপ্লব ঘোষণা করিতে উদ্যত।

ভিক্টোরিয়াতে এই সভা হইল। পরদিন ভ্যান্‌কুভারে পৌঁছিলেন। ভ্যান্‌কুভার বিশাল নগরী। এখানকার বৃহত্তম হলে শিক্ষাসম্মেলনের যে অধিবেশন হইল (৮ এপ্রিল), তাহাতে কবি 'সাহিত্যের ধর্ম' (The Principles of Literature) সম্বন্ধে ভাষণ দিলেন। 'ভ্যান্‌কুভার সান্' নামে দৈনিক লিখিল যে বহু শত লোক কবিকে দেখিতে ও তাঁহার কথা শুনিতে আসে— কিন্তু স্থান পায় নাই। বক্তৃতা আরম্ভ হইয়া গেলেও জনতা পংক্তিবদ্ধভাবে অপেক্ষা করিতে থাকে, যদি কেহ বাহির হইয়া আসে তাহার স্থান একজন পাইবে। More than any other delegate to this Conference he seized their imagination. They paid him the respect due to intellect।

সাহিত্যের ধর্ম সম্বন্ধে কবি যে ভাষণ দিলেন তাহাতে নূতন কথা বিশেষ কিছু নাই— বাংলায় ইতিপূর্বে তাহার আলোচনা করিয়াছেন। কবি বক্তৃতার শেষ দিকে বলেন, "I believe that my hosts did not expect only practical help from me, but only a stimulation in the shape of a surprise, shock of a contrast. In this feast you had your food materials supplied by your co-workers in the hemisphere described as the New World, but evidently you wanted some wine of an exotic flavour from a vintage which is old"।

১ তু. "দেবযানী কচকে অভিসম্পাত দিয়েছিল, ·· তোমার জ্ঞানসাধনার ধন তুমি নিজে ব্যবহার করতে পারবে না, অন্যকে দান করতে পারবে। যদি এই অভিসম্পাত আজ দিত কেউ য়ুরোপকে, তাহলে সে বেঁচে যেত। বিশ্বের জিনিসকে নিজের জিনিসের মতো ব্যবহার করেই ওরা লোভের তাড়ায় মরছে।" শেষকথা, নভেম্বর ১৯৩৯। দ্র. তিনসঙ্গী।

কানাডার অদূর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কবি বক্তৃতা-শেষে যাহা বলেন তাহা গত কয় দশকের মধ্যে সার্থক হইয়াছে: "Canada being a young country is full of possibilities that are incalculable . . Her creative youth is still before her, and the faith needed for building up a new world is still fresh and strong··· Canada is too young to fall a victim to the malady of disillusionment and scepticism, and she must believe in great ideals in the face of contradiction"।

কানাডা ছাড়িবার পূর্বে কবিকে কত সাংবাদিকের কাছে কত কথা বলিতে হইয়াছিল, তাহার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। কানাডায় কবি দশ দিন ছিলেন। ভ্যান্‌কুভার ছাড়িবার পূর্বে কবি অপূর্বকুমার ও এন্‌ড্রুজকে লইয়া বড়লাট লর্ড উইলিংডনের সহিত দেখা করিয়া আসিলেন।

ভ্যান্‌কুভার হইতে রেলপথে কবি ও তাঁহার সঙ্গীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্দর-নগরী লস্ এন্‌জেলিস (Los Angeles) পৌঁছিলেন (১৮ এপ্রিল)। যুক্তরাষ্ট্রের বহুস্থান হইতে কবির নিমন্ত্রণ আসিয়াছে— কালিফোর্নিয়া ডেট্রয়েট কলোম্বিয়া ওয়াশিংটন হার্ভার্ড্ প্রভৃতি। লস্-এন্‌জেলিস বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি ছাত্রদের সমক্ষে একটি ছোটো বক্তৃতা একদিন দিলেন (১৯ এপ্রিল)।

ইহার পর পূর্বদিকে যাত্রার আয়োজন চলিতেছে— কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে তাহা বাধাগ্রস্ত হইল, সমস্ত প্ল্যান বদলাইয়া গেল।

কবির পাস্‌পোর্টখানি খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছিল না. নূতন পাস্‌পোর্ট করাইবার জন্য কবিকে এন্‌ড্রুজ ও টাকার-এর সহিত পাস্‌পোর্ট অপিসে যাইতে হয়। সেখানে কবিকে অকারণে বহুক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয় এবং তাহার পর অপিস-ঘরে গেলে তাঁহাকে নানাবিধ প্রশ্ন করা হয়— তিনি লেখাপড়া জানেন কিনা, তাঁহার টাকা আছে কিনা, ফিরিবার পাথেয় পর্যাপ্ত কিনা— সে অর্থ না থাকিলে তাঁহাকে কী শাস্তি পাইতে হইবে ইত্যাদি মামুলি প্রশ্ন, যাহা অফিসাররা এশিয়ান প্রবাসনপ্রার্থীদের করিতে অভ্যস্ত, তাহা করিয়া যায়। এমিগ্রেশন অপিসের এই অদ্ভুত ব্যবহারে কবির সঙ্গী টাকার সাংবাদিকদের নিকট অত্যন্ত তীব্রভাবে মন্তব্য করেন, রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় কোনো কথা কাহাকেও বলেন নাই— কেবল ঐ দেশ ত্যাগ করাই স্থির করেন। পরদিন (২০ এপ্রিল) কবি অপূর্ব-কুমারকে লইয়া লস্-এন্‌জেলিস ত্যাগ করিয়া জাপানযাত্রা করিলেন। টাকার আপন দেশে থাকিয়া গেলেন, এন্‌ড্রুজ দক্ষিণ-আমেরিকার ব্রিটিশ গিয়েনায় ভারতীয় শ্রমিকদের অবস্থা পরিদর্শনের জন্য চলিয়া গেলেন। জাপানে পৌঁছিবার কয়েকদিন পরে আমেরিকানদের দৈনিক কাগজ The Japan Adviser (১১ মে)-এর সাংবাদিক কবির কাছে লস-এনজেলিসের ঘটনা সম্বন্ধে জানিতে চাহিলে তিনি আনুপূর্বিক ঘটনা বলিয়াছিলেন। কবি বলেন, "I am very glad that the officer did not treat me differently because I might have some reputation but treated me as an Oriental and as a coloured man. The oridnary civility between gentleman and gentleman was lacking in his treatment, but this was entirely due to the fact that he had been dealing with Asiatics and the Immigration Regulations had given his attitude of mind"।

জাপানে

আমেরিকা হইতে কবি ২০ এপ্রিল 'তোয়ামারু' জাহাজে জাপানযাত্রা করিলেন ; পথে হাওয়াই দ্বীপের হনলুলুতে জাহাজ থামে ; পূর্বে ১৯১৬ সালে এই পথে আমেরিকা হইতে জাপানে ফিরিবার সময়ে তিনি একদিন ছিলেন ; এবার আর জাহাজ হইতে নামিলেনই না। জাহাজেও সাংবাদিকের আক্রমণ হইতে নিস্তার নাই। তাহারা *Mother India* সম্বন্ধে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করে। বৃহত্তর ভারত ভ্রমণকালে কবি এই গ্রন্থ সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত লিখিয়া বিলাতের ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। দুই বৎসর পরে এই গ্রন্থ ও লেখিকা সম্বন্ধে সাংবাদিকদের কৌতূহল জাগ্রত হওয়ার প্রত্যক্ষ কারণ এই সময়ে এন্‌ড্রুজের কোনো রচনা। এন্‌ড্রুজ ১৯২৯-এর জানুয়ারি মাসে ইংলণ্ড হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসিয়া মিস্ মেয়োর সহিত সাক্ষাৎ করেন। ৫ ফেব্রুয়ারি তিনি রবীন্দ্রনাথকে এক পত্রে লেখেন— "I could not feel at all indignant with her, but could only feel that she was the very extreme opposite of all that we hold dear in the East. After the meeting he felt that he should withdraw the charge of 'political motive', which he had made originally against her. 'She clearly has political bias', he said, 'but I had no right to ascribe 'motive' " ।[১]

মিস্ মেয়ো সম্বন্ধে এই মত ব্যক্ত করায় এন্‌ড্রুজ মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের ভারতীয়দের নিকট হইতে খুবই ধিক্কৃত হন। বোধ হয় এই সব লেখালেখির অভিঘাতে সাংবাদিকদের মনে মাদার ইন্‌ডিয়া সম্বন্ধে প্রশ্নের উদয় হয়।

রবীন্দ্রনাথ সাংবাদিকদের বলেন যে এই গ্রন্থ প্রকাশের ফলে উভয় দেশের মধ্যে সম্বন্ধ বিষাক্ত হইয়াছে (the publication of this book has done more in poisoning our mutual relationship than anything in recent happenings)। এই মহিলা তাঁহার গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের মত বলিয়া এমন-সব কথা বলিয়াছেন, যাহা তাঁহার পক্ষে বলা বা ভাবাও অসম্ভব। এ ছাড়া শতাব্দীপূর্বে লিখিত কোনো বিদেশীর গ্রন্থ হইতে ঘটনা উদ্‌ধৃত করিয়া তিনি সেগুলি বর্তমান ভারতের বলিয়া চালাইয়া দিয়াছেন ; এইরূপ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া কবি বলিলেন, "I donot feel any enthusiasm in contradicting this book. Knowing that most of her readers are not interested in truth but in a piece of sensationalism that has the savour of rotten flesh. Now that this woman has discovered a mine of wealth in an unholy business of killing reputations, no appeal to truth will ever prevent her from plying a practised hand in wielding her assassin's knife, carefully choosing for her victims those who are already down"। মিস্ মেয়োর এই গ্রন্থ[২] পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। হঠাৎ পৃথিবীর সর্বদেশের শিক্ষিতসমাজের ভারত সম্বন্ধে এমন কৌতূহল জাগ্রত হইল কেন— ইহার নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। ভারতের সংবিধান পরিবর্তনের জন্য ভারতীয়রা দাবী করিতে আরম্ভ করিয়াছে— এমন সময়ে ভারতীয়দের আসল (!) রূপটি প্রকাশ ও প্রচার করা ইংরেজ কূটনীতির পক্ষে একান্ত হইয়া পড়ে ; কোনো ইংরেজ এই শ্রেণীর গ্রন্থ লিখিলে তাহা উদ্দেশ্যমূলক পক্ষপাতদুষ্ট বলিয়া অভিহিত হইতে পারিত ; সেইজন্য একটি মার্কিন মহিলাকে এই কাজের জন্য সংগ্রহ করা হয়। গান্ধীজি মিস্ মেয়োর গ্রন্থ পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন drain-

১ Sykes, *C. F. Andrews*, p. 288-89।

২ Katherine Mayo (1867-1940). American writer, born Ridgeway, P.A. Author of *Isles of Fear* (1925), *Mother India* (1927), etc. *Mother India* পৃথিবীর প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ ভাষায় অনূদিত হয়।

inspectress's report। তবে তিনি এ কথাও বলেন যে এ বই প্রত্যেক ভারতবাসীর পাঠ করা আবশ্যিক; কারণ ইহার মধ্যে অর্ধসত্য অতিরঞ্জিত ঘটনাদি থাকিলেও ভারতীয়দের গ্রাম্যজীবনের চিত্র সুনিপুণভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

জাহাজে বসিয়া কবি জাপানের কাগজ Ashahi Shimbum-এর জন্য A Weary Pilgrim[১] নামে কবিতা লেখেন। কয়েকদিন পরে কবির জন্মদিন সমুদ্রবক্ষে জাহাজে উদ্‌যাপিত হইল (৬ মে)।

১০ মে কবি য়োকোহামা পৌঁছিলেন। সেখান হইতে টৌকিয়োতে আসিয়া ইমপিরিয়াল হোটেলে উঠিলেন। ১৪ মে জাপানে অবস্থিত চীনা লিগেশনের একজন বিশিষ্ট কর্মচারী রবীন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিতে আসেন; ইনি ন্যাশনালিস্ট পার্টির লোক— নানকিঙে কবিকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছেন। সান্‌য়াৎসানের মৃত্যু হয় পেকিঙে ১৯২৫ সালে। এতদিন পরে তাঁহার শবাধার বা কফিন নান্‌কিঙে স্থানান্তরিত করিয়া আনা হইতেছে— তদুপলক্ষে আয়োজিত সরকারী অনুষ্ঠানে কবির উপস্থিতির জন্য নিমন্ত্রণ। কবির পক্ষে নানাকারণে চীনে যাওয়া সম্ভব হইল না। এই চীনা রাজপুরুষের সঙ্গে কবির দীর্ঘ আলোচনা হয়।[২]

১৯২৯ সালে কবির এই তৃতীয় বার জাপান আগমন। প্রথমবার আমেরিকার পথে ১৯১৬ সালে তিন মাস ও ফিরিবার সময়ে একমাস থাকেন, ১৯২৪ সালে চীন সফর অন্তে জাপান ঘুরিয়া আসেন। এই তাঁহার তৃতীয় সফর। নানা প্রতিষ্ঠান হইতে কবি-সংবর্ধনা, কবির ভাষণব্যবস্থাদি অনুষ্ঠান চলিল। ১২ মে জোজোজি (Zozogi) মন্দিরে জাপানের 'টাগোর' সোসাইটি কর্তৃক প্রথম সংবর্ধনা সভা আহূত হয়; কবি এখানে 'অবসরতত্ত্ব' সম্বন্ধে ভাষণ দান করেন।

১৩ মে জাপানের মহিলা মহাবিদ্যালয়ে, ১৫ মে ইন্‌ডো-জাপানীজ অ্যাসোসিয়েশনে, ১৬ মে মিস্ ৎসুদার বিদ্যালয়ে, ১৭ মে টৌকিয়ো হইতে ৬০ মাইল দূরে শিল্পনগরী মিটোতে[৩] বক্তৃতা হয়।

পরদিন কাউন্ট ওকুমা দ্বারা আহূত সংবর্ধনা সভা। ইঁহার পিতা বিখ্যাত কাউন্ট ওকুমা[৪] ১৯১৬ সালে কবিকে স্বাগত করেন, তখন তিনি প্রধানমন্ত্রী।

বক্তৃতার পর বক্তৃতা চলিতেছে, ২১ ও ২৪ মে অবসরতত্ত্ব বিষয়ক ভাষণই দিলেন। ২৩ মে নিচি-নিচি সংবাদপত্রের মালিকদের ব্যবস্থায় সভা ও ২৫ মে মি ফুজিয়ামার উদ্যানসম্মিলনী।

দশ দিনের মধ্যে প্রায় প্রতিদিন বক্তৃতা, সাংবাদিক ও দর্শনপ্রার্থীদের সহিত সংলাপ, পার্টিভোজ প্রভৃতির উত্তেজনায় শরীর খারাপ হইয়া গেল। কয়েকদিন বিশ্রাম লইতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু সপ্তাহান্তে শরীর একটু ভালো বোধ করাতে পুনরায় ভাষণাদি আরম্ভ হইল। জাপানের বড় ব্যাঙ্কার শিবুসওয়ার[৫] উদ্যানসম্মেলনে কবি উপস্থিত হইলেন এবং ৩ জুন কন্‌কর্ডিয়া[৬] নামে প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। এই ভাষণ হইতে আমরা কয়েকটি অংশ উদ্‌ধৃত করিতেছি—

১ A Weary Pilgrim, a poem— composed on the Pacific Ocean for Ashahi Shimbum, dated S. S. Taiyo Maru, May 8, 1929.— Modern Review 1929 August।

২ Visva-Bharati Bulletin No 14. p. 46-50।

৩ Mito— industrial and Commercial city, 60 miles N.E. of Tokyo; important historically especially since under the Tokgawa Shagunate।

৪ Count Okuma (1838-1922)।

৫ Viscount Ei-ichi Shibusawa (1840-1931)।

৬ Ideals of Education (an address at the Concrodia, Tokyo, 3 June 1929). Visva-Bharati Quarterly, vol VII, Parts I & II, 1929 April-September. See also Visva-Bharati Bulletin No. 14.; Also a pamphlet।

"Nations are kept apart not merely by the international jealousy but also by their own past, handicapped by the burden of the dead and decaying, the breeding ground of diseases that attack the spiritual man. I could not believe that generations of peoples, century after century, must have their birth chamber in a moral and intellectual coffin which has its restricted space-regulation for a body that has lost its movements. Civilization has its inevitable tendency to accumulate dead materials and to make elaborate adjustments for their accommodation, leaving less and less room for life with its claim to grow in freedom ... I try to assert in my works and words that education bears its only meaning and object in freedom." (Visva-Bharati Bulletin No. 14, p. 69-71)।

কবির মতে বিশ্বরহস্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতার ফলে জাতিতে জাতিতে নিদারুণ বৈরীভাব উদগ্র হইয়া উঠিতেছে। আজ সকলেই শঙ্কিত; এই অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধায় পারস্পরিক অভিঘাতে মানবসভ্যতা চূর্ণ হইয়া যাইবে।

জাপানের অভাবাত্মক দিকটার প্রতি কবি জাপানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই বীর্যবান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব বা মহত্ত্ব কোথায় সেটিও কবি উত্তমরূপে লক্ষ্য করিয়াছিলেন; সেই কথাটি তিনি 'ধ্যানী জাপান'[১] নামে প্রবন্ধে ব্যক্ত করেন। জাপানীদের চরিত্র মধ্যে কবি যে বৈশিষ্ট্য দেখেন তাহার গোড়ার কথা কী সেইটাই তাঁহার মতে ধ্যানের শিক্ষা, জাপানীদের জীবনের গোড়ার কথা। জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে সেটি সুস্পষ্ট। ভারতীয় বৌদ্ধরা চীনদেশে গিয়া এই 'ধ্যান'ধর্ম প্রচার করেন; চীনাভাষায় ধ্যান শব্দ হইয়াছে চেন্, জাপানীতে তাহা জেন (Zen)। এই ধ্যানধর্ম বুদ্ধদেবের দ্বারাই ব্যাখ্যাত; এই জেন্ সম্প্রদায় জাপানের চরিত্রে মাধুর্য স্থৈর্য শক্তি বীর্য আনিয়াছে; "স্বভাবকে বশে রেখে চাঞ্চল্যকে নিরোধ ক'রে জাপান যে শক্তির বিকার বা খর্বতা ঘটিয়েছে এ কথা বলা চলবে না। ধ্যানধর্মের শিক্ষায় তাহারা বস্তুর সহিত আপনাকে তদ্‌গত করিয়া ফেলে; এই শিক্ষার বলে জাপানীরা মহৎ।"

১৯২৯ সালের ১৪ মে টোকিয়ো শহরের ইম্পিরিয়াল হোটেলে চৈনিক দূতাবাসের একজন পদস্থ কর্মচারী তাঁহার দুইটি সহকর্মী এবং একজন দোভাষী সহ কবির সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহাদের মধ্যে যে আলোচনা হয় তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইল। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাবেই বলেন যে দেশে আভ্যন্তরীণ অশান্তি চলিলে দেশকে সম্পূর্ণভাবে গড়িয়া তোলা কঠিন। দলীয় রাজনীতি এবং ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে উঠিয়া দেশের জনসাধারণের জন্য সমগ্র শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। এই দুই দেশের জনসাধারণকে যাহাতে দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত করিতে পারে তাহার জন্য প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। অপর জাতির প্রতি সহানুভূতি এবং পরস্পর সহযোগিতার জন্য যে মানবিক শিক্ষার প্রয়োজন, সেই শিক্ষা আমাদের যুবসমাজকে দেওয়াই তাঁহার একান্ত উদ্দেশ্য। সমাজের উচ্চস্তরে বসিয়া মর্যাদা লাভ করাই যেন একমাত্র লক্ষ্য না হয়। যাহারা শ্রমের দ্বারা কয়েকটি শিক্ষিত ভাগ্যবানের সমাজে উচ্চস্থান দিয়াছে তাহাদের মধ্যেও আত্মমর্যাদা এবং আত্মশক্তি জাগ্রত করা কর্তব্য। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দ্বারা দেশের সমগ্র উন্নতি অসম্ভব। বর্তমানে দুই দেশের সাধারণ মানুষ প্রকৃত শিক্ষা হইতে বঞ্চিত এবং সেই হেতুই জাতীয় মনোভাব কোনভাবেই গড়িয়া উঠিতেছে না। ভারতবর্ষের সমস্যা পরাধীনতার জন্যই বিশেষভাবেই জটিল। বিদেশী শাসন সামাজিক উন্নতির পক্ষে বিশেষ অন্তরায়। কিন্তু চীনের সমস্যা অন্যপ্রকার। তাহার প্রধান সমস্যা

১ ধ্যানী জাপান, প্রবাসী ১৩৩৬ ভাদ্র। দ্র. শিক্ষা, নূতন সংস্করণ।

বিভিন্নদলের শক্তিমদমত্ততা। জাতীয় শক্তিকে পরিচালিত করিতে হইলে দলীয় রাজনীতি পরিহার করিতে হইবে। শিক্ষিত যুবসমাজকে নিজদেশের সাধারণ মনুষ্যসমাজের সমস্যাগুলির সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন।

য়োকোহামায় ৭ জুন ভারতীয় সম্প্রদায়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া পরদিন কবি ও তাঁহার সঙ্গী ফরাসী জাহাজ Angers-যোগে ভারতাভিমুখে রওনা হইলেন। প্রায় পক্ষকাল পরে জাহাজ আসিয়া ফরাসী-ইন্দোচীন বর্তমান ভিয়েৎনামের বন্দর-নগর সাইগনে থামিল (২১ জুন)। ফরাসী সরকারের পক্ষ হইতে চীফ সেক্রেটারি জাহাজে আসিয়া কবিকে তাঁহাদের রাজ্যে স্বাগত করিয়া লইয়া গেলেন। নগরীর মেয়র কবির সম্মানার্থ যথোপযুক্ত আয়োজন করিয়াছিলেন। সেই সন্ধ্যাতেই কবির বক্তৃতা। পরদিন (২২ জুন) ফরাসী গবর্নরের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর ভারতীয় বণিক সঙ্ঘের সভা। সেই অপরাহ্ণে সাইগন ম্যুজিয়ামে হিন্দু-চীনের আর্ট-সংগ্রহ দেখিলেন। তৎপর দিবস (২৩ জুন) স্থানীয় চীনাদের মন্দির আনামী মন্দির ভারতীয় চেট্টিয়ারদের হিন্দু মন্দির প্রভৃতি পরিদর্শন করিলেন। এই দেশ ত্যাগের পূর্বে ফরাসী-ইন্দোচীনের গবর্নর-জেনারেলের সহিত দেখা করিয়া আসিলেন।

২৪ জুন প্রাতে জাহাজ ছাড়িয়া ২৬-এ সিঙাপুর বন্দরে আসিল, এইখানে ফরাসী জাহাজ বদলাইয়া তাঁহারা ভারতগামী 'ইথিওপিয়া' জাহাজ ধরিলেন; সাত দিন পরে ৩ জুলাই জাহাজ মাদ্রাজ পৌঁছিল এবং কবি সেখান হইতে রেলযোগে কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন ৫ জুলাই ১৯২৯ (২১ আষাঢ় ১৩৩৬)। কবির এবারকার সফরকাল চারি মাস আট দিন (২৬ ফেব্রুয়ারি - ৫ জুলাই ১৯২৯)।

তপতী

কানাডা-জাপান সফরান্তে কবি কলিকাতায় পৌঁছিলেন ৫ জুলাই এবং শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন। ১২ জুলাই শান্তিনিকেতন হইতে রানী দেবীকে লিখিতেছেন (২৮ আষাঢ় ১৩৩৬), "ঘোর বর্ষা নেমেছে। এমনতরো বাদলে আমার মনের শিখরদেশে প্রায়ই সুরের মেঘ ঘনিয়ে আসে·· কিন্তু এবারে কী হল, এখনো আষাঢ়ের আহ্বানে আমার অন্তর সাড়া দিল না। হয়তো ছবি আঁকতে যদি বসি তা হলে কলম সরবে কিন্তু কাব্যভাবনার স্পর্শে তাকে চঞ্চল করতে পারছে না।"[১] বিদেশে বাসকালে দেশের ও বিশ্বভারতীর দৈনন্দিন তুচ্ছ কথায় মন ভারাক্রান্ত হইবার অবসর পায় না। তা ছাড়া সেখানে আদর-আপ্যায়নের একটা উত্তেজনা, সুতীক্ষ্ণ মনস্বী মনের স্পর্শে কবির মনে বীণার তারগুলি বেশ উচ্চস্বরে বাঁধা থাকে— যাকে বলে high-strung। দেশে আসিয়া মনে হয় সমস্ত যেন নিঝুম বিরূপ বিরুদ্ধ। তাই ঐ পত্রে লিখিতেছেন, "এসে অবধিই কেমন আমার মনে হচ্ছে দেশের হাওয়ায় আমার নিমন্ত্রণ বন্ধ হয়ে গেছে, এখানে দরজা খোলা হল না। বুঝি সেইজন্যেই কী ভাবা, কী লেখা, কী কাজ করা কিছুই সহজ হয়ে উঠছে না, সামান্য কর্তব্যগুলোও মনকে ভারাক্রান্ত করছে।"

শারীরিক বার্ধক্যহেতু মনের কোণে নানাভাবে দুর্বলতার স্পর্শ দেখা দিতেছে। তাই বোধ হয় লিখিতেছেন, "একদা সঙ্গের অভাবটাকে অনুভব করিনি— আপনার মধ্যেই আপনার নিরন্তর একটা পূর্ণ দরবার জমেছিল। তার পরে কখন্ বুঝি শরীরের দুর্বলতার সঙ্গে আমার চিত্তলোকের আলোক কমে এল তখনি আপনার মধ্যে সঙ্গলাভ

১ পথে ও পথের প্রান্তে, পত্র ৩৫।

করবার শক্তি ম্লান হয়ে এসেছে, তখন থেকেই বাইরের সঙ্গকে আগ্রহের সঙ্গে ইচ্ছা করেছি। কিন্তু আমার সত্যকার স্বভাবটা বোধ হয় নৈঃসঙ্গিক · · ।”

কবির এই আত্মবিশ্লেষণ অতি সত্য; কিছুকাল হইতে এই নিঃসঙ্গতা তাঁহাকে পীড়িত করিতেছে, তাই বিশ্বভারতীর কাজে অকাজে ও বাজে কাজে নিজের বহু অমূল্য সময় দিয়া থাকেন— এই নিঃসঙ্গতা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য। অধ্যাপনা নৃত্যগীত অভিনয় ছবিআঁকা— এই সমস্তই এই নৈঃসঙ্গিক জীবনের ফাঁকগুলি পূরণের জন্য। কিন্তু মনের আসল মুক্তি পান যখন গানের ভিতর দিয়া ভুবনখানি দেখিতে পান; ‘এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর’— গানের কলিটি সার্থক হয় জীবনে।

পত্ররচনাও এই নিঃসঙ্গ জীবনের ফাঁক পূরণের একটা বড় রকম কাজ। এইটি তাঁহার জীবনের আযৌবনের স্বভাব। পত্র রচনাকালে নৈর্ব্যক্তিকভাবে দূরের মানুষের সঙ্গ পান মনোলোকে— কথা চলে লেখনীর মুখে। কিছুকাল হইতে এই নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গী জুটিয়াছে তাঁহার ছবি— অদৃশ্য অজ্ঞাত অভাবিত রূপের আবির্ভাবের সময় নীরন্ধ্র হইয়া উঠে। এই কথা অতি সত্য যে ‘পরনির্ভরতা মানুষকে অলস করে। এই আলস্যের মন্থরতায় · · আসে ক্লান্তি।’ কিন্তু সে-ক্লান্তি দূর হয় যখন নূতন কিছু সৃষ্টির প্রেরণা আসে।

এমন সময় হাত পড়িল ‘তপতী’ রচনায়। কিছুদিন পূর্বে কলিকাতায় ‘রাজা ও রানী’ নাটিকা অভিনয় করিবার আয়োজন করেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবি সেটাকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত করিয়া অভিনয়যোগ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তার নাম দেন ‘ভৈরবের বলি’। অভিনয়ের জন্য পাত্রপাত্রীও ঠিক হয়। কিন্তু নিজের রচনায় নিজেই খুশি হইতে পারিতেছেন না। নূতন করিয়া নাটকটা লিখিয়া ফেলিলেন। লেখা শেষ হয় ৭ অগস্ট (২২ শ্রাবণ ১৩৩৬)— বোধ হয় ‘দিন দশেকের বেশি সময়’ লাগেনি লিখিতে। অর্থাৎ কানাডা-জাপান সফর থেকে ফিরিবার দিন কুড়ির মধ্যেই লেখায় হাত দেন। রানী দেবীকে ৮ অগস্ট লিখিতেছেন, “গতকল্য আমার লেখনী একটি সর্বাঙ্গসুন্দর নাটককে জন্ম দিয়েছে— দশমাস তার গর্ভবাস হয়নি— বোধ করি দিন দশেকের বেশি সময় নেয় নি।”[১]

নাটকটি ছাপাইবার জন্য, কবি (১৯ ভাদ্র ॥ ৪ সেপ্টেম্বর) যে ভূমিকা লেখেন তাহা ‘রাজা ও রানী’র আমূল পরিবর্তনের কৈফিয়ত। ‘রাজা ও রানী’ কবির আটাশ বৎসর বয়সের রচনা (২৫ শ্রাবণ ১২৯৬ ॥ ৯ অগস্ট ১৮৮৯)— প্রথম নাটক লেখার চেষ্টা। চল্লিশ বৎসর পরে এইটি নূতন করিয়া লিখিতে গিয়া নূতন নাটকই রচিত হইল— মূলের সহিত সম্বন্ধ অতি ক্ষীণ। কবি বলেন অনেক দিন ধরিয়া ‘রাজা ও রানী’র ত্রুটি তাঁহাকে পীড়া দিয়াছে। কিছুকাল পূর্বে ‘ভৈরবের বলি’ লিখিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। কবি লিখিতেছেন, “সুমিত্রা এবং বিক্রমের মধ্যে একটা বিরোধ আছে— সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই বিরোধের সমাধা হয়। বিক্রমের যে প্রচণ্ড আসক্তি পূর্ণভাবে সুমিত্রাকে গ্রহণ করবার অন্তরায় ছিল— সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হল, এইটেই রাজা ও রানীর মূল কথা।

“রচনার দোষে এই ভাবটি পরিস্ফুট হয়নি। কুমার ও ইলার প্রেমের বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিতার দ্বারা নাটকের বাধা দিয়েছে এবং নাটকের শেষ অংশে কুমার যে অসংগত প্রাধান্য লাভ করেছে তাতে নাট্যের বিষয়টি হয়েছে ভারগ্রস্ত ও দ্বিধাবিভক্ত। এই নাটকের অন্তিমে কুমারের মৃত্যু দ্বারা চমৎকার উৎপাদনের চেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে— এই মৃত্যু আখ্যান-ধারার অনিবার্য পরিণাম নয়।”

১ পথে ও পথের প্রান্তে, পত্র ৩৯।

রাজা ও রানী ছিল কাব্যনাট্য। সুমিত্রা (তপতী) লিখিলেন গদ্যে। কবি লিখিতেছেন, "প্রশান্ত মাঝে মাঝে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যেন আমি নেড়াছন্দে ব্ল্যাঙ্কভার্সে নাটক লিখি। আমি স্পষ্টই দেখলুম গদ্যে তার চেয়ে ঢের বেশি জোর পাওয়া যায়। পদ্য জিনিসটা সমুদ্রের মতো— তার যা বৈচিত্র্য তা প্রধানত তরঙ্গের— কিন্তু গদ্যটা স্থলদৃশ্য, তাতে নানা মেজাজের রূপ আনা যায়··। জানা আছে পৃথিবীর জলময় রূপ আদিম যুগের, স্থলের আবির্ভাব হাল আমলের। সাহিত্যে পদ্যটাও প্রাচীন, গদ্য ক্রমে ক্রমে জেগে উঠেছে— তাকে ব্যবহার করা অধিকার করা সহজ নয়, সে তার আপন বেগে ভাসিয়ে নিয়ে যায় না— নিজের শক্তি প্রয়োগ ক'রে তার উপর দিয়ে চলতে হয়— ক্ষমতা অনুসারে সেই চলার বৈচিত্র্য কত তার ঠিক নেই··। বস্তুত গদ্যরচনায় আত্মশক্তির সুতরাং আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র খুবই প্রশস্ত। হয়তো ভাবীকালে সংগীতটাও বন্ধনহীন গদ্যের গূঢ়তর বন্ধনকে আশ্রয় করবে, কখনো কখনো গদ্যরচনায় সুরসংযোগ করবার ইচ্ছা হয়। লিপিকা কি গানে গাওয়া যায় না ভাবছ। মনে রাখা দরকার ভাষা এখন সাবালক হয়েছে, ছন্দের কোলে চড়ে বেড়াতে তার লজ্জা হবার কথা। ছন্দ বলতে বোঝাবে বাঁধা ছন্দ।"[১]

আমরা এইখানে 'তপতী' নাটকের আখ্যানটুকু সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

জালন্ধরের রাজা বিক্রম কাশ্মীরের রাজকন্যা সুমিত্রাকে পত্নীরূপে পাইবার জন্য কাশ্মীর আক্রমণ করেন। কাশ্মীরের যুবরাজ কুমারসেন তখন তাঁহার অভিষেকের পুণ্য জল আনিবার জন্য মানসসরোবরে গিয়াছেন। তাঁহার পিতৃব্য চন্দ্রসেন; তাঁহার লোভ কাশ্মীর রাজ্যের উপর। কুমারসেনের অনুপস্থিতি ও বিক্রমের রাজ্য আক্রমণের পূর্ণ সুযোগ তিনি গ্রহণ করিলেন। তিনি কাশ্মীরের যুবরাজ কুমারসেনের প্রতিনিধিরূপে জালন্ধর রাজের সহিত যুদ্ধের ভান করিয়া সন্ধির প্রস্তাব পাঠাইয়া দিলেন। সন্ধির শর্ত হইল— রাজকন্যা সুমিত্রা বিজয়ী বিক্রমের নিকট আত্মসমর্পণ করিবে ও চন্দ্রসেনকে কাশ্মীরের রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। এই কথা সুমিত্রাকে জানানো হইলে তিনি আগুন জ্বালিয়া আত্মাহুতির আয়োজন করিলেন। পুরবৃদ্ধরা সুমিত্রাকে এই কর্ম হইতে বিরত হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। দেশের মঙ্গলের জন্য, বিক্রমের লুণ্ঠন হইতে কাশ্মীরকে রক্ষার জন্য সুমিত্রা জালন্ধরের রানী হইতে সম্মত হইলেন।

জালন্ধরের রাজা বিক্রম সুমিত্রাকে রানীরূপে পাইয়া অন্ধ আবেগে রাজকার্য অবহেলা করিতে লাগিলেন। কাশ্মীর অভিযানের সময় যেসব বিশ্বাসঘাতক কাশ্মীরি অমাত্যরা তাঁহাকে সহায়তা দান করিয়াছিল, তাহাদের তিনি জালন্ধরে উচ্চ রাজকর্মচারী পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন; বিক্রম ভাবিলেন কাশ্মীরি জ্ঞাতিবর্গদের সম্মানের পদ দান করায় কাশ্মীর-নন্দিনী সুমিত্রা খুশি হইবেন। কিন্তু রানীর এই বিদেশী কুটুম্বদের অত্যাচারে রাজ্যের লোকে পীড়িত মর্মাহত হইয়া রাজার নিকট অভিযোগ করিতে আসে। রাজা কর্ণপাত করেন না দরিদ্রের ক্রন্দনে। বিদেশী কুটুম্বদের দমন করার ইচ্ছাও নাই, সামর্থ্যও নাই। তিনি মোহান্ধ প্রেমের মহিমা প্রচারের জন্য মীনকেতু মদনের উৎসব-আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। মহিষী ও পুরাঙ্গনাদের সেই উৎসবে যোগদানের আদেশ হইল। ইতিমধ্যে বুধকোট হইতে আসিল রত্নেশ্বর— সেখানকার কাশ্মীরি শাসনকর্তা শিলাদিত্যের অত্যাচার অভিযোগ রাজার কাছে

১ পথে ও পথের প্রান্তে, পত্র ৩৯। তু. পুনশ্চ-এর নাটক নামে রচনা (৯ ভাদ্র ১৩৩৯)। কয়েক বৎসর পরে 'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা' ও 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা'র গদ্যছন্দে কবি সুরসংযোগ করেন। 'শাপমোচন'এর বিভিন্ন অভিনয়ে কতকগুলি গদ্য অংশে সুর দেওয়া হইয়াছিল। গীতবিতান গ্রন্থপরিচয় পৃ. ১০১৬-১০১৭ দ্রষ্টব্য। এখানে পুরাতন গান যাহা ছন্দবদ্ধ নহে, তাহাতে সুরসংযোগ করা হয়।

নিবেদন করিবার জন্য। রাজা তাহার কথায় কর্ণপাত না করায় রত্নেশ্বর যায় রানী সুমিত্রার কাছে। সুমিত্রা জ্ঞাতিদের কাহিনী শুনিয়া লজ্জিত— প্রতিকারের জন্য রাজাকে গিয়া সকল কথা বলেন। রাজা রানীকে বলেন, রাজকার্যে মহারানীর হস্তক্ষেপ করা অবাঞ্ছনীয়। বিক্রম রানীকে আদেশ করিলেন তিনি যেন অবিলম্বে মীনকেতন-পূজার জন্য বেশ পরিবর্তন করিয়া উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হন। রানী স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন রাজ্যে অত্যাচার অনাচার নিবারণের অধিকার তাঁহার নাই। তখন তিনি রাজার মোহাবিষ্ট প্রেমের কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য একাকী গৃহত্যাগ করিয়া মার্তণ্ডদেবের মন্দিরে চলিলেন।

রানী সুমিত্রার সখী বিপাশা কাশ্মীর হইতে তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল। বিপাশা গান করে, নাচে; তাহাকে ভালো লাগিয়াছে মহারাজার বৈমাত্রেয় ভাই নরেশের। নরেশও বুঝিয়াছে রাজ্যময় যে ভীষণ অত্যাচার চলিতেছে তাহার প্রতিকারের সাধ্য কাহারও নাই। মনে মনে সে ক্ষুব্ধ। রানীর প্রাসাদত্যাগের সংবাদ শুনিয়া বিপাশা ও নরেশ রানীর সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িল।

রাজা যখন শুনিলেন রানী কাশ্মীরের পথে যাত্রা করিয়াছেন, তখন দুর্বার আক্রোশে সসৈন্যে চলিলেন কাশ্মীর অভিমুখে— রানীকে ফিরাইয়া আনিতেই হইবে।

এদিকে কাশ্মীরের হৃতরাজ্য কুমারসেনকে একদল লোক উদয়পুরে রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করিতেছিল। সেখানে সংবাদ আসিল বিক্রম কাশ্মীরে প্রবেশ করিয়া দেশ-ছারখারে প্রবৃত্ত— কুমারসেনকে বন্দী করিবার জন্য চারি দিকে চর প্রেরণ করিয়াছেন।

কুমারসেনের অভিষেকস্থলে বিপাশা ও নরেশ আসিয়া সংবাদ দিল যে সুমিত্রা মার্তণ্ডের মন্দিরাভিমুখে একাকী চলিয়া গিয়াছেন। তিনি পথের পথিকদের বলেন তিনি তপস্যা করিতে যাইতেছেন, তাঁহার নাম তপতী।

কুমারসেন জানিতে পারিলেন বিক্রমের সমস্ত আক্রোশ তাঁহারই উপর; তখন তিনি সামান্য পথিকের ছদ্মবেশে মার্তণ্ড মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে বিক্রমও জানিতে পারিয়াছে যে সুমিত্রা সেইদিকে গিয়াছে; তিনি উন্মত্তের ন্যায় চলিলেন— পথে বীভৎস অত্যাচার সৃষ্টি করিতে করিতে। রাজসখা দেবদত্ত রাজাকে এই অসামাজিক কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করায় তিনি কারারুদ্ধ হইলেন। কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া দেবদত্ত মার্তণ্ডমন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখেন দ্বার রুদ্ধ। মন্দিরের দ্বারপালকদের অবিশ্বাস দূর করিয়া তিনি রানীর কাছে পৌঁছিলেন। মহারাজকে এই পাপের হাত হইতে রক্ষা করিতেই হইবে— এই ছিল দেবদত্তের সংকল্প। কুমারসেন চাহেন না যে তাঁহার ভগ্নী আর জালন্ধরে ফিরিয়া যান। সুমিত্রা সকল কথা শুনিয়া বলেন, 'রাজাকে আমি এইখানে আহ্বান করিয়া আনিব।' এই কথায় সকলেই ভীত শঙ্কিত হইয়া উঠিল। মন্দিরের পুরোহিত ভার্গব মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ রাখিতে চান— তিনি বিক্রমকে মন্দির-সীমানায় প্রবেশ করিতে দিবেন না। সুমিত্রা বলিলেন, "তুমি এখনই মন্দিরের সিংহদ্বার খুলে দাও; যে পথ দিয়ে রাজার সৈন্য আসবে সেই পথ দিয়েই আমার দেবতা আমাকে উদ্ধার করতে আসবেন। · · রুদ্রের কাছে বহুদিন পূর্বে আত্মনিবেদন করেছিলুম। · · তপস্যা করেছি, আমার দেহমন শুদ্ধ হয়েছে। আজ আমার অনেকদিনের সংকল্প সম্পূর্ণ হবে। তাঁর পরমতেজে আমার তেজ মিলিয়ে দেব।"

তার পর চিতাগ্নি প্রজ্বলিত হইল— তপতী বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে আত্মাহুতি দিলেন। এমন সময়ে রাজা আসিয়া উপস্থিত; তখন সুমিত্রা তাঁহার স্পর্শের বাহিরে।

রাজা ও রানী বা তপতীর মূলকথা রবীন্দ্রনাথ 'তপতী'র ভূমিকায় বলিয়াছেন— "সুমিত্রা এবং বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে একটি বিরোধ আছে— সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই বিরোধের সমাধা হয়। বিক্রমের যে প্রচণ্ড আসক্তি

পূর্ণভাবে সুমিত্রাকে গ্রহণ করবার অন্তরায় ছিল, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হল · ·।"

বিক্রম অন্ধ আসক্তির তাড়নায় যাহা ভুলিয়াছিলেন, তাঁহার সখা দেবদত্ত তাহা তাঁহাকে স্মরণ করাইবার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, "রানীর হৃদয়ের সম্পূর্ণ অংশ তো তোমার নয়, এক অংশ প্রজাদের। শুধু কি তিনি রাজবধূ? তিনি যে লোকমাতা।" রানীও বিক্রমকে সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পারেন নাই; তাই তিনি ক্ষোভে বলিয়াছিলেন, "আমি চাই আমার রাজাকে। · · সিংহাসন থেকে তুমি নেমে এসেছ এই নারীর কাছে। আমাকে কেন তুলে নিয়ে যাও না তোমার সিংহাসনের পাশে?" রাজা কিন্তু রানীকে সে অধিকার দিতে অনিচ্ছুক। তিনি বলেন, "দেখো প্রিয়ে, রাজার হৃদয়েই তোমার অধিকার, রাজার কর্তব্যে নয়— এই কথা মনে রেখো। · · আমার রাজকোষ তোমার পায়ের তলায় সম্পূর্ণ ফেলে দিচ্ছি— তুমি প্রজাদের দান করতে চাও, করো দান যত খুশি।"

রানী বলেন, "ক্ষমা করো মহারাজ, তোমার কোষ তোমারি থাক্। · · অন্যায়ের হাত থেকে প্রজারক্ষায় যদি মহিষীর অধিকার আমার না থাকে তবে এ-সব তো বন্দিনীর বেশভূষা— এ বইতে পারবো না।" রাজা যখন আদেশের সুরে বলিলেন, "রাজার কার্যে বা পূজার কার্যে যদি অনধিকার হস্তক্ষেপ করো তবে তোমার 'পরে রাজার হস্তক্ষেপ প্রীতিকর হবে না। · · যাও, রাজার আদেশ, এখনি বেশ পরিবর্তন করো গে।" সুমিত্রা বলেন, "তাই করবো মহারাজ, · · বেশ পরিবর্তন করবো।" অতঃপর বন্দিনী রাজরানীর বেশ ছাড়িয়া সুমিত্রা 'তপতী'র বেশে কাশ্মীরের পথে চলিলেন মার্তণ্ডদেবের মন্দিরে তপস্যা করিতে সংসারের অশুচিতা হইতে মুক্তির জন্য, স্বামীকে মুক্ত করিবার জন্য এই তপস্যা।

সুমিত্রা রাজার অশেষ ত্রুটি সত্ত্বেও তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতে পারেন নাই। তাঁহার সখী বিপাশা তাঁহাকে একদিন বলে, "মাপ করো, মহারানী, আমার সন্দেহ হয় তুমি তাঁকে অবজ্ঞা করো।" তদুত্তরে রানী বলেন, "অবজ্ঞা! এমন কথা বলিস নে, বিপাশা। ওঁর মধ্যে তুচ্ছ কিছুই নেই। প্রচণ্ড ওঁর শক্তি— সে-শক্তিতে বিলাসের আবিলতা নেই, আছে উল্লাসের উদ্দামতা।" এ কথা হয়তো সত্য যে পৌরুষের অভাব ছিল না বিক্রমের। কিন্তু বিপাশা বলে, "প্রেমের গৌরব খুব প্রকাণ্ড ক'রে জানাতে চেয়েছিলেন রাজা, দুর্মূল্য দান দুঃসাহসের সঙ্গে দিতে পারলে তিনি বাঁচতেন। এই সামান্য কথাটা তুমি বুঝতে পার নি? · · তুমি রাজহংসীর মতো, রাজার তরঙ্গিত কামনাসাগরের জলে তোমার পাখা সিক্ত হতে চায় না, রাজবৈভবের জালে পারলে না তোমাকে একটু বাঁধতে, তুমি যত রইলে মুক্ত, রাজা ততই হলেন বন্দী। শেষে একদিন আপন রাজ্যটাকে খণ্ড খণ্ড করে ছড়িয়ে ফেলে দিলেন ওই কাশ্মীরী কুটুম্বদের হাতে— মনে করলেন তোমাকেই দেওয়া হল।"

রানী যখন প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া গেলেন, রাজা তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিতে চাহিলেন, "ধূলিশায়ী কাশ্মীরের চোখের উপর দিয়ে নিয়ে আসব তাঁকে বন্দিনী করে, যেমন করে দাসীকে নিয়ে আসে।" বিপাশা নরেশকে বলে, "সেও ভালো। এমনি রাগ করেও যদি রাজার পৌরুষ জাগে তো সেও ভালো।" নরেশ বলেন তদুত্তরে, "ভুল করছ বিপাশা। এ পৌরুষ নয়, এ অসংযম · ·। যে-উন্মত্ততায় এতদিন আপনাকে বিস্মৃত হতে লজ্জা পান নি এও সেই উন্মাদনারই রূপান্তর। কোনো আকারে মোহমাদকতা চাই, নিজেকে ভুলতেই হবে এই তাঁর প্রকৃতি।" সুমিত্রা বুঝিয়াছিলেন, মহারাজার উদ্দামতার 'কুলভাঙা বন্যা'র ধারে আসিয়া দাঁড়াবার চেষ্টা না করিয়া, দূরে সরিয়া গিয়া তপস্যার দ্বারাই রাজার ও রাজ্যের মঙ্গল তিনি করিতে পারিবেন।

'তপতী' নাটক রচিত হয় 'যোগাযোগ' উপন্যাস রচনার এক বৎসরের মধ্যে। আমাদের মনে হয় স্বামী-স্ত্রীর

সম্বন্ধের মধ্যে বিরোধের বীজ বা বিষ নিহিত থাকিলে তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হয় বিচ্ছেদে, নয় মৃত্যুতে। উভয় গ্রন্থে স্বামীদেবতারা জবরদস্তি করিয়া স্ত্রীরত্ন লাভ করেন। উভয়েরই নিকট স্ত্রী ভোগের আধার মাত্র— সংসারে বা রাজ্যে তাহার কোনো অধিকার নাই। কুমু অবাঞ্ছিত অশুচি সংসারে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়, কিন্তু সুমিত্রাকে বিক্রম 'কামনার ডোরে' বাঁধিতে পারিলেন না।

('তপতী' নাটকের মধ্যে বিক্রম মীনকেতন মদনের উৎসব করিতেছেন— এইটি লক্ষ্যণীয়। তপতী রচনার (২২ শ্রাবণ ১৩৩৬) কয়েকদিন পরে 'উজ্জীবন' নামে যে কবিতাটি লেখেন (ভাদ্র ১৩৩৬) তাহা 'মহুয়া' কাব্যের প্রবেশক কবিতারূপে প্রযোজিত হইয়াছে।)

ভস্ম-অপমানশয্যা ছাড়ো, পুষ্পধনু,
রুদ্রবহ্নি হতে লহ জলদর্চি তনু।· ·
মৃত্যু হতে জাগো, পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু।· ·

তপতীপর্বে উত্তরায়ণের অট্টালিকার উপর 'মীনকেতন' উড়িয়াছিল— পুষ্পধনুর প্রতীক।

তপতী-অভিনয়পর্ব

শান্তিনিকেতনে ও শ্রীনিকেতনে বৃক্ষরোপণ ও হলকর্ষণ উৎসবান্তে কবি গেলেন কলিকাতায়— 'তপতী' নাটকের খসড়া বন্ধুমহলে শোনাইবার জন্য, কারণ অচিরেই তাহার অভিনয়ের আয়োজন করিতে হইবে। কলিকাতায় আসিলেই পাঁচরকম কাজে তাঁহাকে জড়াইয়া পড়িতে হয়; প্রেসিডেন্সি কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত কবিকে 'রবীন্দ্রপরিষদ'এ সাহিত্য-বিষয়ে ভাষণদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাইলেন। সুরেন্দ্রনাথ দার্শনিক হইলেও তিনি কবি ও সাহিত্যিক— তাঁহার রচিত 'রবিদীপিতা' (১৯৩৪) সুপরিচিত গ্রন্থ। তাঁহারই উদ্যমে এই 'পরিষদ' স্থাপিত হয়। কবি এই পরিষদে দুই দিন 'সাহিত্যের স্বরূপ' (২ ভাদ্র ১৩৩৬) ও 'সাহিত্যবিচার' (৫ ভাদ্র) বিষয়ে মৌখিক ভাষণ দেন (১৮, ২১ আগস্ট ১৯২৯)।[১]

পরে কবি স্বয়ং 'প্রবাসী'র জন্য নূতন করিয়া দুইটি ভাষণ মিলাইয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়া দেন।[২] ভূমিকাচ্ছলে কবি বলেন, "মুখে-বলা কথা লিখে বলায় নূতন আকার ধারণ করে। তা ছাড়া আমার মতো অসাধারণ বিস্মৃতি-শক্তিশালী লোক একদিনে কথিত বাণীকে অন্যদিনে যথাযথরূপে অনুলেখনে অক্ষম। অতএব সেদিনকার বাক্যের ইতিহাস অনুধাবনের বৃথা চেষ্টা না করে বক্তব্য বিষয়টার প্রতি লক্ষ্য করব।"

এই ভাষণে কবির মনে সেসময়কার সাহিত্যের একটা বড় প্রশ্ন— সাহিত্য ব্যক্তিগত না, সাহিত্য শ্রেণীগত— এই

১ বিচিত্রা, ৩য় বর্ষ ১৩৩৬ ভাদ্র। নানাকথা। রবীন্দ্রপরিষদে রবীন্দ্রনাথ। ২ ভাদ্র ১৩৩৬ প্রেসিডেন্সি কলেজের রবীন্দ্রপরিষদে সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে ভাষণ, পৃ. ৪৯০। বিচিত্রা, ১৩৩৬ আশ্বিন। নানাকথা। সাহিত্যের বিচার সম্বন্ধে বক্তৃতা, পৃ. ৬৪৯-৫০।

২ প্রবাসীতে কবি দুই দিনের ভাষণ একত্র করিয়া 'সাহিত্যবিচার' নামে প্রবন্ধ করিয়া দিলেন। প্রবাসী ১৩৩৬ কার্তিক, পৃ. ১৩১-৩৬। দ্র. সাহিত্যের পথে ১৩৬৫ সংস্করণ, পৃ. ৯৪-১০২।

দ্বন্দ্বের তর্ক চলিতেছে। কবি তাই বলিতেছেন, "কিছুদিন পূর্বেই আমার যোগাযোগ উপন্যাসের কুমুর চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে কোনো লেখিকা আমাকে পত্র লিখেছেন। তাতে বুঝতে পারা গেল, সাহিত্যে নারীকেও একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে দাঁড় করিয়ে দেখবার একটা উত্তেজনা সম্প্রতি প্রবল হয়ে উঠেছে।··এর ফলে কুমু ব্যক্তিগতভাবে সম্পূর্ণ কুমু কি না, এই সাহিত্যসংগত প্রশ্নটা কারও কারও লেখনীতে বদলে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে কুমু মানবসমাজে নারী নামক জাতির প্রতিনিধির পদ নিতে পারছে কিনা, অর্থাৎ তাতে সমস্ত নারী-প্রকৃতির উৎকর্ষ স্থাপন করা হয়েছে কিনা।"[১] সমগ্র রচনার সংক্ষেপন করা এখানে সম্ভব নহে।

প্রেসিডেন্সি কলেজে ভাষণদানের অব্যবহিত পরে 'তপতী' অভিনয়ের ব্যবস্থা করিবার জন্য কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন। নাটকের মহড়া শুরু হইল, কবি স্বয়ং সাতষট্টি বৎসর বয়সে বিক্রমের ভূমিকা গ্রহণ করিলেন। মহড়া চলিতেছে দিনের পর দিন। একদিন সংবাদ আসিল লাহোর জেলে যতীন দাস নামে একজন বিপ্লবী যুবক অনশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে; জেল-কর্তৃপক্ষের অন্যায়ের প্রতিবাদে এই আত্মাহুতি। শান্তিদেব লিখিয়াছেন— এই সংবাদ যেদিন আসিল, সেদিন তপতীর মহড়া জমিল না, কবিকে খুবই অন্যমনস্ক দেখা গেল। মনের এই অবস্থায় কবি লেখেন 'সর্বখর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ' গানটি (রবীন্দ্রসংগীত, পৃ. ২১৯)। গানটি 'তপতী'র অন্তর্ভূক্ত করা হয় (গীতবিতান, পৃ. ১০২)।

কিন্তু রিহার্সাল ছাড়াও সারাদিন নানা কাজ করিতে হয়; সেইরূপ একটির কথা এখানে বলিব— কারণ বিষয়টি কবির আন্তর্জাতিক জীবনের ঘটনার সহিত সংযুক্ত।

পেট্রিক গেডিস্ নামকরা ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ও সমাজশাস্ত্রবিদ্। ইনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক— মনস্বিতার জন্য সর্বত্র সুবিদিত। কবির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় কলিকাতায় ও য়ুরোপে; ভারতে বাসকালে তিনি সার্ জগদীশচন্দ্র বসুর সুবৃহৎ জীবনী লেখেন; নগরপত্তন সম্বন্ধেও তাঁহার বিস্তারিত রিপোর্ট এখনো পাঠ করিলে পৌরসভার সদস্যগণ উপকৃত হইতে পারেন। গেডিস্ সম্বন্ধে কবির অভিমত আমরা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। আমাদের আলোচ্যপর্বে গেডিস্ ফ্রান্সের দক্ষিণে মঁপলিয়ের (Montpellier) নামক স্থানে একটি বিদ্যায়তন স্থাপন করিয়াছেন এবং রবীন্দ্রনাথকে[২] উহার প্রেসিডেণ্ট পদ দান করেন।

সেই বিদ্যায়তনের উদ্‌বোধন উপলক্ষ্যে এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা ইংরেজিতে লিখিয়া পাঠান (১৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৯)।[৩] এই কবিতাটি পরে *The Religion of Man* গ্রন্থের প্রবেশককবিতারূপে মুদ্রিত হয়। এই ইংরেজি কবিতা সম্বন্ধে পরে আমাদের আলোচনা করিতে হইবে, এখন বর্তমান কথায় ফিরিয়া আসা যাক্।

কলিকাতায় 'তপতী'র দল যাইবার পূর্বে, একদিন উত্তরায়ণে আভরণহীন অভিনয় হইল। অতঃপর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে চারি দিন[৪] অভিনয় চলিল।

এবারকার অভিনয়ে নাট্যমঞ্চ-পরিকল্পনার মধ্যে বিশেষত্ব ছিল— দৃশ্যপটের কোনো পরিবর্তন করা হয় নাই— আলোক-নিয়ন্ত্রণের দ্বারা যাহা করিবার তাহা করা হয়। তপতী নাটকের ভূমিকায় কবি রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে বলেন,

১ সাহিত্যের পথে, পৃ. ৯৯-১০০।

২ দ্র. *The Golden Book of Tagore*, p. 84।

৩ প্রথম পাঠ— We are borne in the arms of ageless time. Visva-Bharati Quarterly, vol. VII Part III 1929 October-December (Composed for the opening day celebrations of the Indian College, Montpellier, France).

The Religion of Man গ্রন্থের পাঠ— The eternal dream is borne on the wings of ageless light...।

৪ ২৬, ২৭, ২৯ সেপ্টেম্বর ও ১ অক্টোবর ১৯২৯ তপতী অভিনীত হয়।

"আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রবরূপে প্রবেশ করেছে। ওটা যেন ছেলেমানুষী লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা।" প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে কবি 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে[১] যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এখানে তুলনীয়; "· · য়ুরোপীয় বাস্তবসত্য নহিলে নয়। কল্পনা যে কেবল তাহাদের চিত্তরঞ্জন করিবে তাহা নয়, কাল্পনিককে অবিকল বাস্তবিকের মতো করিয়া বালকের মতো তাহাদিগকে ভুলাইবে। কেবল কাব্যরসের প্রাণদায়িনী বিশল্যকরণীটুকু হইলে চলিবে না, তাহার সঙ্গে বাস্তবিকতার আস্ত গন্ধমাদনটা পর্যন্ত চাই। এখন কলিযুগ, সুতরাং গন্ধমাদন টানিয়া আনিতে এঞ্জিনীয়ারিং চাই।"

(তপতীর অভিনয় ও মঞ্চ পরিকল্পনা কলিকাতার নাট্যক্ষেত্রে একটি নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল;) এই বিভূষণ কল্পনার প্রয়োজক গগনেন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ নন্দলাল— প্রযোজক সুরেন্দ্রনাথ কর।

তপতী অভিনীত হয় ১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বরে। এই সময়ে আর-একটি নাট্যবিষয়ক ঘটনা উল্লেখযোগ্য; মধু বোস সে সময়ে বাংলা রঙ্গমঞ্চে শৌখীন অভিনয়ে নামিয়াছেন। ম্যাডান কোম্পানীর নির্দেশে ও সহায়তায় তিনি রবীন্দ্রনাথের 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্প অবলম্বনে 'গিরিবালা' নামে নির্বাক বায়োস্কোপ প্রস্তুত করেন, তখনো সবাক চিত্র অজ্ঞাত। মধু বোস লিখিয়াছেন, "চিত্রনাট্যটি সম্পূর্ণ হবার পর গুরুদেবের· · শরণাপন্ন হই। তিনি পরম যত্নে ও পরম স্নেহে গিরিবালার সিনারিওটি আদ্যোপান্ত সংশোধন কোরে দেন। পাতায় পাতায় কবির হস্তাক্ষর বিভূষিত সেই সংশোধিত সিনারিওটি আজও আমি পরম যত্নে ও গৌরবে রক্ষা কোরচি। ক্রাউন সিনেমায় 'গিরিবালা' চিত্রের উদ্‌বোধন দিবসে গুরুদেব স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন এবং ছবি দেখে খুসী হয়ে আমাকে আশীর্বাদ করেন।"[২]

মধু বোস আরও লিখিতেছেন, "Harmony এবং melody-র সংমিশ্রণে প্রথম Harmonised Indian music-এর যখন প্রবর্তন হয়, তখন এই নব পরিকল্পনার প্রেরণা পাই রবীন্দ্রনাথের সুর ও ভাব থেকে। 'আলিবাবা' গীতিনাট্যের প্রথম Harmonised musicএর স্বরলিপি পুস্তকখানি আমি গুরুদেবের নামে উৎসর্গ করি। তিনি একখানি music-এর উৎসর্গপত্রের নিম্নভাগে এই কথাকয়টি লিখে দিয়ে স্বাক্ষর করেন— "I hope this small beginning will grow into a great musical development"।[৩]

১ রঙ্গমঞ্চ, বঙ্গদর্শন ১৩০৯। দ্র. বিচিত্র প্রবন্ধ।

২ দীপালি ১৩৪৮ রবীন্দ্রজন্মোৎসব সংখ্যা দ্রষ্টব্য। সমসাময়িক দৈনিক পত্রিকা অনুসন্ধান করিলে এবং সিনেমায় প্রদর্শিত চিত্র-গুলির তালিকা দেখিলেও আমরা এ বিষয়ে আরও অধিক তথ্য জানিতে পারি।

মধু বোসের প্রতি কবির বিশেষ স্নেহের কারণ ছিল। ইঁহার পিতা জামসেদপুর-খ্যাত প্রমথনাথ বসু ও মাতা রমেশচন্দ্র দত্তের কন্যা কমলা দেবী। ইঁহাদের বিবাহসভায় বঙ্কিমচন্দ্র তরুণ রবিকে তাঁহার 'সন্ধ্যাসংগীতে'র জন্য অভিনন্দিত করেন। মধু বোস শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলেন (১৯০৭-০৯)।

আমাদের মনে হয় মধু বোস প্রভৃতির তাগিদে কবি 'দালিয়া' গল্পটির একটি নাট্যরূপ দিবার চেষ্টা করেন। সেই 'অরচিত নাটকের পরিকল্পনা'র খসড়া বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫০ বৈশাখ ১ম বর্ষ ১০ সংখ্যায় প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত প্রকাশ করেন। তাঁহারই এক খাতায় কবি এই খসড়াটি লিখিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ— "শ্রীমধু বসুর পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের 'দালিয়া' ছোটো গল্পটি নাট্যীকৃত হইয়া ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩ তারিখে কলিকাতার এম্পায়ার থিয়েটার-এ অভিনীত হয়। তাঁহারই সৌজন্যে সম্প্রতি দেখিবার সুযোগ হইয়াছে যে, উক্ত নাট্যের যে পাঠ রচিত হইয়াছিল তাহাতে কবি স্বহস্তে বহু পরিবর্তন করেন এবং সূচনায়" দেন দুইটি গান— 'ও জলের রানী', 'ভয় নেই রে তোদের নেই রে ভয়' (গীতবিতান, পৃ. ৮৯৬)।

৩ ১৯১৭-১৮ সালে বিচিত্রাপর্বে একজন য়ুরোপীয় বেহালাবাদক গগনেন্দ্রনাথদের বাড়িতে আসিতেন, তিনি harmony ও melody সংশ্লেষণ বিষয়ে গবেষণা করিতেন। আমার অস্পষ্ট ধারণা আছে।

বরোদায় ও পরে

কলিকাতায় তপতী অভিনয়ের পর কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন; পূজাবকাশে বিদ্যালয় বন্ধ হইলে রথীন্দ্রনাথরা বেড়াইতে গেলেন রাঁচি— কবি প্রায় একেলা আছেন উত্তরায়ণের তেপান্তরের মধ্যে। কলিকাতায় অভিনয়ের উগ্র উত্তেজনার পর এখানে আসিয়া মনের সুর খুব নামিয়া গিয়াছে— নৈঃসঙ্গিকতাজনিত মনের অবসাদ স্পষ্ট। বিজয়া-দশমীর দিন (১৩ অক্টোবর) ইন্দিরা দেবীকে লিখিতেছেন, "আজকাল সঙ্গীর অভাব সব চেয়ে অনুভব করি, যাদের অল্প বয়েস তারা মনে করে আমার বেশি বয়েস হয়ে গেছে, কাজেই বক্তৃতা করতে হয়, আর আধুনিকীদের যেটুকু স্পর্শ আদায় করতে পারি সে কেবল অভিনয়ের ছল করে।"[১]

এই পত্রে কবি লিখিতেছেন যে তাঁহাদের প্রেরিত লাইব্রেরি আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এইটাই 'বিজয়ার খুব বড় নমস্কার'। প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবী নিঃসন্তান। প্রমথ চৌধুরী জীবনভর উপার্জিত অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন গ্রন্থক্রয়ে। য়ুরোপীয় সাহিত্য দর্শন অর্থনীতি সম্বন্ধে অত্যাধুনিক গ্রন্থের অপরূপ সংগ্রহ; অধিকাংশ বই যে প্রমথ চৌধুরীর পড়া তার নিদর্শন প্রায় সব বই-ই বহন করিতেছে।[২]

এই পত্রে লিখিতেছেন, "তপতীর ঝাঁজ মরবার পূর্বেই দাবী আসচে রক্তকরবীকে স্টেজে চড়াবার জন্যে।" কিন্তু মনের মধ্যে নন্দিনী সম্বন্ধে কবি এমন-একটা তুরীয় ভাব গড়িয়া তুলিয়াছিলেন যে, কোনোদিনই তাঁহার মনের মতন নন্দিনী আর জুটিল না; ফলে কবির জীবিতকালে রক্তকরবীর অভিনয় হয় নাই।

এই সময়ে বরোদা হইতে খবর পান যে সায়জীরাও গায়কবাড়[৩] দেশে ফিরিয়াছেন— তাঁহার ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথ বরোদায় আসিয়া একটি বক্তৃতা করিয়া যান। বরোদার মহারাজা গত কয় বৎসর হইতে বাৎসরিক ছয় হাজার টাকা বিশ্বভারতীকে দান করিয়া আসিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে মহারাজের এই অনুরোধ 'একটা বাজে কাজের দায় কাঁধে চেপেছে' বলিয়া মনে হইতেছে। ইন্দিরা দেবীকে লিখিতেছেন, "বরোদায় গিয়ে একটা বক্তৃতা দিতে হবে এই আদেশ। বাঁধা আছি সেই রাজদ্বারে রুপোর শৃঙ্খলে— বিশ্বভারতীর খাতিরে মাথা বিকিয়ে বসেছি। তাই আজ সেই মাথা ঠুকচি একখানা বক্তৃতা বের করবার জন্যে। একটুও ভালো লাগচে না· ·পূর্বজন্মের কোন পাপে কবিকে লাগতে হোলো কথার ঘানি ঠেলে বক্তৃতার তেল বের করতে, সেই তেল রাজপদ-সেবার জন্যে।"[৪]

এই পূজাবকাশের আর-একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; জাপান হইতে নোকুজো তাকাগাকি[৫] নামে জুজুৎসু-বীরের আগমন (নভেম্বর)। কানাডা হইতে ফিরিবার পথে কবি জাপানে বাসকালে সেখানকার জুজুৎসু ও

১ চিঠিপত্র ৫, পত্র ২৯। বিজয়া দশমী। ২৭ আশ্বিন ১৩৩৬॥ ১৩ অক্টোবর ১৯২৯॥]

২ কলিকাতার বালিগঞ্জ মে-ফেয়ারে প্রমথ চৌধুরীর বাড়ি হইতে এই বিরাট সংগ্রহ, আলমারী প্রভৃতি আনিবার জন্য আমাকে কলিকাতায় যাইতে হয়। একটি মালগাড়িতে সমস্ত উঠাইয়া আনা হয়। ফরাসী গ্রন্থগুলি ইঁহারা হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেন।

৩ Sayaji Rao Gaekwar, b. 1863 : became Gaekwar of Baroda 1875 ; invested with full power 1881 : d. 1939।

৪ চিঠিপত্র ৫, পত্র ২৯। উত্তরায়ণ, শান্তিনিকেতন। বিজয়া দশমী ১৩৩৬। [২৭ আশ্বিন॥ ১৩ অক্টোবর ১৯২৯]।

৫ "Mr. Nokuzo Takagaki...was formerly Japanese State-scholar at the University of Br. Columbia, and before coming out to India held the post of Ju-Jitsu teacher at the Nippon University and at the House of Representative (Jap. Parliament). He is a qualified medical practitioner in Ju-Jitsu form, and is a member of the Advisory Committee of the Kodokwan which is the official training centre in Japan. At present there are very few men with his qualifications even in Japan...Mr. Takagaki joined the institution in November 1929 and immediately started his classes."—Visva-Bharati Annual Report 1929, p. 20 b।

জুডো কসরৎ ও কুচকাওয়াজ বিশেষভাবে দেখিবার সুযোগ পান। জুজুৎসুর কসরৎ কবি ইতিপূর্বেও দেখিয়াছেন শান্তিনিকেতনে ১৯০৫ সালে; সানো সান্ নামে যে জাপানী তখন আশ্রমে আসেন তিনি একাধারে কারুশিল্পী ও জুজুৎসু-বীর। সেই সময়ের একখানি পত্রে কবি লিখিয়াছিলেন, "এখানে জাপান হইতে জুজুৎসু শিক্ষক আসিয়াছেন, তাঁহার কাণ্ড কারখানা দেখিবার যোগ্য" (স্মৃতি, পৃ. ৩৩)। সেই স্মৃতি কবির ম্লান হয় নাই; তাই এবারও তাকাগাকি সান্‌কে শান্তিনিকেতনে আনার ব্যবস্থা করিয়া আসেন। কবির ইচ্ছা ছিল বাংলার ছেলে ও বিশেষভাবে বাংলার মেয়েরা এই আত্মরক্ষা বিদ্যাটি আয়ত্ত করে। বাংলাদেশে নারী নির্যাতন ও অপমান নিত্য ঘটনা, দুর্বৃত্তদের হাত হইতে আত্মরক্ষার এই সহজ অস্ত্রটি বাঙালি আনন্দে গ্রহণ করিবে ইহাই ছিল কবির আশা। শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় খুলিলে ছাত্রছাত্রীরা মহোৎসাহে ব্যায়াম অভ্যাসে ব্রতী হইল— কবি প্রায়ই স্বয়ং সেইসব দেখিতে আসেন।

তাকাগাকি আসিবেন স্থির হইলে— জুজুৎসুক্রীড়ার জন্য একটি টিনের ঘর নির্মিত হইল; কত বড় ঘর, কত দৈর্ঘ্য প্রস্থ প্রয়োজন সেসব তথ্য না জানিয়াই ঘর তৈয়ারী হইল। তাকাগাকি আসিয়া সে-ঘর নাকোচ করিয়া দিলেন। তখন সিংহসদনের মধ্যে ক্রীড়ার জন্য গদি করিয়া খেলা সুরু হইল।

তাকাগাকি শান্তিনিকেতনে প্রায় দুই বৎসর থাকেন; তাঁহার বেতন ও আসা-যাওয়ার খরচ প্রভৃতি ধরিলে প্রায় চৌদ্দ হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে এমন-একজনকেও এই বিদ্যা উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়া লইবার সুযোগ-সুবিধা অবসর দেওয়া হইল না। কর্তৃপক্ষের মনে এ কথার উদয় হইল না যে তাকাগাকি চলিয়া গেলে কে উত্তরসাধক হইবে? অপিসের মনোমোহন ঘোষ নামে এক বলিষ্ঠ যুবক অতিনিষ্ঠার সহিত এই বিদ্যা শিক্ষা করে; কিন্তু অপিসী হীন সড়যন্ত্রের ফলে তাঁহাকে এই কাজ ছাড়িয়া যাইতে হয়। তারপর তাকাগাকি চলিয়া গেলে কয়েক বৎসর সিংহসদনের গদিগুলি অবহেলায় অযত্নে নষ্ট হইয়া গেল; সে-সব সরাইয়া একদিন সেখানে হইল স্টেজ ও দর্শকের জন্য আসিল বেঞ্চ। শৌর্যচর্চার স্থানে নৃত্যচর্চার কেন্দ্র হইল। রবীন্দ্রনাথের এতবড় আয়োজনের কোনো সুযোগ কেহ গ্রহণ করিল না। যদি বাঙালি মেয়েরা এই জুজুৎসু কসরৎ আয়ত্ত করিত, তবে বাংলাবিভাগের মুখে দুর্বৃত্তদের নারী-অত্যাচার হয়তো বাধা পাইত। কবির জীবনে বহু ব্যর্থতা গিয়াছে— কিন্তু জুজুৎসুর ব্যর্থতার মত এমন দুর্ঘটনা বোধ হয় দ্বিতীয়টি ঘটে নাই। কারণ কর্তৃপক্ষ উহা এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেন যে, আশ্রমবাসীর স্মৃতির মধ্যেও জুজুৎসুর স্থান কোথাও নাই।

তপতী লেখার পর সাহিত্যিক নূতন রচনা চোখে পড়ে না— এখন মন গিয়াছে ছবি আঁকায়। তবে শিশুদের জন্য 'সহজপাঠ' দুই খণ্ড রচনা ও প্রকাশনের কথা মনে আছে। রথীন্দ্রনাথকে ১৫ নভেম্বর কবি লিখিতেছেন, "বাংলা সহজপাঠের ব্লকগুলো পেলে অনতিবিলম্বে কাজ আরম্ভ করে দিতে পারি।"[১]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এককালে বাঙালি ছেলেকে বাংলাভাষার রাজ্যে প্রবেশের পথ প্রস্তুত করিয়াছেন, আমাদের যুগে রবীন্দ্রনাথ ভাষা বানান শিক্ষার সঙ্গে ভাবের ছন্দের রূপের মেলা বসাইয়া শিশুদের আকর্ষণ করিলেন, ইহাকে কি নূতন সৃষ্টি বলিব না? রবীন্দ্রনাথ শিশু ও কিশোরদের জন্য যে বিচিত্র সাহিত্য— গদ্যে পদ্যে কাহিনীতে গল্পে গানে নাট্যে হাস্যে— সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার সম্যক আলোচনা আমরা প্রতীক্ষা করিয়া আছি। পূজাবকাশটার

১ চিঠিপত্র ২, পত্র ৩২। সহজপাঠের কতকগুলি লেখা অনেককাল পূর্বের খসড়া-পাতায় দেখা যায়। সহজপাঠ যখন প্রকাশিত হয় তখন কবি য়ুরোপে। ইহার ছবিগুলি নন্দলাল বসু ও কলাভবনের অন্য শিল্পীদের অঙ্কিত। সেইজন্য এই গ্রন্থের উপসত্বর একটা অংশ কলাভবনে প্রদত্ত হয়।

অনেকখানি ছবি আঁকায় ও সহজপাঠ রচনায় কাটিয়া গেলেও সম্পূর্ণ ভিন্ন অভিযানে তাঁহাকে একটি নূতন প্রবন্ধ-রচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়।

শচীন সেন নামে[১] এক তরুণ লেখকের *The Political Philosophy of Rabindranath Tagore* গ্রন্থ পাঠ করিয়া 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিলেন।

কবি লেখেন[২], "আমি প্রথম থেকেই রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গে এই কথাই বারম্বার বলেছি, যে-কাজ নিজে করতে পারি সে-কাজ সমস্তই বাকি ফেলে, অন্যের উপর অভিযোগ নিয়েই অহরহ কর্মহীন উত্তেজনার মাত্রা চড়িয়ে দিন কাটানোকে আমি রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বলে মনে করি নে। আপন পক্ষের কথাটা সম্পূর্ণ ভুলে আছি বলেই অপর পক্ষের কথা নিয়ে এত অত্যন্ত অধিক করে আমরা আলোচনা করে থাকি। তাতে শক্তিহ্রাস হয়। স্বরাজ হাতে পেলে আমরা স্বরাজের কাজ নির্বাহ করতে পারব, তার পরিচয় স্বরাজ পাবার আগেই দেওয়া চাই। সে পরিচয়ের ক্ষেত্র প্রশস্ত। দেশের সেবার মধ্যে দেশের প্রতি প্রীতির প্রকাশ কোনো বাহ্য অবস্থান্তরের অপেক্ষা করে না, তার নির্ভর একমাত্র আন্তরিক সত্যের প্রতি।"

এইটি হইতেছে রাজনীতির একদিকের প্রশ্ন। কিন্তু রাজনীতি আর এখন স্থানিক নহে, পৃথিবী অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইয়া আসিয়াছে; পৃথিবীর মানুষ আজ নানা যান্ত্রিক অনুকুলতায় পরস্পরের এত কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে যে, নিরালার আবরণটুকুও অপসারিত হইয়াছে। সকলের স্বার্থই আজ অত্যন্ত জটিলভাবে ঘনীভূত। সমস্ত দুনিয়াময় যে-সংগ্রাম প্রথম মহাযুদ্ধোত্তরে দেখা দিয়াছিল, তাহা এখন আর কেবলমাত্র ভিন্ন ভিন্ন মহাজাতির রেষারেষির মধ্যে সীমায়িত নহে; এখন তাহা দাঁড়াইয়া গিয়াছে সকল দেশের শাসিত ও শাসক, শোষিত ও শোষক, সর্বহারা ও সর্বহরার সংগ্রামে; সংগ্রাম এখন এক দেশের সহিত আর-এক দেশের নহে— এখন ইহা বিশ্বব্যাপী শ্রেণীসংঘাত-রূপে দেখা দিয়াছে।

আধুনিক জগতের এই শ্রেণীগত সংগ্রামের সমস্যা লইয়া কিছুকাল পূর্বে কবির কানাডায় আলোচনা হয় এক কোরীয়[৩] যুবকের সহিত। কবি সেই কথোপকথনের ভাবধারা লইয়া একটি প্রবন্ধ এই সময়ে লেখেন।[৪] সেটিতে পরাধীন দুর্বল জাতির মুক্তি কেমনভাবে সম্ভবে তাহার আলোচনা আছে। কোরীয় যুবকের মতে পৃথিবীতে "এমন সময় আসবে যখন জাপানী চীনীয় রুশীয় কোরীয় প্রভৃতি নানা জাতির মধ্যে আর্থিক স্বার্থগত রাষ্ট্রীয় প্রতিযোগিতাই সবচেয়ে প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনারূপে থাকবে না।" পৃথিবী শোষিত ও শোষকে বিভক্ত হইয়া যাইবে। "এতদিন নিম্নস্তরের মানুষ নিজের নিম্নতা নতশিরেই মেনে নিয়েছে, ভাবতেই পারেনি যে ওটা অবশ্য-স্বীকার্য নয়।" যুবকের মত এই যে, পরাভূত ও পদানত জাতির দুঃখ ও দৈন্যই তাহাদের মহাশক্তিশালী করিবে।

তাহার কথার ভাবার্থ এই যে, the proletariat of the world অর্থাৎ জগতের সর্বহারার দল সহজে মিলিবে, কিন্তু "যারা ধনিক তারা কিছুতেই একত্র মিলতে পারবে না, স্বার্থের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরে তারা বিচ্ছিন্ন। · · এতকাল

১ Dr. Sachindranath Sen, *The Political Philosophy of Rabindranath Tagore*, 2nd Edition— এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট পুলিনবিহারী সেন -কৃত Bibliography খুব মূল্যবান। ১ম সংস্করণ হইতে ২য় সংস্করণ অনেক তফাত। বর্তমানে শচীন সেন সাংবাদিক সঙ্ঘের সভাপতি।

২ রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত, প্রবাসী ১৩৩৬ অগ্রহায়ণ। দ্র. কালান্তর, নূতন সংস্করণ, পৃ. ৩৪১-৩৫২।

৩ কোরিয়া (Korea) আমাদের আলোচ্যপর্বে (১৯২৯) জাপানের অধীন। ১৯১০ হইতে ১৯৪৫ পর্যন্ত জাপানের অধীন ছিল।

৪ কোরীয় যুবকের রাষ্ট্রীয় মত, প্রবাসী ১৩৩৬ পৌষ, পৃ. ৩২১-২৪। দ্র. রাশিয়ার চিঠি, পরিশিষ্ট পৃ. ২০৯-১৮।

দুঃখীরাই দৈন্য দ্বারা অজ্ঞানের দ্বারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল ; ধনের মধ্যে যে শক্তিশেল আছে তাই দিয়েই তাদের মর্ম বিদ্ধ হয়েছে। আজ দুঃখদৈন্যেই আমরা মিলিত হব আর ধনের দ্বারাই ধনী হবে বিচ্ছিন্ন।" ইতিহাসে আজ তো সেই রূপই দেখা যাইতেছে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনের সন্দেহ যায় না। ভেদ ঘুচিলেই কি মিলন হইবে ? "পৃথিবীর সমস্ত মরুভূমি ঝড় বৃষ্টির ঝাঁটার তাড়নায় ক্ষয় পেয়ে পেয়ে একদিন সমুদ্রের গর্ভে তলিয়ে যাবে এমন কথা শোনা যায়, কিন্তু সেইদিনই কি পৃথিবীর মরবার সময় আসবে না ? সমত্ব এবং পঞ্চত্ব কি একই কথা নয় ? ভেদ নষ্ট ক'রে মানবসমাজের সত্য নষ্ট করা হয়। ভেদের মধ্যে কল্যাণ সম্বন্ধ স্থাপনই তার নিত্যসাধনা, আর ভেদের মধ্যকার অন্যায়ের সঙ্গেই তার নিত্যসংগ্রাম। এই সাধনায় এই সংগ্রামেই মানুষ বড়ো হয়ে ওঠে।" বিপ্লবের দ্বারা সংস্কার আনিতে হইবে— এ মতবাদ রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সমর্থন করা সম্ভব নহে ; কারণ, সমগ্রের দৃষ্টিতে তিনি সমস্যাকে দেখেন— সাময়িক বা স্থানিক দৃষ্টিতে নহে। তাঁহার চোখে ধনিকের শাসন ও শ্রমিকের শাসনের মধ্যে ভেদ নাই ; একশ্রেণীগত জুলুমের বদলে অন্য-এক শ্রেণীগত জুলুমের আমদানি হইলেই সামাজিক সমস্যা নিরাকৃত হইবে না, ভেদ ঘুচিবে না। আসলে এ প্রশ্নের শেষ উত্তর হয় নাই। সাধারণ মানুষ পরিবর্তনের জন্য ব্যাকুল, ধনের শাসন তাহার অসহ্য। কিন্তু গণের শাসন কী রূপ লইবে তাহা কে জানে ?

পূজাবকাশের সময় কবি শান্তিনিকেতনে ; তাঁহার কাছে বেড়াইতে আসিল বুলা বা উমা সেন— স্বর্গীয় মোহিতচন্দ্র সেনের কন্যা। বুলা ও তাহার জ্যেষ্ঠা মীরা ১৯০৯-১০ সালে শান্তিনিকেতনে তাহাদের মাতা সুশীলা দেবীর সঙ্গে বাস করিত, তখন তাহারা বালিকামাত্র। এখন বুলা বিবাহিতা, তাহার কবিত্বশক্তি কবিকে মুগ্ধ করে ও তিনি তাহার 'বাতায়ন' নামে কাব্যের ভূমিকাও লিখিয়া দেন (১ বৈশাখ ১৩৩৭)। এই কন্যার মধ্যে অতিপ্রাকৃত 'মিডিয়াম'এর শক্তি দেখা দেয়। এই ব্যাপারে কবির খুবই কৌতূহল হয় এবং পূজার ছুটিতে বুলার মাধ্যমে অতি-প্রাকৃত লোকের রহস্য উদ্‌ঘাটনে মন দেন। বাল্যকালে ও যৌবনে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং প্লানচেট্ লইয়া কখনো কৌতুকছলে, কখনো কৌতূহলবশে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। বৃদ্ধবয়সে এতকাল পরে পরিচিতা কন্যার মিডিয়ামে অতিপ্রাকৃত রহস্যলোকে প্রবেশের ইচ্ছা হইল। বুলার অসামান্যতার কথা কবির মুখে শুনিয়াছি। অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন করিবার সঙ্গে সঙ্গে অসম্ভব ক্ষিপ্রবেগে তাহার কম্পমান হস্ত হইতে উত্তর লেখা হইয়া যাইত। প্রশ্নের উত্তর দেখিয়া কবি স্তম্ভিত। একদিনের কথা রানী দেবীকে লিখিতেছেন, "ইতিমধ্যে পরশু বুলার হাতে একটা লেখা বেরিয়েছে তাতে নাম বেরোল না। বললে, নাম জিজ্ঞাসা কোরো না, তুমি মনে যা ভাবছ আমি তাই। তার পরে যেসব কথা বেরোল সে ভারি আশ্চর্য। তার সত্যতা আমি যেমন জানি আর দ্বিতীয় কেউ না।"[১] কবির অদৃশ্য-লোকের এই রহস্যময়ী তাঁহারই বউঠাকুরানী কাদম্বরী দেবী। বলা বাহুল্য কবিরই মনের ভাবনা মিডিয়ামে মনের উপর তাহার অদৃশ্য প্রভাব ফেলিয়া এই আপাতদৃষ্টিতে অলৌকিক ঘটনার আবির্ভাব ঘটায়। সাধারণ লোকে ইহাকে ভৌতিক ও আত্মিক ব্যাপার বলিয়া রাহস্যিক করিয়া তোলে।

কবিজীবনের এই দিকটা আমাদের কাছে অত্যন্ত রহস্যময়। প্রায় দশ বৎসর পর মংপুতে বাসকালে মৈত্রেয়ী দেবীর সহিত এসব বিষয় লইয়া দীর্ঘ আলোচনা হয় ; তিনি বলেন, "পৃথিবীতে কত কিছু তুমি জানো না, তাই বলেই সেসব নেই ? কতটুকু জানো ? জানাটা এতটুকু, না জানাটাই অসীম— সেই এতটুকুর উপর নির্ভর ক'রে চোখ

১ পথে ও পথের প্রান্তে, পত্র ৪৪ : ১০ নভেম্বর ১৯২৯।

বন্ধ ক'রে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া চলে না। আর তা ছাড়া এত লোক দল বেঁধে ক্রমাগত মিছে কথা বলে, এ আমি মনে করতে পারিনে। তবে অনেক গোলমাল হয় বৈকি। কিন্তু যে বিষয়ে প্রমাণও করা যায় না, অপ্রমাণও করা যায় না, সে-সম্বন্ধে মন খোলা রাখাই উচিত। যে-কোনো একদিকে ঝুঁকে পড়াই গোঁড়ামি।"[১]

শান্তিনিকেতন হইতে নভেম্বরের গোড়ায় কয়েকদিনের জন্য কবিকে কলিকাতায় যাইতে হয়।[২] কিন্তু শান্তিনিকেতনেই দিন কাটে।

'মহুয়া' কাব্য ১৩৩৬ সালের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। নিজ কাব্য হইতে প্রেমের কবিতা বাছিয়া 'বরণডালা' ওরফে 'রাখী' নামে সংগ্রহটা করিয়াছিলেন সেটিকে পুস্তকাকারে প্রকাশের কথা ভাবিতেছেন; এছাড়া সহজপাঠ আরম্ভ করিবার সংকল্প করিতেছেন। বরোদার "বক্তৃতা লেখা শেষ হলেই লক্ষ্মীর পরীক্ষাটাকে মেজে ঘষে বাড়িয়ে নাচ গান জুড়ে তৈরি করে" দেবেন এমন কথাও মনে হইতেছে। তবে সহজপাঠ ছাড়া আর কোনোটাই কার্যে পরিণত হয় নাই। অবশ্য বরোদার বক্তৃতাটা লিখিতেই হয়।[৩]

অতঃপর যথাসময়ে সাতই পৌষ সম্পন্ন করেন। ভাষণান্তে রানী দেবীকে লিখিতেছেন, "ভিতরকার গভীর কথাকে প্রকাশ করার দ্বারা যে একটা শান্তি আসে আজ সেই শান্তি আমার মনের উপর বিরাজ করছে।"[৪]

পৌষ-উৎসবের কয়েকদিন পরে কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে মাঘোৎসবের সময় কে উপাসনা করিবে কী ব্যবস্থা হইবে ইত্যাদি জানিবার জন্য ইন্দিরা দেবী কবিকে পত্র দেন। তাহার উত্তরে কবি লেখেন, "দীনু থাকবে গানের অধিনায়ক— ক্ষিতিমোহন বাবুকে বলে রেখেছি বেদীর কাজ করবেন।··বাড়িতে আত্মীয়দের মধ্যে এমন কেউ নেই যে অনুষ্ঠানটাকে জমিয়ে তুলতে পারে।··যে জিনিসে প্রাণশক্তির অভাব, ইঞ্জেকসনের চোটে তাকে ধড়ফড়িয়ে তুলে মনে সান্ত্বনা পাইনে।··মৃতের ভার বহন করতে আমি উৎসাহ পাইনে— অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা উচিত কিন্তু যেন সে অতীত নয় তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করাটা অসঙ্গত।"[৫]

কবির এই উক্তি সত্য। আদি ব্রাহ্মসমাজ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারের মধ্যে আবদ্ধ রাখার জন্য, উহা আজ বাংলাদেশের ইতিহাস হইতে প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। অথচ শতাব্দীকাল পূর্বে এই সমাজই বাঙালির ধর্ম ও সংস্কৃতিকে পাশ্চাত্যের দুরন্ত অভিযান হইতে রক্ষা করিয়াছিল। আদিসমাজ সে শক্তি হারাইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্বে (১৯১১) এই সমাজকে পুনর্জীবিত করিবার আশায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদকত্ব গ্রহণ করেন ও কনিষ্ঠ জামাতাকেও ইহার সহিত যুক্ত করেন। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধস্থাপনেরও চেষ্টা হয়। য়ুরোপ পরিভ্রমণের পর কবির বিশ্ববিশ্রুতির সঙ্গে সঙ্গেই আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার মমত্ব ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে। আজ রবীন্দ্রনাথ নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে আদিসমাজকে দেখিতেছেন— পরিবারগত বা সমাজগত কোনো বন্ধনই তাঁহাকে উদ্‌বোধিত করিতেছে না। মাঘোৎসব একটা ritual বা সংস্কারে পরিণত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের

১ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, পৃ. ৭৭-৭৮।

২ ৮ নভেম্বর ইন্দিরা দেবীকে লিখিতেছেন, "আজ সকালে সুধী-র হঠাৎ মৃত্যু হয়েছে।···তিন দিন আগে খুব হাঁপানিতে কষ্ট পাচ্ছিল। আমার কাছ থেকে ওষুধ খেয়ে সেটা সেরে যায়। তার পরেই আজ হঠাৎ এই বিপদ।"—চিঠিপত্র ৫, পত্র ২০। সুধীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র। যৌবনে সাধনা পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ইহার পুত্র সৌম্যেন্দ্রনাথ সে-সময় য়ুরোপ ছিলেন।

৩ চিঠিপত্র ২, পত্র ৩৪; ১৫ নভেম্বর ১৯২৯ [শান্তিনিকেতন ২৯ কার্তিক ১৩৩৬]।

৪ পথে ও পথের প্রান্তে, পত্র ৪৬, পৃ. ১০২।

৫ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৩১; ১০ জানুয়ারি ১৯৩০, শান্তিনিকেতন, পৃ. ৭২।

অমনোযোগের ফলে রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত 'ব্রহ্মমন্দির' ধ্বংস হইল। প্রেস উঠিয়া গেল, বিরাট পিয়ানো সরাইয়া শান্তিনিকেতন মন্দিরে লইয়া যাওয়া হইল। কালে সেই ব্রহ্মমন্দির চিৎপুরের হকার ও ভিখারীর আবাস হইয়াছিল। আদি ব্রাহ্মসমাজে মাঘোৎসব সম্বন্ধে পত্র যেদিন লেখেন সেই দিনই (১০ জানুয়ারি ১৯৩০) কবি বরোদা অভিমুখে যাত্রা করিলেন— সঙ্গে ধীরেন্দ্রমোহন সেন ও অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী। ধীরেন্দ্রমোহন পাঁচ বৎসর ইংলণ্ডে বাস করিয়া ডক্টর হইয়া সবেমাত্র দেশে ফিরিয়াছেন; অমিয়চন্দ্র কবির সেক্রেটারিরূপে এখন নিযুক্ত আছেন। কবির বরোদায় বক্তৃতার দিন ২৭ জানুয়ারি; তৎপূর্বে লখনৌ এবং কানপুর ঘুরিয়া আহমদাবাদ গিয়া অম্বালাল সরাভাইদের গৃহে গিয়া উঠিলেন। বক্তৃতার পূর্বদিন (২৬ জানুয়ারি) কবি বরোদা পৌঁছিলেন, সেখানে তিনি রাজ-অতিথি।

কবির বক্তৃতার বিষয় ছিল Man the Artist। এই ভাষণের দিন সায়াজীরাও গায়কাবাড় সভায় উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর ৩০ জানুয়ারি বরোদার শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে ছাত্র ও অধ্যাপকদের সম্মুখে শিক্ষাসমস্যা লইয়া আলোচনা করেন।[১]

কবি যখন পশ্চিম-ভারতে তখন কলিকাতায় তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া একটা অত্যন্ত অশান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্ট হইতেছে— সে সংবাদ কবি পাইতেছেন না। বরোদাযাত্রার পূর্বে কবি কলিকাতার আহূত বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মেলনের ঊনবিংশ বাৎসরিক অধিবেশনের সভাপতির পদগ্রহণে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। সম্মেলনের দিন স্থির হয় ২ ফেব্রুয়ারি। কবি সফর করিতে করিতে বুঝিতে পারিলেন যে, যথাসময়ে সম্মেলনে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব তাই তাঁহার ভাষণ লিখিয়া তিনি কলিকাতায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট পাঠাইয়া দেন। কবি সভায় উপস্থিত না হওয়ায় লোকে খুবই মর্মাহত হয়— তাহারা কবিকে তাহাদের মধ্যে চাহিয়াছিল— ভাষণে তাহারা তৃপ্ত নহে। কবি ফেব্রুয়ারির গোড়ায় ফিরিলেন বটে, তখন সম্মেলন শেষ হইয়া গিয়াছে; তাঁহার ভাষণ সম্মেলনের শেষ দিন স্বর্ণকুমারী দেবী পাঠ করিয়া দেন (৪ ফেব্রুয়ারি)।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া কবি সকল কথা শুনিয়া কয়েকদিন পরে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে এক পত্রে লেখেন (১১ ফেব্রুয়ারি)— "বরোদার পথে আহমদাবাদে শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হয়। যখন নিশ্চয় বুঝলুম কোনোমতে সাহিত্যসম্মেলনে এ শরীর নিয়ে পৌঁছতে পারব না তখন বহু কষ্টে ডাক্তারের নিষেধ অমান্য ক'রে একটা লেখা অবনের মারফত সম্মেলনের কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছিলেম। দেশের লোক আমাকে সহজে ক্ষমা করেন না জেনেই এই কষ্টসাধ্য কাজ করতে হয়েছিল। তাও ব্যর্থ হল— ক্ষমা পাই নি। শুনলুম ডাকপেয়াদার মারফত না গিয়ে অবনের মারফতে লেখাটা যাওয়াতে তাঁরা অসম্মানের ক্ষোভে লেখাটার অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। এসকল বিষয়ে আমার বুদ্ধির ত্রুটি আছে, কিন্তু কাউকে অসম্মান করবার কারণ ও ইচ্ছা আমার ছিল না। এত ক্লেশ করে আমার জীবনে আর কোনোদিন লিখি নি। এর থেকে প্রমাণ হয় স্বদেশবাসীকে আমি যমদূতের চেয়ে বেশি ভয় করতে আরম্ভ করেছি। যতটা সম্ভব দূরে থাকবারই চেষ্টা করব।"[২]

১ ১৯২৮-এ বরোদা কলেজের অধ্যাপক Anthony X. Soares রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি প্রবন্ধ হইতে *Lectures and Addresses* নামে গ্রন্থ সম্পাদন করেন। উহা কলেজে পাঠ্য ছিল। প্রবন্ধ সূচী—

1. My Life, 2. My School, 3. Civilization and Progres, 4. Construction vs. Creation 5. Nationalism in India, 6. International Relations, 7. The Voice of Humanity, 8. The Realization of the Infinite।

২ পত্রখানি প্রকাশিত হয় প্রবাসী ১৩৪৮ আষাঢ়, পৃ. ২৭৬। রবীন্দ্রনাথ 'পঞ্চাশোর্ধ্ব' শীর্ষক প্রবন্ধ সম্মেলনের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। বিচিত্রা ১৩৩৬ ফাল্গুন, পৃ. ৩৩০-৩৫। প্রবাসী ১৩৩৭ বৈশাখ, পৃ. ৫৮-৬০। সাহিত্যের পথে, ১৩৬৫ সংস্করণ, পৃ. ২৩১-২৪১।

সাহিত্যসম্মেলনের জন্য 'পঞ্চাশোর্ধ্ব' নামে যে ভাষণটি পাঠান তাহা রোগশয্যায় আহমদাবাদে লিখিত। কবির দুর্বল শরীরের স্পর্শ এই রচনায় রহিয়া গিয়াছে। দুর্বলভাবে আপনার সাহিত্যের মর্যাদা বা মানের অস্পষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। সমসাময়িক তরুণ সাহিত্যিকরা তাঁহার রচনাকে যে ক্লাসিক্‌সের সঙ্গে শ্রেণীত করিয়াছে, কালাতিক্রমণ করিয়া তিনি 'পথরুধি' আছেন ইত্যাদি মতামতের মৃদু ও দুর্বল সমালোচনা।

কবি জানেন, সাহিত্যে শিল্পকলায় কোনো মানই স্থায়ী নহে। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিক ও শিল্পীদের আসন সরিয়া সরিয়া যায়। সাহিত্য ও শিল্পে স্থায়ী বস্তু নিশ্চয়ই আছে, নহিলে প্রাচীন অনেক কিছুই লুপ্ত বা বিনষ্ট হইয়া যাইত। কিন্তু "স্থায়ী প্রতিষ্ঠা স্থির থাকা সত্ত্বেও উপস্থিত কালের মহলে ঠাঁইবদলের আদেশ আসে; তখন এই নূতনে ও পুরাতনে সংঘাত ঘটে। পুরাতন তাহার জীর্ণতা ত্যাগ করিয়া আঙিনা ছাড়িতে চায় না সহজে; আবার নূতন কালের প্রয়োজনটা যে কী সেটাও যথাযথভাবে সাব্যস্ত হইতে সময় লাগে। কারণ নূতন কালের মান রক্ষা করে চললেই যে কালের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করা হয় এ কথা" বলা যায় না।

নানা পুঞ্জীভূত কারণে য়ুরোপে সাহিত্য শিল্প ও কলায় ঠিক সেই রকম ভূমিকম্প দেখা দিয়াছে, যেমন দেখা দিয়াছে তাহার রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে। সর্বত্রই অধৈর্যের লক্ষণ। "যেখানে বিদ্রোহী চিত্ত সব কিছু উলট্‌পালট করবার জন্য কোমর বাঁধল; গানেতে ছবিতে দেখা দিল তাণ্ডবলীলা। কী চাই সেটা স্থির হল না, কেবল হাওয়ায় একটা রব উঠল, 'আর ভালো লাগছে না'। যা করে হোক আর-কিছুই একটা ঘটা চাই।" এইটা হইতেছে ভিক্‌টোরিয়া যুগের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াপর্ব। এমন সময় আসিল প্রথম-মহাযুদ্ধ। "সম্পদের জয়তোরণ তলার উপর তলা গেঁথে ইন্দ্রলোকের দিকে চূড়া তুলেছিল, সেই ঔদ্ধত্য ধরণীর ভারাকর্ষণ সইতে পারল না, এক মুহূর্তে হল ভূমিসাৎ।" সভ্যতার এই ভয়ংকর রূপ অকস্মাৎ দেখিতে পাইয়া জীবনের কোনো কিছুরই স্থায়িত্বের প্রতি শ্রদ্ধা একেবারে শিথিল হইয়া গেল যৌবনের।

ইহারই ফলে সমাজে সাহিত্য কলা রচনায় অবাধে নানা প্রকারের অনাসৃষ্টির সূত্রপাত। প্রবন্ধ শেষে কবি বলিতেছেন—

"পথে চলতে চলতে মর্তলীলার প্রান্তবর্তী ক্লান্ত পথিকের এই নিবেদন-পত্র সংকোচে 'তরুণসভায়' প্রেরণ করলেম। এই কালের যাঁরা অগ্রণী তাঁদের কৃতার্থতা একান্তমনে কামনা করি। নবজীবনের অমৃতপাত্র যদি সত্যই তাঁরা পূর্ণ ক'রে এনে থাকেন, আমাদের কালের ভাণ্ড আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে যদি রিক্ত হয়েই থাকে, আমাদের দিনের ছন্দ যদি এখনকার দিনের সঙ্গে নাই মেলে, তবে তার যথার্থ নূতন কাল সহজেই প্রমাণ করবেন— কোনো হিংস্রনীতির প্রয়োজন হবে না। নিজের আয়ুর দৈর্ঘ্যের অপরাধের জন্য আমি দায়ী নই; তবে সান্ত্বনার কথা এই যে, সমাপ্তির জন্য বিলুপ্তি অনাবশ্যক। সাহিত্য পঞ্চাশোর্ধ্বম্ নিজের তিরোধানের বন নিজেই সৃষ্টি করে, তাকে কর্কশকণ্ঠে তাড়না করে বনে পাঠাতে হবে না।"[১]

পশ্চিম-ভারত সফরান্তে (১০ জানুয়ারি, ৫ ফেব্রুয়ারি) ফেব্রুয়ারির গোড়ায় কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন। শ্রীনিকেতনের সাম্বৎসরিক উৎসবে এলমহার্স্ট সপরিবারে আসিয়াছেন। এলমহার্স্টের স্ত্রী হইতেছেন সেই আমেরিকান ধনী বিধবা যিনি ১৯২২ সাল হইতে শ্রীনিকেতনের জন্য প্রতি বৎসর পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়া আসিতেছেন। ইনি

১ সাহিত্যের পথে, পৃ. ২৪১।

পিতৃকুল ও স্বামীকুলের প্রচুর ধনসম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। এলমহার্স্টকে বিবাহের পূর্বে ইনি ছিলেন মিসেস্ ডোরোথি স্ট্রেট্।

ইহাদের লইয়া শান্তিনিকেতনে কয়েকদিন খুবই আনন্দ-উৎসব চলিল— বহু কৌতুকপ্রদ ঘটনাও ঘটিল।

১০ ফেব্রুয়ারি শ্রীনিকেতনে বাংলাদেশের সমবায় সমিতির প্রতিনিধিদের একটি সম্মেলন আহূত হয়। প্রায় ২৭৩ জন সদস্য উপস্থিত হন; বাংলাদেশের গবর্নর সার্ স্ট্যানলি জ্যাকসন সভা উদ্বোধন ও এলমহার্স্ট সভাপতিত্ব করেন। বিশ্বভারতীর কোনো অনুষ্ঠানে গবর্নরকে নিমন্ত্রণ এই প্রথম; এই ব্যাপার লইয়া কাগজপত্রে রবীন্দ্রনাথকে সমালোচনার ভাগী হইতে হয়, অথচ এসব বিষয়ে তাঁহার প্রত্যক্ষ কোনো যোগ ছিল না।

বরোদা হইতে ফিরিবার এক মাস মধ্যেই কবি য়ুরোপযাত্রা করেন। সুতরাং এই সময়টায় "কাজের ঝঞ্ঝাটে পড়ে কলম বন্ধ করে" আছেন।[১] কিন্তু কাজের ঝঞ্ঝাট ছাড়া "শরীর অলস, মনটা মন্থর। শক্তির গোধূলি।·· কোনো বিশেষ অসুখ আছে তাও নয়, জীবনের স্রোতটা থমথমে। বাইরের দিকে চেয়ে আছি তো চেয়েই আছি।"[২]

কিন্তু মন চাঙ্গা হয়, যখন 'ঋতুরঙ্গ' অভিনয়ে মেয়েদের 'অভ্যাস' করানোর জন্য ডাক আসে— "ওরা অঙ্গভঙ্গিমার লতানে রেখা দিয়ে গানের সুরের উপর নক্শা কাটতে থাকে।" এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করিয়া পত্রমধ্যে নৃত্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা আছে। এই পত্রে 'লোকহিত-ব্রতপরায়ণ সন্ন্যাসী'দের উপর যেন একটু ঝাঁঝ প্রকাশ পাইয়াছে। কবি বলেন, "বাস্তব সংসারে দুঃখ দৈন্য শ্রীহীনতার অন্ত নেই" তাই "দরিদ্রনারায়ণকে বৈকুণ্ঠের সিংহাসনেই বসাতে হবে, তাঁকে লক্ষ্মীছাড়া করে রাখব না।"[৩]

য়ুরোপ তো যাইতেছেন, কিন্তু ভাবনারও শেষ নাই, পিছুটানেরও অন্ত নাই। বিশ্বভারতীর চিরদারিদ্র্য সত্ত্বেও রথীন্দ্রনাথ প্রতিমা দেবী, তাঁহাদের পালিতা কন্যা সকলকে লইয়া য়ুরোপ ভ্রমণে চলিয়াছেন। এই দারিদ্র্য ও অভাবের সময়ে শান্তিনিকেতনের ভার প্রমদারঞ্জন ঘোষের ন্যায় সত্যনিষ্ঠ বিবেকী কর্মীর উপর সমর্পণ করিয়া কবি নিশ্চিন্ত। বিদ্যালয়ের যে-সব আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন তাহার আলোচনা হইতে আমরা নিবৃত্ত থাকিলাম। বিদেশে যাইবার মুখে মনে নানা দ্বন্দ্ব, নানা ভাবনা— তাহার মধ্যে একটি বেদনামুখর গান অকস্মাৎ উৎসরিত হইল—

> এবার বুঝি ভোলার বেলা হল—
> ক্ষতি কী তাহে যদি বা তুমি ভোল।[৪]

১ চিঠিপত্র ৫, পৃ. ২৯১। প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত পত্র ১০৭।

২ পথে ও পথের প্রান্তে, পত্র ৪৭। ইতি তারিখ ভুলেছি— ফেব্রুয়ারি ১৯৩০।

৩ পথে ও পথের প্রান্তে, পৃ. ১০৫।

৪ রচনা, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০ শান্তিনিকেতন। প্রবাসী ১৩৩৬ চৈত্র। দ্র. গীতবিতান, পৃ. ৮৯৬। এই গানের আর-একটি রূপ—স্বপনে দোঁহে ছিনু কী মোহে (গীতবিতান, পৃ. ৩৩১)।

য়ুরোপে শেষবার

১৯৩০ মার্চ ২ রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে য়ুরোপযাত্রা করিলেন (১৩৩৬ ফাল্গুন ১৮) অর্থাৎ রথীন্দ্র, প্রতিমা দেবী ও তাঁহাদের পালিতা কন্যাটিও সঙ্গে চলিয়াছেন। কবির সেক্রেটারির কাজ করিবেন মিঃ আরিয়াম (আর্যনায়কম্)। রথীন্দ্রনাথের শরীর ভালো নয়— য়ুরোপ চলিয়াছেন চিকিৎসা ও বিশ্রামের জন্য। কলম্বোর পথে মাদ্রাজে রথীন্দ্রনাথের শরীর এমনই খারাপ হইল যে অবশেষে ডাক্তার সঙ্গে লইতে হইল; এই ডাক্তার হইতেছেন সুহৃৎনাথ চৌধুরী— দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা, আশুতোষ ও প্রমথ চৌধুরীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা; ইনি প্রথম-মহাযুদ্ধের সময়ের I.M.S.। কবি লিখিতেছেন, "সঙ্গে আছেন ডাক্তার নলিনীরঞ্জন the first"; দ্বিপেন্দ্রনাথের কন্যার নাম 'নলিনী'।

এই বিরাট বাহিনী লইয়া কবি মার্সেলস পৌঁছিলেন ২৬ মার্চ। সকলে গিয়া উঠিলেন চিরঅতিথিবৎসল কাহ্নের কাপ মার্তা (Cap Martin)-র বাড়িতে। এখানে কয়েকদিন থাকিবার পর রথীন্দ্রনাথরা গেলেন সুইসদেশে— কবি গেলেন আরিয়ামকে লইয়া প্যারিসে। কাপ মার্তার অদূরে পৃথিবীর আন্তর্জাতিক জুয়াড়িদের স্বর্গ মন্টিকার্লো; কাপ মার্তার সমুদ্রসৈকতের আকর্ষণেও আসে দেশবিদেশের লোক; এবার তাহাদের মধ্যে ছিলেন চেকোস্লোভাকিয়া রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট মাসারিক (Masaryk); কবির সঙ্গে একদিন দেখাশুনা হয়।

রবীন্দ্রনাথ এখন চিত্রশিল্পী— তুলিতে কালিতে রেখায় রঙে মন আছে নিমগ্ন। প্যারিসে পৌঁছিয়া ইন্দিরা দেবীকে লিখিতেছেন, "ধরাতলে যে রবিঠাকুর বিগত শতাব্দীর ২৫শে বৈশাখ অবতীর্ণ হয়েচেন তাঁর কবিত্ব সম্প্রতি আচ্ছন্ন— তিনি এখন চিত্রকর রূপে প্রকাশমান।"[১]

য়ুরোপের মনীষীরা রবীন্দ্রনাথকে এতদিন কবি সাহিত্যিক শিক্ষাশাস্ত্রী বলিয়া জানিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু এবার তাহারা কবির চিত্রকর রূপের নূতন পরিচয় লাভ করিল। কবি লিখিতেছেন, "আমার এই শেষ কীর্তি এই দেশেই রেখে যাব।"

ফ্রান্সে পৌঁছিবার মাসাধিককাল পরে বহু চেষ্টার পর প্যারিসে Gallery Pigalle-তে ২ মে কবির প্রথম চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইল। সেখানে ১২৫ খানি ছবি প্রদর্শিত হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, "ঘর পেলেই ছবির প্রদর্শনী আপনিই ঘটে— অত্যন্ত ভুল। এর এত কাঠ খড় আছে যে সে আমাদের পক্ষে অসাধ্য— আঁদ্রে-র (Andre Karpelles) পক্ষেও। খরচ কম হয় নি— তিন চারশো পাউণ্ড হবে।... ভিক্টোরিয়া (Victoria Ocumpo) অবাধে টাকা ছড়াচ্ছে।...এখানকার সমস্ত বড়ো বড়ো গুণীজ্ঞানীদের ও জানে— ডাক দিলেই তারা আসে। ভিক্টোরিয়া যদি না থাকত তা হলে ছবি ভালোই হোক্ মন্দই হোক্ কারো চোখ পড়ত না।... কঁতেস দ নোআলিস-ও[২] উৎসাহের সঙ্গে লেগেচে— এমনি করে চারি দিক সরগরম করে তুলেচে।"[৩]

য়ুরোপে কেন, সমস্ত পাশ্চাত্য জগতে, প্যারিস আর্টসমঝদার ও আর্টিস্টদের প্রধান কেন্দ্র; তাই কবির বিশ্বাস

১ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৩২; ২৬ এপ্রিল ১৯৩০।

২ Isodora Duncan তাঁহার *My Life*-এ বলিয়াছেন, "the inspired face of the Sapho of France, Comtesse de Noailles" (Indian Ed., p. 105)।

৩ চিঠিপত্র ৩, পত্র ৩৯; পৃ. ৯৬।

"ফ্রান্সের মত কড়া হাকিমের দরবারেও শিরোপা মিলেচে— কিছুমাত্র কার্পণ্য করেনি।"[১] প্যারিসের দিনগুলি নানা অনুষ্ঠানের ঘূর্ণিপাকে কাটিলেও ছবিআঁকা নিত্য চলিতেছে; "অবকাশ নামক বিশুদ্ধ স্বদেশী মাল এদেশে পাওয়া যায় না।"

প্যারিসের ভারতীয় সমিতির উদ্যোগে কবির জন্মোৎসব নিষ্পন্ন হইয়া গেলে কবি আরিয়ামকে লইয়া ১১ মে লণ্ডন যান ও দুই দিন পরে বার্মিংহামে (১৩ মে)। বার্মিংহাম শিল্পনগরীর নিকট কোয়েকার সম্প্রদায়ের কেন্দ্র Woodbrooke; সেখানকার Sellyoak College এই সম্প্রদায়ের বিদ্যা প্রতিষ্ঠান। কবি উড্‌ব্রুকে আসিলেন। এই সময়ে অমিয় চক্রবর্তী[২] ও তাঁহার পত্নী সেখানে আছেন; ইঁহাদের পাইয়া কবি খুবই খুশি। ইহার উপর উড্‌ব্রুকের কোয়েকার বন্ধুদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও যত্ন পাইয়াও মন আনন্দিত। আয়তনবাসীরা প্রায় প্রতিদিন কবির নিকট হইতে কিছু-না-কিছু উপদেশ শোনে। একদিন সভ্যতা ও প্রগতি (civilization and progress) সম্বন্ধে একটি ভাষণ পাঠ করেন।

কবি ২ মার্চ কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছেন, ১৩ মে উড্‌ব্রুক আসিলেন; এই দেড় মাসের মধ্যে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে বহু পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে— গান্ধীজির আইন-অমান্য আন্দোলন, শোলাপুরের হাঙ্গামা, চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, হিন্দু-মুসলমানের হাঙ্গামা, কংগ্রেসকে বে-আইনি ঘোষণা, অবশেষে গান্ধী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের কারাবরণ প্রভৃতি বহু ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে— যাহার স্পষ্ট ধারণা বিদেশী পত্রিকা পড়িয়া সংগ্রহ করা কঠিন।

ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানের সাংবাদিক কবির সহিত মোলাকাত করিতে আসিলে তিনি বলেন, "Those who are experienced in bureaucratic irresponsible government can easily understand how repressive measures like those culminating in the martial law at Sholapur, are bound to react. Though much suppressed, news is trickling through travellers from India telling how cruel and arbitrary punishment are meted out to entirely inoffensive persons. Though such actions were called by the high-sounding names of law and order they are themselves the worst breaches of the law of humanity which I feel are greater than any other law"। শোলাপুরে 'গান্ধীটুপি' মাথায় পরার জন্য পুলিশ জনতার উপর নিদারুণ অত্যাচার করে; রবীন্দ্রনাথ ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। তবে তিনি বলেন, এই বিরোধের মীমাংসা হইতে পারে পূর্ব ও পশ্চিমের best minds-এর মিলনের মাধ্যমে। পূর্বদেশবাসীরা এখনো পাশ্চাত্যসভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে, কিন্তু 'the present complications cannot be dissipated by repression and a violent display of physical power'। ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান ঐদিনকার মোলাকাতের সমালোচনায় লেখেন যে, ভারতের যথার্থ রাষ্ট্রদূত রবীন্দ্রনাথ: *India's ambassador is* not Mahatma Gandhi but *the poet and thinker Tagore.* It is

১ চিঠিপত্র ৫, পত্র ২৩। অক্সফোর্ড। মে ২৭, ১৯৩০।

২ অমিয়চন্দ্রের স্ত্রী হৈমন্তী ডেনমার্কদেশের কন্যা— নাম ছিল মিস্ সিগ্‌গার্ড। ১৯২৬ সালের ডিসেম্বরে ইনি কবির পরিবারের সহিত ভারতে আসেন ও ১৯২৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর অমিয়চন্দ্রকে বিবাহ করেন। তদুপলক্ষে কবি 'পরিণয়মঙ্গল' নামে কবিতা লিখিয়া দেন। ১ পৌষ ১৩৩৪ (১৭ ডিসেম্বর ১৯২৭)। দ্র. পরিশেষ (নূতন সংস্করণ)। অমিয়চন্দ্র দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে কবির সেক্রেটারি ছিলেন, ভারত সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিবার জন্য কোয়েকারদের দ্বারা আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন।

obviously difficult to transact political business with Mr. Gandhi ··· for he (Tagore) is not a saint but a poet and thinker and as such he understands and sympathises with us average man. (23 May)।

উড্‌ব্রুকে ১৩ হইতে ১৭ই মে পর্যন্ত থাকিয়া কবি অমিয় চক্রবর্তী ও এন্‌ড্রুজকে লইয়া অক্সফোর্ড আসিলেন। এন্‌ড্রুজ গত এপ্রিল মাসে মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র হইতে ইংলণ্ডে আসিয়া ভারতের স্বাধীনতার দাবি সম্পর্কে একখানি গ্রন্থ লিখিতেছেন— *India and the Simon Report*। কবি ও তাঁহার সঙ্গীরা অক্সফোর্ডের ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টীয়সমাজের বিখ্যাত যাজক সুপণ্ডিত ও বহু গ্রন্থের লেখক ডক্টর হেনরি ড্রুমণ্ডের বাটীতে উঠিলেন।

১৯ মে অক্সফোর্ডের ম্যানচেস্টার কলেজে কবির প্রথম হিবার্ট বক্তৃতা হইল। ঐ কলেজের অধ্যক্ষ L. P. Jacks (1860) কবিকে সভায় পরিচিত করিয়া দেন। শ্রোতারা thronged the hall to the doors। আর দুইটি বক্তৃতা হইল ২১ ও ২৬ মে। ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান লিখিলেন, No series of the Hibbert lecture has aroused more public interest than the present one। এতদিন সাহিত্যিক বলিয়া রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল, আজ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তন তাঁহাকে তত্ত্বদর্শীর সম্মান দান করিল।

এই সময়ে অক্সফোর্ডে সার্ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন Spalding Professor রূপে আছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার হিবার্ট বক্তৃতামালা দিতে অপারগ হওয়ায় কর্তৃপক্ষ রাধাকৃষ্ণনকে আহ্বান করিয়া আনেন। এইবার একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের এই দুই মনীষীর সংবর্ধনা হইল।

রবীন্দ্রনাথের ভাষণের বিষয় The Religion of Man ; কিছুকাল পরে এই প্রবন্ধগুলির বক্তব্য 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে নূতনভাবে লিপিবদ্ধ করেন। Institutional বা সম্প্রদায়গত ধর্মমতের প্রতি কবির আনুগত্য ছিল এককালে — ব্রহ্মধর্মনীতির উপরেই তাহার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু সম্প্রদায়গত ধর্মবিশ্বাসের শৃঙ্খলে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মননধর্মী কবি ও কবি-ধর্মী মনীষীর পক্ষে বদ্ধ থাকা অসম্ভব। আদি ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডি হইতে তাঁহার মন ক্রমশই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিস্তারিত ক্ষেত্রে আকৃষ্ট হইলেও সেইটিকেই চরম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই ; কারণ তাঁহার আশঙ্কা পাছে বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের নামাবলী তাঁহার অঙ্গে উঠে। হিবার্ট ভাষণের ধর্মদেশনায় কবি হিন্দুশাস্ত্র হইতে সংস্কৃত বা বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ হইতে পালি শ্লোকাদি উদ্‌ধৃত যেমন করিয়াছেন, তেমনই করিয়াছেন মধ্যযুগের সাধুসন্তদের বাণী ও বাংলাদেশের নিরক্ষর আউল-বাউল সাঁই ফকিরের গান। বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের বা বিশেষ ধর্মগ্রন্থের উদ্‌ধৃতি করিলেই তাহা সাম্প্রদায়িক হয় না ; কারণ লেখকমাত্রই বিশেষ দেশ বিশেষ ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে লালিত— সুতরাং তাঁহার পক্ষে সেইটুকু পক্ষপাতিত্ব অনিবার্য। রবীন্দ্রনাথের মানুষের ধর্ম ব্যাখ্যানের মধ্যে আমরা যে ধর্মভূমিকা দেখিতে পাই, তাহা ভারতীয় তাহা হিন্দু তাহা ঔপনিষদিক তাহা ব্রাহ্মধর্মকেন্দ্রিক। তবে হিন্দুধর্মের মধ্যে যাহা সর্বজনগ্রাহ্য তাহাকেই তিনি বিশ্বধর্মের আসন দান করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষণগুলি প্রধানত হিন্দু পটভূমির উপর রচিত হইলেও তাহা বিশ্বমানবের ধর্মসমস্যা পূরণ করিয়াছে ; সেইজন্য কবির ধর্মের নাম *Religion of Man*[১]— মানুষের ধর্ম।

১ *The Religion of Man*, being the Hibbert Lectures for 1930. [Dedicated] To Dorothy Elmhirst : Preface. September 1930. Contents [নিম্নে দ্রষ্টব্য]-এর পরপৃষ্ঠায় কবিতা— The eternal Dream is borne on the wings of ageless Light... লিখিত Santiniketan, September 16, 1929 (Composed for the Opening Day Celebrations of the Indian College, Montepellier, France)। তিনটি বক্তৃতার বিষয়বস্তু কবি ১৫টি পরিচ্ছেদে লিখিয়া গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করেন (in an

রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য শ্রোতাদের নিকট ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রীয় মতবাদের যে ভাষ্য করিলেন, তাহা নহে, তিনি ভারতের জনসমাজের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য রহিয়াছে, তাহারও ব্যাখ্যা করেন। এই 'অশিক্ষিত' সমাজের সাধনার কথা বোধ হয় রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম বিদেশে বিবৃত করেন— অবশ্য ভারতীয় দর্শন-কংগ্রেসের সভাপতিরূপে তিনি যে ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহাতে এই অজ্ঞাত সমাজের সাধনার কথাই ছিল। অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেনের নিকট এ বিষয়ে কবির গভীর ঋণের কথা তিনি গ্রন্থের ভূমিকায় স্বীকার করিয়াছেন।

কবির প্রথম বক্তৃতা হয় ১৯ মে, দ্বিতীয়টি হয় ২১ মে, তৃতীয় বক্তৃতা ২৬ মে। দ্বিতীয় বক্তৃতার পর কবিকে অক্সফোর্ড হইতে লণ্ডন আসিতে হয়[১] সেখানে ২৪ মে কোয়েকারদের বার্ষিক সম্মেলন। কোয়েকাররা শান্তিবাদী বলিয়া জগতে বদনামের ভাগী চিরকাল; এবারও ব্রিটেনের সহিত ভারতের যে রাজনৈতিক ধস্তাধস্তি শুরু হইয়াছে, তাহা শান্তিপথে শমিত করিবার জন্য তাহারা উৎসুক। রবীন্দ্রনাথকে তাহারা ভারতের কথা শুনিবার জন্য আহ্বান করিয়াছে; কোয়েকারদের ২২৬ বৎসরের ইতিহাসে তাহারা তাহাদের সম্প্রদায়ের বাহিরের কোনো ব্যক্তিকে কখনো তাহাদের সম্মেলনে আহ্বান করে নাই; একমাত্র ব্যতিক্রম হইল রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেই।

এই সম্মেলনে ভারতের দুঃখের কারণ কী ও কেন, তাহার কথা কবি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন। তিনি বলেন, যন্ত্ররাজ্যে হৃদয়ের স্থান নাই, গবর্মেণ্ট যন্ত্রচালিত। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যে লোকে এত বেদনা সহিতেছে, তাহার কারণ যন্ত্রচালিত গবর্মেণ্ট নৈর্ব্যক্তিক, হৃদয়হীন। ভারত স্বাধীনতা চায় কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে কবি বলেন— "There can be no absolute independence for man. Interdependence is in his nature and it is the highest goal. All that is best in humanity has been achieved by mutual exchange of minds among peoples that are far apart. Let the best minds of the East and West join hands and establish a truly human bond of interdependence between England and India in which these interests may never clash and they may gain an abiding strength of life through a spirit of mutual service without having to bear a perpetual burden of slavery on one side that of a diseased responsibility on the other which is demoralising"।

enlarged form by dividing the whole subject into chapters instead of keeping strictly to the lecture form in which they were delivered.)। *The Religion of Man* : Contents—

I. Man's Universe, II. The Creative Spirit, III. The Surplus in Man, IV. Spiritual Union, V. The Prophet, VI. The Vision, VII. The Man of my Heart, VIII. The Music-maker, IX. The Artist, X. Man's Nature, XI. The Meeting, XII. The Teacher, XIII. Spiritual Freedom, XIV. The Four Stages of Life. XV. Conclusion.

Appendix : The Baul singers of Bengal [from an account in the Visva-Bharati Quarterly by Prof. Kshitimohan Sen]।

Notes on the Nature of Reality (a conversation between Rabindranath Tagore and Prof. Albert Einstein in the afternoon of July 14, at the Professor's residence in Kapath, Germany)।

Dadu and the Mystery of Form (from an article in the Visva-Bharati Quarterly by Professor Kshitimohan Sen)।

Night and Morning (An address in the chapel of Manchester College, Oxford, on Sunday, 25 May 1930 by Rabindranath Tagore.)।

১ চিঠিপত্র ২, ২৬ মে ১৯৩০— "মাঝে একদিন লণ্ডনে গিয়ে ভারতের বর্তমান সমস্যা সম্বন্ধে কথা কয়ে এসেছি। বক্তৃতাটা ছাপা হয়েছে।"

তিনি এই বক্তৃতার এক অংশে আরও বলিলেন, 'Life creates, machine constructs'— জীবন সৃষ্টি করে, যন্ত্র গড়ে; মানুষকে যখন যন্ত্র সাহায্য করে তখনই সে সার্থক; বিজ্ঞান তখনই মহান যখন সে অজ্ঞানকে দূর করে; কিন্তু যন্ত্র ও বিজ্ঞানের যখন অপবিত্র মিলন হয়, তখন ইহা পৃথিবীতে দুঃখ আনে। মানুষ যখন 'নেশনে'র দোহাই দিয়া কিছু করে বা বলে তখন সে এক মূর্তি ধরে; কিন্তু 'I believe in individuals in the West; for on no account can I afford to lose my faith in man'।

রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার খুব প্রতিবাদ হয়; কোয়েকার সভায় এ প্রথা আছে। রবীন্দ্রনাথকে সমস্ত প্রতিবাদের উত্তর দিতে হইয়াছিল। গ্রেহাম নামে একজন সভ্য বৃটিশ-শাসনের সপক্ষে খুব জোর দিয়া বলেন। রবীন্দ্রনাথ এইসব তর্কবিতর্কের অন্তে বলিলেন যে, শ্রোতাদের আঘাত দিবার জন্য তিনি ভারতবর্ষের অবস্থা সম্বন্ধে কথাগুলি বলেন নাই; তিনি তাঁহাদিগকে মানবের বন্ধু বলিয়া জানেন এবং সেই বিশ্বাসে তিনি তাঁহার কথা বলিয়াছেন, কেহ যেন তাঁহাকে ভুল না বোঝেন।

"I ask you for your co-operation and that you may realise yourselves in our place and recall the time when your own brothers in America wanted to secure their freedom with the blood. Will you realise we want the privilege of serving our own country in our own way and to solve our problems. Give us the right to serve our own country."—The Friend, 30 May 1930, pp. 493-99।

কোয়েকার-সম্মেলন অধিবেশনের পরদিন কবি অক্সফোর্ডে ফিরিয়া আসেন ও ম্যানচেস্টার কলেজের উপাসনাগৃহে (chapel) Night and Morning শীর্ষক ভাষণ দেন (২৫ মে)। এই রচনাটি 'রিলিজন অব্ ম্যান' গ্রন্থের পরিশিষ্টে আছে। সমসাময়িক পত্রিকা লিখিলেন, 'কবির বক্তৃতা শুনিবার জন্য যত লোক আসিয়াছিল, তাহাদের স্থান দিবার মতো শক্তি চ্যাপেলের ছিল না।' আর-একজন লিখিলেন, His English is as beautiful to hear as to read...his words are music।

কবির শেষ বক্তৃতার দিনের (২৬ মে) মত ভিড় আর কোনোদিন হয় নাই; য়ুনিভার্সিটি কলেজের অধ্যক্ষ সার্ মাইকেল স্যাডলার কবিকে বলিলেন "We shall never forget in Oxford the gift you have given us and the inspiration you have brought to us"।

অক্সফোর্ডে হিবার্ট বক্তৃতামালা শেষ হইয়া গেলে কবি পরদিন (২৭ মে) বার্মিংহাম-উড্ব্রুকে ফিরিয়া গেলেন। এবার সেখানে কবি তিন দিন ছিলেন, ইহার মধ্যে একদিন বার্মিংহামে বক্তৃতা দেন— বক্তৃতার বিষয় ছিল পূর্ব ও পশ্চিমের শিক্ষাবিধির আদর্শ।

উড্ব্রুক হইতে কবি ৩০ মে লণ্ডনে আসিয়া 'আর্যভবনে' উঠিলেন। এইটি ভারতীয়দের অতিথিশালা, দানবীর বিড়লাদের প্রতিষ্ঠান। ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনা আলোচনার জন্য কবি একদিন ভারতের হাই-কমিশনর সার্ অতুল চ্যাটার্জির বাসভবনে পার্লামেন্টের শ্রমিকসদস্য ও ভারতসচিব সার্ ওয়েজউড্ বেন-এর সহিত সাক্ষাৎ করেন। সেইদিন কোয়েকারদেরও একটি ডেপুটেশন ভারতের অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনার জন্য ভারতসচিবের নিকট উপস্থিত হয়। গান্ধীজি-প্রবর্তিত আইন-অমান্য আন্দোলনের প্রতিঘাতে ভারতে ব্রিটিশ ও ভারতীয়দের সম্বন্ধ যেভাবে বিপর্যস্ত হইতেছে— তাহার একটা ভালোরকম সম্মানসূচক শান্তিপূর্ণ বুঝাপড়ার জন্য ইহারা উৎসুক।

লণ্ডনের কাজ চুকাইয়া কবি ভাবিতেছেন বার্মিংহাম উড্ব্রুকে ফিরিবেন— সেখানে ২ জুন তাঁহার চিত্রপ্রদর্শনী।

কিন্তু যাওয়া সম্ভব হইল না ; প্রথমেই ৩ জুন PEN ক্লাবের ভোজ। পরদিন ইণ্ডিয়া হাউসের ব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথের সংগীত সম্বন্ধে ডক্টর বাকে (Bake)-র বক্তৃতা ও কবির চিত্রপ্রদর্শনী উন্মোচন। এই সভার সভাপতিত্ব করেন সার্ ফ্রান্সিস ইয়ংহাস্‌ব্যানড। এতদুপলক্ষে কবি বলেন যে, অল্পকাল হইল তিনি ছবি আঁকার মধ্যে একটা আনন্দ অনুভব করিতেছেন ; ইহার গুণাগুণ সম্বন্ধে তিনি অন্ধ। ফ্রান্সের কয়েকজন গুণীর ভরসায় তিনি প্রদর্শনীতে সেগুলি লোকচক্ষুগোচর করিয়াছিলেন। শিশুকাল হইতে শব্দের সহিত তাঁহার পরিচয়, রেখার সহিত নহে। প্রদর্শনীর পূর্বে তাই তিনি মাইকেল স্যাডলার ও ম্যুরহেড্-বোন্‌কে ডাকিয়া তাঁহার ছবি দেখান।[১]

লণ্ডনের কাজকর্ম সারিয়া কবি বিশ্রামের জন্য গেলেন এলমহার্স্টদের বাড়ি টটনেসের ডার্টিংটন হলে (৫ জুন)। অনতিদূরে টোরক্যে (Torquay)-তে রথীন্দ্রনাথ সপরিবারে আছেন। এলমহার্স্ট-দম্পতির আতিথ্য-আনন্দে কবির দিন দশ কাটিল। ইহার মধ্যে একদিন Spectator পত্রিকার জন্য একটি পত্র-প্রবন্ধ প্রেরণ করেন (৭ জুন)। এই পত্রে কবি বলেন ব্রিটিশের আদর্শবাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে মিলনসাধনের চেষ্টার প্রয়োজন। তিনি স্পষ্টভাবে বলিলেন বর্তমানে আতঙ্ক ও স্পর্ধাপ্রকাশসূচক যে অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার অনতিক্রমণীয় ফল বাদ দিলে এ কথা স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে যে ভারতবর্ষ তাহার আধ্যাত্মিক গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নিজের কঠিন আদর্শ ও মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় নেতার শিক্ষা পালন করিয়াছে।

তিনি বলেন, য়ুরোপ সদাশয়তা প্রকাশ করিয়া তাহার সভ্যতা প্রদর্শনের জন্য এশিয়াতে যান নাই। অহমিকা ও ক্ষমতা প্রকাশের অসীম ক্ষেত্র অন্বেষণে গিয়াছিলেন। কিন্তু এশিয়া কখনই ইহা স্বীকার করিবে না যে, মনুষ্যত্ববিহীন শক্তি বিজ্ঞানের সাহায্যে চিরদিনের জন্য সাফল্য লাভ করিবে।

তবে ব্রিটেনের প্রতি সুবিচার করিয়া তিনি স্বীকার করেন যে, ধ্বংসসাধনে অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন জাতি ও নিরস্ত্র জাতির মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে যেরূপ নিগ্রহভোগের সম্ভাবনা, ব্রিটিশ-শাসনে আমাদের ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। অন্য কোনো সাম্রাজ্যতান্ত্রিক শাসনে ইহা অপেক্ষা অনেক গুণে অধিক লাঞ্ছনাভোগ করিতে হইত তাহা নিশ্চিত।[২]

১ চিঠিপত্র ২ ; ২৬ মে ১৯৩০।

২ দ্র. প্রবাসী ১৩৩৭ শ্রাবণ, পৃ. ৫৯১।

জারমেনি ও জেনিভা

ইংল্যান্ড হইতে এবার কবি চলিলেন জারমেনি— আরিয়াম ও অমিয়চন্দ্রকে লইয়া বার্লিন পৌঁছিলেন ১১ জুলাই; তাঁহারা হারনাক হাউসে উঠিলেন।[১] 'সঙ্গে অমিয় আসাতে ভারি সুবিধা হয়েচে'; তাঁহার সঙ্গে কথাবার্তায় কবির অপার আনন্দ। বার্লিনে পৌঁছিবার পরদিন (১২ জুলাই) জারমান রাইখ্‌স্টাগে গিয়া কবি সদস্যদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তখন জারমেনির চান্‌সেলর হাইনরিখ ব্রুনিং (Brunning; Chancellor 1930-32; ইঁহার পর হিটলার)। কবি এবার বার্লিনে আসিয়া অনুভব করিতেছেন যে ১৯২১ ও ১৯২৬ সালের জারমেনি হইতে বর্তমান জারমেনির অনেক তফাত। সেই অপরাহ্ণে কবি যেখানে তাঁহার চিত্রপ্রদর্শনী হইবে, সেই Gallery Moller দেখিয়া আসিলেন। বার্লিনে কবিভক্ত Dr. Anna Selig[২] প্রাণপণে খাটিতেছেন; এই অদ্ভুতকর্মা মহিলাটি সম্বন্ধে কবি এক পত্রে লিখিতেছেন "প্যারিসে ভিক্‌টোরিয়া [ওকাম্পো] যেরকম ছিল Dr. Selig সেই রকম এমনকি তার চেয়ে বেশি।" প্যারিসে ও বার্লিনের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছে, "এসব জায়গায় মেয়ে বন্ধু পেলেই সবচেয়ে কাজে লাগে।"[৩] এই সন্ধ্যাতেই বার্লিন রেডিয়ো হইতে কবির বক্তৃতা হইল।

হারনাক হাউসে কবি আছেন, ছাত্রেরা আসে কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে— কথাবার্তা বলিয়া কবির মন বেশ প্রসন্ন। সভাসমিতি হইতে বক্তৃতার জন্য আহ্বান আসিতেছে। "ছবিগুলোরও কপাল ভালো বলেই" মনে হইতেছে।

১৬ জুলাই গ্যালারি মোলার-এ কবির চিত্রপ্রদর্শনী; রানী দেবীকে লিখিতেছেন, "বার্লিন ন্যাশনাল গ্যালারি থেকে আমার পাঁচখানা ছবি নিয়েছে।"[৪]

ইতিমধ্যে ১৪ই জুলাই কবি অমিয়চন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া মহামনীষী অধ্যাপক আইনস্টাইনের বাসায় গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়া আসেন। উভয়ের সংলাপ-প্রতিবেদন *The Religion of Man* গ্রন্থের পরিশিষ্টরূপে প্রদত্ত হইয়াছে— অমিয়চন্দ্র এইটি অনুলেখন করেন।

এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যাহা লেখেন আমরা তাহার অনুবাদ[৫] নিম্নে উদ্‌ধৃত করিতেছি—

"প্রথম মহাযুদ্ধের পর জারমেনিতে গিয়ে আইনস্টাইনের সঙ্গে আমার দেখা। মনে পড়ে আমাদের আধুনিক জীবন-যাত্রার মান-উন্নয়নে আধুনিক যন্ত্রশিল্পের উপযোগিতা সম্পর্কে আমাদের আলাপ হয়েছিল। তখন [১৯২৬] আমি বলেছিলেম, আর আজও আমি বিশ্বাস করি, যন্ত্রবিদ্যার এই উন্নতি আসলে আমাদের শারীরিক কল্যাণ-বিধানের অনুকূল— বিশেষত, এই উন্নতির প্রতিরোধ যখন অসম্ভব, তখন প্রয়োজনের তাগাদায় মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি

১ আডোল্‌ফ ফন্ হারনাক (১৮৫১-১৯৩০) জারমেনির প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মতাত্ত্বিক; তাঁহার কন্যা এগনিস (Agnes von Zahn-Harnack; 1884-1950) জারমেনির নারী আন্দোলনের নেতা।

২ Anna Selig জারমান বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতি ছাত্রী, কোলোন বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯২১-২৪) Social Scienceএর উপর ডক্টরেট পান। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে ১৯৩১ নভেম্বর মাসে আমন্ত্রণ করিয়া ভারতে আনেন; পাথেয়াদি বাবদ ১১০ পাউণ্ড পাঠান ও বিশ্বভারতীতে চারি মাস থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন। জারমেনির সহিত ছাত্র বিনিময়ের প্রস্তাব তিনি করেন। ইহার পত্রাদি রবীন্দ্রসদনে আছে।

৩ চিঠিপত্র ২, পত্র ৩৬; ১৫ জুলাই ১৯৩০। Harnack House, Berlin।

৪ পথে ও পথের প্রান্তে, পত্র ৪৯; ১৮ অগস্ট ১৯৩০।

৫ দ্র. বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬২। অনুবাদক—কানাই সামন্ত।

জীবনে যে সুবিধার সৃষ্টি করেছে তার সুচিন্তিত সদ্‌ব্যবহার করাই তো আমাদের কর্তব্য। সভ্যতার যে-স্তরে মানুষ আজ উন্নীত, তাতে যেমন আঙুলে জমি আঁচড়ে চাষ করার কথা ভাবা যায় না, তেমনি হস্তপদ জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয় সেখানে পরাজিত, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি যন্ত্র স্বজন ক'রে আমাদের অক্ষমতা ঘুচিয়ে চলেছে। আইনস্টাইন আর আমার মধ্যে এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ মতের মিল হল যে, নূতন নূতন যন্ত্রাবিষ্কারের সাহায্যে প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে আমাদের জীবনযাত্রার সম্পদ আহরণ করতে হবে।

"গত বৎসরের [১৯৩০] গ্রীষ্মে আবার যখন জারমেনিতে যাই, বার্লিনের কাপুথ-এ (Kaputh) আইনস্টাইনের নিজের বাড়িতে গিয়ে দেখা করার আমন্ত্রণ পেলাম। 'দুদিন' আগে অক্সফোর্ডে হিবার্ট বক্তৃতামালায় যা বলেছিলাম, আর *The Religion of Man* নাম দিয়ে পুস্তকের আকারে গ্রথিত করতে তখন ব্যস্ত ছিলাম, সেই ভাবনায় আমার মন তখন ভরপুর। আইনস্টাইনের সঙ্গে আলাপের সূত্রপাতেই বুঝলাম যে তিনি ধরে নিয়েছেন, 'আমার বিশ্ব' মানবিক ধ্যানধারণা দিয়ে সীমাবদ্ধ বিশ্ব। এ দিকে তাঁর দৃঢ় প্রতীতি এই যে মনবুদ্ধির নাগালের বাইরেও আছে এক **সত্য**। আমার বিশ্বাস, ব্যষ্টিমানব ঐক্যসূত্রে বাঁধা সেই দিব্য মানবের সঙ্গে যিনি আমাদের অন্তরে, আবার বাইরেও। অনন্তের ভূমিকায় বিরাজিত মানুষ, সেই অনন্ত মূলতঃই মানবিক। আমাদের ধর্মসাধনা নয় বিশ্বভৌমিক, আমাদের যে সজীব ব্যষ্টিসত্তা নিয়ে তার করণ কারণ তার আছে শুভাশুভের আদর্শভাবনা। স্বভাবের মধ্যে ঐ প্রকার শুভাশুভের নীতি বা নন্দনীয়তা বিজ্ঞানের স্বীকার্য নয়; নিরাবরণ নিরাভরণ 'অস্তি' নিয়েই তার কারবার। বিজ্ঞানে ব্যক্তিসত্তার কোনো উপযোগিতা নেই। অথচ, অধ্যাত্মপথে বা ধর্ম-সাধনায় নিছক বাস্তব তথ্য বা তৎসম্পর্কিত তত্ত্ব কোনো কাজে লাগে না।

"একক নিঃসঙ্গ মানুষ ব'লে আইনস্টাইনের খাতির আছে। তুচ্ছাতিতুচ্ছের ভিড় থেকে গাণিতিক ভাবনা ও দৃষ্টি মানুষের মনকে মুক্তি দেয় যেখানে, সেখানে তিনি একক বৈকি। তাঁর জড়বাদকে তুরীয় বলা চলে, দার্শনিক ধ্যানধারণার সীমান্তচুম্বী, সীমাবদ্ধ অহমের জটিল জাল থেকে— জগৎ থেকে— নিঃসম্পর্ক মুক্তি হয়তো সেখানে সম্ভবপর। আমার কাছে, বিজ্ঞান এবং আর্ট দুটিই মানুষের স্বরূপ প্রকৃতির প্রকাশ, জৈবিক প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের বাইরে, আর আপনাতেই আপনার তার অপরিসীম এক সার্থকতা আছে।"

বার্লিন হইতে কবি গেলেন ড্রেসডেন; ১৯৩০ সালে এই নগরীর স্থাপত্য শিল্প চারুকলার সৌন্দর্য জগৎ-বিখ্যাত ছিল। কবি দুইদিন সেখানে ছিলেন, বক্তৃতাও করেন (১৭ - ১৯ জুলাই)। কবি নিশ্চয়ই নগরীর দর্শনীয় শিল্পসংগ্রহ দেখিয়াছিলেন; সেইসব অমূল্য সংগ্রহ বিগতযুদ্ধে অধিকাংশই ধ্বংস হইয়াছে।[১]

ড্রেসডেন হইতে কবি দক্ষিণ-জারমেনির ক্যাথলিকপ্রধান প্রাচীন বাভেরিয়া রাষ্ট্রের রাজধানী ম্যুনিক পৌঁছিলেন; এখানে পাঁচ দিন থাকিলেন (১৯ - ২৪ জুলাই)। নানা প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা; নগরীর বিরাট টাউনহলে কবি-সংবর্ধনা। নগরীর টাউন-রেজিস্টারএ রবীন্দ্রনাথের নাম লিপিবদ্ধ করিয়া তাহারা যে সম্মান দান করিল, সে সৌভাগ্য কম লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। ২৩ জুলাই গ্যালারি ক্যাসপেরিতে কবির চিত্রপ্রদর্শনী উদ্‌ঘাটিত হইল।

ম্যুনিকের ডয়চ্‌ ম্যুজিয়াম প্রথম-মহাযুদ্ধের পর একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠে। এই ম্যুজিয়ামের একপ্রান্তে ছিল প্লানেটেরিয়াম্‌— সেইটি ম্যুজিয়ামের প্রতিষ্ঠাতা অস্কার ফন্‌ মুলার স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া কবিকে তন্ন তন্ন করিয়া

১ Dresden was formerly noted for its museums and art collections, and for its architecture of the Baroque Period, but a devastating series of raids early in 1945 reduced it to ruins, destroyed the famous 'Zuringer' with its valuable collections and the Opera House, and damaging the picture gallery.—Chamber's World Gazetteer ।

দেখাইলেন ; বিরাট গম্বুজের অন্ধকার অর্ধগোলকে গ্রহনক্ষত্রাদির গতি প্রভৃতি যন্ত্রদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে দেখিয়া খুবই বিস্মিত।[১]

ম্যুনিকে থাকিবার সময়ে একদিন কবি প্যাশান প্লে দেখিবার জন্য Oberammergau নামক গ্রামে যান। গ্রামটি ম্যুনিক হইতে ৪২ মাইল দূরে মার্গাউ নদীর তীরে অবস্থিত। সেখানে যীশুখৃষ্টের জীবনলীলার অভিনয়— দেশবিদেশ হইতে ভক্তদের সমাগম হয়। ১৬৩৪ অব্দে এই গ্রামের লোক প্লেগ মহামারী হইতে রক্ষা পাইলে, তাহারা এই প্যাশান প্লে প্রতি দশ বৎসর অন্তর অভিনয় করিবে বলিয়া সংকল্প গ্রহণ করে। সেই হইতে এই অভিনয় হইয়া আসিতেছে।[২]

খ্রীষ্টের ভূমিকা যে ব্যক্তি গ্রহণ করে তাহাকে দীর্ঘদিন খ্রীষ্টজীবন ভাবনা ও সাধনা করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ সমস্ত দিন বসিয়া অভিনয় দেখেন— নাট্যের ভাষা জারমান, কবির অবোধগম্য ; কিন্তু অভিনয়ের ভাবের মধ্যে কবির ভক্তমন নিমজ্জিত হইয়াছিল।

এই ঘটনাটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই অভিনয় দেখিয়া কবির মনে যে ভাবের উদয় হয়, তাহাই *The Child* নামে কাব্যে রূপ লয়। কিছুকাল পূর্বে জারমেনির বিখ্যাত উফা কোম্পানি কবিকে ফিল্‌মের উপযুক্ত একটা কিছু লিখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করে।

২৪ জুলাই ম্যুনিক হইতে অমিয়চন্দ্র এক পত্রে লিখিতেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ সারাদিন ধরে ইংরেজিতে একটা নূতন রকম টেকনীকে ফিল্‌মের জন্য নাটক লিখছেন। ছবির মতো এও তাঁর নূতন সৃষ্টির নেশা।'[৩]

যীশুখ্রীষ্টের মৃত্যুবরণ লইয়া খ্রীষ্টীয়জগতে যে বিরাট সংগীত সাহিত্য চিত্রকলা ও ভাস্কর্য সৃষ্ট হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের এই রচনা তাহারই অন্তর্গত একটি শিল্পসৃষ্টি। নেতাকে হত্যা করিবার পর ভয়বিহ্বল জনতা পরস্পরকে প্রশ্ন করে 'কে তাহাদের পথ দেখাইবে ?'

They ask each other in bewilderment
'who will show us the path' !
The old man from the East bends his
head and says 'the victim.'
'We refused him in doubt, we killed
him in anger, now we shall
accept him in love
For in his death he lives in the life,
of us all, the great victim.'

১ The Deutschers Museum on the Museum island, is a science, engineering and technical museum, whose exhibitions cover ten acres.—Chamber's Encyclopaedia— Munich।

২ Passion Play first given in 1634 as a result of vow by villagers because of deliverance from the plague ; held recently in 1900, 1910, 1922, 1930, 1934 (Special jubilee 300th anniversary), and 1950। প্যাশান প্লে সম্বন্ধে যাঁহারা অধিক জানিতে চান, তাঁহারা Encyclopaedia of Religion and Ethics-এর Miracle Plays, Mysteries, Moralities প্রভৃতি প্রবন্ধ দেখিতে পারেন।

৩ প্রবাসী ১৩৩৭ কার্তিক, পৃ. ৯৮।

এই কথাটি অতি সত্য, খ্রীষ্ট মরিয়া অমর; কোটি কোটি ভক্ত ও ভাবুক -হৃদয়ে তাঁহার স্থান অক্ষয় গৌরবে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত।

The Child[১] রবীন্দ্রনাথের একমাত্র কাব্য যাহা মূল ইংরেজিতে রচিত, পরে তাহা 'শিশুতীর্থে' নূতন রূপ গ্রহণ করে; যথাস্থানে সে আলোচনা আসিবে।

ম্যুনিক হইতে কবি ফ্রাংকফুর্ট মারবুর্গ কোবলেনজ-এ বক্তৃতা করিলেন (২৪ জুলাই হইতে ৬ অগস্ট)। এই ভ্রমণকালে জারমেনির নূতন যুব-আন্দোলন সম্বন্ধে অনেক কিছুই প্রত্যক্ষভাবে জানিতে পারিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে এই দলের (Wondervogel)[২] একটি শাখা ভারতভ্রমণকালে শান্তিনিকেতনে আসে; তাহারা সিংহসদনের স্টেজে জারমান ভাষায় একটি ক্ষুদ্র নাটিকা অভিনয় করে; রবীন্দ্রনাথ তাহাদের এক শত টাকা দেন।[৩] এইবার এই আন্দোলন সম্বন্ধে ভালো ভাবে জানিতে পারিলেন। প্রথম-মহাযুদ্ধের পর জারমান জাতির উপর মিত্রশক্তি বহু বিধিনিষেধ জারি করেন— তাহারা সৈন্যবৃদ্ধি করিতে পারিবে না, এরোপ্লেন নির্মাণ করিতে পারিবে না ইত্যাদি অসংখ্য নিষেধ। কিন্তু জারমানদের ন্যায় একটা প্রাণবান জাতির যৌবনকে এভাবে নিষ্পেষিত করা যায় না; এরোপ্লেন নির্মাণ নিষিদ্ধ হইলে তাহারা গ্লাইডার বানাইয়া আকাশবিহার শুরু করে। আত্মশক্তি বিকাশের জন্য দেশভ্রমণটা যুবআন্দোলনের বিশেষ অঙ্গ হইয়া উঠে। হাঁটিয়া দেশ দেখা ও লোকেদের জানা প্রধান উদ্দেশ্য। আপনার কাজ আপনারা করিয়া তাহারা খরচ বাঁচাইত। এ ছাড়া অভিনয় করিয়া গান গাহিয়া তাহারা অর্থ অর্জন করিত। কবির সহিত এই আন্দোলনের নেতা কার্ল ফিশার (Fischer)-এর সাক্ষাৎ হয়। ইহাদের কর্মপদ্ধতি ভালোভাবে দেখিবার সুযোগ তিনি পান। কবি দেশে থাকিতে কতবার কতজনকে Peripatric school অর্থাৎ চলিতে চলিতে শিক্ষালাভের কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল ছাত্রেরা বৎসরের মধ্যে কয়েক মাস দেশ দেখিয়া জ্ঞানার্জন করে। নিজের কাজ নিজেরা করিবে; পৃথিবী হইবে তাহাদের জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্র।

জারমেনির ভ্রমণ-পালা শেষ হইল। এবারকার সফর সম্বন্ধে কবি লিখিতেছেন, "অনেক পূর্ব পরিচিত [১৯২১, ১৯২৬] জায়গা দিয়ে ঘুরে এলুম, তেমনি করে বক্তৃতাও দিয়েছি। কিন্তু এই যাত্রায় আগের বারের চেয়ে জর্মনির অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে আমার প্রবেশাধিকার ঘটেছে। ওদের কাছাকাছি এসেছি। এদের মধ্যে যে যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্বজাতীয়তা আছে তা নয়, য়ুরোপের অন্য সকল জাতের হাতের ঠেলা খেয়ে এরা ভিতরে ভিতরে খুব কঠোরভাবেই ন্যাশানালিস্ট হয়ে উঠেছে। অথচ আমার উপরে এদের একটা বিশেষ প্রীতি কেন আছে ঠিক ভেবে পাইনে।·· দারিদ্র্যের ঠেলা খেয়েই এদের শক্তি আরো যেন দুর্গম হয়ে উঠেছে।"[৪]

কবির সঙ্গী অমিয়চন্দ্র জারমেনি ভ্রমণ সম্বন্ধে এক পত্রে লিখিতেছেন, 'সম্রাটের মতো জারমেনি পরিভ্রমণ করচি— শ্রেষ্ঠ যা-কিছু আপনিই আমাদের কাছে এসে পড়চে— যেখানে যা-কিছু সুন্দর, স্মরণীয়। এদেশের মনীষী যাঁরা ভাবচেন আঁকচেন লিখচেন— রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সহজে সকলের পরিচয় ঘটচে, আমরাও ভাগ পাচ্ছি। এমন গভীর ক'রে বিচিত্র করে য়ুরোপকে জানবার শুভযোগ কখনো হবে ভাবিনি।·· পৃথিবীতে কোথাও রবীন্দ্রনাথকে এদের চেয়ে বেশি ভালোবাসে ভাবতে পারি না; 'টাগোরে' শুনলেই হোটেলের কর্তৃপক্ষ, ট্রামগাড়ির টিকিটক্লার্ক,

১ *The Child*, Allen & Unwin 1931।

২ জার্মেনির তরুণ আন্দোলন (সচিত্র), দুর্গাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী; প্রবাসী ১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠ।

৩ ইহারা কবির একটি সচল ফোটো তোলে— চার মিনিটের মত।

৪ পথে ও পথের প্রান্তে, পত্র ৪৯; ১৮ অগস্ট ১৯৩০।

কলেজের ছেলেমেয়ে, অধ্যাপক বণিক রাষ্ট্রনেতা রাজকুল-প্রতিনিধি— এমন কেউ নেই এদেশে যার মুখ উজ্জ্বল হয়ে না ওঠে ; যেখানেই আমরা যাই জয়ধ্বনি আনন্দ অভ্যর্থনায় এদের পক্ষে উৎসাহ সংবরণ করা অসাধ্য হয়ে ওঠে। হাজার হাজার ছেলেমেয়ে পথে পথে রৌদ্রে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে আছে 'টাগোরে' দেখবে বলে— এদেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা যাঁরা তাঁরা সভয়ে ক্ষণেকমাত্র ওঁর কাছে এসে শ্রদ্ধা জানিয়ে উৎফুল্লচিত্তে চলে যান। যার যা কিছু আছে, ফুলের বাগান সুন্দর বাড়ি বড়ো গাড়ি সমাদর আতিথ্য অজস্র হয়ে কবির কাছে ঝরে পড়ে ; উনি অনাসক্ত চিত্তে সকলের মধ্যে দিয়ে চলে যান, কিছুই ওঁকে বাঁধে না। সমস্তক্ষণই এত ইন্‌সপায়ার্ড থাকেন যে, যখনই যা বলেচেন তা কবিতার মতো শ্রেষ্ঠ প্রকাশ পায়। চিন্তার চরম ঐশ্বর্য পথে পথে ছড়িয়ে চলে যান।"[১]

কবি ও অমিয়চন্দ্র জারমেনির যে দৃশ্য দেখিতেছেন, তাহা চিকনের সেলাই-এর উপর দিকটা। জারমান জাতি ভিতরে ভিতরে কী ভীষণভাবে উগ্র ন্যাশানালিস্ট হইয়া উঠিতেছে, তাহার সম্যকরূপ ইঁহারা দেখিতে পান নাই। হিটলারের 'নাৎসি'দল প্রতিদিন সংখ্যায় সমৃদ্ধ ও সংঘশক্তিতে দুর্জয় হইয়া উঠিতেছে— তাহা ইঁহাদের নিকট স্পষ্ট হয় নাই। কয়েক বৎসরের মধ্যে জারমেনি যখন হিটলার ও তাঁহার উন্মত্ত নাৎসিবাহিনীর কবলে পড়িল, তখন রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ প্রচার তাহাদের দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছিল।[২]

বার্লিন হইতে কবি চলিলেন উত্তর-য়ুরোপে ; ডেনমার্ক রাজ্যে এলসিনোর (Helsingor) শহরে স্কান্দানেভিয়া দেশসমূহে নিউ এডুকেশন ফেলোশিপ নামে প্রতিষ্ঠানের সম্মেলন— বহু ছাত্র ও অধ্যাপক সেখানে সমাগত : শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথও নিমন্ত্রিত। এখানে কবির সহিত বহু ছাত্র ও অধ্যাপকের পরিচয় হইল। এই নবশিল্পসংঘের সহিত কবির ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে আরও ছয় বৎসর পরে ১৯৩৬ সালে ; যথাস্থানে সে আলোচনা হইবে।

এবার কবির গম্যস্থল কোপেনহাগেন— ডেনমার্কের রাজধানী। এখানে ৯ই অগস্ট কবির চিত্রপ্রদর্শনী। আছেন হোটেলে ; পত্র লিখিতেছেন রানী দেবীকে, "পড়েছি ঘূর্ণির মধ্যে— কোথাও একদণ্ড থামতে দিলে না। অপরিচিতের পরিচয় কুড়োতে কুড়োতে চলেছি, কিন্তু সে পরিচয় সঞ্চয় করে রাখবার মতো সময় নেই।" কবি একদিন গান গাহিয়াছিলেন, 'ভারের বেগেতে চলেছি কোথায়, এ যাত্রা তুমি থামাও'। কিন্তু কবির জীবনের শেষ পর্যন্ত এই চলার বেগ থামে নাই। এইটাই কবির শেষ কথা নহে ; অন্তরের মণিকোঠায় পরমা শান্তি অধিষ্ঠিত থাকায় এই নিরন্তর চলার বেগের মধ্যে কাব্য গান প্রবন্ধ গল্প উপন্যাসের বিচিত্রধারা নব নব রূপ পরিগ্রহ করিয়া চলিয়াছিল।

এই কোপেনহাগেনে থাকার সময়ে কলিকাতা হইতে 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'র মুদ্রিত একখণ্ড তাঁহার হস্তগত হইল। এই বইখানি গত দশ বৎসরের মধ্যে বালিকা রানুকে লিখিত তাঁহার পত্রের সংগ্রহ। বইখানি পড়িতে পড়িতে ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া গেলেন যে উত্তর-য়ুরোপের এক মহানগরীর বিরাট হোটেল পিঞ্জরে তিনি আবদ্ধ— মন তাঁহার ভাসিয়া চলিয়াছে শান্তিনিকেতনের প্রান্তর মধ্যে।[৩]

১ অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীর পত্র সোমনাথ মৈত্রকে লিখিত, প্রবাসী ১৩৩৭ কার্তিক, পৃ. ৯৭।

২ In 1931 Hitler contested the presidency with Hindenberg, but was defeated. In 1932 the national elections gave his party a large mojority in the Reichstag. He became Chancellor and compelled the Reichstag to deliver dictatorial power into his hands. His first steps were to set aside the constitution, suppress the governments of the separate states, outlaw all parties other than the Nazi and order a boycott of the Jews. On the death of Hindenberg in 1934, Hitler was made Reichsfurer।

৩ পথে ও পথের প্রান্তে, পত্র ৪৮।

কোপেনহাগেন হইতে জেনিভা আসিবার পথে বার্লিনে এন্‌ড্রুজ আসিয়া কবির দলে মিলিত হইলেন। এন্‌ড্রুজ এতদিন ইংলণ্ডে ছিলেন তাঁহার বইগুলির প্রকাশন ব্যবস্থার জন্য। বার্লিন হইতে সকলে জেনিভায় আসিলেন; "বিশ্বজাতীয়তার উদ্যম সংঘীভূত হয়ে উঠেছে জেনিভায়। লীগ অব নেশনে ঠিক সুর বাজে নি— হয়তো বাজবেও না— কিন্তু আপনা-আপনিই এই শহর সমস্ত জগতের মহানগরী হয়ে উঠেছে। যাদের প্রকৃতি বিশ্বপ্রাণ তারা আপনা-আপনি ঐখানে এসে মিলবে।"[১] ত্রিশ বৎসর পরে আজ দুনিয়ার দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে জেনিভার দিকেই— পৃথিবীর সকল মরণ-বাঁচন সমস্যা সমাধানের জন্য 'প্রকৃত মহাপ্রাণ'গণ বারে বারে মিলিত হইতেছেন— কবি দিব্যদৃষ্টিতে এই মহানগরীর ভবিষ্যৎ যেন দেখিতে পাইয়াছিলেন।

জেনিভাতে কবি আতিথ্য লাভ করিয়াছেন মিস্ স্টোরি নামে এক ইংরেজ মহিলার। মিস্ স্টোরি কয়েক মাস পূর্বে ভারত-ভ্রমণকালে শান্তিনিকেতন দেখিয়া আসেন; বিশিষ্ট অতিথিরূপে তিনি বিশ্বভারতী হইতে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেন। মনে আছে তাঁহার জন্য আম্রকুঞ্জে চা-পার্টির ব্যবস্থা হয়। জেনিভায় তিনি কবিকে তাঁহার শান্তিনিকেতনবাসের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলেন, বোধ হয় বিশ্বভারতীর কয়েকজন বিদেশী অধ্যাপকদের সম্বন্ধে কিছু বলিয়া থাকিবেন। অধ্যাপক বগ্‌দানফ ও ডক্টর কলিন্স সম্বন্ধেই অভিযোগটা ছিল। বগ্‌দানফ ছিলেন কট্টর জারপন্থী, কলিন্স পাকা ব্রিটিশ। এই সময়ে আইন-অমান্য আন্দোলন শান্তিনিকেতনের শান্তি ভঙ্গ করিতেছিল, উৎসাহী ছাত্রদের ঘটা করিয়া মেলার মাঠে কাপড় পুড়াইতে ও নানাপ্রকার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে দেখিয়া এই দুই জন বিদেশী খুবই বিচলিত হন। মিস্ স্টোরিকে তাঁহারা কী বলিয়াছিলেন এবং মিস্ স্টোরি তাঁহার নাম সার্থক করিয়া কবিকে কী বলিয়াছিলেন তাহা আমরা জানি না। মোট কথা, রবীন্দ্রনাথ এই মহিলার রিপোর্ট সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠেন। তখনই শান্তিনিকেতনের কর্তৃপক্ষকে লিখিয়া পাঠান যে, বিশ্বভারতীর প্রতি যাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই, তাঁহাদের পক্ষে সেখানে অবস্থান কল্যাণকর হইতে পারে না। কবির তিক্ত মনোভাব তাঁহার কন্যাকে লিখিত পত্র মধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়ে। "শান্তিনিকেতনের পাশ্চাত্য পাড়ার·· উপর বিশ্বভারতীর ঝাঁটা বোলাবার প্রস্তাব করে পাঠাতে হবে।·· আবর্জনা যদি না এখনি সরানো যায় তা হলে ওদের সংসর্গে য়ুরোপের সম্বন্ধ বিষাক্ত হয়ে উঠবে।"[২] কবির এই তীব্র মনোভাব জানিতে পারিয়া বগ্‌দানফ ও কলিন্স কার্য ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। ইঁহাদের ন্যায় পণ্ডিতের স্থান বিশ্বভারতীতে আর পূরণ হয় নাই। ইঁহাদের হইতে বহুগুণিত অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের কবি অশেষ ধৈর্য ও মমতার সহিত সহ্য করিয়াছিলেন, অকস্মাৎ তাঁহার এই স্থৈর্যের চ্যুতি কেন হইল জানি না।

জেনিভাতে কবি প্রায় এক মাস থাকেন; তথাকার নানা প্রতিষ্ঠান হইতে কবির আহ্বান আসে। ছাত্রদের সহিত মিলিত হন— মোট কথা জায়গাটি ভালোই লাগিতেছে।

জেনিভা থাকিবার সময় কবির সোভিয়েট রুশিয়া যাইবার ব্যবস্থা পাকা হয়। কিন্তু বাধা যে একেবারেই নাই, তাহাও নহে। জনৈক মার্কিন সাংবাদিক লিখিতেছেন, "Although actively abstaining from politics, Tagore revealed, while resting in Geneva, that he is heart and soul for the Indian nationalist movement. It is understood—it is because of the impetus which his presence might give to Pro-Gandhi

১ পথে ও পথের প্রান্তে, পত্র ৪৯। দ্র. প্রবাসী ১৩৩৭ ভাদ্র, পত্র। ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩০।

২ চিঠিপত্র ৪, পত্র ৬১।

sentiment in the U.S.A. and Russia that the coteri of Englishmen who surrounded him while here, was continually against his trips for reasons of health"।[১] ইংলিশম্যানের মধ্যে ছিলেন তো মিঃ এনড্রুজ ও মিস্ স্টোরি। এই মার্কিন সাংবাদিকের তথ্য যে কতখানি নির্ভরযোগ্য তাহা আমরা বিচার করিতে অসমর্থ; তবে ইতিপূর্বে তাঁহার বিশ্বভ্রমণকালে এই ধরণের বাধা কয়েকবারই পাইয়াছিলেন: চীনে সান্‌য়াৎসানের সহিত সাক্ষাৎ, ইসরেইল ভ্রমণ, রুশিয়া যাইবার প্রথমবারের প্রস্তাব এবং আর্জেন্টিনা হইতে পেরুযাত্রার ব্যবস্থা বানচাল হইয়া যায়; নিছক শারীরিক কারণে বলিয়া আমাদের তো মনে হয় না।

জেনিভাতে আসিবার পর কবি ভারতের আইন-অমান্য আন্দোলন ও ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতি সম্বন্ধে সংবাদ ভালো করিয়া জানিতে পারিলেন। এ সম্বন্ধে আমরা পরবর্তী এক পরিচ্ছেদে আলোচনা করিব।

সোভিয়েট রাশিয়া ১৯৩০

সোভিএট রাশিয়াকে স্বচক্ষে দেখিবার ইচ্ছা কবির বহুকালের। ১৯২৬ সালে কবি যখন ভিয়েনায়, সেবার রাশিয়া হইতে তাঁহার নিমন্ত্রণ আসে; শরীরের জন্য যাওয়া সম্ভব হয় নাই। ১৯২৯ সালে কানাডা হইতে ফিরিয়া জাপানে বাসকালে (মে) কোরিয়া যাইবার নিমন্ত্রণ হয়; যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কথা ছিল কোরিয়া হইয়া ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথে রাশিয়ায় যাইবেন। সেখানে জনসাধারণকে কী ভাবে ও কী পরিমাণে অশিক্ষা হইতে উদ্ধার করার ব্যবস্থা হইয়াছে, সেইটি জানিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ। সেবারও শরীরের জন্য জাপানী ডাক্তারের পরামর্শে বা আদেশে সম্পূর্ণ বিশ্রাম করিতে হয়। কোরিয়া বা রাশিয়ায় যাওয়া সেবারও পণ্ড হয়। এবারও জেনিভা বাসকালে কবির ইংরেজ বন্ধুবান্ধবরা তাঁহার শরীর খারাপের অজুহাতে তাঁহাকে রুশযাত্রা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টায় ছিলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারিয়া উঠিলেন না।

রাশিয়া ভ্রমণে কবির সহযাত্রী ছিলেন অমিয় চক্রবর্তী, আরিয়াম ও ডাঃ হ্যারি টিম্বর্স। এ ছাড়া জারমেনি হইতে মিস্ আইনস্টাইন ও সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরও কবির সঙ্গী হইলেন।

১১ সেপ্টেম্বর (১৯৩০) কবি সদলে মস্কৌ পৌঁছিলেন; স্টেশনে সংবর্ধনার জন্য অনেক লোকই উপস্থিত ছিলেন। কবি ও তাঁহার সঙ্গীরা গিয়া উঠিলেন গ্র্যাণ্ড হোটেলে। কবি লিখিতেছেন, "বাড়িটা মস্ত, কিন্তু অবস্থা অতি দরিদ্র, ··সমস্ত শহরেরই অবস্থা এই রকম··আহারে ব্যবহারে এমন সর্বব্যাপী নির্ধনতা য়ুরোপের আর কোথাও দেখা যায় না।" মস্কৌ পৌঁছিয়া লিখিতেছেন, "রাশিয়ায় অবশেষে আসা গেল। যা দেখছি আশ্চর্য ঠেকছে। অন্য কোনো দেশের মতোই নয়। একেবারে মূলে প্রভেদ। আগাগোড়া সকল মানুষকেই এরা সমান করে জাগিয়ে তুলেছে।··চিরকাল মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন; তাদের মানুষ হবার সময় নেই; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সবচেয়ে কম খেয়ে কম পরে কম শিখে বাকি সকলের পরিচর্যা করে; সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা উপোসে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি ঝাঁটা খেয়ে মরে। জীবনযাত্রার জন্য যত-কিছু সুযোগসুবিধে,

১] New York World, 5 September 1930।

সব কিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে— উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।" এই দিয়ে পত্রধারা আরম্ভ।

কবি যাহা দেখিতেছেন শুনিতেছেন, তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি লিখিতেছেন, "আর সব জায়গাতে ধনী দরিদ্রের প্রবেশ থাকাতে ধনের পুঞ্জীভূত রূপ সবচেয়ে বড়ো ক'রে চোখে পড়ে— সেখানে দারিদ্র্য থাকে যবনিকার আড়ালে নেপথ্যে।⋯এই সমৃদ্ধি যদি সমানভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যেত তাহলে তখনই ধরা পড়ত, দেশের ধন এত কিছু বেশি নয় যাতে সকলেরই ভাত কাপড় যথেষ্ট পরিমাণে জোটে। এখানে ভেদ নেই ব'লে ধনের চেহারা গেছে ঘুচে, দৈন্যের কুশ্রীতা নেই, আছে অকিঞ্চনতা।"[১]

"এখানে এসে যেটা সবচেয়ে আমার চোখে ভালো লেগেছে সে হচ্ছে এই ধন-গরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব।⋯কেবলমাত্র এই কারণেই এদেশে জনসাধারণের আত্মমর্যাদা এক মুহূর্তে অবারিত হয়েছে।" সোভিয়েট রাশিয়ায় আসিয়া কবি যাহা কিছু দেখিতেছেন, সমস্তই তাঁহাকে মুগ্ধ করিতেছে; তাই লিখিতেছেন, রাশিয়ায় "না এলে এজন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত।"

কবি সোভিয়েট মতবাদটির আসল জায়গাটি যেন ধরিতে পারিয়াছেন; তাই লিখিতেছেন, "আজ পৃথিবীতে অন্তত এই একটা দেশের লোক স্বাজাতিক স্বার্থের উপরেও সমস্ত মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করছে।⋯স্বজাতির সমস্যা সমস্ত মানুষের সমস্যার অন্তর্গত এই কথাটা বর্তমান যুগের অন্তর্নিহিত কথা। একে স্বীকার করতেই হবে।" ইহাকেই যথার্থভাবে বলা যাইতে পারে international।

মস্কৌ থেকে কবির যখন নিমন্ত্রণ আসে, তখন কম্যুনিজম সম্বন্ধে তাঁহার মনে স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না। সোভিয়েট সম্বন্ধে ক্রমাগতই উলটো-পালটা কথা শুনিয়াছেন বিস্তর। তিনি লিখিতেছেন, "পৃথিবীতে যেখানে সবচেয়ে বড়ো ঐতিহাসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান সেখানে নিমন্ত্রণ পেয়েও না আসা আমার পক্ষে অমার্জনীয় হত।" তাই সত্তর বৎসর বয়সের কোঠায় পৌঁছিয়া কবি মস্কৌ আসিলেন।

মস্কৌ পৌঁছিবার পরদিন Voks অর্থাৎ সংস্কৃতি-মিলন সমিতিতে কবির সংবর্ধনা হইল। ইহার সভাপতি অধ্যাপক Petroff। ইঁহার সহিত কবির দীর্ঘ আলোচনা হয়; পেট্রফ কবিকে সোভিয়েট মতবাদ ও তাঁহাদের কর্মপ্রচেষ্টার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন। পেট্রফের সহিত কথাবার্তায় কবি বুঝিতে পারিলেন যে নূতন রাশিয়া শিক্ষার মর্যাদা দিয়াছে। কবি লিখিতেছেন, শুধু রাশিয়াতে "শিক্ষা কি আশ্চর্য উদ্যমে সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হচ্ছে তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়; শিক্ষার পরিমাণ সংখ্যায় নয়। তার সম্পূর্ণতায়, তার প্রবলতায়।"

যেদিন মধ্যাহ্নে Voksএ কবির সংবর্ধনা হইল সেইদিন সন্ধ্যায় Federation of Soviet Writers বা সোভিয়েট লেখকসংঘের সভায় কবির নিমন্ত্রণ। আধুনিক সোভিয়েট লেখকদের অনেকেই সেদিন উপস্থিত ছিলেন। সভায় পেট্রফ যে বক্তৃতা করিয়া কবিকে স্বাগত করেন তাহার মধ্যে আছে—"Rabindranath Tagore is one of those men who have followed with the closest attention and interest the great events developing during the last ten years in the history of humanity. It is obvious that one so gifted with spiritual and poetic insight could not have gone away without seeing this most important page of human history, that page which bears the name of the great October Revolution.

১ রাশিয়ার চিঠি, পৃ. ৯।

"We who have taken part in the October Revolution and assisted at the construction of new forms of human culture, extend a warm welcome to one who has come amongst us, as a profound thinker, to study our culture, study our strivings for the renewal of human society, and thus of human personality itself."

পেট্রফের বক্তৃতার পর অধ্যাপক Kogan, Pinkevitch ও সোভিয়েট লেখক Shaklar কিছু কিছু বলেন; কবিও তদুত্তরে কিছু বলিয়াছিলেন।

একদিন (১৪ সেপ্টেম্বর) কবি Pioneer's Commune নামে প্রতিষ্ঠান দেখিতে গেলেন। এটি পিতৃমাতৃহীন নিরাশ্রয় বালকবালিকাদের বাসস্থান; এখানে কম্যুনিজমের মূলতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হয়; এবং সকলকেই সংঘ-জীবন যাপন করিতে হয়। কবি উপস্থিত হইলে তথাকার বালকবালিকারা তাঁহার চারিদিকে ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া বসিল যেন তিনি ওদেরই আপন দলের। কবি লিখিতেছেন, "এরা যে-শ্রেণী থেকে এসেছে একদা সে-শ্রেণীর মানুষ কারও কাছে কোনো যত্নের দাবি করতে পারত না— এদের মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম, অনাদরের অসম্মানের কুয়াশা-ঢাকা চেহারা একেবারেই নয়। সংকোচ নেই, জড়তা নেই। তাছাড়া সকলেরই মনের মধ্যে একটা পণ, সামনে একটা কর্মক্ষেত্র আছে বলে মনে হয় যেন সর্বদা তৎপর হয়ে আছে, কোনো কিছুতেই অনবধানের শৈথিল্য থাকবার জো নেই।"[১] কবির সহিত আবাসিকদের অনেকের যে কথাবার্তা হয়, তাহা কবি স্বয়ং পত্রধারার মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

দুই দিন পরে কবি মস্কোর বিখ্যাত Peasant Home (বা কৃষিভবন) দেখিতে যান। "রাশিয়ার সমস্ত ছোটো বড়ো শহরে এবং গ্রামে এ-রকম আবাস ছড়ানো আছে। এগুলি চাষীদের সামাজিক মিলনক্ষেত্র, শিক্ষালাভের কেন্দ্র।" কৃষি ও সমবায় সম্বন্ধে তথ্য ও তত্ত্ব এইখান হইতে তাহাদের সরবরাহ হয়। এই আবাসের অধ্যক্ষ আবাসিক চাষীদের নিকট কবির পরিচয় দিলে কবি তাহাদের সহিত ঘরোয়াভাবে কথাবার্তায় প্রবৃত্ত হইলেন, অবশ্য দোভাষীর সাহায্যে। তাহারা কবিকে বলে, পূর্বের ব্যক্তিগত চাষকাজ হইতে আধুনিক সংঘগত চাষবাস অনেক ভালো, কারণ তাহাদের মতে ইহা অধিক লাভজনক। কমিউনের নানা জাতির লোকের সহিত কবির যেসব কথোপকথন হয় তাহা 'রাশিয়ার চিঠি'তে আছে।

কবি হোটেলে আছেন; নানা লোক দেখা করিতে আসে, সময় পাইলে কবি ছবি আঁকেন। দুই চারিজন শিল্পশাস্ত্রী ও 'ক্রিটিক' আসিয়া কবির ছবির নমুনা দেখিয়া যান। তাঁহারা বিস্মিত হন।

১৭ সেপ্টেম্বর The State Museum of New Western Art ভবনে কবির চিত্রপ্রদর্শনী হইল; অধ্যাপক পেট্রফ প্রদর্শনী উন্মোচন করেন। অধ্যাপক Sidorov কবির চিত্রকলা সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলেন। Peoples Commissarat of Education-এর অধ্যাপক Ettingov বলেন যে, ভারতের সহিত সোভিয়েটকে নূতন বন্ধনে কবি গাঁথিয়া গেলেন। অধ্যাপক Kristie রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন; কবির চিত্রাবলী দেখিয়া তিনি পূর্বেই বিস্মিত হন এবং কবির হাতের রেখা ও রঙের নবতর সৃষ্টি তাঁহার দেশবাসীকে দেখাইবার জন্য উৎসুক হন। তিনি বলেন, "It is with special pleasure that we have arranged an exhibition of his work in order to acquaint our intellectuals and our working masses with them...the more we acquaint ourselves with his

১ রাশিয়ার চিঠি, পৃ. ৬১।

paintings, the more we are struck with the creative skill shown in his pictures. We consider these works to be a great manifestation of artistic life and that his skill will be, like all high technical achievements, assimilated by us from abroad of the greatest use to our country" ।[১]

সাধারণত এই ম্যুজিয়মে দৈনিক ১৫০-র বেশি দর্শক আসিত না; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি দেখিবার জন্য প্রতিদিন ৫০০-র উপর লোক আসে।

এখানে একটি কথা বলা উচিত যে, রাশিয়ায় এতবড় বিপ্লবের মধ্যে তাহারা আর্টের একটি মাত্র নিদর্শনও নষ্ট হইতে দেয় নাই, সযত্নে বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যুজিয়মে শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি লইয়া গিয়া রাখিয়া দেয়। সোভিয়েট তাহাদের সর্বোত্তম সংগীত, শ্রেষ্ঠ শিল্পনিদর্শনসমূহ, সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়া জনতার মধ্যে শিক্ষাকে নূতনভাবে পরিবেশন করিয়াছে। কবি লিখিতেছেন যে, আর্ট গ্যালারিতে "আসে অসংখ্য স্বশ্রমজীবীর দল, যথা রাজমিস্ত্রি লোহার, মুদি, দর্জি ইত্যাদি। আর আসে সোভিয়েট সৈনিক, সেনানায়ক, ছাত্র এবং চাষী সম্প্রদায়।"[২]

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পত্রধারায় জনতার আর্ট শিক্ষা সম্বন্ধে সোভিয়েটের মত অতি পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সোভিয়েট রাশিয়ার নূতন থিয়েটার দেখিবার ও সংগীত শুনিবার সুযোগ কবি পান। Moscow Art Theatreএ টলস্টয়ের *Resurrection*এর অভিনয়ে কবি উপস্থিত ছিলেন। আর-একদিন First State Opera Houseএ *Biaderka* নামে নৃত্যাভিনয় (ballet) দেখিতে যান; ভারতীয় কোনো প্রেমকাহিনী লইয়া নাকি নাটিকাটি রচিত। অভিনয় সম্বন্ধে কবির মত পত্রধারায় প্রকাশ করিয়াছেন।

কবি যে স্বল্পকাল মস্কৌতে ছিলেন তাহার মধ্যে এত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, এত লোকের সহিত মোলাকাত, এত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন যে, তাহা বাহুল্যভয়ে বিস্তৃতভাবে বলা সম্ভব নহে। 'রাশিয়ার চিঠি' ও বিশ্বভারতী কর্তৃক Dr. Timbers-এর 'নোট' হইতে সংকলিত বুলেটিনে অনেক কথাই জানা যাইবে। এ ছাড়া মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় (১৯৩১ জানুয়ারি) কবির রাশিয়া ভ্রমণ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ আছে, তাহা বহু তথ্যপূর্ণ।

পক্ষকাল মস্কৌ (১১ - ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩০) থাকিয়া কবি বার্লিন ফিরিয়া আসিলেন। মস্কৌ বাসকালে রাশিয়া সম্বন্ধে যে পত্রধারা লিখিতে আরম্ভ করেন তাহা বার্লিন থাকিবার সময় এমনকি (৩ অক্টোবর) আমেরিকার পথে ব্রেমেন জাহাজেও লিখিয়াছিলেন। শেষ পত্রখানি (২৮ অক্টোবর) আমেরিকা হইতে লিখিত।[৩]

১ Rabindranath Tagore in Russia . Modern Review, 1931 January pp. 10।

২ রাশিয়ার চিঠি, পৃ. ৭৮।

৩ ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩০ মস্কৌ, পত্র ২; রানী মহলানবিশকে লিখিত, প্রবাসী ১৩৩৭ পৌষ, পৃ. ৩০১-০২। ২০ সেপ্টেম্বর মস্কৌ, পত্র ১; রথীন্দ্রনাথকে লিখিত, প্রবাসী ১৩৩৭ অগ্রহায়ণ, পৃ. ১৫৭-৫৯। ২৫ সেপ্টেম্বর মস্কৌ, পত্র ৩; প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লিখিত, প্রবাসী ১৩৩৭ পৌষ, পৃ. ৩০২-০৬। ২৮ সেপ্টেম্বর ৩০ বার্লিন, পত্র ৪; রানী মহলানবিশকে লিখিত, প্রবাসী ১৩৩৭ ফাল্গুন, পৃ. ৫৯১-৯৩। ১ অক্টোবর বার্লিন, পত্র ৫; প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লিখিত, প্রবাসী ১৩৩৭ পৌষ, পৃ. ৩০৭-১০। ২ অক্টোবর বার্লিন, পত্র ৬; আশাদেবীকে লিখিত, প্রবাসী ১৩৩৭ চৈত্র, পৃ. ৮৮৫। ৩ অক্টোবর ব্রেমেন, পত্র ৭; সুরেন্দ্রনাথ করকে লিখিত, প্রবাসী ১৩৩৭ মাঘ, পৃ. ৪৪৬। ৪ অক্টোবর জাহাজ অতলান্তিক, পত্র ৮, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত, প্রবাসী ১৩৩৭ অগ্রহায়ণ, পৃ. ২২৫; ৫ অক্টোবর জাহাজ অতলান্তিক, পত্র ৯; নন্দলাল বসুকে লিখিত, প্রবাসী ১৩৩৭ অগ্রহায়ণ, পৃ. ১৫৯-৬১। ৭ অক্টোবর, পত্র ১০; সুরেন্দ্রনাথ করকে লিখিত, প্রবাসী ১৩৩৭ মাঘ পৃ. ৪৪৯। ৮ অক্টোবর জাহাজ অতলান্তিক, পত্র ১২; সুরেন্দ্রনাথ করকে লিখিত, প্রবাসী, ১৩৩৭ ফাল্গুন পৃ. ৫৯৩-৯৫। ৯ অক্টোবর জাহাজ অতলান্তিক, পত্র ১৩; কালীমোহন ঘোষকে লিখিত, প্রবাসী ১৩৩৭ চৈত্র, পৃ. ৮৯৯। ২৮ অক্টোবর ল্যান্সডাউন নিউইয়র্ক, পত্র ১৪। সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত, প্রবাসী ১৩৩৭ চৈত্র পৃ. ৮৯০। উপসংহার (নিউইয়র্ক) রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত, প্রবাসী ১৩৩৮ বৈশাখ।

আমেরিকায় পৌঁছিয়া কবি রথীন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন (১৪ অক্টোবর ১৯৩০), "এবার রাশিয়ার অভিজ্ঞতায় আমাকে গভীরভাবে অনেক কথা ভাবিয়েচে। প্রচুর উপকরণের মধ্যে আত্মসম্মানের যে বিঘ্ন আছে সেটা বেশ স্পষ্ট চোখে দেখতে পেয়েছি। সেখান থেকে ফিরে এসে মেন্‌ডেল (Mondel)দের[১] ঐশ্বর্যের মধ্যে যখন পৌঁছলুম একটুও ভাল লাগল না— ব্রেমেন জাহাজের আড়ম্বর এবং অপব্যয় এতদিন মনকে বিমুখ করেচে। ধনের বোঝা কি প্রকাণ্ড এবং কি অনর্থক। জীবনযাত্রার কত জটিলতা কত সহজেই এড়ানো যেতে পারে।"[২] "নিজেদের কথা সম্পূর্ণ ভুলতে হবে— তার চেয়ে বড়ো কথা সামনে এসেচে।"[৩]

আমেরিকা হইতে প্রতিমা দেবীকে লিখিতেছেন, "ধনিপরিবারের ব্যক্তিগত অমিতব্যয়িতার উপর এবার আমার আন্তরিক বৈরাগ্য হয়েচে। দেনা শোধের ভাবনা ঘুচে গেলেই দেনা বাড়াবার পথ একেবারে বন্ধ করতে হবে। তা ছাড়া নিজেদের ভরণপোষণের দায়িত্ব আমাদের গরীব প্রজাদের 'পরে যেন আর চাপাতে না হয়। এ কথা আমার অনেকদিনের পুরানো কথা। বহুকাল থেকেই আশা করেছিলুম আমাদের জমিদারি যেন আমাদের প্রজাদেরই জমিদারি হয়— আমরা যেন ট্রস্টির মতো থাকি।[৪] অল্প কিছু খোরাকপোষাক দাবী করতে পারব কিন্তু সে ওদের অংশীদারের মতো। কিন্তু দিনে দিনে দেখলুম জমিদারি-রথ সে-রাস্তায় গেল না— তার পরে যখন দেনার অঙ্ক বেড়ে চলল তখন মনের থেকেও সংকল্প সরাতে হল। এতে করে দুঃখ বোধ করেচি— কোনো কথা বলিনি। এবার যদি দেনা শোধ হয় তাহলে আর-একবার আমার বহুদিনের ইচ্ছা পূর্ণ করবার আশা করব।"[৫]

রথীন্দ্রনাথকে জমিদারি সম্বন্ধে কবি লিখিতেছেন (৩১ অক্টোবর ১৯৩০), "যে রকম দিন আসচে তাতে জমিদারির উপরে কোনোদিন আর ভরসা রাখা চলবে না। ও জিনিসটার উপর অনেককাল থেকেই আমার মনে মনে ধিক্কার ছিল, এবার সেটা আরও পাকা হয়েচে। যেসব কথা বহুকাল ভেবেচি এবার রাশিয়ায় তার চেহারা দেখে এলুম। তাই জমিদারির ব্যবসায়ে আমার লজ্জা বোধ হয়।...

"দেশের ইতিহাসে অনেক কিছু উলটপালট হবে। জীবনযাত্রাকে গোড়া ঘেঁসে বদল করবার দিন এল, সেটা যেন অনায়াসে প্রসন্ন মনে করতে পারি। যারা যত বেশি নানা জালে জড়িয়ে আছে তারা তত বেশি কষ্ট পাবে। দুঃখের দিন যখন আসে তখন তাকে দায়ে পড়ে মেনে নেওয়ার চেয়ে এগিয়ে গিয়ে মেনে নেওয়া ভালো। ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে দুঃখ সকলকেই পেতে হবে— সংকট এড়িয়ে আরামে থাকবার প্রত্যাশা করাই ভুল।"[৬]

রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া সম্বন্ধে যে-বিস্ময় লইয়া ঐ মহাদেশে প্রবেশ করেন, তাহা শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল, কোনো বিরুদ্ধ বা বিরূপ মনোভাব প্রশ্রয় পায় নাই।[৭] রাশিয়া হইতে ২৫ সেপ্টেম্বর লেখেন, "আমাদের কর্মীরা যদি কিছুদিন এখানে

১ Dr. and Mrs. Mendel at Wannsee, Berlin।

২ চিঠিপত্র ২, পত্র, ৩৮; Williamstown, Massachusetts, ১৪ অক্টোবর ১৯৩০ [২৭ আশ্বিন ১৩৩৭]।

৩ চিঠিপত্র ২, পত্র ৪০; ৩১ অক্টোবর ১৯৩০।

৪ তু. টলস্টয়ের 'রিসারেকশান' উপন্যাসের আদর্শের কথা।

৫ চিঠিপত্র ৩, পৃ. ৯১-৯২।

৬ চিঠিপত্র ২, পত্র ৪০।

৭ 'রাশিয়ার চিঠি' প্রথমে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। বলাবাহুল্য, বহু সহস্র বাঙালি সেগুলি পড়িয়াছিল; তার পর পুস্তকাকারে বাহির হইলে বহুলোকে পড়ে। প্রথম সংস্করণ ছাপাও হয় তিন হাজারের উপর। কিন্তু মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় একটি মাত্র চিঠির ইংরেজি তর্জমা বাহির হওয়া মাত্র সম্পাদকের উপর সরকারী হুকুম আসিল, আর যেন অনুবাদ ছাপা না হয়।

An English translation entitled 'The Soviet System' appeared in the Modern Review (September 1931). Another

[মস্কৌ] এসে শিক্ষা ক'রে যেতে পারত, তাহলে ভারি উপকার হত।" আমেরিকার পথে ব্রেমেন জাহাজ হইতে ঐ কথা লিখিতেছেন. "কতবার মনে হয়েছে আর কোথাও নয়, রাশিয়ায় এসে একবার তোমাদের সব দেখে যাওয়া উচিত।" রাশিয়া কবির মনকে ভালো করিয়াই স্পর্শ করিয়াছিল। পাঁচ বৎসর পরে লাহোর হইতে ঘুরিয়া আসিয়া অমিয় চক্রবর্তীকে যে দীর্ঘ পত্র লেখেন তার মধ্যে সোভিয়েটের কথা আছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্বন্ধে বলিতেছেন, "এই পেটুক সভ্যতাসমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান হবে কী করে? অধিকাংশ মানুষকে স্বল্পসংখ্যক মানুষের উদ্দেশে নিজেকে কি চিরকালই উৎসর্গ করতে হবে? ... সভ্যতার এই ভিত্তি-বদলের প্রয়াস দেখেছিলুম রাশিয়ায় গিয়ে— মনে হয়েছিল নরমাংসজীবী রাষ্ট্রতন্ত্রের রুচির পরিবর্তন যদি এরা ঘটাতে পারে তবেই আমরা বাঁচব নইলে চোখ রাঙানীর ভান অথবা দয়ার দোহাই পেড়ে দুর্বল কখনোই মুক্তি লাভ করবে না। নানা ত্রুটি সত্ত্বেও মানবের নবযুগের রূপ ঐ তপোভূমিতে দেখে আমি আনন্দিত ও আশান্বিত হয়েছিলুম। মানুষের ইতিহাসে আর কোথাও আনন্দ ও আশার স্থায়ী কারণ দেখিনি। জানি, প্রকাণ্ড একটা বিপ্লবের উপরে রাশিয়া এই নবযুগের প্রতিষ্ঠা করেছে— কিন্তু এ বিপ্লব মানুষের সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও প্রবল রিপুর বিরুদ্ধে বিপ্লব— এ বিপ্লব অনেকদিনের পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান। নব্য রাশিয়া মানবসভ্যতার পাঁজর থেকে একটা বড়ো মৃত্যুশেল তোলবার সাধনা করচে যেটাকে বলে লোভ।"[১]

P. S. Kogan মস্কৌ হইতে *The Golden Book of Tagore* (1931)-এ লিখিতেছেন— "Our enemies very often accuse us of having 'destroyed culture.' Meanwhile, perhaps no nation shows such a strained attention to the world's culture and its greatest representatives as the delivered nations of the Soviet Union. In 1930, Rabindranath Tagore paid us a visit and could convince himself how our workers respect and honour the great writer....

"It must have seemed that Tagore, avoiding all political struggle absorved in his deep meditation, must be foreign to us and far away from our life, which is spent in an atmosphere of stormy

English version (Tr. Sasadhar Sinha) entitled 'On Russia' came out in the same magazine in June 1934 and became the subject of a 'question' in the British Parliament. In this connection the following extracts from the proceeding of Parliament may prove interesting :

Mr. R. J. Davies asked the Secretary of State for India whether he was aware that the Government of Bengal had given notice to the *Modern Review* of India that an article written by Rabindranath Tagore, entitled "On Russia" which appeared in the *Modern Review* last June, 1934 was highly objectionable, and that the editor had been warned that such articles must not be published in future ; and, in view of the fact that no objection was taken by the Government of Bengal when this and similar articles were published in book form by this author in 1931, if he would state why this alteration of policy had taken place.

Mr. Butler, Under-Secretary for India : It is the case that a warning was issued to the editor of the *Modern Review* in respect of an article written by Rabindranath Tagore. This article was taken from a book called "Letters from Russia", which was published in Bengali by a local press in 1931. This book attracted little public attention and consequently no notice of it was taken by Government, but the translation into English of a particular chapter, which was clearly calculated by distortion of the facts to bring the British Administration in India into contempt and disrepute, and its publication in the forefront of a widely read English magazine, put a wholly different complexion on the case.

১ ৭ মার্চ ১৯৩৫, কবিতা, ১৩৪১ চৈত্র, পৃ. ১৭৩-৭৪।

political discussions and feverish reconstructions. But it is an error. A thinker, reflecting on the Eternal and a Revolution full to-day's interest and immediate problems, are not enemies. There is no rupture between them, and somewhere high upon the last summit they will hold a friendly meeting. Our Revolution does not reject the hope of a 'golden age', of a future brotherhood of humanity, the idea which during many thousand years animated all religions and also the best representatives of humanity. The communist revolution has traced on its banner the practical realisation of these ideals. The revolution is not a destroyer, an enemy of noble thinkers. On the contrary, the proletariat looks upon itself as the lawful heir who is called to translate these ideals into life. That is why the songs of Tagore are resounding in our hearts as a beautiful call for liberation." (p. 128)।

আমেরিকায় শেষ সফর

সোভিয়েট রাশিয়া হইতে কবির বার্লিন প্রত্যাবর্তনের পূর্বদিন (১৪ সেপ্টেম্বর) এন্‌ড্রুজ মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র রওনা হন— বোধ হয় কবির অগ্রদূতরূপে। ৩ অক্টোবর কবি ডক্টর টিমার্স ও আরিয়ামকে সঙ্গে লইয়া ব্রেমেন জাহাজে আমেরিকা যাত্রা করেন, ৯।১০ তারিখে নিউইয়র্ক পৌঁছান। নিউইয়র্ক হইতে কবি বস্টনে আসিলেন— বিশপ্‌ প্যাডক এর অতিথি। এইটির ব্যবস্থা বোধ হয় এন্‌ড্রুজ করিয়াছিলেন। সেখান হইতে কনেক্‌টিকাট স্টেটের নিউ হাভেন বন্দর-নগরে আসিলেন।

এখানে আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় Yale University অবস্থিত। কিন্তু এখানে আসিবার পর তাঁহার শরীর হঠাৎ এমন খারাপ হইয়া পড়িল যে তাঁহাকে সেখানকার বক্তৃতাদির ব্যবস্থা বাতিল করিতে হইল। কবি যতটা অসুস্থ নহেন, তাহা হইতেও তিনি অধিক অসুস্থ— এই সংবাদটাই পৃথিবীময় রাষ্ট্র করা হইল। তাঁহার শরীর খারাপ কিন্তু 'খারাপ বলেও এমন কি খারাপ' বলিয়া কবির নিজেরই প্রশ্ন জাগে। সামান্য বিষয় লইয়া বেশ বাড়াবাড়ি চলিল। বিলাত হইতে প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনল্‌ড উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া কেব্‌ল করিলেন: হাংগেরিতে বালাতন ফুরাদে কবি একটি বৃক্ষরোপণ করেন লোকে দেখিয়া আসিল সে গাছটি জীবিত আছে, তখন তাহারা কবিকে কেব্‌ল করিয়া জানাইল তিনি নিরাময় হইয়া উঠিবেন! মোটকথা, এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হইল যাহাতে কবির বক্তৃতা দেওয়া বন্ধ হইল। অথবা আমাদের মতে কবি যাহাতে বক্তৃতাদি না করিতে পারেন সেইরূপ চাতুর্যপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হইল— অর্থাৎ তিনি খুবই অসুস্থ, ক্লান্ত— সভাসমিতিতে কেহ ডাকিয়ো না।

কবি ইন্দিরা দেবীকে লিখিতেছেন (২৫ অক্টোবর), "পৃথিবীতে অল্পসংখ্যক দুর্ভাগা আছে যাদের গতিবিধি খবরের কাগজে (কালির ?) কালীর ছাপ দিতে দিতে চলে, তাদের নিরালায় অসুস্থ হবারও জো নেই। অতএব তোদের কাছে ছাপা নেই যে আমার শরীর খারাপ।... কিছুদিনের মতো চুপচাপ করে পড়ে থাকবার মতো খারাপ, তার বেশি নয়।"

আমেরিকানদের ভয় রবীন্দ্রনাথ পাছে ভারতে গান্ধীবাদ সমর্থন করেন ও সোভিয়েট রাশিয়ার সমাজতন্ত্রবাদের

প্রশংসা করিয়া বক্তৃতাদি করেন! যে মার্কিনরা দেড় শত বৎসর পূর্বে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যুদ্ধ করিয়াছিল, আজ পরাধীন ভারতকে ব্রিটিশের নাগপাশ ছিন্ন করিবার জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাহারা হৃষ্টচিত্তে সে আন্দোলনকে সমর্থন করিতে পারিল না। আর রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রবাদের যে পরীক্ষা শুরু হইয়াছে তাহা তো আমেরিকার ধনতন্ত্র ধুরন্ধরদের স্বার্থের চরম পরিপন্থী আন্দোলন— রবীন্দ্রনাথ সদ্য রাশিয়া সফর করিয়া আসিয়াছেন— যদি তিনি প্রসংশমান কথা বলেন!

রাশিয়ার ধনহীন দেশ হইতে মার্কিনী ধনবানদের দেশে কবি আসিয়াছেন। ধনতন্ত্র ও ধনের 'ইতরতা' সম্বন্ধে মনে যথেষ্ট বিতৃষ্ণা। তৎসত্ত্বেও সেখান হইতেই বিশ্বভারতীর জন্য ধনসংগ্রহের কথা মন হইতে দূর করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু সময়টা বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজার (slump) পর্ব। ধনকুবের রকফেলারের সঙ্গে একটা সাক্ষাতকারের কথা উঠে— তবে তখন তিনি দেশে নাই ; মাসাধিককাল পরে য়ুরোপ হইতে ফিরিবেন নভেম্বর মাসের শেষ দিকে। যাঁহারা মোলাকাতের কথা ভাবিতেছিলেন, তাঁহারা চারিদিকের ভাবগতিক দেখিয়া কবিকে আর ধনপতির সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য উৎসাহিত করিলেন না।

রুফাস্ জোন্স্ হেভেরফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, কোয়েকার সংঘের লোক, খ্যাতনামা লেখক— তিনি কবিকে বলিলেন যে তাঁহারাই যাহা পারেন পরে করিবেন।[১] কিন্তু এইসব কথাবার্তা, উদ্বেগের মধ্যে কবির মন ডুবিয়া আছে ছবির মধ্যে। নিউ হাভেন হইতে ফিলাডেলফিয়া আসিয়া (২৬ অক্টোবর) লিখিতেছেন, "য়ুরোপে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা হয়েচে তাতে বুঝেচি আমার ছবি আঁকার উপর আমি ভরসা করতে পারি ; তাই মনে করে আমার মন বেশ খুশিতে আছে।"[২] অর্থাৎ ছবি আঁকিয়া চলিয়াছেন।

ফিলাডেলফিয়া হইতে ৩ নভেম্বর কবি আসিলেন নিউইয়র্কে। সেখানে ইতিপূর্বে তাঁহার চিত্রপ্রদর্শনী হইয়াছে— সেটির ব্যবস্থা করেন শ্রীহরিসিং গোভিল। গোভিল দীর্ঘকাল মার্কিন মুলুকে আছেন— সে-দেশের হালচাল সম্বন্ধে খুবই ওয়াকিবহাল। কবির বিশ্বাস নিউইয়র্কে তাঁহার ছবির বিক্রয় হইবে, বস্টনে আশানুরূপ হয় নাই— তার কারণ তিনি মনে করেন বস্টন ইংরেজের আঁচলধরা— কন্টিনেন্টাল নয়— ভারতের প্রতি তাদের দরদ নাই।[৩]

নিউইয়র্কের হোটেলে (১১৭২ পার্ক এভিনিউ) আছেন ; মোলাকাত ও সামাজিকতা ছাড়া কোনো কাজ নাই— কোনো আহ্বান নাই। শান্তিনিকেতনের কথা সদাই মনে জাগে। বহুবার কবি ভাবিয়াছেন যে বিশ্বভারতীকে মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয় করিবেন ; শ্রীসদনের পরিচালিকা হেমবালা সেনকে লিখিতেছেন, "মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে, এই সংকল্প আমাকে রাস্তায় বের করেছে।"[৪] এ ভাবনা কবির নূতন নয় ; মাঝে মাঝে ইহাকে-তাহাকে পত্রমধ্যে এই বিষয়ে লিখিয়াছেন, কিন্তু কখনো সংকল্পের রূপ লয় নাই। এইভাবে দিন যায় নিউইয়র্কের হোটেলে। শেষ পর্যন্ত লোক দেখানো আপ্যায়িতের বিরাট ব্যবস্থা হইল বিল্টমোর হোটেলে (২৫ নভেম্বর)। সেইদিন প্রাতে কবি লিখিতেছেন, "পাঁচ শো লোক মিলে আমাকে অভ্যর্থনা করবে। এটা যে আমার পক্ষে কত বড়ো পীড়া তা কেউ বুঝবে না। খ্যাতির আড়ম্বরে অনেকখানি মসলা থাকে যা কেবলমাত্র ওজন বাড়াবার জন্যে কিন্তু সেইটের বোঝা বড়ো অসহ্য।... হায় রে, এর মাঝে আমি কেন? কি পাপ করেছিলুম? বিশ্বভারতী? প্রায়শ্চিত্ত

১ চিঠিপত্র ২, পৃ. ১০০।

২ চিঠিপত্র ২, পৃ. ১০৪।

৩ দ্র. চিঠিপত্র ২, পৃ. ১০২ ; চিঠিপত্র ৩, পত্র ১৮।

৪ প্রবাসী ১৩৪৮ কার্তিক, পৃ. ১১৫।

করে বিদায় নিতে পারলে বাঁচি। প্রতিপদে মনে হচ্ছে সত্যকে মিথ্যা করে তুলচি— সেই মিথ্যার বোঝা কি ভয়ঙ্কর।"[১]

এই ভোজসভার কাণ্ডকারখানা দেখিয়া নিউইয়র্কের Saturday Review (৬ ডিসেম্বর) লিখিলেন, 'নিমন্ত্রিতের তালিকাটিতে কারবারী লোক ধনী লোকের নাম অনেক দেখা গেল, কিন্তু একজন কবির নাম পাইলাম না, এমনকি একজন লেখকেরও নাম নয়। এরূপ ব্যাপার কি কখনো ফ্রান্সে হইতে পারিত।'

কবিকে লইয়া তাহারা মাতামাতি করিতেছে, কিন্তু ভারতীয় কবির কী বক্তব্য তাহা শুনিবার আগ্রহ বা অবসর কাহারও নাই। কবির সঙ্গে প্রায়ই দেখা করেন ব্রিটিশ রাজদূত সার্ রোনলাড লিন্ড্সে। তিনি একদিন কবিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট হুভার-এর সঙ্গে দেখা করিতেও লইয়া গেলেন। কিন্তু ভাষণদানের ব্যবস্থা করিতে কোনো প্রতিষ্ঠানই অগ্রসর হইতেছে না।

পহেলা ডিসেম্বর Discussion Guild ও India Society of America, নিউইয়র্কের কার্নেগি হলে একটা সংবর্ধনা সভার আয়োজন করে, সেখানে শিক্ষা বিষয়ে কবি এক ভাষণ দান করিলেন। ৭ ডিসেম্বর আমেরিকার বাহাই সম্প্রদায়ের আহ্বানে (The first and the last prophet of Persia) পারস্যের প্রথম ঋষি জরথুষ্ট্র ও শেষ ঋষি আবদুল বাহা সম্বন্ধে একটি লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন। এই সভায় হেলেন কেলার লিখিত এক সংক্ষিপ্ত ভাষণও পঠিত হয়।[২] সভাশেষে কবি তাঁহার ভাষণে কি বলিলেন তাহা হেলেন কেলার জানিতে চাহিলেন। অন্ধ মূক বধির বিধাতার আশ্চর্য সৃষ্টি এই নারী— রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিকটে আসিলে তিনি কবির ওষ্ঠের উপর অঙ্গুলি রাখিলে তিনি সংক্ষেপে তাঁহার বক্তব্য বলিলেন। কেলার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া কবিকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। কেলার এই স্পর্শানুভূতির সাহায্যে 'শ্রবণ' করিতেন।

কবির আমেরিকা হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে একদিন (১৫ ডিসেম্বর) কেলার কবিকে উপহার ও পুষ্পার্ঘ্যের সহিত যে পত্র প্রেরণ করেন তাহাতে রবীন্দ্র-প্রচারিত বিশ্বমানবিকতার আদর্শের প্রতি ও কবির প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে—

Now is the time of your departure, dear Master. Will you graciously accept my offering of flowers? I would have them please your senses and breathe my heart's loving wish. A happy year to you for every noble word you have spoken!

O Master! it is beautiful to know that nothing is finally wrong with the world. It is beautiful to know that when everything is in its place, it is good. O dear Master, it is beautiful to know that out of cruel things and great sorrows is finally wrought the Empire of Love.

The little bridge in the picture is a symbol of the bond of justice that shall unite East and West, North and South. Beautiful shall be the feet of those who cross and recross it with tidings of fellowship and peace!

নিউ হিস্ট্রি সোসাইটির উদ্যোগে Ritz-Carlton Hotel-এ যখন সভা হইতেছে, সেই সময়ে আইনস্টাইন

১ চিঠিপত্র ৩, পত্র ৩৭।

২ হেলেন কেলার প্রসঙ্গ, শ্রীপুলিনবিহারী সেন; আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৬১ চৈত্র ১৩।

আমেরিকায় আসিতেছেন, জাহাজ হইতে কবিকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।[১] রাশিয়া হইতে ফিরিবার পরই মেন্‌ডেলদের গৃহে কবির সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এবার আইনস্টাইন কালিফোর্ণিয়ার Institute of Technologyর ভিজিটিং প্রোফেসার রূপে আমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন। নিউইয়র্কে কবির এক মহিলা ভাস্করের গৃহে আইন-স্টাইনের সহিত তাঁহার পুনরায় সাক্ষাৎ হইল।[২]

কবির সহিত এবার আমেরিকায় আর যে কয়জন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় আনন্দ কুমারস্বামী। বস্টন ও নিউইয়র্কের কবির চিত্রপ্রদর্শনীর জন্য যে চিত্রতালিকা মুদ্রিত হয়, তাহাতে তিনি ভূমিকা লিখিয়া দেন। আর কবির সহিত সাক্ষাৎ হয় Will Durant-এর। ডুরাণ্ট আমেরিকার চিন্তাশীল লেখক; তিনি ভারতে আসিয়াছিলেন ভারতের দর্শনাদি অধ্যয়ন করিবার জন্য। কিন্তু তথাকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা দেখিয়া লিখিলেন *Case for India* নামে গ্রন্থ। বইএর যে কপি তিনি রবীন্দ্রনাথকে উপহার দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি লিখিয়া দেন, You alone are sufficient reason why India should be free। দুঃখের বিষয় ভারতসরকার Durant-এর এই বইখানি ভারতে আসা নিষিদ্ধ করেন।[৩]

য়ুরোপযাত্রার পূর্বদিন সন্ধ্যায় Ruth St. Denis[৪] নামে বিখ্যাত মহিলা নৃত্যশিল্পী কবির কতকগুলি কবিতা ভাব-নৃত্যে রূপায়িত করেন; এই জলসায় যে টাকা টিকিট বিক্রয় করিয়া উঠে, তাহা কবি নিউইয়র্কের বেকারদের তহবিলে দান করেন।

পরদিন (১৮ ডিসেম্বর) আমেরিকা ছাড়িয়া ২২ ডিসেম্বর কবি ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন। লণ্ডনে আসিয়া কবি ভাবিতেছেন বিশ্বভারতীর জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিবেন। সময়টা ছিল ভালো। লণ্ডনে প্রথম গোলটেবিল বৈঠক (Round Table Conference) বসিয়াছে (১২ নভেম্বর)— ভারতের রাজা মহারাজা নানা রাজনৈতিক দলের নেতারা সমবেত হইয়াছেন। শ্রীনিকেতনের কালীমোহন ঘোষ[৫] তখন লণ্ডনে, তিনি আসিয়াছেন দক্ষিণ-পূর্ব য়ুরোপে পল্লীসংগঠনের কাজকর্ম দেখিবার জন্য। তিনি বিশ্বভারতীর জন্য অর্থসংগ্রহ ব্যাপারে ঘোরাঘুরি করিতে লাগিলেন; আরিয়াম তো আছেনই। ইতিপূর্বে কোয়েকার বন্ধুরা একটি সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। এবার লণ্ডনেও একটি সমিতি গঠিত হইল।[৬]

১ New History Society-র এই সভা হয় Ritz-Carlton Hotel-এ। প্রায় ৩০০০ শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। সভার দিনে সন্ধ্যার সময়ে Albert Einstein-এর নিকট হইতে radiogramএ এক message আসিল 'May Tagore work further with success in the services of our ideals for the union of all nations. Greetings to Tagore'.

২ Gertrude Emerson লিখিত প্রবন্ধ *The Golden Book of Tagore*, p. 80 দ্রষ্টব্য।

৩ দ্র. প্রবাসী ১৩৩৮ শ্রাবণ, পৃ. ৫০৯। বঙ্গের পুস্তকালয় ও বঙ্গভাষা সম্বন্ধে রামানন্দবাবুর বক্তৃতা।
দেশে ফিরিয়া রবীন্দ্রনাথ ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১ ডুরাণ্টের *Case for India* গ্রন্থের সমালোচনা লেখেন। Modern Review, 1931 March। *The Golden Book of Tagore*-এ Will Durant-এর লিখিত রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৪ Ruth St. Denis—Ruth Denis (1882) American dancer and teacher of dancing. Organiser Denishawn School of Dancing in Los Angeles, later in New York; toured United States, England and the Orient (1925-26); married Teddy Shawn, a reputed dancer in 1914; separated in 1930. (See Websters' Biographical Dictionary)।

৫ Kalimohan Ghose was granted five months' leave with full pay for studying Rural Reconstruction work in South-East Europe and returned in March 1931.—Annual Report of the Visva-Bharati 1931, p 22।

৬ Lady Parmoor, ন্যাশনাল গ্যালারীর অধ্যক্ষ A. M. Daniel, Master of Baliol College, A. B. Lindsay, M. Sadler, Rothenstein প্রভৃতি।

আমেরিকা হইতে ফিরিবার পর স্পেকটেটর পত্রিকার সম্পাদক Evelyn Wrench কবিকে হাইড্ পার্ক হোটেলে একদিন সংবর্ধিত করেন; এই সভায় বার্নর্ড্ শ (Shaw) উপস্থিত হন; কবির সহিত তাঁহার নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। এখানে 'বেঙ্গল-লান্সার' গ্রন্থের লেখক মেজর ইয়েটস্-ব্রাউন (Yeats-Brown) উপস্থিত ছিলেন; বৎসর দশ পূর্বে তিনি শ্রীনিকেতনে একবার আসেন— তখন তাঁহার লেখক খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ ডিসেম্বর মাসে যখন লণ্ডনে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন সেখানে (১২ নভেম্বর হইতে) গোলটেবিল বৈঠক বসিয়াছে। এই বৈঠকে কংগ্রেস প্রতিনিধি কেহ আসেন নাই— আসিয়াছেন রাজন্যবর্গের ষোলো জন। ব্রিটিশভারতের ছাপান্ন জন মনোনীত সদস্য; আর বিলেতের তেরো জন প্রতিনিধি লইয়া সভা চলিতেছে।

গত জুলাই (১৯৩০) মাসে ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড আরউইন বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকের সংবাদ প্রকাশ করেন। আইন-অমান্য আন্দোলনের ফলে কংগ্রেসের প্রায় সকল সদস্য কারাপ্রাচীরের অন্তরালে বন্দী। ভারতসরকার ভারত হইতে নির্বাচিত সদস্য প্রেরণের ব্যবস্থা না করিয়া আপনাদের মনোনীত লোক প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা গান্ধীজিকে সভায় উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন— তিনি যাইতে অস্বীকৃত হন। তিনি এমন কতকগুলি শর্ত দাবী করেন যাহা মানিয়া লইতে গেলে ব্রিটিশসরকারের রাজকীয় মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়, ফলে কংগ্রেস পক্ষীয় কোনো প্রতিনিধি প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থিত হইলেন না। রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা বাসকালে ভারতের সকল সংবাদ ভালো করিয়া পাইতেছিলেন না; তিনি বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষী হইতে বিচার করিয়া লিখিয়াছিলেন যে গান্ধীজি সভায় উপস্থিত হইলে ভালোই হইত। তিনি Spectatorএ ১৭ নভেম্বর লিখিলেন, "I believe that it would have been worthy of Mahatma Gandhi, if he could have accepted unhesitatingly the seat offered to him, even though the conditions were not fully acceptable to himself. To come there without any absolute assurance of political success would all the more enhance the significance of his moral misson. And now he had the opportunity to introduce the moral spirit of the (non-violent resistance) movement into a Conference which only he has made compelling possible and which only could have been used as a platform wherefrom to send his voice to all those all over the world who truly represent the future history of man. It waits for a man of genius, as he surely is, to turn an instrument for giving expression to the spirit of the age in the field of political inter-communication. I feel sad such an opportunity has been lost for the moment for India and for all the world. For today is the age of Co-operation in all departments of life, including politics.'।

রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিলেন তাহা ভাবুকচিত্তের উচ্ছ্বাস নহে, তাহা অত্যন্ত খাঁটি রাজনৈতিক সত্য। তবে ঐ পত্রের শেষে বিষয়টাকে মোলায়েম করিবার জন্য লিখিলেন, "I hesitate to doubt his wisdom when he holds himself aloof from the invitation. ... Let me believe in his firmness, and not in my doubts"। স্পেকটেটরের সম্পাদক লিখিলেন যে তাঁহারা কবির সহিত সম্পূর্ণ একমত— We welcome his [Tagore's] outspoken letter.

গোলটেবিল বৈঠকে গোড়া হইতেই গোল বাধিয়াছে; ভারতীয় প্রতিনিধিদল কোনো বিষয়ে একমত হইয়া গঠনমূলক সুপারিশ খাড়া করিতে পারিতেছেন না। কংগ্রেস অসহযোগ করিয়া কোনো প্রতিনিধি পাঠান নাই। মুসলমান প্রতিনিধিরা প্রায় সংঘবদ্ধ; তাঁহারা সকল বিষয়েই নিজেদের সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণীগত স্বার্থকে

ভারতের সমগ্র জাতীয় জীবনের ধারা হইতে পৃথক রাখিবার জন্য বদ্ধকর। অমুসলমান যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারাও আপন-আপন ধর্ম ও শ্রেণীর জন্য নানারূপ রক্ষাকবচ ধারণের জন্য উৎসুক ; কোনো মিলনের সূত্র কোথাও কেহ খুঁজিয়া পাইতেছেন না। কোনো কোনো নেতা রবীন্দ্রনাথকে মধ্যস্থতা করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন ; কিন্তু কবি কথাবার্তা কহিতে গিয়া দেখিলেন এ কাজ তাঁহার নহে।

আমেরিকা হইতে ফিরিবার দিন পনেরো পর জানুয়ারি (১৯৩১) মাসের গোড়ায় কবি দেশের দিকে রওনা হইলেন। এগারো মাস পরে ৩১ জানুয়ারি (১৭ মাঘ ১৩৩৭) কবি দেশে ফিরিলেন।

য়ুরোমেরিকায় চিত্রপ্রদর্শনী

১৯৩০ সালের এই সফর, পাশ্চাত্য জগতে কবির শেষ ভ্রমণ। এইবারের এগারো মাস ভ্রমণের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা পনেরো দিনে সোভিয়েট দেশের মস্কৌ দর্শন। সোভিয়েট অর্থনীতিবাদ কবির মনকে কতখানি অধিকার করে, তার সাক্ষ্য 'রাশিয়ার চিঠি'গুলি। সোভিয়েট দেশের অর্থনৈতিক আদর্শবাদে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশে ফিরিলেন। আর বিদেশের কাছে দিয়া আসিলেন তাঁহার রিলিজন অব্ ম্যান-এর বাণী ; আর তাঁহার চিত্রাবলী। ধর্মের নূতন সংজ্ঞা ও ছবির নূতনরূপ। এতকাল রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল সাহিত্যিক ও শিক্ষাশাস্ত্রীর, এবার লোকে তাঁহার হিবার্ট বক্তৃতামালা পাঠে জানিতে পারিল যে, কবি বিশেষ এক জীবনদর্শনের দ্রষ্টা। আর তাঁহার চিত্রাবলী দেখিয়া তাহারা বুঝিল যে রবীন্দ্রনাথ একজন চিত্রশিল্পীও বটে। তিনি সর্বত্রই এইটি অনুভব করিলেন যে, তাঁহার খেয়াল-খুশির সৃষ্টিকে কেহ তাচ্ছিল্য করিতে পারে নাই। তাঁহার অঙ্কিত চিত্রাবলী দেশে তখনো প্রদর্শিত হয় নাই— অন্তরঙ্গরা ছাড়া তাঁহার এই আর্টিস্টসত্তার পরিচয় কাহারও ছিল না ; পাশ্চাত্যদেশেই তাঁহার চিত্রপ্রদর্শনী প্রথম হয়।

কবির ছবিআঁকার ইতিহাস খুব পুরাতন নহে ; বলিতে গেলে ১৯২৬ হইতে ইহার আরম্ভ। তবে তাঁহার পুরাতন পত্রাবলী হইতে আমরা জানিতে পাই যে, ছবি তিনি মাঝে মাঝে আঁকিতেন। তবে ১৯২৬ হইতে ছবি-আঁকা রীতিমত নেশার মতো তাঁহাকে পাইয়া বসে। বৎসর বারো-তেরোর মধ্যে তিনি প্রায় তিন হাজারের উপর ছবি আঁকেন। নন্দলাল বসু লিখিয়াছেন, 'প্রায় দশ-বারো বছরের মধ্যেই যেসব ছবি তিনি এঁকেছেন, তার সংখ্যা গত পঞ্চাশ বৎসরে বাংলাদেশে সমস্ত নামকরা চিত্রশিল্পীরা মিলে যত ছবি এঁকেছেন— তার চেয়ে বেশি। তাঁর বহুসংখ্যক ছবির মধ্যে ১৫০০-এর বেশি ছবি রবীন্দ্রসদনে আছে।'

রবীন্দ্রনাথের ছবি ভালো কি মন্দ, তাহা দুর্বোধ্য, না একেবারেই অবোধ্য— এ সকল প্রশ্নর বহু আলোচনা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে— আমরা সে-আলোচনার অনধিকারী। তবে একটা কথা সকল শ্রেণীর ক্রিটিক স্বীকার করিয়াছেন যে, এই সব ছবির মধ্যে দেখিবার ভাবিবার বুঝিবার অনেক কিছু আছে। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বা পেশাদার শিল্পী নহেন ; তাই বলিয়া তাঁহার চিত্রাবলী কেহ উপেক্ষা করিতে পারেন না, প্রদর্শনীতে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে হইয়াছে।

কবির ছবিআঁকার বা 'চিত্তির-বিচিত্তির' শুরু হয় নিজ লেখার কাটাকুটির উপর। লেখার মধ্যে যে অংশ বাদ দিতে চাইতেন তাহাকে এমনভাবে কাটাকুটি করিতেন যে, তার মধ্য থেকে পুরাতন হরফ যেন কেউ উদ্ধার করিতে না পারে। এই কাটাকুটি করিতে করিতে সকলেরই একটা রূপ খাড়া করিতে ইচ্ছা হয় ; রবীন্দ্রনাথ

তাহাই করিতেন এবং তাঁহার শিল্পীমনের মধ্যে যে শিশুর বাস, সে অন্যমনস্কভাবে বিচিত্র রূপসৃষ্টি করিয়া চলে কলমের আঁচড়ে আঁচড়ে। কৈশোরে ও যৌবনে তিনি ছবি আঁকেন। পুরাতন কাগজপত্রে সেসবের নমুনা দেখা যায়; তবে সেগুলি মামুলি পদ্ধতিতে অঙ্কিত— কিছুটা দেখা, কিছুটা স্মরণকরা বিষয়।

কিন্তু কবির এবারকার ছবি আঁকার পদ্ধতি গড়িয়া উঠে তাঁহার লেখা-কাটাকুটি হইতে। সাধারণত ছবিআঁকা হয় দুই ভাব হইতে— বাহিরের কোনো দৃশ্য মনের মধ্যে রং ধরায়, তাহাকেই শিল্পী রূপ দান করে; অথবা মনের মধ্যে যেসব ভাবনা আকুলিত, তাহা শিল্পী রূপ দেন— চিত্রে ভাস্কর্যে এমনকি স্থাপত্যে। কিন্তু যাহাকে আমরা অন্তরের ভাবনা হইতে উদ্ভূত বলিতেছি, তাহারাও হয়তো বাহিরের কোনো সুদূরকালের অভিঘাত-সঞ্জাত বিষয়— প্রচ্ছন্ন ছিল অবচেতনের তলে— শিল্পী যখন সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন সেইসব অবচেতন-গুহাশায়িত রূপগুলি মূর্ত হইয়া উঠে। মোটামুটিভাবে বলা হয় যে, একশ্রেণীর আর্টের সৃষ্টি দৃশ্যমান জগৎ হইতে (Objective); আর-একশ্রেণীর জন্ম হয় মনের গহনে, অদৃশ্য লীলাক্ষেত্রে (Subjective)।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছবির উৎপত্তি এই দুই ধারার বাহিরে। তাঁহার লেখার উপর কাটাকুটি করিতে করিতে একটা রূপ গড়িয়া উঠে— সে ছবিআঁকার কোনো উদ্দেশ্য বা purpose নাই; অর্থাৎ একটা-কিছু গড়িবার সংকল্প লইয়া তাহার পত্তন হয় নাই— অথবা চেতনমনের কাছে কোনো সংকল্পই অজ্ঞাত। রেখার টানে তুলির লেপনে রঙের বিস্তারে রূপ হইতে রূপান্তরে চলে তাঁহার চিত্র— তার পর এমন-একটা স্থানে আসিয়া সে দাঁড়ায়, যখন তাহাকে আর নূতন রেখা বা রঙের দ্বারা স্পর্শ করা যায় না— সে যেন গানের সমে আসিয়া স্তব্ধ হইয়া শিল্পীর মানসনয়নে প্রাণবন্ত হইয়া উঠে।

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ছবির ইতিহাস এই; তবে ইহা ছাড়াও তিনি বহু রকমের পরীক্ষা করিয়াছেন— কখনো কোনো বিলাতী ছবি দেখিয়া, কখনো কোনো মানুষের মুখ দেখিয়া, কখনো কোনো ফুল বা গাছ দেখিয়া— নিজের টেক্‌নিকে রূপায়িত করিয়াছেন। কবি তাঁহার চিত্র সম্বন্ধে একপত্রে লিখিতেছেন, "আমাদের দেশের সঙ্গে আমার চিত্র-ভারতীর সম্বন্ধ নেই বলে মনে হয়। কবিতা যখন লিখি তখন বাংলার বাণীর সঙ্গে তার ভাবের যোগ আপনি জেগে ওঠে। ছবি যখন আঁকি তখন রেখা বলো রং বলো কোনো বিশেষ প্রদেশের পরিচয় নিয়ে আসে না। অতএব এ জিনিসটা যারা পছন্দ করে তাদেরই, আমি বাঙালি বলে এটা আপন হতেই বাঙালির জিনিস নয়। এইজন্যে স্বতঃই এই ছবিগুলিকে পশ্চিমের হাতে দান করেছি। আমার দেশের লোক বোধ হয় একটা জিনিস জানতে পেরেছে যে আমি কোনো বিশেষ জাতের মানুষ নই।"[১]

এইবার য়ুরোপ-আমেরিকায় সফরকালে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিষয়ক বড়কিছু রচনা চোখে পড়ে না। বেশির ভাগ সময় কাটে ছবিআঁকায়। এখন এই মিউজ্‌ বা কলালক্ষ্মী তাঁহার জীবনকাব্যের অচ্ছেদ্য লীলাসঙ্গিনী, কেবল-মাত্র চিত্তবিনোদন বা অবসরযাপনের প্রিয়া নহে। কিন্তু বহুকাল য়ুরোমেরিকার বস্তুরাজ্যে ও আপনারই সৃষ্ট দৃশ্যমান ছবির রাজ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে মন অবশেষে যেন ক্লান্ত ও কিছুটা বিরক্ত হইয়াও উঠিতেছে; মনে হইতেছে ছবিআঁকার মধ্যে মনস্বিতার ও রসানুভূতির অভাব। সেই ক্লান্ত দিনে আত্মীয়হীন বিদেশে জীবনদেবতার প্রকাশ-

১ পথে ও পথের প্রান্তে, পত্র ৪৯।

অভাব অকস্মাৎ তীব্রভাবে অনুভব করিয়া প্রাণলক্ষ্মীর উদ্দেশ্য লিখিলেন 'তুমি' কবিতা (৭ নভেম্বর ১৯৩০, আল্‌গন্‌ কুয়িন, নিউইয়র্ক)—

চেনা মুখখানি আর নাহি জানি
আঁধারে হতেছে গুপ্ত,
তব বাণীরূপ কেন আজি চুপ,
কোথায় সে হায় সুপ্ত।
অবলুণ্ঠিত তব চারিধার,
মহামৌনের নাহি পাই পার,
হাসিকান্নার ছন্দ তোমার
গহনে হল যে লুপ্ত।[১]

এই 'প্রাণলক্ষ্মী' কবিতার 'তুমি'কে—

অজানা তারায় বাজে তব গান . .।
প্রেমের দিয়ালি দিয়েছিল জ্বালি
তোমারি দীপের দীপ্তি
মোর সংগীতে তুমিই সঁপিতে
তোমার নীরব তৃপ্তি।. .
হৃৎশতদলে তুমি বীণাপানি
সুরের আসন পাতি
দিনের প্রহর করেছ মুখর,
এখন এল যে রাতি।

এই দীর্ঘ কবিতায় যে বেদনা মুক্তিলাভের জন্য আকুলিত, তাহার বিকাশ হয় দেশে ফিরিবার মাত্র এগারো দিন পরে— 'আমি' কবিতায় (১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১)—

আজ ভাবি মনে-মনে তাহারে কি জানি
যাহার বলায় মোর বাণী,
যাহার চলায় মোর চলা,
আমার ছবিতে যার কলা
যার সুর বেজে ওঠে মোর গানে গানে,
সুখে দুঃখে দিনে দিনে বিচিত্র যে আমার পরানে। . .
যুগে যুগে কবির বাণীতে
সেই আমি আপনারে পেরেছে জানিতে।

'প্রাণলক্ষ্মী' (তুমি) কবিতা নিউইয়র্ক হোটেলে লিখিবার দিন চার পরে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত তাগিদে কবিকে একটি

১ প্রাণলক্ষ্মী, প্রবাসী ১৩৩৭ পৌষ। পরিশেষ কাব্যখণ্ডে ইহা 'তুমি' নামে উল্লিখিত।

কবিতা লিখিতে হইল। কলিকাতায় 'লিবার্টি' (Liberty) দৈনিক-পত্রিকা তাহাদের নববর্ষের (১৯৩১) জন্য একটি কবিতা চাহিয়া পাঠান। নূতন কবিতা লিখিবার প্রেরণা ক্ষীণ, তাই পুরাতন ইংরেজি একটি কবিতা অনুবাদ করিয়া দিলেন। পাঠকের স্মরণ আছে ১৯২৯ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর কবি মঁপলিয়ের কলেজ প্রতিষ্ঠাদিনের জন্য একটি কবিতা লেখেন; পরে ওই কবিতা *Religion of Man*-এর প্রবেশকরূপে মুদ্রিত হয়। এইবার সেই কবিতাটি অনুবাদ করিয়া দিলেন।[১]

পক্ষে বহিয়া অসীমকালের বার্তা
যুগে যুগে চলে অনাদি জ্যোতির যাত্রা
কালের রাত্রি ভেদি
অব্যক্তের কুজ্ঝটিজাল ছেদি,
পথে পথে রচি' আলিম্পনের লেখা।
পাখার কাঁপনে গগনে গগনে
উজ্জ্বলি উঠে দিক প্রাঙ্গণে অগ্নিচক্ররেখা।
অস্তিত্বের গহনতত্ত্ব ছিল মূক বাণীহীন; অবশেষে একদিন
যুগান্তরের প্রদোষ আঁধারে শূন্য পাথারে
মানবাত্মার প্রকাশ উঠিল ফুটি।
মহাদুঃখের মহানন্দের সংঘাত লাগি চিরদ্বন্দ্বের
চিৎপদ্মের আবরণ গেল টুটি'।
শতদলে দিল দেখা
অসীমের পানে মেলিয়া নয়ন দাঁড়ায়ে রয়েছে একা
প্রথম পরমবাণী বীণা হাতে বীণাপানি।

ছবি আঁকিতে আঁকিতে যে মনস্বিতার অভাব অনুভব করিতেছিলেন, তাহারই প্রতিক্রিয়ায় কবি যেন এই সহজ অবোধ্য কবিতাটি লিখিলেন; বলা বাহুল্য এইটি লিখিতে কবিকে সযত্নে চেতনমনে অবগাহন করিতে হইয়াছিল।

১ এই কবিতাটি Liberty দৈনিকে কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত হয়। 'বিচিত্রা'র ১৩৩৭ পৌষ সংখ্যায় চয়ন অংশে 'অনাদিকালের বার্তা' শিরোনামায় কবিহস্তাক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহা লিবার্টির সৌজন্যে প্রাপ্ত বলিয়া উল্লিখিত। ইহার প্রথম পংক্তি ছিল—"পক্ষে বহিয়া অনাদিকালের বার্তা।" প্রবাসীতে পাঠ আছে "পক্ষে বহিয়া অসীমকালের বার্তা।" কবি আমেরিকা হইতে কবিতাটি লিবার্টি ও প্রবাসীর জন্য পাঠাইয়া দেন; লিবার্টির জন্য পাঠাইবার পর পাঠের পরিবর্তন করিয়া প্রবাসীতে দেন। প্রবাসী (১৩৩৭ মাঘ) পত্রিকায় 'বাণী' নামে প্রকাশিত হয়। এই কবিতাটি 'পরিশেষ' মধ্যে স্থান পায় নাই কেন বুঝিলাম না।

দেশে প্রত্যাবর্তনের পরে

য়ুরোমেরিকায় প্রায় বৎসরকাল সফর করিয়া কবি ৩১ জানুয়ারি দেশে ফিরিলেন। ঐ দুই মহাদেশের অতি-ব্যবহারিক কৃত্রিম উত্তেজনার মধ্যে দীর্ঘকাল বাস করিয়া আসিয়া আজ 'গীতসুধার তরে' কবির 'চিত্ত পিপাসিত'। বসন্তকাল সমাগত, সম্মুখে দোলপূর্ণিমা, সুন্দরের পূজায় নূতন নৈবেদ্য অর্ঘ্যরূপে দান করিতে হইবে। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে 'নবীন'এর অনেকগুলি গান লেখা হইয়া গেল; ইন্দিরা দেবীকে লিখিতেছেন (৭ মার্চ), "আমি এখন আছি গান নিয়ে— কতকটা ক্ষ্যাপার মতো ভাব। আপাতত ছবির নেশাটা ঠেকিয়ে রেখেচি— কবিতার তো কথাই নেই। আমার যেন বধূবাহুল্য ঘটেচে, সব কটিকে একসঙ্গে সামলানো অসম্ভব।"[১]

দোলপূর্ণিমার দিন (৪ মার্চ ॥ ২০ ফাল্গুন ১৩৩৭) 'নবীন' অভিনীত হইল। ইতিপূর্বে এই শ্রেণীর ঋতুনাট্য রচিত ও অভিনীত হইয়াছে। বসন্ত শেষবর্ষণ সুন্দর প্রভৃতি গীতনাট্যে রাজা কবিশেখর বা কবি সভাকবি মন্ত্রী প্রভৃতির কথোপকথনের মধ্য দিয়া গান ও ঋতু-উৎসবের তাৎপর্য ও তত্ত্বকথা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। 'নবীন' গীতগুচ্ছে সে-শ্রেণীর পাত্রপাত্রী বা বক্তা নাই। কবি স্বয়ং রঙ্গমঞ্চের এক পার্শ্বে বসিয়া কবিতা আবৃত্তি ও গানের ব্যাখ্যা করিতেছেন, মাঝে মাঝে বালিকারা গান ও নৃত্য করিতেছে। বলা বাহুল্য কবি যে ভূমিকা গ্রহণ করিলেন তাহা তাঁহারই উপযুক্ত, তাঁহাকেই শোভা পায়— ইহা অননুকরণীয় অনুষ্ঠান।

শান্তিনিকেতনে দোলপূর্ণিমার দিন 'নবীন' উৎসব নিষ্পন্ন হইবার পর স্থির হইল কলিকাতায় ইহার অভিনয় করা হইবে। কবির গান রচনা এখনো চলিতেছে, ১৫ মার্চ পর্যন্ত এই গানের ধারা চলে। এই সময়ে স্থির হয় যে 'নবীন' অভিনয়ের পূর্বে কলিকাতার ঐ রঙ্গমঞ্চে জুজুৎসুর ক্রীড়া-প্রদর্শনী হইবে। এ যেন শক্তি ও সুন্দরের মিলন-উৎসব— 'এক হাতে ওর কৃপাণ আছে, আরেক হাতে হার'— একদিকে শক্তির সাধন, অপরদিকে সুন্দরের প্রসাধন। কবি জানিতেন সৌন্দর্যই শক্তির ভূষণ, সংযমই প্রেমের সম্পদ— তাই এইবার কলিকাতার উৎসবক্ষেত্রে জুজুৎসুক্রীড়া ও নবীনের নৃত্যগীতের যুগপৎ আয়োজন হইল— দুইটি অনুষ্ঠান যেন পরস্পরের পরিপূরক, সমগ্র জীবনের প্রতীক।

কবির জীবনে নানা বিরুদ্ধ ভাবনার ও বিচিত্র কর্মের সমবায় ও সমন্বয় দেখিয়া অনেকেই বিভ্রান্ত হয়। একপত্রে লিখিতেছেন (১১ মার্চ), "আমি . . নানা কিছুকেই নিয়ে আছি— নানাভাবে নানাদিকেই নিজেকে প্রকাশ করতে আমার উৎসুক্য। বাইরে থেকে লোকে মনে ভাবে তাদের মধ্যে অসঙ্গতি আছে, আমি তা অনুভব করিনে। আমি নাকি গাই, আঁকি, ছেলে পড়াই— গাছপালা আকাশ আলোক জলস্থল থেকে আনন্দ কুড়িয়ে বেড়াই। . . আমি স্বভাবতই সর্বাস্তিবাদী— অর্থাৎ আমাকে ডাকে সকলে মিলে— আমি সমগ্রকেই মানি। গাছ যেমন আকাশের আলো থেকে আরম্ভ করে মাটির তলা পর্যন্ত সমস্ত কিছু থেকে ঋতু-পর্যায়ের বিচিত্র প্রেরণা দ্বারা রস ও তেজ গ্রহণ ক'রে তবেই সফল হয়ে ওঠে— আমি মনে করি আমারও ধর্ম তেমনি সমস্তের মধ্যে সহজে সঞ্চরণ করতে সমস্তের

১ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৩৫।

ভিতর থেকে আমার আত্মা সত্যের স্পর্শ লাভ ক'রে সার্থক হতে পারবে।"[১] ইহাই যথার্থ কবির ধর্ম, কবির দর্শনশাস্ত্র।

কলিকাতার নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে (১৬ মার্চ) জুজুৎসুক্রীড়া ও কসরতের প্রদর্শনী[২] অধ্যাপক তাকাগাকি ও শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের জুজুৎসু ও জুডোর অপরূপ কৌশলাদি দেখাইলেন। এই অনুষ্ঠানটি শুরু হয়—

সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান
সংকটের[৩] কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মান

গানটি দিয়া ক্রীড়া প্রদর্শনী হইল, কিন্তু দর্শকের কোনো ভিড় নাই। কবির বড় আশা ছিল বাঙালি ছেলেমেয়েরা এই আত্মরক্ষা ও দুর্বৃত্তদমনের সহজ কৌশল আয়ত্ত করিবার জন্য উৎসাহ দেখাইবে। তাকাগাকি বৎসরাধিক কাল আসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বিদ্যা ও কৌশল বাহিরের কেহ গ্রহণ করিতে আসিল না। বিজ্ঞাপন দিয়া বৃত্তি ঘোষণা করিয়া সাড়া পাওয়া যায় নাই। তাই কবি ভাবিলেন কলিকাতায় জুজুৎসু-কসরৎ দেখিয়া যদি যুবকরা আকৃষ্ট হয়; কিন্তু শোনা যায় সেদিন কোনো মার্কিন ফিল্ম্ স্টার আসিতেছিলেন বলিয়া সমস্ত ভিড় সেখানে ছুটিয়াছিল।

জুজুৎসু দেখিবার জন্য ভিড় হইল না। কিন্তু 'নবীন' অভিনয়ের চার দিনই[৪] জনতার অভাব হয় নাই।

নবীন[৫] গীতনাট্য দুই পর্বে সম্পূর্ণ। প্রথম পর্বে বসন্তের আবির্ভাব ও পূর্ণ পরিণতি; কালের মধ্যে চিরপুরাতন

১ সাধনার রূপ, শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষকে লিখিত পত্র, ১১ মার্চ ১৯৩১। প্রবাসী ১৩৩৮ ভাদ্র, পৃ. ৬০১-২। মনে পড়ে 'ক্ষণিকা'র কবির 'বয়স' কবিতাটির ভাব—

সবাই মোরে করেন ডাকাডাকি
কখন শুনি পরকালের ডাক
সবার আমি সমানবয়সি যে
চুলে আমার যত ধরুক পাক।

২ Programme of Jiu-jitsu demonstration by Santiniketan boys and girls—New Empire Theatre, 6 P.M., 16th March 1931 (5 pages). Printed by Jagadananda Roy, at the Santiniketan Press।

৩ এই গানটি চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে সংযোজিত হয়,—'সন্ত্রাসের বিহ্বলতা' ইত্যাদি পদ আছে। গীতবিতান, পৃ. ৭১০।

৪ নিউ এম্পায়ারে ৪ দিন নবীন অভিনীত হয়—১৭, ১৮, ১৯, ২২ মার্চ ১৯৩১ ॥ ৩, ৪, ৫, ৮ চৈত্র ১৩৩৭। নবীন প্রথম যখন শান্তিনিকেতন প্রেসে মুদ্রিত হয়, তখন তাহাতে নূতন ও পুরাতন ৩০টি গান ছিল।

৫ নবীন রচনা শেষ হয় ১৫ মার্চ (৩০ ফাল্গুন ১৩৩৭); দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নলিনী রায় কর্তৃক সম্পাদিত 'মুক্তধারা'র ১ম বর্ষের ২য় সংখ্যায় (১৩৩৭ চৈত্র) নবীনের ৩৪টি গান মুদ্রিত হয়। পরে 'নবীন' বনবাণীর অন্তর্ভুক্ত হয় (১৩৩৮ আশ্বিন)। গীতবিতানে (নূতন সংস্করণ) গানগুলি বিক্ষিপ্তভাবে আছে বলিয়া উহার পত্রাঙ্ক দিলাম। 'মুক্তধারা' পত্রিকায় প্রকাশিত নবীনের গানের তালিকা—

১। বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী— গীতবিতান পৃ. ৫২২, ২। সুরের গুরু, দাও গো সুরের দীক্ষা— গীতবিতান পৃ. ৫, ৩। আন গো তোরা কার কী আছে— গীতবিতান পৃ. ৫২২, ৪। ফাগুন তোমার হাওয়ায়— গীতবিতান পৃ. ৫২৩, ৫। গানের ডালি ভরে দে— গীতবিতান পৃ. ২৭৩, ৬। নিবিড় অমা-তিমির হতে— গীতবিতান পৃ. ৫২৩, ৭। ওরে গৃহবাসী, তোরা খোল— গীতবিতান পৃ. ৫০৪, ৮। কে দেবে চাঁদ তোমায় দোলা— গীতবিতান পৃ. ৫১৫, ৯। আমি সকল নিয়ে বসে আছি (কয়েক পংক্তি)— গীতবিতান পৃ. ৩০৭, ১০। হে মাধবী, দ্বিধা কেন— গীতবিতান পৃ. ৫২৩, ১১। সে কি ভাবে গোপন রবে— গীতবিতান পৃ. ৫১৪, ১২। হৃদয় আমার ঐ বুঝি তোর— গীতবিতান পৃ. ৪৭২/৯৩৯, ১৩। ওরা অকারণে চঞ্চল— গীতবিতান পৃ. ৫২৪, ১৪। ও মঞ্জরী, ও মঞ্জরী— গীতবিতান পৃ. ৫০২, ১৫। মোর পথিকেরে বুঝি এনেছ— গীতবিতান পৃ. ২২৮, ১৬। ফাগুনের নবীন আনন্দে— গীতবিতান পৃ. ৫২৪, ১৭। কেন ধরে রাখা ও যে যাবে চলে— গীতবিতান পৃ. ৩৬৭, ১৮। চলে যায় মরি হায় বসন্তের দিন— গীতবিতান পৃ. ৫২৫, ১৯। বসন্তে বসন্তে তোমার

'নবীন' নানা রসে রূপে আবির্ভূত হইতেছে। তাহারই প্রভাবে মানবমনে বিচিত্র আনন্দলহরীর ধ্বনি। দ্বিতীয় পর্বে বসন্তের বিদায়পালা। আমরা পূর্বে বলিয়াছি এই গীতনাট্যে কথোপকথন নাই; কবি রঙ্গমঞ্চের এক পার্শ্বে উপবিষ্ট। তিনি গানের ভাব ব্যাখ্যা করিতেছেন। ইহার একটু নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি "এই খেলা বীরের খেলা, শেষ পর্যন্ত যে ভঙ্গ দিল না, তারি জয়। বাঁধন ছিঁড়ে যে চলে যেতে পারল পথিকের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল, তারি জন্য জয়ের মালা। পিছনে ফিরে ভাঙা খেলনার টুকরো কুড়োতে গেল যে কৃপণ, তার খেলা পুরো হলো না, খেলা তাকে মুক্তি দিল না। খেলা তাকে বেঁধে রাখল। এবার তবে ধুলোর সঞ্চয় চুকিয়ে দিয়ে হাল্‌কা হয়ে বেরিয়ে পড়ো।"

২২ মার্চ নবীনের চতুর্থ দিনের অভিনয় শেষ হইল। ইহার পরই ছাত্রছাত্রীরা শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া গেল— জোড়াসাঁকোর বাড়িতে একা একা কবির ভালো লাগিতেছে না— তিনি গেলেন বরাহনগরে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশদের বাটীতে। সেখানে বাসকালে কবিতার তরঙ্গ একে একে আসিয়া তাঁহাকে নব নব ভাবলোকে উত্তীর্ণ করিতেছে। 'নীহারিকা' (১৮ চৈত্র ১৩৩৭। বিচিত্রিতা) নামে কবিতাটির মধ্যে দেখি জীবনের অস্পষ্ট অতীতকে ভাষণ দানের চেষ্টা— "নিজের সমস্ত ডুবে-যাওয়া দামী দিনগুলিকে উদ্ধার করে আনবার ইচ্ছে।"[১]

বিস্মৃত বেদনা যাহা নীহারিকার ন্যায় সুদূর, অথচ ধ্রুবতারকার ন্যায় অন্তর মধ্যে চিরস্থির তাহারই কথা বলিতেছেন—

অস্তরবির পথ তাকানো মেঘে
কালোর বুকে আলোর বেদন লেগে ;—
কেন এমন খনে
কে যেন সে উঠল হঠাৎ জেগে
আমার শূন্য মনে। . .
'কে গো তুমি, ওগো ছায়ায় লীন'
প্রশ্ন পুছিলাম।

কবিরে দাও ডাক— গীতবিতান পৃ. ৫২৫, ২০। তবে শেষ করে দাও শেষ গান (৪ পংক্তি)— গীতবিতান পৃ. ৩২৯, ২১। যখন মল্লিকা বনে প্রথম ধরেছে কলি— গীতবিতান পৃ. ৫২৬, ২২। আজি দখিন বাতাসে— গীতবিতান পৃ. ৫১৭, ২৩। শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা— গীতবিতান পৃ. ৫৭৩, ২৪। এখন আমার সময় হোল— গীতবিতান পৃ. ২২৭, ২৫। ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে— গীতবিতান পৃ. ৫৩৯, ২৬। সে যে কাছে এসে চলে গেল তবু জাগিনি (২ পংক্তি)— গীতবিতান পৃ. ৩৭৮, ২৭। কখন দিলে পরায়ে— গীতবিতান পৃ. ৩৪০, ২৮। ক্লান্ত যখন আম্রকলির কাল— গীতবিতান পৃ. ৫২৬, ২৯। তুমি কিছু দিয়ে যাও— গীতবিতান পৃ. ৫২৬, ৩০। এ বেলা ডাক পড়েছে কোনখানে— গীতবিতান পৃ. ৫১৭, ৩১। আজ খেলা ভাঙার খেলা— গীতবিতান পৃ. ৫১৯/৯২৪, ৩২। বাজে করুণ সুরে— গীতবিতান পৃ. ৩৪৯, ৩৩। বসন্তে ফুল গাঁথল— গীতবিতান পৃ. ৫১০, ৩৪। ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক— গীতবিতান পৃ. ২২৭।

নবীন ১৩৩৭, ৩০ ফাল্গুন রচিত। চৈত্র মাসে কলিকাতায় অভিনয়কালে প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। 'বনবাণী' সম্পাদনকালে কবি কয়েকটি পুরাতন গান ও কথাবস্তু বর্জন করিয়া এবং অন্যান্য পরিবর্তন করিয়া উহাকে নূতন আকার প্রদান করেন। দ্র. বনবাণী, পৃ. ১৪৫-১৬১। গ্রন্থপরিচয় পৃ. ১৭২। নবীনের প্রথম পুস্তিকা সংস্করণ। পৃ. ১১৩-১৮১।

[১] পথে ও পথের প্রান্তে, পত্র ৫১ ; ১৮ শ্রাবণ ১৩৩৮।

সে কহিল, ছিল এমন দিন
জেনেছ মোর নাম।[১] . .
চেন কিম্বা নাই বা আমায় চেন,
তবু তোমার আমি।
সেই সেদিনের পায়ের ধ্বনি জেনো
আর যাবে না থামি।
যে আমারে হারালে সেই কবে
তারই সাধন করে গানের রবে
তোমার বীণাখানি।
তোমার বনে প্রোল্লোল পল্লবে
তাহার কানাকানি।[২]

বর্ষশেষ হইবার পূর্বেই কবি বরাহনগর হইতে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়াছেন— যথাসময়ে মন্দিরে বর্ষশেষ ও নববর্ষের (১৩৩৮) উপাসনাদি করিলেন ; কয়েকদিন পূর্বে কলিকাতা হইতে ইন্দিরা দেবী আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে উপাসনা করিবার জন্য অনুরোধপত্র দেন। ইতিপূর্বে কলিকাতার মাঘোৎসব সম্বন্ধে যেভাবে ইন্দিরা দেবীকে পত্র দিয়াছিলেন, এবারও তাহাই লিখিলেন ; "একটা পরিবারের কোমরের সঙ্গে টাকার শৃঙ্খলে বাঁধা আদি ব্রাহ্মসমাজ একটা প্রকাণ্ড বিড়ম্বনা। . . কেবল শিকলটা ঝম্‌ঝম্‌ করবে। প্রথা জিনিসটা যেখানে সত্যকে বিদ্রূপ করে সেখানে সেই প্রথার মতো লজ্জাজনক ব্যাপার আর কিছু নেই। শান্তিনিকেতনে ১১ই মাঘের উৎসব করতে আমার একটুও সংকোচ বোধ হয় না কিন্তু আমাদের বাড়িতে অর্থহীন অনুষ্ঠানের আড়ম্বর আমাকে বড় লজ্জা দেয়।"[৩] পূর্বেও এই ধরণের পত্র দেন। সকল প্রকার institutional প্রতিষ্ঠানের প্রতিই কবি এখন বীতশ্রদ্ধ। লৌকিক হিন্দুধর্ম সম্বন্ধেও এই একই মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে আর-একখানি পত্রে ; কোনো এক আচারনিষ্ঠ হিন্দুরমণীকে লিখিতেছেন, "নির্বিকার নিরঞ্জনের অবমাননা হচ্চে বলে আমি ঠাকুরঘরের থেকে দূরে থাকি এ কথা সত্য নয়— মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে বলেই আমরা নালিশ করি। যে-সেবা যে-প্রীতি মানুষের মধ্যে সত্য করে তোলবার সাধনাই হচ্ছে ধর্মসাধনা তাকে আমরা খেলার মধ্যে ফাঁকি দিয়ে মেটাবার চেষ্টায় প্রভূত অপব্যয় ঘটাচ্চি। এই জন্যেই আমাদের দেশে ধার্মিকতার দ্বারা মানুষ অত্যন্ত অবজ্ঞাত।"[৪]

ধার্মিকতা— আদি ব্রাহ্মসমাজের নামেও যেমন অরুচিকর, হিন্দুসমাজের আচারনিষ্ঠ ধার্মিকতাও তেমনই অর্থহীন-বোধে অসমর্থনীয়। সমস্ত convention বা সংস্কারের বোঝা নামাইয়া চলিবার জন্য কবির আকাঙ্ক্ষা। "সব দায়িত্ব কাটিয়ে সব তর্কবিতর্ক এড়িয়ে দিয়ে জীবনের অন্ত্যলীলাকে আদ্যলীলার সঙ্গে মিলিয়ে দেবার জন্যে একটা প্রবল

১ তু. পথে ও পথের প্রান্তে, পৃ. ১০২। "ইতিমধ্যে পরশু বুলার হাত থেকে একটা লেখা বেরিয়েছে তাতে নাম বেরোল না। বললেম, নাম জিজ্ঞাসা কোরো না, তুমি যা মনে ভাবছ আমি তাই···।"

২ বিচিত্রিতা। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭, পৃ. ৩৫। এই কবিতাটির সহিত প্রতিমা দেবী অঙ্কিত ছবি আছে। এই কবিতার উৎস এই চিত্র নহে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। তু. ছবি (বলাকা)— 'ওই যে সুদূর নীহারিকা' ইত্যাদি।

৩ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৩৬ ; ১ বৈশাখ ১৩৩৮।

৪ চিঠি, ২৯ চৈত্র ১৩৩৭। প্রবাসী ১৩৩৮ কার্তিক, পৃ. ২।

ইচ্ছে জেগে উঠেচে মনে। ছেলেবেলায় বিশুদ্ধ খেলা নিয়ে কাটত, এখন বিশুদ্ধ খেয়াল নিয়ে থাকতে ভালো লাগে।"[১]

কবির ৭০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে উৎসবাদির আয়োজন চলিতেছে। কবি যখন বরাহনগরে— প্রশান্তচন্দ্রের বাসায়, সেই সময়ে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রেরা 'কবিপরিচিতি' নামে একটি গ্রন্থ সম্পাদনে রত— তাহাদের অনুরোধে কবি 'প্রণাম' নামে যে কবিতা (২৩ চৈত্র ১৩৩৭) লিখিয়া দেন, তাহা 'নবীন' গানোত্তর পর্বে রচিত কবিতাবলীর দ্বিতীয় কবিতা— প্রথম কবিতা 'নীহারিকা'র কথা পূর্বে বলিয়াছি।[২]

'প্রণাম' কবিতায় লিখিলেন (৬ এপ্রিল)—

আমি তীরে বসি তারি রুদ্রতালে
গান বেঁধে লভিয়াছি আপন ছন্দের অন্তরালে
অনন্তের আনন্দবেদনা। নিখিলের অনুভূতি
সংগীতসাধনা মাঝে রচিয়াছে অসংখ্য আকৃতি।
এই গীতিপথপ্রান্তে হে মানব, তোমার মন্দিরে
দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দ্যের তীরে
আরতির সান্ধ্যক্ষণে; একের চরণে রাখিলাম
বিচিত্রের নর্মবাঁশি,— এই মোর রহিল প্রণাম।

এক মাস পরে জন্মোৎসবের অব্যবহিত পূর্বে 'জন্মদিন' কবিতায় (২৩ বৈশাখ ১৩৩৮) লিখিতেছেন—

বিশ্বের প্রাঙ্গণে আজি ছুটি হ'ক মোর,
ছিন্ন করে দাও কর্মডোর।

কিন্তু কর্মডোর ছিন্ন করিয়া মুক্তিপথের পান্থ রবীন্দ্রনাথ নহেন— তাই পরদিন যে কবিতা লেখেন (পান্থ) তাহাতে আছে—

চলিয়া তোমার সাথে মুক্তি পাই চলার সম্পদে।

পরিপূর্ণ আবেগে বলিলেন—

শুধায়ো না মোরে তুমি মুক্তি কোথা, মুক্তি কারে কই,
আমি তো সাধক নই, আমি গুরু নই।

১ প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত পত্র; ৩ বৈশাখ ১৩৩৮ ॥ ১৬ এপ্রিল। চিঠিপত্র ৫, পত্র ১০৮।

২ নীহারিকা ১৮ চৈত্র ১৩৩৭
প্রণাম ২৩ চৈত্র ১৩৩৭ ॥ ৬ এপ্রিল ১৯৩১
একলা বসে হেরো তোমার ছবি ১৭ বৈশাখ ১৩৩৮
বৈশাখেতে তপ্ত বাতাস (আছি) ১৯ বৈশাখ ১৩৩৮
বালক ২১ বৈশাখ ১৩৩৮
জন্মদিন ২৩ বৈশাখ ১৩৩৮
পান্থ ২৪ বৈশাখ ১৩৩৮, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫। পরিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমি কবি, আছি
ধরণীর অতি কাছাকাছি.
এ পারের খেয়ার ঘাটায়। · ·
রাখিতে চাহি না কিছু, আঁকড়িয়া চাহি না রহিতে,
ভাসিয়া চলিতে চাই সবার সহিতে
বিরহমিলনগ্রন্থি খুলিয়া খুলিয়া,
তরণীর পালখানি পলাতকা বাতাসে তুলিয়া।

শান্তিনিকেতনে পঁচিশে বৈশাখ (১৩৩৮) রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর পূর্তি-উৎসব নিষ্পন্ন হইল।[১]

এই উৎসবে কবি বলেন, "একটি পরিচয় আমার আছে, · · আমি কবি মাত্র। · · আমি তত্ত্বজ্ঞানী শাস্ত্রজ্ঞানী গুরু বা নেতা নই। · · আমি বিচিত্রের দূত। · · বিচিত্রের লীলাকে অন্তরে গ্রহণ ক'রে তাকে বাইরে লীলায়িত করা— এই আমার কাজ।" দুই দিন পূর্বে রচিত 'পান্থ' কবিতায় এই কথাটিই বলিয়াছিলেন।

এই সময়ে দিলীপ রায়কে লিখিত পত্র হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি, "বয়স সত্তর হলো— আমার পরিচয়ের কোঠায় অনুমানের জায়গা প্রায় বাকি নেই। · · এইটুকু নিঃসন্দেহে পাওয়া গেল যে, আমি কবি। কিন্তু শুধু কবি বললেও সংজ্ঞাটা অসম্পূর্ণ থাকে। কবির প্রেরণা কিসের এবং তার সাধনার শেষ ঠিকানাটা কোন্‌খানে এরও একটা পরিষ্কার জবাব চাই। সে-ও আমি জানি। আমার সব অনুভূতি ও রচনার ধারা এসে ঠেকেছে মানবের মধ্যে। বার বার ডেকেছি দেবতাকে, বার বার সাড়া দিয়েছেন মানুষ, রূপে এবং অরূপে, ভোগে এবং ত্যাগে। এই মানুষ ব্যক্তিতে এবং সেই মানুষ অব্যক্তে।

"বহুকাল আগে 'কড়ি ও কোমল'-এর একটি কবিতায় লিখেছিলুম— 'মানুষের [মানবের] মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।' তার মানে হচ্চে এই, মানুষ যেখানে অমর সেখানেই বাঁচতে চাই। সেই জন্যেই মোটামোটা নামওয়ালা ছোট ছোট গণ্ডীগুলোর মধ্যে আমি মানুষের সাধনা করতে পারি নে। স্বাজাত্যের খুঁটি গাড়ি ক'রে নিখিল মানবকে ঠেকিয়ে রাখা আমার দ্বারা হয়ে উঠল না, কেন না অমরতা তাঁরই মধ্যে যে-মানব সর্বলোকে। আমরা রাহুগ্রস্ত হয়ে মরি যেখানে নিজের দিকে তাকিয়ে তাঁর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াই।"[২]

কবির এই জন্মদিনে 'রাশিয়ার চিঠি' প্রকাশিত হইয়া সুরেন্দ্রনাথ করকে উৎসর্গিত হয়। ঐ দিন সুরেন্দ্রনাথের বিবাহ হয় রমা বা নুটুর সহিত। রমা— সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের ভগ্নী, আশৈশব আশ্রমে লালিত; তার পর দিনেন্দ্রনাথ ও ভীমরাও হস্নুরকারের নিকট সংগীত শিক্ষা করিয়া বিদ্যালয়ে সংগীতশিক্ষিকার কার্যে নিযুক্ত। সুরেন্দ্রনাথ কায়স্থ, রমা বৈদ্য— সুতরাং বিবাহ অসবর্ণ এবং তখনকার আইন ও সনাতন হিন্দুদের মতে অবৈধ। এই তর্কটা তোলেন কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-অধ্যাপক ফণিভূষণ অধিকারী। রবীন্দ্রনাথ এই জাতভাঙা বিবাহকে কী ভাবে দেখিতেন, তাহা অধ্যাপক অধিকারীকে লিখিত পত্র হইতে জানিতে পারি। বিবাহের কয়েকদিন পূর্বে (২০ বৈশাখ ১৩৩৮) কবি লিখিলেন, "সুরেন মানুষ হিসাবে অধিকাংশ সৎকুলীনের চেয়ে বুদ্ধিমান ও প্রতিভাসম্পন্ন, তথাপি নুটুকে তার ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি ও অনুরাগ সংযত করতেই হবে অর্থাৎ বিনা কারণে নিজের ও সুরেনের ধর্মসঙ্গত ইচ্ছাকেই

১ কবির জন্মোৎসবের বিস্তৃত বিবরণ— প্রবাসী ১৩৩৮ জ্যৈষ্ঠ, ক্রোড়পত্র। শান্তিনিকেতন 'রবীন্দ্রপরিচয় সভা'র উদ্যোগে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

২ অনামী, পৃ. ৩৪৬।

অপমানিত করতে হবে এটা হিন্দুসমাজসম্মত তা মানি, কিন্তু শ্রেয়স্কর তা কিছুতেই মানি নে। সামাজিক অসতীত্ব ও স্বাভাবিক অসতীত্বের মধ্যে প্রভেদ আছে— দুটু সমাজনির্বাচিত পাত্রকে বিবাহ করার দ্বারা মনে মনে অশুচি হলেও সমাজ সেই নিষ্ঠুর বীভৎসতাকে প্রশ্রয় দেয়— এটা একটা তথ্যমাত্র, কিন্তু এটাকে শ্রেয় বলব কি করে? সংস্কারের দোহাই দাও, সামাজিক অসুবিধার দোহাই দাও, তার কোনো উত্তর নেই, কিন্তু শ্রেয়ের দোহাই দিলে কেমন করে মেনে নেব? অত্যাচারের অস্ত্র সমাজের হাতে, বিধাতৃবিহিত মানবধর্মকে অন্যায় নিপীড়ন করবার শক্তি আছে সমাজের, অক্ষমতাবশত সমাজের অযৌক্তিক অস্বাস্থ্যকর বিধান মেনে নিতে পারি, কিন্তু সমাজ কর্তৃক অনুমোদিত মূঢ়তা ও অধর্মকে শ্রেয় বলে মানতে পারব না।"[১]

যে বিবাহকে কবি এভাবে সমর্থন করিলেন, সেই বিবাহ যখন নন্দলাল বসু প্রমুখ আশ্রমমুখ্যরা কলাভবন-গৃহে অনুষ্ঠানের আয়োজন করিলেন— তখন তিনি বিরক্ত হইয়া বাধা দান করিলেন। তিনি বলিয়া পাঠান বিশ্বভারতীর পাবলিক ঘরগুলিতে পৌত্তলিক অনুষ্ঠান হইতে পারে না।

বিবাহ হিন্দুমতে শালগ্রামশিলাদি আনিয়া নিষ্পন্ন হইতেছিল বলিয়া এই নিষেধ জারি করেন। বিবাহ অন্যস্থানে হইল।

দার্জিলিঙে

জন্মোৎসবের পর কবির পারস্য যাইবার কথা উঠে; স্থির হইয়াছিল ৫ জ্যৈষ্ঠ বর্ধমান হইয়া বোম্বাই গিয়া জলপথে বস্‌রা যাইবেন। প্রতিমা দেবীকে দার্জিলিঙে লিখিতেছেন, "কাপড়চোপড় গোছানো গাছানোর ধুম চলচে।"[২] কিন্তু এ যাত্রায় পারস্য যাওয়া হইল না। শরীর ক্লান্ত; তা ছাড়া "একটুখানি জ্বর রক্তের মধ্যে লুকোচুরি ক'রে বেড়াচ্চে — ডাক্তার . . দার্জিলিঙের হাওয়ায় তাকে ঝাড়িয়ে নেবার জন্যে পরামর্শ দিচ্ছে।"[৩] পিতার শরীরের এই অবস্থা দেখিয়া রথীন্দ্রনাথ তাঁহাকে লইয়া দার্জিলিঙ যাত্রা করিলেন, পারস্যযাত্রা বর্তমানের মত মুলতুবি রহিল।

দার্জিলিঙে কবি মাসেককাল ছিলেন, রচনার কাজ খুবই মন্দ; সময় অফুরন্ত বলিয়া 'পত্রধারা' লেখেন পূর্বোল্লিখিত হিন্দুমহিলাকে। এই নিষ্ঠাবতী নারী কবির নিজ ধর্মসম্বন্ধে নানা প্রশ্ন ও নিজ সম্প্রদায়গত মত ও বিশ্বাস কবিকে বুঝাইবার জন্য পত্র লিখিতেন; এইসব পত্রে ধর্ম সমাজ আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন ও তাহার সমাধান আছে; এইসব রচনায় কবি তার্কিক যুক্তিবাদী iconoclast, এমনকি সংস্কারক। ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে যেসব মতামত তিনি তাঁহার নানা প্রবন্ধে ও ধর্মদেশনায় ব্যক্ত করিয়াছেন, এই 'পত্রধারা'য়[৪] সেইসব কথা ও যুক্তি আরও

১ বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫৯ মাঘ-চৈত্র, পৃ. ১০২-০৮।

২ চিঠিপত্র ৩, পত্র ৪১; ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮। চিঠিপত্র ৫, পত্র ৪০; ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮।

৩ পত্রধারা [৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮] ২৩ মে ১৯৩১। প্রবাসী ১৩৩৮ ফাল্গুন, পৃ. ৬১৪।

৪ বরাহনগর হইতে দার্জিলিঙ যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত সময়ে ৯ খানি ও দার্জিলিঙে ৭ খানি পত্র এই মহিলাকে লেখেন; পরেও লেখেন; মোট ৪৩। পত্রধারা প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। আমরা কোন্ মাসে কয়খানি করিয়া পত্র প্রকাশিত হয়— তাহা মাসের পর সংখ্যা উল্লেখ করিলাম—

১৩৩৮ কার্তিক— ১ খানি। অগ্রহায়ণ— ২। পৌষ— ৩। মাঘ— ২। ফাল্গুন— ৪। চৈত্র— ১।

১৩৩৯ বৈশাখ— ১ খানি। জ্যৈষ্ঠ— ১। শ্রাবণ— ২। ভাদ্র— ৪। আশ্বিন— ১। কার্তিক— ২। অগ্রহায়ণ— ৪। পৌষ— ২। মাঘ— ৩ খানি। ফাল্গুন— ৩। চৈত্র— ৪।

১৩৪০ বৈশাখ— ৩ খানি। =মোট ৪৩ খানি।

স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ব্যক্তিত্বের স্পর্শে পত্রধারা সরস ও সুতীক্ষ্ণ হয়। এই শ্রেণীর 'পত্রধারা'য় ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করিবার ক্ষেত্র খুবই প্রশস্ত; বিশেষ বিষয়ের প্রবন্ধ মধ্যে অবান্তর, অথচ প্রয়োজনীয়, কথা বলার স্থান অত্যন্ত সংকীর্ণ, রচনাশৈলীর দিক হইতে সেগুলি অপ্রাসঙ্গিক; কিন্তু পত্রধারায় সেই স্বাধীনতা পাওয়া যায়।

দার্জিলিঙ বাসকালে কবি বক্সাদুর্গে বন্দী[১] বাঙালি যুবকদের দ্বারা অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের অভিনন্দনপত্র পাইলেন: কবি তাঁহাদের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি পংক্তি লিখিয়া পাঠাইলেন (১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮)—

নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন।
পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা, সংগীত না মানিল বন্ধন।
ফোয়ারার রন্ধ্র হতে উন্মুখর ঊর্ধ্বস্রোতে
বন্দীবারি উচ্চারিল আলোকের কী অভিনন্দন। —পরিশেষ

দার্জিলিঙে এবার নজরুল ইসলাম, নাট্যকার মন্মথ রায় ও শিল্পী অখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো) ভ্রমণে আসেন। নজরুল মুখপাত্র হইয়া একটা বড় রকমের দল লইয়া রবীন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিতে যান; রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে পাইয়া খুবই খুশি— বহুক্ষণ নানা বিষয়ের আলোচনা হয়।[২]

মাসেককাল দার্জিলিঙ বাস করিয়া জুলাই মাসের গোড়াতেই কবি শান্তিনিকেতন ফিরিলেন— বিশ্বভারতীর নানা প্রতিষ্ঠান দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশের পর খুলিতেছে; এখন কবিকে সেখানে থাকিতেই হইবে। প্রান্তরে বর্ষা নামিতেছে, কিন্তু কবির মনে তাহার আহ্বান নাই— নানা কারণে মন ক্লান্ত বিষণ্ণ— দেশের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ প্রতিদিন বিকৃত বীভৎস হইয়া উঠিতেছে। আপনার মনকে নৃত্য-গীত-উৎসবাদির মধ্যে নিমগ্ন রাখিয়া বাহিরের উত্তেজনা হইতে দূরে থাকিবেন ভাবেন; কিন্তু কোনোদিনই কবি দেশের সমস্যাকে পাশ কাটাইয়া তুরীয়তার মধ্যে বাস করেন নাই— আজও দেশব্যাপী বিচিত্র সমস্যার মুখে স্থির থাকিতে পারিলেন না, লেখনী ধারণও করিতে হইল। আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে দেশের গভীর উদ্বেগকর হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা

রবীন্দ্রনাথ যেদিন য়ুরোপ যাত্রা করেন— সেই ২রা মার্চ ১৯৩০— গান্ধীজি বড়লাট লর্ড আরউইনকে তাঁহার তথা কংগ্রেসের আইন-অমান্য আন্দোলনের পরিকল্পনা পত্রযোগে প্রেরণ করেন।

কংগ্রেস পুনরায় সংগ্রামের জন্য কেন প্রস্তুত হইতেছে তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলা প্রয়োজন। সাইমন কমিশনের আবির্ভাবের সময় হইতে ভারতের নানা সাম্প্রদায়িক রাজনীতিজ্ঞরা আপন-আপন শ্রেণীর স্বার্থ ভারত-স্বার্থ হইতে বৃহত্তর ও গুরুতর করিয়া দেখিতে আরম্ভ করেন। এই বিচিত্র সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা শমিত করিবার উদ্দেশ্যে

১ আমাদের আলোচ্যপর্বে বাঙালি বহু শত যুবক মেদিনীপুরের হিজলী জেলে, রাজস্থানের মরুদুর্গ দেউলিতে ও আলিপুর দুআর্সের বক্সা দুর্গে অন্তরীণাবদ্ধ।

২ স্বপনবুড়ো, রবীন্দ্রস্মৃতি কথা; শিক্ষাব্রতী ১৩৬০ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ১৪৫-৪৬। উভয়ের সংলাপের সমসাময়িক বিবৃতি আমরা পাই নাই।

বড়লাট আরউইন বিলাতে ভারতসচিব সার্ ওয়েজউড্ বেন্-এর সহিত পরামর্শ করিয়া আসিয়া ১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসে ঘোষণা করিলেন যে অদূর ভবিষ্যতে সকল দলকে লইয়া গোলটেবিল বৈঠক (Round Table Conference) আহূত হইবে। কংগ্রেস জানিতে চাহিল, এই বৈঠকে ভারতের ডোমিনিয়ন স্টেটাসসম্মত সংবিধান প্রবর্তনের কথা আলোচিত হইবে কিনা। কূটনীতিক ইংরেজ জানাইল— The conference is to meet not to discuss when Dominion status is to be established, but to frame a scheme of Dominion constitution for India।

এই উত্তরের দুই মাস পরে লাহোরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন— এবারকার সভাপতি যুবক জবহরলাল নেহরু। সভায় স্থির হইল যে কংগ্রেসপক্ষীয়ের তরফ হইতে কেহ লণ্ডনে আহূত গোলটেবিল বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করিতে যাইবে না। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মত আমরা পূর্বে উদ্‌ধৃত করিয়াছি। এই কংগ্রেস-অধিবেশনে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, ভারত ডোমিনিয়াম স্টেটাস চাহে না, সে চায় পূর্ণস্বাধীনতা (Complete independence)।

কংগ্রেস অধিবেশন শেষে কংগ্রেস সদস্যগণ স্বাধীনতা প্রতিজ্ঞা (pledge) গ্রহণ করিলেন ও সেই সময়ে স্থির হইল যে আগামী ২৬ জানুয়ারি (১৯৩০) দেশের সর্বত্র এই স্বাধীনতা সংকল্প পঠিত হইবে।

ব্রিটিশসরকারের পক্ষ হইতে ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইবার মত কোনো মনোভাব দেখা গেল না। অতঃপর ফেব্রুয়ারি মাসে (১৯৩০) সবরমতীতে কংগ্রেস কার্যকরী সভায় গান্ধীজি-পরিকল্পিত আইন-অমান্য সম্বন্ধে প্রস্তাব গৃহীত হইল। এই পরিকল্পনা গান্ধীজি বড়লাট সমীপে ২রা মার্চ (১৯৩০) পাঠাইয়াছেন।

ইহার পর বহুদিন পূর্বে অনুষ্ঠিত জালিনবালাবাগের ঘটনার দিনকে স্মরণ করিয়া এপ্রিল মাসের গোড়ায় গান্ধীজি সবরমতী আশ্রম হইতে লবণ-আইন ভঙ্গ করিবার জন্য একদল কট্টর সত্যাগ্রহীকে সঙ্গে লইয়া বোম্বাই প্রদেশের সমুদ্রতীরস্থ দণ্ডীর দিকে যাত্রা করিলেন— ১৩ এপ্রিল গান্ধীজি লবণ-আইন ভঙ্গ করিলেন।

ইতিমধ্যে সর্বত্র ২৬ জানুয়ারি 'স্বাধীনতা দিবস' উদ্‌যাপনের আন্দোলন শুরু হইয়া গিয়াছিল। এই আইন-অমান্য-আন্দোলনও অহিংসক থাকিল না; শোলাপুরের শিল্পকেন্দ্রে দাঙ্গাহাঙ্গামা এমনই ভীষণ আকার ধারণ করে যে অবশেষে সেখানে সামরিক আইন জারি করিতে হয়; তিন জন বিশিষ্ট পরিবারের যুবককে এই হাঙ্গামার জন্য দায়ী করিয়া সামরিক আইনকর্তা তাহাদের সরাসরি ফাঁসি দিলেন। গান্ধীটুপি পরা নিষিদ্ধ হইল। রবীন্দ্রনাথ ১৬ মে (১৯৩০) ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকার প্রতিনিধিকে যে পত্র দেন, তাহা আমরা উদ্‌ধৃত করিয়াছি।

ভারতের নানাস্থানে আইন-অমান্য-আন্দোলন চলিতেছে; এমন সময়ে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম শহরে বিপ্লবীরা অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করিয়া (১৮ এপ্রিল ১৯৩০) সকলকে বিস্মিত করিয়া দিল। এই বিদ্রোহ ইংরেজ অচিরেই দমন করিল। তার পরে পুলিশ ও মুসলমান জনতা দ্বারা হিন্দুদের উপর যে অকথ্য অত্যাচার চলিল— তাহা অবর্ণনীয়। গান্ধীজি, জবহরলাল প্রভৃতি কংগ্রেস নেতারা ১৫ মে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। সেই দিন ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিল— চট্টগ্রামের অনুরূপ। রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপ হইতে লিখিলেন— "ঢাকার অত্যাচারের কাহিনী আমার মনের মধ্যে তোলপাড় করছিল। কী সব অমানুষিক নিষ্ঠুরতা— অথচ ইংলন্ডের খবরের কাগজে তার খবর নেই।"[১]

চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর পুলিশের অত্যাচার দুর্বিষহ হইয়া উঠিলে আসানুল্লা নামে এক উৎপীড়ক দারোগাকে বালক হরিপদ ভট্টাচার্য গুলি করিয়া হত্যা করে। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা

১ রাশিয়ার চিঠি, পৃ. ২১।

বাধে। শহরের সংখ্যালঘু হিন্দুদের গৃহাদি লুণ্ঠন, 'পাঞ্চজন্য' পত্রিকার অপিস ও প্রেস ধ্বংস প্রভৃতি নিষ্ঠুরভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া চলে। রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরিবার পর এই ঘটনা ঘটে। তিনি (৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩১) লিখিতেছেন, "চিত্তকে নিরতিশয় পীড়িত করে তোলে অত্যাচারের কথা। আমার বেদনাবহ নাড়ী এই রকম কোনও সংবাদের নাড়া খেয়ে যখন ঝন্‌ঝন্ করে ওঠে, তখন সে যেন কিছুতেই থামতে চায় না। সম্প্রতি দেহ-মনের উপর সেই উপদ্রব দেখা দিয়েচে। এতদিন বন্যা-প্লাবনের [উত্তর বঙ্গের] দুঃখ দেশের বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছিল: তার উপরে চট্টগ্রামের বিবরণটা সাইক্লোনের মত এসে তার সমস্ত বাসাটা যেন নাড়া দিয়েচে।"[১]

দেশের মধ্যে 'শান্তি ও শৃঙ্খলা' রক্ষার দায়িত্ব বড়লাটের-- তাই তিনি কয় মাসের মধ্যে ৬টি অর্ডিনান্স পাস করেন। প্রেস অর্ডিনান্সের চাপে ১৩০ খানি দেশীয় কাগজের ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা জামিন জমা দিতে হয়। লবণ সত্যাগ্রহের ফলে ১৯৩০-৩১ দশ মাসের মধ্যে ভারতের প্রায় ৯০ হাজার নরনারী কারাগারে প্রেরিত হয়।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি লন্‌ডনের প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস প্রতিনিধি কেহ যান নাই। কবির ইচ্ছা ছিল গান্ধীজি যেন এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান না করেন। প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনালড্ দেখিলেন ভারতের বৃহত্তম দল কংগ্রেসের কোনো প্রতিনিধি নাই— তাঁহারা বৈঠকে যোগ না দেওয়াতে, কোনো মীমাংসাতেই উপনীত হওয়া যায় না।

বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নামজাদা ব্যবহারজীবী ছিলেন; তাঁহারা দেশে ফিরিয়া গান্ধীজির সহিত আরউইনের সাক্ষাতকারের ব্যবস্থা করিলেন। আরউইনও বুঝিয়াছিলেন কংগ্রেসপক্ষীয়দের বাদ দিয়া কোনো মীমাংসায় উপনীত হওয়া যাইবে না, এবং আইন-অমান্য আন্দোলনের উত্তেজনা শমিত না হইলেও কংগ্রেসনেতাদের পাওয়া যাইবে না। সেই জন্য গান্ধীজি ও আরউইনের মধ্যে একটা চুক্তি হইল— যাহার ফলে গান্ধীজি সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া লইলেন, এবং সরকার বাহাদুরও বন্দীদের মুক্তি দিলেন। গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হয় ১৯৩১ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি— রবীন্দ্রনাথের দেশে প্রত্যাবর্তনের সতেরো দিন পরে।

এপ্রিল মাসে (১৯৩১) লর্ড আরউইনের স্থলে লর্ড উইলিংডন ভারতের বড়লাট হইয়া আসিলেন; ইতিপূর্বে ইনি মাদ্রাজের গবর্নর ছিলেন। তার পর কানাডা ডোমিনিয়নের গবর্নর-জেনারেল হইয়া গিয়াছিলেন— সেখানে ১৯২৯এ রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ হয়। সেখান হইতে তিনি ভারতে আসিলেন। ইনি বুরোক্রেট— ভারতীয়দের শাসন তিনি পূর্বে করিয়াছেন— বোধ হয় সেই গুণেই তিনি এবার ভারতশাসনচূড়ার শ্রেষ্ঠ আসন পাইলেন।

উইলিংডন বড়লাট হইয়া আসিলে ভারতশাসনের স্টীল-ফ্রেমের রক্ষক সিবিল সার্বিসের ব্রিটিশ কর্মচারীরা আশ্বস্ত হইল; গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে তাহারা তাহাদের পূর্ণ প্রভুশক্তির প্রয়োগ করিতে পারিতেছে না। ভিতরে ভিতরে ঐ চুক্তি বানচাল করিবার জন্য তাহারা চেষ্টান্বিত। কংগ্রেসপক্ষীয় বড়লাটকে এইসকল বিষয় অবগত করিলে, তিনি তদন্ত করিবেন বলিয়া ভরসা দিলেন। এইভাবে ১৯৩১ সালের এপ্রিল হইতে অগস্ট মাস কাটিয়া গেল। গান্ধীজি দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধিরূপে যোগদান করিবার (১৯৩১ অগস্ট ২৯) জন্য যাত্রা করিলেন। তিনি সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক পরামর্শদাতা, অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ লইলেন না;

১ প্রবাসী ১৩৩৮ আশ্বিন, পৃ. ৮৫৫।

অথচ তিনি লন্ডনে যাইতেছেন রাজনীতি বুঝাপড়া করিতে। তিনি ভাবিতেছেন তাঁহার সরল আত্মত্যাগের অহিংস জীবনাদর্শে মুসলীম লীগের নেতারা, অচ্ছুত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা, রাজন্যবর্গের পরামর্শদাতারা এবং ব্রিটিশ কূটনীতিজ্ঞরা— সকলেই আকৃষ্ট হইবে। ইহার পরিণাম কি হইয়াছিল তাহা এ গ্রন্থের আলোচ্য নহে।

ভারতের সমস্যা ইংরেজশাসনের উচ্ছেদ নহে; সমস্যা ভারতের হিন্দু ও মুসলমানের সম্বন্ধের মধ্যে; অথবা বলা যাইতে পারে বহু সম্প্রদায়ে ও স্বার্থে বিভক্ত বিবদমান হিন্দু শিখ ও অনুন্নত সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্বে। পাঠকের স্মরণ আছে ১৯১৬ সালে লখনৌ কংগ্রেসে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রশাসনিক বিষয়ে কতকগুলি শর্ত স্বীকৃত হয়। তার পর গত চৌদ্দ বৎসর হিন্দু-মুসলমানদের মতান্তর দ্রুত মনান্তরে ও মনান্তর অল্পকাল মধ্যে প্রত্যক্ষ দাঙ্গাহাঙ্গামায় পরিণত হইয়া চলিয়াছে। সে ইতিহাস বলিবার স্থান এ গ্রন্থ নহে। তবে রবীন্দ্রনাথ এইসব ঘটনা কিভাবে দেখিতেছেন তাহাই আমাদের আলোচনার বিষয়।

হিন্দু-মুসলমানের এই দ্বন্দ্বের মূলে আছে সাম্প্রদায়িক শক্তিমত্তা। অন্যদেশে যাহা পার্টি পলিটিক্স, এখানে তাহা কম্যুনাল পলিটিক্স। ইহার কারণ, আমরা ধর্মপ্রাণ জাতি। নেতারাও জানেন যে এই পথে লোকের মনকে সহজে আপনার অনুকূলে আনা যায়। ধর্মনিরপেক্ষ স্বরাজ ও শ্রেণীনিরপেক্ষ সমাজ সংস্থাপনের যে আদর্শ কংগ্রেস এতাবৎকাল প্রচার করিয়া আসিতেছে, তাহা শ্রেণীগত ও সম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠা স্থাপনেচ্ছু নেতাদের মনোপূত হয় না; তাই এদেশে যত মত তত পথ, সে মতের শেষ নাই, পথেরও শেষ নাই।

দেশে ফিরিবার (জানুয়ারি) পর হইতে রবীন্দ্রনাথ দেশের এই আত্মঘাতী রাজনীতি দেখিয়া খুবই উদ্বিগ্ন। গ্রীষ্মকালটা দার্জিলিঙ থাকিয়া শান্তিনিকেতনে ফিরিয়াছেন— মন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত। মনের এই অবস্থায় লিখিলেন 'হিন্দু-মুসলমান'[১] প্রবন্ধ। আজ হইতে বত্রিশ বৎসর পূর্বে লিখিত হইলেও আজ স্বাধীন ভারতের অধিবাসীগণ যদি সেইটি পুনরায় পাঠ করেন তো দেখিবেন যে, বহু সমস্যা এখনো অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছে এবং রবীন্দ্রনাথই সমাধানের পথনির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কবি লিখিতেছেন, "যে-দেশে প্রধানত ধর্মের মিলই মানুষকে মেলায়, অন্য কোনো বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না, সে-দেশ হতভাগ্য। সে-দেশ স্বয়ং ধর্মকে দিয়ে যে বিভেদ সৃষ্টি করে সেইটে সকলের চেয়ে সর্বনেশে বিভেদ। মানুষ বলেই মানুষের যে-মূল্য সেইটিকেই সহজ প্রীতির সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি। যে-দেশে ধর্মই সেই বুদ্ধিকে পীড়িত করে রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধি কি সে-দেশকে বাঁধতে পারে?" কবি ইতিহাসের নজীর দেখাইয়া বলিলেন, "ফরাসীদেশে বিপ্লবের সঙ্গেসঙ্গেই লোপ পায় ধর্মবিদ্বেষ। সোভিয়েট রাশিয়া প্রচলিত ধর্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর।"

রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্মের অবতারণার ঘোর বিরোধী। খিলাফৎ প্রশ্ন ধর্মীয়— সেটিকে ভারত-রাজনীতির সহিত অঙ্গীভূত করিয়া হিন্দু-মুসলমান বিচ্ছেদের যে বিষ-বীজ উপ্ত করা হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত এক সময়ে খুবই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছিল।

ভারতকে কতখানি স্বাধীনতা দান করিতে পারা যায় তাহা লইয়া বিলাতে গোলটেবিল বৈঠক বসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই দয়ার দানে শ্রদ্ধাশীল নহেন, স্বাধীনতা কেহ দেয় না। তবুও লিখিতেছেন যে ধরিয়া লওয়া গেল স্বাধীনতা লাভ হইয়াছে, কিন্তু দেশটাকে হাত-ফেরাফেরির করিবার মাঝখানে একটা সুদীর্ঘ সন্ধিক্ষণ আছে। সমস্যা দেখা দিবে সেই সময়। "সিবিল সার্বিসের মেয়াদ কিছুকাল টিকে থাকতে বাধ্য। কিন্তু সেদিনকার সিবিল

১ হিন্দু-মুসলমান, প্রবাসী ১৩৩৮ শ্রাবণ; পৃ. ৪৪৯-৪৫৫। দ্র. কালান্তর, নূতন সংস্করণ; পৃ. ৩১৪-১৮।

সার্বিস হবে ঘা-খাওয়া নেকড়ে বাঘের মতো। মন তার গরম হয়ে থাকবার কথা। সেই সময়টুকুর মধ্যে দেশের লোক ও বিদেশের লোকের কাছে দেগে দেগে দেওয়া তার পক্ষে দরকার হবে যে, ব্রিটিশ-রাজের পাহারা আল্‌গা হবামাত্রই অরাজকতার কালসাপ নানা গর্ত থেকে বেরিয়ে চারিদিকেই ফণা তুলে আছে— তাই আমরা স্বদেশের দায়িত্ব-ভার নিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। আমাদের আপন লোকদেরকে দিয়ে এ কথা কবুল করিয়ে নেবার ইচ্ছা তার স্বভাবতই হবে যে, আগেকার আমলে অবস্থা ছিল ভালো। সেই যুগান্তরের সময়ে যে-যে গুহায় আমাদের আত্মীয়-বিদ্বেষের মার-গুলো লুকিয়ে আছে, সেই-সেইখানে খুব করেই খোঁচা খাবে: সেইটি আমাদের বিশেষ পরীক্ষার সময়। সে পরীক্ষা সমস্ত পৃথিবীর কাছে। এখন থেকে সর্বপ্রকারে প্রস্তুত থাকতে হবে যেন বিশ্বজগতের দৃষ্টির সামনে মূঢ়তায় বর্বরতায় আমাদের নূতন ইতিহাসের মুখে কালি না পড়ে।" কবির এই বাণী কি আমাদের কানে পৌঁছিয়াছিল? ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র যুগেই নোয়াখালি কলিকাতা বিহারের ঘটনাগুলি ঘটে; তার পর ভারত দ্বিখণ্ডিত হইয়া দুইটি রাষ্ট্র গঠিত হইলে তাহাদের নিত্য কলহ সভ্যজগতের চিরকৌতুকের ও উদ্বেগের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। আজ ভারতের রাষ্ট্র (প্রদেশ)গুলির মধ্যে সীমানা ও ভাষা লইয়া যে কাণ্ডটা হইতেছে তাহা পূর্বেরই অনুক্রমণ।

সমস্যা যেখানে বিচিত্রকারণপ্রসূত ও বহু যুগের সঞ্চিত অপরাধজনিত— সেখানে সমাধান হইবে সহজ ও সরল, এরূপ আশা করা যায় না। এ কথা সত্য যে, আধুনিক যুগে ভারতের ন্যায় বিচিত্র জাতি ও ধর্মের লোক লইয়া গঠিত মহাদেশ তুল্য দেশ ধর্মীয় ভিত্তির উপর তাহার রাষ্ট্রতন্ত্র কখনো গাড়িতে পারে না। কবি সমসাময়িক একটি রচনায় বলিলেন যে, অর্থনৈতিক সুবিচার ব্যতীত এই সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণীগত সমস্যা নিরাকৃত হইতে পারে না। তিনি বলেন, "অর্থ-উপার্জন শক্তি-উপার্জন যদি সমাজভুক্ত লোকের **পরস্পরের যোগে** [Cooperation] হতে পারত, তাহলে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি **সম্মিলিত প্রয়াসের ফল** সহজ নিয়মে লাভ করতে পারত।"

কবির প্রশ্ন "ধর্মের উপদেশ ব্যর্থ হয়েচে বলেই দস্যুবৃত্তি করে, রক্তপাত করে, ধনীর ধন অপহরণ করে সমাজে আর্থিক সাম্যস্থাপন" করিতে হইবে— এ যুক্তি শ্রদ্ধেয় নহে। য়ুরোপে এই জুলুম-পদ্ধতি দেখা দিয়াছে, "তার কারণ হচ্চে, পশ্চিমের মানুষের গায়ের জোরটা বেশি, সেই জন্যেই গায়ের জোরের উপর তার আস্থা বেশি— কল্যাণসাধনেও সে গায়ের জোর না খাটিয়ে থাকতে পারে না। তার ফলে অর্থও নষ্ট হয়, ধর্মও নষ্ট হয়। রাশিয়ায় সোভিয়েট রাষ্ট্রনীতিতে তার দৃষ্টান্ত দেখতে পাই।" লোকে মনে করিয়াছিল রাজতন্ত্র উঠিয়া গিয়া গণতন্ত্র বা ডিমক্রাসি স্থাপিত হইলেই সব দুঃখ দূর হইবে। "আমেরিকার যুক্তরাজ্য এই ডিমক্রাসির বড়াই করে থাকে।·· কিন্তু যেখানে মূলধন ও মজুরীর মধ্যে অত্যন্ত ভেদ আছে, সেখানে ডিমক্রাসি পদে পদে প্রতিহত হতে বাধ্য।·· টাকার জোরে সেখানে লোকমত তৈরি হয়, টাকার দৌরাত্ম্যে সেখানে ধনীর স্বার্থের সর্বপ্রকার প্রতিকূলতা দলিত হয়— একে জনসাধারণের স্বায়ত্তশাসন বলা চলে না।"··"এই জন্যে, যথেষ্ট পরিমাণে স্বাধীনতাকে সর্বসাধারণের সম্পদ করে তোলবার মূল উপায় হচ্ছে **ধন-অর্জনে সর্বসাধারণের শক্তিকে সম্মিলিত** করা। তাহলে ধন টাকার-আকারে কোনো একজনের বা এক সম্প্রদায়ের হাতে জমা হবে না; কিন্তু লক্ষপতি ক্রোরপতিরা আজ ধনের যে ফল ভোগ করবার অধিকার পায়, সেই ফল সকলেই ভোগ করতে পারে। সমবায়-প্রণালীতে অনেকে আপন শক্তিকে যখন ধনে পরিণত করতে শিখবে, তখনই সর্বমানবের স্বাধীনতা-ভিত্তি স্থাপিত হবে।"

রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের উপায়স্বরূপ এই অর্থনৈতিক মতবাদ গ্রহণ; কবির এই মতবাদ কতখানি সোভিয়েট-ঘেঁষা তাহা প্রণিধান-সাপেক্ষ। তবে কবি ধনসাম্য স্থাপনের জন্য ব্যক্তিবিশেষের উপর জুলুম করার বিরোধী— এখানে তিনি গান্ধীজিরই মতবাদী— ধনীরও হৃদয় পরিবর্তন করিতে হইবে। ব্যক্তি ও সংঘ বা রাষ্ট্রের

মধ্যে (individual and state) সম্বন্ধটা যেন নৈর্ব্যক্তিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, ইহাই ছিল কবির রাষ্ট্র তথা সমাজ নীতি। ইহার মূলে থাকিবে সমবায়— সহনঃ অবতু— এক সঙ্গে আমরা কাজ করি; কি শিল্পে কি কৃষিতে কি শাসনবিষয়ে সর্বত্র এই সহকর্মনীতি অনুসরণীয়।[১]

দেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর দ্রুত পটপরিবর্তন হইতেছে— রবীন্দ্রনাথের স্পর্শচেতন মন সাড়া না দিয়া পারে না। কিন্তু তাঁহার প্রত্যক্ষ দায়— তাঁহার প্রতিদিনের আনন্দের উৎস— তাঁহার প্রতিদিনের কণ্টকশয্যা বিশ্বভারতী— তাহার সকল প্রকার আর্থিক দায়িত্ব তাঁহার একলার; তাঁহাকেই অর্থসংগ্রহ করিতে হয়— যদিও ব্যয় যাঁহারা করেন তাঁহারা কেহ আয়ের কথা ভাবেন না। বিশ্বভারতীর চিরদারিদ্র্য কিছুতেই ঘোচে না; যে করিয়া হউক কবিকে নাচিয়া গাহিয়া বক্তৃতা করিয়া নাট্য মঞ্চিত করিয়া রাজদ্বারে বা ধনীর গৃহে ধর্না দিয়া টাকা আনিতেই হইবে। এই অর্থের সন্ধানে এবার চলিলেন ভুপাল নবাববাহাদুরের দরবারে। এই সময়ে শ্রীনিকেতনে ডক্টর হাসেম আলী নামে কর্মিষ্ঠ যুবক কৃষিঅর্থশাস্ত্রী (agricultural economist) রূপে আসিয়াছেন মার্চ মাসে। মিঃ এলমহার্স্ট ইঁহাকে বিলাত হইতে সুরুলে গবেষণার জন্য পাঠাইয়াছেন। ডক্টর আলী নিজাম-হায়দরাবাদের লোক। তাঁহার বিশ্বাস— ভুপালের মুসলমান নবাববাহাদুর, নিজামবাহাদুরের দৃষ্টান্তে তাঁহারই ন্যায় উদারহস্তে বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ খয়রাত করিবেন; তাঁহার আশা ছিল এই মধ্যবর্তিতার গৌরব তিনি অর্জন করিবেন।

দার্জিলিঙ হইতে শান্তিনিকেতনে ফিরিবার কয়েকদিনের মধ্যে কবি কলিকাতা হইয়া ডক্টর আলীর সঙ্গে ভুপাল যাত্রা করিলেন, সঙ্গে নন্দলাল বসু; কিন্তু এবারও ভরতপুর সফরের (১৯২৭) ন্যায় আসা-যাওয়ার দুর্ভোগ ও বিশ্বভারতীর ধনক্ষয় ব্যতীত আর কিছুই হইল না। নবাবসাহেব রাজকোষে অর্থাভাব জানাইলেন ও সুদিনে কবির যোগ্য সম্মান দিবেন— এই ভরসা দিয়া মহা-আড়ম্বরে অতিথি-পরিচর্যা করিলেন।

ভুপাল থেকে কবি সাঁচির স্তূপ দেখিতে যান। সাঁচি ভুপাল হইতে ২৬ মাইল দূরে। ২২শে জুলাই (১৯৩১) অসিত হালদারকে লখনৌ-এ লিখিলেন, "এখানে সাঁচির কীর্তি দেখে খুবই খুশি হয়েচি। নন্দলাল আমার সঙ্গী হয়ে এসে দেখে গেল।·· কাল ফিরে চললুম ইটারসি হয়ে। এই বর্ষাকালটা পথে পথে মাটি করতে চাইনে।"[২]

শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া কবি লিখিতেছেন (২৬ জুলাই), "ভুপাল থেকে ফিরে শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেচি।·· রাজপ্রাসাদে ছিলুম দুটো দিন মাত্র। আরও দুই-এক জায়গায় যাবার সংকল্প ছিল। আমার এবং তাঁদের সৌভাগ্যক্রমে, যাঁদের লক্ষ্য করে যাওয়া, তাঁরা কেউ উপস্থিত ছিলেন না। সেটা উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে ক্ষতিজনক, কিন্তু মনের শান্তির পক্ষে অনুকূল।"

ভুপাল হইতে ফিরিয়া দেখেন প্রেসিডেন্সি কলেজের বঙ্কিম-শরৎ সমিতির তরফ হইতে অনুরোধ আসিয়াছে যে আগামী সতেরোই সেপ্টেম্বর (৩১ ভাদ্র ১৩৩৮) শরৎচন্দ্রের জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাঁহারা যে পুস্তিকা প্রকাশ করিবেন, তাহাতে কবির একটি লেখা চাই। তদনুসারে কবি ১২ অগস্ট একটি প্রবন্ধ লিখিয়া দিলেন; বাংলাসাহিত্যে উপন্যাসের সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়া শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে তাহার বর্তমান পরিণতি কিভাবে হইয়াছে, তাহারই দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ। কবি লিখিলেন যে শরৎচন্দ্রের "গল্পে যে-রসকে তিনি নিবিড় ক'রে

১ উপরে উদ্‌ধৃত প্রবন্ধটি ডক্টর নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত 'জাতীয় ভিত্তি' গ্রন্থের কবিকৃত ভূমিকা (১৩৩৮ আশ্বিন)। কিন্তু প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় বঙ্গবাণী ১৩২৯ ফাল্গুন। দ্র. সমবায়নীতি, পৃ. ১৪-১৯। পুনশ্চ, পৃ. ৫৩।

২ রবিতীর্থ, পৃ. ১৫৪।

জুগিয়েছেন সে হচ্ছে সুপরিচয়ের রস। তাঁর সৃষ্টি পূর্বের চেয়ে পাঠকের আরও অনেক কাছে এসে পৌঁছিল। তিনি নিজে দেখেছেন বিস্তৃত ক'রে, স্পষ্ট ক'রে, দেখিয়েচেন তেমনি সুগোচর ক'রে। তিনি রঙ্গমঞ্চের পট উঠিয়ে দিয়ে বাঙালি সংসারের যে আলোকিত দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত করেচেন সেইখানে আধুনিক লেখকের প্রবেশ সহজ হল।"[১]

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে প্রবন্ধ ফরমাশী রচনা। কিন্তু মন নূতন-কিছু সৃষ্টির দিকেও যাইতেছে।

গীতোৎসব

দেশের হিংসাত্মক বিভীষিকাময় ঘটনা একের পর এক ঘটিয়া যাইতেছে— রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ লিখিয়া পত্র লিখিয়া তাহা নানাভাবে আলোচনা করিতেছেন। এই সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই সময়ের রচিত 'শিশুতীর্থ' ও 'নরদেবতা' বিচারণীয়। এই বিশ্বব্যাপী হিংসাত্মক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দিনে কবির মনে হইতেছে যীশুখ্রীষ্টের কথা— যিনি শিশুরূপে মানবপুত্ররূপে নরদেবতারূপে মানুষের দুঃখ বহন করিবার জন্য অবতীর্ণ।

পাঠকের স্মরণ আছে জারমেনি থাকার সময়ে ম্যুনিক নগরে এক বৎসর পূর্বে (১৯৩০ জুলাই) *The Child* নামে একটি কাব্য লেখেন। এইবার সেইটিকে অবলম্বন করিয়া একটি অপরূপ গদ্যময় কাব্য লিখিলেন; 'বিচিত্রা' পত্রিকায় (১৩৩৮ ভাদ্র) উহার নাম ছিল 'সনাতনম্ এনম্ আহুর্ উতাদ্যস্যাৎ পুনর্নবঃ'। পরে ইহার 'শিশুতীর্থ' নাম হয়। প্রায় এই সময়েই শান্তিনিকেতন মন্দিরে 'নরদেবতা' ভাষণ কথিত হয়।[২] এক বৎসর পরে 'মানবপুত্র' নামে গদ্যকবিতাটি এই দুইটি রচনার সঙ্গে পঠনীয়।

ইতিমধ্যে কলিকাতায় এক গীতোৎসবের[৩] আয়োজন হইল। গীতোৎসবের দুইটি ভাগ— প্রথমাংশে গান নৃত্য ও আবৃত্তি; দ্বিতীয়াংশে 'শিশুতীর্থ' অভিনয়। প্রথমাংশে যে সব গান গাওয়া হয়, তাহার মধ্যে নূতন গান একটিও নাই— কারণ এ সময়ে কবিকে কোনো গান রচনা করিতে দেখি না। তবে গানগুলির সহিত নৃত্য ছিল বিচিত্র রকমের। শান্তিদেব কথাকলির ঢঙ প্রথম প্রবর্তন করিলেন; বাসুদেব মেনন দক্ষিণ-ভারতীয় নৃত্যকলা রূপায়িত করিলেন। শ্রীমতী হাতিসিং গুজরাটি নৃত্য দেখাইলেন; হাঙ্গেরিয়ান ব্রুনার মা ও মেয়ে নিজদেশের লোকনৃত্য রূপদান করিলেন। কবির 'ঝুলন' কবিতার আবৃত্তির সঙ্গে শ্রীমতী দেবীর নৃত্য সেদিন সকলকে মুগ্ধ করিল; এ ছাড়া 'দুঃসময়' কবিতা আবৃত্তির সঙ্গে 'মণিপুরী' নৃত্য অনুকৃত হয়।[৪]

গীতোৎসবের দ্বিতীয়াংশ 'শিশুতীর্থ' কথিকাকারে নৃত্যাভিনয়ের মতো করিয়া নূতন ভাবে রূপদান করা হইল।

১ শরৎচন্দ্র (২৭ শ্রাবণ ১৩৩৮ ॥ ১২ অগস্ট ১৯৩১), প্রবাসী ১৩৩৮ আশ্বিন।

২ নরদেবতা, প্রবাসী ১৩৩৮ আশ্বিন, পৃ. ৭৪৯-৫৪।

৩ গীতোৎসব। বিশ্বভারতী দুর্গতসহায়ক সংঘ কর্তৃক প্রবর্তিত। অভিনয়-রাত্রি ২৮, ২৯, ৩১ ভাদ্র ও ১ আশ্বিন ১৩৩৮। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ২০ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা।

৪ বাসুদেব মেনন, বিশ্বভারতীর এককালীন ছাত্র। এই সময়ে ইনি মাদ্রাজের ঋষিভ্যালি ট্রাস্টের বিদ্যালয়ে নৃত্যশিক্ষক।

শ্রীমতী হাতি সিং বিশ্বভারতীর এককালীন ছাত্রী। পরে য়ুরোপ গিয়া নৃত্যাদি শিক্ষা করেন। ইনি সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী। (দ্র. মাসিক বসুমতী ১৩৬৬)।

ব্রুনার, হাঙ্গেরিয়ান শিল্পী। মা ও মেয়ে দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে বাস করেন। মিসেস ব্রুনারের মৃত্যু হইয়াছে; মিস্ ব্রুনার দিল্লিতে থাকেন।

কোনো কোনো সাহিত্যিকের মতে মূল 'শিশুতীর্থ' কবির সর্বোৎকৃষ্ট গদ্যছন্দে লিখিত কবিতা।[১] ইহার ভাষা ও বর্ণনা নিখুঁত জহুরীর কাজ, অথচ ইহার মধ্যে আছে epic beauty।

কলিকাতার ম্যাডান থিয়েটর ও প্যালেস অব্ ভ্যারাইটিস নামে প্রেক্ষাগৃহে দুই দিন 'গীতোৎসব' অভিনীত হয় (১৪, ১৫ সেপ্টেম্বর)। বিচিত্রায় প্রকাশিত অথবা 'পুনশ্চ' কাব্যান্তর্গত 'শিশুতীর্থ'র রূপ হইতে গীতোৎসবে প্রয়োজিত নৃত্যরূপ বহুলভাবে পরিবর্তিত। নাটকটি উদ্বোধন অংশ ছাড়া দশটি স্বর্গে বিভক্ত। 'পুনশ্চ' গ্রন্থে উদ্বোধন অংশ নাই। উদ্বোধনটি এইরূপ—

"দেবতার পরাভব হল দৈত্যেরা হল জয়ী, ছারখার হয়ে গেল স্বর্গলোক। ঋতুপর্যায় গেল ভেঙে, চন্দ্রসূর্য গেল থেমে, সমস্তই হল উলট্-পালট।

"তখন পিতামহ বললেন, ভয় নেই। স্বর্গকে উদ্ধার করবে নূতন প্রাণ। নবজাত কুমার দেখা দেবেন অভয় বহন ক'রে।

"মানুষের সমস্ত প্রত্যাশা নবজীবনের কাছে। শিশু আসে যুগে যুগে 'পরিত্রাণায় সাধুনাং, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং'।

"আদিকাল থেকে মানব-ইতিহাসের যাত্রা— নবজীবনের তীর্থে। বুদ্ধ[২] একদিন শিশুরূপে দেখা দিয়েছিলেন, এনেছিলেন নবজন্ম। মানুষ তাকিয়ে আছে শিশুর দিকে। এই শিশুতীর্থের বিষয়টি নিয়ে নৃত্যাভিনয়।"

যাঁহারা পুনশ্চ কাব্যে শিশুতীর্থ কবিতাটি পড়িয়াছেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন গীতোৎসবের 'শিশুতীর্থ' সম্পূর্ণ নৃত্যের আদর্শে পুনঃ-রচিত।[৩]

পাবলিক রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের পরে কলিকাতা য়ুনির্ভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে আরও দুইদিন (১৭, ১৮ সেপ্টেম্বর) গীতোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সমসাময়িক 'বিচিত্রা' লেখেন, "অভিনয়ের এ এক অভিনব রূপ; অভিনয় বলিতে এতদিন বুঝিতাম কোনো নাটক বা নাটকের আকারে গদ্যে বা ছন্দে লিখিত কোনো পুস্তকের সংগীত ও নৃত্যসহযোগে বা বিনা সংগীতে ও বিনা নৃত্যে অভিনয়। কিন্তু সেদিন গীতোৎসবে যাহা অভিনীত হইয়াছিল, তাহা নাটক বা নাটকাকারে লিখিত কোনো পুস্তিকা নয়। সেটি দর্শকদের সম্মুখে রঙ্গমঞ্চের উপর রূপায়িত হইয়াছিল নৃত্য-সহযোগে আবৃত্তির ভিতর দিয়া। সুদীর্ঘ গদ্যকবিতার প্রত্যেকটি ভাবই 'নৃত্যের দ্বারা প্রতিফলিত হইয়াছিল'। ইহা অভিনয়ের একটি রূপান্তর বটে কিন্তু এ ধরণের অভিনয় পূর্বে কখনো দেখি নাই।"[৪]

গীতোৎসব অভিনয়ের একদিন পর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলী রবীন্দ্রনাথকে 'কবিসার্বভৌম' উপাধি দান উপলক্ষ্যে একটি সুন্দর অনুষ্ঠান করেন (২০ সেপ্টেম্বর)। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রেসিডেন্সি কলেজ

১ বহু বৎসর পরে আবু সয়াদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সংকলিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' গ্রন্থে শিশুতীর্থ সন্নিবেশিত দেখিয়া কবি সম্পাদকদের লেখেন (২০ অগস্ট ১৯৪০), "দীর্ঘকাল হোলো শিশুতীর্থ বলে একটা গদ্যছন্দের রচনা বানিয়েছিলাম। আজ পর্যন্ত সেটা কারো যে চোখে পড়েছে তার কোনো প্রমাণ পাইনি। তোমরা যে সেই কক্ষচ্যুত পথহারাকে অখ্যাতি থেকে উদ্ধার করেছ এতে খুশি হয়েছি।"—কবিতা ১৩৪৮ পৌষ।

২ বুদ্ধকে শিশুরূপে দেখানো এটি কবির Second thought; ধর্মের ইতিহাসে শিশু-যীশুরই কথা (Child-Christ) আছে। শিশুবুদ্ধের কাহিনী কোথাও নাই।

৩ দ্র. শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, রবীন্দ্রসংগীত, পৃ. ২৬২।

৪ বিচিত্রা ১৩৩৮ কার্তিক, পৃ. ৫৬১।

Dr. Stella Kramrisch গীতোৎসব সম্বন্ধে Amrita Bazar Patrika-য় যে প্রবন্ধ লেখেন তাহা বিচিত্রায় অনুদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। বিচিত্রা ১৩৩৮ অগ্রহায়ণ, পৃ. ৬৯২-৯৪।

হইতে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া আসিয়াছেন— তাঁহারই উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানটি নিষ্পন্ন হয়। কবি অভিনন্দন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "এই বিদ্যামন্দির থেকে সম্মানলাভের কল্পনা কোনোদিন আমি করিনি। এ আমার আশার অতীত। একদিন ছিল যখন পাণ্ডিত্যের সঙ্গে বাংলাভাষা ও বাংলাসাহিত্যের বিরোধ ছিল। তখন বাংলা অপরিণত, সাহিত্যের অনুপযোগী। এর দৈন্যকে উপেক্ষা করা সহজ ছিল। কিন্তু যে শক্তি তখন এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল, সে শক্তি এ কোথায় পেয়েছে? সংস্কৃতভাষারই অমৃত-উৎস থেকে।· · এই কারণেই তার পরিণতি চলেছে, কোথাও বাধা পায় নি।· ·

"বাংলাকে বাংলা বলে স্বীকার ক'রেও এ কথা মানতে হবে যে সংস্কৃতের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। সংস্কৃত ভাষায় ভারতীয় চিত্তের আভিজাত্য, যে তপস্যা আছে, বাংলাভাষায় তাকে যদি গ্রহণ না করি তবে আমাদের সাহিত্য ক্ষীণপ্রাণ ও ঐশ্বর্যভ্রষ্ট হবে।"[১]

সংস্কৃতভাষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাতিত্ব বহুকালের। সংস্কৃতশিক্ষাকে সহজ করিবার জন্য তিনি হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য ও হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কীভাবে উৎসাহিত করেন, তাহার কথা আমরা পূর্বে অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। বিশ্বভারতী স্থাপন করিয়া পানিনীব্যাকরণ অধ্যয়ন অধ্যাপনার জন্য কী চেষ্টাই না করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতভাষাকে আবশ্যিক পাঠ্যতালিকা হইতে ছাঁটিয়া দিলে, রবীন্দ্রনাথ তাহার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। শান্তিনিকেতনের সকল প্রকার উৎসব-অনুষ্ঠানে সংস্কৃত শ্লোকাদির ব্যবহার কবির অনুমোদিত। কিন্তু সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও কবি বাংলাভাষাকে সংস্কৃতের অনুজ্ঞা করিতে চাহেন নাই। কয়েক বৎসর পূর্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে ভাষা লইয়া আলোচনা স্মরণীয়।

হিজলীর হত্যাকাণ্ড

কলিকাতার লোকে যখন নানা উৎসব ও আনন্দে মত্ত, তখন বহিপৃথিবীর অজ্ঞাতে মেদিনীপুর হিজলী জেলের মধ্যে দুই জন যুবক রাজবন্দী পুলিশের গুলিতে নিহত হইল (১৬ সেপ্টেম্বর) এবং বিশ জন নির্দয়ভাবে প্রহৃত হইল। নিরস্ত্র বন্দীকে হত্যা ও প্রহার ইংরেজের ইতিহাসে অশ্রুত— কিন্তু ব্রিটিশ ভারতে তাহাও সংঘটিত হইল।

ক্ষোভ প্রকাশও রুদ্ধ করিবার জন্য প্রেস-আইনের খসড়া তখনো ব্যবস্থাপক সভাকক্ষ অতিক্রম করিয়া সদরে উপস্থিত হয় নাই; তাই লোকে তাহাদের মনের ক্ষোভ প্রকাশ করিতে পারিল।

এই ঘটনার দশ দিন পরে মৃত আত্মাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও গবর্মেন্টের প্রতি ক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য মনুমেণ্টের পাদমূলে জনসভা আহূত হইল (২৬ সেপ্টেম্বর)। লক্ষাধিক লোকসমক্ষে রবীন্দ্রনাথ বাঙালি জাতির প্রতিভূরূপে তাঁহার বক্তব্য মুদ্রিতপত্র হইতে পাঠ করিলেন।

"· · আমি রাষ্ট্রনেতা নই, আমার কর্মক্ষেত্র রাষ্ট্র-আন্দোলনের বাইরে। কর্তৃপক্ষের কৃত কোন অন্যায় বা ক্রটি নিয়ে সেটাকে আমাদের রাষ্ট্রিক খাতায় জমা করতে আমি বিশেষ আনন্দ পাই নে। এই যে হিজলীর গুলিচালনা ব্যাপারটি আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়, তার শোচনীয় কাপুরুষতা ও পশুত্ব যা কিছু আমার বলবার, সে কেবল অবমানিত মনুষ্যত্বের দিকে তাকিয়ে।

১ বিচিত্রা ১৩৩৮ কার্তিক, পৃ. ৪২২।

"এত বড়ো জনসভায় যোগ দেওয়া আমার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর, মনের পক্ষে উদ্‌ভ্রান্তিজনক; কিন্তু যখন ডাক পড়ল, থাকতে পারলুম না। ডাক এল সেই পীড়িতদের কাছ থেকে, রক্ষক নামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতন নিষ্ঠুরতার দ্বারা চিরদিনের মতো নীরব করে দিয়েছে।

"যখন দেখা যায়, জনমতকে অবজ্ঞার সঙ্গে উপেক্ষা ক'রে এত অনায়াসে বিভীষিকার বিস্তার সম্ভবপর হয়, তখন ধরে নিতে হবে যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের চরিত্র বিকৃত হয়েছে এবং এখন থেকে আমাদের ভাগ্যে দুর্দাম দৌরাত্ম্য উত্তরোত্তর বেড়ে চলবার আশঙ্কা ঘটল। যেখানে নির্বিবেচক অপমান ও অপঘাতে পীড়িত হওয়া দেশের লোকের পক্ষে এত সহজ, অথচ যেখানে যথোচিত বিচারের ও অন্যায় প্রতিকারের আশা এত বাধাগ্রস্ত, সেখানে প্রজারক্ষার দায়িত্ব যাদের 'পরে, সেইসব শাসনকর্তা এবং তাঁদেরই আত্মীয়-কুটুম্বদের শ্রেয়োবুদ্ধি কলুষিত হবেই, এবং সেখানে ভদ্রজাতীয় রাষ্ট্রবিধির ভিত্তি জীর্ণ না হয়ে থাকতে পারে না।

"এ সভায় আমার আগমনের কারণ আর কিছু নয়, আমি আমার স্বদেশবাসীর হয়ে রাজপুরুষদের এই ব'লে সতর্ক করতে চাই যে, বিদেশী-রাজা যত পরাক্রমশালী হোক-না কেন, আত্মসম্মান হারানো তার পক্ষে সকলের চেয়ে দুর্বলতার কারণ। এই আত্মসম্মানের প্রতিষ্ঠা ন্যায়পরতায়. ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও অবিচলিত সত্যনিষ্ঠায়। প্রজাকে পীড়ন স্বীকার ক'রে নিতে বাধ্য করা রাজার পক্ষে কঠিন না হতে পারে, কিন্তু বিধিদত্ত অধিকার নিয়ে প্রজার মন যখন স্বয়ং রাজাকে বিচার করে তখন তাকে নিরস্ত করতে পারে কোন্ শক্তি? এ কথা ভুললে চলবে না যে, প্রজাদের অনুকূল বিচার ও আন্তরিক সমর্থনের 'পরেই অবশেষে বিদেশী শাসনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

"আমি আজ উত্তেজনা বাক্য সাজিয়ে সাজিয়ে নিজের হৃদয়াবেগের ব্যর্থ আড়ম্বর করতে চাই নে এবং এই সভার বক্তাদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তাঁরা যেন এ কথা মনে রাখেন যে, ঘটনাটা স্বতঃই আপন কলঙ্ক-লাঞ্ছিত নিন্দার পতাকা যত উচ্চে ধ'রে আছে, তত ঊর্ধ্বে আমাদের ধিক্কার-বাক্য পূর্ণবেগে পৌঁছিতে পারবে না। এ কথাও মনে রাখতে হবে, আমরা নিজের চিত্তে সেই গভীর শান্তি যেন রক্ষা করি, যাতে ক'রে পাপের মূলগত প্রতি-কারের কথা চিন্তা করার স্থৈর্য আমাদের থাকে এবং নির্যাতিত ভ্রাতাদের কঠোর দুঃখ স্বীকারের প্রত্যুত্তরে আমরাও দুঃখ ও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হতে পারি।

"উপসংহারে শোকসন্তপ্ত পরিবারদের নিকট আমাদের আন্তরিক বেদনা নিবেদন করি এবং সেই সঙ্গে আমরাও জানাই যে, এই মর্মভেদী দুর্যোগের একদা সম্পূর্ণ অবসান হলেও দেশবাসী-সকলের ব্যথিত স্মৃতি দেহমুক্ত আত্মার যেন বেদীমূলে পুণ্যশিখায় উজ্জ্বল দীপ্তি দান করবে।"[১]

এই ঘটনার সরকারী অনুসন্ধান প্রকাশিত হইবার পর দৈনিক স্টেটসম্যান রক্ষীদের সম্বন্ধে নানা কথা অবতারণ করেন ও খৃষ্টোচিত আদর্শে ক্ষমা করিবার জন্য বলেন। রবীন্দ্রনাথ তদুত্তরে যাহা লেখেন, তাহাও আমরা নিম্নে উদ্‌ধৃত করিলাম।

"হিজলী-কারার যে-রক্ষীরা সেখানকার দুজন রাজবন্দীকে খুন করেছে, তাদের প্রতি কোনো একটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র খৃষ্টোপদিষ্ট মানবপ্রেমের পুনঃপুনঃ ঘোষণা করেছেন। অপরাধকারীদের প্রতি দরদের কারণ এই যে, লেখকের মতে নানা উৎপাতে তাদের স্নায়ুতন্ত্রের 'পরে এতোবেশি অসহ্য চাড় লাগে যে, বিচারবুদ্ধি সংগত

১ মাসিক বসুমতী ১৩৩৮ আশ্বিন। দ্র. প্রবাসী ১৩৩৮ কার্তিক, পৃ. ১৪৩-৪৪।

ধৈর্য তাদের কাছে প্রত্যাশাই করা যায় না। এইসব অত্যন্ত চড়া নাড়ীওয়ালা ব্যক্তিরা স্বাধীনতা ও অক্ষুন্ন আত্মসম্মান ভোগ করে থাকে। এদের বাসা আরামের, আহার-বিহার স্বাস্থ্যকর।— এরাই একদা রাত্রির অন্ধকারে নরঘাতক অভিযানে সকলে মিলে চড়াও হয়ে আক্রমণ করলে এইসব হতভাগ্যদেরকে যারা বর্বরতম প্রণালীর বন্ধনদশায় অনির্দিষ্টকালব্যাপী, অনিশ্চিত ভাগ্যের প্রতীক্ষায় নিজেদের স্নায়ুকে প্রতিনিয়ত পীড়িত করছে। সম্পাদক তাঁর সকরুণ প্যারাগ্রাফে স্নিগ্ধ প্রলেপ প্রয়োগ ক'রে সেই হত্যাকারীদের পীড়িত চিত্তে সান্ত্বনা সঞ্চার করেছেন। . . .

"সুকুমার স্নায়ুতন্ত্রের দোহাই দিয়ে তাদেরই জন্যে একটা স্বতন্ত্র আদর্শের বিচারপদ্ধতি মঞ্জুর হতে পারে, তবে সভ্যজগতের সর্বত্র ন্যায়বিচারের যে মূলতত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে, তাকে অপমানিত করা হবে, এবং সর্বসাধারণের মনে এর যে ফল ফলবে তা অজস্র রাজদ্রোহ প্রচারের দ্বারাও সম্ভব হবে না। . .

"বে-আইনী অপরাধকে অপরাধ বলেই মানতে হবে, এবং তার ন্যায়সংগত পরিণাম যেন অনিবার্য হয়— এইটিই বাঞ্ছনীয়। অথচ এ কথাও ইতিহাসবিখ্যাত যে যাদের হাতে সৈন্যবল ও রাজপ্রতাপ অথবা যারা এই শক্তির প্রশ্রয়ে পালিত, তারা বিচার এড়িয়ে এবং বলপূর্বক সাধারণের কণ্ঠরোধ ক'রে ব্যাপকভাবে এবং গোপন প্রণালীতে দুর্বৃত্ততার চূড়ান্ত সীমায় যেতে কুণ্ঠিত হয়নি। কিন্তু মানুষের সৌভাগ্যক্রমে এইরূপ নীতি শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারে না।

"পরিশেষে আমি গবর্মেণ্টকে এবং সেই সঙ্গে আমার দেশবাসীগণকে অনুরোধ করি যে, অন্তহীন চক্রপথে হিংসা ও প্রতিহিংসার যুগল তাণ্ডবনৃত্য এখনি শান্ত হউক। ক্রোধ ও বিরক্তি প্রকাশকে বাধামুক্ত ক'রে দেওয়া সাধারণ মানবপ্রকৃতির পক্ষে স্বাভাবিক সন্দেহ নেই, কিন্তু শাসক শাসয়িতা কারও পক্ষেই সুবিজ্ঞতার লক্ষণ নয়। এ রকম উভয় পক্ষে ক্রোধমত্ততা নিরতিশয় ক্ষতিজনক— এর ফলে আমাদের দুঃখ ব্যর্থতা বেড়েই চলবে এবং এতে শাসনকর্তাদের নৈতিক পৌরুষের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাসহানি ঘটবে, লোকসমাজে এই পৌরুষের প্রতিষ্ঠা তার ঔদার্যের দ্বারাই সপ্রমাণ হয়।"[১]

সাম্প্রদায়িক বিচিত্র ও বিরুদ্ধ স্বার্থের দ্বন্দ্বে বাংলাদেশ জর্জরিত। 'সর্ববঙ্গ মুসলীম ছাত্র সম্মিলনী'র উদ্যোক্তারা কবির নিকট হইতে কোনো বাণী বা ভাষণ চাহিলে, কবি তাঁহার বক্তব্য সংক্ষেপে ও অতি স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি লিখিলেন— "আমাদের দেশে অন্ধকার রাত্রি। মানুষের মন চাপা পড়ছে। তাই অবুদ্ধি দুর্বুদ্ধি ভেদবুদ্ধিতে সমস্ত জাতি পীড়িত।" তিনি তরুণকে সকল প্রকার ভেদ-বুদ্ধির উর্ধ্বে উঠিয়া 'বলিষ্ঠ ঔদার্য' দেখাইবার জন্য আহ্বান করিলেন।[২] কিন্তু হায়— এ-যে কবির বাণী, ইহাকে জীবনে রূপায়িত করিবে কে ?

কলিকাতার সমস্ত উত্তেজনাকে পিছনে রাখিয়া কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া গেলেন। আসিয়া দেখেন আশ্রমবাসীরা গান্ধীজির ৬৫তম জন্মদিন (২ অক্টোবর ১৯৩১) পালনের আয়োজন করিয়াছেন। গান্ধীজি সেই সময় দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিবার জন্য ইংলন্ডে। কবি সেইদিন মন্দিরে যথোপযুক্ত ভাষণ দান করেন। তাহার মধ্যে তিনি বলেন যে, "কেবলমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজন সিদ্ধির মূল্য আরোপ করে তাঁকে আমরা দেখব না। যে-দৃঢ় শক্তির বলে তিনি আজ সমগ্র ভারতবর্ষকে প্রবলভাবে সচেতন করেছেন, সেই শক্তির মহিমাকে

১ প্রবাসী ১৩৩৮ অগ্রহায়ণ, পৃ. ৩০৪-০৫। বিবিধ প্রসঙ্গ ; হিজলী হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ।

২ সম্বেদন (সর্ববঙ্গ মুসলীম ছাত্র সম্মিলনীর প্রতি), প্রবাসী ১৩৩৮ কার্তিক, পৃ. ১।

আমরা উপলব্ধি করব।· · দেশ ভয়ে আচ্ছন্ন, সংকোচে অভিভূত ছিল।· · আমাদের আত্মকৃত পরাভব থেকে মুক্তি দিলেন মহাত্মাজি।· ·"[১]

দেশের মহাত্মাজির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের কয়েকদিন পরে, মহাকবি গ্যেটের মৃত্যুশতবার্ষিকী [আগামী ২২ মার্চ ১৯৩২] উদ্‌যাপনের জন্য জারমেনিতে যে সমিতি গঠিত হয়, তাহাদের কাছে তাঁহার শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়া পত্র দেন (১১ অক্টোবর)— I feel proud to associate myself with your project and thus render my homage to the undying memory of Goethe।

আমাদের এই আলোচ্যপর্বে রবীন্দ্রনাথের 'গীতবিতান' গ্রন্থ সম্পাদিত হইল; কবির প্রায় দেড় হাজার গান নানা কাব্যে গানের বহি ও স্বরলিপি গ্রন্থে পত্রিকায় ছড়াইয়া ছিল। গীতবিতানের প্রথম দুই খণ্ডে কৈশোরক পর্যায় হইতে 'বসন্ত' (১৩৩০ সাল) গীতনাট্য পর্যন্ত পর্বের (১১২৮) সংগৃহীত গান, এই আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হইয়া বাহির হইল। ইহার তৃতীয় খণ্ড কয়েক মাস পরে প্রকাশিত হয় (১৩৩৯ আষাঢ়)। গীতবিতানের এই সংস্করণে গানগুলি কবির প্রকাশিত গ্রন্থের কালক্রমানুসারে সাজানো হয়। কবির ইচ্ছা ছিল গানগুলি বিষয়ানুযায়ী সজ্জিত হয়; কিন্তু "সংকলন-কর্তারা সত্বরতার তাড়নায় গানগুলির মধ্যে বিষয়ানুক্রমিক শৃঙ্খলা বিধান করতে পারেন নি।" এই গীতবিতান সম্পাদন করেন সুধীরচন্দ্র কর— তখন কবির খাস্ মুন্সী, দপ্তরের অন্যতম কর্মী।

এই বৎসরের শেষে গ্রন্থ প্রকাশন বিষয়ে আরেকটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য— সেটি হইতেছে 'সঞ্চয়িতা' নামে কাব্যচয়ন গ্রন্থ প্রকাশন। সঞ্চয়িতার ভূমিকায় কবি লেখেন যে, এই গ্রন্থ সংকলনের ভার তিনি নিজে লইয়াছেন। এই কথাটি বিশেষভাবে লিখিবার তাৎপর্য আছে। কারণ তাঁহার 'চয়নিকা' নামে যে কাব্যসঞ্চয়ন প্রচলিত ছিল, তাহা কবিকৃত সঞ্চয়ন নহে; চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মণিলাল গাঙ্গুলি অজিত চক্রবর্তী প্রভৃতি এই সম্পাদন-কার্য পরিচালনা করেন; সে প্রায় বিশ-একুশ বৎসরের পুরাতন কথা। তার পর বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর মালিক হইবার পর, তাঁহারা চয়নিকার নূতন সংস্করণ বাহির করেন; এই সংস্করণের কবিতা পাবলিকের মত ও ভোট লইয়া নির্বাচিত হইয়াছিল— ব্যবস্থাটি খুবই অভিনব। এই জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে চয়নিকা নূতন কলেবরে বাহির হয়।

আমাদের মনে হয় কবির এই পদ্ধতি মনোমত ছিল না; তাই 'সঞ্চয়িতা' সম্পাদন করিয়া লিখিলেন, "সংকলনের ভার নিজে নিয়েছি।" এই ভারগ্রহণের কারণ সম্বন্ধে বলেন, "আমার অল্পবয়সের যে-সকল রচনা স্খলিত পদে চলতে আরম্ভ করেছে মাত্র, যারা ঠিক কবিতার সীমার মধ্যে এসে পৌঁছয় নি, আমার গ্রন্থাবলীতে তাদের স্থান দেওয়া আমার প্রতি অবিচার।· ·

"সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত ও ছবি ও গান, এখনো যে বই-আকারে চলছে, একে বলা যেতে পারে কালাতিক্রমণ-দোষ।· · ওই তিনটি কবিতাগ্রন্থের আর-কোনো অপরাধ নেই কেবল একটি অপরাধ, সেগুলি কবিতার রূপ পায় নি।· ·

"ইতিহাস রক্ষার খাতিরে এই সংকলনে ওই তিনটি বইয়ের যে কয়টি [মাত্র ৫টি] লেখা· · ছাড়া· · আর-কোনো লেখাই আমি স্বীকার করতে পারব না। ভানুসিংহের পদাবলী সম্বন্ধেও সেই একই কথা। 'কড়ি ও কোমলে'· · আমার কাব্য-ভূসংস্থানে ডাঙা জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে।· · মানসী· · প্রবেশিকা অতিক্রম করে কবিতার শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।"

১ মহাত্মা গান্ধী (শান্তিনিকেতনে ১৫ আশ্বিন ১৩৩৮, মন্দিরে কথিত)। প্রবাসী ১৩৩৮ অগ্রহায়ণ, পৃ. ১৬৬-৬৭। দ্র. মহাত্মা গান্ধী, বিশ্বভারতী, ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮; পৃ. ২৪-২৯।

রবীন্দ্রজয়ন্তী

শান্তিনিকেতনে ২ অক্টোবর [১] গান্ধীজির জন্মদিন উপলক্ষ্যে মন্দিরের উপাসনা কবি করেন। ইহার কয়েকদিনের মধ্যে তিনি দার্জিলিঙ গেলেন ; কিন্তু এদিকে হিজলীজেলের হত্যাকাণ্ডের পর ২৬ সেপ্টেম্বর মনুমেন্টের পাদদেশে তিনি যে ভাষণ দেন, তাহার জের এখনো মেটে নাই। দার্জিলিঙ গিয়াও তিনি এ বিষয়ে যে পত্র লেখেন, তাহার কথা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি। সাহিত্যবিষয়ক রচনা খুব কমই, জোয়ার-স্রোত নাই ; কয়েকটি লেখেন, অধিকাংশই ফরমাশী রচনা। 'বুদ্ধদেবের প্রতি' (২০ অক্টোবর) কবিতাটি লিখিত হয় বারানসীর নিকটস্থ সারনাথে মূলগন্ধী বিহার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে ; মহাবোধি সোসাইটির একনিষ্ঠ কর্মী অনাগারিক ধর্মপালের চেষ্টায় সারনাথের এই মন্দির নির্মাণ শেষ হইয়াছে— তাহারই উদ্দেশে কবিতাটি লিখিত হয়।

'আশীর্বাদী' কবিতাটি পরদিনে লিখিত (২১ অক্টোবর) একটি বালিকার প্রথম জন্মদিন উপলক্ষ্যে পিতামাতার চিত্তবিনোদনের জন্য রচিয়া দেন। 'কবি'র (২৫ অক্টোবর) মধ্যে আপন কথা আছে— হালকা সুরে ও ছন্দে লেখা হইলেও হালকাভাবে পূর্ণ নহে (বীথিকা)।

> এতদিনে বুঝিলাম, এ হৃদয় মরু না,
> ঋতুপতি তার প্রতি আজো করে করুণা।

আরও কিছুদিন পরে (৩ নভেম্বর) তাঁহার সুহৃৎ ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের কন্যা ইন্দিরার বিবাহ উপলক্ষ্যে কবিতা লিখিয়া দেন। কিন্তু ইহার এক সপ্তাহ পরে (১০ নভেম্বর) 'জন্মদিনে' কবিতাটি লিখিতে দেখি। জন্মদিন সম্বন্ধে এই অসময়ে কবিতা লেখার কারণ— দেশময় কবির সত্তর বৎসরের জন্মোৎসব পালনের বিরাট আয়োজন চলিতেছে ; সেই কথাই মনে করিয়া এই আত্মবিশ্লেষণী তত্ত্বমূলক কবিতাটি রচিত হয়।[২]

সম্পূর্ণ বিভিন্ন সুরের কবিতা 'নাতবউ' (প্রহাসিনী)—

> অন্তরে তার যে মধুমাধুরী পুঞ্জিত
> সুপ্রকাশিত সুন্দর হাতে সন্দেশে।
> লুব্ধ কবির চিত্ত গভীর গুঞ্জিত,
> মত্ত মধুপ মিষ্টরসের গন্ধে সে।
> দাদামশায়ের মন ভুলাইল নাতিত্বে
> প্রবাসবাসের অবকাশ ভরি আতিথ্যে,
> সে কথাটি কবি গাঁথি রাখে এই ছন্দে সে।[৩]

আমাদের আলোচ্যপর্বে কলিকাতায় 'পরিচয়' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে ; ইহার সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত উদীয়মান সাহিত্যিক, কয়েক বৎসর পূর্বে কবির কানাডাযাত্রার অন্যতম সঙ্গী। সাহিত্যের 'আভিজাত্য' রক্ষা ছিল এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। নূতন পত্রিকা এখনো কবিকে আকর্ষণ করে— যদি সেটি মনের

১ ১৫ আশ্বিন ১৩৩৮ (২ অক্টোবর ১৯৩১) কবি শান্তিনিকেতন হইতে এক পত্রে হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ কৃত মহাভারতের সানুবাদ সংস্করণ সম্বন্ধে প্রশস্তিপূর্ণ পত্র লেখেন।

২ জন্মদিনে, প্রবাসী ১৩৩৮ পৌষ ; পরিশেষে কবিতাটির নাম 'অপূর্ণ'।

৩ নাতবউ (দার্জিলিং, বিজয়া দ্বাদশী, ১৬ আশ্বিন ১৩৩৮)। প্রহাসিনী, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩, পৃ. ৪৮।

মতো হয়, অর্থাৎ বাঁধি বুলির পথে যদি না চলে। এই পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় (১৩৩৮ কার্তিক) কবি সমসাময়িক পত্রিকার উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া এক পত্র-প্রবন্ধ লিখিলেন ; ইহাতে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবাসী ও প্রমথ চৌধুরীর সবুজ পত্র সম্বন্ধে আলোচনা আছে। এ ছাড়া গ্রন্থসমালোচনার একটি সুষ্ঠু মান প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি কয়েকটি গ্রন্থের সমালোচনা (ক্রিটিসিজম্) লিখিলেন। য়ুরোপের অধিকাংশ খ্যাতনামা গদ্যলেখকদের উৎকৃষ্ট রচনা হইতেছে গ্রন্থসমালোচনা। রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক সাহিত্য' এই শ্রেণীর গ্রন্থ। বহু বৎসর পরে কবি পুনরায় সেই সূত্র সাময়িকভাবে ধারণ করিয়া জগদীশ গুপ্তের 'লঘু ও গুরু'[১], অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের 'মাটির স্বর্গে'র[২] সমালোচনা লেখেন।

'নবীন কবি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ এই সময়েরই কাছাকাছি রচিত ; সেটিতে বাংলার উদীয়মান প্রতিভা বুদ্ধদেব বসুর কবিতা সম্বন্ধে কবির মত আমরা পাই।[৩]

কবিতা লেখা ও পুস্তক-সমালোচনা ছাড়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির রচনাও লিখিতে হয়। বিষয়টা পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার। আমাদের আলোচ্যপর্ব অর্থাৎ ১৯৩০-৩১ সাল পৃথিবীর বাজারমন্দা (slump) পর্ব ; এই বাজার-মন্দা সকল দেশ ও রাষ্ট্রকেই রূঢ়ভাবেই স্পর্শ করিয়াছিল। এই সময়ে বোম্বাই-এর কাপড়-কলের মালিকরা সস্তায় দক্ষিণ-আফ্রিকার কয়লা পাইতে থাকেন ; এতকাল তাঁহারা বঙ্গ-বিহারের কয়লা ব্যবহার করিতেছিলেন। এই বিদেশী কয়লা খরিদের ফলে এতদ্দেশীয় কয়লাখাদের কাজ কমিয়া যায় এবং বহু মজুর ও চাকুরে বেকার হইয়া পড়ে। ইহারই প্রতিক্রিয়ায় বাংলায় বুলি উঠিল, বাংলাদেশের লোকের পক্ষে বাঙালির কলে বা বাংলাদেশের কলে-উৎপন্ন বস্ত্র ব্যবহার আবশ্যিক। এই আন্দোলনের নেতা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তাঁহারই নিকট হইতে রবীন্দ্রনাথের কাছে এ বিষয়ে কিছু লিখিবার অনুরোধ আসে ও তদনুযায়ী কবি 'বাংলার তাঁতি' সম্বন্ধে লেখেন।[৪] কবি বলিলেন, "বাংলার মিল থেকে যে কাপড় উৎপন্ন হচ্ছে, যথাসম্ভব একান্তভাবে সেই কাপড়ই বাঙালি ব্যবহার করবে বলে যেন পণ করে। একে প্রাদেশিকতা বলে না, এ আত্মরক্ষা।" তিনি দেশবাসীকে মনে রাখিতে বলেন যে, "আত্মীয়-মণ্ডলের মধ্যে নিঃস্ব কুটুম্বের মতো কৃপাপাত্র আর কেউ নেই।" কবির মতে "দেশবাসীর পক্ষে প্রথমে তাঁতের কাপড় ব্যবহার আবশ্যিক ; যেসব ক্ষেত্রে অর্থাভাবে তাহা সম্ভব হয় না, সেখানে মিলের ও বিশেষভাবে বাংলার মিলের কাপড় ব্যবহার অনুমোদনীয়।"

অর্থনৈতিক দিক হইতে এই প্রাদেশিক স্বাদেশিকতা সম্ভব কিনা, তাহা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে গভীরভাবে বিচারের অবকাশ ছিল না, তাহা হইলে এই অর্থনৈতিক জটিল প্রশ্নের মধ্যে প্রবেশ করিতেন না। বাংলাদেশের মিলে যে-পরিমাণ বস্ত্র প্রস্তুত হইত, তাহার দ্বারা বাঙালির নগ্নতা আদৌ দূরীভূত হইত না।[৫] এই প্রবন্ধে কবি একটি কথা স্পষ্ট করিয়া বলেন যে, যন্ত্রের সুযোগকে সর্বজনের পক্ষে সুগম করিয়া দিয়া যন্ত্রের যে বিষদাঁত ব্যক্তিগত লোভ

১ জগদীশচন্দ্র গুপ্ত, লঘু ও গুরু। কবির সমালোচনা, দ্র. পরিচয় ১৩৩৮ কার্তিক।

২ অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়, মাটির স্বর্গ। কবির সমালোচনা, দ্র. প্রবাসী ১৩৩৮ অগ্রহায়ণ।

৩ নবীন কবি, বিচিত্রা ১৩৩৮ কার্তিক, পৃ. ৪৫১-৫৩।

৪ বাংলার তাঁতি, বিচিত্রা ১৩৩৮ কার্তিক, পৃ. ২২৭। বাঙালার কাপড়ের কল ও হাতের তাঁত— প্রবাসী ১৩৩৮ কার্তিক, পৃ. ১০৯-১২।

৫ ১৯৩১-৩২ সালে বাঙালার যা কাপড় মাথাপিছু লাগে, তার ২ গজ মাত্র বাংলার মিলে তৈরি, অবশিষ্ট ১০ গজ কাপড় বিদেশী ও বাংলার বাহিরে উৎপন্ন। বাঙালির কল মাত্র ৮টি বাঙালির মিলে উৎপন্ন কাপড় বাঙালির মাথাপিছু প্রয়োজনীয় কাপড়ের বোধ হয় ৬-৭ ইঞ্চি সরবরাহ করে। দ্র. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত বঙ্গপরিচয়, পৃ. ৪৮৬।

তাহাকে ভাঙিয়া দিতে হইবে, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকভাবে কুটিরশিল্প ও সংঘ-মালিকানা বা সমবায় ছাড়া কারবার ও শিল্পের সমস্যা দূর হইবে না। এই সময়ে সোভিয়েট রাশিয়া জানিতে চাহিল কবির মতে রাশিয়ার উন্নতি কিজন্য হইয়াছে এবং ভারতে তাহা ব্যাহত কেন? কবি তদুত্তরে লিখিলেন, "Your success is due to turning the tide of wealth from the individual to collective humanity. Our obstacles are social and political insanity, bigotry and illiteracy।"[১]

দার্জিলিঙে মাসেক কাল থাকিয়া কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়াছেন; আবার ছবিআঁকায় মন গিয়াছে। রাসপূর্ণিমার দিন (৯ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮) শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর ৫০তম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে কবি একটি কবিতা লিখিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন। এই কবিতার শেষ স্তবকে তাঁহার নিজের কথা আছে (বিচিত্রিতা)—

তোমারি খেলা খেলিতে আজি উঠেছে কবি মেতে
নববালক-জন্ম নেবে নতুন আলোকেতে।
ভাবনা তার ভাষায় ডোবা,
মুক্ত চোখে বিশ্বশোভা
দেখাও তারে, ছুটেছে মন তোমার পথে যেতে।

শান্তিনিকেতনে আসিবার পর কবি সংবাদ পাইলেন যে পহেলা অগ্রহায়ণ (১৭ নভেম্বর) হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। ৬ ডিসেম্বর হরপ্রসাদের জন্মদিনে (১৮৫৩) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে তাঁহার শ্রাদ্ধসভা; রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া এক পত্র দিলেন।[২]

হরপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের গুণগ্রাহী ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকিপ্রতিভা কিভাবে হরপ্রসাদের 'বাল্মীকিজয়' গ্রন্থ প্রভাবান্বিত করিয়াছিল, তাহা আমরা পূর্বে একস্থানে বলিয়াছি। বৃহত্তর ভারতে যাত্রার পূর্বে যে সভা হয়, তাহাতে হরপ্রসাদ কবির ললাটে চন্দন তিলক দিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন; কবির ৬০ বৎসর পূর্তির সময়ে সাহিত্য-পরিষদ হইতে যে অভিনন্দন প্রদত্ত হয়, তাহা হরপ্রসাদ পাঠ করিয়াছিলেন।

এই বৎসরের গোড়ায় (২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮) কবির ৭০তম জন্মোৎসবের যে প্রারম্ভিক সভা হয়, তাহাতে হরপ্রসাদ সভাপতিত্ব করেন; এই উৎসব-আয়োজনের জন্য যে আহ্বানলিপি প্রচারিত হয় তাহাতে হরপ্রসাদের স্বাক্ষর ছিল প্রথম পংক্তিতে।

হরপ্রসাদের পঞ্চসপ্ততিতম বর্ষ উপলক্ষ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ 'হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা' নামে গ্রন্থ সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; বিশিষ্ট লেখকগণের নিকট হইতে সংগৃহীত প্রবন্ধাবলীর প্রথম খণ্ড হরপ্রসাদের জীবিতকালে প্রকাশিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় (১৯৩২ সেপ্টেম্বর ৩০) তাঁহার মৃত্যুর পর (৭৮ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়)। এই খণ্ডের জন্য রবীন্দ্রনাথ একটি ক্ষুদ্র ও হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ লিখিয়া দিয়াছিলেন।[৩]

১ The Soviet System, Modern Review 1931 September। প্রবাসী, বিবিধ প্রসঙ্গ; রুশীয় টেলিগ্রাম ও রবীন্দ্রনাথের উত্তর, ১৩৩৮ অগ্রহায়ণ, পৃ. ৩০২।

২ বিচিত্রা ১৩৩৮ পৌষ, পৃ. ৮৪৭-৪৮।

৩ হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা— সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাবলী ৮০। দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা ও শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত। ১৩৩৯।

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে শান্তিনিকেতনের পৌষ উৎসবাদি শেষ করিয়া কবি কলিকাতায় গেলেন— সেখানে খ্রীষ্টমাস সপ্তাহে তাঁহার জয়ন্তী-উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে।

বাংলাদেশে কবিমনীষীকে সংবর্ধনা জানাইবার এই প্রথম আয়োজন— ইহার অনুকূলে কোনো রাষ্ট্রশক্তি নাই, সাধারণ শিক্ষিত লোকের এই সমারোহ। কলিকাতা টাউন হলে উৎসবের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই ব্যবস্থার কর্ণধার অমল হোম— ক্যালকাটা ম্যুনিসিপাল গেজেটের সম্পাদক। প্রদর্শনী ও মেলার ভার ছিল জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর উপর। রবীন্দ্রজয়ন্তী সাফল্যমণ্ডিত করিবার দায়িত্ব বহুল পরিমাণে ছিল অমল হোমের। আমাদের তথাকথিত শাস্ত্রে বলে 'ন গণস্য অগ্রতঃ গচ্ছেৎ' অর্থাৎ আগবাড়াইয়া কোনো কাজ করিবে না; কার্য-সিদ্ধি হইলে সকলে সুনামের অংশীদার হবে, আর যদি কিছু গোলমাল হয় তবে 'মুখরস্তত্র হন্যতে'। তাই অমল সম্বন্ধে লোকে নানা কথা বলিতে শুরু করে; শরৎচন্দ্র তাঁহাকে এক পত্রে লেখেন, "জয়ন্তীর গোড়ায় এও শুনেছি স্বয়ং কবি তোমাকে খাড়া করেছেন, তাঁর শিখণ্ডী মাত্র তুমি, পেছনে থেকে তিনিই তোমাকে দিয়ে সব করাচ্ছেন! এ যে বাংলা দেশ, অমল। মনে ক্ষোভ রেখোনা— যে যা বলে বলুক।· · দেশের মুখ রেখেছ তুমি।"[১]

২৫ ডিসেম্বর (৯ পৌষ ১৩৩৮) টাউন হলে কবির চিত্রপ্রদর্শনী উদ্‌ঘাটন দিয়া জয়ন্তী-উৎসব আরম্ভ হইল। এ ছাড়া কবির নানা বয়সের প্রতিকৃতি, তাঁহার রচিত পুস্তকাবলীও প্রদর্শিত হয়। ত্রিপুরার মহারাজা বীরবিক্রম কিশোরমাণিক্য প্রদর্শনীর দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলেন। রবীন্দ্রনাথ সভায় ত্রিপুরা-রাজপরিবারের সহিত তাঁহার দীর্ঘকালের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার কথা বিবৃত করেন।

সেই দিন অপরাহ্ণে টাউন হলে সাহিত্যসম্মেলন আহূত হয়; এই সভায় শরৎচন্দ্র সভাপতিত্ব করেন। সেইদিন সন্ধ্যায় ও পরদিন সন্ধ্যায় (২৬ ডিসেম্বর) কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে 'গীত-উৎসব' অনুষ্ঠিত হইল।

২৭ ডিসেম্বর টাউন হলে কবিসংবর্ধনা। কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে মেয়র ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে প্রফুল্লচন্দ্র রায়, হিন্দী সাহিত্যসম্মেলনের তরফ হইতে অম্বিকাপ্রসাদ বাজপেয়ী, প্রবাসী বঙ্গসাহিত্যসম্মেলনের প্রতিনিধিরূপে প্রতিভা দেবী, রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবের পক্ষ হইতে জগদীশচন্দ্র বসু (তিনি অসুস্থ হওয়ায় কবি কামিনী রায়) অভিনন্দন পাঠ করিলেন। অতঃপর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় *The Golden Book of Tagore* নামে প্রশস্তি গ্রন্থ, শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র-পরিচয় সভার প্রতিনিধিরূপে ক্ষিতিমোহন সেন 'জয়ন্তী-উৎসর্গ' নামে গ্রন্থ কবিকে উপহার দিলেন। কবি প্রত্যেকটি অভিনন্দনের যথাযোগ্য প্রতিভাষণ দান করিলেন।[২]

ইহার পর একদিন (৩১ ডিসেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে কলিকাতার ছাত্রসমাজ কর্তৃক কবিসংবর্ধনা হইল।[৩]

এই ছাত্র-ছাত্রী-উৎসবের অঙ্গরূপে জোড়াসাঁকোর বাটীতে 'শাপমোচন' নাটিকার মূক অভিনয় ও নৃত্যগীত হয়।

জয়ন্তী-উৎসবের শেষ অনুষ্ঠান ইন্‌ডিয়া সোসাইটি অব্‌ ওরিয়েন্টাল আর্টস-এর সদস্যদের কবিপ্রণাম। এইটি উৎসবক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয় নাই— কারণ, ৪ জানুয়ারি সংবাদ আসিল গান্ধীজি গ্রেপ্তার হইয়াছেন— উৎসব বন্ধ করিয়া

১ শরৎ-পরিচয়, পৃ. ১০৭।

২ বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য প্রবাসী ১৩৩৮ মাঘ, পৃ. ৫০৩-০৮। Municipal Gazette— Tagore Memorial Number 1941। সাহিত্যসম্মেলনে শরৎচন্দ্রের ভাষণ, জয়ন্তী-উৎসর্গ (বিশ্বভারতী গ্রন্থপ্রকাশন). পৃ. ৪৯৩-৯৯। কবিসংবর্ধনার অভিনন্দনের লেখকও শরৎচন্দ্র।

৩ রবীন্দ্রজয়ন্তী ছাত্র-ছাত্রী উৎসব-পরিষদ হইতে 'কবিপ্রশস্তি' প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত।

দেওয়া হইল। ৫ জানুয়ারি শিল্পীদের অনুষ্ঠান হইল জোড়াসাঁকোর বাটীতে। এই দিন শিল্পীদের উদ্দেশে কবি একটি গান রচনা করিলেন—

> আমাদের দান যশের ডালায় সব-শেষ সঞ্চয় আমার—
> নিতে মনে লাগে ভয়॥
> এই রূপলোকে কবে এসেছিনু রাতে,
> গেঁথেছিনু মালা ঝরে-পড়া পারিজাতে,
> আঁধারে অন্ধ— এ যে গাঁথা তারি হাতে—
> কী দিল এ পরিচয়॥ —গীতবিতান, পৃ. ৫৭৪

সুরশিল্পীর যশোগৌরবে তিনি এতকাল পরিচিত আছেন, আজ রূপশিল্পীরূপে রূপদক্ষরা তাঁহাকে সম্মান দিতে আসিয়াছেন— তাই তাঁহার 'নিতে মনে লাগে ভয়'।[১]

চিত্র ও নৃত্য

এইবারের জয়ন্তী-উৎসবে রবীন্দ্রনাথের দুইটি নব সৃষ্টি লোকে দেখিল; একটি তাঁহার অঙ্কিত ছবির প্রদর্শনী, অপরটি হইল 'শাপমোচনে'র অভিনয়।

কবির অঙ্কিত চিত্র এই প্রথম ভারতে প্রদর্শিত হইল; ইতিপূর্বে ১৯৩০ সালে ফ্রান্স ইংলন্ড জারমেনি নরওয়ে রাশিয়া ও আমেরিকায় চিত্রপ্রদর্শনী হইয়াছিল। কবির চিত্রকলার মূল্যনিরূপণ লইয়া আর্টিস্ট ও আর্ট-ক্রিটিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। পশ্চিমদেশে নানা শাস্ত্রীর নানা মত। এ দেশে আর্টের এমন একটা মানদণ্ড স্থাপিত হয় নাই যাহার সাহায্যে কবির চিত্রাবলীর সুষ্ঠু বিচার হইতে পারে; ফলে বাহিরের শিল্পীদেরই মানকেই স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

কবির অঙ্কিত ছবিগুলি দর্শকদের দিশাহারা করিয়া রাখিয়া গেল; তাহাকে ভালো বলিবে, না, মন্দ বলিবে; তাহাকে কোন্ আর্টগোষ্ঠীভুক্ত করিবে— কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না। কোনো ছবির নীচে কোনো বর্ণনাত্মক নাম নাই— কাহার মুখ, কোথাকার দৃশ্য, কোন্ প্রাণীর রূপ— কিছুই লিখিত নাই। কবি ছবিতে কোনো নাম দেন নাই কেন তাহার কৈফিয়তে লিখিলেন— "ছবিতে নাম দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। তার কারণ বলি, আমি কোনো বিষয় ভেবে আঁকি নে— দৈবক্রমে কোনো অজ্ঞাতকুলশীল চেহারা চলতি কলমের মুখে খাড়া হয়ে ওঠে। জনকরাজার লাঙলের ফলার মুখে যেমন জানকীর উদ্ভব। কিন্তু সেই একটিমাত্র আকস্মিককে নাম দেওয়া সহজ ছিল।··· আমার যে অনেকগুলি— তারা অনাহূত এসে হাজির।··· রূপসৃষ্টি পর্যন্ত আমার কাজ, নামবৃদ্ধি অপরের।"[২] অন্যত্র বলিয়াছেন—

১ ইণ্ডিয়া সোসাইটি অব্ ওরিয়েণ্টেল আর্টের সদস্যগণ দ্বারা কবিশিল্পী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে অর্ঘ্য-প্রশস্তি দান ২০ পৌষ ১৩৩৮। স্থান— কবির নিজভবন। (মন্ত্রগুলি ক্ষিতিমোহন সেন কর্তৃক অথর্ববেদ হইতে সংকলিত)। বিচিত্রা ১৩৩৮ মাঘ, পৃ. ২৮-২৯।

২ রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কন, প্রবাসী ১৩৩৮ মাঘ, পৃ. ৬০২।

জগতে রূপের আনাগোনা চলছে,
সেই সঙ্গে আমার ছবিও এক-একটি রূপ,
অজানা থেকে বেরিয়ে আসছে জানার দ্বারে।
সে প্রতিরূপ নয়।
মনের মধ্যে ভাঙাগড়া কত, কতই জোড়াতাড়া ;
কিছু বা তার ঘনিয়ে ওঠে ভাবে,
কিছু বা তার ফুটে ওঠে চিত্রে ;
এত দিন এই-সব আকাশবিহারীদের ধরেছি কথার ফাঁদে। · ·
আজকাল আছে সে চোখ মেলে।
রেখার বিশ্বে খোলা রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে, দেখবে ব'লে।
সে তাকায়, আর বলে, 'দেখলেম'। —শেষসপ্তক ১৫

কবির ছবি যেমন রূপদক্ষদের মুগ্ধ ও যুগপৎ চিন্তান্বিত করিয়া তোলে, তেমনি করিল তাঁহার নূতন গীতাভিনয় শাপমোচন— সুর ছন্দ ও রূপের সমাবেশে অপরূপ। সমসাময়িক এক দর্শক লিখিতেছেন, "শাপমোচন একটি সত্যকার নতুন সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের যে নাটকগুলির অভিনয় দেখেছি তাদের থেকে 'শাপমোচনে'র একটি স্বাতন্ত্র্য আছে। প্রথমত নাটকখানির কথোপকথনের অংশ বাণীহীন ; অর্থাৎ তার সমস্তটুকুই tableau দ্বারা সাধিত হয়।· · কাহিনীটি কবি নিজে আবৃত্তি করেন এবং তাঁর সেই আবৃত্তির সঙ্গে সংগতি বজায় রেখে অভিনেতৃবর্গ মূকাভিনয় করে যান, মধ্যে মধ্যে গীত রচনা চলে। দ্বিতীয়ত· ·নাটকের প্রথম কথাটি [আবৃত্তি] থেকে আরম্ভ ক'রে শেষ কথাটি পর্যন্ত একটি অবিচ্ছিন্ন নৃত্যের ছন্দে গাঁথা, অভিনেতৃবৃন্দের ছন্দোবদ্ধ ভঙ্গিমায় অভিনয়কালের সমস্ত ক্ষণটুকু স্পন্দিত হতে থাকে। সেইজন্য কবি একে নৃত্যাভিনয় আখ্যা দিয়েছেন।"[১]

শাপমোচন অভিনয়ের কয়েকমাস পূর্বে (১৩৩৮ ভাদ্র) গীতোৎসবে 'শিশুতীর্থ' লইয়া এই নৃত্যাভিনয়ের প্রথম পরীক্ষা হইয়াছিল। শিশুতীর্থে প্রতীকাত্মক ও রাহস্যিক পরিবেশ থাকায় নাট্যবস্তুর আবেদন সকল শ্রেণীর দর্শক-শ্রোতার চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে নাই। কিন্তু "যে বৌদ্ধ আখ্যান অবলম্বন করে 'রাজা' নাটক রচিত, তারই আভাসে" শাপমোচনের[২] গল্পাংশ লিখিত। ইহার গানগুলি পুরাতন, কারণ কবি যে-সময়ে এইটি নাট্যাভিনয়-প্রযোজনায় ব্যস্ত (১৩৩৮ পৌষ), তখন তিনি কোনো গান রচনা করিতেছেন না— মন নানাভাবে বিক্ষিপ্ত।

শান্তিদেব তাঁহার 'রবীন্দ্রসংগীত'এ শাপমোচন সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, এখানে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। তবে এইটুকু বলিয়া রাখা দরকার যে শিশুতীর্থ ও শাপমোচন নৃত্যাভিনয়ের পূর্বে বসন্ত, সুন্দর নবীন নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা প্রভৃতি গীতাভিনয় হইতে সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি। এতকাল নৃত্যাভিনয়ে ঋতুর গান ছিল মুখ্য ; সেগুলি কোনো ঘটনা বা নাটকীয় পরিবেশ মনে রাখিয়া পরিকল্পিত নহে ; কবির অন্তর্বেদনা, বা আনন্দময়লোক হইতে যে গীতধারা উৎসরিত হইত, তাহা সমগ্র জলসার ভারসাম্য রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই সাজানো হইত ; গানের ভাবপারম্পর্য রক্ষার জন্যই কথা বা সংলাপের অবতারণা ; আসলে গানগুলির মর্যাদা দান

১ নবশক্তি, ৩য় বর্ষ ৩৪ সংখ্যা, ১৩৩৮ পৌষ ২৩।
২ শাপমোচন, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২।

উপলক্ষ্যে সংলাপের সৃষ্টি, কোনো নাটকীয় কাহিনীর ঘাত-প্রতিঘাত কল্পিত হয় নাই। শিশুতীর্থ ও শাপমোচন গল্প বা ঘটনাকে নাটকীয় রূপ দিতে গিয়া গানের যোজনা ও অখণ্ড নৃত্যের বিচিত্র ছন্দ রচনা। এখানে গান আসিয়াছে ভাবের বা কাহিনীর বাহনরূপে।[১]

প্রতিমা দেবী 'নৃত্য' গ্রন্থে বলিয়াছেন শিশুতীর্থ ও শাপমোচন রঙ্গমঞ্চে মুক্তিলাভের পূর্ব পর্যন্ত তাঁহারা বর্তমান যুগে নৃত্য কী রূপ লইতে পারে, সে-সম্বন্ধে পথ পান নাই। "অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ানোর মতো কতকটা মূক অভিনয়, কতকটা গীতাভিনয়, কতকটা দেহভঙ্গীর মধ্য দিয়ে ভাবের প্রকাশ হতো বটে, কিন্তু তার পরিপূর্ণ রূপ সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল।" গতবার য়ুরোপ-সফরকালে প্রতিমা দেবী যখন এলমহার্স্টের ডার্টিংটন হলে কিছুকাল বাস করেন, সে সময়ে য়ুরোপের নানা দেশ হইতে বহু ব্যালে নর্তকের সমাগম হয় সেখানে। এইসব ভালোভাবে জানিবার ও বুঝিবার সুযোগ তিনি লাভ করেন ও দেশে ফিরিয়া প্রথমে 'শিশুতীর্থ' ও পরে 'শাপমোচনে' তাহার পরীক্ষা করিবার অবসর পান। প্রতিমা দেবী লিখিতেছেন যে এতকাল "নাচগুলি ছিল ছোটো, খণ্ড খণ্ড গানের সঙ্গে হতো তার আরম্ভ ও শেষ। সেই টুকরো নৃত্যগুলি সুন্দর হলেও দর্শকের চোখের উপর দিয়ে ভেসে যেত, মনে কোনো স্থায়ী রস রেখে যেতে পারত না। 'শাপমোচন'এর যুগে আমরা প্রথম চেষ্টা করলুম নাচের মধ্যে নাটকের বিষয় আনতে।"[২]

খড়দহে একমাস

জয়ন্তী-উৎসবের পর কবি সপরিবারে কলিকাতার উপকণ্ঠে খড়দহে যান; খড়দহ গঙ্গার তীরে— কলিকাতা হইতে রেলপথে ১৪ মাইল দূরে। দোতলা সুন্দর বাড়িটি— নদীতে নামবার জন্য বাঁধানো সিঁড়ি জল পর্যন্ত নামিয়াছে। 'পদ্মা' নামে তাঁহাদের নৌকাটি ঘাটে বাঁধা থাকিত। নূতন বাড়িতে নূতন পরিবেশে কবির মন কাব্য রচনায় ডুবিল। খড়দহ বাসকালে যে কবিতাগুলি লেখেন, তার অধিকাংশ স্থান পাইয়াছে 'বিচিত্রিতা'র মধ্যে, কয়েকটি 'বীথিকা' ও 'পরিশেষ' গ্রন্থের অন্তর্গত হইয়াছে।

কলিকাতায় থাকিবার সময় এবার গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরদের বাটীতে কতকগুলি ভালো ছবি তাঁহার চোখে পড়ে। এই সংগ্রহ দেখিয়া স্থির করিলেন যে এই মূক চিত্রগুলিতে তিনি ভাষা দিয়া নূতনভাবে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিবেন। গত কয়েক বৎসর হইতে রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকিতেছেন। আমরা ছবিকে যেভাবে সাধারণত দেখিতে অভ্যস্ত রবীন্দ্রনাথের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গী যে সে-দৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইবে, তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি।

১ শাপমোচনে প্রথম অভিনয়ের সময়ে (১৫ পৌষ ১৩৩৮)—

১. পাছে সুর ভুলি; ২. ভরা থাক স্মৃতিসুধায়; ৩. তুমি কি কেবলি ছবি (বলাকা, ছবি); ৪. তোমার আনন্দ ঐ এল দ্বারে; ৫. বাজো রে বাঁশরি বাজো; ৬. লহ লহ তুলে লহ; ৭. যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়; ৮. কোথা বাইরে দূরে; ৯. আনমনা আনমনা; ১০. আমি এলেম তারি দ্বারে; ১১. চোখ যে ওদের ছুটে চলে গো। ১২. বসন্তে ফুল গাঁথল; ১৩. এসো আমার ঘরে; ১৪. বাহিরে ভুল হানবে; ১৫. পাখি আমার নীড়ের পাখি; ১৬. না যেয়ো না; ১৭. সখী আঁধারে একেলা ঘরে; ১৮. অরূপ বীণা রূপের আড়ালে; ১৯। মোর বীণা ওঠে কোন্ সুরে বাজি।

দ্বিতীয় অভিনয়ের সময়ে ১২-১৬ (চৈত্র ১৩৩৯)। ২৯টি গান গীত হয়। দ্র. শাপমোচন, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২, পৃ. ৮৫-১০১। সংযোজন, পৃ. ১০৫-১১০। গ্রন্থপরিচয়, পৃ. ৫০৬-৫০৯।

২ নৃত্য, পৃ. ১২-১৩।

খড়দহ যাইবার সময়ে ছবিগুলি সঙ্গে করিয়া লইয়া যান এবং সেগুলি অবলম্বন করিয়া কবিতা লেখেন। চিত্রগুলি উপলক্ষ্যমাত্র; সামান্য এক-একটি সূত্র ধরিয়া তাঁহার কবি-মানস বহু বিস্তারে রূপ হইতে রূপান্তরে ছন্দ গাঁথিয়া চলে। ছবি একটি জায়গায় আসিয়া স্তব্ধ; সে যেন তাহার সমস্ত বাণী বহিয়া মূক হইয়া যায়। কবি সেই স্তব্ধ বাণীকে ভাষা ও ছন্দে গাঁথিয়া চলমান করিয়া দেন। ছবি না দেখিলেও 'বিচিত্রিতা'র কবিতার রস গ্রহণে কোনো বাধা হয় না। রবীন্দ্রনাথ চিরদিন অন্তরের অরূপ মূর্তিকে ভাষায় রূপায়িত করিয়াছেন, আজ তিনি চিত্রশিল্পী, রূপকারের সৃষ্টির অন্তরে সহজে প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন, এই রূপ ও ছন্দের রাজ্য তাঁহার মনে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিত। তাই চিত্রের রূপ তাঁহার মনে ভাবতরঙ্গ তুলিতেছে।

'বিচিত্রিতা' খণ্ডকবিতার সংগ্রহ; ইহাদের মধ্যে কোনো ভাবের সাম্য নাই যাহা অল্প সময়ের মধ্যে লিখিত কবিতার মধ্যে প্রায়ই পাওয়া যায়। তবে বিচিত্রিতার সব কবিতাই ছবি দেখিয়া লিখিত হয় নাই; কয়েকটি কবিতার উপর ছবি আঁকা হয় বলিয়া শুনিয়াছি।

এই কাব্যখণ্ড নন্দলাল বসুর জন্মদিন স্মরণে কবি উৎসর্গ করেন; উহা একাধারে কবির ও রূপদক্ষদের যুগ্ম উপহার। গ্রন্থের প্রথমে যে আশীর্বাদ-কবিতা আছে তাহা লিখিত হয় ৯ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮ (২৫ নভেম্বর ১৯৩১) রাস-পূর্ণিমার দিনে; তখন এই বিচিত্রিতার কবিতা লিখিত হয় নাই।[১]

অন্যের বা নিজের ছবির উপর কবিতা লিখিতে গিয়া কবির অন্তরের অনেক কথাই ব্যক্ত হইয়াছে বিচ্ছিন্ন এই কবিতাগুচ্ছের মাঝে মাঝে। কবিতাগুলি বিশ্লেষণ করিলে অনেক তত্ত্বই পাওয়া যায়, তবে তাহারা বিচ্ছিন্ন বলিয়া

১ "পঞ্চাশটি নূতন ছবি ও তদদৃষ্টে কবির পঞ্চাশটি নূতন কবিতা শীঘ্রই 'বিচিত্রিতা' নামে বই আকারে বাহির হইবে।" বিচিত্রা ১৩৩৯ কার্তিক। 'বিচিত্রিতা'য় ৫০টি কবিতা নাই; আছে ৩১টি। অবশিষ্ট কবিতা বীথিকা ও পরিশেষের মধ্যে গিয়াছে। বীথিকার 'গোধূলি' (১৪ মাঘ ১৩৩৮) নামে কবিতাটি নন্দলাল বসুর একটি চিত্রসহ বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়।

আমরা পারস্যযাত্রার পূর্ব পর্যন্ত কবির লিখিত কবিতার তালিকা দিলাম—

১৩৩৮ মাঘ ২, সেঁজুর (বিচিত্রিতা ২১নং, চিত্রী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর); মাঘ ৩, হার (বিচিত্রিতা ৯নং, সুরেন্দ্রনাথ কর); মাঘ ৪, কালোঘোড়া (বিচিত্রিতা ১৪নং, গগনেন্দ্রনাথ); মাঘ ৪, মরণমাতা (বীথিকা, পৃ. ৮০); মাঘ ৫, পসারিণী (বিচিত্রিতা ৪নং, নন্দলাল বসু); মাঘ ৬, অপ্রকাশ (বীথিকা, পৃ. ১২২); মাঘ ৭, মরীচিকা (বিচিত্রিতা ১০নং, গগনেন্দ্রনাথ); মাঘ ৭, রাত্রিরূপিণী (বীথিকা, পৃ. ৯); মাঘ ৮, শ্যামলা (বিচিত্রিতা ১১নং, রবীন্দ্রনাথ); মাঘ ৯, আরশি (বিচিত্রিতা ৭নং, সুরেন্দ্রনাথ কর); মাঘ ১০, পুষ্পচয়না (বিচিত্রিতা ১৮নং, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার); মাঘ ১০, ভীরু (বিচিত্রিতা ১৯নং, গগনেন্দ্রনাথ); মাঘ ১১, পুষ্প (বিচিত্রিতা ১নং, রবীন্দ্রনাথ); মাঘ ১১, দ্বারে (বিচিত্রিতা ২৯নং, সুরেন্দ্রনাথ); মাঘ ১২, কুমার (বিচিত্রিতা ৬নং, গগনেন্দ্রনাথ) মাঘ ১২, যাত্রী (বিচিত্রিতা ২৮নং, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী); মাঘ ১৩, দ্বিধা (বিচিত্রিতা ২৭নং, গগনেন্দ্রনাথ); মাঘ ১৪, বধূ (বিচিত্রিতা ২নং, গগনেন্দ্রনাথ); মাঘ ১৪, গোধূলি (বীথিকা, পৃ. ১০৩)।

বিচিত্রিতার জন্য মাঘ মাসে রচিত কবিতা (তারিখ নাই)— সাজ ১৩নং, প্রকাশিতা ১৪নং, নববধূ ১৫নং, ছায়াসঙ্গিনী ১৬নং, নির্বাক (২৮ মাঘ, পরিশেষ), প্রভেদ ১৭নং, অচেনা ৩নং, গোয়ালিনী ৫নং, অনাগতা ২৫নং, ঝাঁকড়া চুল ২৬নং, কন্যাবিদায় ৩০নং।

২ ফাল্গুন, ব্যর্থমিলন, অপরাধিনী (বীথিকা); ৫ ফাল্গুন, যুগল (বিচিত্রিতা ২০নং); ২৫ ফাল্গুন, প্রতীক্ষা (পরিশেষ); ২৫ ফাল্গুন, পক্ষীমানব (নবজাতক); ২৮ ফাল্গুন, একাকিনী (১২নং বিচিত্রিতা); ২৮ ফাল্গুন, রাজপুত্র (পরিশেষ)। ফাল্গুন মাসে লেখা অন্যান্য কবিতা— দীপশিল্পী, বিহ্বলতা (বীথিকা)।

৯ চৈত্র, বসন্তউৎসব (দোলপূর্ণিমা); পরিশেষ (সংযোজন); ১১ চৈত্র, ছন্দোমঞ্জরী (বীথিকা); ১২ চৈত্র, অগ্রদূত (পরিশেষ); ১৪ চৈত্র, শান্ত (পরিশেষ); ১৭ চৈত্র, প্রণাম (পরিশেষ)। চৈত্র মাসে লিখিত শূন্যঘর (পরিশেষ); গৌড়ী রীতি, পরিচয় ১৩৩৯। [২৯ চৈত্র ১৩৩৮ পারস্য যাত্রা]।

কোনো বিশেষ কথা ফুটিয়া উঠে না। 'বেসুর' কবিতা (২ মাঘ ১৩৩৮) লঘু ছন্দে হালকা ভাষায় লেখা, কিন্তু তার ভিতরে আছে গভীর বাণী যাহা প্রত্যেক লোক আপনার মধ্যে অনুভব করে—

আপনি যেন আর কেহ সে, এই লাগে তার মনে,
চেনা ঘরের অচল ভিতে কাটায় নির্বাসনে।
বসন ভূষণ অঙ্গরাগে
ছদ্মবেশের মতন লাগে,
তার আপনার ভাষা যে হায় কয় না আপন জনে।[১]

ফেব্রুয়ারি মাসের (১৯৩২) গোড়ার দিকেই কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন।

খড়দহ বাসকালেই হউক অথবা শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া কবি 'পরিচয়' পত্রিকার জন্য (১৩৩৯ বৈশাখ) 'গৌড়ী রীতি' ও 'ভোজনবীর' নামে দুইটি কবিতা লিখিয়া দেন (প্রবাসিনী)। প্রথম কবিতাটির ইতিহাস আছে; ১৯২৬ সালের নভেম্বর মাসে বেল্‌গ্রেড হইতে দিলীপকুমার রায়কে লিখিত এক পত্রের শেষে এই কবিতাটির গোড়ার দিকের কয়েক পংক্তি পাই।[২] রবীন্দ্রনাথ aristocrat, তাঁহার কাছে যাওয়া যায় না— ইত্যাদি অনেক অভিযোগ তাঁহার কানে আসে। সেই কথা শুনিয়া দিলীপকুমারকে লিখিয়াছিলেন, "বঙ্কিম একদিন সাহিত্য-অগ্রণী ছিলেন।...তাঁর কাছে ঘেঁষতে কেউ সাহস করত না...। কিন্তু আমার ঘর চড়াও হয়ে উপদ্রব করতে না পারে এমন অপোগণ্ড বা নগণ্য ব্যক্তি তো বাংলাদেশে কেউ নেই। অথচ বঙ্কিমকে কেউ উদ্ধত বা কঠিনহৃদয় বলে না। কেননা যাঁর কাছে কেউ সহজে কিছুই পায় না তাঁর অনুগ্রহের কণা পেলেও লোকে কৃতার্থ হয়। কিন্তু, যার কাছে কোনো বাধা নেই তার কাছেই দাবির ষোলো আনা পূরণ করতে না পারলে আট আনারও রসিদ পাওয়া যায় না।" এই পত্রের (১৭ নভেম্বর ১৯২৬) শেষে ছিল—

নাহি চাহিতেই ঘোড়া দেয় যেই, ফুঁকে দেয় ঝুলি থলি,
লোকে তার 'পরে ভারি রাগ করে হাতি দেয় নাই বলি।
বহু সাধনায় যার কাছে পায় কালো বেড়ালের ছানা,
লোকে তারে বলে নয়নের জলে, দাতা বটে ষোলো-আনা।

এই সময়ে (১৯৩২) এই কবিতায় আরও কয়েক পংক্তি যোগ করেন। এ ছাড়া এই সময়েই লেখা 'ভোজনবীর' কবিতাটি। রবীন্দ্রনাথ চিরকালই বাঙালির খাদ্যসংস্কার লইয়া অনেক লিখিয়াছেন, অনেক বলিয়াছেন; এই কবিতাটি তাহারই অনুক্রমণ—

খাওয়া বাঁচায়ে বাঙালিদের বাঁচিতে হলে ঝোঁক
এ দেশে তবে ধরিত না তো লোক।
অপরিপাকে মরণভয়
গৌড়জনে করেছে জয়,
তাদের লাগি কোরো না কেহ শোক।

১ বেসুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭, পৃ. ৩২।
২ বাতায়ন ১৩৩৮, রবীন্দ্র-জয়ন্তী সংখ্যা। দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩, পৃ. ৫৩৫।

পারস্যযাত্রার পূর্বে

ফেব্রুয়ারি (১৯৩২) মাসের গোড়ায় খড়দহ হইতে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন। ৬ ফেব্রুয়ারি শ্রীনিকেতনের দশম বার্ষিক উৎসবে কবি যে ভাষণ দেন, তাহা 'দেশের কাজ' নামে প্রকাশিত হয় (প্রবাসী ১৩৩৮ চৈত্র)।

কবি খুব সহজ ভাষায় জনতাকে বলেন যে দেশের কাজ বলিতে রাজনৈতিক আন্দোলন বুঝায় না, বিলাতের সহিত ঘনিষ্ঠতার চেষ্টা মাত্র নহে, শুধু চোখ বুজিয়া বিদেশীর নকল করা নহে। "আজ দেশের প্রাণান্তিক দৈন্যের দিনে একটা বড়ো বিষয়ে ওদের অনুবর্তন করতে হবে, কোমর বেঁধে বলতে চাই কিছু সুবিধার ক্ষতি, কিছু আরামের ব্যাঘাত হলেও নিজের দ্রব্য নিজে ব্যবহার করব।··দেশকে আপন করে উপলব্ধি করবার এ একটি প্রকৃষ্ট সাধনা।" স্বদেশী আন্দোলনের যুগে যে-কথা বলিয়াছিলেন, এ-যে দেখি সেই স্বাদেশিকতা; মনোরাজ্যে তিনি সর্বতোভাবে আন্তর্জাতিক; কিন্তু ব্যবহারিক জগতে পরিপূর্ণ স্বাদেশিক। তাঁহার কাছে স্বদেশ বলিতে বুঝাইত স্বদেশের লোক ও দেশের কাজ বলিতে বুঝাইত দেশের সর্বহারাদের জন্য কাজ। দেশ সম্বন্ধে কোনো তুরীয় অবচ্ছিন্নতা তাঁহার ছিল না— যাহা ছিল সেটা অত্যন্ত practical, বস্তুতান্ত্রিক বিবেচনা।

দেশের কাজ বলিতে কবি কী বুঝিতেন সেই সূত্রে অন্য একস্থানে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এইখানে উদ্‌ধৃত করিলাম—

"দেশ মানুষের সৃষ্টি। দেশ মৃণ্ময় নয়, সে চিন্ময়। মানুষ যদি প্রকাশমান হয় তবেই দেশ প্রকাশিত। সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা ভূমির কথা যতই উচ্চকণ্ঠে রটাব ততই জবাবদিহির দায় বাড়বে, প্রশ্ন উঠবে প্রাকৃতিক দান তো উপাদান মাত্র, তা নিয়ে মানবিক সম্পদ কতটা গড়ে তোলা হল। মানুষের হাতে দেশের জল যদি যায় শুকিয়ে, ফল যদি যায় মরে, মলয়জ যদি বিষিয়ে ওঠে মারীবীজে, শস্যের জমি যদি হয় বন্ধ্যা, তবে কাব্যকথায় দেশের লজ্জা চাপা পড়বে না। দেশ মাটিতে তৈরি নয়, মানুষের তৈরি।" রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিকতার মধ্যে বিরোধ ছিল না। দেশের কাজ বলিতে তিনি দশের কাজ বুঝিতেন। এদিকে রবীন্দ্রনাথের পারস্য যাইবার কথা চলিতেছে; কিছুদিন পূর্বে জলপথে যাইবার প্রস্তাব হয়; কিন্তু তাঁহার এই বৃদ্ধবয়সে উহা সহ্য হইবে না বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এইবার আকাশপথে যাওয়ার কথা উঠিল কিন্তু তাহাও সহ্য হইবে কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য কলিকাতায় গেলেন। সেখানে একদিন (২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২) ডাচ্‌ এরোপ্লেনে চড়িয়া আধ ঘণ্টা আকাশে ঘুরিয়া আসিলেন। কবির সঙ্গে ছিলেন ডাচ্‌ কন্সাল-জেনারল ও তাঁহার পত্নী। বোঝা গেল পারস্যযাত্রাকালে আকাশপথে তাঁহার কষ্ট হইবে না। এই আকাশ-ভ্রমণ স্মরণে লেখেন 'পক্ষীমানব' কবিতা (২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২, নবজাতক)। ভাবীকালে এই আকাশযান যে মানুষের সভ্যতাকে নিষ্ঠুরভাবে ধ্বংস করিবে এ আশঙ্কা কবিরমনে সেদিন উদয় হয়। কবি লিখিলেন—

> যুগান্ত এল বুঝিলাম অনুমানে
> অশান্তি আজ উদ্যত বাজ কোথাও না বাধা মানে;
> ঈর্ষা হিংসা জ্বালি মৃত্যুর শিখা
> আকাশে আকাশে বিরাট বিনাশে
> জাগাইল বিভীষিকা।

ইহা লিখিত হয় ১৯৩২ সালের গোড়ায়, তখনো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কথা কেহ ভাবে নাই।

কলিকাতায় আসিবার অন্যতম কারণ আর্টস্কুলে কবির চিত্রাবলীর প্রদর্শনী চলিতেছে। মুকুলচন্দ্র দে তখন আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ। য়ুরোপ ও আমেরিকা হইতে কবির চিত্রসমূহ ফিরিয়া আসিলে তাঁহারই উদ্যোগে এই প্রদর্শনী উদ্‌বোধনের সময় কবি কলিকাতায় আসেন (২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২)। যে সার্ উপাধি তিনি ১৯১৯ সালে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, চিত্র-তালিকায় তাঁহার নামের সহিত তাহা সংযুক্ত দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হন।

কলিকাতার নানা কর্তব্যকর্ম শেষ করিয়া চৈত্র মাসের গোড়ায় কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন। "এ-বৎসর দোলপূর্ণিমা ফাল্গুন পার হয়ে চৈত্রে পৌঁছিল [৯ই চৈত্র]।· ·শালের বীথিকা ভরে উঠেছে মঞ্জরিতে। উৎসব-প্রভাতে আশ্রমকন্যারা ঋতুরাজের সিংহাসন প্রদক্ষিণ করলে এই পুষ্পিত শালের বনে, তার বল্কলে আবির মাখিয়ে দিলে, তার ছায়ায় রাখলে মাল্যপ্রদীপের অর্ঘ্য। চতুর্দশী চাঁদ যখন অস্তদিগন্তে, প্রভাতের ললাটে যখন অরুণ-আবিরের তিলকরেখা ফুটে উঠল, তখন আমি এই ছন্দের নৈবেদ্য বসন্ত-উৎসবের বেদির জন্য রচনা করেছি।" বসন্ত-উৎসব কবিতার এই ভূমিকা।[১]

এইদিন কবির সহিত দেখা করিতে আসিলেন তিন জন কোয়েকার। গান্ধীজি ও কন্‌গ্রেসের নেতৃবর্গ কারারুদ্ধ হওয়ায় যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে ভারতসরকার বা বিলাতের শাসকবর্গের কোনো ভাবান্তর সৃষ্টি না করিলেও ইংলন্‌ডের এক শ্রেণীর মানবদরদী ও ভারতবন্ধু নরনারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কোয়েকার সম্প্রদায়ের তিন জন প্রতিনিধি ভারতে আসিয়া বৃটিশ রাজপুরুষদের সহিত কথাবার্তা বলিয়া বুঝিলেন যে তাহারা শান্তি চাহে না, তাহারা জয় চাহে।

এই ফেব্রুয়ারি মাসে ইঁহারা শান্তিনিকেতনে আসিলে রবীন্দ্রনাথ ইঁহাদের বলিয়াছিলেন—

"We in India are ready for a fundamental change in our affairs which will bring harmony and understanding into our relationships with those who have inevitably been brought near to us. We are waiting for a gesture of good-will from both sides, spontaneous and generous in its faith in humanity, which will create a future of moral federation, of constructive works of public good of the inner harmony of peace between peoples of India and England.

"The memory of the past, however painful it may have been for us all, should never obscure the vision of the perfect, of the future, which it is for us jointly to create"।[২]

এই কথোপকথনের প্রতিঘাতে রবীন্দ্রনাথ 'ছন্দোমাধুরী' (২৪ মার্চ। বীথিকা) নামে কবিতাটি লিখিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের মনে হয়।—

নিঠুর লোভ জগৎ ব্যেপে দুর্বলেরে মারিছে চেপে,
মথিয়া তোলে হিংসাহলাহল।
অর্থহীন কিসের তরে এ কাড়াকাড়ি ধুলার 'পরে
লজ্জাহীন বেসুর কোলাহল।

১ বসন্ত-উৎসব, ৯ চৈত্র ১৩৩৮। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫, পৃ. ৩০৪-৬।

২ Visva-Bharati News, 22 March 1932.

এনড্রুজ ও অতিথিদের নিকট কবি শুনিয়াছিলেন যে, বড়লাট লর্ড উইলিংডন তাঁহার পূর্ববর্তী বড়লাটের রাজনৈতিক ব্যবহার 'মৃদু' (mild) মনে করিতেন এবং শাসনব্যাপারে 'কঠোরতা'র (strong hand) পক্ষপাতী। আমাদের মনে হয় এই কথাবার্তার অভিঘাতে কয়েকটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। প্রথমটি 'মানী'[১] এবং তাহার পর 'অগ্রদূত' (২৫ মার্চ), "শান্ত" (২৭ মার্চ) ও "প্রণাম" (৩০ মার্চ)।

প্রথম কবিতা 'মানী' যে বড়লাটের উদ্দেশ্যে রচিত তাহা কবিতাটির উদ্‌ধৃত অংশ হইতে বোঝা যাইবে—

উচ্চপ্রাচীরে রুদ্ধ তোমার ক্ষুদ্র ভুবনখানি,
হে মানী, হে অভিমানী।
মন্দিরবাসী দেবতার মতো সম্মানশৃঙ্খলে
বন্দী রয়েছ পূজার আসনতলে।
সাধারণজন-পরশ এড়ায়ে নিজেরে পৃথক করি
আছ দিন রাত গৌরবগুরু কঠিন মূর্তি ধরি।
সবার যেখানে ঠাঁই
বিপুল তোমার মর্যাদা নিয়ে সেথায় প্রবেশ নাই।
অনেক উপাধি তব,
মানুষ-উপাধি হারায়েছ শুধু এ ক্ষতি কাহারে কব।...
হে রাজা, তোমার পূজাঘেরা মন আপনারে নাহি জানে।
প্রাণহীন সম্মানে
উজ্জ্বল রঙে রঙকরা তুমি ঢেলা,
তোমার জীবন সাজানো পুতুল স্থূল মিথ্যার খেলা।
আপনি রয়েছ আড়ষ্ট হয়ে আপনার অভিশাপে,
নিশ্চল তুমি নিজ গর্বের চাপে।
সহজ প্রাণের মান নিয়ে যারা মুক্তভুবনে ফিরে
মরিবার আগে তাদের পরশ লাগুক তোমার শিরে।[২]

'বিচিত্রিতা' রচনা হইতে কবিতার নানারূপ পরীক্ষা ও যুগপৎ সাময়িক পত্রিকায় আধুনিক ও ঊনবিংশ শতকের কাব্যের মান ও আদর্শ লইয়া আলোচনা চলিতেছে। রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার ভক্তবৃন্দ আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে কিছু লিখিবার জন্য অনুরোধ করেন। তদনুযায়ী 'আধুনিক কাব্য' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া 'পরিচয়'

১ মানী, পরিশেষ; রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫, পৃ. ২২১।

২ ১৯৩২, ৪ জানুয়ারি গান্ধীজি অন্তরীণ-আবদ্ধ হন, তিনি এখন পুণার য়েরবাদার জেলে আছেন। রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত *The Golden Book of Tagore* তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। গান্ধীজি যে তিনখানি পত্র রামানন্দবাবুকে লেখেন তাহা মডার্ন রিভিউ ১৯৩২ মার্চ সংখ্যায় ব্লক ছাপায় প্রকাশিত হয়। একটি পত্রে আছে 'My love to Gurudeva, when you meet him।" রামানন্দবাবু নিশ্চয় কবিকে এইটি জানান। দ্র. প্রবাসী ১৩৩৮ চৈত্র, পৃ. ৮৮৯।

পত্রিকায় পাঠাইয়া দেন। প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-বিশ্লেষণের প্রতিভা যেমন মুগ্ধ করে, আধুনিক কাব্য-সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার পরিচয়ও আমাদের তেমনি আশ্চর্য করে।[১]

সাহিত্যে আধুনিকতা চিরদিনই আসিয়াছে। সেই 'আধুনিক যুগ' কালে হয় প্রাচীন, তখন নবীনের দল তাহাকে আর মানিতে চায় না। রবীন্দ্রনাথ যে-যুগের লোক তাকে ইতিহাসে সাহিত্যের মধ্য-ভিক্টোরিয়ান্ যুগ বলা হয়। "তখনকার কালে কারো আধুনিকতার লক্ষণ হচ্ছে ব্যক্তিগত খুশির দৌড়।· · তারা বাহিরকে নিজের অন্তরের যোগে দেখছিলেন, জগৎটা হয়েছিল তাঁদের নিজের ব্যক্তিগত। আপন কল্পনা, মত ও রুচি সেই বিশ্বকে শুধু যে কেবল মানবিক ও মানসিক করেছিল তা নয়, তাকে করেছিল বিশেষ কবির মনোগত" (সাহিত্যের পথে, পৃ. ১০৪)। উনবিংশ শতাব্দীর শুরু হইতে এক নূতন যুগের অভ্যুদয় হয়। সে-যুগের লেখকদের রচনায় পাঠকের মনে মোহ বিস্তার করিত। কাব্যে যে-রস সৃষ্টি হইত, তাহা আধুনিকদের মতে অবাস্তব। কারণ সে-যুগে বিষয় হইতে বিষয়ী হইত বড়ো। আধুনিকদের মতে মোহ— কাব্য যাহা মনের উপর বিস্তার করিত— সে জিনিসটার আর কোনো দরকার নাই। বিজ্ঞানের যুগে পূর্বকালের অনেক অজ্ঞানতাপ্রসূত তত্ত্ব মানব-মন হইতে দূরীভূত হইয়াছে। মোহবন্ধ অনেক দূর হইয়াছে বিজ্ঞানের সাহায্যে।

বিজ্ঞানের আতিশয্যে যন্ত্রযুগে আজ আধুনিকের দল জীবিকার্জন-উৎকণ্ঠায় অবকাশহীন; তাহাদের আহার বিহার বিনোদন সমস্তের মধ্যে ব্যস্ততা, সকলেরই সময়ের অভাব। "তাই এই বৈজ্ঞানিক যুগের কাব্য-ব্যবস্থায় যে ব্যয়-সংক্ষেপ চলছে, তার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান ছাঁট গড়ন প্রসাধনে। ছন্দে বন্ধে ভাষায় অতিমাত্র বাছাবাছি চুকে যাবার পথে।" সেটা স্বাভাবিকভাবে হয় না বলিয়া কৃত্রিমভাবে করার দিকে প্রবল ঝোঁক গিয়াছে। "এখনকার কাব্যের যা বিষয়, তা লালিত্যে মন ভোলাতে চায় না।" নবীন লেখকরা বলেন তাহাদের জোর হইতেছে আত্মতায়, অর্থাৎ characterএ, যাকে বলা যায় নৈর্ব্যক্তিক বা impersonal। গত শতাব্দীতে কাব্যে বিষয়ীর আত্মতা ছিল, আধুনিক যুগে বিষয়ের আত্মতা, "এইজন্যে কাব্যবস্তুর বাস্তবতার উপরেই ঝোঁক দেওয়া হয়, অলঙ্কারের উপর নয়। কেননা অলঙ্কারটা ব্যক্তির নিজেরই রুচির প্রকাশ করে, খাঁটি বাস্তবতার জোর হচ্ছে বিষয়ের নিজের প্রকাশের জন্যে।"

লেখকদের বিশ্বাস যে বিষয়ের নৈর্ব্যক্তিকতা তাঁহারা প্রকাশ করেন— আপনাদের ব্যক্তিত্ব থাকে অন্তরালে। "আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে, আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্রদৃষ্টিতে দেখায়— এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক।" রবীন্দ্রনাথের মতে এই নিরাসক্ত সহজ দৃষ্টির আনন্দ কোনো বিশেষ কাব্যের মধ্যে আবদ্ধ নয়; তার প্রমাণ পুরাতন সাহিত্যে দুর্লভ নয়।

যুগে যুগে একটা রাষ্ট্রবিপ্লবের পরে মানুষের প্রাচীন মত বিশ্বাস ভাবাবেগের মূলে টান পড়ে। উনবিংশ শতকে ইংলন্ডে কাব্যে আধুনিকতা আসে— তাহা ফরাসী বিপ্লবের পর। গত প্রথম-মহাযুদ্ধে মানুষের অভিজ্ঞতা এত কর্কশ এত নিষ্ঠুর হইয়াছিল যে, তাহার বহু যুগের মত বিশ্বাস সমস্ত চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। "মানুষ যে সকল শোভনরীতি কল্যাণনীতিকে আশ্রয় করেছিল তার বিধ্বস্ত রূপ দেখে এতকাল যা কিছুকে সে ভদ্র বলে জানত তাকে দুর্বল ব'লে, আত্মপ্রতারণার কৃত্রিম উপায় ব'লে অবজ্ঞা করাতেই যেন সে একটা উগ্র আনন্দ বোধ করতে লাগল,

১ দ্র. পরিচয় ১৩৩৯ বৈশাখ। দ্র. সাহিত্যের পথে।

বিশ্বনিন্দুকতাকেই সে সত্যনিষ্ঠতা বলে আজ ধ'রে নিয়েছে।" রবীন্দ্রনাথের মতে এই উগ্রতা, এই অবজ্ঞাও "একটা মোহ, এর মধ্যেও শান্ত নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে সহজভাবে গ্রহণ করার গভীরতা নেই।" উগ্রতা আধুনিকতা নহে।

"বিশ্ববিষয়ের প্রতি অতিমাত্র শ্রদ্ধাকে যদি বল সেন্টিমেণ্টালিজম্, তার প্রতি গায়ে-পড়া বিরুদ্ধতাকেও সেই একই নাম দেওয়া যেতে পারে। যে কারণেই হোক মন বিগড়ে গেলে দৃষ্টি সহজ হয় না। অতএব মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগকে যদি অতি-ভদ্রয়ানার পাণ্ডা বলে ব্যঙ্গ কর, তবে এডোয়ার্ড যুগকেও ব্যঙ্গ করতে হয় উল্‌টো বিশেষণ দিয়ে। ব্যাপারখানা স্বাভাবিক নয় অতএব শাশ্বত নয়। সায়ান্সেই বল আর আর্টেই বল নিরাসক্ত মনই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন, য়ুরোপ সায়ান্সে সেটা পেয়েছে কিন্তু সাহিত্যে পায়নি।"

পারস্য ও ইরাকে। ১৯৩২

'পারস্যে' গ্রন্থের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, "দেশ থেকে বেরবার বয়স গেছে এইটেই স্থির করে বসেছিলুম। এমন সময় পারস্যরাজের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ এল। মনে হল এ নিমন্ত্রণ অস্বীকার করা অকর্তব্য হবে। তবু সত্তর বছরের ক্লান্ত শরীরের পক্ষ থেকে দ্বিধা ঘোচে নি। বোম্বাই থেকে আমার পারসী বন্ধু দিন্‌শা ইরানী ভরসা দিয়ে লিখে পাঠালেন যে, পারস্যের বুশেয়ার বন্দর থেকে তিনিও হবেন আমার সঙ্গী।"

এবার কবির সঙ্গী হলেন প্রতিমা দেবী, অমিয় চক্রবর্তী ও কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। একই ডাচ্ উড়োজাহাজে সকলের একত্র যাওয়া সম্ভব হইল না, কারণ জাভা থেকে যাত্রী ছিল। তাই কেদারনাথ এক সপ্তাহ পূর্বে অন্য জাহাজে রওনা হইয়া গেলেন। কেদারনাথ হইতেছেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র, শিল্পসমঝ্‌দার ও পণ্ডিত।

কবি ছিলেন খড়দহের বাসায়; শেষরাত্রে সেখান হইতে যাত্রা করিতে হইল (১১ এপ্রিল ১৯৩২॥২৯ চৈত্র ১৩৩৮)। লিখিতেছেন, "পূর্বে আর-একবার এই [আকাশ] পথের পরিচয় পেয়েছিলুম লণ্ডন থেকে প্যারিসে। কিন্তু সেখানে যে ধরাতল ছেড়ে ঊর্ধ্বে উঠেছিলুম তার সঙ্গে আমার বন্ধন ছিল আলগা। তার জল-স্থল আমাকে পিছুডাক দেয় না, তাই নোঙর তুলতে টানাটানি করতে হয় নি। এবারে বাংলাদেশের মাটির টান কাটিয়ে নিজেকে শূন্যে ভাসান দিলুম, হৃদয় সেটা অনুভব করলে।"

দ্বিপ্রহরে কিছুক্ষণের জন্য এলাহাবাদের বামরুলি এরোড্রোমে আকাশতরী থামে। উপর হইতে ধরণীর যে ছবি দেখা গেল, সে সম্বন্ধে কবির মনে হইতেছে, "নির্জীব ধূলিপটের উপর অদৃশ্য জীবলোকের গোটাকতক স্বাক্ষরের আঁচড়। যেন ভাবী যুগাবসানের প্রতিবিম্ব পিছন ফিরে বর্তমানের উপর এসে পড়েছে। যে ছবিটা দেখলেম সে একটা বিপুল রিক্ততা; কালের সমস্ত দলিল অবলুপ্ত।"

অপরাহ্ণে আকাশতরী পৌঁছিল 'রুক্ষ মরুভূমির পাংশুল বক্ষে যোধপুর' শহরে। যাত্রীদের হোটেলে সকলে উঠিলেন; সন্ধ্যাবেলায় মহারাজ আসিলেন কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে; 'তাঁর সহজ সৌজন্য রাজোচিত'। পরদিন প্রাতে (১২ এপ্রিল) যোধপুর ছাড়িয়া আকাশতরী মধ্যাহ্নে করাচি পৌঁছিল। সেখানে বহুলোক কবিকে স্বাগত করিবার জন্য উপস্থিত ছিলেন।

করাচি থেকে অল্প সময়ের মধ্যে এরোপ্লেন জাস্ক পৌঁছিল। ওমন উপসাগর তীরে মরুভূমি প্রান্তে সামান্য গ্রাম— "কাদায় তৈরি গোটাকতক চৌকো চ্যাপ্টা-ছাদের ছোটো ছোটো বাড়ি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, যেন মাটির সিন্দুক।" এরোপ্লেন জাস্কে পৌঁছিবার পূর্বে বুশেয়ার[১] হইতে কবিকে স্বাগত করিয়া পারসিক গবর্নরের অভ্যর্থনা আসিল বেতারে; জাস্কের বেতার স্টেশন হইতে আসিল আর-একটি। জাস্কের এরোড্রোম বিশ্রামাগারে রাত্রি কাটিল। উড়োজাহাজ শেষরাত্রে (১৩ এপ্রিল ১৯৩২) ছাড়িয়া সকালে দশটার মধ্যে আসিল বুশেয়ারে। ভীষণ ঝড়বৃষ্টির মধ্যে প্লেন নামিল। এরোড্রোমে প্রাদেশিক ডেপুটিগবর্নর, একদল রাজকর্মচারী, বয়স্কাউটের দল, কয়েকজন সিপাহী এবং স্থানীয় ভদ্রলোকেরা কবি-সংবর্ধনার জন্য হাজির। কবির ও তাঁহার সঙ্গীদের থাকিবার ব্যবস্থা হইল জনাব মাহমুদ রেজা বা পুরেরেজা নামে এক সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীর বাটীতে। এইখানে স্বয়ং গবর্নর ও অন্যান্য রাজকর্মচারীরা আসিয়া কবির রাজকীয় অভ্যর্থনা করিলেন। "আদর অভ্যর্থনা এবার 'রাজসিক' ভাবে আরম্ভ হল। চারিদিকে বন্দুকে সঙিন চড়িয়ে সেপাই শাস্ত্রী, বড় বড় রাজকর্মচারীর ছুটোছুটি এবং ক্রমাগত লোকজনের দরবার।"[২] এই দিন বোম্বাই হইতে জলতরী যোগে দিনশা ইরানী পৌঁছিলেন বুশেয়ার; ইনি পারস্যভ্রমণে কবির অন্যতম সঙ্গী।

বুশেয়ার হইতে কবিকে এবার স্থলপথে তেহেরান যাইতে হইবে; দুই দিন বুশেয়ারে থাকিতে হয়। এইখানে সর্বসাধারণ ও স্থানীয় গবর্নর কবি-সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে এক দীর্ঘ ভাষণ দান করেন, তাহার মধ্যে আছে— "আজ যে শ্রদ্ধেয় অতিথিকে আমাদের মধ্যে অভ্যর্থনা করবার দুর্লভ সৌভাগ্যলাভ আমাদের ঘটেছে, এঁর মোহিনীশক্তি অগ্রদূত হয়ে এসে কিছুকাল ধরে আমাদের অধীর আগ্রহান্বিত প্রতীক্ষাকে হর্ষোজ্জ্বল করে রেখেছিল। এঁকে পৃথিবীর সকল জাতি কতখানি শ্রদ্ধার চোখে দেখে সে-বিষয়ে কোনো আলোচনা নিষ্প্রয়োজন; যেখানেই মনের উৎকর্ষ আছে, বিদ্যা আছে, সেখানেই এঁর গ্রন্থাবলী যে সমাদর লাভ করছে, জনে জনে ইনি বিতরণ করেছেন যে প্রেমের ও সমবেদনার বাণী তাই থেকেই এঁর গুণের প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্যাকাশে ইনি উজ্জ্বলতম তারকাবাজির অন্যতম; মানুষের চিন্তার মধ্যে ইনি সঞ্চারিত করেছেন যে কল্যাণের শক্তি তা যেমনই পবিত্র তেমনই নিষ্কলঙ্ক।"

লোকের আগ্রহ দেখিয়া কবি আশ্চর্য হইয়াছেন; য়ুরোপে লোকে তাঁহার কাব্য পাইয়াছিল; এখানে লোকে কাব্যপ্রতিভার কিই বা জানে, অথচ এই অহেতুকী প্রীতির কারণ কী? কবি লিখিতেছেন, "এদের কাছে আমি বিশেষ কবি নই, আমি কবি। · · কাব্য পারসিকদের নেশা, কবিদের সঙ্গে এদের আন্তরিক মৈত্রী। · · এদের কাছে শুধু কবি নই, আমি প্রাচ্য-কবি। · · পারসিকদের কাছে আমার পরিচয়ের আরও-একটু বিশিষ্টতা আছে। আমি ইণ্ডো-এরিয়ান।" কিছুকাল হইতে পারস্যে এই আর্যামির একটা চেতনা খুব স্পষ্ট হইয়াছে। মুসলমান হইয়াও ইহারা আর্য-গৌরব বোধ করে।

১৬ এপ্রিল মোটর-যান শিরাজ অভিমুখে চলিল। দুইখানি প্রকাণ্ড লরীতে মালপত্র, একটি মোটরে সশস্ত্র সেপাই আর চারিখানি মোটরে অতিথিরা, কবির জন্য নূতন একখানা সেডান গাড়ি। বুশেয়ার হইতে শিরাজের রাস্তা খুব খারাপ; "মেঠো রাস্তা। মোটরগাড়ির চালচলনের সঙ্গে রাস্তাটার ভঙ্গিমার বনিবনাও নেই। সেই অসামঞ্জস্যের ধাক্কা যাত্রীরা প্রতিমুহূর্তে বুঝেছিল। যাকে বলে হাড়ে হাড়ে বোঝা।

১ বুশেয়ার (Bushire); ইরানে ফার্স প্রদেশের বন্দর, পারসিক উপসাগরে অবস্থিত। ১৭৮৯ হইতে ব্রিটিশের ব্যবসায় বাণিজ্যের কেন্দ্র।

২ কেদারনাথ, প্রবাসী ১৩৩৯ ভাদ্র, পৃ. ৭০৪।

"মাঠের পর মাঠ, তার আর শেষ নেই। কোথাও একটা ঘর বা গাছ বা বসতির চিহ্ন দেখি নে।"[১]

কোনোরতখ্‌ত হইতে নূতন শাহর আমলের নূতন পথ তৈয়ারি হইতেছে। পাহাড়ে পথ যেমন বন্ধুর, তেমনি বিপজ্জনক; ভীষণ উচ্চকোণে চড়াই, উৎরাই তেমনি। শিরাজের পথ দীর্ঘ; তাই কথা ছিল খাজরুনের গবর্নরের আতিথ্য গ্রহণ করা হইবে মধ্যাহ্নভোজনের জন্য; কিন্তু খাজরুন এখনো অনেক দূরে। তাই কোনোরতখ্‌ত নামক একস্থানে প্রহরীদের মাটির বাড়িতে মাটির মেঝেতে কার্পেট বিছাইয়া মধ্যাহ্নভোজন করিয়া লইলেন; কবির "মনে হল এ যেন বইয়ে পড়া গল্পের পান্থশালা, খেজুর-কুঞ্জের মাঝখানে।"

ইহার উপর পাকদণ্ডীর বাঁক। দুই-এক স্থানে দস্যুরা পুল ধ্বংস করিয়াছে; নালায় নামিয়া গাড়ি নিচু গিয়রে ফেলিয়া প্রচণ্ড বেগে পাড়ে উঠিতে হয়; সমস্ত সেতুর কাছে এবং রাস্তারও মাঝে মাঝে সশস্ত্র পুলিসের ঘাঁটি। বুঝা যায়, দেশ আয়ত্তে আসিয়াছে কিন্তু লোকে এখনো বশ মানে নাই।

খাজরুনের[২] গবর্নরের ঘোড়সোয়ারের দল পথে অপেক্ষায় ছিল। বেলা প্রায় যায়; অতিথিরা তাঁহাদের জন্য নির্দিষ্ট বাগ-এ-নজর নামক বাগানবাড়িতে পৌঁছিলেন। "বড়ো বড়ো কমলালেবুগাছের ঘনসংহত বীথিকা; স্নিগ্ধ-চ্ছায়ায় চোখ জুড়িয়ে দিলে।· · অতিথির সম্মানের জন্য আজ এখানে সরকারী ছুটি।" রাত্রে বিরাট ভোজ। কেদারনাথ তাহার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন।

পরদিন প্রাতে আবার যাত্রারম্ভ। পথ তেমনি দুর্গম তবে মাঝে মাঝে সবুজ চোখে পড়ে। এই অঞ্চলটা কাশগাই নামক এক দুর্ধর্ষ জাতির এলাকাভুক্ত। দস্যুবৃত্তি ছিল ইহাদের পেশা; বর্তমান পারস্য-শাহের প্রতাপে ইহারা বশ মানিয়াছে। ইহাদের একজন প্রধান শুকরুল্লা খাঁ পথের মাঝে ঘোড়া ছুটাইয়া আসেন ও চা এবং ভেট দিয়া কবিকে স্বাগত করেন।

১৬ এপ্রিল দ্বিপ্রহরে কবি সদলে শিরাজে[৩] পৌঁছিলেন। শিরাজের গবর্নর মহাসমারোহে কবিকে 'বাগ্ মহম্মদিয়ে' নামক প্রাসাদে লইয়া গেলেন; নাগরিকদের তরফ থেকে সেখানে অভিনন্দন। খুব আড়ম্বরপূর্ণ কবিত্বের ভাষায় কবিকে দুইটি অভিনন্দন দেওয়া হয়। একটি অভিনন্দনের মর্ম এই— "শিরাজ শহর দুটি চিরজীবী মানুষের গৌরবে গৌরবান্বিত। তাঁদের চিত্তের পরিমণ্ডল তোমার চিত্তের কাছাকাছি। যে উৎস থেকে তোমার বাণী উৎসারিত সেই উৎসধারাতেই এখানকার দুই কবিজীবনের পুষ্পকানন অভিষিক্ত। যে সাদির দেহ এখানকার একটি পবিত্র ভূখণ্ডতলে বহু শতাব্দীকাল চির-বিশ্রামে শয়ান তাঁর আত্মা আজ এই মুহূর্তে এই কাননের আকাশে ঊর্ধ্বে উত্থিত, এবং এখন কবি হাফেজের পরিতৃপ্ত হাস্য তাঁর স্বদেশবাসীর আনন্দের মধ্যে পরিব্যাপ্ত।"[৪]

কবি উত্তরে বলেন যে, "বঙ্গাধিপতি একদা কবি হাফেজকে বাংলায় নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তিনি যেতে পারেন নি। বাংলার কবি পারস্যাধিপের নিমন্ত্রণ পেলে, সে নিমন্ত্রণ রক্ষাও করলে এবং পারস্যকে তার প্রীতি ও শুভকামনা প্রত্যক্ষ জানিয়ে কৃতার্থ হল।"

১ পারস্যে, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২, পৃ. ৪৫১।

২ খাজরুন (Kazerun); ফার্স্ প্রদেশের শহর। এখান থেকে শিরাজ ৭০ মাইল পূর্বে। এখানকার কমলালেবু বিখ্যাত।

৩ শিরাজ (Shiraz): ফার্স্ প্রদেশের রাজধানী; শিল্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্র। হাফেজের কবর, ও সাদির এবং বাব্-এর (বাহাইধর্মের প্রবর্তক) জন্মভূমি।

৪ বিচিত্রা ১৩৩৯ আশ্বিন, পৃ. ২৯৪। পারস্যে, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২, পৃ. ৪৫৭-৫৮।

এই অভিনন্দনের পর কবিকে গবর্নরের বাড়িতে লইয়া যাওয়া হইল ; সেখানে ফার্স্ প্রদেশের শাসনকর্তা বহু কর্মচারী ও অনেক বিশিষ্ট দেশীয় ও বিদেশী লোক উপস্থিত। সে রাত্রে কবি ও তাঁহার সঙ্গীরা প্রাসাদে বাস করিলেন। তার পরদিন ১৭ এপ্রিল বৈকালে সাদির কবর-উদ্যানে কবির অভ্যর্থনা ; সভাপতি স্বয়ং ফার্সের গবর্নর। তেহেরানের রাজ-তরফ থেকে জনাব ফেরুঘি এবং জনাব কৈখসরো শাহরোখ আসেন কবিকে আগাইয়া লইবার জন্য। জনাব ফেরুঘি অভিনন্দনে বলেন যে, আর্যবংশ এবং আর্যসভ্যতার দরুণ পারস্য এবং ভারতের আত্মীয়তা এবং সেই কারণে কবির গৌরবে পারস্যের গৌরব।

এখানে কবিকে সাদিব রচিত একটি প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থ উপহার দেওয়া হয়। প্রত্যক্ষদর্শী কেদারনাথ লিখিতেছেন, "অসম্ভব ভিড় হয়েছিল। পুলিস হিমসিম খেয়ে শেষে সৈন্যদের সাহায্যে লোক আটকায়।"

দুই দিন পরে গবর্নরের ব্যবস্থায় কবি ও তাঁহার সঙ্গীদের থাকিবার জন্য শিরাজের শহরতলি খলিলাবাদের এক বাগানবাড়ি ঠিক হয়। কেদারনাথ লিখিতেছেন, "গবর্নরের বাড়িতে রাজভোগ খেয়ে, বাদশাহী হাম্মামে স্নান করে যেমন আরাম ছিল, তেমনি সমস্তক্ষণ সেপাই শাস্ত্রী রাজকর্মচারীর দলের মধ্যে কেতাদুরস্ত হয়ে আদব-কায়দা বজায় রেখে চলতে হাঁপিয়ে ওঠা গিয়েছিল। . . বাগানবাড়িতে এসে এসব থেকে উদ্ধার পেলাম, শহর দেখার সুযোগ হল। বাড়ির কর্তা অতি অমায়িক সুদর্শন যুবাপুরুষ।" যাঁহার বাড়ি তাঁহার নাম শিরাজী, কলিকাতায় ব্যবসায় করেন। তাঁহারই ভাইপো খলীল আতিথ্যভার লইয়াছেন।

বাগানবাড়িতে যাইবার পথে পড়ে হাফেজের কবর। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন হাফেজের অনুরাগী ভক্ত ; তাঁহার মুখ হইতে বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথ দিবানের আবৃত্তি ও তার তর্জমা শুনিতেন। সেই কবিতার মাধুর্য দিয়া পারস্যের হৃদয়ে তাঁহার প্রথম প্রবেশ, এই কথাগুলি বলেন সাদির কবর-উদ্যানের অভিনন্দনের প্রত্যভিভাষণে।

হাফেজের কবর-স্থানে সমাধিরক্ষক হাফেজের একখানি গ্রন্থ আনিয়া কবিকে খুলিতে বলিল। সেখানকার লোকেদের বিশ্বাস এই যে, যে-কোনো একটি বিশেষ ইচ্ছা মনে লইয়া চোখ বুজিয়া এই গ্রন্থ খুলিলে যে কবিতাটি বাহির হইবে, তাহা হইতে ইচ্ছার সফলতা নির্ণয় হইবে। কবিও তাহাই করিলেন। তথায় আসিবার পূর্বে গবর্নরের সহিত ধর্মান্ধতা সম্বন্ধে কবির যে কথাবার্তা হইতেছিল সেইটাই মনে জাগিতেছিল। তাই মনে মনে ইচ্ছা করিলেন ধর্মনামধারী অন্ধতার প্রাণান্তিক ফাঁস থেকে ভারতবর্ষ যেন মুক্তি পায়। যে পাতা বাহির হইল তাহার কবিতার দ্বিতীয়াংশর অর্থ হইতেছে— 'স্বর্গদ্বার যাবে খুলে, আর সেইসঙ্গে খুলবে আমাদের সমস্ত জটিল ব্যাপারের গ্রন্থি, এও কি হবে সম্ভব। অহংকৃত ধার্মিকনামধারীদের জন্যে যদি তা বন্ধই থাকে তবে ভরসা রেখো মনে ঈশ্বরের নিমিত্তে তা যাবে খুলে।' "বন্ধুরা প্রশ্নের সঙ্গে উত্তরের সংগতি দেখে বিস্মিত হলেন।" কবি লিখিতেছেন, "এই সমাধির পাশে বসে আমার মনের মধ্যে একটা চমক এসে পৌঁছল, এখানকার এই বসন্তপ্রভাতে সূর্যের আলোতে দূরকালের বসন্তদিন থেকে কবির হাস্যোজ্জ্বল চোখের সংকেত। মনে হল আমরা দুজনে একই পানশালার বন্ধু, অনেকবার নানা রসের অনেক পেয়ালা ভর্তি করেছি। আমিও তো কতবার দেখেছি আচারনিষ্ঠ ধার্মিকদের কুটিল ভ্রুকুটি। তাদের বচনজালে আমাকে বাঁধতে পারে নি ; আমি পলাতক, ছুটি নিয়েছি অবাধপ্রবাহিত আনন্দের হাওয়ায়। নিশ্চিত মনে হল আজ কত-শত বৎসর পরে জীবনমৃত্যুর ব্যবধান পেরিয়ে এই কবরের পাশে এমন একজন মুসাফির এসেছে যে মানুষ হাফেজের চিরকালের জানা লোক।"[১]

১ পারস্যে, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২, পৃ. ৪৬১।

নূতন বাগানবাড়িতে আসিয়া কবি পারস্যের গুল-বেহস্তের শোভা ও সৌন্দর্য উপভোগ করিতেছেন; এইখানে পারসিক সংগীত শুনিবার সুবিধা হইল; এখানকার সংগীত সম্বন্ধে বলিতেছেন, যে সংগীত কাব্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন নয়।

সাত দিন শিরাজে থাকিয়া ২২ এপ্রিল (১৯৩২) কবি সঙ্গীদের সহিত ইস্‌পাহান[১] যাত্রা করিলেন। পথে ইরানের প্রাচীন রাজধানী পারসিপুরী (Persipolis), দরিয়ুসের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ; ধ্বংসকর্তা দিগ্বিজয়ী মসিদানরাজ অলিকসন্দর। শোনা যায় মত্ত অবস্থায় তিনি এই প্রাসাদে অগ্নিসংযোগের আদেশ দেন। Herzfeldt নামে একজন জার্মান প্রত্নতত্ত্ববিদ, এক যুবক জার্মান সহকারীর সাথে এখানে বহুকাল আছেন। জারমেনিতে হেরজফেল্‌ট্‌ রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন; তাই কবির সহিত সাক্ষাতের জন্য তাঁহার অত্যন্ত ঔৎসুক্য। পার্সিপোলিসের বিরাট ধ্বংসাবশেষ কবির পক্ষে সমস্ত হাঁটিয়া দেখা সম্ভব নহে। তাই কয়েকটি দর্শনীয় জিনিস দেখাইয়া তাঁহাকে আর্তখোহর্যের (Artaxerexes) পুঁথিশালায় লইয়া যাওয়া হইল। এই স্থানটি হেরজফেলট্‌ ভগ্নপাথর জড় করিয়া পূর্বরূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইখানে কবির সহিত তাঁহার নানা বিষয়ে আলোচনা চলিল: পারসিক স্থাপত্যে নারীচিত্রের একান্ত অভাব কেন— এই প্রশ্ন কবি করেন। অধ্যাপক বলেন প্রাচীন পারস্যে অবরোধ প্রথা অত্যন্ত কঠোর ছিল, বোধ হয় সেইজন্যই শিল্পকলায় নারীর রূপ দেখা যায় না। বহুক্ষণ ধরিয়া নানা খুঁটিনাটি বিষয়ে আলোচনা চলে। জানিবার বুঝিবার কী পিপাসা![২]

মধ্যাহ্নভোজন হইল সাদাতাবাদ নামে এক গ্রামে— ছোটো জলধারার পাশে ঘাসের উপর কার্পেট বিছাইয়া সকলে বসিলেন। পথে শাহরেজা নামে এক গ্রামে লোকে কবির মোটর থামাইয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিল। ভাবিলে আশ্চর্য বোধ হয় সেদেশের লোকে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কী জানে! কেবল তিনি ভারতীয় কবি— সেইজন্যই তাহাদের কাছে তাঁহার সম্মান। অভিনন্দনটির অনুবাদের কয়েক ছত্র উঠাইয়া দিলাম—

"ভারতের কারাভানে শর্করা আসে চিরদিন, কিন্তু এবার রহিয়াছে কল্পনার সৌরভ। ও কারাভান, ক্ষণেক দাঁড়াও, তৃষ্ণার্ত হৃদয়সকল তোমার পিছনে চলিয়াছে,— আলোকের পশ্চাতে প্রজাপতির মতো; মলয় পবন, সাদির সমাধিস্থলে স্নিগ্ধ স্পর্শে ও মৃদুশব্দে বহিয়া যাও, কবরের ভিতর সাদি পুনর্জীবিত হইবেন। ঠাকুর! তিনি অপূর্ব, তিনি জ্ঞানী দার্শনিক ও ত্রিকালজ্ঞ; মহান কুরুষের দেশে তাঁহার আগমন শুভ ও সৌভাগ্যযুক্ত হউক, যে দেশে কুরুষের এক সন্তান এখন সৌভাগ্যক্রমে রাজমুকুট ধারণ করিতেছেন।"[৩]

২৩ এপ্রিল মধ্যাহ্নে কবি ও যাত্রীদল ইস্‌পাহানে পৌঁছিলেন। বাগ্‌-ই-জেরেশক্‌ নামক উদ্যানবাটিকার দ্বারে ইস্‌পাহানের গবর্নর কবিকে অভ্যর্থনা করিলেন। ছয় দিন ইস্‌পাহানে অতিবাহিত হয়। নানা লোকের সহিত আলাপ আলোচনা, নানা প্রতিষ্ঠানের অভিনন্দন সংবর্ধনার বন্যা চলিল। কবি ইস্‌পাহানের বিখ্যাত মস্‌জিদ[৪] প্রাসাদ প্রভৃতি তন্নতন্ন করিয়া দেখিতেছেন। একদিন আর্মানীয় গির্জা দেখিতে যান, সেখানেও কবিকে ভক্তেরা

১ ইস্‌পাহান (Ishpahan, Ispahan); প্রাচীন অস্‌পদান বা অশ্বস্থান।

২ পার্সিপোলিস সম্বন্ধে কেদারনাথ বিস্তৃতভাবে লিখিয়াছেন, প্রবাসী ১৩৩৯ কার্তিক।

৩ প্রবাসী ১৩৩৯ অগ্রহায়ণ; পৃ. ২৯৪।

৪ মস্‌জিদ্‌-ই-শাহ— ১৬ শতকের শেষভাগে শাহ আব্বাস কর্তৃক নির্মিত।

বিশেষভাবে সম্মান দেখাইল। ২৭ এপ্রিল স্থানীয় ম্যুনিসিপালিটি কবিকে ও শ্রীদিন্‌শা ইরানীকে সংবর্ধিত করেন। দিন্‌শা ইরানীর পারস্যপ্রীতি কবিকে যে পারস্যভ্রমণে উৎসাহিত করিয়াছিল তজ্জন্য তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

কবি ইহার জবাবে বলিলেন, "আমি য়ুরোপে ও প্রাচ্যের বহু দেশ হইতে নিমন্ত্রণ পাইয়াছি; সকলেই আমাকে কবি ও চিন্তাশীল মনে করিয়া আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু আমি আশা করি নাই যে কোনো স্বাধীন দেশের রাজা নিমন্ত্রণ করিবেন। পুরাকালে গুণীর সমাদর ছিল রাজসভায়; এখন রাষ্ট্রনীতিজ্ঞরা এইসব কৃষ্টির ধার ধারেন না। সুতরাং শ্রীযুক্ত দিন্‌শা ইরানী যখন আমাকে জানাইলেন যে পারস্যের শাহ্ আমাকে নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাইতেছেন তখন আমি খুবই বিস্মিত হইয়াছিলাম। ইহা প্রাচ্যের রীতির উপযুক্তই হইয়াছে।" ইস্‌পাহানের সংগীত শুনিবার, সেখানকার কার্পেট-শিল্প দেখিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল; কোনো জিনিস কবির কাছে হেয় নয়।

২৯ এপ্রিল ইস্‌পাহান থেকে কবি তেহেরান যাত্রা করিলেন। কেদারনাথ লিখিতেছেন, "কবির অভ্যর্থনা সংবর্ধনা লোকজনের দেখাশুনা আলাপ-পরিচয় ইত্যাদি এবার যথার্থ রাজসিকভাবে আরম্ভ হইল। বুশীরে, শিরাজে ও ইস্‌পাহানে এসব ব্যাপারের যা পরিচয় ও অভিজ্ঞতা হয়েছিল, এখন দেখা গেল আসল ব্যাপারের কাছে সেটা যৎসামান্য মাত্র।"

তেহেরানে কবি ছিলেন দুই সপ্তাহ। এই সময়ে তাঁহার দেখাশুনা করার জন্য সহায় ও কর্ণধার ছিলেন মহামান্য ফেরুঘি— বৈদেশিক মন্ত্রী, শিক্ষাসচিব কৈখস্‌রো শাহরোখ ও শ্রীযুক্ত ফেরুঘি— মন্ত্রীর ভ্রাতা ও সাহিত্যিক।

দুই সপ্তাহে তেহেরানে আঠারোটি অনুষ্ঠান হয়; সকলগুলির বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। ২ মে কবির সহিত পারস্যরাজের সাক্ষাৎ হয়। মহামহিম রেজা শাহ পহ্লবী[১] প্রায় এক ঘণ্টা কবির সঙ্গে রাজপ্রাসাদের খাসকামরায় আলাপ করেন। কবি শাহকে তাঁহার কতকগুলি বই ও সেই সঙ্গে একটি বাঙলা কবিতা ইংরেজি অনুবাদসহ উপহার দেন। কবিতাটি এই—

আমার হৃদয়ে অতীত স্মৃতির
সোনার প্রদীপ এ যে,
মরিচা ধরানো কালের পরশ
বাঁচায়ে রেখেছি মেজে।
তোমরা জ্বেলেচ নূতন কালের
উদার প্রাণের আলো;
এসেচি, হে ভাই, আমার প্রদীপে
তোমার শিখাটি জ্বালো।

১ Riza Sha Pahlavi (1877-1944)— Chosen Shah of Iran by National Assembly (Majlis) after deposition of Ahmad Shah (1925). During the World War II, he had to abdicate in favour of Md. Riza-Pahlavi।

৫ মে কবিকে নাগরিকদের তরফ হইতে সংবর্ধনা করা হয়। কবি তাহার উত্তরে যাহা ইংরেজিতে বলেন, দোভাষী পারসিকে তাহা তর্জমা করিয়া দেন। কবি বলেন, "প্রকৃতির শক্তিভাণ্ডারের দ্বার য়ুরোপ উদ্‌ঘাটন করে প্রাণযাত্রাকে নানাদিক থেকে ঐশ্বর্যশালী করে তুলেচে। এই শক্তিপ্রভাবে আজকের দিনে তারা দিগ্বিজয়ী। আমরা প্রাচ্য জাতিরা বস্তুজগতে এই শক্তিসাধনায় শৈথিল্য করেচি, তাহার ফলে আমাদের দুর্বলতা সমাজের সকল বিভাগেই ব্যাপ্ত। এই সাধনার দীক্ষা য়ুরোপের কাছ থেকে আমাদের নিতান্তই নেওয়া চাই।

"এশিয়াকে আজ ভার নিতে হবে মানুষের মধ্যে এই দেবত্বকে সম্পূর্ণ করে তুলতে, কর্মশক্তিকে ও ধর্মশক্তিকে এক করে দিয়ে।

"পারস্যে আজ নূতন করে জাতি-রচনার কাজ আরম্ভ হয়েচে। আমার সৌভাগ্য এই যে, এই নবসৃষ্টির যুগে অতিথিরূপে আমি পারস্যে উপস্থিত, আমি আশা করে এসেচি এখানে সৃষ্টির যে সংকল্পন দেখব তার মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার পূর্ণ মিলনের রূপ আছে।

"অতীতকালে একদা এশিয়ায় সৃষ্টির যুগ প্রবল শক্তিতে দেখা দিয়েছিল। তখন পারস্য ভারত চীন নিজ নিজ জ্যোতিতে দীপ্যমান হয়ে একটি সম্মিলিত মহাদেশীয় সভ্যতার বিস্তার করেছিল। তখন এশিয়ার মহতী বাণীর উদ্ভব হয়েছিল এবং মহতী কীর্তির। তখন মাঝে মাঝে এশিয়ার চিত্তে যেন কোটালের বান ডেকে এসেচে, তখন তার বিদ্যার ঐশ্বর্য বহু বাধা অতিক্রম করে বহু বহুদূর দেশে পরিব্যাপ্ত হয়েচে।

"তারপর এল দুর্দিন · · সেই প্রাচীন যুগের গৌরবকাহিনীর স্বপ্নমাত্র নিয়ে অতি দীর্ঘকাল আমাদের দীনভাবে কাটল। . আজ এই মহাদেশের নাড়ীতে নাড়ীতে পুনর্যৌবনের বেগ যেন আবার স্পন্দিত হয়ে উঠেচে। ভারতবর্ষের কবিকে আজ ইরান যে আহ্বান করেচে এ একটি সুলক্ষণ ; এতে প্রমাণ হয় যে এশিয়ার আত্মপ্রকাশের দায়িত্ববোধ দেশের সীমানাকে অতিক্রম করে দূরে বিস্তীর্ণ হচ্চে।

"এ কথা বলা বাহুল্য যে, এশিয়ার প্রত্যেক দেশ আপন শক্তি প্রকৃতি ও প্রয়োজন অনুসারে আপন ঐতিহাসিক সমস্যা স্বয়ং সমাধান করবে, কিন্তু আপন উন্নতির পথে তারা প্রত্যেকে যে প্রদীপ নিয়ে চলবে তার আলোক পরস্পর সম্মিলিত হয়ে জ্ঞানজ্যোতির সমবায় সমাধান করবে। · · তাই আজ আমি এই কামনা ঘোষণা করি যে আমাদের মধ্যে সাধনার মিলন ঘটুক। এবং সেই মিলনে প্রাচ্য মহাদেশে মহতী শক্তিতে জেগে উঠুক তার সাহিত্য, তার কলা, তার নূতন নিরাময় সমাজনীতি, তার অন্ধ-সংস্কার-মুক্ত বিশুদ্ধ ধর্মবুদ্ধি, তার আত্মশক্তিতে অবসাদহীন শ্রদ্ধা।"[১]

'৬ মে কবির জন্মদিন উপলক্ষ্যে ইরানরাজের আদেশে বাগ্‌ নেয়েরেদ্দৌলেহ্‌তে সমস্ত দিন উৎসব হয়। সমস্ত দিন লোকজন খাওয়ানো, কয়েক হাজার লোকের অভিবাদন ও অভিনন্দন গ্রহণ ও দেশবিদেশ থেকে টেলিগ্রাম রাশি পাওয়া, প্রাসাদের সমস্ত ফুল দিয়ে সাজানো এবং বহুলোকের অভিনন্দনপত্র ফুলের ডালি এবং অসংখ্য উপহার গ্রহণে সমস্ত দিন সকলের অবিশ্রান্ত খাটুনি চলে' (কেদারনাথ)। পারস্যরাজ কবিকে বিজ্ঞান সাহিত্যের প্রথম শ্রেণীর রাজকীয় পদক ও সনন্দ দেন। জন্মদিনে কবি ইরানের নামে একটি কবিতা লিখিয়া দেন ; 'পরিশেষে' এই কবিতাটি আছে— "ইরান, তোমার যত বুলবুল, তোমার কাননে আছে যত ফুল" ইত্যাদি।

দিনের পর দিন সংবর্ধনা, অভিনন্দন চলিতেছে। আফগান মিশরীয় বৃটিশ রাজদূতাবাসে কবির সংবর্ধনা হইল।

১ বিচিত্রা ১৩৩৯।

১৫ মে কবি তেহেরান ত্যাগ করিলেন। ইহার পূর্বেই কবি ইরানরাজের নিকট হইতে সংবাদ পাইলেন যে বিশ্বভারতীর জন্য শাহ্ এক পারসিক অধ্যাপক পাঠাইবেন।

ইতিমধ্যে একদিন ইরাকের রাজদূত আসিয়া কবিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে কবি তেহেরান হইতে মোটরযোগে বোগদাদ যাত্রা করিলেন।

তেহেরান হইতে বোগদাদের পথ পাহাড় মরুভূমির মধ্য দিয়া চলিয়াছে; পথ দীর্ঘ ও বন্ধুর। প্রথম দিন কবি ও তাঁহার সঙ্গীরা কাজবিন নামক একটি শহরে রাত্রিযাপন করিলেন। পরদিন ভোরে হামাদান অভিমুখে যাত্রা করিলেন। হামাদানে বিশ্রাম করিয়া রওয়ানা হইলেন কির্মানশার[১] দিকে। পথে দরায়ুসের বিখ্যাত শিলালিপি বেহিস্থান দেখিলেন; অদূরে তাকিবুস্তানের পর্বতগাত্রে সাসনীয় যুগের খোদাই চিত্র দেখিবার সুযোগও হইল।

কির্মানশায় রাত্রি কাটাইয়া সকালে যাত্রা করিলেন কাস্‌রিশিরিনের দিকে; এই স্থানে পারস্যের সীমানা শেষ। তারপর কানিকিন, ইরাকের রেলস্টেশন। পারসিক সভ্যতার এলাকা হইতে আরবী সভ্যতার সীমানায় প্রবেশ করিলেন।

ইরাকরাজ্যের সীমানায় কবিকে যথোচিত সমাদর করিবার জন্য রাজকর্মচারীরা ছিলেন। এখান হইতে রেলপথে বোগদাদ যাইতে হয়।

বোগদাদ স্টেশনে খুবই ভিড় কবিকে দেখিবার জন্য। কবি উঠিলেন গিয়া একটি হোটেলে। রাজা ফৈজল তখন জীবিত; কবিকে তিনি একদিন নিমন্ত্রণ করেন। ভারতে হিন্দু-মুসলমানে যে দ্বন্দ্ব বেধেছে সে-সম্বন্ধে রাজা বলিলেন, "যখন কোনো দেশে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্বোধন আসে, তখন প্রথম অবস্থায় তারা নিজেদের বিশিষ্টতা সম্বন্ধে অত্যন্ত বেশি সচেতন হয়ে ওঠে এবং সেইটেকে রক্ষা করবার জন্য তাদের চেষ্টা প্রবল হয়। এই আকস্মিক বেগটা কমে গেলে মন আবার সহজ হয়ে আসে।"

রাজা ফৈজলের সাদাসিধা ব্যবহার, অনাড়ম্বর নিরহংকার সৌজন্য কবিকে খুবই প্রীত করিয়াছিল।

বোগদাদে নানাবিধ আদর-আপ্যায়ন চলিল। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পৌরজনপদের অভ্যর্থনা। কবি তাহার যে জবাব দেন 'বিচিত্রা'য় তাহার অনুবাদ প্রকাশিত হয় (১৩৩৯ চৈত্র, পৃ. ৩০৫)। ভারতের ধর্মগত বিদ্বেষের ব্যাপার কবির মনকে পীড়িত করিতেছে; এই স্বাধীন দেশে আসিয়া বার বার ভারতের দুর্গতির কথা মনে পড়িতেছে। তাই কবি উত্তরে বলিলেন, "আমার প্রাণের গোপন কথাটি আজ আপনাদের বলি, যে গোপন উদ্দেশ্য গভীরতম অন্তরে পোষণ করে আজ আপনাদের দেশে বেড়াতে এসেচি। আমার আহ্বান এই— আসুন আমরা পরস্পর মিলিত হয়ে ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব বিদ্বেষের মূল ছিন্ন করে দিই, মানুষে মানুষে সহজ বিশ্বাসের নিত্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করি।· ·

"আজ আরব সাগর পার হয়ে আসুক আপনাদের বাণী বিশ্বজনীন আদর্শ নিয়ে: আপনাদের পুরোহিতেরা আসুন তাঁদের বিশ্বাসের আলো নিয়ে; জাতিভেদ, সম্প্রদায়ভেদ ও ধর্মভেদ প্রেমের মধ্যে অতিক্রম করে সকল শ্রেণীর মানুষকে আজ সখ্যের সংযোগিতায় মিলিয়ে দিন তাঁরা।· · আপনাদের সমধর্মী ভারতবাসীরা আজ প্রতীক্ষা করে আছে আপনাদের কাছে থেকেই নূতন বাণী শুনবে, বীর্যের বাণী, মিলনের বাণী, সকল ধর্মকে কল্যাণের যোগে শ্রদ্ধা করবার মানবোচিত শুভবুদ্ধির বাণী।"

১ Kermanshah হইতে ২২ মাইল পূর্বে বেহিস্তানের পর্বতগাত্রে হংখামনায় বংশের দরায়ুস (৬ষ্ঠ খ্রীষ্টশতক) এর তিনটি ভাষায় লিখিত শিলালেখ।

কবির যৌবনের স্বপ্ন "ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন"— বোগদাদে থাকিতে থাকিতে, সেই বেদুইনদের শিবির একদিন দেখিতে গেলেন। বেদুইন-সর্দারের তাঁবু মরুভূমির মধ্যে। কবি সেখানে গেলেন, তাহাদের রণনৃত্য দেখিলেন। বেদুইন-সর্দার বলিলেন, "ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানে যে বিরোধ চলছে এ পাপের মূল রয়েছে সেখানকার শিক্ষিত লোকদের মনে। এখানে অল্পকাল পূর্বে ভারতবর্ষ থেকে কোনো-কোনো শিক্ষিত মুসলমান গিয়ে ইসলামের নামে হিংস্র ভেদবুদ্ধি প্রচার করবার চেষ্টা করেছিলেন।" তিনি বলিলেন, "আমি তাঁদের ভোজের নিমন্ত্রণে যেতে অস্বীকার করেছিলেম, অন্তত আরবদেশে তাঁরা শ্রদ্ধা পাননি।" সমসাময়িক ইতিহাস পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন আরব-সর্দার কোন্ আন্দোলনের উল্লেখ করিতেছেন।

কবির ইরান-ইরাক ভ্রমণের পালা শেষ হইল; প্রাচ্যের দুইটি স্বাধীন মুসলমান রাজ্য এবার দেখিলেন।

বোগদাদ হইতে ডাচ্ এরোপ্লেনে ফিরিলেন। প্রতিমা দেবী সঙ্গে আসিলেন; অমিয়চন্দ্র ও কেদারনাথ ইরাক দেখিবার জন্য থাকিয়া গেলেন।[১]

পরিশেষের পর পুনশ্চ

ইরান-ইরাক ভ্রমণপর্ব মাত্র এক মাস বাইশ দিনের (১১ এপ্রিল - ৩ জুন ১৯৩২)। এরোপ্লেন যোগে কবি ও প্রতিমা দেবী কলিকাতায় ফিরিলেন; কয়েকদিন খড়দহের বাসাবাটীতে থাকিয়া জুনের মাঝামাঝি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন।

আমরা দেখিয়াছি যে, পারস্য বা ইরান যাত্রার পূর্বে কবি 'বিচিত্রিতা' ও 'পরিশেষ'-এর অনেকগুলি কবিতা লিখিয়াছিলেন। ইরান সফরকালে তিনটি মাত্র কবিতা লিখিতে দেখি— একটি ইরানের উদ্দেশ্যে, অপর দুইটি তাঁহার জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রবাস-সঙ্গী অমিয়চন্দ্র ও কেদারনাথের উদ্দেশ্যে। প্রায় দুই মাস পরে কবি তাঁহার হারানো কাব্যসূত্র ফিরিয়া পাইলেন। পহেলা আষাঢ় (১৩৩৯।১৫ জুন) হইতে আশ্বিন মাসের প্রথম পর্যন্ত তিন মাস নূতন কবিতা নানা ধারায় প্রবাহিত হইতে থাকে। এই কবিতারাজি বিচিত্রিতা পরিশেষ বীথিকা পুনশ্চ কাব্যর মধ্যে ছড়াইয়া আছে।

কিন্তু জীবনটা কেবল কাব্য রচনা নয়; নিষ্ঠুর সংসার তাহার পাওনা-গণ্ডা আদায় হইতে কাহাকেও রেহাই দেয় না। কিছুকাল হইতে কবির অর্থসংকট চলিতেছে। পৃথিবীব্যাপী বাজার মন্দা তো সকলকেই স্পর্শ করিতেছে; তাহার উপর গত কয়েক বৎসর উপর্যুপরি বন্যা ও অজন্মায় জমিদারির প্রজারা বিপন্ন। প্রাপ্য খাজনা আদায় হয়

১ কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'পারস্যভ্রমণ' (সচিত্র) প্রবাসীতে ১৩৩৯, শ্রাবণ - চৈত্রে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'পারস্য সম্বন্ধে ভ্রমণকাহিনী' বিচিত্রা মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয় (১৩৩৯ শ্রাবণ - ১৩৪০ বৈশাখ)। 'পারস্যযাত্রা' নামক প্রথম অংশ প্রবাসীতে বাহির হয় (১৩৩৯ আষাঢ়)। ১৩৪৩ শ্রাবণ মাসে 'জাপানযাত্রী'র (১৩২৬) সঙ্গে পারস্যভ্রমণ জুড়িয়া দিয়া একটি গ্রন্থ 'জাপানে-পারস্যে' নামে মুদ্রিত হয় (১৯৩৬ অগস্ট)। আরও দশ বৎসর পরে (১৩৫৩ আশ্বিন) রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বাবিংশ খণ্ডে 'পারস্যে' গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত হইল। কিন্তু পৃথক গ্রন্থ এখনো অমুদ্রিত। রবীন্দ্র-রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয় অংশে বহু মূল্যবান তথ্য আছে। খণ্ডগ্রন্থ ও রচনাবলীর পাঠেরও ভেদ আছে। 'পারস্যে' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ যে কেবল ভ্রমণকাহিনী বিবৃত করিয়াছেন তাহা নহে, পারস্যের ইতিহাসের বহু তথ্য ও তত্ত্ব পাকা পণ্ডিতের মতো ব্যক্ত করিয়াছেন; কোনো দেশ ভ্রমণের এমন ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ রচনা কবির আর নাই।

না, অথচ সরকারী রাজস্ব দিতে হয়। শরীক ও আত্মীয়স্বজনের বরাদ্দ টাকার ব্যবস্থা সাধ্যমত করেন; সময়মত এই অর্থ না-পাইলে আত্মীয়রা বিরক্ত হন— অশান্তি বাড়ে। তার পর পারস্য হইতে ফিরিয়া শোনেন তাঁহার একমাত্র দৌহিত্র নীতু জারমেনিতে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত। বৎসরখানেক পূর্বে নীতুকে জারমেনিতে মুদ্রাযন্ত্রের কার্য শিখিবার জন্য পাঠানো হয়; দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানে তাহার শরীর ভাঙিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা মীরার সাংসারিক জীবন সুখের হয় নাই; তিনি পিতার আশ্রয়ে পুত্র-কন্যা লইয়া থাকিতেন। কবি তাঁহার জন্য পৃথক গৃহাদি ও মাসোহারার ব্যবস্থা করিয়া দেন।

নীতুর ব্যাধি এমনি সংকটপূর্ণ হইল যে, অবশেষে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কন্যাকে ধীরেন্দ্রমোহন সেনের সহিত জারমেনিতে পাঠাইয়া দিলেন— ও সঙ্গে সঙ্গে বিলাতে এন্‌ড্রুজকেও পত্র লিখিলেন। পত্র পাইয়াই এন্‌ড্রুজ জারমেনি যাত্রা করিলেন ও মীরার সহিত জেনোয়ায় মিলিত হইলেন। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক শোক দুঃখ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই মৌন। তবে কাব্যের মধ্যে তাহার প্রকাশ দেখা যায়। এই সময়ে রচিত কয়েকটি কবিতায় আসন্ন দুঃখের ছায়া তাঁহার শত চেষ্টা সত্ত্বেও প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে নাই।

'ধাবমান' কবিতায়[১] (২৪ জুন) বলেন—

> 'যেয়ো না, যেয়ো না' বলি কারে ডাকে ব্যর্থ এ ক্রন্দন।...
> ওরে শোকাতুর, শেষে
> শোকের বুদ্‌বুদ তোর অশোক-সমুদ্রে যাবে ভেসে।

'মৃত্যুঞ্জয়' (১ জুলাই) ও 'যাত্রী' (২ জুলাই)-তে এই দুঃখেরই আভাস। তবে এই পর্বের সকল কবিতার উপর যে এই বিষাদ ছায়া পড়িয়াছে, তাহা ভাবিবার কোনো কারণ নাই। 'বিস্ময়' (২৬ জুন) ও 'অগোচর' (২৪ জুন) কবির বিশ্বব্যাপী সমীক্ষণতার পরিচায়ক। এই শ্রেণীর ভাবনা তাঁহার রচনায় নূতন নহে— ভঙ্গী নবীন। মনের বিচিত্র সুর ও রূপের প্রকাশ হইয়াছে স্বল্পকালের মধ্যে।

শ্রাবণ (১৩৩৯) মাসে 'মানবপুত্র' নামে একটি গদ্যকবিতা লিখিতে দেখি। ইহা যীশু খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যে রচিত। এভাবে খ্রীষ্টের মহত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের খুব কম কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে। বহু বৎসর পূর্বে 'বলাকা'পর্বে 'বিচার' (২৮ ডিসেম্বর ১৯১৫) কবিতা লিখিত হয়। 'মানবপুত্র' (পুনশ্চ)[২] লিখিবার অব্যবহিত কারণ আছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। এন্‌ড্রুজের *What I owe to Christ* নামে গ্রন্থখানি রবীন্দ্রনাথ পাঠ করিয়া (২ অগস্ট) তাঁহার মন্তব্য লিখিয়া পাঠান। এই গ্রন্থখানি পাঠান্তে কবির মনে যে ভাবোদয় হয় তাহাই এই গদ্যকবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে—

> মৃত্যুর পাত্রে খৃষ্ট যেদিন মৃত্যুহীন প্রাণ উৎসর্গ করলেন।
> রবাহুত অনাহুতের জন্য
> তার পর কেটে গেছে বহু শত বৎসর।

১ ধাবমান (৬ আষাঢ় ১৩৩৯), পরিশেষ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫, পৃ. ২৩৫-৩৭। মৃত্যুঞ্জয় (১৭ আষাঢ় ১৩৩৯), পৃ. ২৪৮-৪৯। 'যাত্রী' (১৮ আষাঢ় ১৩৩৯), পৃ. ২৫১-৫২। বিস্ময় (১২ আষাঢ়), পৃ. ২৪২। অগোচর (১৪ আষাঢ়), পৃ. ২৪৩।

২ মানবপুত্র [শ্রাবণ ১৩৩৯], পুনশ্চ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৬, পৃ. ১২৪। রবীন্দ্রনাথ এন্‌ড্রুজের গ্রন্থ সম্বন্ধে যাহা লেখেন, তাহা **Visva-Bharati News. Vol. I. p. 81 (1933 March)** সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। *What I owe to Christ* বাংলায় 'ঋণাঞ্জলি' নামে নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত হইয়াছে (১৯৬০)।

প্রসঙ্গত বলি, ১৯১০ সালের বড়দিনে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন-মন্দিরে সর্বপ্রথম খ্রীষ্ট সম্বন্ধে ভাষণ দান করেন ; তদবধি খ্রীষ্টদিন পালিত হইয়া আসিতেছে।

কবির ব্যক্তিগত জীবনের কথায় ফিরিয়া আসা যাউক। আমাদের আলোচ্যপর্বে রবীন্দ্রনাথকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে টানিবার চেষ্টা চলিতেছিল। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র অমর গ্রন্থকার দীনেশচন্দ্র সেন বহু বৎসর পরে 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' পদ হইতে অবসর গ্রহণ করায় ঐ পদ কাহার উপর বর্তাইবে তাহা লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা চলে দীর্ঘদিন। বহু দল-উপদলে প্রার্থী। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের কয়েকজন সদস্য রবীন্দ্রনাথকে এই পদ দানের প্রস্তাব লইয়া আসেন। কবির তখন দারুণ অর্থকষ্ট চলিতেছে। সিণ্ডিকেটে স্থির হয় যে, দুই বৎসরের জন্য কবিকে অধ্যাপক পদের জন্য পাঁচ হাজার টাকা হিসাবে দেওয়া হইবে। ক্লাস পড়াইবার কোনো শর্ত রহিল না, কেবল কয়েকটি বক্তৃতা দিবেন। এই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কমলা বক্তৃতা'[১] দিবার জন্যও তাঁহাকে আহ্বান করা হইল। রবীন্দ্রনাথকে 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' পদে নিয়োগ করা স্থির হইলে, প্রথানুসারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বঙ্গীয় সরকারের নিকট হইতে মঞ্জুরী আনিতে হয়।

শান্তিনিকেতন[২] হইতে কবি ৫ অগস্ট (১৯৩২) কলিকাতায় গেলেন ; সেখানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কবি-সংবর্ধনার আয়োজন হইয়াছে। ১৯৩১-এর পৌষ মাসে রবীন্দ্রজয়ন্তীপর্বে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে অনুষ্ঠান করিবার কথা ছিল, তাহা গান্ধীজির আকস্মিক অন্তরীণাবদ্ধ হইবার জন্য পরিত্যক্ত হইয়াছিল ; সেই সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হইল ৬ অগস্ট।

তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলর ছিলেন সার্ হাসান সুরবার্দি[৩] ; তিনি তাঁহার অভিনন্দন-প্রসঙ্গে কবির পারস্যভ্রমণ সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। সৈয়দ আবু য়ুসুফ আহমদ পার্সি কবিতায় কবি-প্রশস্তি পাঠ করেন। মহাসমারোহে সিনেট-হাউসে অভিনন্দন হইয়া গেল।

রবীন্দ্রনাথকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করিতে দেখিয়া তাঁহার গুণগ্রাহীরা আনন্দিত হইলেন ; কিন্তু সকলে নয়। যে রবীন্দ্রনাথ চিরজীবন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার সমালোচনা করিয়া আসিয়াছেন, তিনিই সত্তর বৎসর বয়সের পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরী গ্রহণ করিলেন ! আমরা পূর্বেই বলিয়াছি অর্থসংকটে কবির এই আপোষনীতি গ্রহণ ছাড়া উপায় ছিল না।

যেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি-সংবর্ধনা হইল, সেইদিন কবি 'দুর্ভাগিনী' কবিতা (বীথিকা) লেখেন। কবিতাটি পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে যে, এইটি তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার কথা স্মরণ করিয়া লিখিত। কবিতাটি পড়িলে মনে হয়

১ কমলা লেকচারশীপ। সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মৃতা কন্যা কমলার নামে তিনি ৪০,০০০৲ টাকা দান করেন। ১৯২৪ সাল হইতে প্রবর্তিত হয়। রবীন্দ্রনাথকে ইতিপূর্বে 'জগত্তারিণী পদক' প্রথম বৎসর ১৯২১ সালে প্রদত্ত হয়।

২ শান্তিনিকেতনে ৪ অগস্ট ১৯৩২ (১৯ শ্রাবণ ১৩৩৯) 'দানমহিমা' কবিতা লেখেন ; বীথিকা।

৩ কবিপ্রশস্তি। রবীন্দ্রজয়ন্তী ছাত্র-ছাত্রী উৎসব-পরিষদ। উৎসব-পরিষদ পক্ষে প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত। ১৩৩৮। পৃ. ৮৫। ভাইস-চান্সেলর হাসান সুরবার্দি এই পুস্তিকার ভূমিকা লিখিয়া দেন— "আমাদের জাতীয় কবির সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুবিধ যোগাযোগের কথা আমার স্বভাবতই স্মরণ হইতেছে। বহুদিন তিনি সৌজন্যপূর্বক এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র প্রস্তুত ও গবেষণার বিচারের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিধ ভারতবর্ষীয় ভাষার উচ্চতর শিক্ষা প্রবর্তনে স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কবির ঐকান্তিক সহায়তালাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৯৩২ সালে তিনি একটি রীডারশীপ বক্তৃতা প্রদানের ভারও গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

মীরার একমাত্র পুত্র যাহার শুশ্রূষার জন্য তিনি জারমেনিতে গিয়াছিলেন, তাহার মৃত্যু হইয়াছে অথবা সুনিশ্চিত জানিয়াই যেন এইটি লিখিত হয়—

এ কী দুঃখভার,
কী বিপুল বিষাদের স্তম্ভিত নীরন্ধ্র অন্ধকার
ব্যাপ্ত করে আছে তব সমস্ত জগৎ,
তব ভূত ভবিষ্যৎ। . .
খুঁজিছ কাছের বিশ্ব মুহূর্তে যা চলে গেল দূরে :
খুঁজিছ বুকের ধন, সে তো আর নেই,
বুকের পাথর হল মুহূর্তেই। . .
অশ্রুহীন তোমার নয়নে
অবিশ্রাম প্রশ্ন জাগে যেন—
কেন, ওগো কেন!

সাতই অগস্ট (২২ শ্রাবণ ১৩৩৯) জারমেনিতে নীতুর মৃত্যুর সংবাদ পরদিন কবির কাছে আসে— তখন তিনি বরাহনগরে প্রশান্তচন্দ্রদের বাড়িতে আছেন। সেইদিন 'মাতা' (বীথিকা) কবিতাটি লিখিলেন। নারীহৃদয়ের বাৎসল্যকে কবি ভাষা দিয়াছেন অপরূপ ভঙ্গীতে। কিন্তু মনের এই দুঃখের ভাব দেখিয়া যেন নিজেই সংকুচিত; শান্তিনিকেতনে ফিরিবার কয়েকদিন পরে 'বিশ্বশোক' (১১ ভাদ্র। পুনশ্চ) গদ্যকবিতায় লিখিতেছেন—

দুঃখের দিনে লেখনীকে বলি— লজ্জা দিয়ো না।
সকলের নয় যে আঘাত ধোরো না সবার চোখে।
ঢেকো না মুখ অন্ধকারে, রেখো না দ্বারে আগল দিয়ে।
জ্বালো সকল রঙের উজ্জ্বল বাতি,
কৃপণ হোয়ো না।

পরদিন ২৯ অগস্ট মীরা দেবীকে যে পত্রখানি লেখেন তাহাতে স্বীয় জীবনের শোকাঘাতের অভিজ্ঞতার কথা আছে।—

"শমী যে রাত্রে চলে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়ছে তার লক্ষণ নেই। মন বলল কম পড়েনি— সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তার মধ্যে। সমস্তর জন্য আমার কাজও বাকি রইল। যতদিন আছি সেই কাজের ধারা চলতে থাকবে। সাহস যেন থাকে, অবসাদ যেন না আসে, কোনোখানে কোনো সূত্র যেন ছিন্ন হয়ে না যায়। যা ঘটেছে, তাকে যেন সহজে স্বীকার করি, যা কিছু রয়ে গেল তাকেও যেন সম্পূর্ণ সহজ মনে স্বীকার করতে ত্রুটি না হয়।"[১]

মীরা দেবীকে পত্র লেখার পূর্বদিন যে কেবল 'বিশ্বশোক' লেখেন তাহা নহে, সম্পূর্ণ অন্য সুরের দুইটি কবিতা— 'ফাঁক' ও 'সহযাত্রী' লেখেন। দুঃখের উপর উঠিবার অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী কবি: তাই দেখি অতি সহজভাবে প্রতিদিন 'পুনশ্চ'এর গল্প-কবিতা লিখিতেছেন। নীতুর মৃত্যুসংবাদ পান ৮ অগস্ট; তার পরদিন হইতে

১ চিঠিপত্র ৪, পত্র ৬৬; ২৮ অগস্ট ১৯৩২। ১২ ভাদ্র ১৩৩৯]।

অগাস্টমাস-ভর কবিতা পত্রধারা ভাষণাদি লিখিতেছেন, এমন-কি 'দুই বোন' গল্পোন্যাসের খসড়াটি করিলেন। মনের 'সকল রঙের উজ্জ্বল বাতি' জ্বালাইয়াছেন।

পারস্য হইতে ফিরিবার পর ও পুণা যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত তিন মাসের (আষাঢ় শ্রাবণ ও ভাদ্র) মধ্যে কবি লেখেন পরিশেষ, বীথিকার কয়েকটি ও পুনশ্চ-র সকল কবিতা। 'পরিশেষে'র অনেকগুলিই লেখা ১ আষাঢ় হইতে ১০ শ্রাবণের মধ্যে। পরিশেষ ভাদ্র মাসে প্রকাশিত হয়। সত্তর বৎসর পার হইয়া কবি ভাবিতেছেন তাঁহার জীবন কাব্যসৃষ্টির অন্তে উপনীত হইয়াছে— তাই কাব্যখণ্ডের নাম দেন 'পরিশেষ'। এই কাব্যটি উৎসর্গ করেন কবি অতুলপ্রসাদ সেনকে।

পূরবী-র পর মহুয়া, তার পর পরিশেষ। পরিশেষের মধ্যে গদ্যছন্দে কবিতা শুরু হয়, তারই ধারা চলে 'পুনশ্চ'এ। গদ্যছন্দের প্রথম রচনা 'শিশুতীর্থ' (১৩৩৮ পৌষ)। তার পরে লেখা 'শাপমোচন'কেও এই শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু এই দুইটি রচনার সহিত পরিশেষ পুনশ্চ-র গদ্যছন্দে রচিত কবিতার পার্থক্য যথেষ্ট। প্রথম দুইটি নাটকধর্মী। এবারকার কবিতাগুলি কিছু লিরিকধর্মী, তবে বেশির ভাগ চিত্র বা গল্পধর্মী— যাহার আদিরূপ প্রকাশ পায় 'লিপিকা'র 'ভীরুতা'য়। যথার্থ গদ্যছন্দে কথিকার সূত্রপাত হয় 'খেলনার মুক্তি'তে (১৩ আষাঢ় ১৩৩৯); এ যেন তাঁর কাব্যক্রীড়নকের মুক্তি; এইটি কবির একটি অপরূপ সৃষ্টি; রূপ-কল্পনা ও রূপক-অর্থ দুইই অসামান্য বলিয়া মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি ও তাঁহার গদ্যছন্দে কাব্যরচনারীতির মধ্যে একটা মিল যেন খুঁজিয়া পাওয়া যায়। চিত্রে তিনি গতানুগতিক বনেদী পথে চলেন নাই— রেখায় একবর্ণে বহুবর্ণে তাঁহার চিত্রগুলি যেমন একটি ছন্দ রক্ষা করিয়া মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে— তেমনই ভাব-প্রকাশের অন্যতম ভাষামাধ্যম কবিতা, তাহাকেও বনেদী ছন্দের বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়া নূতন গদ্যছন্দের আবরণে পেশ করিলেন।

'পরিশেষ' প্রথম সংস্করণে কয়েকটি গদ্যকবিতা ছিল; সেগুলি 'পুনশ্চ'র 'দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩৪০ ফাল্গুন) যোজিত হয়; তাদের সংখ্যা ১৩; 'পুনশ্চ'র প্রথম সংস্করণে কবিতার সংখ্যা ছিল ৩৭। বর্তমান সংস্করণে মোট ৫০টি। শেষ কবিতা 'পহেলা আশ্বিন'। বইখানির ভূমিকা লেখা হয় ২ আশ্বিন ১৩৩৯। এইটি উৎসর্গ করেন সদ্যমৃত দৌহিত্র 'নীতু'র নামে।

'পুনশ্চ' রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যকাব্য। বাংলাভাষায় এই রীতি প্রবর্তনের কারণ কবি 'পুনশ্চ'র ভূমিকায় ব্যক্ত করিয়াছেন। "গীতাঞ্জলির গল্পগুলি ইংরেজি গদ্যে" লিখিত হইলেও সেগুলি "কাব্যশ্রেণীতে গণ্য" হইয়াছিল। সেই অবধি কবির "মনে এই প্রশ্ন ছিল যে পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কি না।" পাশ্চাত্য রচনারীতি অনেক কিছুর ন্যায় গদ্যকাব্যর লেখনপদ্ধতিও আমরা গ্রহণ করিয়াছি। কবি 'লিপিকা'র কথিকায় তার প্রথম পরীক্ষা করেন; কিন্তু "ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয়নি— বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ।"

রবীন্দ্রনাথের অনুরোধক্রমে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন; কিন্তু তাঁহার ভাষাবাহুল্যের জন্য পরিমাণ রক্ষিত হয় নাই। সেইজন্য কবি স্বয়ং এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। "গদ্যকাব্যে অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠনপ্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীনক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে। অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস।"

গদ্যকাব্যের এই নূতন রীতির সপক্ষে কবি অনেক স্থানেই বলিয়াছেন, কখনো পত্রমধ্যে কখনো প্রবন্ধাকারে। খড়দহ বাসকালে দেওয়ালি দিনে (২৯ অক্টোবর ১৯৩২) কবি অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে এক দীর্ঘ নানা উপমা অলংকারে লিপিবদ্ধ পত্রে গদ্যকবিতার কৈফিয়ত লেখেন। এই সূত্রে কবির তিনটি প্রবন্ধও উল্লেখযোগ্য— সেগুলি 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থে প্রকাশিত হয় (কাব্যে গদ্যরীতি, কাব্য ও ছন্দ, গদ্যকাব্য)।

রবীন্দ্রনাথের মতে "ছন্দটাই যে ঐকান্তিকভাবে কাব্য তাহা নয়। কাব্যের মূল কথাটা আছে রসে, ছন্দটা এই রসের পরিচয় দেয় তার আনুষঙ্গিক হয়ে।'· ·'এককালে নিয়মিত অংশে বিভক্ত ছন্দই সাধু কাব্যভাষায় একমাত্র পাংক্তেয় বলে গণ্য ছিল। · · ছন্দে মিলপ্রথা ছিল অপরিহার্য।" মধুসূদন প্রবর্তিত "অমিত্রাক্ষর ছন্দের মিলবর্জিত অসমানতাকে কেউ কাব্যরীতির বিরোধী আজ মনে করেন না। অথচ পূর্বতন বিধানকে এই ছন্দে বহুদূরে লঙ্ঘন করে গেছে।" অমিত্রাক্ষর ছন্দ চৌদ্দ অক্ষরের গণ্ডি পার হইয়া চলে সত্য, তবে সে পয়ারের ঠাট বজায় রাখিয়াছে বলিয়া উহা কাব্য। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "আজ গদ্যকাব্যের উপরে প্রমাণের ভার পড়েছে যে গদ্যেও কাব্যের সঞ্চরণ অসাধ্য নয়।"[১]

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস যে তিনি অনেক গদ্যকাব্য লিখিয়াছেন যার বিষয়বস্তু অপর কোনো রূপে প্রকাশ করিতে পারিতেন না। তাঁহার মতে গদ্যকাব্যের "মধ্যে একটা সহজ প্রাত্যহিক ভাব আছে ; হয়তো সজ্জা নেই, কিন্তু রূপ আছে এবং সেইজন্যেই তাদেরকে সত্যকার কাব্যগোত্রীয় বলে মনে করি।"[২]

ধূর্জটিপ্রসাদকে লিখিত পত্রে কবি বলিয়াছিলেন, "গদ্য কাব্যে জোরে পা ফেলে চলতে পারে। সেটা সযত্নে নেচে চলার চেয়ে সব সময়ে নিন্দনীয় তা নয়। নাচের আসরের বাইরে আছে এই উঁচুনিচু বিচিত্র জগৎ রূঢ় অথচমনোহর, সেখানে জোর চলাটাই মানায় ভালো— কখনো ঘাসের উপর কখনো কাঁকরের উপর দিয়ে।" অর্থাৎ ছন্দে ছন্দে চলার মধ্যে যেমন সৌন্দর্য থাকিতে পারে, অসমছন্দে ও বিষমছন্দে চলার মধ্যে তেমনি গতি ও সাবলীলতার রূপ প্রকাশ পাইতে পারে। আবার ইহার উলটা কথাও ঠিক— সুললিত অলংকারিত ছন্দই কাব্যের মূল শক্তি নহে ; তেমনি গদ্যছন্দের অসম চলমানতার দ্বারাই সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। কাব্যের আসল দেহবস্তু রস— তাহা অনির্বচনীয় উপভোগ মাত্র ; উহার উপরেই কাব্যের দোষগুণ বিচার নির্ভরশীল। বলা বাহুল্য, এসব অত্যন্ত সাধারণ কথা। সংস্কৃতে কাদম্বরী প্রভৃতি কাব্য নামেই পরিচিত, অথচ তাহার ভাষা ও ভঙ্গী 'গীতগোবিন্দ' হইতে অনেক দূরে। আসলে গদ্যছন্দে আত্মপ্রকাশের একটা নূতন পথ পাইল, যেমন পাইয়াছিল মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে। কিন্তু ইহার মধ্যে যথেষ্ট ভেদ আছে— মধুসূদনের প্রদর্শিত পথ হইতে রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দের পথে বাঙালি কবি আপনাকে প্রকাশের বিস্তারিত পথ পাইয়াছে— সেখানে তাহার বিবরণ সহজ, বিশ্লেষণ গভীর, অনুভূতি রাহস্যিক হইয়াছে। সত্যই এখন গদ্যকাব্য জোরে পা ফেলিয়া চলিতেছে। ইহার পথিকৃৎ রবীন্দ্রনাথ।

কয়েক বৎসর পরে (১৩৪৫) কবি লিখিতেছেন, "সম্প্রতি বাংলাসাহিত্যে গদ্যরীতির কাব্য দেখা দিয়েছে। এটাকে অনধিকার প্রবেশ ব'লে রুখে দাঁড়াবার কোনো আইন নেই। যেমনি প্রাণের রাজ্যে তেমনি সাহিত্য ও কলাসৃষ্টিতে টিকে থাকার দ্বারাই তার অধিকার সপ্রমাণ হয়— পুরাতন ও নূতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা নয়। অমিতাক্ষর ছন্দ যেমন তার যতিভাগের অমিতি এবং মিলের অভাবসত্ত্বেও কাব্যের পংক্তিতে চলে গেছে, গদ্যকাব্যও যে তেমন

১ দ্র. পরিশেষ ২য় সংস্করণ, গ্রন্থপরিচয়। উদ্‌ধৃতির তারিখ ২৯ অগস্ট ১৯৩৬।

২ দ্র.. পরিশেষ ২য় সংস্করণ, গ্রন্থপরিচয়। উদ্‌ধৃত প্রবন্ধের তারিখ ২৯ অগস্ট ১৯৩৯।

চলবে না কারো মুখের কথায় তার স্থির সিদ্ধান্ত হবে না। চিরাচরিত মিতাক্ষর-রীতির বহুদূর বাইরে গেছে অমিতাক্ষর, আরো বাইরে পদক্ষেপে যে তার চিরনিষেধ, অন্তঃপুরচারিণী কবিতা অন্দর থেকে সদরে এলেই যে সে হবে স্বধর্মচ্যুত, সাহিত্যের ঐতিহাসিক নজির দেখলে বোঝা যায়, এ কথা আজ যাঁরা বলছেন হয়তো কাল তাঁরা বলবেন না। বস্তুত নৈব চ বলবার শেষ অধিকার আজ তাঁদের নেই, হয়তো আছে কালকের লোকের।"[১]

'পুনশ্চ'র নাটক নামে গদ্যকবিতায় (৯ ভাদ্র ১৩৩৯) এই গদ্যরীতির সমর্থন করেন। কবি যখন 'তপতী' লেখেন তখন অনুরোধ আসে সেটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিবার জন্য। কবি 'নাটকে' লিখিয়াছেন—

বিষয়টা হচ্ছে আমার নাটক
বন্ধুদের ফরমাশ, ভাষা হওয়া চাই অমিত্রাক্ষর
 আমি লিখেছি গদ্যে।
পদ্য হল সমুদ্র,
সাহিত্যের আদিযুগের সৃষ্টি।
তার বৈচিত্র্য ছন্দতরঙ্গে কলকল্লোলে।
গদ্য এল অনেক পরে।
 বাঁধা ছন্দের বাইরে জমলো আসর।

কালের যাত্রা : কবির দীক্ষা

কাব্যে ও চিত্রে যেমন নূতন ছন্দ আত্মপ্রকাশমান, সমাজজীবনে নূতন ছন্দের তেমনি চলে সন্ধান। 'পুনশ্চ'র গল্প ও নাট্যধর্মী গদ্য-কবিতার শেষে 'রথের রশি' নামে গদ্য-নাটক রচিত হয় (৩১ ভাদ্র ১৩৩৯)। প্রায় নয় বৎসর পূর্বে 'রথযাত্রা' নামে একটি নাটিকা (১৩৩০) প্রকাশিত হয়।[২] 'রথের রশি' তাহারই পরিবর্তিত ও আগাগোড়া পুনর্লিখিত রূপ।

চার বৎসর পূর্বে (১৯২৮) 'শিবের দীক্ষা' নামে একটি নাট্য-কথিকা প্রকাশিত হয়।[৩] সেইটিও এই সময়ে নূতন করিয়া লিখিয়া 'কবির দীক্ষা' নাম দেন। 'রথের রশি' ও 'কবির দীক্ষা' একত্রে নূতন নামাঙ্কিত হয় 'কালের যাত্রা'। এই বইটি কবি উৎসর্গ করেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে তাঁহার ৫৭তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে (৩১ ভাদ্র ১৩৩৯)। কথা ছিল অল্পকাল মধ্যে শরৎচন্দ্রের জন্মদিন উপলক্ষ্যে উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে— এই শরৎজয়ন্তীর সভাপতি রবীন্দ্রনাথ। পাঠকের স্মরণ আছে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রজয়ন্তীর সভাপতি ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে যে দুইখানি গ্রন্থ উপহার দিলেন তাহা নূতন করিয়া লিখিত পুরাতন রচনা।

রবীন্দ্রনাথ এক পত্রে শরৎচন্দ্রকে লিখিতেছেন— "তোমার জন্মদিন উপলক্ষে 'কালের যাত্রা' নামক নাটিকা তোমার নামে উৎসর্গ করেছি। আশা করি, আমার এ-দান তোমার অযোগ্য হয়নি। বিষয়টি এই—

১ বাংলা কাব্য-পরিচয়, ভূমিকা, ১৩৪৫।

২ রথযাত্রা, প্রবাসী ১৩৩০ অগ্রহায়ণ, পৃ. ২১৬-২২৫। দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২, পৃ. ১৫৭-১৭০।

৩ শিবের দীক্ষা, মাসিক বসুমতী ১৩৩৫ বৈশাখ।

"রথযাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখতে পেলে, মহাকালের রথ অচল। মানবসমাজের সকলের চেয়ে বড়ো দুর্গতি কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধবন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই রথ টানার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানবসম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চলছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করছেন তাঁর রথের বাহনরূপে, তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে।

"কালের রথযাত্রার বাধা দূর করবার মহামন্ত্র তোমার প্রবল লেখনীর মুখে সার্থক হোক, এই আশীর্বাদ সহ তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।"[১]

'রথের রশি' নাটকের নাট্যবস্তু প্রতীকমূলক— তবে প্রত্যকের মধ্যে রাহস্যিক অস্পষ্টতা নাই।

সভ্যতার রথ চলিয়া আসিতেছে, আজ তাহা অকস্মাৎ অচল। পুরোহিত রাজশক্তি বণিকসংঘ— কাহারও স্পর্শে রথ চলিতেছে না। সকলেই চিন্তিত, উত্তেজিত। কেহ বলে মন্ত্র পড়ো, কেহ বলে জোর করো, কেহ বলে ধনিকের দলকে ডাকো— ভাবে, ধনবলে সব হবে— সকলেই জানে পৃথিবীটা কার বশ। সব পরীক্ষা ব্যর্থ হইল। তখন শোনা গেল সমাজের অচ্ছুত শূদ্রের দল আসিতেছে। তাহারা যখন রথের রশি ধরিল— চারিদিকে আর্তনাদ, অভিশাপ, ভীতিপ্রদর্শন মুখর হইয়া উঠিল। পুরোহিত প্রশ্ন করে 'রথ তারা চালাবে কিসের জোরে'।

কবি বলেন, গায়ের জোরে নয়, ছন্দের জোরে।

> আমরা মানি ছন্দ, জানি এক ঝোঁকা হলেই তাল কাটে।
> মরে মানুষ সেই অসুন্দরের হাতে
> চালচলন যার এক পাশে বাঁকা ; . .
> আমরা জানি সুন্দরকে। তোমরা মানো কঠোরকে—
> অস্ত্রের কঠোরকে, শাস্ত্রের কঠোরকে।
> বাইরে ঠেলা মারার উপর বিশ্বাস,
> অন্তরের তালমানের উপর নয়।

পুরোহিত পূর্বে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কবিকে—

> তোমার শূদ্রগুলোই কি এত বুদ্ধিমান—
> ওরাই কি দড়ির নিয়ম মেনে চলতে পারবে।

কবি উত্তরে বললেন—

> পারবে না হয়তো।
> একদিন ওরা ভাববে, রথী কেউ নেই, রথের সর্বময় কর্তা ওরাই।
> দেখো, কাল থেকেই শুরু করবে চেঁচাতে—
> জয় আমাদের হাল-লাঙল-চরকা-তাঁতের।
> তখন এঁরাই হবেন বলরামের চেলা—
> হলধরের মাতলামিতে জগৎটা উঠবে টলমলিয়ে।. .

১ শরৎবন্দনা। বিচিত্রা ১৩৩৯ কার্তিক, পৃ. ৪৯২। দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২, পৃ. ৫১০।

ওদের দিকেই ঠাকুর পাশ ফিরলেন—

নইলে ছন্দ মেলেনা। একদিকটা উঁচু হয়েছিল অতিশয় বেশি.
ঠাকুর নিচে দাঁড়ালেন ছোটোর দিকে,
সেইখান থেকে মারলেন টান, বড়টাকে দিলেন কাত করে।
সমান করে নিলেন তাঁর আসনটা।

কবির শেষ কথা—

তার পরে কোন্‌-একযুগে কোন্‌-একদিন
আসবে উলটোরথের পালা।
তখন আবার নতুন যুগের উঁচুতে নিচুতে হবে বোঝাপড়া।
এই বেলা থেকে বাঁধনটাতে দাও মন—
রথের দড়িটাকে নাও বুকে তুলে, ধুলোয় ফেলো না।
রাস্তাটাকে ভক্তিরসে দিয়ো না কাদা করে।
আজকের মতো বলো সবাই মিলে—
যারা এতদিন মরেছিল তারা উঠুক বেঁচে,
যারা যুগে ছিল খাটো হয়ে তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।

এই ক্ষুদ্র নাটিকায় কবি যে ইঙ্গিত করিলেন, তাহা কালোপযোগী। জগতের ইতিহাসে পুরোহিত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পরে পরে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিয়াছে সমাজকে। নূতন যুগে শূদ্রের বা ক্ষুদ্রের (worker) দিন আগত, তাহারাই সমাজকে চালনা করিবে। কিন্তু সেইটাই শেষ কথা নহে, সর্বহরাদের দৌরাত্ম্য ও সর্বহারাদের উপদ্রবের মধ্যে কোনো গুণগত পার্থক্য নাই। সকলকে লইয়া যে-চলা, সকল বৈচিত্র্য এমন-কি বিরুদ্ধকে সহ্য ও স্বীকার করিয়া যে প্রগতি, তাহাই সভ্যতাকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে পারিবে।

মহাত্মা গান্ধীর অনশন ও পুণাপ্যাক্ট

রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল— সংবাদ আসিল গান্ধীজি বন্দী হইয়াছেন (৪ জানুয়ারি ১৯৩২)।

পাঠকের স্মরণ আছে লন্‌ডনে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশনে যোগ দিবার জন্য গান্ধীজি কন্‌গ্রেস-পক্ষীয়ের একমাত্র প্রতিনিধিরূপে গিয়াছিলেন (১৯৩১ অক্টোবর)। বিলাতে তিনি ভারতের সম্মান রক্ষা ও স্বাধীনতা লাভের জন্য যে চেষ্টা করেন, তাহা ইতিহাসে চিরদিনের তরে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু হইল না— দেশবাসীর আত্মকলহের মধ্যে সম্মেলন অকস্মাৎ অবসিত হয়। নেতারা দেশের জন্য অনেক মহত্ত্ব দেখাইয়াছেন, বহু ত্যাগস্বীকার করিয়াছেন—পারেন নাই কেবল সাম্প্রদায়িক মনোবিকারের ঊর্ধ্বে উঠিতে। সেই সাম্প্রদায়িক অহমিকা হইতে সমস্ত বিরোধ ও বিদ্বেষের জন্ম। গান্ধীজি হতাশ হইয়া ২৮ ডিসেম্বর বোম্বাই পৌঁছিলেন। দেশে আসিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, নবনিযুক্ত বড়লাট লর্ড উইলিংডন[১]

১ Lord Willingdon, 1st Marquis of; Freeman-Thomas (1866-1941), Br. Statesman; junior lord of treasury 1905-12: Governor of Bombay 1913-19; Governor of Madras 1919-24; Governor-General, Canada 1926-31; Governor-General, India 1931-36।

[লর্ড আরুইনের পরের ভাইসরয়] ভারতের নানাস্থানে কন্‌গ্রেস-কর্মীদের উৎপীড়ন করিতেছেন। বড়লাটের অভিযোগ যে, গান্ধী-আরুইন চুক্তিভঙ্গ করিয়া কর্মীরা যথেচ্ছাচার করিতেছেন। কন্‌গ্রেস পক্ষের অভিযোগ যে সরকারী কর্মচারী চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছেন। দেশের এই পরিস্থিতি সম্বন্ধে গান্ধীজি বড়লাট বাহাদুরের সহিত আলোচনা করিবার জন্য মোলাকাত প্রার্থনা করেন। লর্ড উইলিংডন সরাসরি 'না' করিয়া দিলেন ; তার পর দেশে প্রত্যাবর্তনের সাত দিনের মধ্যে ৪ জানুয়ারি (১৯৩২) গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার করিয়া পুণার য়েরবাদা জেলে অন্তরীণাবদ্ধ করা হইল। এই সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছিলে টাউন হলের জয়ন্তী-উৎসব যে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল সে-কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ এই সংবাদ পাইয়া যে বাণীটি প্রেসে প্রেরণ করেন তাহার তর্জমা নিম্নে উদ্‌ধৃত করিলাম—

"গবর্মেণ্ট ও মহাত্মাজির মধ্যে পরস্পর বুঝাপড়ার কোনো সুযোগ মহাত্মাজিকে না দিয়াই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে আমাদের শাসকদের মতে, ভারতবর্ষের ইতিহাস গড়িয়া তুলিবার কাজে ব্যাপৃত দুই সহযোগীর মধ্যে অন্যতর সহযোগী ভারতবর্ষের জনগণ দৃপ্ত-অবজ্ঞা-ভরে উপেক্ষিত হইতে পারে। যাহাই হউক প্রকৃত অবস্থাকে প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে এবং আমাদের জগতের নিকট প্রমাণ করিতে হইবে যে, ভারতের ভাগ্য যে দুই পক্ষের কার্য ও প্রভাবের উপর নির্ভর করে, তাহাদের মধ্যে আমরা গরীয়ান— অপর যে-পক্ষের ভারতবর্ষে বিদ্যমানতা চিরন্তন নহে, আকস্মিক মাত্র, তাহাদের চেয়ে গরীয়ান। কিন্তু যদি আমরা মাথা খারাপ করি এবং অন্ধ আত্মঘাতী রাজনৈতিক উন্মাদনা দ্বারা হঠাৎ আক্রান্তের মতো আচরণ করি, তাহা হইলে একটি মহৎ সুযোগ হারাইব। নৈরাশ্য হইতেই আমাদের পাওয়া উচিত শক্তিমত্তার গভীর স্থৈর্য এবং সেই নিষ্করণ প্রতিজ্ঞা, যাহা বালকোচিত ভাবোচ্ছ্বাস এবং আত্মব্যর্থতাজনক ধ্বংসপরায়ণতা দ্বারা নিজের সম্বল অপচয় না করিয়া নীরবে নিজের সংকল্পসিদ্ধি সম্পন্ন করে। সেই মুহূর্তে যখন আমাদের স্বজনগণের বিরুদ্ধে আমাদের সমুদয় পুঞ্জীভূত পূর্বসংস্কার ভুলিয়া যাওয়া সহজ হওয়া উচিত ; যখন, যাহারা রূঢ়তার সহিত আমাদের সাহচর্য-আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহাদিগেরও সঙ্গে ভ্রাতৃপ্রেমের সহিত একযোগে কাজ করা আমাদের অবশ্য-কর্তব্য, যখন আমাদিগকে আমাদেরই নিজেদের নিকট হইতে আমাদের জাতির সকল অংশের সহিত সহযোগিতার প্রগাঢ় প্রেরণা দাবি অবশ্যই করিতে হইবে। ইহা সেই প্রকারের বিপত্তি যাহা কচিৎ কোনো জাতির নিকট উপনীত হয় এরূপ সংঘাতের সহিত যাহা আমাদের ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত শক্তিপুঞ্জকে এককেন্দ্রাভিমুখ করে এবং আমাদের স্বাধীনতা গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রয়োজনীয় আমাদের সৃজনচেষ্টার প্রতিবন্ধকগুলিকে সংক্ষিপ্ত ও সংকুচিত করে।

"আইনকর্তাদের আদিমযুগোচিত উচ্ছৃঙ্খলতায় আমাদিগকে বলপূর্বক সেই প্রেমেই আমাদের মুক্তির নিশ্চয়তা সম্বন্ধে উদ্‌বুদ্ধ করা উচিত, যে প্রেম এরূপ শক্তির সম্মুখেও আপনার পরাজয় মানে না যাহা সেই অবিচারিত সন্দেহের বেড়ার পশ্চাতে আত্মরক্ষার জন্য আপনাকে স্থাপন করে, যে-সন্দেহ হইতে উৎপন্ন অন্ধ আতঙ্ক তাহার স্বরূপ নির্দেশে অসমর্থ। ইহাই সেই সময় যখন সেইসব লোকদের চেয়ে আমাদের নৈতিক শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিবার দায়িত্ব আমাদের কখনও ভুলা উচিত নয়, যে-সব লোকের বাহুশক্তির পরিমাণ এত বেশি যে তাহা তাহাদিগকে মানবতা অগ্রাহ্য করাইতে পারে।"[১]

১ প্রবাসী, ১৩৩৮ মাঘ পৃ. ৬০১-৬০২।

লর্ড উইলিংডন মনে করিতেন তাঁহার পূর্ববর্তী বড়লাট আরউইনের রাজনীতিক ব্যবহার অত্যন্ত মৃদু (mild) ছিল, এবং কঠোর হস্তে (strong hand) শাসনদণ্ড চালনাই প্রয়োজন।

এইসব ঘটনায় ইংলন্ডের শান্তিকামী কোয়েকার সমাজের পক্ষ হইতে তিন জন[১] সদস্য এন্ড্রুসের অনুরোধে ভারত-পরিদর্শনে আসেন; তাঁহারা রাজকর্মচারীদের সহিত আলাপ-আলোচনায় বুঝিলেন যে ইংরেজরা ('were out not for peace, but for victory') শান্তি চাহে না, তাহারা চাহে জয়।[২]

রবীন্দ্রনাথের মনে আশা ছিল গান্ধীজি এই পীড়িতদেশে মুক্তি আনিবেন এবং ব্রিটিশের উদার সহানুভূতিতে তাহা নিষ্পন্ন হইবে। কিন্তু এই অপ্রত্যাশিত ঘটনা খুবই বিচলিত করিল। অল্পদিনের মধ্যে জবহরলাল নেহরু ও অন্যান্য কন্‌গ্রেস কর্মীরাও কারারুদ্ধ হইলেন। দেশের মন উত্তেজিত, কিন্তু নেতৃশূন্য জনতা মূক। রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডকে কেব্‌ল করিলেন—

"The sensational policy of indiscriminate repression being followed by Indian Government starting with imprisonment of Mahatmaji is most unfortunate in causing permanent alienation of our people from yours making it extremely difficult for us to co-operate with your representations for peaceful political adjustment."

মনের দুঃখ ও ক্ষোভ কবিতায় মূর্ত হইল—'প্রশ্ন' করিলেন—

ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত, পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে,
তারা বলে গেল 'ক্ষমা করো সবে' বলে গেল 'ভালোবাসো'
অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো।
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে।

মনের অত্যন্ত তীব্রতায় প্রশ্ন করিতেছেন—

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো।[৩]

১ তিন জন সদস্য— Mrs. Hilda Cashmore, warden of Manchester University Settlement, Mr. Eric Hayman, Percy W Bartlet।

২ দ্র. Sykes, *Life of Andrews*, p. 256।

৩ পরিশেষ। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫, পৃ. ১৯৬-৯৭।

পুণায়

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে আপনার রচনালোকে ও বিশ্বভারতীর কর্মকোলাহলের মধ্যে আছেন। এমন সময়ে সংবাদ পাইলেন যে, গান্ধীজি পুণার য়েরবাদা জেলে ২০ সেপ্টেম্বর (৪ আশ্বিন ১৩৩৯) হইতে অনশন আরম্ভ করিবেন। কবির সমস্ত রচনা ও কর্মের সূত্র হঠাৎ ছিন্ন হইয়া গেল। দেশবাসীও এমন নিদারুণ সংবাদের জন্য প্রস্তুত ছিল না। গান্ধীজি কিজন্য এই সংকল্প গ্রহণ করিলেন, তাহার ইতিহাস এইখানে সংক্ষেপে বিবৃত করা প্রয়োজন।

পাঠকের স্মরণ আছে লন্ডনে গত দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিয়া দেশে ফিরিবার সাত দিনের মধ্যে গান্ধীজিকে রাজবন্দী (State Prisoner) করিয়া (৪ জানুয়ারি ১৯৩২)[১] রাখা হইয়াছিল; তাহার পর নয় মাস কাটিয়া গিয়াছে।

গোলটেবিল বৈঠকে দেখা গেল যে কেবল কন্‌গ্রেস ও লীগের মধ্যে ভাবী শাসননীতি ও সংবিধান সম্বন্ধে মতভেদ তাহা নহে— কন্‌গ্রেসের নিখিল-ভারত ভাবনার বিরুদ্ধে হিন্দুমহাসভা অনুন্নত সম্প্রদায় শিখসমাজ সকলেই আপন আপন সম্প্রদায় ও ধর্মের জন্য রক্ষাকবচের জন্য উদ্‌গ্রীব। এ ছাড়াও রাজা মহারাজা নবাবরা আপনাদের স্বার্থরক্ষার জন্য ব্যস্ত। গোলটেবিল বৈঠকে ভারতীয়রা কোনো দাবী সংঘবদ্ধভাবে পেশ করিতে না পারায় অবশেষে প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনল্ডের উপর গিয়া শেষ বিচারের ভার বর্তাইয়াছিল। প্রধানমন্ত্রী ভাবী প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্বাচন নীতির মধ্যে হিন্দু-মুসলমান ভেদ তো রাখিলেনই, উপরন্তু হিন্দুদের মধ্যে বর্ণহিন্দু ও অনুন্নত হিন্দুর শ্রেণীভেদ সুপারিশ করিলেন। হিন্দু-মুসলমান ভেদনীতি ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির মধ্যে অসংখ্য সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে; ইহার উপর হিন্দুদের মধ্যে বর্ণ ও অনুন্নত (যাহাদের জন্য নূতন তপসিল তালিকা বা শিডিউল প্রস্তুত হওয়ায় ইহারা তপশিলী নাম প্রাপ্ত হয়) দুইটি পৃথক নির্বাচকশ্রেণী গঠনের প্রস্তাব হইল; তখন স্পষ্টই বুঝা গেল যে হিন্দুসমাজের মধ্যে একটি প্রতিপক্ষ শক্তি খাড়া করিয়া কন্‌গ্রেসকে দুর্বল করারই ইহা অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইবে।

গান্ধীজি য়েরবাদা জেলে আটক; তিনি কারাগার হইতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (Communal award) প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন।

দেশময় প্রতিবাদ শুরু হইল; কিন্তু কন্‌গ্রেস নাই— সে প্রতিষ্ঠানের মূল শাখা সমস্ত দেশে নিষিদ্ধ হইয়া আছে। যাহারা কন্‌গ্রেসের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বাহিরে ছিলেন, তাঁহারা অসংঘবদ্ধভাবে কাগজে পত্রে প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। এলাহাবাদের দৈনিক Leader-এর সম্পাদক চিন্তামণি (Sri C. J. Chintamani) রবীন্দ্রনাথের মত জিজ্ঞাসা করিয়া টেলিগ্রাম করেন। কবি তদুত্তরে লেখেন (২২ অগস্ট ১৯৩২)—

"Things have come to such a state that I hate even to complain, knowing the determined attitude of our rulers and hopelessness of our situation. We cannot expect fair dealings from a power

১ January 4th, 1932, was a notable day. Early that morning Gandhiji and the Congress President Vallabhbhai Patel, were arrested and confined without trial as state prisoners....Four ordinances were promulgated....Civil liberty ceased to exist. 'The Congress had been declared illegal...and innumerable local committees....The lists were formidable. The all-India total must have run into several thousands....'—Nehru, *Autobiography*, p. 328।

which, for its self-interest, would perpetuate differences amongst our people regardless of the ultimate consequences, which cannot be good for itself. I for my own part, would prefer to remain silent when no words of reason from us are likely to prevail."

ইহার দুই-একদিন পরে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন হইতে একখানি পত্র লিখিয়া দেশবাসীকে এই কথাটি স্পষ্ট করিয়া বলিলেন—

"My advice to my countrymen is that they should ignore this award and focus all their forces for the united consideration of those new measures that will soon be inaugurated. The solution of the communal problem is in our own hands and we should take advantage of the new feeling of resentment that is sweeping intellectual circles in our country today against irrational communal and class differences, come to agreement between ourselves and thus remove one of the greatest obstacles in the path of our national self expression.

"But let us not be sidetracked by emotional consideration and let us meet the real issues that will soon be revealed to us, united amongst ourselves and prepared for any contingency."

এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে গান্ধীজির প্রতিবাদ মৃত্যুপণ-অনশন সংকল্প। যাহা হউক, চতুর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এই বাঁটোয়ারা-প্রস্তাবের মধ্যে একটি শর্ত রাখিয়াছিলেন— বর্ণহিন্দু ও তপশিলী হিন্দুরা আপোসে যাহা স্থির করিবেন, তাহা তিনি মানিয়া লইয়া নূতন সংবিধান রচনা করিবেন। বহু আলোচনার পর উভয় সম্প্রদায়ের একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া বিলাতে খবর পাঠাইলেন; কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর জবাব আর মেলেনা। গান্ধীজি য়েরবাদা জেলে অস্থির হইয়া পড়িলেন, তিনি স্থির করিলেন ২০ সেপ্টেম্বর হইতে অনশন আরম্ভ করিবেন।

পূর্বদিনে (১৯ শে) রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজিকে যে টেলিগ্রাম পাঠাইলেন, তাহাতে কবি তাঁহাকে তাঁহার সংকল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন নাই—

"It is worth sacrificing precious life for the sake of India's unity and her social integrity. Though we cannot anticipate what effect it may have upon our rulers who may not understand its immense importance for our people, we feel certain that the supreme appeal of such self-offering to the conscience of our own countrymen will not callously allow such national tragedy to reach its extreme length. Our sorrowing hearts will follow your sublime penance with reverence and love."

গান্ধীজি পরদিন (২০শে) উত্তরে জানাইলেন— "Have always experienced God's mercy. Very early this morning I wrote seeking your blessing if you could approve action, and behold I have it in abundance in your message just received. Thank you"।

গান্ধীজি যেদিন অনশন আরম্ভ করিলেন সেইদিন শান্তিনিকেতনের বহু লোক উপবাসী থাকেন : সেইদিন প্রাতে মন্দিরে কবি উপাসনা করিলেন। কবি বলেন, "যিনি সুদীর্ঘকাল দুঃখের তপস্যার মধ্য দিয়ে সমস্ত দেশকে যথার্থভাবে, গভীর ভাবে, আপন করে নিয়েছেন, সেই মহাত্মা আজ আমাদের সকলের হয়ে মৃত্যুব্রত গ্রহণ করলেন।"

"আজ ভারতের কত সহস্র লোক কারাগারে রুদ্ধ, বন্দী।·· আমরাও অসম্মানের বেড়ার মধ্যে বন্দী করে রেখেছি সমাজের বৃহৎ এক দলকে।··মানুষের অধিকার সংক্ষেপ করাই তো বন্ধন।·· ভারতবর্ষে সেই সামাজিক কারাগারকে আমরা খণ্ডে খণ্ডে বড়ো করেছি। এই বন্দীর দেশে আমরা মুক্তি পাব কী করে? যারা মুক্তি দেয় তারাই তো মুক্ত হয়।"

কবি বলেন, "আমাদের রাষ্ট্রিক মুক্তিসাধনা কেবলই ব্যর্থ হচ্ছে এই ভেদবুদ্ধির অভিশাপে।·· সাম্যই মানুষের মূলগত ধর্ম।·· যদি সহজে সাম্য স্থাপন হয় তবেই রক্ষা, নইলে নিষ্কৃতি নেই।" তিনি বলেন, এই রাজনৈতিক আন্দোলনে আমরা আর্থিক দুর্গতির দিকে যতটা দৃষ্টি দিয়াছি, সামাজিক পাপের দিকে ততটা দিই নাই।

হিন্দুসমাজের মধ্যে ব্রিটিশের কূট ভেদনীতির উল্লেখ করিয়া কবি বলেন, ইংলন্‌ডে প্রটেস্টাণ্ট ও রোমান-ক্যাথলিকদের যদি কোনো তৃতীয় পক্ষ আসিয়া বিভক্ত করিবার চেষ্টা করিত, তবে সেখানে বিপ্লব আসিত।

"প্রটেস্টাণ্ট ও রোমান-ক্যাথলিকদের মধ্যে বহু দীর্ঘকাল যে অধিকার ভেদ চলে এসেছিল, সমাজই আজ স্বয়ং তার সমাধান করেছে, সেজন্যে তুর্কির বাদশাকে ডাকে নি। আমাদের দেশের সামাজিক সমস্যা-সমাধানের ভার আমাদের 'পরেই থাকার প্রয়োজন ছিল।

"রাষ্ট্র ব্যাপারে মহাত্মাজি যে অহিংসনীতি এতকাল প্রচার করেছেন, আজ তিনি সেই নীতি নিজের প্রাণ দিয়ে সমর্থন করতে উদ্যত, একথা বোঝা অত্যন্ত কঠিন বলে আমি মনে করি নে।"[১]

পরদিন চতুর্পাশ্বস্থ গ্রামবাসীরা শান্তিনিকেতনে আহূত হইলে কবি তাহাদের নিকট গান্ধীজির অনশনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভাষণ দিলেন। অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ দূর করিতেই হইবে— এই ছিল কবির মর্মগত কথা। ভাষণশেষে তিনি বলিলেন, "আমাদের সকলের চেয়ে সৌভাগ্য, পর যখন আপন হয়। সকলের চেয়ে বিপদ, আপন যখন পর হয়। ইচ্ছে করেই যাদের আমরা হারিয়েছি, ইচ্ছে করেই আজ তাদের ফিরে ডাকো; অপরাধের অবসান হোক, অমঙ্গল দূর হয়ে যাক। মানুষকে গৌরব দান করে মনুষ্যত্বের সগৌরব অধিকার লাভ করি।"[২]

ফ্রী প্রেস মারফত ২২ সেপ্টেম্বর কবি দেশবাসীকে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য আবেদন করিয়া বলিলেন—

"The movement should be universal and immediate, its expression clear and indubitable. All manner of humiliation and disabilities from which any class in India suffers should be removed by heroic efforts and self sacrifice."···

কবি গান্ধীজি সম্বন্ধে খুবই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছেন; পুণায় যাওয়া স্থির করিলেন। শরৎচন্দ্রের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে কলিকাতায় গিয়া তাঁহার সভাপতিত্ব করার কথা; কয়েকদিন পূর্বে মাত্র শরৎচন্দ্রকে 'কালের যাত্রা' উৎসর্গ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। জয়ন্তী-উৎসব স্থগিত করিয়া তিনি ২৪ সেপ্টেম্বর সুরেন্দ্রনাথ কর ও অমিয় চক্রবর্তীকে সঙ্গে লইয়া পুণা যাত্রা করিলেন। ইতিপূর্বে অধ্যাপক টাকার সাহেবকে কবি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, "আশানৈরাশ্যে আন্দোলিত হয়ে ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর প্রাতে আমরা কল্যাণ স্টেশনে পৌঁছলেম। সেখানে শ্রীমতী বাসন্তী ও শ্রীমতী উর্মিলার [চিত্তরঞ্জন দাশের পত্নী ও ভগ্নী] সঙ্গে দেখা হল।·· কালবিলম্ব না করে·· মোটর গাড়িতে চড়ে পুণা-পথে চললেম।·· বিঠলভাই থাকারসে মহাশয়ের প্রাসাদে গাড়ি থামল।·· গৃহে প্রবেশ করেই বুঝেছিলেম গভীর একটি আশঙ্কায় হাওয়া ভারাক্রান্ত।·· মহাত্মাজির শরীরের অবস্থা

১ ৪ আশ্বিন। প্রবাসী ১৩৩৯ কার্তিক, পৃ. ১৫৬-১৫৮। দ্র. মহাত্মা গান্ধী; বিশ্বভারতী, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮, পৃ. ৩০-৩৮।

২ মহাত্মাজির পুণ্যব্রত; প্রবাসী ১৩৩৯ কার্তিক। দ্র. মহাত্মা গান্ধী, পৃ. ৩৯-৪৭।

সংকটাপন্ন। বিলাত হতে তখনও খবর আসে নি। প্রধানমন্ত্রীর নামে আমি একটি জরুরী তার পাঠিয়ে দিলেম।· · দরকার ছিল না পাঠাবার। শীঘ্রই জনরব কানে এল, বিলাত থেকে সম্মতি এসেছে। · ·

"যারবাদা জেলের · · লোহার দরজা একটার পর একটা খুলল, আবার বন্ধ হয়ে গেল। · · অঙ্গনে একটি ছোটো আমগাছের ঘন ছায়ায় মহাত্মাজি শয্যাশায়ী।

"মহাত্মাজি আমাকে দুই হাতে বুকের কাছে টেনে নিলেন, অনেকক্ষণ রাখলেন। · ·

"বিলাতের খবর ভারতময় রাষ্ট্র হয়ে গেছে, খবরের কাগজওয়ালারাও জেনেছে। কেবল যাঁর প্রাণের ধারা· · মৃত্যুসীমায় সংলগ্নপ্রায় তাঁর প্রাণ-সংকট মোচনের যথেষ্ট সত্বরতা নেই। · ·

"মহাত্মাজির স্বভাবতই শীর্ণ শরীর শীর্ণতম। · · অথচ চিত্তশক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নি।· ·উপবাসকালে নানান দলের প্রবল দাবি তাঁর অবস্থার প্রতি মমতা করে নি · ·।

"অবশেষে· · জেলের কর্তৃপক্ষ গবর্মেন্টের ছাপমারা মোড়ক হাতে উপস্থিত হলেন।· · পড়া শেষ করে· · জানালেন কাগজটা ডাক্তার আম্বেদকরকে দেখানো দরকার। তাঁর সমর্থন পেলেই তবেই তিনি নিশ্চিন্ত হবেন।

"লেবুর রস প্রস্তুত করলেন শ্রীমতী কমলা নেহেরু · · রস মহাত্মাজিকে দেন শ্রীমতী কস্তুরীবাঈ নিজের হাতে। মহাদেব [দেশাই] বললেন, 'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো' গীতাঞ্জলির এই গানটি মহাত্মাজির প্রিয়। সুর ভুলে গিয়েছিলেম। তখনকার মতো সুর দিয়ে গাইতে হল।

"রাত্রে পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু প্রমুখ পুণার সমবেত বিশিষ্ট নেতারা এসে আমাকে ধরলেন, পরদিন (২৭ সেপ্টেম্বর) মহাত্মাজির বার্ষিকী উৎসবসভায় আমাকে সভাপতি হতে হবে; মালব্যজিও বোম্বাই হতে আসবেন।· ·

"বিকালে শিবাজি-মন্দির নামক বৃহৎ মুক্ত অঙ্গনে বিরাট জনসভা। · · মুখে দু-চারটে কথা বললেম, পরে রচনা পাঠ করবার ভার নিলেন পণ্ডিতজির পুত্র গোবিন্দ মালব্য। · · সভায় সমবেত বিরাট জনসংঘ হাত তুলে অস্পৃশ্যতা নিবারণের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন। · ·

"আমার পালা শেষ হল। পরদিন প্রাতে মহাত্মাজির কাছে অনেকক্ষণ ছিলেম। তাঁর সঙ্গে এবং মালব্যজির সঙ্গে দীর্ঘকাল নানা বিষয়ে আলোচনা হল। একদিনেই মহাত্মাজি অপ্রত্যাশিত বল লাভ করেছেন। · · এখন তাঁর প্রধান চিন্তার বিষয় হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ-ভঞ্জন।"[১]

পুণায় রবীন্দ্রনাথের যে ভাষণ প্রদত্ত হয় তাহাতে তিনি একস্থলে বলেন—

"On this day of our rejoicing over reconciliation with the depressed classes of India, we still suffer from a bitter sense of disappointment for not being able to realise the confidence of our Mahomedan brethren which is absolutely necessary for the fulfilment of our national life. We assure them that this great fight which has recently been taken up by our country against the iniquitous custom of untouchability, has not made us forget the greater ordeal of purification through which India must pass in order to bring together the two great neighbours, Hindus and Mahomedans in a perfect spirit of trust and co-operation. Both communities must be united in a bond of comradeship and stand side by side in the arduous adventure of India's freedom which to

১ পুণা-ভ্রমণ, বিচিত্রা ১৩৩৯ অগ্রহায়ণ। দ্র. মহাত্মা গান্ধী, ব্রতউদ্‌যাপন, পৃ. ৪৮-৫৮।

be real, must come from within the heart of our common humanity and build on the basis of uncompromising honesty and love.

"I appeal to our countrymen that this must never pause till the evils of disparity and discord are completely rooted out from the soil of India. Let us today take upon ourselves, all men and women of India, this great task which lies before us and dare meet the challenge which it has sent from one end of our country to the other."

গান্ধীজিকে সুস্থ দেখিয়া ও রাজনৈতিক ব্যাপারের একটা মোটামুটি মীমাংসা হইয়াছে মনে করিয়া হৃষ্টমনে রবীন্দ্রনাথ অক্টোবর মাসের গোড়ায় শান্তিনিকেতন ফিরিয়া আসিলেন। 'অনুন্নত' সমাজের সহিত বর্ণহিন্দুদের যে রফা হইল, তাহা ইতিহাসে পুণাপ্যাক্ট (Poona Pact) নামে খ্যাত। ম্যাকডোনলডি প্রথম প্রস্তাবে ছিল যে মুসলমানদের ন্যায়ই তপশীলী সমাজ আপনাদের মধ্য হইতে সদস্য নির্বাচন করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরণ করিবে; গান্ধীজির অনশনের ফলে যে মীমাংসা হইল, তাহাতে স্থির হয় যে অনুন্নত সমাজের জন্য জনসংখ্যার অনুপাতে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য সংখ্যার পদ সংরক্ষিত থাকিবে এবং যুক্ত নির্বাচন অর্থাৎ বর্ণহিন্দু ও তপশীলীদের যুক্ত ভোটের দ্বারা 'সাধারণ' ও তপশীলী সদস্যরা নির্বাচিত হইবেন। সংবিধানে ভোটদাতারা তিনটি ভাগে বিভক্ত হইল— মুসলমান সাধারণ ও তপশীলী— 'হিন্দু' নামে কোনো 'ভোটার' নাই— তাহারা 'সাধারণ' শ্রেণী অন্তর্গত। গান্ধীজি এই পুণাপ্যাক্ট মানিয়া লইবার পর বাংলাদেশে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার কথা যথাস্থানে আসিবে। রবীন্দ্রনাথ এইসব কূটনীতিক ব্যাপারের মধ্যে প্রবেশ করেন নাই— গান্ধীজির প্রাণরক্ষার জন্য সকলেই উৎকণ্ঠিত— সুতরাং তিনি যাহা মানিয়া লইলেন তাহাতেই কবি সন্তুষ্ট হইলেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি গবর্মেণ্ট কন্‌গ্রেসকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান ঘোষণা করায় সকল প্রাদেশিক কন্‌গ্রেসও নিষিদ্ধ হইয়া যায়; তা ছাড়া কন্‌গ্রেসের অধিকাংশ নেতা ও কর্মী তখন জেলে— বাংলাদেশের একজন রাজনীতিবিদ্‌ও পুণাচুক্তির সময়ে উপস্থিত ছিলেন না।

এদিকে বিলাতে গান্ধীজির অনশন লইয়া বেশ একটু চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছিল। লন্‌ডনের শান্তিকামীদলের (Indian Conciliation Group) মুখপাত্ররূপে কার্ল হীদ্ রবীন্দ্রনাথের নিকট ভারতের সহিত সহযোগিতা সম্পর্কে দীর্ঘ এক কেব্‌ল পাঠান। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন হইতে ১৪ অক্টোবর তারিখে দীর্ঘ এক পত্রে তাহার উত্তর লিখিয়া পাঠান।

পুণা হইতে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়াছেন। তখন আশ্রমের মধ্যে সমাজসংস্কারের জন্য একটা উৎসাহ দেখা দিয়াছিল। অভয়-আশ্রমের প্রাক্তনকর্মী এখন রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থপ্রকাশন দপ্তরের সহিত যুক্ত সুধীরচন্দ্র করের নেতৃত্বে 'সংস্কার-সমিতি' স্থাপিত হয়। বিশ্বভারতী হইতে রবীন্দ্রনাথ যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন, তাহাতে এই সমিতির উদ্দেশ্য বিবৃত হয়:

১। কাহাকেও আমরা সামাজিকভাবে হীন মনে করিব না, অস্পৃশ্য করিয়া রাখিব না। সকল জাতিকেই জল-চল করিয়া লইতে হইবে।

২। সাধারণ মন্দির, পূজার স্থান ও জলাশয় সকলের জন্যই সমানভাবে উন্মুক্ত হইবে।

৩। বিদ্যালয়, তীর্থক্ষেত্র, সভাসমিতি প্রভৃতিতে কোথাও কাহারও আসিবার কোনো বাধা থাকিবে না।

৪। কাহারও জাতি লক্ষ্য করিয়া আত্মসম্মানে আঘাত দিবার অন্যায় ব্যবস্থা সমাজে থাকিবে না।

রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল, "বিনা দক্ষিণায় শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে দুর্গতদের ছেলে রাখিয়া অন্যান্য ছাত্রদের সহিত সমভাবে শিক্ষা দিয়া তাহাদের মধ্য হইতেই ভাবীকর্মী ও কেন্দ্রপরিচালক তৈরী করা।" এই ইস্তাহারে কবি সহি দেন ১৫ অগ্রহায়ণ ১৩৩৯ (১ ডিসেম্বর)। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জয়ন্তী উপলক্ষ্যে কবি মহাত্মাজি ও অনুন্নত জাতি সম্বন্ধে যে পুস্তিকা উৎসর্গ করেন, তাহার উপস্বত্ব এই 'সংস্কার-সমিতি'কে প্রদত্ত হইয়াছিল।

বিচিত্র কাজ

আমরা পূর্বে বলিয়াছি কবি পুণা হইতে ফিরিয়া কয়েকদিন শান্তিনিকেতনে থাকেন; সেই সময়ে কার্ল হীদ্‌কে পত্র দেন (১৪ অক্টোবর)। তার পর গঙ্গাতীরের খড়দহের বাসাবাড়িতে গিয়া বাস করেন। এইখান হইতে দেওয়ালির দিন (৩০ অক্টোবর) 'পুনশ্চ'র ছন্দাদি লইয়া যে দীর্ঘ পত্র ধূর্জটিপ্রসাদকে লিখিয়াছিলেন, তাহার কথা পূর্বে বলিয়াছি।

পূজাবকাশের পর নভেম্বরের গোড়ায় বিদ্যালয় খুলিলে কবিও শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন। পুণা যাইবার পূর্বে পুনশ্চর শেষ রচনা লেখেন ১৭ সেপ্টেম্বর; ফিরিয়া আবার ছিন্নসূত্র জোড়া দিবার আয়োজন চলিতেছে। 'দুই বোন' নামে যে-একটি গল্প অগস্ট মাসে খসড়া করিয়াছিলেন, সেইটি মাজিয়া-ঘসিয়া প্রকাশের উপযুক্ত করিলেন; 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রিকায় উহা ধারাবাহিক প্রকাশিত হইল (১৩৩৯ অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন)।

সাহিত্যের ফরমাশ খাটা, বিশ্বভারতীর দৈনন্দিন কাজকর্ম তদারকী— এসব তো জীবনের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হইয়াছে। তার মাঝে হঠাৎ একটি কবিতা পড়িয়া পাঠকের মনে হয় কবির অন্তর-রহস্যে কে প্রবেশ করিবে। কবিতাটি 'শেষ সপ্তক' কাব্যের প্রথম রচনা (১৭ নভেম্বর)। একি ত্রিশ বৎসর পূর্বে যে গৃহলক্ষ্মীকে এই অগ্রহায়ণ মাসে হারাইয়াছিলেন তাঁহারই স্মরণ অথবা কবিমানসের নিরর্থক বেদনা মাত্র?

আজ তুমি গেছ চলে,
দিনের পর দিন আসে, রাতের পর রাত,
তুমি আস না।
এতদিন পরে ভাণ্ডার খুলে দেখছি তোমার রত্নমালা,
নিয়েছি তুলে বুকে।
যে গর্ব আমার ছিল উদাসীন সে নুয়ে পড়েছে সেই মাটিতে
যেখানে তোমার দুটি পায়ের চিহ্ন আছে আঁকা।
তোমার প্রেমের দাম দেওয়া হল বেদনায়,
হারিয়ে তাই পেলেম তোমায় পূর্ণ ক'রে।[১]

কিন্তু অতীতের স্বপ্নদেখার সময় কোথায়? জরুরী পত্র লিখিতে হইতেছে কোচীন-মহারাজা বা জামোরিনকে। সেখানে সর্বজনের জন্য হিন্দুদের দেবমন্দির উন্মুক্ত করিয়া দিবার আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। রাজশক্তি উদাসীন—

১ শেষ সপ্তক (১) শান্তিনিকেতন, ১ অগ্রহায়ণ ১৩৩৯। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ. ৩-৪।

ব্রাহ্মণশক্তি বিরোধী। কেলাপ্পন নামে জনৈক সমাজসেবী বর্ণহিন্দুদের ব্যবহারের প্রতিবাদে অনশন ধর্মঘট করিয়া মন্দিরদ্বারে ধর্না দিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ এই সংবাদ পাইয়া জামোরিনকে এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়া হিন্দুমাত্রেরই দেবমন্দিরে প্রবেশের জন্মগত অধিকার স্বীকার করিয়া লইবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন (২ ডিসেম্বর)।

দেশের মধ্যে গান্ধীজির অনশনের প্রভাবে সর্বত্রই 'অচ্ছুত' অন্ত্যজহিন্দুদের মধ্যে দেবমন্দিরে সমঅধিকার পাইবার আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়াছে।

ডিসেম্বরের গোড়ায় কবি শান্তিনিকেতনে আছেন— আসিলেন (২ ডিসেম্বর) বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মদনমোহন মালব্য। আম্রকুঞ্জে সম্মানার্হ অতিথির যথোপযুক্ত অভিনন্দন করা হইল— রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁহাকে স্বাগত করেন। তাঁহার অতি সরল হিন্দীতে স্পষ্ট ভাষণ শ্রোতাদের পক্ষে আদৌ দুর্বোধ হয় নাই। পাঠকের মনে আছে সেপ্টেম্বর মাসে পুণায় কবির সঙ্গে মালব্যজীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

দেশের এই সমস্যার কথাই বোধ হয় প্রকাশ পায় এই সময়ে লিখিত 'শুচি' কবিতায় (পুনশ্চ)—

'লোকস্থিতি রক্ষা করতে হবে যে প্রভু'—
ব'লে গুরু চেয়ে রইলেন ঠাকুরের মুখের দিকে।
ঠাকুরের চক্ষু দীপ্ত হয়ে উঠল; বললেন,
'যে লোকসৃষ্টি স্বয়ং আমার,
যার প্রাঙ্গণে সকল মানুষের নিমন্ত্রণ,
তার মধ্যে তোমার লোকস্থিতির বেড়া তুলে
আমার অধিকারের সীমা দিতে চাও,
এতবড়ো স্পর্ধা!'

১৩০২ সালের চৈত্রমাসে রচিত চৈতালি কাব্যের তিনটি কবিতা এখানে স্মরণীয়— দেবতার বিদায়, পুণ্যের হিসাব ও বৈরাগ্য।

রবীন্দ্রনাথ ভালো করিয়া জানেন ভারতের সমস্যা কেবল বর্ণহিন্দু ও 'অন্ত্যজ'হিন্দুর মধ্যে সীমিত নহে—বিরাট মুসলমানসমাজ হিন্দুর নিকট অস্পৃশ্য। তাই গুরু রামানন্দ কেবল চণ্ডাল নাভাকে বুকে টানিলেন তাহা নহে, মুসলমান জোলা দরিদ্র কবীরকেও আলিঙ্গন করিয়াছিলেন—

কবীর বসেছেন তাঁর প্রাঙ্গণে,
কাপড় বুনছেন আর গান গাইছেন গুন্ গুন্ করে।
রামানন্দ বসলেন পাশে
কণ্ঠ তাঁর ধরলেন জড়িয়ে।
কবীর ব্যস্ত হয়ে বললেন,
'প্রভু, জাতিতে আমি মুসলমান,
আমি জোলা, নীচ আমার বৃত্তি।'
রামানন্দ বললেন, 'এতদিন তোমার সঙ্গ পাই নি বন্ধু,
তাই অন্তরে আমি নগ্ন,
চিত্ত আমার ধূলায় মলিন,

আজ আমি পরব শুচিবস্ত্র তোমার হাতে—
আমার লজ্জা যাবে দূর হয়ে।'
শিষ্যেরা খুঁজতে খুঁজতে এল সেখানে,
ধিক্‌কার দিয়ে বললে, 'এ কী করলেন প্রভু!'
রামানন্দ বললেন, 'আমার ঠাকুরকে এতদিন যেখানে হারিয়েছিলুম
আজ তাঁকে সেখানে পেয়েছি খুঁজে।'
সূর্য উঠল আকাশে
আলো এসে পড়ল গুরুর আনন্দিত মুখে।[১]

ডিসেম্বরের (১৯৩২) গোড়ায় কবি কলিকাতায় আসিয়াছেন— নানা আহ্বান। তার একটি হইতেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক'রূপে তাঁহার প্রথম ভাষণ দান কর্তব্য। ভাষণের বিষয় 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ';[২] কবি বলেন, "অপরিচিত আসনে অনভ্যস্ত কর্তব্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্বানের আসন চিরপ্রসিদ্ধ। সেই পাণ্ডিত্যের গৌরব-গম্ভীর পদে সহসা সাহিত্যিককে বসানো হল। সুতরাং এই রীতি-বিপর্যয় অত্যন্ত বেশি ক'রে চোখে পড়বার বিষয় হয়েছে।··· পুরাতনের সঙ্গে আমার অসংগতি থাকতে পারে, কিন্তু নূতন বিধানের নবোদ্যম হয়তো আমাকে তার আনুচর্যে গ্রহণ করতে অপ্রসন্ন হবে না।" তিনি আরও বলিলেন— "অনেকদিন থেকে ইংরেজি বিদ্যার খাঁচা স্থাবরভাবে আমাদের দেশে রাজবাড়ির দেউড়িতে রক্ষিত ছিল। এর দরজা খুলে দিয়ে দেশের চিত্তশক্তির জন্য যে নীড় নির্মাণ করতে হবে সব-প্রথমে আশুতোষ [মুখোপাধ্যায়] সে-কথা বুঝেছিলেন।··· বাংলাভাষা আজও সম্পূর্ণরূপে শিক্ষার ভাষা হবার মতো পাকা হয়ে ওঠেনি, সে কথা সত্য। কিন্তু আশুতোষ জানতেন যে, না-হবার কারণ তার নিজের শক্তিদৈন্যের মধ্যে নেই, আছে তার অবস্থাদৈন্যের মধ্যে।"

কবি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত যোগ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলিলেন, "আমার মহৎ সৌভাগ্য এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বদেশীভাষায় দীক্ষিত করে নেবার পুণ্য অনুষ্ঠানে আমারও কিছু হাত রইল, অন্তত নামটা রয়ে গেল। আমি মনে করি যে, স্বদেশের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলন-সেতুরূপেই আমাকে আহ্বান করা হয়েছে। স্বদেশীভাষায় চিরজীবন আমি যে সাধনা করে এসেছি সেই সাধনাকে সম্মান দেবার জন্যেই বিশ্ববিদ্যালয় আজ তাঁর সভায় আমাকে আসন দিলেন। দুই কালের সন্ধিস্থলে আমাকে রাখলেন একটি চিহ্নের মতো। দেখলেম, যথারীতি আমাকে পদবী দেওয়া হয়েছে অধ্যাপক; এ পদবীতে যথেষ্ট সম্মান, কিন্তু আমার পক্ষে এটা অসংগত। এর দায়িত্ব আছে, সে-ও আমার পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব। সাহিত্যের প্রত্নতত্ত্ব, তার শব্দের উৎপত্তি ও বিশিষ্ট উপাদান, অর্থাৎ সাহিত্যের নাড়ীনক্ষত্র আমার অভিজ্ঞতার বহির্ভূত। আমি অনুশীলন করেছি তার অখণ্ড রূপ, তার গতি, তার ভঙ্গী, তার ইঙ্গিত।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই দীর্ঘ ভাষণে য়ুনিভার্সিটির উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপন করেন নাই; তবে আমাদের দেশের নালন্দা তক্ষশিলা প্রভৃতি স্থানে নানা জ্ঞানচর্চার কী রূপ ছিল এবং কেন দেশবিদেশ হইতে ভিক্ষু-ছাত্ররা এইসকল বিদ্যাকেন্দ্রে আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই প্রবন্ধে পাই। কবি বলেন, আমাদের

১ শুচি, পুনশ্চ। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৬, পৃ. ১০৩।

২ বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ [জানুয়ারি ১৯৩৩ মুদ্রিত], কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। দ্র. শিক্ষা, বিশ্বভারতী সংস্করণ।

দেশে বর্তমানে যে য়ুনিভার্সিটি স্থাপিত হইয়াছে তাহা ব্রিটিশ শিক্ষায়তনের অনুকরণে রচিত ; কিন্তু এখানে অনুকরণও সম্পূর্ণ হয় নাই, সেখানেও দারুণ ভেদ। পাশ্চাত্য য়ুনিভার্সিটিগুলি বিদ্যার ও জ্ঞানের কেন্দ্র— ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি জ্ঞানের দাতা তো নহেই, গ্রহীতারূপেও সে সার্থক নহে।

আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিজ নিজ জাতির সংস্কৃতি ও জ্ঞানের রক্ষীও বটে, প্রচারকও বটে। নানা যুগের ধ্রুব আদর্শগুলি যেমন মনের সম্মুখে বিধৃত সঞ্চিত করিয়া তাহারা পরিবেশন করে, তেমনি প্রচলিত সাহিত্য আলোচনা ও সমস্যামূলক প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টাও চলে যুগপৎ। 'পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বাহিরের এই চিত্তমথনের সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন নয়।' মানুষের শিক্ষার এই দুই ধারা— তাহার জাতীয় সংস্কৃতির ধারা সংরক্ষণ ও আধুনিক যুগের বিশ্বব্যাপী সমস্যা সমাধানকল্পে তাহার কর্তব্য নির্ধারণ— এই দুইটিই পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ধারায় মিলিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ যে, পাশ্চাত্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাধারায় যে স্বাভাবিক প্রাণগতি দেখা যায়, আমাদের দেশের শিক্ষায় তাহার একান্ত অভাব। দেশের প্রাণের সঙ্গে, তাহার সমস্যার সঙ্গে এই জ্ঞানের সম্বন্ধ অতি ক্ষীণ। কিভাবে তাহা ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ গ্রহণ করিতে পারে, তাহার রেখাঙ্কন পাই এই ভাষণে। এই ভাষণে কবি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যে সজীবতা, দেশের নাড়ীর সঙ্গে তাহার যে যোগ থাকা একান্ত প্রয়োজনীয় তাহা প্রাচীন ও আধুনিক দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট করিয়া বলেন।

কলিকাতায় আসিবার কয়েকদিন পরে ১১ ডিসেম্বর টাউনহলে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সংবর্ধনা ; তাঁহার সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে এই জয়ন্তী-সভা— রবীন্দ্রনাথ সভাপতি। ১৮৬১ সালে ২ অগস্ট প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম হয়— সুতরাং তিনি রবীন্দ্রনাথ হইতে মাত্র তিন মাসের কনিষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণটি পাঠ করিলেন— উহা তাঁহার জন্মমাসে (২২ অগস্ট ১৯৩২)[১] লিখিত হয়। এই ভাষণের একস্থানে কবি বলেন, "আমি প্রফুল্লচন্দ্রকে তাঁর সেই আসনে অভিনন্দন জানাই, যে-আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি তাঁর ছাত্রের চিত্তাকে উদ্বোধিত করেছেন, কেবলমাত্র তাকে জ্ঞান দেন নি, নিজেকে দিয়েছেন, সে দানের প্রভাবে ছাত্র নিজেকে পেয়েছে।. . বস্তুজগতে প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উদ্‌ঘাটিত করেন বৈজ্ঞানিক, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তার থেকে গভীরে প্রবেশ করেছেন, কত যুবকের মনোলোকে ব্যক্ত করেছেন তার গুহাহিত অনভিব্যক্ত দৃষ্টিশক্তি, বিচারশক্তি, বোধশক্তি।" কবির মনে আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে রূপ আছে, তাহা যেন তিনি আচার্যের জীবনে দেখিতে পাইয়াছেন।[২]

কলিকাতায় আসিলেই পাঁচমিশালি[৩] কাজ আসিয়া পড়ে। প্রফুল্লজয়ন্তীর পরদিন (১২ ডিসেম্বর) জাপানি কন্সাল-জেনারেলের বাটীতে নিমন্ত্রণ— জাপানের অন্যতম শ্রেষ্ঠশিল্পী কোসেৎসু-নসু আসিয়াছেন— কাশী-সারনাথের

১ ২২ অগস্ট ১৯৩২ [৬ ভাদ্র ১৩৩৯] 'পুনশ্চ'র কবিতাগুলি এই দিন ছাড়া পূর্বে ও পরে লিখিতেছিলেন। শান্তিনিকেতনে লিখিত। ১১ ডিসেম্বর [২৫ অগ্রহায়ণ]। এই দিন কলিকাতায় লেখেন 'রঙরেজিনি' (পুনশ্চ)।

২ *Mahatmaji and Depressed Humanity* পুস্তিকা প্রফুল্লচন্দ্রের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীত হয় in appreciation of his self-sacrifice for his country and his students। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে 'সংস্কারসমিতি' সম্বন্ধে বলা আছে।

৩ ইংরেজ সাংবাদিক, নিউ লাডারএর সম্পাদক H. N. Brailsford (b. 1878) ১৯৩০ সালে ভারতের আইন-অমান্য আন্দোলনের সময়ে ভারতভ্রমণে আসেন। তিনি *Rebel India* নামে একখানি গ্রন্থ লেখেন (১৯৩২)। রবীন্দ্রনাথ সেই গ্রন্থ পাঠ করিয়া লেখেন, "Rebel India...is an honest book. Reading it I feel encouraged to hope that individual Englishman in our land will emulate his attitude of sober judgment and no matter how inconvenient it may be to do so, dare face facts as they really are today in India."— Modern Review 1933 January।

মূলগন্ধীকুটির নবনির্মিত বিহারের প্রাচীরচিত্র অঙ্কন করিবার জন্য; ইঁহার সহিত কথাবার্তা কহিবার জন্য কবিকে নিমন্ত্রণ। এক বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ এই বিহার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে দার্জিলিঙ বাসকালে একটি কবিতা (২৪ অক্টোবর ১৯৩১) লিখিয়াছিলেন।

পৌষ-উৎসবের পূর্বে শান্তিনিকেতনে ফিরিবার জন্য মন উৎসুক, কিন্তু সহজে মহানগরী হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছেন না; ১৮ ডিসেম্বর চৌরঙ্গীতে বিড়লাদের বেঙ্গল স্টোর্স নামে বিপণীর দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে হইল। এই শ্রেণীর কাজ কবিকে আরও করিতে হয়— বাধ্য হইয়া। ধনিকদের কাছে বিশ্বভারতীর সাধারণ তহবিলের জন্য আচার্যের তহবিলের জন্য (প্রেসিডেন্টস্ ফাণ্ড) তাঁহাকে উপস্থিত হইতে হয়— সুতরাং তাহাদের অনুরোধ এড়াইতে পারেন না। বিড়লাদের কাছে তো কয়েকবারই হাত পাতিতে হইয়াছে। অত্যন্ত ক্লান্ত দেহে, মনের রুচির বিরুদ্ধে মনের সঙ্গে আপোস করিয়া হাস্যমুখে দ্বার উদ্‌ঘাটন উৎসব করিয়া আসিলেন।

আর যে-একটি অনুষ্ঠানে যোগদান করিলেন তাহা সম্পূর্ণ সামাজিক ব্যাপার। কোচবিহারের রাজমাতা সুনীতি দেবীর মৃত্যু উপলক্ষ্যে শ্রাদ্ধসভায় রবীন্দ্রনাথকে সভাপতিত্ব করিতে হয়। সুনীতি দেবীর সহিত কবির দীর্ঘদিনের পরিচয়। দার্জিলিঙে তাঁহাদের উড্‌ল্যানডস বাড়িতে ও আলিপুরে তাঁহাদের প্রাসাদে বহুবার গিয়াছিলেন; সান্ধ্য মজলিশে কত গল্প বলিয়া তাঁহাদের উৎচকিত করিতেন। কবি সভায় বলিলেন যে, কেশবচন্দ্র সেন যখন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের পর তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া জোড়াসাঁকোর বাটীতে তাঁহার পিতৃদেবের আশ্রয়ে আসিয়া বাস করিতে বাধ্য হন, তখন রবীন্দ্রনাথ শিশু এবং সুনীতি দেবীর পূর্বেই তিনি তাঁহার জননীর কোলে আসন লাভ করেন। আজ তিনি পরলোকে। কবি বলিলেন, আজ তিনি যে বয়সে পৌঁছিয়াছেন, সেখানে মৃত্যু আর মিথ্যা রূপ ধরিতে পারে না। মৃত্যুর জন্য দুঃখ করা তাঁহার আর সম্ভব নয়।

শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন পৌষ-উৎসবের মুখে। সাতই পৌষ (১৩৩৯) মন্দিরে উপাসনা[১], ৮ই প্রাক্তন ছাত্র সম্মেলনে ভাষণ ও বিশ্বভারতীর বার্ষিক সভায় শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের উদ্‌ভব সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ ভাষণ দান করেন। এই আশ্রমবিদ্যালয় স্থাপনের মূল অভিপ্রায়টুকু একটি বাক্যের মধ্যে প্রকাশ করিয়া বলেন, "মানুষ বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবসংসার এই দুইয়ের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছে, অতএব এই দুইকে একত্র সমাবেশ করে বালকদের শিক্ষায়তন গড়লে তবেই শিক্ষার পূর্ণতা ও মানবজীবনের সমগ্রতা হয়।"[২]

সেই সন্ধ্যায় খ্রীষ্টোৎসবেও কবি ভাষণ দেন। কবি বলেন, "আমাদের জীবনে তাঁর বড়দিন দৈবাৎ আসে, কিন্তু ক্রুসে বিদ্ধ তাঁর মৃত্যু সে তো আসে দিনের পর দিন।‥ লোভ আজ নিদারুণ, দুর্বলের অন্নগ্রাস আজ লুণ্ঠিত, প্রবলের সামনে দাঁড়িয়ে মৃত্যুশূলবিদ্ধ সেই কারুণিকের জয়ধ্বনি করচে, অভ্যস্ত বচন আবৃত্তি ক'রে। তবে কিসের উৎসব আজ? ··· আজও তিনি মানুষের ইতিহাসে প্রতিমুহূর্তে ক্রুসে বিদ্ধ হচ্চেন।"[৩] এই কথাই 'মানবপুত্র' (পুনশ্চ) কবিতায় প্রকাশ করিয়াছিলেন (১৩৩৯ শ্রাবণ)।

কবির বড়দিনের ভাষণগুলি প্রায়ই খ্রীষ্টের আত্মাহুতির কথায় পূর্ণ। কিন্তু আসলে এই দিনটি আনন্দের দিন— যিশুর জন্ম— ত্রাণকর্তার আবির্ভাবের উৎসব দিন।

১ নবযুগ (শ্রীপুলিনবিহারী সেন কর্তৃক অনুলিখিত), প্রবাসী ১৩৩৯ মাঘ, পৃ. ৫২৫। Visva-Bharati News, Vol. I. pp. 60-65।

২ শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত কর্তৃক অনুলিখিত। ভাষণটি Visva-Bharati News 1933 January সংখ্যায় 'আচার্যদেবের অভিভাষণ' আখ্যায় প্রকাশিত হয়। দ্র. বিশ্বভারতী ১৩৫১, ১৫ সংখ্যক ভাষণ, পৃ. ১২১-১৩২।

৩ বড়দিন: ২৫ ডিসেম্বর ১৯৩২। প্রবাসী ১৩৩৯ মাঘ, পৃ. ৪৬৫-৬৬। দ্র. খৃষ্ট; ১৯৫৯, ২৫ ডিসেম্বর; পৃ. ৪০-৪৩।

উৎসবান্তে কবিকে পুনরায় কলিকাতায় যাইতে হয়। ২৯ ডিসেম্বর (১৯৩২) সার্ ডানিয়েল হামিলটনের গোসাবা পল্লীকেন্দ্র দেখিতে যান। কলিকাতার দক্ষিণে ক্যানিং টাউন হইতে মোটরলঞ্চযোগে সুন্দরবনের অন্তর্গত এই স্থানে যাইতে হয়।[১] "সুন্দরবন অঞ্চলে চাষ-আবাদ প্রবর্তনের জন্য সার্ ডানিয়েল [বঙ্গীয়] সরকারের নিকট হইতে বহু জমি গ্রহণ করিয়া গোসাবায় একটি আদর্শ কৃষি-উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এখানে ভদ্র ও বেকার যুবকগণকে অতি সুলভে বাসস্থান ও কৃষিকার্যের উপযোগী জমি বিলির ব্যবস্থা আছে। সার্ ডানিয়েলের প্রচেষ্টায় শ্বাপদ-সংকুল সুন্দরবনের মধ্যে গোসাবা একটি আদর্শ-পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। এখানে সাধারণ শিক্ষার সহিত হাতে-কলমে কৃষিশিক্ষা দেওয়ার প্রতিষ্ঠান আছে। এখানে সুন্দর পথঘাট নির্মিত হইয়াছে, যৌথভাণ্ডার আছে, সুপেয় জলের ব্যবস্থা আছে, উৎপন্ন দ্রব্যের খরিদ-বিক্রয়ের জন্য উপযুক্ত বন্দোবস্ত রহিয়াছে। ইহার এলাকার মধ্যে বিনিময়ের জন্য 'গোসাবানোট' নামক একপ্রকার নোটও প্রচলিত আছে। অতিথি অভ্যাগতগণের থাকিবার জন্য গোসাবায় একটি গেস্টহাউস বা অতিথিশালা আছে।"

পাঠকদের স্মরণ আছে কয়েক বৎসর পূর্বে সার্ ডানিয়েল শ্রীনিকেতনে আসেন, তখন কবিকে গোসাবা দেখিয়া আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছিলেন। কবি দুই দিন গোসাবায় ছিলেন এবং তন্নতন্ন করিয়া সেখানকার কাজকর্ম পরিদর্শন করেন। গোসাবা হইতে ফিরিয়া একদিন কলিকাতার অন্তঃপাতী 'কেশোরাম কটন মিলস' দেখিতে যান। এই মিলের মালিক বিড়লারা— তাঁহাদের একান্ত ইচ্ছায় সেখানে যাইতে হয়। প্রায় দুই ঘণ্টা মিলের নানা বিভাগের কাজ তাঁহাকে দেখানো হয়; কবিরও জানিবার ও বুঝিবার তৃষ্ণা অসীম; প্রাঙ্গণে মিলের প্রায় বারো হাজার কর্মী কবিকে স্বাগত করে।

জানুয়ারির গোড়ায় (১৯৩৩) কবি আশ্রমে ফিরিয়া আসেন। এই সময়ে পারস্যের শাহ, রেজা শাহ পহ্লবী শান্তিনিকেতনের জন্য আগা পুরে দাউদ নামে একজন খ্যাতনামা পারসিক অধ্যাপককে পাঠাইয়া দেন। ইনি জারমেনিপ্রবাসী, প্রাচীন ইরানী-সাহিত্য ও -ভাষায় সুপণ্ডিত, এ ছাড়া একজন সুকবি। বোম্বাই হইতে পারসীসমাজ ইঁহার সঙ্গে একজন সুশিক্ষিত পারসীযুবকও পাঠাইয়াছিলেন। ৯ জানুয়ারি শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক পুরে দাউদের অভ্যর্থনার জন্য যে সভা হয়, তাহাতে কবি উপস্থিত থাকেন এবং একটি লিখিত ভাষণে অধ্যাপককে স্বাগত করিয়া বলেন, "The memory of that ancient union still runs in our blood, and in this great age of Asia's awakening we are once discovering our affinities, we are rescuing from the debris of vanished ages the undying memorials of our co-operation"।

এখানে আর-একটি ক্ষুদ্র ঘটনা উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে বার্নাড্ শ (Shaw) পৃথিবী ভ্রমণ করিতে করিতে বোম্বাই বন্দরে আসিয়া পৌঁছান। ১০ জানুয়ারি কবি তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া টেলিগ্রাম পাঠান। শ জবাবে তার করেন যে, তাঁহার এই ছিয়াত্তর বৎসর বয়সে ঘোরাঘুরি সহিবে না; তবে 'My only regret is that I shall be unable to visit you'।

১ বাংলায় ভ্রমণ, ১ম খণ্ড; পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচারবিভাগ হইতে প্রকাশিত ২য় সংস্করণ, ১৯৪০; পৃ. ১৭৮।

'মানুষের ধর্ম'

জানুয়ারি মাসের (১৯৩৩) মাঝামাঝি কবিকে পুনরায় কলিকাতায় যাইতে হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ে 'কমলা লেকচার' দিতে হইবে। সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহার স্বর্গতা কন্যা কমলার নামে ১৯২৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে চল্লিশ হাজার টাকা দিয়া 'কমলা লেকচার' প্রবর্তিত করেন। বক্তারা নগদে এক হাজার টাকা ও দুই শত টাকা মূল্যের একটি পদক পাইয়া থাকেন। গত অগস্ট (১৯৩২) মাসে সিনেট রবীন্দ্রনাথকে এই বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। এতদিন পরে জানুয়ারি মাসের ১৬, ১৮ ও ২০ (৩, ৫, ৭ মাঘ ১৩৩৯) তারিখে কবি সিনেট হলে 'মানুষের ধর্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন।[১]

পূজাবকাশের পর বিদ্যালয় খুলিলে কবি এই বক্তৃতাধারা লিখিতে আরম্ভ করেন। প্রমথ চৌধুরীকে লিখিতেছেন (১৫ নভেম্বর ১৯৩২), "কমলা লেকচার নিয়ে পড়েচি। বিষয়টা মানবের ধর্ম। সহজ করে সরস করে গৌড়ীয় ভাষায় লেখা দুঃসাধ্য কাজ। কেননা ভাষার অস্পষ্টতাবশত হঠাৎ লোকের মনে হতে পারে এ সমস্তই জানা কথা। নতুন জিনিসকে নতুন বলে উপলব্ধি করানো বাংলাভাষায় সহজ নয়।"[২]

বহু বৎসর পূর্বে (১৩১১) 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের অন্তর্গত তাঁহার [আত্মজীবনী] ও সবুজ পত্রের যুগে লিখিত 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে কবি তাঁহার আন্তরজীবনের অভিব্যক্তির কথা আলোচনা করিয়াছিলেন; কবি-জীবনের এই অনির্দেশ্য অজ্ঞাত শক্তি বা প্রেরণাকে বলিয়াছিলেন 'জীবনদেবতা'। 'জীবনদেবতা'র রহস্যবাদ সম্বন্ধে আমরা সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি। আমাদের এই আলোচ্যপর্বেও জীবনদেবতা সম্বন্ধে কবি লেখেন 'মানবসত্য' নামক প্রবন্ধে। এই তত্ত্বের পুনরবতারণ অবান্তর হইবে।

রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মনীষীর পক্ষে জীবন-জিজ্ঞাসাকে কেবলমাত্র কবির দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিয়াই তৃপ্ত হওয়া সম্ভব নহে। রবীন্দ্রনাথের জীবনী যাঁহারা পড়িয়া আসিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, কবি একজায়গায় কঠোর যুক্তিবাদী, সমালোচক এমনকি তার্কিক। বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে বিশ্বতত্ত্বকে বুঝিবার চেষ্টা তাঁহার আবাল্যের সাধনা। কিন্তু কবির ভাবময় সৃষ্টির মূল উৎস যে ধ্যানলোক, সে-কথা কবিজীবনী আলোচনাকালে আমরা যেন বিস্মৃত না হই। বলা বাহুল্য, গভীরধ্যানযোগ ব্যতীত বৃহৎ ভাবনা রূপ লয় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিজের মত যে, "এই সর্বমানুষের জীবনদেবতার দর্শনের কথাগুলিকে দর্শনের কোঠার মধ্যে ফেললে ভুল হবে। তাকে মতবাদের একটা আকার দিতে হয়েছে, কিন্তু বস্তুত সে কবিচিত্তের একটা অভিজ্ঞতা (মানবসত্য)।"

*The Religion of Man*এ তিনি বলিয়াছেন, "The idea of the humanity of our God or the Divinity of Man the Eternal, is the main subject of this book. This thought of God has not grown in my mind through any process of philosophical reasoning ... it suddenly flashed ··· with a direct vision" (p 15)। এই visionকেই পণ্ডিতেরা বলেন intuition। ভাবুকরা বলেন inspiration, ভক্তেরা বলেন revelation। কাব্যকলা অনুভূতি হইতে উৎসারিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনপ্রশ্ন ভাব বা অনুভূতির রাজ্যে সীমায়িত নহে। তাঁহার বিরাট সাহিত্যের অনেকখানি গভীর মনন বা intellectএর কোঠায় পড়ে। 'মানুষের ধর্মে' কবি যাহা বলিয়াছেন তাহা জীবনদেবতার কথা হইলেও বিশ্বদেবতা আছেন তাহার মূলে।

১ ইতিপূর্বে ১৯২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে জগত্তারিণী পদক প্রদান করেন; কবিই প্রথম প্রাপক।

২ চিঠিপত্র ৫, পত্র ১০৯ : ২৯ কার্তিক ১৩৩৯।

কিন্তু intuition ও intellectএর কথা উঠিলে একটা প্রশ্ন স্বভাবতই উঠে। সাধারণত intuitionকে অহেতুকী অনুভব বলা হয়। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন বা সমস্যা অন্য প্রকারের। যে-কবি intuition বা visionকে তাঁহার কাব্যসৃষ্টির উৎস বলিয়া দাবি করেন, তাঁহার মন বা ভাবনার উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করিলে আমরা কী পাই। একটি মানুষের মনের পিছনে আছে অসংখ্য সংস্কার— বংশগত সমাজগত জাতিগত ভাষাগত বিচিত্র উপাদানে গঠিত তিনি। জৈব ও ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ভৌগোলিক বিবিধ কার্যকারণ-পরম্পরা-গঠিত মানবের এই দেহ ও মন; তাহার ব্যক্তিপুরুষ (Personality) সৃজিত হইতেছে এই বিচিত্র উপকরণের ঘাত-প্রতিঘাতে। এইসবের ভার যুগযুগান্ত ধরিয়া মানুষ বহন করিয়া আসিতেছে। এই সমস্তের পুঞ্জীভূত ভালো-মন্দের সংস্কার আমার অহং বা আত্মাকে রূপ দিয়াছে; এবং পারিপার্শ্বিকের নিত্য প্রভাব ও সাহচর্য নব নব পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া মানুষকে জটিল জীব রূপে গড়িতেছে। এই প্রত্যেকটি মানুষই unique— তাহার দ্বিতীয় কেহ নাই, কেহ ছিল না, কখনো হইবে না। এই self বা অহং-এর বোধি ও বুদ্ধি এই সকল বিচিত্র সংস্কার দ্বারা বিধৃত। প্রত্যেক মানুষ, বিচিত্রের প্রতীক। সে-'আমি'র কত আবরণ যুগযুগান্ত হইতে সঞ্চিত হইয়াছে— "জানি জানি কোন্ আদি কাল হতে ভাসালে আমারে জীবনের স্রোতে।" এই গানে কবি জীবনের এই অনন্ত ঐতিহ্যের কথা বলিয়াছেন। এই সংস্কার-বিজড়িত 'আমি'র বোধি যে ভুলভ্রান্তিতে মলিন হয় না, তাহা কেহ জোর করিয়া বলিতে পারেন না; তাহা না হইলে এত মত এত পথ হইত না; প্রেরণার দাবী সকলেই করিয়াছেন, কিন্তু সকলের কাছ হইতে সাড়া পাওয়া যায় না— বিশেষ টাইপ-এর লোকে বিশেষ বাণীতে সাড়া দেয়। সকলে একবাণী শোনেও না, একই বাণীকে অনুসরণ করে না।

আমাদের বক্তব্য রবীন্দ্রনাথের বোধি গভীর মননস্তর হইতে উৎসরিত উৎসের ন্যায়; কিভাবে বোধ হইতে বোধি ভাবরূপে প্রকাশ পায় সে ইতিহাস অব্যক্ত অজ্ঞেয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র কাব্যপ্রবাহ ও বিবিধ গদ্যধারার গতি সমান্তরালে— মিলিবার সাধারণ ক্ষেত্র কোথাও নাই; কারণ সাধারণভাবে আমরা বলি কাব্যের উৎস বোধি (intuition) ও গদ্যের উৎস বোধ (intellect)। কিন্তু একটি অখণ্ড জীবনে এভাবে ছককাটা যায় না। আসলে কবিজীবনে বোধি ও বোধের উৎসস্থল ধ্যানক্ষেত্র; ধ্যানের সেই তৃতীয় নেত্রে জীবনদেবতা ও বিশ্বদেবতা এক বিশ্বাত্মা— যাহাকে সাধকরা বলিয়াছেন সোঽহং-তত্ত্ব। কবিতার মধ্যে জীবনদেবতা তত্ত্ব— দ্বৈতভাবে জীবাত্মার প্রকাশ সেখানে; কবির 'ধর্মা'দি গ্রন্থে দ্বৈতাদ্বৈতভাবে পরমাত্মার এবং 'মানুষের ধর্মে' বিশ্বাত্মার সোঽহং-তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কবির সোঽহং অদ্বৈতবাদীর সোঽহং হইতে পৃথক, তাহার আলোচনা পরে আসিবে।

'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থখানি রবীন্দ্রনাথের ধর্মদেশনার শেষ গ্রন্থ। তাঁহার দীর্ঘ জীবনের ধর্মভাবনার নির্গলিত রূপ, রচনার শৈলীতেও ইহা অপরূপ। রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষার্ধ ভাগ— অর্থাৎ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম -স্থাপনের সময় হইতে মহাপ্রয়াণ পর্যন্ত চল্লিশ বৎসরের পর্বে কবি অসংখ্য ধর্মভাষণ দিয়াছিলেন; তাহার অধিকাংশ লিখিত, এবং গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। পত্রিকার মধ্যে মুদ্রিত ও গ্রন্থ-মধ্যে সন্নিবেশিত হয় নাই এমন ভাষণের সংখ্যাও কম নহে। মন্দিরে কথিত ও লিখিত হয় নাই অথবা অন্যের দ্বারা অনুলিখিত এ শ্রেণীর ভাষণের সংখ্যা বলা কঠিন। এ ছাড়া কলিকাতায় ও মফঃস্বলে এবং বিদেশে ধর্মসংক্রান্ত যে-সব উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার সম্যক্ ইতিহাস জানা যায় না। এই ধর্মদেশনা-সাহিত্য বিরাট; ধর্ম শান্তিনিকেতন পরিচয় ও সঞ্চয়-এর মধ্যে কিয়দংশ সংগৃহীত হইয়াছে। 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থ এইসকল ভাবনার সারমর্ম— সমস্ত জীবনের ধ্যান-মন্থনজাত কৌস্তুভমণি সদৃশ।

'মানুষের ধর্মে'র বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে, ইহাই একমাত্র গ্রন্থ যাহাতে কবি ধারাবাহিকভাবে তাঁহার ধর্মমতকে স্পষ্ট করিয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের মতে 'রবীন্দ্র-দর্শন' সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের পক্ষে এই গ্রন্থ অপরিহার্য। একজন আধুনিক লেখক[১] যথার্থই বলিয়াছেন যে হিন্দুধর্ম ও দর্শনশাস্ত্র যেমন 'ব্রহ্মসূত্রে' গ্রথিত, সমগ্র রবীন্দ্রদর্শন ও রবীন্দ্রসাহিত্য তেমনই এই গ্রন্থে সংক্ষেপে প্রায় সূত্রাকারে কথিত হইয়াছে। সেইজন্য গ্রন্থখানির প্রায় প্রত্যেকটি বাক্য গভীর মনসংযোগের সহিত অধীতব্য, কেবল পঠনীয় নহে। আমরা আশা করি ভাবীকালে কোনো মনীষী রবীন্দ্রসাহিত্য মন্থন বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ দ্বারা রবীন্দ্রদর্শন প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

'মানুষের ধর্ম' কথা আমাদের কানে অনভ্যস্ত; চিরদিন লোকে শুনিয়া আসিতেছে হিন্দুর ধর্ম, মুসলমানের ধর্ম, খ্রীষ্টানের ধর্ম। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও লোকের মধ্যে একটি নৈর্ব্যক্তিক মানুষের কল্পনা আছে, নহিলে লোকে বলিত না— 'কাজটা মানুষের মতো হল না।' কিন্তু সাধারণভাবে মানুষ বলিতে আমরা জানি 'জাত' বা 'জাতি'— ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র— অথবা কামার কুমোর তাঁতি জোলা; আর 'জাতি' রূপে জানি ইংরেজ রুশ জাপানি চীনা। বলা বাহুল্য সভ্যতার আদিযুগ হইতে এই চিন্তাধারায় লোকে অভ্যস্ত; কেবল মাঝে মাঝে কোনো মহাপুরুষ আসিয়া মানুষের এই মূঢ়তাকে আঘাত করিয়া গিয়াছেন— তাঁহারা বিশ্বমানবের কথাই বলিয়াছেন— যে-মানুষ বিশেষ 'জাতে'র মানুষ নহে, যে-মানুষ নৈর্ব্যক্তিক চিরমানব। এই মানবের রহস্যভেদ করিবার জন্য বিজ্ঞান ও দর্শনের চেষ্টা চলিতেছে মানবসৃষ্টির প্রায় আদিযুগ হইতে। য়ুরোপে প্লাতুন (Plato) হইতে কাসিরের (Cassirer) পর্যন্ত বহু মনীষী এই প্রশ্নই করিয়াছেন— মানুষ কী? অধ্যাপক Dorsey তাঁহার এক গ্রন্থের নাম দিয়াছেন '*Why we behave like human beings*।' ডাক্তার Alexis Carol মানুষকে বলিয়াছেন— 'Man the Unknown।' রবীন্দ্রনাথ সেই রহস্যময় মানুষের লক্ষণ কী তাহারই আলোচনা করিলেন এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তিনটি মাত্র প্রবন্ধে।

রবীন্দ্রনাথ *Religion of Man* গ্রন্থে religion শব্দ যেভাবে ব্যবহার করিলেন তাহার বৈশিষ্ট্য আছে। কারণ, religion শব্দের সঙ্গে dogma, ritual বা বিশেষ মতবাদ ও ক্রিয়াকাণ্ড ইহলোক-পরলোক আত্মা-অনাত্মা পাপ-পুণ্য প্রভৃতি বিচিত্র বিষয় ওতপ্রোত যুক্ত। আমাদের 'ধর্ম' শব্দ religion বলিয়া ইংরেজিতে লেখা হয় সত্য, কিন্তু সংস্কৃতে 'ধর্ম' শব্দর অর্থ বিচিত্র। ধর্মশাস্ত্র বলিলে religious scripture বুঝায় না— ধর্মশাস্ত্রর অর্থ code of laws বা conduct। এ ছাড়াও আমরা বলি জলের 'ধর্ম' শৈত্য, অগ্নির 'ধর্ম' তাপ, ইহারা properties of matter বা পদার্থের গুণাগুণ। তেমনই আবার বলি সর্পের ধর্ম দংশন, ব্যাঘ্রের ধর্ম হিংসা, রাজার ধর্ম প্রজারঞ্জন। এ সবই ধর্ম। সেইরূপ নৈর্ব্যক্তিক মানুষের কোনো 'ধর্ম' আছে কিনা, ইহাই হইতেছে কবির জিজ্ঞাসা।

রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করিয়াছেন, "কোন্ মানুষের ধর্ম। এতে কার পাই পরিচয়। এ তো সাধারণ মানুষের ধর্ম নয়, তাহলে এর জন্যে সাধনা করতে হত না।

"আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ' তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায় ভাবে কর্মে সর্বজনীনতার আবির্ভাব। মহাত্মারা সহজে তাঁকে অনুভব করেন সকল মানুষের মধ্যে, তাঁর প্রেমে সহজে জীবন উৎসর্গ করেন। সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবসীমা অতিক্রম ক'রে মানবসীমায় উত্তীর্ণ হয়। সেই

১ অমলেন্দু দাশগুপ্ত, বিশ্বভারতী পত্রিকা ৯ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৩৫৮, পৃ. ৫৮।

মানুষের উপলব্ধি সর্বত্র সমান নয় ও অনেক স্থলে বিকৃত ব'লেই সব মানুষ আজও মানুষ হয় নি। কিন্তু, তাঁর আকর্ষণ নিয়ত মানুষের অন্তর থেকে কাজ করছে বলেই আত্মপ্রকাশের প্রত্যাশায় ও প্রয়াসে মানুষ কোথাও সীমাকে স্বীকার করছে না। সেই মানবকেই মানুষ নানা নামে পূজা করছে, তাঁকেই বলেছে 'এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা'। সকল মানবের ঐক্যের মধ্যে নিজের বিচ্ছিন্নতাকে পেরিয়ে তাঁকে পাবে আশা করে তাঁর উদ্দেশে প্রার্থনা জানিয়েছে— 'স দেবঃ সনো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু'।" সেই মানব সেই দেবতা, যিনি এক, তাঁহার কথাই কবির বক্তৃতার বিষয়।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মদেশনাগুলির পটভূমি ভারতীয় তথা হিন্দু; সংস্কৃত ভাষার তথাকথিত শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে উদ্‌ধৃতাংশ রচনা মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়। পাঠকদের সন্দেহ হইতে পারে যে, এইসব সংস্কৃতগ্রন্থ এমনকি উপনিষদাদিকে কবি authority-জ্ঞানে উদ্‌ধৃত করিয়াছেন; ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত তাঁহার যে যোগ, তাহা যে অখণ্ড প্রবহমান সভ্যতার অংশমাত্র— এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উপনিষদাদি গ্রন্থ হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধার করিয়াছেন— তাঁহার অন্তরের সহিত তাহার সায় পাইয়াছেন বলিয়া সেগুলি উদ্‌ধৃত হইয়াছে। Plato সম্বন্ধে বলা হইয়াছে "He himself had no interest whatsoever in the thoughts or words of his predecessors, except in so far as they aided him in understanding himself and the world around him, though he often consulted them and wrestled with them at great length when in difficulties."— John Wild, *Plato's Theory of Man*। শাস্ত্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথেরও সেই দৃষ্টি ছিল।

মানুষ মাত্রেই সে যে-সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, যে-ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে সে পুষ্ট হয়, তাহার প্রতি তাহার পক্ষপাতিত্ব অতি স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের ভাষা বাংলা; বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে তিনি লালিত, উপনিষদ বা ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ হইতে বা অনুরূপ সাহিত্য হইতে তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের প্রাণরস সংগৃহীত। বৃহত্তম সত্যের সহিত সাযুজ্য আছে বলিয়া এইসব সাহিত্য হইতে উপযুক্ত অংশ উদ্‌ধৃত হইয়াছে, ইহাকে সাম্প্রদায়িক বলা চলে না; ইহাকে authority বা শাস্ত্র মানাও বলা যায় না। কোনো য়ুরোপীয় বা কোনো মুসলমান জ্ঞানী সাহিত্য ও দর্শনাদি আলোচনা প্রসঙ্গে যদি খ্রীষ্টানী বা গ্রীক্ অথবা আরবী বা পারসিক পূর্বজনের উক্তি উদ্‌ধৃত করেন— তবে তাঁহাকেও আমরা সাম্প্রদায়িক বলিব না, যদি তিনি ধর্ম বা religionএর dogma বা ritualএর বিতর্ক বা প্রমাণহীন বিশ্বাসের নজীর পেশ না করেন। প্রত্যেক লেখকের মধ্যেই নিজ সংস্কৃতির ও ঐতিহ্যের চিহ্ন থাকিবেই, তবে তাহা বিশ্বমানবীয় ধর্মের শর্তাবলী প্রকাশ করিতেছে কিনা, ইহাই বিচার্য। রবীন্দ্রনাথের ধর্মদেশনা— সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে— উহা নিখিল মানবসত্য।

জন্তুর সহিত মানুষের পার্থক্য জৈব দিক হইতে খুব বেশি নয়, ক্ষুধা তৃষ্ণা কামক্রোধাদি রিপুর উপদ্রব জীবমাত্রকেই চঞ্চল করে। এমনকি বুদ্ধি ও ইচ্ছা— যাহার গর্বে মানুষ আপনাকে সর্বজীব হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করে— সেই বুদ্ধি ও ইচ্ছা মনুষ্যেতর অনেক প্রাণীর মধ্যে নানা স্তরে প্রকাশ পায়।

দেহের দিক হইতে জন্তুর চেয়ে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব সেখানে— যেখানে সে দুই পদের উপর ভর করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইবার শক্তি আহরণ করিল— তাহার গ্রীবা সঞ্চালন করিয়া উর্ধ্বদিকে অবলোকন করিবার কৌশল লাভ করিল। মানুষ জন্তুর স্বভাবকে মানিল না। দুই পায়ের সাহায্যে সে চলিল, দৌড়াইল— এমনকি জলের মধ্যে সাঁতার দিল। ঋজু হইয়া চলিবার জন্য মানুষের দৈহিক অনেক বিকৃতি হইয়াছে, তাহার রোগ দুঃখ বাড়িয়াছে— কিন্তু সে তথাচ জন্তুর ন্যায় চার-হাত-পায় চলিবে না।

জন্তু নীচের দিকে তাকাইয়া খণ্ড বস্তুকে দেখে; "দেখা ও ঘ্রাণ নিয়ে জন্তুরা বস্তুর যে-পরিচয় পায়, সেই পরিচয় বিশেষভাবে আশু প্রয়োজনের। উপরে মাথা তুলে মানুষ দেখলে কেবল বস্তুকে নয়, দেখলে দৃশ্যকে অর্থাৎ বিচিত্র বস্তুর ঐক্যকে। একটা অখণ্ড বিস্তারের কেন্দ্রস্থলে দেখলে নিজেকে।"

যে মুহূর্তে মানুষ দাঁড়াইবার শক্তি অর্জন করিল, তখন হইতে তাহার দুইটি হাত হইল মুক্ত; "পায়ের কাছ থেকে হাত যদি ছুটি না পেত, তা হলে সে থাকত দেহেরই একান্ত অনুগত, চতুর্থ বর্ণের মত অস্পৃশ্যতার মলিনতা নিয়ে। . . মানুষের ঋজু মুক্ত দেহ মাটির নিকটস্থ টান ছাড়িয়ে যেতেই তার মন এমন একটা বিরাট রাজ্যের পরিচয় পেলে যা অন্নব্রহ্মের নয়, যাকে বলা যায় বিজ্ঞানব্রহ্ম আনন্দব্রহ্মের রাজ্য।" ঋজু হইয়া চলিবার শক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে দেহব্যবস্থার যে পরিবর্তন হইল, তাহার গ্রীবা সঞ্চালন শক্তি তাহার কণ্ঠের তন্তুসমূহের মধ্যে যে পরিবর্তন আনিল— তাহারই ফলে জন্তুর শব্দ হইল মানুষের কণ্ঠের কথা, স্বর হইল হইল সুর— যাহা ছিল অস্পষ্ট ধ্বনিমাত্র তাহা হইল ভাষা। ভাষার অধিকার ও ভাবের অভিব্যক্তি মানুষের মধ্যেই দেখা দেয়; সমাজ পত্তন হইল ভাববিনিময়ের প্রতীক ভাষা হইতে। ভাষা ও ভাব অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত; এই দুইএর সংযোগ হইতে মানুষের অশেষ চেষ্টা, তাহার অফুরন্ত জিজ্ঞাসার সূত্রপাত। এইসবের মূলে আছে আনন্দ— আপন ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্যবোধ— আপনার দায়িত্ববোধ।

আমরা একটু গভীরভাবে যদি আত্মচিন্তা করি, তবে এ কথা সহজেই উপলব্ধ হইবে যে, আনন্দের প্রেরণা না থাকিলে মানুষের এক মুহূর্তও সংসারে বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা বা প্রয়াস হইত না; অশেষ দুঃখকষ্টকেও মানুষ আনন্দে বহন করিয়াছে— নিজের, নিজ পরিবারের, নিজ দেশের জন্য বহু দুঃখকে আনন্দে বরণ করিয়াছে।

সুখের বিপরীত দুঃখ— এই তত্ত্ব সর্বজীবের নিকট পরিজ্ঞাত; কিন্তু মানুষই জানে দুঃখের মধ্যেও আনন্দ আছে। প্রাকৃত জনে এই সাধারণ তত্ত্বটি ভুলিয়া গিয়া সুখকে আনন্দ মনে করে। মহৎ আদর্শের দায়িত্ব ও মনুষ্যত্বের দায়িত্ব স্বীকার করিতে গিয়া মানুষই দুঃখকে বরণ করিয়াছে যুগে যুগে। "শত শত শতাব্দী ধরে চলেছে তার প্রয়াস। কত ধর্মতন্ত্র, কত অনুষ্ঠানের পত্তন হল; সহজ প্রবৃত্তির প্রতিবাদ করে নিজেকে সে স্বীকার করাতে চায় যে, বাইরে সে যা ভিতরে ভিতরে তার চেয়ে সে বড়ো।" এই ভাবনা মানুষেরই; এটা মানুষেরই ধর্ম। সেইজন্য তাহার গতি বড়োর সন্ধানে। সেই বৃহৎ বা ব্রহ্ম অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতকে বিধৃত করিয়া আছেন। মানুষের দেশ ভৌমিক নহে, মানসিকও নহে, তাহা আধ্যাত্মিক বা আত্মিক। মানুষেরই চিন্তা যায় অতীতে ও ভবিষ্যতে, দেশ ও দেশান্তরে— অর্থাৎ কাল ও দেশের এবং দেশ-কালের অতীত অবস্থার মধ্যে মনের ব্যাপ্তি সম্ভবে।

জীবতত্ত্ব ও ইতিহাস হইতে দেখা যায় যে কী জীব কী মানুষ সকলেই অসম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির সৃষ্টি। অনেক ভাঙাচোরা অদলবদলের মধ্য দিয়া জীবের ও মানবের দেহের একটা পরিণতি হইয়াছে। কিন্তু "পূর্ণ পুরুষের অধিকাংশ এখনও আছে অব্যক্ত। ব্যক্ত করবার প্রত্যাশা নিয়ত চলেছে ভবিষ্যতের দিকে। পূর্ণ পুরুষ আগন্তুক।"

কবির বিশ্বাস যে, মানুষের মনের বা নীতি-ধর্মবোধের পূর্ণ প্রকাশ হয় নাই, উহা ভাবীকালে হইবে। কবির শেষ দিককার রচনার মধ্যে এই ভাবটি খুবই স্পষ্ট হইয়াছে। তাঁহার আশা মানুষের বুদ্ধি একদা ধর্মাশ্রয়ী হইবে। এই স্থূলাত্মা মানুষের মনের মধ্যে যদি ভাবীকালের আশা না থাকিত, তাহার জ্ঞান ও বুদ্ধি বৃহতের ক্ষেত্রে মুক্তিপ্রার্থী না হইত তবে সে 'পরমাণুতত্ত্বের চেয়ে পাক-প্রণালী'কে অধিক সম্মান দেখাইত। আসলে সীমার মধ্যে মানুষের ধর্মজিজ্ঞাসা অসমাপ্ত; বস্তু-জগতের তথ্য তাহার কাছে জ্ঞান-রাজ্যের শেষ কথা নহে; তথ্যকে ছাড়াইয়া ছাপাইয়া তত্ত্বের মধ্যে নিমজ্জিত হইবার জন্যই তাহার অন্তরের আকূতি। অহেতুকী এই প্রয়াস— প্রয়োজনের কোনো দায়

নাই, তাই সে বৃহতের মধ্যে আপনাকে ও আপনার মধ্যে বৃহৎকে পাইবার জন্য ব্যাকুল। এই বৃহৎ বা ব্রহ্মের ঐশ্বর্যবোধ, এই সত্যের মহিমা উপলব্ধি ও প্রকাশ হইতেছে মানুষের ধর্ম।

এই আলোচনায় মানুষের যে দুইটি দিক সবচেয়ে প্রধান তাহার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কবি বলিতেছেন, "মানুষ আছে তার দুই ভাবকে নিয়ে, একটা তার জীবভাব, আর "একটা বিশ্বভাব।" যেখানে সে জৈবিক সেখানে সে আছে উপস্থিতকে আঁকড়াইয়া। "জীব চলছে অবশ্য-প্রয়োজনের কেন্দ্র প্রদক্ষিণ করে। মানুষের মধ্যে সেই জীবকে পেরিয়ে গেছে যে-সত্তা সে আছে আদর্শকে নিয়ে।" সেখানে সে আত্মিক— লৌকিক ভাষায় বলা যায় জীব ও শিব।

মানুষের জৈব দিকটা কঠোর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত ; কার্য-কারণের প্রবাহ চলিতেছে যুগযুগান্ত ধরিয়া প্রতি ব্যক্তিবিশেষের জীবদেহের অন্তরালে। তেমনই প্রবাহ চলিয়াছে মানবসমাজে সমষ্টিগতভাবে বিচিত্র ধারায় ভাবনার মধ্যে। ব্যক্তিগতভাবে মানুষের সাধনা হইতেছে সত্যের ঐশ্বর্য ও তাহার মহিমা উপলব্ধি করা এবং ব্যবহারে তাহার প্রকাশ। এইখানে মানুষ পৃথিবীর অন্য জীব হইতে স্বতন্ত্র, সকলকে সে অতিক্রম করিয়াছে। মানুষই বলিয়াছে 'অল্পে সুখ নাই, বৃহতেই সুখ'। এই অল্প ও বৃহৎ সুখের আদর্শ নানা জনের মধ্যে নানা ভাবে রূপায়িত হইয়াছে— স্থূল বস্তু সঞ্চয় হইতে অধ্যাত্ম ধ্যানময় জীবনযাপন পর্যন্ত নানা স্তরের অনুভূতি। আসলে কোনো মানুষই আপনার ব্যষ্টির মধ্যে সীমায়িত থাকিয়া সুখী নহে, সে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে অথবা মহত্তর সাধনক্ষেত্রে আপনার সার্থকতার সন্ধান করে। কিন্তু জন্তু লক্ষ বৎসর পূর্বে যেভাবে গহ্বর খনন করিয়া বাস করিত, যে খাদ্য আহরণ করিত, আজও তাহাদের সে স্বভাবের পরিবর্তন হয় নাই ; কারণ, তাহাদের অভাব সুনির্দিষ্ট, বৃহতের জন্য কোনো আকাঙ্ক্ষা নাই। মানুষের বেশ বাস এমনকি ভাষার পর্যন্ত এত পরিবর্তন হইয়াছে যে তাহাকে চেনাই মুশকিল, ইহার কারণ সে অল্পে সুখী নয়। মানুষই আশু ছাড়িয়া দূর, বর্তমান ছাড়িয়া অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে বিচরণ করিয়া সুখ পায়। আর, আদর্শের জন্য অপার দুঃখ এমনকি মৃত্যুকেও আনন্দচিত্তে বরণ করিয়া লয়। 'মানুষের সত্তায় দ্বৈধ আছে'। সে সাংসারিক সুখেই তৃপ্ত নহে। "সে সুখের বেশি চায়, সে ভুমাকে চায়। তাই সকল জীবের মধ্যে মানুষ কেবল অমিতাচারী।· · সেই অমিতমানব সুখের কাঙাল নয়, দুঃখভীরু নয়।" তাহা না হইলে কেবলমাত্র ideaর জন্য মানুষ দুঃখকে স্বীকার করিতে পারিত না। স্বেচ্ছায় দুঃখবরণ মানুষেরই ধর্ম।[১]

১ তু. 'অবুঝ মন'—

বিরাট অবুঝ এই সে আদিম মন,
মানব-ইতিহাসের মাঝে আপনারে তার অধীর অন্বেষণ।
ঘর হতে ধায় আগুন-পানে, আগুন হতে পথে,
পথ হতে ধায় তেপান্তরের বিঘ্নবিষম অরণ্যে পর্বতে :
এই সে গড়ে, এই সে ভাঙে, এই সে কী আক্ষেপে
পায়ের তলায় ধরণীরে আঘাত করে, ধুলায় আকাশ ব্যেপে ;
হঠাৎ খেপে উঠে
রুদ্ধ পাষাণভিত্তি-'পরে বেড়ায় মাথা কুটে।
অনাসৃষ্টি সৃষ্টি আপনগড়া
তাই নিয়ে সে লড়াই করে, তাই নিয়ে তার কেবল ওঠাপড়া।

—পরিশেষ, ২০ অক্টোবর ১৯২৭

মানুষের ধর্ম সহজ ধর্ম নহে ; ইহার ভিত্তি গভীর মনন ও ধ্যানযোগের উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্তরে কঠোর সাধনা, বাহিরে অপার করুণা ; অন্তরে ধ্যান, বাহিরে কর্ম— এই দুইএর মিলনে সে পূর্ণকে পায় ও স্বয়ং পরিপূর্ণ হয়। হওয়া-পাওয়া এক হয়।

অমিতমানুষের জিজ্ঞাসার শেষ নাই ; সে আপন অন্তরকে প্রশ্ন করে, 'কে তুমি'। এই-যে মানুষ শুনিতেছে, কথা কহিতেছে, দেখিতেছে— এই সমস্তের ভৌতিক কারণ সে তন্ন তন্ন করিয়া আবিষ্কার করিয়াছে ; কিন্তু সমস্ত জানিয়াও সে বুঝিতে পারে না, বলিতে পারে না— কোথা হইতে আসিল তাহার শ্রেয়বোধ, মঙ্গল-ইচ্ছা। কেন সে শ্রেয়কে জীবনের পুরোভাগে বসাইতে পারিতেছে না! পাপের জীবন কাটাইয়া কেন সে মার বা শয়তানকে বিশ্বরাজ বলিয়া সম্বোধন করিতেছে না! এই শ্রেয় ও প্রেয়-র সংগ্রাম মানুষেরই আছে— মানুষের চরম ধর্মবোধে এই প্রশ্ন। অথচ "শ্রেয়কে গ্রহণ করার দ্বারা মানুষ কিছু-একটা পায় যে তা নয়, কিছু একটা হয়।" এইখানেই সমস্ত দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রের মূল কথা আসিয়া পড়ে— পাওয়া ও হওয়া। মানুষ ধন পাইয়া ধনী হয়, রাজ্য পাইয়া রাজা হয় ; কিন্তু যে শ্রেয়কে পায় সে সাধু হয়— কোনো ভৌতিক ঐশ্বর্যের অধিকারী সে হয় না ; অথচ সে যাহা পায় তাহাই মানুষের একমাত্র কার্য-কারণ।

তারি লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক। মহাপ্রাণ সহিয়াছে, পলে পলে
প্রত্যহের কুশাঙ্কুর।

পাওয়ায় মানুস ও তাহার প্রাপ্য বিনয় বা বস্তুর মধ্যে ভেদ থাকিয়া যায় ; রাজ্য পাইয়া লোকে রাজা হয়— সে রাজ্যের সঙ্গে একাত্ম হইতে পারে না। জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানীর সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য, কিন্তু এখানে জ্ঞান বাহির হইতে আহরিত সংগৃহীত শ্রুত অধীত। মোটকথা বাহিরের মাধ্যমে জ্ঞান প্রাপ্ত। প্রাকৃতিক "তত্ত্ব জানার দ্বারা নিষ্কাম আনন্দ হয় না, তা নয়। কিন্তু সে আনন্দটি হওয়ার আনন্দ নয়, তা পাওয়ায় আনন্দ ; অর্থাৎ এই জ্ঞান জ্ঞানীর থেকে পৃথক, এ তার ব্যক্তিগত সত্তার অন্দরমহলের জিনিস নয়, ভাণ্ডারের জিনিস।"[১] কিন্তু অধ্যাত্ম জীবনে, সাধুজীবনে যাহা পাওয়া যায়— তাহা বাহির হইতে জ্ঞানের ন্যায় প্রাপ্ত নহে ; তাহা আপনার গুহাহিত বোধি হইতে উদ্‌বুদ্ধ ; এখানে ধ্যেয় ও ধ্যানী ধ্যানের মধ্যে আপনসিদ্ধ— অদ্বৈত। বুদ্ধির ক্ষেত্রে যাহা সোঽহম্ বোধির ক্ষেত্রে তাহা সর্বাত্মবোধ, তাহা অনির্বচনীয় অর্থাৎ বুদ্ধি ও বচনের অতীত উপলব্ধি। রবীন্দ্রনাথের মতে 'সোঽহম্' সমস্ত মানুষের সম্মিলিত অভিপ্রায়-মন্ত্র, কেবলমাত্র একজনের না। "ব্যক্তিগত শক্তিতে নিজে কেউ যতটুকু মুক্ত হচ্ছে, সেই মুক্তি তার নিরর্থক যতক্ষণ সে তা সকলকে না দিতে পারে। বুদ্ধদেব আপনার মুক্তিতেই সত্যই যদি মুক্ত হতেন, তাহলে একজন মানুষের জন্যেও তিনি কিছু করিতেন না।" এখানে আসিতেছে সর্বমানবের মুক্তির কথা— সর্বশ্রেণীর সর্বস্তরের মানুষ। সোঽহম্-বোধ তখনই সার্থক, যখন উহা সর্বমানবের ভাবনার ও ধ্যানে সিদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মদেশনায় শাস্ত্রজ্ঞ ও জ্ঞানী মানুষের ধর্মকথাই প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার জীবনের একাংশ স্পর্শ করিয়াছে জ্ঞানী-বিজ্ঞানীকে, অপরাংশের সহিত নিবিড় যোগ রহিয়াছে সাধারণ মানুষের। একদিকে

১ সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্যের পথে, পৃ. ১২৮।

তিনি অভিজাত, অপরদিকে ব্রাত্য। কঠোর জ্ঞানময় ব্রহ্মবাদ ও অনুভূতিমূলক প্রেমের বৈষ্ণবতা তাঁহার কাছে সমভাবেই সত্য। ভারতীয় আর্য-সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার যেমন অনুরাগ, ভারতে প্রাকৃত জনের বুনিয়াদী সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার তেমনই আকর্ষণ। তাই দেখি 'মানুষের ধর্মে' সাধারণ মানুষের সহজ ধর্মের কথা বা অশাস্ত্রজ্ঞ বাউল সম্প্রদায়ের ধর্মসাধনা বা উপলব্ধির কথা প্রকাশ পাইয়াছে। এই ব্রাত্য সমাজের আধ্যাত্মিক সাধনার কথা তিনিই ভারতীয় দর্শন কন্‌গ্রেসের প্রথম সভাপতিরূপে তাঁহার ভাষণে ব্যাখ্যা করিয়া বলেন। ইতিপূর্বে এভাবে শিক্ষিত সমাজের নিকট এত স্পষ্ট করিয়া এই অশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাত্য সাধকদের কথা বলা হয় নাই।

ভারতে আমরা যাহাকে হিন্দুধর্ম বলি তাহা বহুল পরিমাণে বেদ ও ব্রাত্যর সমাবেশে গঠিত। বেদাদি শাস্ত্রের শিক্ষা সমাজের উচ্চবর্ণের মধ্যে সীমায়িত থাকিয়া ধীরে ধীরে নিম্নস্তরের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছে এবং এইভাবে যতটুকু অভিষিক্ত করা সম্ভব তাহা করিয়াছে। আবার, তথাকথিত ব্রাত্য বাউলাদি অবৈদিক সম্প্রদায়ের সহজ সাধনার রস-উৎস উপরের স্তরে উঠিয়া আসিয়াছে। সূর্যের কিরণ তরুদেহের মধ্য দিয়া ভূমিকে তাপদ্বারা স্পর্শ করে ও ধরিত্রী-গর্ভস্থিত জলকণা অদৃশ্যভাবে বিজ্ঞানের ভৌতিক ধর্মানুসারে তরুতন্তুর মধ্য দিয়া উর্ধ্বগামী হয়। তেমনই আর্য-সভ্যতা বাহির হইতে আসিয়া ভারতীয়ের জীবনধারাকে তেজোময় করিয়াছে এবং আদিম ব্রাত্য রস-সাধনা আর্য-সভ্যতার মধ্যে মাধুর্য আনয়ন করিয়াছে। কিন্তু যেখানে তাপ বেশি, সেখানে সাধনা শুষ্ক ও নৈর্ব্যক্তিক, আর যেখানে রসের সাধনা মাত্রা ছাড়ায় সেখানে ভাব অশ্রুবাষ্পে গদগদ হইয়া কর্মবিমুখ ও নির্বীর্য। যেখানে তাপ ও রস ছন্দ রক্ষা করে, সেখানেই সাধনা সুন্দর ও বলিষ্ঠ। সেই সভ্যতার সংস্কৃতিধারা রুদ্ধ না হইয়া ক্রমশই বিশাল ও গভীর হয়। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনা যেমন সংস্কৃত ও প্রাকৃত বা বাংলা লইয়া সার্থক, তেমনই তাঁহার আধ্যাত্মিক সাধনা বেদ ও ব্রাত্যকে লইয়া পরিপূর্ণ। তিনি সংস্কৃতির দুই চরম কোটিকে জ্ঞান ও প্রেমের দ্বারা আপনার মধ্যে অর্থপূর্ণ করিয়া নবীন ধারায় নূতন দর্শনতত্ত্বর বুনিয়াদ করিয়াছেন। জীবনের ছন্দ নষ্ট হইলে, তাল কাটিলেই স্বর্গ হইতে হয় নির্বাসন।

কবির বক্তব্যে নিখিলের সঙ্গে মানুষের মনের বা আত্মার যে যোগ বা বিশ্বানুভূতি তাহাই সোঽহম্-তত্ত্ব। সাধনার ব্যাঘাত দাঁড়ায় তখনই যখন সোঽহমের 'অহং' হয় একান্ত। কিন্তু মানুষের চির প্রশ্ন 'সত্য কী', কিসের সঙ্গে বা কার সঙ্গে তার একাত্মতা সম্ভবে। What is truth এ প্রশ্ন যুগযুগান্ত হইতে মানুষ করিয়া আসিতেছে। কবি মধ্যযুগীয় সাধক রজ্জবের বাণী উদ্‌ধৃত করিয়া বলিলেন, 'সব সত্যের সঙ্গে যা মেলে তাই সত্য, যা মিলল না তা মিথ্যে'। অজ্ঞানীর নিকট দুনিয়ার সমস্তই অসম্বদ্ধ প্রলাপ মাত্র ; কিন্তু জ্ঞানী যিনি তিনি পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারা আপাতবিরুদ্ধ শক্তিসমূহের মধ্যে মিলের সন্ধান পান ; বিজ্ঞানী আজ সেইখানে পৌঁছিয়াছে। যাহার মধ্যে ছন্দের মিল আছে যাহা মেলায় ও মিলিত হয়, তাহাই সত্য ; দুনিয়ার zig-saw puzzleএ যে ঠিকঠাক রেখা বর্ণ মিলাইয়া ছবিকে গড়িতে পারেন, তিনিই সমগ্রের রূপ দেখেন।

লক্ষ লোকে গ্যালিলিওর মতবাদ মিথ্যা বলিলেও সে-সত্য মিথ্যা হয় নাই। আবার "যদি লক্ষ লক্ষ লোক বলে, কোটি যোজন দূরে কোনো বিশেষ গ্রহনক্ষত্রের সমবায়ে পৃথিবীর কোনো একটি বিশেষ প্রদেশের জলধারায় এমন অভৌতিক জাদুশক্তির সঞ্চার হয় যাতে স্নানকারীর নিজের ও পূর্বপুরুষের আন্তরিক পাপ যায় ধুয়ে, তাহলে বলতেই হবে, 'সব সাঁচ মিলৈ সো সাঁচ হৈ না মিলৈ সো ঝুঁট'।"

এই 'মিলৈ'-তে সত্য বুঝিলেন রামানন্দ— চণ্ডাল-নাভা মুসলমান-কবীর ও চামার-রবিদাসকে আলিঙ্গন

দিলেন তিনি মানুষ ব'লেই। যিশুখ্রীষ্টও তাই করেন ও বলেন সোঽহম্— 'আমি আর আমার পরমপিতা এক'। বুদ্ধদেব ইহাকেই বলেন ব্রহ্মবিহার, সুফী সাধক বলিলেন অনলূহক্ (অদ্বৈতম্)।

কবির সোঽহম্-বাদ 'জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে' পরিব্যাপ্ত। অতীতের সঙ্গে জন্মজন্মান্তরের সঙ্গে যোগের কথা কবি বহু কবিতায় ও গানে ব্যক্ত করিয়াছেন। মানুষের ধর্ম সেই অখণ্ডবোধ— খণ্ডকালে বা খণ্ডদেশে তাহা সীমায়িত নহে— কালের ন্যায় দেশে বা স্থানে সে সর্বজীব ও সর্বচরাচরের সহিত যুক্ত। সেখানে তাহার এই বোধ বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, কেবল বোধির উপর নহে। আবার তাহা ইহজন্ম পূর্বজন্ম পরজন্ম— জন্মজন্মান্তরের সহিত অবিচ্ছিন্ন।[১]

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে মানুষের ধর্মের সকল কথা কবি আলোচনা করেন নাই; কারণ পরিপূর্ণ মানুষের ধর্ম অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, যদি তাহার 'আর্ট'সত্তার কথা বলা না হয়। তবে রবীন্দ্রনাথ 'আর্ট' ও ব্যক্তিসত্তার সম্বন্ধে 'পারসোন্যালিটি' 'ক্রিএটিভ ইউনিটি' গ্রন্থে ও অন্যান্য বহু স্থানে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন বলিয়াই হয়তো এখানে তাহার উল্লেখ করেন নাই। মানুষের ধর্মে কর্মের স্থান কী তাহাও এই গ্রন্থে উত্থাপন করেন নাই এই একই কারণে; পরিপূর্ণ জীবন-আনন্দের সহিত কর্মও যে নিবিড়ভাবে যুক্ত, কবি অন্যান্য রচনার মধ্যে তাহার আলোচনা করিয়াছেন।

'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধগুলিতে যে তত্ত্বকথা পাই, তার সন্ধান মেলে পূর্বের অনেক প্রবন্ধে বিক্ষিপ্ত আকারে। ১৩৩৮ আশ্বিন সংখ্যার প্রবাসীতে 'নরদেবতা' নামে যে প্রবন্ধ আছে, তাহার অনেক কথাই পুরাতন এবং অনেক ভাবনাই 'মানুষের ধর্মে' পাই। ইহার সঙ্গে 'সাহিত্যতত্ত্ব' (সাহিত্যের পথে ১৩৪০) প্রবন্ধটি পঠনীয়।

শিক্ষার বিকিরণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মানুষের ধর্ম'-এ কমলা-বক্তৃতা দিয়া শান্তিনিকেতনে আসিলেন ও ঐ বক্তৃতার অনুবৃত্তিরূপে শান্তিনিকেতনে 'মানবসত্য'[২] শীর্ষক একটি ভাষণ দান করিলেন। সেটি 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থের পরিশিষ্টরূপে মুদ্রিত হইয়াছে। সেখানে ফিরিয়া কবি ঐ গ্রন্থের জন্য ভূমিকাটি লিখিয়া দেন (৩১ জানুয়ারি ১৯৩৩)।

কয়েকদিন পরে শ্রীনিকেতনের একাদশ সাম্বৎসরিক উৎসব (৫ ফেব্রুয়ারি)। প্রধান-অতিথিরূপে আসিলেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়— তখন কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র।

১ মানুষের ধর্ম গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন যে মানুষের একটা দিকে সে বিষয়বুদ্ধি লইয়া সীমিত জীবধর্মপালনে উৎসুক; কিন্তু ইহার বাহিরেও একটি জীবন আছে— সেখানে জ্ঞান উপস্থিত-প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করিয়া যায়। বৃহত্তর জীবনে সে বাঁচিতে চায়। "যা আমাদের ত্যাগের দিকে, তপস্যার দিকে নিয়ে যায়, তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম।…আমাদের অন্তরে সর্বজনীন সর্বকালীন মানব আছেন। সেই মহৎ মানবের উপলব্ধিতে মানুষ আপন জীবসীমা অতিক্রম করিয়া মানবসীমায় উত্তীর্ণ হয়। সেই মহৎ মানবসত্য ও মানবসত্তার উপলব্ধি সর্বত্র সমান নয় বলিয়া অনেক স্থলে তাহার বিকৃত রূপ দেখি, মনুষ্যরূপ দেখিতে পাই না।" ভূমিকা শেষে কবি বলিয়াছেন, "সেই মানব, সেই দেবতা। য একং, যিনি এক, তাঁর কথাই আমার এই বক্তৃতাগুলিতে আলোচনা করেছি।"

২ মানবসত্য, প্রবাসী ১৩৪০ বৈশাখ, পৃ. ১-৫। জ্যৈষ্ঠ. পৃ. ২৬০-৬১। বিশ্বভারতী বিদ্যাভবনে রবীন্দ্রনাথের সাপ্তাহিক বক্তৃতার অনুলিপি করেন অধ্যাপক প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত ও বিজনবিহারী ভট্টাচার্য।

কয়েকদিন পরে শান্তিনিকেতনে আসিলেন বঙ্গীয়-শাসন-পরিষদের স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের মন্ত্রী সার্ বিজয়প্রসাদ সিংহ। সেখানে নূতন নলকূপ খনন করিয়া জল সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে— সেই উৎস-উন্মোচন উৎসবে সার্ বিজয়প্রসাদ আসিয়াছেন প্রধান-অতিথিরূপে। এই ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ শান্তিনিকেতনের মধ্যে গবর্মেণ্ট সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির দ্বারা আশ্রমের কোনো শুভকার্যের উদ্বোধন এখন পর্যন্ত হয় নাই; বঙ্গীয় সরকার হইতে অর্থপ্রাপ্তির আশায় এই মন্ত্রী আনয়ন ব্যবস্থা হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। ইতিপূর্বে শ্রীনিকেতনে গবর্নর জ্যাকসনকে যে আনা হয়, সে-কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। তবে এসব বিষয়ের সহিত রবীন্দ্রনাথ পরোক্ষভাবে জড়িত হইয়া পড়িতেন— কারণ বিশ্বভারতী সংক্রান্ত অনেক কাজ সংসদ করিতেন— রবীন্দ্রনাথ হইতেন 'নিমিত্তের ভাগী'।

শান্তিনিকেতনে নলকূপ-খননের ইতিহাস আমরা পূর্বে বিবৃত করিয়াছি। কয়েক বৎসর পূর্বে টেক্সাস টিউব-ওয়েল নামে একটি আমেরিকান কোম্পানি নলকূপ-খননে কৃতকার্য হইতে পারে নাই; এইবার অমূল্যচন্দ্র বিশ্বাস নামে কলিকাতার এক ইন্‌জিনীয়ার সফল হইয়াছেন। বিরাট এক ট্যাংক বা জলাধারে পাম্প করিয়া জল উঠানো হয়; প্রধান-অতিথি সভাক্ষেত্রে জলকলের একটি বোতাম টিপিলে জলের ফোয়ারা খুলিয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ প্রীত হইয়া এই জলধারার নাম দেন 'অমূল্য উৎস'।[১]

পুণা-য়েরবাদা জেল হইতে গবর্মেণ্ট গান্ধীজিকে অস্পৃশ্যতা বর্জন আন্দোলন করিবার অধিকার দেওয়ায় তিনি Harijan নামে ইংরেজি সাপ্তাহিক সম্পাদনের আয়োজন করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথকে কিছু লিখিবার অনুরোধ আসায় তিনি কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'মেথর' কবিতাটি ইংরেজি করিয়া পাঠাইয়া দিলেন; উহা Harijanএর প্রথম সংখ্যায় (১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩) প্রকাশিত হইল।

কলিকাতা হইতে পুনরায় আহ্বান আসিল: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুশতবার্ষিকী (১৯৩৩ সেপ্টেম্বর ২৭) উদ্‌যাপনের আয়োজন উপলক্ষ্যে এই সভা আহূত হইয়াছে। এই উৎসব কমিটির সভাপতি রবীন্দ্রনাথ। উদ্বোধন সভায় (১৮ ফেব্রুয়ারি) কবি বলিলেন— "Rammohan was the only person in his time, in the whole world of man, to realize completely the significance of the Modern Age. He knew that the ideal of human civilization does not lie in the isolation of independence, but in the brotherhood of inter-dependence of individuals as well as of nations in all spheres of thought and activity"।[২]

রামমোহন-শতবার্ষিকী উদ্‌বোধনের কয়েকদিন পরেই রবীন্দ্রনাথকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বাংলার অধ্যাপক'রূপে পুনরায় একটি ভাষণ দিতে হইল (মার্চ ১৯৩৩); পাঠকের স্মরণ আছে তিন মাস পূর্বে ১৯৩২ সালের ডিসেম্বরে রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ' শীর্ষক ভাষণ পাঠ করেন; এবার ভাষণের বিষয় 'শিক্ষার বিকিরণ'।

রবীন্দ্রনাথের বহুকালের অভিযোগ যে, শিক্ষা মুষ্টিমেয়র মধ্যে আবদ্ধ থাকায় দেশ পঙ্গু হইয়া রহিয়াছে।

১ দ্র. Visva-Bharati Annual Report 1933, p. 21। দুঃখের বিষয় জলাধারটি জলের ভার বহন করিতে না পারায়, কয়েকদিন পরে অকস্মাৎ ভাঙিয়া পড়ে। পুনরায় নূতন ট্যাংক দৃঢ় মঞ্চের উপর নির্মিত হইয়াছিল।

২ Rammohan Roy, Inaugurator of Modern Age in India—Modern Review 1933 March : also The Father of Modern India : Rammohan Centenary Volume 1933, Part II, p. 4 (Centenary Publicity Booklet -1)। দ্র. ভারতপথিক রামমোহন : রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী সংস্করণ ১১, মাঘ ১৩৬৬, ১৮৮১ শকাব্দ; পৃ. ১৩৭-১৪২।

এতদ্‌ব্যতীত পাশ্চাত্যশিক্ষা যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহাদের সহিত পুরাতন ধারায় শিক্ষিত জনসমাজের ব্যবধান গভীর। 'দেশের সকলের চেয়ে বড়ো জাতিভেদ এইখানেই, শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা'। ভারতের বর্ণগত জাতিভেদ তো ছিলই; অধুনা অর্থগত শ্রেণীভেদ তাহাকে আরও বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল করিয়াছে। পাশ্চাত্যদেশে চিত্তোৎকর্ষ যে বিচিত্র শক্তির মধ্যে প্রকাশমান, আমাদের দেশের সাহিত্যে তাহার অভাবের জন্য কবির অভিযোগ। পাশ্চাত্য সাহিত্য কেবলমাত্র গল্প উপন্যাস কবিতা নাটকের মধ্যে পর্যবসিত নহে। তাহাদের মনের শক্তি অসংখ্য বিদ্যাধারায় প্রবাহিত। আমাদের সাহিত্যে রসেরই প্রাধান্য। সেইজন্য যখন কোনো অসংযম, কোনো চিত্তবিকার আমাদের সাহিত্যে প্রবেশ করে, তখন সেটাই একান্ত হইয়া উঠে, কল্পনাকে রুগ্নবিলাসিতায় পরিণত করে। প্রবল প্রাণশক্তি না থাকিলে দেহের সামান্য বিকার সহজেই দুরারোগ্য ব্যাধিতে পরিণত হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব স্কুল-কলেজের বাহিরে 'শিক্ষা বিছিয়ে দেবার উপায় সাহিত্য'। কিন্তু সেই সাহিত্য আজ সাম্প্রদায়িকতার উপচ্ছায়ায় অন্ধকারময়। কবি লিখিতেছেন, "শেষকালে নিজের সর্বনাশ করবার জেদ এতদূর পর্যন্ত আজ এগোল যে বাঙালি হয়ে বাংলাভাষার মধ্যেও ফাটল ধরাবার চেষ্টা আজ সম্ভবপর হয়েছে; শিক্ষার ও সাহিত্যের যে উদার ক্ষেত্রে সকল মতভেদ সত্ত্বেও এক রাষ্ট্রীয় মানুষের মেলবার জায়গা সেখানেও স্বহস্তে কাঁটাগাছ রোপণ করবার উৎসাহ ব্যথা পেল না, লজ্জা পেল না।·· ব্যর্থ করে দিল আমাদের সকল মহৎ উদ্যম।"

এই আলোচ্যপর্বে বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বাংলাভাষা লইয়া বিরোধ শুরু হইয়াছে। মুসলমানদের মধ্যে লীগপন্থীরা বাংলাভাষার মধ্যে 'হিন্দু'র প্রভুত্ব ও সংস্কৃতভাষার প্রাধান্য দেখিতেছে, এবং এমন কথাও উঠিতেছে যে মুসলমানের মাতৃভাষা 'উর্দু'। আজ ত্রিশ বৎসর পরেও কি সেই দুর্ভাবনার শান্তি হইয়াছে!

রবীন্দ্রনাথের এই ভাষণের উদ্দেশ্য ছিল যাহাতে সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিকিরণ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় উৎসাহ বোধ করেন। "আমার আজকের আলোচ্য বিষয়·· সর্বসাধারণের শিক্ষা নিয়ে। শিক্ষার জলের কল চালানোর কথা নয়, পাইপ যেখানে পৌঁছয় না সেখানে পানীয়ের ব্যবস্থার কথা।" রবীন্দ্রনাথ ভাষণ শেষে "বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে চাতকের মতো উৎকণ্ঠিত বেদনায় আবেদন" করিয়া বলিলেন যে তাঁহারা যেন এই শিক্ষার বিকিরণ ভার গ্রহণ করেন। রাশিয়া হইতে আসিয়া সর্ব প্রথম এই চেষ্টা করেন শ্রীনিকেতনের শিক্ষার ভিতর দিয়া, তাঁহার অন্তরের ইচ্ছা 'শিক্ষার বিকিরণ'।

শাপমোচন

রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, "আমি কলিকাতায় এখনো নানাজালে জড়িয়ে আছি— ছাড়তে পারচি নে।" তখন কলিকাতায় 'মায়ার খেলা' অভিনয় হইতেছে। কবি দেখিতে যান দুই দিনই। 'দালিয়া' নাটক করিয়া মধু বোস ফিল্মে করেন— সেটাও দেখিতে যান।[১]

এই সময়ে প্রতিমা দেবী আছেন লখনৌতে; অসিত হালদার সেখানকার আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ। লখনৌতে একটি সংগীত-সম্মেলনে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা 'নবীন' ও 'শাপমোচন' অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়; প্রতিমা দেবীর পরিচালনায় ও অসিতকুমারের সহায়তায় অভিনয় সাফল্যমণ্ডিত হয়।

১ চিঠিপত্র ৩, পত্র ৪৮।

কলিকাতার বাহিরে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের গীতোৎসব বা নৃত্যাভিনয় এই প্রথম।[১]

লখনৌতে গীতাভিনয়ের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া কবি কলিকাতায় উহার অভিনয়ের জন্য আগ্রহান্বিত হইলেন। কবি কলিকাতা হইতে বোধ হয় ৭ মার্চ[২] শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন ও শাপমোচনকে নূতন করিয়া গীতে নৃত্যে ভরিয়া নূতন কলেবর দানে প্রবৃত্ত হইলেন। অতঃপর কলিকাতায় এম্পায়ার থিয়েটর মঞ্চে অভিনয়ের জন্য কবি পুনরায় রাজধানী চলিলেন। এম্পায়ারে দুই রাত্রি অভিনয় হইল (২৯, ৩০ মার্চ ১৯৩৩॥ ১৫, ১৬ চৈত্র ১৩৩৯)।[৩]

অভিনয়ান্তে কবি কলিকাতার উপকণ্ঠে অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বরাহনগরের বাসাবাটীতে কয়েকদিন বাস করেন। সেখানে একদিন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজী কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন (৮ এপ্রিল)। পাঠকের স্মরণ আছে গান্ধীজির অনশনপর্বে পুণায় কবির সহিত মালব্যর সাক্ষাৎ হয়। মালব্যজী কবিকে বলিলেন, য়ুরোপ হইতে বিঠলভাই পাটেল ভারতীয় নেতাদের নিকট জানাইয়াছেন যে বিদেশে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে ব্রিটিশদের তীব্র প্রচারকার্য চলিতেছে, তাহা প্রতিরুদ্ধ করিবার আশু ব্যবস্থা প্রয়োজন। অচিরে ভারতের নূতন সংবিধান (১৯৩৫-এর) প্রবর্তিত হইবে, তজ্জন্য ভারতীয়দের অযোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ নানাবিধ কুৎসা বিদেশে প্রচারিত হইতেছে; এইজন্য ব্রিটিশরা লর্ড হ্যালিফেক্স (ভারতের পূর্বতন বড়লাট আরউইন)-কে এই কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। বিঠলভাই জানাইয়াছেন যে এই প্রচারকার্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতি-প্রচার ব্যবস্থার জন্য রবীন্দ্রনাথ যেন অচিরে লেখনী ধারণ করেন। সেই কথাই বলিবার জন্য মালব্যজীর আগমন।

শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া কবি এবিষয়ে এক বিবৃতি প্রেসে পাঠাইয়া দিলেন (বর্ষশেষ ১৩৩৯॥১৩ এপ্রিল ১৯৩৩)। কবির আন্তর্জাতিক ভাবনার সহিত দেশপ্রীতির কোনো বিরোধ নাই, দেশের অপমানকে তিনি কোনোদিনই নীরবে সহ্য করেন নাই। তিনি লিখিলেন, "I fully agree with what Mr. V. J. Patel has recently said in London about the need of counter-acting anti-Indian propaganda in the West not by display of our injured feelings, but by sober *presentation abroad of facts and figures about the present situation* in this country...Attempts are made to prove that I, for one, utterly at variance with Mahatmajee and capital is made of our supposed antagonism.' (ইটালিকস্ আমাদের)।

বিদেশে ভারতের কুৎসা কিভাবে রটনা হইতেছে, তাহার কয়েকটি উদাহরণ নিজ অভিজ্ঞতা হইতে দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করেন। দক্ষিণ-আমেরিকা ভ্রমণকালে সেই সুদূর দেশে গিয়া দেখেন ভারতের নিন্দা অত্যন্ত চতুরতার সহিত প্রচারিত হইতেছে। কবি লিখিলেন, আমরা জানি না ভারতনিন্দা-প্রচারের পশ্চাতে কি সব শক্তি কার্য করিতেছে।

১ নৃত্যগীত সম্বন্ধে দক্ষিণ-ভারত হইতে কোনো ব্যক্তি প্রশ্ন করিয়া পাঠায়; কবির সেক্রেটারি অমিয় চক্রবর্তী তদুত্তরে লেখেন, 'Dr. Tagore believes that through dancing and music the highest spiritual gifts of man can be expressed and therefore by neglecting them we shall be crippling our essential personality.' (8 January 1933)।

২ ৫ মার্চ প্রশান্তচন্দ্রের বিবাহের সাম্বৎসরিকে উপস্থিত ছিলেন। চিঠিপত্র ৩, পত্র ৪৮।

৩ 'শাপমোচন' নামে কথিকা লিখিত হয় ১৩৩৮ পৌষ মাসে। রবীন্দ্রজয়ন্তীর আঙ্গিকরূপে ১৫ ও ১৬ পৌষ জোড়াসাঁকো ভবনে নৃত্যগীত ও পাঠসহযোগে ইহা অভিনীত হয়। দ্র. বিচিত্রা ১৩৩৮ মাঘ, পৃ. ৪-৭। পুনশ্চ গ্রন্থভুক্ত ১৩৩৯ আশ্বিন। কলিকাতায় এইবার (১৩৩৯ চৈত্র) শাপমোচনের যে রূপটি দান করেন, তাহাই রচনাবলী ২২শ খণ্ডে গৃহীত হইয়াছে। জোড়াসাঁকোর প্রথম অভিনয়কালে যে গানগুলি ছিল, পরবর্তী সংস্করণে তাহার অদলবদল হয়। দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২, গ্রন্থপরিচয়, পৃ. ৫০৬-০৭।

কিন্তু "that it is efficient and has a sound financial power to support it is evident."। কবি স্পষ্ট করিয়া এই বিবৃতি-পত্রে বলিলেন যে "এই দুষ্টপ্রচার কর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেই হইবে।" কিন্তু "mere sporadic oratorical display or casual visits in foreign lands by gifted individuals can never have any lasting effect. What is needed is to establish *fully equipped information centres in the West,* from where the organized voice of India may have the opportunity to send abroad her judgment and appeal"।[১]

বিদেশে ভারতবিষয়ক সংবাদ সরবরাহ কেন্দ্র স্থাপন করিয়া তথা হইতে নিয়মিতভাবে তথ্যাদি প্রচার দ্বারা পাশ্চাত্যদেশের অপ-প্রচারকে বাধা দান করিতে হইবে— ইহা হইল বাস্তববাদী কবির উপদেশ।

যেদিন এই দীর্ঘ পত্র-বিবৃতি লেখেন, সেই দিন বর্ষশেষে 'অভ্যুদয়' (১৩৩৯) নামে বীথিকার কবিতাটি লেখেন।[২]

বর্ষশেষে সন্ধ্যার সময় ও পরদিন প্রাতে নববর্ষের প্রাতে (১৩৪০) যথারীতি শান্তিনিকেতন মন্দিরে উপাসনা করিলেন।[৩]

এই পরিচ্ছেদ শেষ করিবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রমুখী প্রতিভার একটি সংবাদ এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি। পাঠকের স্মরণ আছে প্রায় অর্ধশতাব্দীর পূর্বে কলিকাতা সারস্বত সমাজ স্থাপন প্রচেষ্টার সময়ে বাংলা পরিভাষা প্রণয়নে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-পদ গ্রহণ করার পর রবীন্দ্রনাথ এই কার্যে পুনঃপ্রবৃত্ত হন। তাঁহার অনুরোধে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য তরুণ অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্যকে নিযুক্ত করেন। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে পরিভাষা সংকলনে কে কি কার্য করিতেছেন, তাহা জানিবার জন্য পত্রিকাসমূহে বিজ্ঞাপন প্রদত্ত হয়। পরিভাষা সংকলন কার্য ভালোভাবেই আরম্ভ হয়; কিন্তু যে কারণেই হউক বিশ্ববিদ্যালয় ইহা তখন সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। ভারত স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের নানাস্থানে পরিভাষা প্রণয়নের কার্য ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়। হিন্দীভাষায় বহু পারিভাষিক কোষ প্রকাশিত হইয়াছে এবং কেন্দ্রীয় ভারতসরকার এ বিষয়ে তৎপর হইয়াছেন। বাংলায় সে-শ্রেণীর প্রয়াস হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ অগ্রণী হইয়া যে-কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা যদি বাংলাসরকার ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করিতেন, তবে হয়তো পরিভাষা রচনার গৌরব বাঙালিরই প্রাপ্য হইত। কয়েক বৎসরের মধ্যে বাংলার রাজনীতির মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা দেখা দিল, এবং বাংলাভাষার মধ্যেও সেই সাম্প্রদায়িক বিষ প্রবেশিয়া এই প্রচেষ্টাকে অগ্রসর হইতে দিল না। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত সর্ববাদীসম্মত পরিভাষাকোষ রচিত হয় নাই।

১ Advance, April 16, 1933 ও সমসাময়িক দৈনিক পত্রিকা।

২ 'অভ্যুদয়' নামে একখানি মাসিকপত্রে ১৩৪০ বৈশাখ সংখ্যায় কবির হস্তলিপির হাফটোন মুদ্রিত হয়।

৩ দ্র. প্রবাসী ১৩৪০ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ৬২-৬৩।

দুই বোন, মালঞ্চ ও বাঁশরী

দুই বোন, মালঞ্চ

আমরা যে পর্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত, তাহা যেমন ঘটনাবাহুল্যে বিচিত্র, নূতন সাহিত্য রচনায় তেমনই সমৃদ্ধ। আমরা কবির জীবনে বারে বারে লক্ষ্য করিয়াছি যে, এক-একটি কবিতাপর্বের পর কবি গল্প বলিয়াছেন। 'পুনশ্চ' গদ্যকাব্যে গল্পের আভাস পাই। কিন্তু লিপিকা-শ্রেণী কথিকার সীমিত-অঙ্গনে গল্পের সকল কথা প্রকাশ পায় না। গদ্যের বৃহত্তর ক্ষেত্রে গল্প বলিবার ইচ্ছা রূপ পাইল 'দুই বোন'-এ।[১] প্রায় এক বৎসর পরে লেখেন 'মালঞ্চ'[২]। এই দুইটি ছোট উপন্যাসের সমসাময়িক রচনা 'বাঁশরী'[৩] নাটক— প্রথম খসড়ায় নাম ছিল 'ললাটের লিখন'। বিদ্যালয় গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বন্ধ হইবার পূর্বে নাটকটির খসড়া শান্তিনিকেতনবাসীদের নিকট পড়িয়া শোনান (১৯৩৩ এপ্রিল ২৩ ॥ ১৩৪০ বৈশাখ ১০)।

এই উপন্যাস দুইটিতে ও নাটকের মধ্যে ভারতীয় হিন্দুসমাজ-জীবনে নরনারীর সম্বন্ধ বিষয়ে যে যুগান্তর আসিতেছে, কবির দৃষ্টি তাহার উপর নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার সূচনা হয় 'শেষের কবিতা'য়— তাই বা বলি কেন— তাহার বহু পূর্বে 'চতুরঙ্গে'ই তো তাহার স্পষ্ট আভাস পাই। নূতন কাহিনীর নরনারীরা নূতনযুগের প্রতীক। সেই নূতনযুগের ভাবনারাজি ইহাদের মুখ দিয়া নানাভাবে উক্ত ও ব্যবহারিক জীবনে ব্যক্ত হইতেছে।

দুই বোন, মালঞ্চ ও বাঁশরী— এই তিনখানি বইতে কবি 'প্রেম' ও 'ভালোবাসা'র মধ্যে সূক্ষ্ম রেখা টানিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার বাহিরে সামাজিকভাবে-নিঃসংপৃক্ত নরনারীর আকর্ষণজনিত প্রেমেরও ক্ষেত্র আছে। সে-প্রেম দেহসম্বন্ধ-নিরপেক্ষ, সাধারণ যৌন লক্ষণের ঊর্ধ্বে; মনস্বিতা ও হৃদয়াবেগ (intollectuality ও omotion) এখন একটা সুন্দর সমন্বয়ের স্তরে কল্পিত হয়— যেখানে দেহের ক্ষুধা লুপ্ত, মানুষের মধ্যে সুপ্ত-পশু মৃতপ্রায়। বীথিকার একটি কবিতা (ব্যর্থ মিলন) এখানে স্মরণীয়—

> ভয় করিয়ো না মোরে। এ করুণা কণা
> রেখো মনে— ভুল করে মনে করিয়ো না
> দস্যু আমি— লোভেতে নিষ্ঠুর। জেনো মোরে
> প্রেমের তাপস। সুকঠোর ব্রত ধরে
> কবির সাধনা।· ·

কিন্তু বাস্তব জগতে দেখা যায় যে, পশু মৃতপ্রায় তো নহেই, সে অত্যন্ত তীব্রভাবেই সদা জাগ্রত— অনুকূল স্পর্শাভাবেই অবচেতনে ডুবিয়া থাকে। সেই সোনার কাঠির স্পর্শে তাহার মনও যেমন জাগে, বুভুক্ষিত দেহও তেমনি নিজ প্রাকৃতরূপ ধারণ করে; এই দেহতত্ত্ব চির রহস্যময়।

১ দুই বোন, বিচিত্রা ১৩৩৯ অগ্রহায়ণ - ফাল্গুন সংখ্যায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে ১৩৩৯ ফাল্গুন [১৯৩৩ মার্চ]। দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী ১১ খণ্ড, পৃ. ৪০৯-৬৬।

২ মালঞ্চ, বিচিত্রা ১৩৪০ আশ্বিন - অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে ১৩৪০ চৈত্র [১৯৩৪ মার্চ]। দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২, পৃ. ১৬৯-২০২।

৩ বাঁশরী, ভারতবর্ষ ১৩৪০ কার্তিক - পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে ১৩৪০ অগ্রহায়ণ [১৯৩৩ ডিসেম্বর]। দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ. ১৪৫-২০০। রচনাকালে নাটকের নাম ছিল 'ললাটের লিখন' ও ক্ষিতীশের নাম ছিল পৃথ্বীশ। দ্র. সুধীরচন্দ্র কর, কবিকথা, পৃ. ৬৫।

'দুই বোন, 'মালঞ্চ' ও 'বাঁশরী'— এই তিনটি রচনা এবং ইহার পরবর্তী 'চার অধ্যায়' ও 'তিনসঙ্গী'কে একটি গল্পচক্রের মধ্যে ফেলা যায়। একই পুরুষের পক্ষে দুইজন নারীর প্রতি প্রেম কী সমাজে, কী সাহিত্যে দুর্লভ নহে। কিন্তু সার্থক দাম্পত্যজীবনের মধ্যে দান-প্রতিদান যে বড়ো একটা অঙ্গ, সে-কথা অস্বীকৃতি বা বিস্মৃতি হইতেই সমাজবন্ধনের সমস্যা। নিঃস্বার্থ প্রেম দেবতা বা মহামানবে সম্ভব হইলেও হইতে পারে, জৈব ও প্রাকৃত জগতে তাহার স্থান অত্যন্ত সংকীর্ণ ও ক্ষণস্থায়ী। প্রেমের সার্থকতা ত্যাগে এ কথা অত্যন্ত সাধারণ; কিন্তু সেই প্রেম তখনই সার্থক যখন প্রেমিক ও প্রেমিকা নিঃসন্দেহে জানে যে তাহার প্রেমাস্পদ তাহার দান অকলুষিত চিত্তে অকলঙ্কিত দেহে ঐকান্তিকভাবে গ্রহণ করিতেছে। দাম্পত্যজীবনে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ ও তাহার সহিত প্রেমের বখেরা সহ্য করিবার মতো উদারতা কোনো স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে; অথচ পুরুষ চিরদিনই নিজজীবনে বহু নারীসম্ভোগকে বিধিবিধান রচনার দ্বারা সমর্থন করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু নারীর নিকট হইতে দাবি করিয়াছে একনিষ্ঠা। সমাজে সেই একনিষ্ঠার নাম সতীত্ব, পাতিব্রত্য। কিন্তু পুরুষের স্ত্রীনিষ্ঠার কোনো শব্দ ভাষায় নাই। বরং পুরুষ আপন বিবাহিত স্ত্রীর প্রতি অক্ষুণ্ণ কর্তব্য পালন করিলে 'স্ত্রৈণ' বলিয়া উপহসিত হইয়া আসিতেছে। পুরুষরাই শাস্ত্রকার— কী প্রাচীন, কী আধুনিক যুগে— সকলেই পুরুষের প্রতি নারীর একনিষ্ঠা দাবী করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু নারী প্রেমাস্পদের উপর অন্যের দাবিকে অন্তর হইতে স্বীকার বা সহ্য করিতে পারে নাই, বরং নিজের দাবি সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিতেই সে প্রস্তুত। রবীন্দ্রনাথ এই যৌন সমস্যার চরম আলোচনা করিয়াছেন। আরও কয়েক বৎসর পরে— 'তিনসঙ্গী'র গল্পগুলির মধ্যে; যথাস্থানে তাহার আলোচনা হইবে।

দুই বোন ও মালঞ্চে বিরোধ ঘটিয়াছে বিবাহিত জীবনে— স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক সম্বন্ধের সঙ্গে অবিবাহিত প্রেমের দ্বন্দ্ব। আর বাঁশরীতে সংগ্রাম বাধিয়াছে প্রেম ও কর্তব্যের মধ্যে; এ সম্বন্ধে আর-একটু পরে আলোচনা আসিতেছে।

'চোখের বালি' উপন্যাসে আশা ও বিনোদিনীকে যুগপৎ সম্ভোগের যে দুষ্টকল্পনা মহেন্দ্রকে পাইয়া বসে, তাহা 'শেষের কবিতা'য় প্রেম ও ভালোবাসার সূক্ষ্ম ভেদ সৃষ্টি দ্বারা সমস্যা নিরাকৃত করা হয়; অশিষ্ট সম্ভোগ লালসা শেষের কবিতায় স্থান লাভ করে নাই। কিন্তু 'দুই বোন' 'মালঞ্চে' অশিষ্ট প্রেম-আকাঙ্ক্ষা নায়ক-নায়িকাদের জীবনকে ট্রাজেডির মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়া দিল।

'দুই বোন' ক্ষুদ্র উপন্যাস; পড়িতে পড়িতে অনুভব করা যায় যে, বিশেষ একটা কিছু বলিবার জন্যই লেখকের চেষ্টা চলিতেছে। সেই বিশেষ কথাটা গল্পের গোড়াতেই বলিয়াছেন, মেয়েদের মধ্যে "এক জাত প্রধানত মা, আর-এক জাত প্রিয়া।" বলাকার যুগে এই সুর প্রথম ধ্বনিত হয়—

> কোন্ ক্ষণে সৃজনের সমুদ্রমন্থনে
> উঠেছিল দুই নারী অতলের শয্যাতল ছাড়ি!
> একজন উর্বশী, সুন্দরী,
> বিশ্বের কামনারাজ্যে রানী, স্বর্গের অপ্সরী।
> অন্যজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী,
> বিশ্বের জননী তাঁরে জানি, স্বর্গের ঈশ্বরী।

প্রেমিকা অপ্সরী— জনের উপর যেন সদাই সরে সরে চলে; জননী ঈশ্বরী ষড়ৈশ্বর্যশালিনী। বহু বৎসর পূর্বে

'নারী' কবিতায় (বঙ্গদর্শন ১৩০৯ পৌষ। উৎসর্গ ৪৩) কবি নারীকে আহ্বান করিয়াছিলেন— সুন্দরী কল্যাণী আনন্দময়ী বিষাদিনী তপস্বিনী— এই পঞ্চরূপে।

'দুই বোনে'র মধ্যে শর্মিলার মাতৃরূপটি ফুটিয়াছে তাহার স্বামীসেবায়। 'মালঞ্চে'র মধ্যে নীরজার ভালোবাসাও ছিল প্রচণ্ড ; সেই ভালোবাসার বিরুদ্ধে "বিধাতার হস্তক্ষেপ তার কল্পনার অতীত।"

এই ভালোবাসা তাহার ব্যাহত হয় নাই বিবাহিত জীবনের প্রথম নয়-দশটি বৎসর। উভয় গল্পে সমস্যা দেখা দিল, যখন স্ত্রী হইল পীড়িত। যতক্ষণ শর্মিলা সুস্থ ও কর্মক্ষম ছিল ততক্ষণ ঊর্মিমালার প্রতি শশাঙ্কের আকর্ষণ সুস্পষ্ট হয় নাই। সন্তানের অভাবে স্বামীর উপরেই শর্মিলার মাতৃহৃদয়-উত্থিত অতি-লালনতার ভার শশাঙ্কের পক্ষে দুর্বহ হইয়া উঠে। বড়ো দুঃখে একবার শশাঙ্ক শর্মিলাকে বলেন, "দোহাই তোমার, চক্রবর্তীবাড়ির গিন্নির মতো একটা ঠাকুরদেবতা আশ্রয় করো। তোমার মনোযোগ আমার একলার পক্ষে বেশি।" আর-একদিন সে বলে, "দেখো শর্মিলা, তুমি আমাকে খেলনা বানিয়ে বিশ্বের লোক ডেকে খেলা করবার চেষ্টা করো না।" আসলে, ভিতরের সুপ্ত পশু সহজে মরিতে চায় না। একান্ত ভালোবাসার অসহ্য পীড়নে সে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে, বৈচিত্র্যের জন্য বটে, দায়িত্বহীন প্রেমরস সম্ভোগের জন্যও বটে।

'মালঞ্চে' নীরজার বিবাহের পর দশটা বৎসর একটানা চলিয়া যায় অবিমিশ্র সুখে। এই দীর্ঘকাল সরলার সঙ্গে তাহাদের যোগ ছিল নিবিড়। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল নীরজার পীড়ার পর। শর্মিলা ও নীরজা— উভয়ের জীবনে স্বামী ছিল ভালোবাসার একমাত্র পাত্র, কারণ উভয়েই নিঃসন্তান। "নীরজার সন্তান হবার আশা সবাই ছেড়ে দিয়েছিল। ওদের আশ্রিত গণেশের ছেলেটাকে নিয়ে যখন নীরজার প্রতিহত স্নেহবৃত্তির প্রবল আলোড়ন চলেছে, আর ছেলেটা যখন তার অশান্ত অভিঘাত আর সইতে পারছে না, এমন সময় ঘটল সন্তানসম্ভাবনা, ভিতরে ভিতরে মাতৃহৃদয় উঠল ভরে, ভাবীকালের দিগন্ত উঠল নবজীবনের প্রভাত আভায় রক্তিম হয়ে।·· তার পর অস্ত্রাঘাত করতে হল, শিশুকে মেরে জননীকে বাঁচালে।" এখন হইতেই সমস্যা নিবিড় হইয়া উঠিল।

অশান্ত পুরুষের মন চায় বৈচিত্র্য, নূতনত্ব ; নূতনত্ব যখন গৃহের মধ্যে ফুরায়, তখন সে তাহা খোঁজে বাহিরে। শশাঙ্ক-ঊর্মিমালার সংসারজীবনে ঊর্মিমালা আসিয়া প্রথমে কোনোই সমস্যা সৃষ্টি করে নাই ; কিন্তু অচিরে শশাঙ্কের মনের মধ্যে ঊর্মিমালার হাসি উচ্ছ্বাস প্রলয়ের অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তুলিল— স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের মধ্যে বেসুর ধ্বনিল।

অসুস্থ শর্মিলা বুঝিতে পারিতেছে যে দীর্ঘকাল সেবার দ্বারা, সাহচর্যের দ্বারা সে স্বামীকে আপন করিতে পারে নাই ; ঊর্মিমালার মতো সে শশাঙ্ককে 'আমোদ' দিতে পারে না। ঊর্মিমালাকে দেখিতে দেখিতে শর্মিলার মনে হইতেছে, "ও তো আমি নয়, ও যে সম্পূর্ণ আর-এক মেয়ে।" ·· "আমার জায়গা ও নেয় নি, ওর জায়গা আমি নিতে পারব না। আমি চলে গেলে ক্ষতি হবে, কিন্তু ও চলে গেলে সব শূন্য হবে।"

পূরবীর 'পূর্ণতা' কবিতায় আছে—

> তুমি দূরে যাও যদি নিরবধি
> শূন্যতার সীমাশূন্য ভারে
> সমস্ত ভুবন মম মরুময় রুক্ষ হয়ে যাবে একেবারে।
> আকাশ-বিস্তীর্ণ ক্লান্তি সব শান্তি চিত্ত হ'তে করিবে হরণ,—
> নিরানন্দ নিরালোক স্তব্ধ শোক মরণের অধিক মরণ।

বলা বাহুল্য, সমাজজীবনের বাস্তবতায় এই বিবাহ-উত্তর প্রেমের স্থান নির্দেশ করা কঠিন। কিন্তু এ কথা সত্য প্রেমলীলার উল্লাস উচ্ছ্বাস মনকে তৃপ্তি দিতে পারে না ; একদিন গ্লানিতে মন ভরিয়া উঠিবেই। শর্মিলা ভাবে, "দৈন্য-অপমানের এই নিদারুণ শূন্যতা একদিন কি পরিতাপ আনবে না ওঁর মনে। যার মোহে অভিভূত হয়ে এটা ঘটতে পারলে একদিন হয়তো তাকে মাপ করতে পারবেন না · · ।"

স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার বাহিরে, সামাজিকভাবে নিঃসম্পৃক্ত নরনারীর মধ্যে যে যৌন আকর্ষণ হয়— তাহাকে বলা হয় 'প্রেম'। ইহাকেই কি বৈষ্ণবশাস্ত্রের পরকীয়া প্রেম বলে ! চণ্ডীদাসের রজকিনীর প্রতি প্রেম 'কামগন্ধহীন'— রজকিনী চণ্ডীদাসের বিয়াত্রিচে, লরা।

দুই বোন ও মালঞ্চে পাত্রপাত্রীদের খুবই ঘেঁষাঘেঁষি কাছাকাছি বাস— তাই অহর্নিশি সংগ্রাম ও সংঘাত। (বাঁশরী নাটকেও এই দ্বন্দ্ব ; তবে গল্প দুইটির আরম্ভ মধুর দিয়া— সংঘাত নাই, ঈর্ষা নাই।) বাঁশরীর সংলাপ ঈর্ষাদগ্ধ তীব্র কঠোর— কোনো মাধুর্য নাই। মধুর দিয়া আরম্ভের পরিণাম হইল ভয়ঙ্কর— মালঞ্চের এক নারীর হইল মৃত্যু— সরলার কি হইল তাহা স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত না হইলেও বুঝা যায়। 'দুই বোন'এ যবনিকা পড়িল উর্মিমালার দেশত্যাগের সঙ্গে। আদিত্যের প্রেমের প্রতিমা সরলা ভালোবাসার প্রতীক গৃহিণীরূপে তাহার সংসারে আবির্ভূতা হইলে প্রেমের মোহ নিশ্চয়ই নির্বাপিত হইত। আদিত্য ও শশাঙ্ক কি করিয়া কল্পনা করিয়াছিল যে লক্ষ্মী ও উর্বশী একই গৃহতলে বাস করিতে পারে ! রবীন্দ্রনাথ এই অশিষ্ট কল্পনার পরিণাম দেখাইয়াছেন এই দুই গল্পে।

শর্মিলা-উর্মিমালা এবং নীরজা-সরলার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চিত্রিত হইয়াছে তাহা সাধারণ ও স্বাভাবিক নারীসুলভ ঈর্ষাপ্রসূত। তৎসত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়িয়া হীনতার পঙ্কে উর্মিমালা ও সরলা নিক্ষিপ্ত হয় নাই।

'চোখের বালি' উপন্যাসে এই দুই নারীর প্রথম আবির্ভাব হইয়াছিল : সেখানে আছে "বিনোদিনী ও আশা কাহাকেও ত্যাগ না করিয়া দুই চন্দ্রসেবিত গ্রহের মতো এইভাবে সে (মহেন্দ্র) চিরকাল কাটাইয়া দিতে পারিবে— এই মনে করিয়া তাহার মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল।" এই শ্রেণীর দুষ্ট কল্পনা পুরুষের পক্ষে স্বাভাবিক হইতে পারে, কিন্তু স্বাভাবিক হইলেই তাহা মানবিক সত্য বলিয়া সমাজে স্বীকৃত হয় নাই— এই অশিষ্ট কল্পনার যত সুন্দর ও আধ্যাত্মিক নাম দিই, বা বৈজ্ঞানিক কারণ দর্শাই। আদিত্য ও শশাঙ্ক মহেন্দ্রের ন্যায়ই ভাবিয়াছিল যে তাহারাও দুই নারীকে একই সঙ্গে পাইবে। কবি দেখাইলেন যে প্রেমের এই রাজসিকতা বাস্তবজীবনে সম্ভব নহে— বিনোদিনী উর্মিমালা ও সরলা কেহই সংসারে ধরা দিল না। 'দুই বোন' পড়িতে পড়িতে 'নষ্টনীড়ে'র কাহিনী স্মরণে উদিত হয়।[১]

১ দ্র. সুধাময়ী দেবী লিখিত, 'বাঁশরী, মালঞ্চ ও দুই বোন' ; জয়শ্রী ৫ম বর্ষ ১৩৪২ আশ্বিন, পৃ. ৫১৭-৬১। Will Durantএর *Mansions of Philosophy* গ্রন্থের Love পরিচ্ছেদ হইতে তিনি এই কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন— "It is remarkable how marriage withers when children stay away and how it blossoms when they come......The man looking at her falls in love with her anew ; this is another woman than before with new resources and abilities with a patience and tenderness never felt in the violence of love and though face may be pale now and her form for a time disfigured, to him it seems as if she comes back out of the jaws of death with a gift absurdly precious ; a gift for which he can never sufficiently repay her"। শিশুজন্মের পর স্বামীস্ত্রীর প্রেম নূতনরূপ গ্রহণ করে। সন্তানকে কেন্দ্র করিয়া আরম্ভ হয় প্রেমের নূতন জয়যাত্রা।

বাঁশরী

'বাঁশরী' নাটকাকারে লিখিত উপন্যাস ; দুই বোন ও মালঞ্চ মধুর দিয়া আরম্ভ, তিক্ততায় তার পরিণতি। বাঁশরীর আখ্যান তীব্র বিদ্বেষ ও ঘাতপ্রতিঘাত দিয়া আরম্ভ, ও উচ্চ আদর্শবাদের মধ্যে তাহার সমাপ্তি।) বাঁশরী সোমশঙ্করকে ভালোবাসিয়াছিল যৌবনের সমস্ত আবেগ দিয়া। সে জানিত সোমশঙ্কর একদিন তাহারই হইবে। কিন্তু হঠাৎ সন্ন্যাসী পুরন্দর আসিয়া সোমশঙ্করকে তাহার কাছ হইতে যেন ছিনাইয়া লইয়া গেলেন এবং তাহার বিবাহ দিলেন সুষমার সঙ্গে। সুষমা পুরন্দরের হাতে-গড়া— ভিতরে-ভিতরে সে তাঁহাকেই প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছিল— সে কথা পুরন্দরের অজানিত ছিল না। কিন্তু আজ দেশোদ্ধারের মহৎ আদর্শের জন্য পুরন্দর ক্ষত্রিয় সোমশঙ্করকে ব্রতী করিলেন। তিনি জানিতেন বাঁশরী সোমশঙ্করকে তাঁহার আদর্শের দিকে পৌঁছিতে দিবে না। এই নিদারুণ ঘটনার অভিঘাতে বাঁশরী ক্ষিতীশকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইল। ক্ষিতীশের প্রতি প্রেম বা অনুরাগবশত যে, সে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছে তাহা নহে, কেবল আপন মনের ক্ষোভকে শমিত করিবার জন্য তাহার এই আত্মঘাতের আয়োজন। এমন সময়ে সোমশঙ্করের সহিত বাঁশরীর সাক্ষাৎ হইল। তাহার সহিত কথা বলিয়া বাঁশরী বুঝিল সোমশঙ্কর এখনো তাহাকে ভালোবাসে— কিন্তু সে ভালোবাসায় দাহ নাই, তা কামগন্ধহীন বিশুদ্ধ প্রেম ; মহৎ আদর্শ সফল করিবার জন্য সুষমাকে তাহার প্রয়োজন। কারণ সুষমা পুরন্দরের দ্বারা মহৎ আদর্শে দীক্ষিত, তাহার পক্ষে সোমশঙ্করের কঠিন ব্রতে সহায়ক হওয়া সম্ভব।

সোমশঙ্করের সহিত কথাবার্তা কহিয়া বাঁশরীর পরিবর্তন ঘটিল। সে বলিতেছে, "শঙ্কর তুমি ক্ষত্রিয়ের মতোই ভালোবাসতে পারো। শুধু ভাব দিয়ে নয়, বীর্য দিয়ে। সত্যি করে বলো আজও কি আমাকে সেদিনের মতোই ততখানিই ভালোবাসো।" সোমশঙ্কর বলিল "ততখানিই।" এই একটিমাত্র কথায় বাঁশরীর মনের সমস্ত কুয়াশা যেন কাটিয়া গেল। সে বলিল, "আর কিছুই চাইনে আমি। সুষমাকে নিয়ে পূর্ণ হোক তোমার ব্রত, তা'কে ঈর্ষা করব না।"

পুরন্দরের সঙ্গে দেখা হলে বাঁশরী বলিল, সোমশঙ্করের "তপস্যা অপূর্ণ থাকবে আমি না থাকলে, আবশ্যক আছে আমাকে।" পুরন্দর বলে, "বঞ্চিত হবার দুঃখই শঙ্করকে দেবে শক্তি।" এ কথার প্রতিবাদে বাঁশরী বলে, "কখনই না, তা'তে পঙ্গু করবে তার ব্রত। যে পারে ঐ ক্ষত্রিয়কে শক্তি দিতে, সে সুষমা নয়।··" আজ বাঁশরী নিঃসংকোচে তাঁহাকে অভয় দিতে পারিবে— কারণ, আপনার অন্তরের মধ্যে সে যথার্থ ধর্মের দীক্ষা লাভ করিয়াছে।—

চাইনে তোমায় ধরতে আমি
মোর বাসনার ডোরে
আকাশ হতে গান গেয়ে যাও
নয় খাঁচাটার থেকে।

এইটিই যেন বাঁশরীর মনের কথা আজ।

'বাঁশরী' নাটকে পুরন্দর সন্ন্যাসী কবির একটি অদ্ভুত সৃষ্টি, এ যেন 'চার অধ্যায়ে'র ইন্দ্রনাথ, 'পথের দাবী'র সব্যসাচী। মহৎ আদর্শ কী তাহা কবি স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও আমরা বুঝিতে পারি যে দেশমাতৃকার উদ্ধারের জন্য কোনো বৈপ্লবিক অনুষ্ঠানের গুপ্ত আয়োজনে সোমশঙ্করকে পুরন্দর দীক্ষিত করিয়াছেন, সেই আদর্শের জন্য

সোমশঙ্কর বাঁশরীকে পরিত্যাগ করিয়া সুষমাকে বিবাহ করিল। আদর্শের জন্য এই শ্রেণীর নেতারা চিরদিনই নিজের সুখ অপরের সুখ সমস্তই অগ্রাহ্য করিতে পারে। এই আদর্শে উত্তীর্ণ হইবার পথের পরিণাম কি তাহা সোমশঙ্কর ভালোভাবেই জানেন; তাই বলিতেছেন, "সন্ন্যাসী, যে ব্রত নিয়েছি, সে কাজ আমার রক্তে বইছে, তেজরূপে জলছে বুকের মধ্যে হোমাগ্নির মতো। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি, আজ আমার দ্বিধা কোথায়?"

পুরন্দর এই উত্তর শুনিয়া বলিলেন, "এই কথাই শুনতে চেয়েছিলুম তোমার মুখ থেকে। আর-একটা কথা বাকি আছে। কেউ কেউ প্রশ্ন করে কেন সুষমার বিয়ে দিলুম তোমার সঙ্গে। তোমার কাছ থেকে আমি তার উত্তর চাই।" সোমশঙ্কর বলেন, "এতদিনের তপস্যায় এই নারীর চিত্তকে তুমি যজ্ঞের অগ্নিশিখার মতো উর্ধ্বে জ্বালিয়ে তুলেছ, আমারি 'পরে ভার দিলে অনির্বাণ অগ্নিকে চিরদিন রক্ষা করতে।" পুরন্দরের শেষ কথা, "বৎস, যতদিন রক্ষা করবে, তার দ্বারা তুমি আপনাকেই রক্ষা করবে। ঐ তোমার মূর্তিমান ধর্ম রইল— তোমার সঙ্গে— ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতম্।"

বাঁশরী নাটকের মধ্যে আধুনিক-আধুনিকা নর-নারীর প্রগল্ভ বাক্‌চাতুর্য লঘুচিত্ততা সমস্তকে অতিক্রম করেছে এর আদর্শতা; কোনো পাত্রপাত্রী 'ছোট' হয় নাই ব্যবহারে। সোমশঙ্কর সুষমাকে পত্নীরূপে লাভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু বাঁশরীর বিশুদ্ধ প্রেমকে সে পেয়েছে। এ কথা অতিসত্য যে, সুষমার স্থান বাঁশরী গ্রহণ করিতে পারে না, এবং বাঁশরীর স্থানও সুষমার পক্ষে লাভ করা অসম্ভব। আজ সোমশঙ্করের জীবন থেকে সুষমা চলে গেলে ক্ষতি হবে, কিন্তু বাঁশরী তাহার অন্তরে না থাকিলে সব শূন্য হইবে। কামগন্ধহীন প্রেম ইহাদের তিন জনকে বাঁধিল, কারণ অন্তরালে আছে মহৎ আদর্শের ভাবনা।[১]

গ্রীষ্মকালে দার্জিলিঙে

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বন্ধ (২৭ এপ্রিল ১৯৩৩) হইয়া গেলে কবি দার্জিলিঙ গেলেন। সেখানে সংবাদ পাইলেন গান্ধীজি য়েরবাদা জেলে একুশ দিনের জন্য অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন; এই অনশনের সহিত কোনো রাজনৈতিক ঘটনার যোগ নাই। ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত আত্মশুদ্ধি।

পুণাচুক্তির (১৯৩২ সেপ্টেম্বর) পর গবর্মেণ্ট গান্ধীজিকে জেলের ভিতর হইতে হরিজন বা অচ্ছুত দূরীকরণ আন্দোলন পরিচালন করিবার অনুমতি ও সুবিধা-সুযোগ দিয়াছিলেন। তদনুসারে ১৯৩৩ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি হইতে Harijan নামে ইংরেজি সাপ্তাহিক তাঁহার সম্পাদনে আহমেদাবাদের নবজীবন প্রেস হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। ইহার প্রথম সংখ্যা রবীন্দ্রনাথ কবি সত্যেন্দ্রনাথের 'মেথর' নামে একটি কবিতা অনুবাদ করিয়া পাঠাইয়া দেন।

আমাদের আলোচ্যপর্বে গান্ধীজির সাবরমতী আশ্রম হরিজন উন্নয়ন কেন্দ্র হইয়াছে। পুণা জেলে গান্ধীজি সংবাদ পাইলেন এই আশ্রমে তাঁহার কয়েকজন কর্মীদের মধ্যে নৈতিক দুর্বলতা দেখা দিয়াছে; এই পাপ নিরাকরণ উদ্দেশ্যে তিনি অনশন ব্রত গ্রহণ করেন। এই ঘটনার তিন দিন পরে গবর্মেণ্ট গান্ধীজিকে মুক্তি দিলেন; তিনি পুণায় লেডি থ্যাকারসের 'পর্ণ কুটির' নামে প্রাসাদে কয়েকদিনের জন্য আশ্রয় লইলেন।

১ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বাঁশরী ও তার পটভূমি; যুগান্তর ১৯৫৯ ডিসেম্বর ২৭ (১৩৬৬ পৌষ)।

রবীন্দ্রনাথ এই সংবাদ পাইয়া গান্ধীজিকে য়েরবাদা জেলে এক টেলিগ্রাম পাঠান, সে বার্তা তাঁহার হস্তগত হয় নাই বলিয়া শুনিয়াছি। গান্ধীজির এই অনশন গ্রহণকে কবি সমর্থন করিতে পারেন নাই; দার্জিলিঙ হইতে অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত দুইখানি পত্রে এই অনশনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন; অবশ্য সে-পত্রদ্বয় পরে মুদ্রিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে সাধক রবিদাস সম্বন্ধে একটি নূতন কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়া গান্ধীজিকে পাঠাইয়া দিলেন (১০ মে)। মূল কবিতাটি 'পুনশ্চ' কাব্যের 'প্রেমের সাধনা' নামে পরিচিত।

গান্ধীজি মুক্তিলাভ করিয়া ঘোষণা করিলেন যে, সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ থাকিবে, দেশের সমস্ত শক্তি অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিতে হইবে। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য খ্রীষ্টীয় মিশনারীগণ ব্রাহ্মসমাজ আর্যসমাজ বহুকাল চেষ্টান্বিত; ইহারা জাতিভেদকে সামাজিক ব্যাধি বলিয়া নিরাকৃত করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বহু প্রবন্ধ ও কবিতায় এই বিষয়ে লিখিয়াছিলেন। কিন্তু আজ রাজনৈতিক প্রয়োজনের জন্য অচ্ছুত-আন্দোলনের জন্ম হইল।

গত দুই বৎসর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের জন্য বহু নরনারী কারারুদ্ধ। গান্ধীজি যখন সেই আন্দোলন স্থগিত করিলেন, তখন সত্যাগ্রহীদের কারাবদ্ধ রাখার কোনো কারণ থাকিতে পারে না। নানা দলের নেতারা এইসব সত্যাগ্রহী রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিবার জন্য প্রার্থনা করিয়া এক টেলিগ্রাম গবর্মেণ্টের নিকট প্রেরণ করিলেন— স্বাক্ষরকারীদের তালিকায় রবীন্দ্রনাথের নাম প্রথমেই ছিল। বিলাতে New Statesman লিখিলেন যে তাঁহারা আশা করেন, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ লোকের দ্বারা প্রেরিত remarkable telegramএর প্রতি গবর্মেণ্টের মনোযোগ নিশ্চয়ই আকৃষ্ট হইবে।

গান্ধীজি প্রত্যক্ষ সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইয়া বিপ্লবকে প্রতিহত করিলেন, রবীন্দ্রনাথও 'আবেদন ও নিবেদন' না কবার মতবাদ হইতে ভ্রষ্ট হইলেন।[১]

এই সময়ে বাংলাদেশে আর-একটি সমস্যা দেখা দিল। তখনকার একশ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দীকে আন্দামান দ্বীপের বন্দীশালায় পাঠানো হইত। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের অংশগ্রহণকারীদের এই দ্বীপে সর্বপ্রথম প্রেরণ করা হয়; সেই হইতে ১৯৪২ সালে জাপানিদের দ্বারা অধিকৃত হইবার পূর্ব পর্যন্ত এই দ্বীপ পেনাল্ সেটলমেণ্টরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

বাংলার বহু সন্ত্রাসবাদীর দীর্ঘকাল এইখানে কাটিয়াছিল। ১৯৩৩ সালে বহুসংখ্যক যুবক সেখানে আবদ্ধ। গবর্মেণ্টের অতি-উৎসাহী কর্মচারীদের উৎপীড়নে উত্ত্যক্ত হইয়া বন্দীরা গান্ধীজির প্রদর্শিত 'অনশন' ধর্মঘট করিল। এই সংবাদে দেশবাসী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল; রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিঙ হইতে বন্দীদিগকে এভাবে আত্মাহুতি দান করিতে নিষেধ করিয়া টেলিগ্রাম করিলেন; কবির অনুরোধ রক্ষিত হইয়াছিল।

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত দিক হইতে কবির প্রতি এক আক্রমণের সংবাদ আসিল দার্জিলিঙে। পঞ্জাবের লায়াল-পুরের শিখরা রবীন্দ্রনাথের 'গুরু গোবিন্দ' (কথা ও কাহিনী) কবিতার মধ্যে গুরুর অপমানকর ঘটনা আবিষ্কার করিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া এক প্রতিবাদ সভা করিয়াছে (৬ জুন ১৯৩৩)। এই সংবাদ শুনিয়া কবি তো অবাক। এমন সুন্দর কবিতার মধ্য হইতে শিখরা কী করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল! জানা গেল, কবিতাটির একটি নিকৃষ্ট উর্দু তর্জমা এই কোলাহল সৃষ্টির জন্য দায়ী।

১ ভারতসরকারের হোম-মেম্বর সাহেব এই বিবৃতি পড়িয়া অত্যন্ত বিব্রত হইলেন এবং বন্দীদের প্রতি দরদ দেখাইবার জন্য তাহাদিগকে ভারতমধ্যে আবদ্ধ রাখার ব্যবস্থা করিলেন এবং এখন হইতে বন্দীরা বাংলাসরকারের তত্ত্বাবধানে থাকিবে স্থির হইল।

রবীন্দ্রনাথ তখনই অধ্যাপক তেজাসিংহকে এ বিষয়ে দীর্ঘ এক পত্র দার্জিলিঙ হইতে লিখিয়া (৯ জুন) পাঠাইলেন। কবি অধ্যাপককে জানান যে তিনি কোনো গল্প (আফ্‌সলা) লেখেন নাই, কবিতা লিখিয়াছিলেন। 'মানসসরোবর' নামে পত্রিকায় যে উর্দু গল্প প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা কবিতার অনুবাদ নহে, উহা a garbled version of the Urdu writer। কবি লিখিলেন যে ৩৫ বৎসর পূর্বে এই কবিতা লিখিত হয়; তখন ম্যাকগ্রেগর ও কানিংহামের ইতিহাস ব্যতীত গ্রন্থ ছিল না।[১] কবি তাঁহাদের প্রদত্ত কাহিনী অবলম্বন করিয়াছিলেন। কবি বলেন তাঁহার কবিতায় গুরু গোবিন্দের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখানো হয় নাই। ইহার পরে বহুদিন শিখদের পত্রিকায় এই আলোচনা চলে। অতঃপর ১৯৩৫ সালে কবি যেবার লাহোর যান সেইবার শিখদের সহিত মুকাবালা হইলে তাহারা বুঝিতে পারে যে, গুরুর প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা, তাহাদের ভক্তি হইতে কিছু কম নয়।

দার্জিলিঙ বাসকালে জিমখানা ক্লাবের এক অনুষ্ঠানে কবি নিমন্ত্রিত হন (১১ জুন)। সেখানে তিনি তাঁহার ইংরেজি ও বাংলা কবিতা পাঠ করেন; বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'বিদায়-অভিশাপ' আবৃত্তির সঙ্গে শ্রীমতী দেবীর নৃত্য। নৃত্যব্যঞ্জনার দ্বারা কচ ও দেবযানীর ভাব ব্যক্ত হয়। দুইটি মাত্র পাত্রের সংলাপে যে নৃত্য-ছন্দে রূপায়িত করা যায়, এইটি কবি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলেন।

দার্জিলিঙে কাব্যলক্ষ্মী মাঝে মাঝে দেখা দেন। হিমালয়ে বর্ষা নামে পাঁজির বর্ষা ঋতুর পূর্বেই; তাই কবি জ্যৈষ্ঠ মাসে 'আষাঢ়'[২] বন্দনা করিলেন ও 'যক্ষ'কে প্রশ্ন করিয়া পত্র লিখিলেন (১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০)। 'যক্ষ' কবিতা লেখার পূর্বে লেখা 'বিচ্ছেদ'এর (১৪ জ্যৈষ্ঠ) মধ্যে প্রেমের দ্বন্দ্ব ও বিরোধের যে বিশ্লেষণ আছে, তাহার ভাবাত্মক দিকটির প্রকাশ পাই 'যক্ষ' কবিতায়। আরও কয়েকদিন পরে লেখা 'দুঃখী'র সঙ্গে (৬ আষাঢ়) ঐ দুইটি কবিতা একত্র পঠনীয় (দ্র. বীথিকা)।

'মেঘদূত' সম্বন্ধে কবির অনেক রচনা আছে। নানা সময়ে নানাভাবে মেঘদূতকে দেখিয়াছেন; এবারকার 'যক্ষ'র মধ্যে এই বিরহের নূতনত্ব পাই। 'বিচ্ছেদ' কবিতার মধ্যে আছে—

তোমাদের ভাগ্যে আছে চেয়ে অনুক্ষণ
কখন দোঁহার মাঝে একজন
উঠিবে সাহস ক'রে,
বলিবে, "যে মায়াডোরে
বন্দী হয়ে দূরে ছিনু এতদিন
ছিন্ন হ'ক, সে তো সত্যহীন।
লও বক্ষে দুবাহু বাড়ায়ে;
সম্মুখে যাহারে চাও পিছনেই আছে সে দাঁড়ায়ে।"

১ "Mc. Gregor's *History of the Sikhs* (Pub. 1846), pages 99-100 and Cunnigham's *History of the Sikhs* (2nd Ed. 1858, pp. 79-80)...give the version of the incident followed in my poem. Cunningham's book is regarded as the standard authority on Sikh history and a new edition of this book has been edited by Prof. Garret of Lahore. I had no reason to suspect that this writer is unreliable....".— National Call, Delhi, 11 June 1933.

২ আষাঢ়, নববর্ষার দিন, প্রবাসী ১৩৪০ আষাঢ়। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ. ১২০। শেষ সপ্তকের সংযোজন ৩৭ ও ৩৮ সংখ্যায় পুনর্লিখিত।

এই গেল 'বিরহে'র এক মূর্তি বা এক ধরণের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা। 'যক্ষ'র মধ্যে বিরহের অন্য প্রকার ব্যাখ্যা ; সেখানে কবি বলিতেছেন দয়িতাকে—

আপন বেষ্টনে তুমি যবে
রুদ্ধ রেখেছিলে তারে দু-জনের নির্জন উৎসবে
সংসারের নিভৃত সীমায় · ·

তার পর · · বর তুমি পেলে যবে প্রভুশাপে,
সামীপ্যের বন্ধ ছিন্ন হল, বিরহের দুঃখতাপে
প্রেম হল পূর্ণ বিকাশত ; · ·

'বিচ্ছেদ' কবিতা পাঠ করিবার পর এই 'যক্ষ' কবিতাটি পুনরায় পড়িতে অনুরোধ করিতেছি ; উভয়ের মধ্যে বিরহের দুইটি রূপ ব্যাখ্যাত। 'দুঃখী' (বীথিকা, পৃ. ১৩৭) কবিতাও বিশেষভাবে পঠনীয় ; 'বিসর্জনে' আছে—

জান কি একেলা কারে বলে। যবে বসে আছি ভরা মনে দিতে চাই নিতে কেহ নাই।

আজ বলিতেছেন—

দুইজন পাশাপাশি যবে
রহে একা, তার চেয়ে একা কিছু নাই এ ভুবনে।
দুজনার অসংলগ্ন মনে
ছিদ্রময় যৌবনের তরী
অশ্রুর তরঙ্গে ওঠে ভরি ;
বসন্তের রসরাশি সেও হয় দারুণ দুর্বহ,
যুগলের নিঃসঙ্গতা নিষ্ঠুর বিরহ।

এই কবিতাগুলি কাহারো জীবনের কোনো বাস্তব সমস্যা দেখিয়া লেখা কি না জানি না ; অথবা 'মালঞ্চ'র মধ্যে প্রেমের যে দ্বন্দ্ব ও সমস্যা দেখাইয়াছেন, এ কবিতাগুলি তাহারই সমাধান।

শিক্ষাভবন ও পাঠভবন

রবীন্দ্রনাথের জীবনকাহিনীর সহিত শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত, তাই মাঝে মাঝে তথাকার সমসাময়িক ইতিহাস বলিতে হয়। বিদ্যালয়ের কর্মীদের মধ্যে অদল-বদল নিয়োগ-বিয়োগ পূর্বের ন্যায় চলিতেছে ; আদর্শের সহিত কবি বাস্তবের মিল পান না, মনে করেন লোক পরিবর্তনের দ্বারা তাঁহার আদর্শ সফল হইবে।

শান্তিনিকেতন কলেজ বা শিক্ষাভবন শুরু হয় ১৯২৬ সালে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রথম অধ্যক্ষ ; তার পর নেপালচন্দ্র রায় জাহাঙ্গীর ভকীল ও প্রেমসুন্দর বসু অধ্যক্ষতা করেন। ডক্টর নলিনচন্দ্র গাঙ্গুলি ১৯২৮ ডিসেম্বর মাসে আসেন। ১৯৩২ সালে পূজাবকাশের পর তিনি কার্যে যোগদান করিলেন না। নানা কারণে নলিনচন্দ্রের কর্মপদ্ধতিতে কবির মনে হইতেছিল যে ঠিক সুর বাজিতেছে না, আদর্শ ও বাস্তবে কোথায় সংঘাত বাধিয়াছিল।

কবি জারমেনির মারবুর্গ হইতে ২৮ জুলাই ১৯৩০ নলিনচন্দ্র গাঙ্গুলিকে যে পত্র লেখেন, তাহার মধ্যে বেসুর ধ্বনিতেছে। কবি লিখিতেছেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষায় ষোলো আনা ফল পেয়েছ শুনে পবনবাহন [airmail] যোগে সাধুবাদ পাঠাচ্ছি।· · তবে একটা কথা মনে করিয়ে দেওয়া ভালো যে, পরীক্ষার ফল যে খুব বেশি দামী এ কথা আমি কোনোদিন মনে করিনে, বাল্যকালেই তার পরিচয় দিয়েছি— বৃদ্ধকালেও যে মতের পরিবর্তন হয়েচে তার লক্ষণ দেখিনে।· · শিক্ষার যথার্থ সার্থকতা প্রাণের মধ্যে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা· · পরীক্ষা পাস করানো নয়।· · যে-বিদ্যালয়কে নিজের প্রাণশক্তি দ্বারা ছাত্ররা প্রতিদিন সৃষ্টি না করে সে বিদ্যালয় বিদ্যার খাঁচা। তোমার ছাত্ররা যতদিন আমাদের আশ্রমের সঙ্গে প্রাণের যোগ স্থাপন না করবে ততদিন তাদেরও অগৌরব, আমাদেরও ব্যর্থতা।· · পরীক্ষা· · ক্লিষ্ট জীবনের অশ্রুজল গ্রহণ কোরো না, গ্রহণ কোরো ভারতীর প্রসাদ থেকে অমৃতবিন্দু।"[১]

কবির এই পত্রের সুর হইতে বুঝা যাইতেছে যে, নলিনচন্দ্র গাঙ্গুলি শিক্ষাভবনকে যতই 'কলেজে'র রূপ দান করিবার জন্য ব্যস্ত, কবির আশঙ্কা তত যেন বাড়িতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত বিশ্বভারতীর কলেজের সরকারী সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৬ হইতে; কিন্তু তখনো খানিকটা ঘরোয়াভাবে কাজকর্ম-পঠনপাঠন চলিত। কলিকাতা হইতে সপ্তাহে সপ্তাহে সরোজকুমার দাস অশোক চট্টোপাধ্যায়, কখনো কখনো প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ আসিয়া কলেজের ছাত্রদের পাঠনির্দেশ দিতেন; ছাত্ররা আপন চেষ্টায় অধ্যয়ন করিত। নলিনচন্দ্রর সময় হইতে নানা বিষয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়, এবং আশ্রমের অনেককে অধ্যাপনাকার্যে তিনি আকর্ষণ করেন। বলিতে গেলে তিনিই শিক্ষাভবনকে সর্বাঙ্গীণ কলেজী রূপ দান করিয়াছিলেন; তাহাতে হয়তো আশ্রমের সমগ্রতা আহত হইতেছিল। প্রায় চারি বৎসর পরে নলিনচন্দ্র অধ্যক্ষতার পদে ইস্তফা দিলে তাঁহার স্থলে ধীরেন্দ্রমোহন সেনকে কবি ঐ কার্যে নিযুক্ত করিলেন।

ধীরেন্দ্রমোহন সেন অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র; ইনি বাল্যকাল হইতে আশ্রমে লালিত। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দিল্লির নবগঠিত য়ুনিভর্সিটিতে পড়িতে যান ও সেখান হইতে এম.এ. পাস করিবার পর ১৯২৫ সালে ইংলন্‌ড যান। সেখানে দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাল নানা বিষয় অধ্যয়ন করিয়া অবশেষে লন্‌ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের Ph.D. উপাধি লইয়া দেশে ফেরেন ১৯৩০ সালে। ১৯৩০ মার্চ মাসে মি. এলম্‌হার্স্ট কর্তৃক ধীরেন্দ্রমোহন শ্রীনিকেতনে Research Psychologist রূপে এক বৎসরের জন্য নিয়োজিত হন। শিক্ষাচর্চা ও গ্রাম্যশিক্ষার বিশেষ ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। ১৯৩২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি শিক্ষাসত্রের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন; অধ্যক্ষ প্রেমচাঁদ লাল বিদেশ হইতে 'ডক্টর' উপাধি লইয়া ফিরিয়া আসিলেন অক্টোবর মাসে। তিনি শিক্ষাসত্রের কার্যভার গ্রহণ করিলে ধীরেন্দ্রমোহন নভেম্বর মাস হইতে শান্তিনিকেতনের কলেজ বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন।[২]

শিক্ষাভবন বা কলেজ-বিভাগের মধ্যে যেমন পরিবর্তন হইতেছে, পাঠভবন বা স্কুল-বিভাগের মধ্যে অদল-বদল কিছু কম হইতেছে না। আরিয়াম কবির সহিত য়ুরোপ গেলে জগদানন্দ রায় ১৯৩০ ফেব্রুয়ারি হইতে এক বৎসর কাল পাঠভবনের অধ্যক্ষতা করেন। ১৯৩১ ফেব্রুয়ারি মাসে তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ রেক্টর নিযুক্ত হন; তনয়েন্দ্রনাথ

১ প্রবাসী ১৩৩৮ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ১৭৪।

২ রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০, ৫ সেপ্টেম্বর আমেরিকা হইতে রথীন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন, "আমার বিশ্বাস ধীরেনকে যদি ঐ পদ [অধ্যক্ষতা] দেওয়া যায় তো ভালই হয়।"—চিঠিপত্র ২।

১৯২৬ অগস্ট মাস হইতে আশ্রমের কাজে নিযুক্ত আছেন ; রেক্টর-পদ গ্রহণের পূর্বে তিনি শিশুবিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। কবির য়ুরোপযাত্রার পূর্বে আশা দেবী আশ্রমের কাজে যোগদান করেন ও কয়েকমাস পরে তাঁহার ভগ্নী ভক্তি দেবীও আসেন।[১]

তনয়েন্দ্রনাথের পরে ১৯৩২ সালে জুলাই মাস হইতে আশা দেবী রেক্টরের পদ গ্রহণ করিলেন ; জুলাই হইতে ১৯৩৩এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ইনি অধ্যক্ষ ছিলেন। এই কয়েক মাসের মধ্যে বিদ্যালয়ে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। পুরাতন অধ্যাপকদের মধ্যে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জগদানন্দ রায় ও নগেন্দ্রনাথ আইচকে অধিক বয়সের জন্য অবসর গ্রহণ করিতে হইল। ইঁহাদের মধ্যে হরিচরণ ও জগদানন্দের বয়স ষাটের উপর হইয়াছিল, নগেন্দ্রনাথের হয় নাই।

জগদানন্দ রায় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নগেন্দ্রনাথ আইচ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রায় আদিপর্ব হইতে কাজ করিতেছেন। জগদানন্দ রায় সাধারণের জন্য বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদি লিখিয়া যশস্বী হন। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘকাল ধরিয়া 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' সম্পাদন করেন। নগেন্দ্রনাথ আইচ সেরূপ কিছু না করিলেও বিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় তাঁহার পারদর্শিতা সর্ববাদীসম্মত। নগেন্দ্রনাথের স্বার্থত্যাগের কথা এখন লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। বিদ্যালয়ের আর্থিক-দুর্দিনে এককালে নগেন্দ্রনাথ তাঁহার এক শত টাকার সঞ্চিত সম্বলটুকু বিদ্যালয়ের জন্য দান করিয়াছিলেন। এসব ইতিহাস অজ্ঞাত এবং কেহ স্মরণও করিবেন না। বহু লোকের বহু স্বার্থত্যাগের উপর এই প্রতিষ্ঠানের বুনিয়াদ। কী দারিদ্র্যের মধ্যে দিন গিয়াছে, তাহার সংবাদ কয়জন জানেন! কিন্তু সে-দারিদ্র্যে অগৌরব বোধ কেহ কখনো করিতেন না—এইখানেই ছিল তাহার সৌন্দর্য তাহার শক্তি, যাহা প্রভূত ধনের দ্বারা কিনিতে পারা যায় নাই।

পুরাতন বিদায় হইল, নূতন আসিয়া স্থান পূরণ করিল। শুধু নূতন নয়, অদ্ভুতও আসিল। ব্যাংক্রফট (F. Bancroft) নামে একজন ইংরেজ ও জ্যাকব্‌সন (N.R. Jacobson) নামে এক নিউজীল্যান্ডার কিছুকাল পাঠভবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইলেন। নূতনের প্রতি কবির আকর্ষণ চিরদিনের। তাঁহার বিশ্বাস এই উৎসাহীর দল বিদ্যালয়ে নূতন প্রাণ আনিবে। ব্যাংক্রফটকে ছাত্রপরিচালনার ভার পর্যন্ত অর্পিত হইল। বলা বাহুল্য এই শ্রেণীর লোক দেশ-ভ্রমণে আসে, পাথেয় সংগ্রহ হইলেই চলিয়া যায়।

ইতিমধ্যে আশা দেবী ও আরিয়ামের বিবাহ হইল। আরিয়াম খ্রীষ্টান ছিলেন ; তিনি 'হিন্দু' হইয়া আর্যনায়কম নাম গ্রহণ ও বৈদিক মতে অপৌত্তলিক অনুষ্ঠান করিয়া বিবাহ করিলেন। বিবাহ শান্তিনিকেতনেই হয়। ইহার কিছুকাল পরেই তাঁহারা আশ্রমের কাজ ছাড়িয়া চলিয়া যান। ১৯৩৩ সালে ফেব্রুয়ারি মাস হইতে ধীরেন্দ্রমোহনের উপর শিক্ষাভবন ও পাঠভবনের যুগ্মভার অর্পিত হইল ; ইতিপূর্বে কলেজের ভার ১৯৩২ নভেম্বর হইতে পড়িয়াছিল। উভয় ভবনে এককর্তৃত্বর পরীক্ষা ইতিপূর্বে প্রেমসুন্দর বসুর অধ্যক্ষতা কালেও একবার হয়। ধীরেন্দ্রমোহনের অধ্যক্ষতা কাল পর্বে বিদ্যালয়ের অনেক উন্নতি হয়।

জগদানন্দ রায় অবসর গ্রহণের পর্বেও যথাসাধ্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় সাহায্য করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার শরীর ভাঙিয়া গিয়াছিল। গ্রীষ্মকালের ছুটির সময় (২৫ জুন ১৯৩৩) তাঁহার অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটিল। রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিঙ

১ বিদেশে বাসকালে কবি আশ্রমের সমস্ত খবর তন্ন তন্ন করিয়া রাখিতেন ; সেখানেও তাঁহার উদ্বেগ, কারণ, স্কুলবিভাগে ক্লাসের শিক্ষক বদল প্রায়ই হয় ; কবি এক পত্রে লিখিতেছেন (২৮ জুলাই ১৯৩০), "এমনি করে বারবার উলটপালট করতে করতে ছেলেগুলোর সর্বনাশ হয়। এ সম্বন্ধে চিরকাল আমাদের নাম খারাপ আছে সে নাম কিছুতে উদ্ধার হোলো না।" শ্রীভবনের পরিদর্শিকা শ্রীহেমবালা সেনকে লিখিত পত্র (পাণ্ডুলিপি)।

হইতে ফিরিয়া কলিকাতায় এই সংবাদ পাইলেন। মৃত্যুকালে জগদানন্দের বয়স ছিল ৬৫ বৎসর। ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন হইতে তিনি ইহার সহিত যুক্ত ছিলেন। বহু পূর্বে তিনি ঠাকুর স্টেটে চাকরী করিতেন। বিজ্ঞান-বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কবি ইঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন ও শিলাইদহে তাঁহার পারিবারিক বিদ্যালয়ে নিজ পুত্রকন্যাদের শিক্ষার জন্য ইঁহাকে নিযুক্ত করেন। এই দীর্ঘকাল তিনি কী নিষ্ঠার সহিত কার্য করিয়াছিলেন তাহা সমসাময়িক কর্মী ও ছাত্রদের নিকট সুপরিচিত।[১]

দার্জিলিঙ হইতে ফিরিয়া

প্রায় দুই মাস কাল দার্জিলিঙে থাকিয়া কবি জুলাই মাসের (১৯৩৩) গোড়ায় বিদ্যালয় খোলার প্রায় সময়-সময় আশ্রমে ফিরিয়াছিলেন। এবার শান্তিনিকেতনে আসিয়া কবি সন্ধ্যার পর অধ্যাপক ও ছাত্রদের নিকট প্রায়ই বাংলাভাষা ও ছন্দ লইয়া আলোচনা করেন; কিছুকাল হইতে গদ্যছন্দ সম্বন্ধে যে পরীক্ষা করিতেছেন, এইসব আলোচনার দ্বারা তাহার সমর্থন খুঁজিতেছেন এবং সমর্থনের পক্ষে যুক্তিও দেখাইতেছেন।

আষাঢ়ের (১৩৪০) শেষভাগে বর্ষামঙ্গল-উৎসব ও বৃক্ষরোপণ-অনুষ্ঠান নিষ্পন্ন হইল (৮ জুলাই ১৯৩৩)। এই দিনকার সান্ধ্য-উৎসবে কবির আবৃত্তির সহিত শ্রীমতী দেবীর ভাবনৃত্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: কারণ, গীত ও বাদ্য ছাড়া ছন্দোময় কবিতার আবৃত্তির সহিত নৃত্য যে সম্ভবে, এই কলাটির পরীক্ষা এবার স্পষ্ট হইল। পাঠকের স্মরণ আছে কয়েক বৎসর পূর্বে আমেরিকায় রুথ সেণ্ট ডেনিস নামে মহিলা নৃত্যশিল্পী কবির কবিতাকে নৃত্যময় ভাবব্যঞ্জনা দান করিয়াছিলেন। সেই হইতে বোধ হয় নৃত্যছন্দের সহিত কবিতা আবৃত্তির কথা কবির মনে উদিত হয় এবং শ্রীমতী দেবীকে দিয়া দার্জিলিঙে তাহার প্রথম পরীক্ষা করেন।

বর্ষামঙ্গল উৎসবের চারিদিন পরে (১২ জুলাই ১৯৩৩) নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর শান্তিনিকেতনে আসেন; উদয়শঙ্কর তখন উদীয়মান শিল্পী। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার যথোপযুক্ত অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন; উদয়শঙ্কর ও তাঁহার সঙ্গীদের নৃত্যাদি দেখিয়া সকলেই খুশি হয়; কবি সভায় সমস্তক্ষণ উপস্থিত ছিলেন।

উদয়শঙ্কর সম্বন্ধে কবি কয়েকদিন পরে বলিলেন, "একদিন আমাদের দেশের চিত্তে নৃত্যের প্রবাহ ছিল উদ্বেল। সেই উৎসের পথ কালক্রমে অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। অবসাদগ্রস্ত দেশে আনন্দের সেই ভাষা আজ স্তব্ধ। তার শুষ্ক স্রোতঃপথে মাঝে মাঝে যেখানে তার অবশেষ আছে সে পঙ্কিল এবং ধারাবিহীন। তুমি নিরাশ্বাস দেশে নৃত্যকলাকে উদ্বাহিত ক'রে আনন্দের এই বাণীকে আবার একবার জাগিয়ে তুলেছ।

"নৃত্যহারা দেশ অনেক সময় এ কথা ভুলে যায় যে, নৃত্যকলা ভোগের উপকরণ মাত্র নয়। মানবসমাজে নৃত্য সেইখানে বেগবান্, গতিশীল, সেখানে বিশুদ্ধ, যেখানে মানুষের বীর্য আছে। যে দেশে প্রাণের ঐশ্বর্য অপর্যাপ্ত, নৃত্যে সেখানে শৌর্যের বাণী পাওয়া যায়। শ্রাবণমেঘে নৃত্যের রূপ তড়িৎ-লতায়, তার নিত্যসহচর বজ্রাগ্নি। পৌরুষের দুর্গতি যেখানে ঘটে, সেখানে নৃত্য অন্তর্ধান করে, কিংবা বিলাসব্যবসায়ীদের হাতে কুহকে আবিষ্ট হয়ে তেজ হারায়, স্বাস্থ্য হারায়, যেমন বাইজীর নাচ। এই পণ্যজীবিনী নৃত্যকলাকে তার দুর্বলতা থেকে তার সবলতা থেকে উদ্ধার

১ রবীন্দ্রনাথ: জগদানন্দ রায় (শ্রাদ্ধবাসরে মন্দিরে বক্তৃতা), প্রবাসী ১৩৪০ ভাদ্র, পৃ. ৬২৩-২৫।

করে। সে মন ভোলাবার জন্যে নয়, মন জাগাবার জন্যে। বসন্তের বাতাস অরণ্যের প্রাণশক্তিকে বিচিত্র সৌন্দর্যে ও সফলতায় সমুৎসুক করে তোলে। তোমার নৃত্যে ম্লানপ্রাণ দেশে সেই বসন্তের বাতাস জাগুক, তার সুপ্ত শক্তি উৎসাহের উদ্দাম ভাষায় সতেজে আত্মপ্রকাশ করতে উদ্যত হয়ে উঠুক, এই আমি কামনা করি।"[১]

কয়েকদিন পরে প্রমথ চৌধুরীকে লিখিতেছেন, "উদয়শঙ্করের নাচের প্রধান গুণ হচ্ছে তার আত্মশক্তি ও তাঁর শিক্ষা— দুইই এ নাচে মিলেছে। আঙ্গিক দিকে উৎকর্ষপ্রাপ্ত এ জিনিসটা— ভাবিক দিকে ক্ষুণ্ণ।... যে কল্পনাবৃত্তির উৎকর্ষ থেকে সৌন্দর্যসৃষ্টি হয় উদয়শঙ্করের নাচে এখনো তার অপেক্ষা আছে।"[২] এই বিশ্লেষণের সত্যতা গত বিশ বৎসরের মধ্যে প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে।

দেশের প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে যেমন 'বাণী' দিতে হয়, দেশের বাহির হইতে অনুরোধ আসে বাণীর জন্য; এই বৎসর মহামতি উইলবারফোর্সের[৩] মৃত্যু-শতবার্ষিকী; সভ্যসমাজ হইতে ক্রীতদাস-প্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য তাঁহার চেষ্টা তাঁহাকে অমর করিয়াছে। ইংলন্ডের হাল্ (Hull) শহরে সেই উৎসব: কবি ১৮ জুলাই (১৯৩৩) এই বাণী পাঠাইলেন— "But . the evil has not died with his own death, . in the dark corners of civilization slavery still lurks, hiding its name and nourishing its spirit. It is there in our plantations, in factories, in business offices, in the primitive department of government where the primitive vindictiveness of man claims a special privilege to indulge in fierce barbarism. A considerable section of men still seems to have an innate sympathy for the strong seeking victims in its chase of profit and power and what is worse there are terrible movements of benevolent idealism relentlessly smothering freedom in their path of ruthless recruitment. Humanity ever waits for the voice of judgment against the uncontrolled cultivation of slavery . "।

কিন্তু কবির শান্তি নাই: গত বৎসর আশ্বিন (১৯৩২ সেপ্টেম্বর) মাসে মহাত্মাজির অনশনের সময় পুণাচুক্তি ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন: তাহার জের এখনো চলিতেছে। এই চুক্তি মানিয়া লইলে বাংলাদেশের বর্ণহিন্দুদের যে কী ক্ষতি হইবে, তাহা তখন কেহ স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। পুণাচুক্তির সময়ে বাংলাদেশের মধ্যে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত অন্তরীণে আবদ্ধ, সুভাষ বসু নির্বাসনে: যথার্থভাবে বলিতে গেলে বাংলাদেশের রাজনীতির ও বিশেষভাবে সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুদের স্বার্থরক্ষার দিক হইতে যুক্তি-আদি প্রয়োগ করিতে পারে এমন লোক কেহই পুণায় যান নাই। কলিকাতা হইতে এতদিন পরে কয়েকজন বিশিষ্ট লোক[৪] শান্তিনিকেতনে আসিয়া কবিকে পুণাচুক্তি গ্রহণ করায় বাঙালি হিন্দুর কোথায় ক্ষতি তাহা বুঝাইয়া গেলেন। বিলাতে পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির সম্মুখে ম্যাকডোনাল্ডি দান ও পুণাশর্ত সম্বন্ধে আলোচনা উঠিলে, সার্ নৃপেন্দ্রনাথ সরকার বাংলার পক্ষ হইতে প্রতিবাদ করেন: তখন ভারতসচিব সার্ স্যামুয়েল হোর বলিয়াছিলেন যে, পুণায় চুক্তির সময় হিন্দুসমাজের

১ প্রবাসী ১৩৪০ ভাদ্র, পৃ. ৭২৫।

২ চিঠিপত্র ৫, পত্র ১১১; ৯ আশ্বিন ১৩৪০।

৩ William Wilberforce (1759 - 1833), English philanthropist and anti-slavery crusader; led agitation in the House of Commons against slave-trade (1787); heard on death-bed of second reading of bill abolishing slavery, which became a law a month after; buried at Westministor Abbey.

৪ অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, তুলসীচরণ গোস্বামী ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

সকলশ্রেণীর লোক একমত হইয়া উহা গ্রহণ করেন— এমন-কি বাংলাদেশের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ছিলেন! এইসব ব্যাপার জানিতে পারিয়া কবি সংবাদপত্র মারফত ঘোষণা করিলেন, মহাত্মাজির জীবনসংকট লইয়া তখন তিনি এতই উদ্‌বিগ্ন যে প্যাক্টের পূর্বাপর সকল ফল ভাবিবার মত সুযোগ পান নাই। তিনি আরও কবুল করেন, "Never having experience in political dealings, while entertaining great love for Mahatmaji and complete faith in his wisdom in Indian politics, I dared not wait for further consideration"। বাংলাদেশের বর্ণহিন্দুর প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছে এই পত্রে তিনি তাহাও স্বীকার করিলেন। তবে তাঁহাকে আঘাত করিয়াছে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সদস্যগণের ব্যবহার; তাঁহারা শুধু উদাসীন নহেন, তাঁহারা বাংলার ন্যায্য দাবিরও বিরোধী— 'actively take part in Bengal's misfortune, is terribly ominous'। পত্রখানি প্রকাশিত হয় ২৪ জুলাই ১৯৩৩। এই উক্তির জন্যে কবিকে হরিজন সম্প্রদায়ের নেতাদের নিকট হইতে পুনরায় ভৎর্সিত হইতে হইল; এবং অপর প্রদেশের বর্ণহিন্দু— যাঁহাদের গায়ে সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাটোয়ারার আঁচ লাগে নাই— তাঁহাদের নিকট হইতেও তিনি তিরস্কৃত হইলেন।

এই পত্রখানি যেদিন প্রকাশিত হইল সেদিন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মৃত্যুসংবাদ আসে। আশ্রমবাসীরা কবির নিকট সবেত হইলে তিনি যে স্বল্পভাষণ দেন, তাহার মধ্যে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন যে, "দীর্ঘকাল রাজনৈতিক বন্দীরূপে আবদ্ধ থাকার জন্যেই যে তাঁহার মৃত্যু এত ত্বরান্বিত এবং এত অসময়ে সংঘটিত হইল, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।"[১]

রবীন্দ্রনাথ দূর হইতে ভারতীয় রাজনীতির বিচিত্র ভাবতরঙ্গ লক্ষ্য করিতেছেন— বিদেশেও ইংরেজের মনোভাবের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ। বিরাট পরিবর্তনের সম্মুখে ভারত আজ অত্যন্ত চঞ্চল; রবীন্দ্রনাথ এই অবস্থাকে 'কালান্তর' নাম দিয়াছেন অর্থাৎ একটি যুগের অবসানে নূতন যুগের আবির্ভাবের সন্ধিক্ষণ। এই সমসাময়িক আন্দোলনকে সম্মুখে রাখিয়া কবি 'কালান্তর' নামে এক প্রবন্ধ লিখিলেন (পরিচয় ১৩৪০ শ্রাবণ)। এ দেশ সুশাসনের জন্য ইংরেজের পার্লামেণ্টে তখন (১৯৩৩) নূতন রাষ্ট্রবিধি তৈয়ারি হইতেছে— যাহা পরে ১৯৩৫ সালের আইন নামে খ্যাত হয়। কবি বলিলেন, বিশ্বসংসারের ইতিহাসে যে যুগান্তর হইয়া আসিতেছে সেই পটভূমিতে আজ ইংরেজ ভারতবর্ষকে দেখিতে পাইতেছে না— সে কালান্তরকে অস্বীকার করিয়া আপনার ইচ্ছায় 'এ দেশে ল অ্যাণ্ড্ অর্ডার কায়েম' করিবার জন্য ব্যস্ত; ইহা যে সম্ভব নহে— তাহাই ছিল কবির মর্মগত কথা। কবি বলিতেছেন, "য়ুরোপের চরিত্রের প্রতি আস্থা নিয়েই আমাদের নবযুগের আরম্ভ হয়েছিল, দেখেছিলুম জ্ঞানের ক্ষেত্রে য়ুরোপ মানুষের মোহমুক্ত বুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করেছে এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বীকার করেছে তার ন্যায়সংগত অধিকারকে। এতে করেই সকলপ্রকার অভাব-ত্রুটি সত্ত্বেও আমাদের আত্মসম্মানের পথ খুলে গিয়েছে।" কিন্তু আজ ভারতের দিকে তাকাইয়া ইংরেজের প্রতি সে সম্ভ্রম রক্ষা করা কেন কঠিন হইতেছে— তাহারই আভাস দেন এই প্রবন্ধে। 'নবযুগের সূর্যমণ্ডলের মধ্যে কলঙ্কের মতো রয়ে গেল ভারতবর্ষ'। "[প্রথম] যুদ্ধপরবর্তীকালীন য়ুরোপের বর্বর নির্দয়তা যখন আজ এমন নির্লজ্জভাবে চারিদিকে উদ্‌ঘাটিত হতে থাকল তখন এই কথাই বারবার মনে আসে, কোথায় রইল মানুষের সেই দরবার যেখানে মানুষের শেষ আপিল পৌঁছবে আজ। মনুষ্যত্বের 'পরে বিশ্বাস কি ভাঙতে হবে— বর্বরতা দিয়েই কি চিরকাল ঠেকাতে হবে বর্বরতা? . . যে দুঃখী, যে অপমানিত, সে যেদিন ন্যায়ের দোহাইকে অত্যাচারের সিংহগর্জনের উপরে তুলে আত্মবিস্মৃত প্রবলকে ধিক্কার দেবার ভরসা ও অধিকার সম্পূর্ণ হারাবে, সেইদিনই বুঝব এই যুগ আপন শ্রেষ্ঠ সম্পদে শেষ কড়া পর্যন্ত দেউলে হল।"

১ আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ শ্রাবণ ১৩৪০।

'তাসের দেশ' ও 'চণ্ডালিকা'

রবীন্দ্রনাথ 'বিচিত্রের দূত' নিশ্চয়ই ; সাহিত্যসৃষ্টি যে ইহার প্রধানতম, তাহা ভুলিলে চলিবে না। তাঁহার আর্টিস্ট সত্তা দীর্ঘকাল সৃষ্টিহীন জীবন ও রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে যাপন করিতে পারে না। পূজাবকাশের পূর্বে সকলকে লইয়া একটা কিছু অভিনয় করিবার ইতিহাস আশ্রমে বহু প্রাচীন। এবারও ছুটির পূর্বে কোনো-একটা নাটক অভিনয়ের কথা উঠিল। সেই অনুরোধের অভিঘাতে লিখিলেন 'তাসের দেশ' ও 'চণ্ডালিকা'।

গল্পগুচ্ছের 'একটি আষাঢ়ে গল্প' (সাধনা ১২৯৯ আষাঢ়) নামে গল্প অবলম্বনে 'তাসের দেশ' লিখিত হইল। এই নাটক কবির একটি অপরূপ সৃষ্টি ; আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ইহা একটি কৌতুক-নাট্য ; কিন্তু একটু মন সংযোগ করিয়া ইহার সংলাপ ও গানগুলি পাঠ বা শ্রবণ করিলে এই রচনার অর্থ স্ফুট হয়। কেবলমাত্র হাস্যরসে ভরপুর শ্লেষাত্মক কৌতুক-নাট্য ইহা নহে ; যে-সমাজ বা যে-দেশ বাহিরের সকল স্পর্শদোষ হইতে আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিতে চায়, তাহার জীবন্মৃত অবস্থার বিরুদ্ধে এই তীব্র অভিযান, এই বিদ্রূপের কশাঘাত। অচলায়তন ফাল্গুনীর মধ্যে কবি যে তত্ত্ব রূপকচ্ছলে বলিয়াছিলেন, এখানেও সেই কথা পাই অন্য পরিপ্রেক্ষিতে। সদাগর-পুত্র বলিতেছে, "এই মনমরা দেশকে নতুন বলে ? এ নতুনও না, পুরনোও না।" রাজপুত্র বলে, "হতাশ হোয়ো না বন্ধু। এটা ঢাকা-পড়া দেশ। ঢাকা খুললেই বেরিয়ে পড়বে নতুন রূপ। এবার ভিতরকার সমুদ্রে দিতে হবে পাড়ি, সেখানে আসবে ঝড়। সেই তুফানের মুখে উঠব নতুন দেশের ডাঙায়।" 'ফাল্গুনী'র গানে আছে—

> আবরণকে বরণ ক'রে ছিলে কাহার জীর্ণ ঘরে।
> এবার তো যৌবনের কাছে মেনেছ হার মেনেছ ?· ·
> আপনাকে আজ বাহির করে এনেছ ?· ·
> আপন-মাঝে নূতনকে আজ জেনেছ ?

'তাসের দেশে'র আবরণ মোচন করিল দুরন্ত যৌবনের দল—ইহারাই 'ফাল্গুনী'র নূতন প্রাণের চর। এই নূতনের আহ্বানে উদ্দীপ্ত চিঁড়েতনী সাহস ভরে বিদ্রোহী ; সে বলে, "চলো, চলো, বীর, মরণ পণ করে বেরিয়ে পড়ি দু-জনে মিলে— · · কালো পাথরের ভ্রূকুটি ভেঙে চুরমার করতে হবে। ··· পথ কাটতে হবে পাহাড়ের বুক ফাটিয়ে দিয়ে ! কী করতে এসেছি এখানে ! ছি ছি ! কেন আছি ! এ কী অর্থহীন দিন ! কী প্রাণহীন রাত্রি ! কী ব্যর্থতার আবৃত্তি মুহূর্তে মুহূর্তে !" · · "ভাঙতে হবে এখানে এই অলসের বেড়া, এই নির্জীবের গণ্ডি, ঠেলে ফেলতে হবে এইসব নিরর্থের আবর্জনা।" · · "ছিঁড়ে ফেলো আবরণ, টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলো। মুক্ত হও, শুদ্ধ হও, পূর্ণ হও।" কবি চিরদিন বাঁধন-ভাঙার গান গাহিয়াছেন— 'তাসের দেশে' সেই বাণী এক নূতন অভিনয়রূপে প্রকাশ পাইয়াছে।[১]

'তাসের দেশে'র মধ্যে কবি কয়েকটি আধুনিক বাংলা শব্দের ব্যবহার লইয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন। Culture অর্থে 'কৃষ্টি' শব্দের প্রয়োগে কবির আপত্তি ; "আধুনিক বাংলাভাষায় · · কুশ্রাব্য নাম দিয়েছে কৃষ্টি" (মানুষের ধর্ম, পৃ. ৯)। রবীন্দ্রনাথ 'কৃষ্টি' ও 'সংস্কৃতি'র মধ্যে অর্থভেদ দেখিয়াছেন ; মানুষের "কৃষ্টির ক্ষেত্র আছে তার চাষেবাসে আপিসে কারখানায় ; তার সংস্কৃতির ক্ষেত্র সাহিত্যে, এখানে তার আপনারই সংস্কৃতি, সে তাতে আপনাকেই সম্যক্‌রূপে করে

১ 'তাসের দেশে' ১৮টি নূতন ও ৫টি পুরাতন গান ছিল ; দ্বিতীয় সংস্করণে পুরাতন গান চারটি বাদ দিয়াছেন, নূতন গান ৮টি সংযোজন করিয়াছেন। দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩, গ্রন্থপরিচয়, পৃ. ৫৪৪।

তুলেছে, সে আপনিই হয়ে উঠেছে" (সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্যের পথে)। Civilization ও Culture শব্দদ্বয়ের জন্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি কবি ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু Culture অর্থে কৃষ্টি শব্দের প্রয়োগ এখনো চলিয়া থাকে। আরেকটি বিষয়েও তাঁহার আপত্তি ছিল— সংবাদপত্রের Columnকে 'স্তম্ভ' অনুবাদে।

'চণ্ডালিকা' সম্পূর্ণ অন্য ধরণের নাটিকা; এখানে দুইটিমাত্র নারীর— মাতা ও কন্যার সংলাপ; তাহাদের মর্মন্তুদ সংগ্রামের কাহিনী নাটকীয়ভাবে বর্ণিত। রবীন্দ্রনাথ ভূমিকায় লিখিতেছেন, "রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্যে শার্দূলকর্ণাবদানের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তাই থেকে এই নাটিকার গল্পটি গৃহীত।

"গল্পের ঘটনাস্থল শ্রাবস্তী। প্রভু বুদ্ধ তখন অনাথপিণ্ডদের উদ্যানে প্রবাস যাপন করছেন। তাঁর প্রিয়শিষ্য আনন্দ একদিন এক গৃহস্থের বাড়িতে আহার শেষ করে বিহারে ফেরবার সময় তৃষ্ণা বোধ করলেন। দেখতে পেলেন, এক চণ্ডালের কন্যা, নাম প্রকৃতি, কুয়ো থেকে জল তুলছে। তার কাছ থেকে জল চাইলে, সে দিল। তাঁর রূপ দেখে মেয়েটি মুগ্ধ হল। তাঁকে পাবার অন্য কোনো উপায় না দেখে মায়ের কাছে সাহায্য চাইলেন। মা তার জাদুবিদ্যা জানত। মা আঙিনায় গোবর লেপে একটি বেদী প্রস্তুত করে সেখানে আগুন জ্বালল এবং মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে একে একে ১০৮টি অর্কফুল সেই আগুনে ফেললে। আনন্দ এই জাদুর শক্তি রোধ করতে পারলেন না। রাত্রে তার বাড়িতে এসে উপস্থিত। তিনি বেদীর উপর আসন গ্রহণ করলে প্রকৃতি তাঁর জন্যে বিছানা পাততে লাগল। আনন্দের মনে তখন পরিতাপ উপস্থিত হল। পরিত্রাণের জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

"ভগবান বুদ্ধ তাঁর অলৌকিক শক্তিতে শিষ্যের অবস্থা জেনে একটি বৌদ্ধমন্ত্র আবৃত্তি করলেন। সেই মন্ত্রের জোরে চণ্ডালীর বশীকরণবিদ্যা দুর্বল হয়ে গেল এবং আনন্দ মঠে ফিরে এলেন।"[১]

এই আখ্যানটির সূত্র লইয়া কবি রচিলেন 'চণ্ডালিকা'। চণ্ডালকন্যা প্রকৃতির হাত হইতে ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ আনন্দ জল গ্রহণ করায়, মাতঙ্গীর মনে যেসব প্রশ্ন উঠে তাহা অত্যন্ত সাধারণ মানবজিজ্ঞাসা— মানুষে মানুষে ভেদ কেন? এই প্রশ্ন ভারতের মজ্জাগত সমস্যা। বহু যুগ পরে অস্পৃশ্যতা ও জল-অচলনীয়তা নিরাকৃত করিবার জন্য মহাত্মাজি আন্দোলন শুরু করিয়াছেন। সে হিসাবে বলা যাইতে পারে এটি খুবই সময়োপযোগী রচনা।[২]

রচনাটি লেখা হয় শ্রাবণ (১৩৪০) মাসে; ১ ভাদ্র (১৭ অগস্ট ১৯৩৩) শান্তিনিকেতনে উহা পড়িয়া শোনান। এই নাটিকা পাঁচ বৎসর পরে 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা' নামে প্রকাশিত হয়; তখন ইহার যে রূপান্তর হইয়াছিল তাহা পাঠক দুইখানি বই পাশাপাশি লইয়াই বুঝিতে পারিবেন।[৩]

যে নাটক লিখিলেন, তাহা অভিনয়ের জন্য লেখা, কলিকাতায় অভিনয় হইবে তাহারই আয়োজন চলিতে লাগিল। শান্তিনিকেতনে মহড়া চলে প্রতি সন্ধ্যায় কবিরই সম্মুখে।

বিচিত্র কাজ সৃষ্টি করিবার জন্যও যেমন কবির উৎসাহ, কাজ হইতে মুক্তি বা 'ছুটি' পাইবার জন্য ব্যাকুলতাও

১ রবীন্দ্রনাথ সতীশচন্দ্র রায়কে 'চণ্ডালী'র উপর একটি কবিতা লিখিবার কথা বলেন। সতীশচন্দ্র রায়, চণ্ডালী, বঙ্গদর্শন ১৩১০ মাঘ, পৃ. ৪৪-৫৭। দ্র. বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫৪ কার্তিক-মাঘ সংখ্যা, পৃ. ২৮৭।

২ ১৯৩২ জুলাই ২৪, 'জলপাত্র' (পরিশেষ) কবিতায় চণ্ডালিকা আখ্যায়িকার আভাস পাই।

৩ 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা'র স্বরলিপি করেন শৈলজারঞ্জন মজুমদার ১৩৪৫ সালে। নাটিকা 'চণ্ডালিকা'র গানগুলির স্বরলিপি করেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৪০ সালেই। এই সালের ভাদ্র মাসে নাটিকাখানি প্রকাশিত হয়।

তেমনই। আসলে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় কবির পক্ষে দীর্ঘকাল কোনো এক বিষয়ে এমন-কি একস্থানে নিবিষ্ট থাকা সম্ভব নহে; তিনি বিচিত্রের দূত, সুদূরের পিয়াসী। 'কর্তব্য' 'দেশহিত' প্রভৃতিকে গালি দেন প্রাণ ভরিয়া, কিন্তু প্রয়োজন হইলে কোনোদিন তাঁহাকে পাশ কাটাইয়া তুরীয়তার মধ্যে আশ্রয় লইতে দেখা যায় নাই। কিন্তু কবির অন্তরের ইচ্ছা 'ছুটি পেলেই ভালো ক'রে জানালাটা খুলে' বিশ্বপৃথিবীকে দেখেন: "আরও একটা সুখ আছে দেশবিদেশের মানুষ ছবিতে লেখাতে নানা মূর্তিতে নানা রসে আপনার নিত্যস্বরূপ প্রকাশ করেছে— অন্য সমস্ত ত্যাগ করে— তারই পরিচয় ভালো করে নিতে।"[১] এই কথাই লিখিয়াছিলেন প্রমথ চৌধুরীকে (১৭ অগস্ট): তাঁহার প্রেরিত বইগুলি[২] পাইয়া সেগুলি "নাড়াচাড়া করতে করতে মন চঞ্চল হয়ে" উঠে। "নানা কাজে নানা অকাজে আপাদমস্তক জড়িয়ে, আধুনিক লোকের বাণীলোকে প্রবেশের ছুটি" পান না।[৩] এইবার ইচ্ছা বইগুলি পড়েন। কিন্তু 'মনে রয়ে গেল মনের কথা'। নরওয়ের রাজা হাসিয়া কবিকে একদা বলিয়াছিলেন, 'আপনার ভালোলাগা মন্দলাগার পথ আপনার এখন হইতে বন্ধ'; সে কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। অচিরে কলিকাতায় যাত্রা করিতে হইল, সেখানে চণ্ডালিকা ও তাসের দেশের অভিনয়— বিশ্বভারতীর জন্য অর্থের প্রয়োজন। তবে সেইটা চরম সত্য নহে; কবি তাঁহার নাটককে রূপলোকে দেখিতে চান।

কলিকাতায় ম্যাডান থিয়েটরে তিন দিন অভিনয় হইল (১৩৪০॥১, ২, ৪ সেপ্টেম্বর)। প্রথম দিন কবি 'চণ্ডালিকা'টি স্বয়ং পাঠ করেন। 'তাসের দেশে'র অভিনয় দর্শকদের খুবই ভালো লাগে: তাসের দেশের সাজসজ্জা ও চলাফেরার মধ্যে এমন-একটি বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে, সেই হইতে কোনো অচল পরিস্থিতির উল্লেখ করিতে হইলে লোকে বলে 'তাসের দেশ'।

অভিনয়ের পরে কবি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ছন্দ' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন ও শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসেন ১৬ সেপ্টেম্বর (১৯৩৩)। কয়েকদিন পরে প্রমথ চৌধুরী'কে[৪] লিখিতেছেন, "নাচ সম্বন্ধে তোমার লেখাটা পড়ে খুসি হলুম।... ছন্দ সম্বন্ধে আমি যে বক্তৃতা পাঠ করেছি স্থানে স্থানে তার সঙ্গে তোমার এই লেখার অনেক মিল আছে।"

ইতিমধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুশতবার্ষিকী দিনের জন্য Forward নামে দৈনিক কাগজ কবির নিকট হইতে বাণী চান। রামমোহনের মৃত্যুদিন ২৭ সেপ্টেম্বর। কবি লিখিয়া দিলেন—

Freedom from fear is the freedom I claim
    for you my motherland.
Fear, the phantom demon,
    shaped by your own distorted dreams,
Freedom from the burden of ages,
    bending your head, breaking your back,
    binding your eyes to the beckoning call of future.

১ ছুটির দাবি, ২১ অগস্ট ১৯৩৩। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র। দ্র. প্রবাসী ১৩৪০ আশ্বিন, পৃ. ৮৩৪-৩৬।

২ প্রমথ চৌধুরী তাঁহার লাইব্রেরি বিশ্বভারতীকে দান করিয়াছিলেন। সেই লাইব্রেরির কিছু বই তাঁহার কাছে ছিল, সেগুলি এবার পাঠাইয়া দেন। কবি সেগুলি কাছে রাখেন দেখিবার জন্য।

৩ চিঠিপত্র ৫, পত্র ১১২; ১ ভাদ্র ১৩৪০।

৪ চিঠিপত্র ৫, পত্র ১১৩; ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩।

পূজাবকাশের জন্য (১৯৩৩ সেপ্টেম্বর - অক্টোবর) বিদ্যালয় বন্ধ হইয়া গেলেও কবি কোথাও বাহির হইলেন না। "ছুটির অবকাশে অতিথি-অভ্যাগতে আশ্রম পরিপূর্ণ।"[১] অতি দুঃখে ইন্দিরা দেবীকে লিখিতেছেন, "কিছুকাল থেকে এত বেশি লোকের ভিড় কাজের ভিড় যে মাথার ঠিক থাকে না— তার উপর বাহাত্তর বছর বয়সের মাথাটাও নড়বড়ে হয়ে উঠেছে— ভুল হয় বিস্তর— কিন্তু লোকে বিচার করে সাবেক কালের আদর্শে।"[২] এ কথা অতি সত্য ; রবীন্দ্রনাথের বয়স যে বাহাত্তর এ কথা না আশ্রমবাসী, না বিশ্বভারতী, না বাহিরের পাবলিক মনে করিতে পারেন। কারণ, এখনো সবার 'সমবয়সী', দূরত্বের অন্তরালে নির্বাসনে তিনি বাস করিতে পারেন না।

এদিকে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বক্তৃতার জন্য নিমন্ত্রণ আসিয়াছে ; ডিসেম্বরের গোড়াতে সেখানে যাইতে হইবে ; অবসর-মত বক্তৃতা লিখিতেছেন। অথচ চারিদিকের "গোলমাল ও অনবকাশের মধ্যে সেটাকে খাড়া করতে হবে। এ ছাড়া আরো বিস্তর দুশ্চিন্তা ও কাজ জমে আছে।" এইভাবে পূজাবকাশ কাটিয়া গেল।

বোম্বাই অন্ধ্র ও হায়দ্রাবাদে

বোম্বাই মহানগরীতে রবীন্দ্র-সপ্তাহ উদ্‌যাপনের আয়োজন হইতেছে ; শান্তিনিকেতন-কলাভবনের চিত্র ও শিল্প নিদর্শন, রবীন্দ্রনাথের নিজকৃত চিত্রাবলী ও রথীন্দ্রনাথের 'বিচিত্রা'[৩] ভবনের কারুশিল্পের নমুনার প্রদর্শনী হইবে। এ ছাড়া কবির কোনো নাটিকার অভিনয়ের জন্য অনুরোধ আসিয়াছে। তদনুসারে স্থির হইল, বোম্বাইতে শাপমোচন ও তাসের দেশ অভিনীত হইবে। তজ্জন্য 'তাসের দেশে'র গুজরাটি অনুবাদের ভার পড়িল বিদ্যাভবনের প্রাক্তন ছাত্র (অধুনা বোম্বাইবাসী) পিনাকীন্ ত্রিবেদীর উপর ; পিনাকীন্ ভালো বাংলা জানিতেন, সংগীত শিখিয়াছিলেন ; তিনি আশ্চর্য সুন্দরভাবে গানগুলির অনুবাদ করিলেন।

বোম্বাই মহানগরীর রবীন্দ্র-সপ্তাহে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকিবেন জানিতে পারিয়া উদ্‌যোক্তারা কবির যথোপযুক্ত সংবর্ধনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।[৪] রবীন্দ্রনাথ ২৩ নভেম্বর ১৯৩৩ (৭ অগ্রহায়ণ ১৩৪০) বোম্বাই পৌঁছিলেন। সঙ্গে বিরাট দল ; ছোটো বড়ো মিলিয়া পঁয়তাল্লিশ জন, শাপমোচন ও তাসের দেশের অভিনয়ের অঙ্গ ইহারা। এ ছাড়া, চিত্রপ্রদর্শনীর জন্য নন্দলাল বসু সুরেন্দ্রনাথ কর ও কলাভবনের ছাত্র কয়েকজন ছিলেন। দিনেন্দ্রনাথ আছেন গানের দল সামলাইবার জন্য।

বোম্বাই স্টেশনে নামিয়া কবি দেখেন, জনসমুদ্র ভিক্‌টোরিয়া টারমিনাসে আসিয়া তরঙ্গাঘাত করিতেছে। সরোজিনী নাইডু এই রবীন্দ্র-সপ্তাহের আয়োজনের মূলে। তিনি ছাড়া স্টেশনে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উপস্থিত

১ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৪৮ ; ১৩ আশ্বিন ১৩৪০ [২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩]।

২ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৩৯ ; ১৬ আশ্বিন ১৩৪০ [২ অক্টোবর ১৯৩৩]।

৩ উত্তরায়ণের বাগানের মাঝে একতলা বাড়ি (যেখানে হিসাবরক্ষার অপিস ছিল ও বর্তমানে বিদ্যাভবনের গ্রন্থশালা) বিচিত্রা নামে অভিহিত হইত। এই বাগানে ১৯৬১, ৮ই মে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকীকালে যে গৃহ উন্মুক্ত হয় তাহার 'বিচিত্রা' নাম হইয়াছে।

৪ এই সব ব্যবস্থায় হরেন ঘোষ ছিলেন অগ্রণী। তিনি কয়েকবারই শান্তিনিকেতনের বাহিরে এইরূপ অভিনয়ের ব্যবস্থা-ভার গ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সনে ৯ জুলাই কলিকাতায় দাঙ্গার সময় তিনি নিহত হন।

ছিলেন কর্পোরেশনের মেয়র মি জাভ্‌লে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্‌সেলর চন্দ্রভরকর, প্রাদেশিক কন্‌গ্রেসের সভাপতি মি. নরীমান প্রভৃতি। বোম্বাই গবর্মেণ্টের নিষেধাজ্ঞা থাকায় স্টেশনে কোনো স্বেচ্ছাবাহিনী থাকিতে পারে নাই; ফলে জনতা নিয়ন্ত্রণ করিবার কোনো ব্যবস্থা না থাকায় স্টেশনে হইতে বাহিরে আসিতে কবির অনেক সময় লাগে। স্বর্গত সার্‌ দোরব টাটার প্রাসাদোপম অট্টালিকা কবির থাকিবার জন্য নির্দিষ্ট ছিল; অন্যেরা উঠিলেন হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানির স্থানীয় অধ্যক্ষ সুরেশচন্দ্র মজুমদারের বাসায় ও তাঁহার অফিস-গৃহে।

কবি যেদিন বোম্বাই পৌঁছান সেই সন্ধ্যায় আর্ট-প্রদর্শনী উন্মোচন করিলেন বোম্বাই হাইকোর্টের জজ মি. মির্জা আকবর। কবি সেখানে উপস্থিত হইলে বিপুল জয়ধ্বনি সহকারে জনতা তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিল। সেই রাত্রেই ভাইস-চান্‌সেলরের নিমন্ত্রণে প্রায় দুই শত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কবির সহিত নৈশভোজন করিলেন। পরদিন অপরাহ্ণে বোম্বাই গবর্মেণ্ট আর্ট স্কুলের বার্ষিক চিত্র-প্রদর্শনী দেখিবার জন্য কবির নিমন্ত্রণ ছিল।

২৫শে রাত্রে এক্‌সেলসিঅর থিয়েটরে শাপমোচনের প্রথম অভিনয়; নাটকের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও দর্শকরা সংগীত ও নৃত্যের মধ্য দিয়া প্রভূত আনন্দ লাভ করিয়াছিল।

পরদিন ২৬শে রবিবার; রিগ্যাল থিয়েটরে কবির প্রথম পাবলিক বক্তৃতা। সভাপতিত্ব করেন হাইকোর্টের ভূতপূর্ব জজ মি. তালিয়ার খাঁ। কবির বক্তৃতার বিষয় The challenge of judgment। এই বক্তৃতা পাশ্চাত্য সভ্যতা-অনুকারী সদম্ভের ব্যবসায় ভিত্তি-মূলক সমাজ-সংস্থিতির কঠোর সমালোচনাপূর্ণ। কবি বলেন, বৃহত্ত্বের দ্বারা মহত্ত্বের পরিমাপ হয় না। যাহা বৃহৎ তাহা যে মহৎ হইবে ইহা সত্য নাও হইতে পারে। তিনি আরও বলেন যে, আজকাল চারিদিকে সকলে modern বা আধুনিক হইবার জন্য উদ্‌গ্রীব। এই আধুনিকত্বের অর্থ হইতেছে য়ুরোপীয়দের বহিরবয়বের অনুকরণ, তাহাদের প্রকৃতিগত চারিত্রনীতির অনুশীলন নহে। এই অনুকরণপ্রিয়তা কিভাবে সর্বগ্রাসী ও সর্বনাশী হইয়া উঠিতেছে তাহাই কবি এই ভাষণে বলিতে চেষ্টা করেন।

কবির এই ভাষণ শুনিয়া সরোজিনী নাইডু বলিয়া পাঠান যে, এই প্রবন্ধের ব্যাপক প্রচার প্রয়োজন, কারণ it has a message which should be broadcast over the country।

পরদিন অপরাহ্ণে হাইকোর্টের চীফ্‌জাস্টিস্‌ কবির সহিত দেখা করিয়া গেলেন; সেই সন্ধ্যায় (২৭ নভেম্বর) 'তাসের দেশে'র অভিনয়। এই নাটকের মধ্যে কথোপকথন বেশি থাকায় কবি বুঝিলেন যে দর্শক-শ্রোতার পক্ষে তাহা তেমন বোধগম্য হয় নাই। সেজন্য পরদিন অনেক নূতন গান ও নৃত্য সংযোগ করিয়া অভিনয়কে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিলেন।

২৯ নভেম্বর বোম্বাইএর পারসিক যুব সমিতির দ্বারা মালাবার হিলে শ্রীমতী আতিয়া বেগমের বিরাট উদ্যান-বাটিকায় কবি-সংবর্ধনা হইল। আশ্চর্যের বিষয়, বোম্বাই ত্যাগ করিয়া যাইবার পরে এই মহিলাই 'টাইমস অব্‌ ইন্‌ডিয়া' দৈনিক লেখেন যে, বোম্বাইএর অর্থ বিদেশে অর্থাৎ বাংলাদেশের শান্তিনিকেতনে যাওয়া অন্যায়। ভারতের বা বোম্বাইএর অর্থ য়ুরোপে বা ইংলন্‌ডে যাইবার বিরুদ্ধে কখনো কোনো মত তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় নাই।

দুই দিন পরে (২ ডিসেম্বর) Cowasji Jehangir Hallএ সরোজিনী নাইডুর সভাপতিত্বে কবির আর-একটি পাবলিক বক্তৃতা হয়— The Price of Freedom।

রবীন্দ্র-সপ্তাহের উৎসব নিষ্পন্ন হইয়া গেলে কয়েকদিন কবি বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় নানা স্থানে

ঘোরাঘুরি করিতে লাগিলেন; পরিশ্রম নিষ্ফল হয় নাই, অভিনয়ে বক্তৃতায় ও দানে মিলাইয়া প্রায় পঁয়ষট্টি হাজার টাকা পাইলেন।

দিন বারো বোম্বাইএ থাকিয়া কবি ওয়ালটার (৫ ডিসেম্বর ১৯৩৩) যাত্রা করিলেন। সেখানে বব্‌লীর রাজা সমুদ্রতীরস্থ তাঁহার প্রাসাদ কবির জন্য ছাড়িয়া দেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি কবি অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য আহূত হইয়া আসিয়াছেন। ৮ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট প্রাঙ্গণে ভাইস-চান্‌সেলর রাধাকৃষ্ণন কবির সম্মানার্থ প্রীতিসম্মেলনের ব্যবস্থা করেন। তৎপূর্বে নবনির্মিত মণ্ডপতলে প্রায় চারি সহস্র শ্রোতার সম্মুখে কবি তাঁহার প্রথম ভাষণ পাঠ করেন— বিষয় ছিল Supreme Man। দুই দিন পরে (১০ই) বক্তৃতা দেন— I am He। এই দুইটি ভাষণ Readership Lecture রূপে প্রদত্ত হয়। পরে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় হইতে *Man* নামে তাহা মুদ্রিত হয়।

ওয়ালটারে বাসকালে, মধ্যে একদিন (৯ই) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কবিকে বিশেষভাবে সমাদৃত করে। শহরের বাহিরে সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের উপর বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়; এই দূরত্ব সত্ত্বেও বিপুল জনস্রোত সেখানে উপস্থিত হয় কবিকে দেখিবার জন্য। আর-একদিন ম্যুন্সিপালিটি ও অন্ধ্র কবিসমাজ কবিকে অভিনন্দন করিয়াছিলেন; অন্ধ্রদেশীয় কবি ও সাহিত্যিকরা রবীন্দ্রসাহিত্যের নিকট যে বিশেষভাবে ঋণী, সেই কথাটি তাঁহারা বলেন। বহুকাল হইতে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে এখানে বাংলাভাষার চর্চা হইয়া আসিতেছিল।

ওয়ালটার হইতে কালীমোহন ঘোষ ও নবনিযুক্ত তরুণ সেক্রেটারি অনিলকুমার চন্দকে[১] লইয়া কবি নিজাম হায়দ্রাবাদে যাত্রা করিলেন। তথাকার শাসন-পরিষদের প্রেসিডেন্ট মহারাজা সার্ কিষণ প্রসাদের নিমন্ত্রণ। সার্ কিষণ প্রসাদ হিন্দু কি মুসলমান বলা কঠিন— এমনই বিচিত্র সমাজ-জীবন ছিল তাঁহার। কবি হায়দ্রাবাদে স্টেট অতিথিরূপে প্রায় পক্ষকাল ছিলেন। নিজাম বাহাদুর ইতিপূর্বে (১৯২৭) বিশ্বভারতীতে লক্ষাধিক টাকা ইসলামিক সংস্কৃতির আলোচনাকেন্দ্র স্থাপনের জন্য দান করিয়াছিলেন।[২] এতদিন পরে কবি ব্যক্তিগত ভাবে আসিয়া নিজামের সহিত দেখা করিলেন ও তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন।

হায়দ্রাবাদে কবি যে-কয়দিন ছিলেন— বক্তৃতা পার্টি ভোজ নানা লোকের সহিত মোলাকাত প্রভৃতি একটির পর একটি লাগিয়াই ছিল। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সম্মুখে ও সেকেন্দ্রাবাদে জনসভায় Ideals of an Eastern University সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ডিসেম্বরের শেষভাগে কবি কলিকাতায় ফিরিলেন; শান্তিনিকেতনের পৌষ-উৎসবে তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

১ অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী প্রায় ছয় বৎসর কবির সেক্রেটারি ছিলেন। ১৯৩৩ জুলাই মাসে তিনি পদত্যাগ করেন। তাঁহার স্থলে শিক্ষাভবনের পলিটিক্সের অধ্যাপক শ্রীঅনিলকুমার চন্দ বি. কম্. (ঢাকা), বি. এস-সি (লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকস্) সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। অনিলকুমার শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র, নন্-কোঅপারেশন্ যুগে কিছুকাল পড়েন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অপূর্বকুমার চন্দ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পুরাতন ছাত্রদের অন্যতম। ইঁহার পিতা কামিনীকুমার চন্দ কবির বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। অনিলকুমার বর্তমানে ভারতীয় লোকসভার সদস্য (১৯৫২) ও পরে উপমন্ত্রী।

২ ১৯২৭ জুলাই মাসে নিজাম বিশ্বভারতীতে ১,০০,০০০ টাকা দান করেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারে কলিকাতায় ভূসম্পত্তিতে ঐ টাকা লগ্নি করিয়া তাহার মুনাফা হইতে ইসলামিক বিভাগ পরিপোষণ ব্যবস্থা হয়। The letter of the Finance Member to H. E. the Nizam, in announcing the gift, stated that "it is understood that the amount will be invested in such form as may be agreed upon in consulation with Nizam's Government and utilised for making provision for the study of Islamic Culture."—Visva-Bharati Annual Report 1927., p. 19।

১৯৩০ ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা সিটি কলেজকে উহার গৃহাদি বন্ধক রাখিয়া ঐ টাকা ধার দেওয়া হয়; উহার বার্ষিক সুদ ২৬৭৫৲।

নানা কথা ও কবিতা

কলিকাতায় ফিরিয়া বিশ্রাম নাই: রামমোহন শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২৯ ডিসেম্বর (১৯৩৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট গৃহে 'ভারতপথিক রামমোহন' নামে ভাষণ দান করেন। এই বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ ভারত-ইতিহাসে রামমোহনের যথার্থ স্থান কোথায় তাহাই বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন। ইহাই শতবার্ষিকী উৎসবের শেষ বক্তৃতা।[১] পরদিনই All India Women's Conferenceএ ভাষণ দিতে হইল।[২]

প্রায় দেড় মাস পরে (২১ নভেম্বর ১৯৩৩ ; ৩ জানুয়ারি ১৯৩৪) কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন; এবার পৌষ-উৎসবে ও বিশ্বভারতীর সাংবৎসরিক সভায় কবি অনুপস্থিত। কবির শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তনের দুই দিন পর সরোজিনী নাইডু আশ্রমে আসিলেন। ইহাই তাঁহার প্রথম আগমন। আম্রকুঞ্জে তাঁহার যথোপযুক্ত সংবর্ধনা হইল। ইহারই পক্ষকাল পরে আসিলেন (১০ জানুয়ারি ১৯৩৪) জহরলাল নেহেরু[৩] ও তাঁহার পত্নী কমলা দেবী; ইঁহাদের একমাত্র সন্তান ইন্দিরা তখন বিশ্বভারতীর ছাত্রী।

হায়দ্রাবাদ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর শ্রীনিকেতনের উৎসব শেষ পর্যন্ত (৩ জানুয়ারি - ৮ ফেব্রুয়ারি) পর্বটিতে কবি শান্তিনিকেতনে বাসকালে এই কবিতা কয়টি রচনা করেন— ঈষৎ দয়া (১০ জানুয়ারি), মৌন (১৮ই), কৈশোরিকা (২৩শে), আসন্ন রাত্রি (৪ ফেব্রুয়ারি, বীথিকা)। আমি (প্রবাসী ১৩৪০ ফাল্গুন)— এই শেষ কবিতাটিতে কবির আধ্যাত্মিক চেতনা খুবই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। এই কবিতাটিকে তিনি গদ্যছন্দে রূপান্তরিত করেন (শেষ সপ্তক ৩৭)।[৪]

"The Samsad sanctioned the mortgage loan on the 23rd Dec. 1930, subject to approval by the Founder-President [Rabindranath] who signified his approval on the 29th. Dec 1930—Visva-Bharati Annual Report 1931, p. 9।

পরে নিজাম ১৯,০০০৲ টাকা দেন নিজাম-অধ্যাপকের গৃহাদি নির্মাণের জন্য। সেই টাকা দিয়া শান্তিনিকেতনের মধ্যস্থিত 'নিচুবাংলা' ক্রয় করা হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর নিচুবাংলার বাড়ি ও সংলগ্ন জমির মালিক হন তাঁহার পুত্রবধূ শ্রীহেমলতা ঠাকুর। তিনি ঐ স্থান বিক্রয় করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বিশ্বভারতীকে অবিলম্বে ঐ স্থান কিনিতে হয় (১৯৩৬)। দ্র. Annual Report for 1936, p. 6 of the Account section।

১ রামমোহন রায়; প্রবাসী ১৩৪০ ফাল্গুন, পৃ. ৬৪৭-৪৯। দ্র. ভারতপথিক রামমোহন।

২ "Woman cannot be pushed back into the superficial region of the merely decorative by man's aggressive athleticism. It is not that woman is merely seeking today her freedom of livelihood ... but against man's monopoly of civilization. Woman must come into the bruised and maimed world. The world with its insulted individuals has sent its appeal to her.

"The union of man and woman represents a perfect co-operation in the building up of human history on equal terms in every department of life....The rudely elbowing age of relentless rapacity will give way to that of a generous communion of minds and means, when individuals will not be allowed to be terrorised into abject submission by idealistic bullies compelled to lose their own physiognomy in a gigantic mask of a nebulous abstraction."

৩ শান্তিনিকেতনে আসিবার পূর্বে কলিকাতায় তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহা তাঁহার পুনরায় কারারুদ্ধ হইবার প্রত্যক্ষ কারণ।

৪ "During my tour in the earthquake areas or just before going there, I read with a great shock Gandhiji's statement to the effect that the earthquake had been a punishment for the sin untouchability. This was a staggering remark and I welcomed and wholly agreed with Rabindranath Tagore's answer to it."—*Autobiography of Jawaharlal Nehru*, p 490.

ইতিমধ্যে মহাত্মাজীর সহিত কবির মতান্তর হইবার বিশেষ একটি ঘটনা ঘটিয়া যায়। ১৫ জানুয়ারি ১৯৩৪ (২৯ পৌষ ১৩৪০)-বিহারের নিদারুণ ভূমিকম্পে বহুশত লোক হতাহত হয়, সম্পত্তি নষ্ট হয় বহু লক্ষ টাকার। এই আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় সম্বন্ধে মহাত্মাজী বলিলেন যে, উহা অস্পৃশ্যতা পাপের প্রায়শ্চিত্ত, বিধাতার কোপ! রবীন্দ্রনাথ এই কথা শুনিয়া অবাক্! তিনি প্রতিবাদ করিয়া এক পত্র লিখিলেন (৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪); অস্পৃশ্যতার পাপে যাহারা হত বা আহত হইয়াছে, যাহাদের গৃহাদি ধ্বংস হইয়াছে— বিধাতার শাস্তি তাহাদের উপর পড়িল, আর সারা দেশময় যাহারা স্পর্শদোষ মানিয়া চলিতেছে তাহারা তো দিব্য বাঁচিয়া থাকিল— এ কবি কেন, কাহারও পক্ষে মহাত্মাজীর এই যুক্তি মানিয়া লওয়া সম্ভব নহে। কবির প্রতিবাদের উত্তরে মহাত্মাজীর লিখিলেন, এ তাঁহার বিশ্বাস! অবশ্য ইহার পরে আর যুক্তি চলে না।[১]

বিহারের নিদারুণ অবস্থার কথা কবি বিলাতে এন্‌ড্রুজের নিকট কেবল্ করিলেন (২৩ জানুয়ারি)। সংবাদপত্র মারফতেও দেশবিদেশে এই ঘটনা জানাইয়া মুক্তহস্তে সাহায্যের জন্য অনুরোধ করিলেন, "its calamity transcends geographical limits and makes its appeal to universal man."[২]

এবার শ্রীনিকেতনের একাদশ বার্ষিক উৎসব। কলিকাতার মেয়র নলিনীরঞ্জন সরকার বিশেষ অতিথি-রূপে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন ৬ ফেব্রুয়ারি (১৯৩৪)। কবি এই উৎসবের দিন 'উপেক্ষিতা পল্লী' নামে এক ভাষণ দান করেন; এই প্রবন্ধের প্রত্যেকটি পংক্তি দেশসেবক মাত্রেরই পাঠ করা উচিত— দেশের সমস্যা বলিয়া আমরা যে অবচ্ছিন্ন বাক্য প্রয়োগ করি, তাহা যে কত মিথ্যা তাহা বুঝিতে পারি যখন পল্লীগ্রামের মধ্যে আমরা যাই। কবি বলিলেন, "বর্তমান সভ্যতায় দেখি এক জায়গায় একদল মানুষ উৎপাদনের চেষ্টায় নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে, আর-এক জায়গায় আর-একদল মানুষ স্বতন্ত্র থেকে সেই অন্নে প্রাণধারণ করে। চাঁদের যেমন এক পিঠে অন্ধকার, অন্য পিঠে আলো, এ সেই রকম। একদিকে দৈন্য মানুষকে পঙ্গু করে রেখেছে, অন্যদিকে ধনের সন্ধান, ধনের অভিমান, ভোগবিলাস সাধনের প্রয়াসে মানুষ উন্মত্ত। অন্নের উৎপাদন হয় পল্লীতে; আর অর্থের সংগ্রহ চলে নগরে। অর্থ উপার্জনের সুযোগ ও উপকরণ যেখানেই কেন্দ্রীভূত স্বভাবত সেখানেই আরাম আরোগ্য আমোদ ও শিক্ষার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোককে ঐশ্বর্যের আশ্রয় দান করে। পল্লীতে সেই ভোগের উচ্ছিষ্ট যা-কিছু পৌঁছয় তা যৎকিঞ্চিৎ। এই বিচ্ছেদের মধ্যে যে সভ্যতা বাসা বাঁধে তার বাসা বেশিদিন টি'কতেই পারে না।

"পৃথিবীতে ধন-উৎপাদন এবং অর্থ-সঞ্চয়িতার মধ্যে সাংঘাতিক বিচ্ছেদ বৃহৎ হয়ে উঠেছে। এই আসন্ন বিপ্লবের আশঙ্কার মধ্যে আজ বিশেষ করে মনে রাখবার দিন আসছে যে, যারা বিশিষ্ট সাধারণ বলে গর্ব করে তারা সর্বসাধারণকে যে পরিমাণে বঞ্চিত করে তার চেয়ে অধিক পরিমাণে নিজেকেই বঞ্চিত করে— কেননা শুধু কেবল ঋণই যে পুঞ্জীভূত হচ্ছে তা নয়, শাস্তিও উঠছে জমা হয়ে।"[৩]

মহাত্মাজীর সহিত রবীন্দ্রনাথের বহু বিষয়ে বহু বারই মতভেদ হইয়াছে; তৎসত্ত্বেও উভয়ে উভয়কে কী শ্রদ্ধা করিতেন তাহার দৃষ্টান্তও দেখিয়াছি একাধিকবার। আমাদের আলোচ্যপর্বে (১৯৩৪) গান্ধীজি হরিজন-আন্দোলন ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য ভারতময় সফর করিতেছেন। এতদিন রাজনীতির চর্চা করিয়া বুঝিয়াছেন যে হিন্দু

১ মূল কবিতাটি, দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, শেষ সপ্তকের সংযোজন, পৃ. ১১৭-১৯।

২ এন্‌ড্রুজ বিলাতে *The Indian Earthquake* গ্রন্থ লিখিয়া প্রকাশ করেন; ১৯৩৪।

৩ উপেক্ষিতা পল্লী, প্রবাসী ১৩৪০ চৈত্র; ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪, শ্রীনিকেতনের বার্ষিক অধিবেশনের বক্তৃতা।

সমাজের বুনিয়াদ এক-এক স্থলে কী চোরাবালির উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি বাংলাদেশে আসিতেছেন এই হরিজন আন্দোলন ব্যপদেশে। কিন্তু কিছুকাল হইতে ও বিশেষভাবে পুণা-চুক্তির পর হইতে গান্ধীবাদের বিরোধী একটি কঠিন মত বাংলাদেশে গড়িয়া উঠিতেছিল। গান্ধীবিরোধীদের মতে তাঁহার অহিংসবাদ জাতিকে নির্বীর্য করিতেছে, অহিংসবাদের উপর কোনো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না; মাইনরিটি বা সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতি সুবিচারের অজুহাতে মুসলমানদের অনুকূলে সর্বদাই তোষণনীতি অনুসরণ করিয়া তাহাদের সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে পুষ্ট হইবার সহায়তা করিতেছেন; কৃত্রিমভাবে গঠিত তপশীলী জাতিসমূহের তথাকথিত স্বার্থরক্ষার নামে ও হিন্দু-মুসলমানের সদ্‌ভাবের নামে বাংলাদেশের বর্ণহিন্দুর স্বার্থ ও সংস্কৃতিকে বলি দিতেছে। এইরূপ নানাভাবের পুঞ্জীভূত মত গান্ধীজির বিরুদ্ধে আজ জাগিয়াছে: বাংলাদেশ তাঁহার সফরকে 'বয়কট' করিতে চায়।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে আছেন, এইসকল কথার কিছুটা সংবাদপত্র মারফত কিছুটা লোকমুখে জানিতে পারিলেন। ৭ ফেব্রুয়ারি (১৯৩৪) তিনি মহাত্মাজীকে বয়কট করিতে নিষেধ করিয়া দেশবাসীর নিকট এক বিবৃতি দিলেন। কবি লিখিলেন, কিছুকাল হইতে মহাত্মাজীর মতামত সম্বন্ধে বাংলাদেশে বিরুদ্ধতা দেখা দিয়াছে; সমালোচনা দূষণীয় হবে, তবে সমালোচনা ও অপবাদ এক নহে। "I would be failing in my duty were I not to raise my voice of protest against the slanderous campaign that is being carried on against him. I have often disagreed with him and even quite recently criticized his belief··· but I have enough regard for the sincerity of his religious convictions and abiding love for the poor, to hold his differences of opinion with him with respect. I offer him a hearty welcome"।

গান্ধীজি সম্বন্ধে বিবৃতি লিখিবার পরদিন কবি কলিকাতায় গেলেন (৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪), বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার বক্তৃতা। বিষয়— 'সাহিত্যতত্ত্ব'।[১] কলিকাতায় থাকিলেই পাঁচমিশালী দাবি আসে, সকলকেই খুশি করিতে হয় — যদি বিশ্বভারতীর কোনো উপকার হয় কাহারও দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। একদিন প্রেসিডেন্সি কলেজের 'রবীন্দ্র-পরিষদে' উপস্থিত হন; একদিন জি. সি. লাহাদের 'ভারতী' ফাউন্টেনপেনের কারখানা দেখিতে যান ও ঐ জাতীয় কলমের নামকরণ করেন 'ঝরনা' কলম। হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানির ২৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় জুবিলি-উৎসবে তাঁহাকে সভাপতিত্ব করিতে হইল। এই প্রতিষ্ঠানের জনক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর; স্বদেশী আন্দোলনের যুগে যখন বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস প্রভৃতির সূচনা হয়, সেই সময়ে এই ব্যাঙ্ক ও জীবনবীমা-কোম্পানির জন্ম হয়; সে-সময়ে রবীন্দ্রনাথের সহিত হিন্দুস্থানের যোগ ছিল। কলিকাতার বিচিত্র অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া কবি ২৪ ফেব্রুয়ারি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন।

. এই সময়ে ভারতব্যাপী হিন্দু-মুসলমান বিরোধের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশে ভাষা-বিরোধের সূত্রপাত হয়। বিংশ শতকের গোড়ায় ইংরেজ শাসকবর্গ হিতচিকীর্ষু (!) হইয়া বাংলাদেশকে প্রাদেশিক উপভাষা ভেদে ভাগ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সেইটিতে ব্যর্থ হইয়া বঙ্গচ্ছেদ ব্যবস্থা করেন। তারপর গত বিশ বৎসরের মধ্যে নানা কৃত্রিম উত্তেজনা সৃষ্টির দ্বারা বাংলাদেশের মুসলমানের মনের মধ্যে এই বিষ সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে তাহারা বাঙালি হইতে পৃথক, বাংলা তাহাদের জাতীয় ভাষা নহে— তাহাদের ভাষা উর্দু। বিষপ্রয়োগ হয় বাহির হইতে,

১ . প্রবাসী ১৩৪১ বৈশাখ, পৃ. ৪-১৩।

বিষক্রিয়া চলে অভ্যন্তরে। তাহারই ফলে কিছুকাল হইতে বাংলার মুসলমানসমাজের এক শ্রেণীর লেখক বাংলাকে উর্দু-ঘেঁসা করিবার জন্ম বদ্ধপরিকর হন। বাংলাসাহিত্য 'হিন্দু-গন্ধী', বাংলাভাষা 'সংস্কৃত-ঘেঁসা' ইত্যাদির অজুহাতে তাহার আমূল সংস্কার বা সংহার কার্যে তাঁহারা ব্রতী হইয়াছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতা আনিয়া ফেলিলেন।

কিছুকাল হইতে সাময়িক পত্রিকাদিতে সাম্প্রদায়িক ভাষাবিরোধের কথা প্রায়ই আলোচিত হইতেছে।[১] রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইলে তিনি এম. এ. আজানকে (১১ চৈত্র ১৩৪০) পরে আলতাফ চৌধুরীকে (১৭ বৈশাখ ১৩৪১) এ বিষয়ে দুইখানি পত্র লেখেন। প্রথম পত্রে কবি লেখেন,[২] "সর্বপ্রথমে ব'লে রাখি আমার স্বভাবে এবং ব্যবহারে হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব নেই। দুই পক্ষেরই অত্যাচারে আমি সমান লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হই এবং সে রকম উপদ্রবকে সমস্ত দেশেরই অগৌরব মনে ক'রে থাকি।·· বাংলাভাষায় সহজেই হাজার হাজার পারসী আরবী শব্দ চলে গেছে, তার মধ্যে আড়াআড়ি বা কৃত্রিম জেদের কোনো লক্ষণ নেই। কিন্তু যেসব পারসী আরবী শব্দ সাধারণ্যে অপ্রচলিত, অথবা হয়তো কোনো এক শ্রেণীর মধ্যেই বদ্ধ, তাকে বাংলাভাষার মধ্যে প্রক্ষেপ করাকে জবরদস্তি বলতেই হবে।" কবি কয়েকটি উদাহরণ দিয়া পত্র শেষে বলিলেন, "আমাদের ঝগড়া আজ যদি ভাষার মধ্যে প্রবেশ ক'রে সাহিত্যে উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ হয়ে ওঠে তবে এর অভিসম্পাত আমাদের সভ্যতার মূলে আঘাত করবে।"

অপর পত্রখানিতে লিখিলেন, "আজকাল সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে আশ্রয় ক'রে ভাষা ও সাহিত্যকে বিকৃত করবার যে চেষ্টা চলছে তার মতো বর্বরতা আর হতে পারে না। এ যেন ভাইয়ের উপর রাগ করে পারিবারিক বাস্তুঘরে আগুন লাগানো। এমনতর নির্মম অন্ধতা বাংলা প্রদেশেই এত বড়ো স্পর্ধার সঙ্গে আজ দেখা দিয়েছে ব'লে আমি লজ্জা বোধ করি।"

শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন বটে, কিন্তু অচিরেই রাজধানীতে আবার আসিতে হইল (৩ এপ্রিল)। সেখানে International Relation Clubএর আয়োজনে এই বক্তৃতা (৭ এপ্রিল ১৯৩৪)। সভা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে। ভাইস-চান্সেলর সার্ হাসান সুরবর্দি প্রমুখ বহু গুণীজ্ঞানী সভায় উপস্থিত; প্রতিষ্ঠানটি আমেরিকার Carnegie endowment for the International Peaceএর অন্তর্গত।

শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর শতবিধ সমস্যার মধ্যে নিমজ্জিত থাকুন, আর কলিকাতার বহুবিধ অনুষ্ঠানের উত্তেজনার মধ্যে যাওয়া-আসা করুন, তাঁহার সাহিত্যের সাজি প্রায় প্রতিদিন ভরিয়া উঠে নবনব কবিতাপুষ্পে। এই সময়ে 'বীথিকা'র বিচ্ছিন্ন কবিতা লিখিতেছেন। কবিমানসের এই সৃষ্টিলীলার সন্ধান এইবার লওয়া যাক্।[৩]

রবীন্দ্রনাথ কবি হইলেও জৈবধর্মী মানুষ, এবং সাধারণ মানুষের ন্যায় তাঁহাকেও অর্থকষ্ট মনঃকষ্ট ভোগ করিতে হয়; বার্ধক্য ও জরা ধীরে ধীরে শরীর ও মনের উপর তাহাদের নিষ্করুণ ছাপ মুদ্রিত করে; চক্ষুর জ্যোতি ক্ষীণ ও

১ রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। দ্র. প্রবাসী ১৩৩৯ বৈশাখ, ১৩৪২ অগ্রহায়ণ।

২ প্রবাসী ১৩৪২ পৌষ, পৃ. ৩১৩-১৪।

৩ এই পর্বে লিখিত কবিতা কলিকাতায় রচিত — শেষ পর্ব (৫ এপ্রিল ১৯৩৪, দ্র. শেষ সপ্তক ৪); প্রাণের ডাক(৭ই. বীথিকা); প্রণতি (৭-১০ই, বীথিকা)। শান্তিনিকেতনে রচিত— ঢেঁকে উঠল ঝড় (পত্রপুট ৯); ভুল (১৯ এপ্রিল, বীথিকা); পথিক দেখেছি আমি পুরাণে (২০ এপ্রিল ॥ ৬ বৈশাখ ১৩৪১। প্রান্তিক ১৬)। আদিতম (২১ শে, বীথিকা)। যাবার সময় হল বিহঙ্গের (২৮ এপ্রিল ॥ ১৫ বৈশাখ ১৩৪১, প্রান্তিক ১৪); নব পরিচয় (২৯ শে, বীথিকা); পাঠিকা (বৈশাখ ১৩৪১, বীথিকা)।

কর্ণের শ্রবণশক্তি মন্দ হইয়া আসিতেছে; নিঃসঙ্গতায় মন ক্লান্ত হয়—এই অবস্থায় স্বভাবতই মন আশ্রয় খোঁজে অতীতের স্মৃতির মাঝে।

সেথা হতে ভেসে আসে চৈত্র দিবসের দীর্ঘশ্বাসে অস্ফুট মর্মর, কোকিলের ক্লান্ত স্বর,
ক্ষীণস্রোত তটিনীর অলস কল্লোল,— রক্তে লাগে মৃদুমন্দ দোল।

কলিকাতা আসিবার দুই দিন পর (৫ এপ্রিল) 'শেষ পর্ব' কবিতায়[১] মনের এই দ্বন্দ্ব ব্যক্ত হইয়াছে—

যেথা দূর যৌবনের প্রান্তসীমা সেথা হতে শেষ অরুণিমা শীর্ণ প্রায় আজি দেখা যায়।

কিন্তু কবির সুস্থ মন বলে—

এ আবেশ মুক্ত হ'ক; ঘোরভাঙা চোখ শুভ্র সুস্পষ্টের মাঝে জাগিয়া উঠুক।

দৃঢ় কণ্ঠে বলেন—

ভাঙিব মনের বেড়া কুসুমিত কাঁটালতা ঘেরা,
যেথা স্বপনেরা
মধুগন্ধে মরে ঘুরে ঘুরে
গুন গুন সুরে।
নেব আমি বিপুল বৃহৎ
আদিম প্রাণের দেশ . .

এই সুরেই 'প্রাণের ডাক' (৭ এপ্রিল ১৯৩৪) কবিতায় বলিতেছেন—

নিভৃতে পৃথক কোরো নাকো তুমি আপনারে।
ভাবনার বেড়া বেঁধে রাখ কেন চারিধারে। . .
হয়তো বা কোনো কাজ নাই, ওঠো তবু ওঠো;
বৃথা হোক তবুও বৃথাই পথ-পানে ছোটো।

সেই পুরাতন পরিচিত সুর, 'মানসী'র যুগকে স্মরণ করাইয়া দেয়। নিঃসঙ্গতার জন্য যে দুঃখ পাইতেছেন, তাহার ঊর্ধ্বে উঠিবার জন্য আপনার মনকে আহ্বান করিতেছেন। জীবনের যাত্রাপথে 'প্রণতি' পাঠাইতেছেন—

অনেক তৃষ্ণা, অনেক ক্ষুধা, তাহারি মাঝে পেয়েছি সুধা— উদয়গিরি প্রণাম লহো মম। . .
এ মোর দেহ-পেয়ালাখানা উঠেছে ভরি কানায় কানা রঙিন রসধারায় অনুপম।
একটুকুও দয়া না মানি ফেলায়ে দেবে, জানি তা জানি— উদয়গিরি তবুও নমোনম।

কবি জানেন, তিনি 'রূপকার'-রূপে যাহা গড়িয়াছেন তাহা তাঁহার পরিপূর্ণ জীবনের অর্ঘ্য; কর্মকারের গৌরব তিনি চান না।—

হায় রে রূপকার,
না-হয় কারো কর'নি উপকার,—
আপন দায়ে করেছ তুমি নিজেরে অবসান,
সে লাগি কভু চেয়ো না প্রতিদান।

১ দ্র. শেষ সপ্তক, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, সংযোজন।

যে নিজেকে যথার্থ ভাবে দান করিয়াছে তাহারই প্রেম সার্থক।

করুণ চোখে যে প্রেম দেখে ভুল,
সকল ত্রুটি জানে,
তবু যে অনুকূল,
শ্রদ্ধা যার তবু না হার মানে।

সুন্দরের উপাসক রূপকার সব অসংগতি, সব বিচ্যুতিকে প্রেমের চোখে দেখেন।

তাই জীবনে 'ভুল' (৬ বৈশাখ ১৩৪১) করিয়া 'শরমে' যার 'মলিন মুখ নত', সংসারে যে ছন্দছাড়া, তালভঙ্গ করিয়া যে অবমানিতা— কবি তাহাকে দেখিতেছেন সেই প্রেমের চোখে 'যে প্রেম সবহারা', যাহা বিশ্বব্যাপী।—

এখন আমি পেয়েছি অধিকার তোমার বেদনার
অংশ নিতে আমার বেদনায়।
আজিকে সব ব্যাঘাত টুটে জীবনে মোর উঠিল ফুটে
শরম তব পরম করুণায়।

কোথা হইতে এই করুণা, এই অপরিসীম ক্ষমা মানবের মনে আসে। কবি বলিতেছেন—

পথিক দেখেছি আমি পুরাণে কীর্তিত কত দেশ
কীর্তিনিঃস্ব আজি ; দেখেছি অবমানিত ভগ্নশেষ
দর্পোদ্ধত প্রতাপের ; অন্তর্হিত বিজয়নিশান · ·
তবু করি অনুভব বসি এই অনিত্যের বুকে,
অসীমের হৃৎস্পন্দন তরঙ্গিছে মোর দুঃখে সুখে।[১]

সেই হৃৎস্পন্দন বিশ্বাত্মার অভিঘাতে অনুভূত ; 'আদিতম' (৮ বৈশাখ ১৩৪১। বীথিকা, পৃ. ১৯-২০) কবিতাটি সেই কথাকেই ভাষা দিয়াছে অন্য ছন্দে—

প্রাণের প্রথমতম কম্পন
অশথের মজ্জায় করিতেছে বিচরণ,
তারি সেই ঝংকার ধ্বনিহীন—
আকাশের বক্ষেতে কেঁপে ওঠে নিশিদিন ;
মোর শিরাতন্তুতে বাজে তাই ;
সুগভীর চেতনার মাঝে তাই
নর্তন জেগে ওঠে অদৃশ্য ভঙ্গীতে
অরণ্যমর্মর-সংগীতে।

১ ৭ বৈশাখ ১৩৪১, প্রান্তিক ১৬।

কিন্তু 'যাবার সময় হল বিহঙ্গের' এই কথাটি মনে করিয়া লিখিলেন—

· · কত কাল এই বসুন্ধরা
আতিথ্য দিয়েছে ; · · সব নিয়ে ধন্য আমি
প্রাণের সম্মানে। এ পারের ক্লান্ত যাত্রা গেলে থামি
ক্ষণতরে পশ্চাতে ফিরিয়া মোর নম্র নমস্কারে
বন্দনা করিয়া যাব এ জন্মের অধিদেবতারে।[১]

ইহার সঙ্গে পঠনীয় পরদিন লিখিত 'নব পরিচয়' কবিতা। এই মনোভাবের পরিপূর্ণ রূপটি পাই ঐ কবিতার[২] মধ্যে—

এ-সংসারে সব সীমা ছাড়ায়ে গেছে যে-মহিমা ব্যাপিয়া আছে অতীতে অনাগতে,
মরণ করে অভিনব, আছেন চির যে-মানব
নিজেরে দেখি সে-পথিকের পথে।
সংসারের ঢেউখেলা সহজে করি অবহেলা রাজহংস চলেছে যেন ভেসে—
সিক্ত নাহি করে তারে, মুক্ত রাখে পাখাটারে, ঊর্ধ্বশিরে পড়িছে আলো এসে।

রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কাব্যের এই অনুভূতিই তাঁহার উপাসনা, তাঁহার ধর্মদেশনা, তাঁহার পরিপূর্ণ সত্তা—

আনন্দিত মন আজি কী সংগীতে উঠে বাজি,
বিশ্ববীণা পেয়েছি যেন বুকে।
সকল লাভ, সব ক্ষতি, তুচ্ছ আজি হল অতি
দুঃখ সুখ ভুলে যাওয়ার সুখে।

দ্রষ্টা কবির মনের আকুতি প্রকাশ পাইয়াছে এই কবিতাগুলির মধ্য দিয়া, কিন্তু মানুষ বারে বারে বলিতে চাহে ধরার দিকে চাহিয়া— 'মনে রেখো'। কোথায় কবির পরিপূর্তি, তাহার সার্থকতা ? যেখানে বিরহী হিয়া অপেক্ষিয়া আছে— সেখানে। তাই 'পাঠিকা' কবিতায়[৩] বহুকাল পূর্বের প্রশ্ন—

কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি, কৌতূহল ভরে ; আজি হতে শতবর্ষ পরে—

তাহার উত্তর পাই এখানে—

ওগো আমার কবি,
ছন্দ বুকে যতই বাজে
ততই সেই মুরতি-মাঝে
জানি না কেন আমারে আমি লভি। · ·

১ ১৫ বৈশাখ ১৩৪১, প্রান্তিক ১৪। 'প্রান্তিক'এর এই কবিতাটি "চাঁদপুর য়ুনিয়ন ইন্‌স্টিট্যুটে ত্রিসপ্ততিতম রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে কবিগুরুর আশীর্বাদবাণী" রূপে প্রেরিত হয়। দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২. পৃ. ৫০৩। এই উৎসবের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন বিনয় মুখোপাধ্যায়, যিনি পরে 'যাযাবর' নামে খ্যাতিমান হন। দ্র. সুধীরচন্দ্র কর, কবিকথা, পৃ. ৪।

২ ১৬ বৈশাখ ১৩৪১॥ ২৯ এপ্রিল ১৯৩৪ ; বীথিকা, পৃ. ৮১-৮২।

৩ বৈশাখ ১৩৪১ ; বীথিকা, পৃ. ২১-২২।

ওগো আমার কবি,
জান না, তুমি মৃদু কী তানে
আমারি এই লতাবিতানে
শুনায়েছিলে করুণ ভৈরবী।
ঘটেনি যাহা আজ কপালে
ঘটেছে যেন সে কোন্ কালে
আপনভোলা যেন তোমার গীতি
বহিছে তারি গভীর বিস্মৃতি।

আপনার মনের সাধনা কবিহৃদয় দেখিতে চায় মানবের মাঝে সার্থক রূপে। রবীন্দ্রনাথ যদি কেবল সাধক হইতেন, তবে তিনি নিজেই তুরীয় আনন্দ-আবেগ প্রকাশ করিয়া আত্মতৃপ্ত হইতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সাধক-কবি— তাঁহার কবিচিত্তের আকাঙ্ক্ষা—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

সিংহলে ১৯৩৪

তিয়াত্তর বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ-সংগ্রহের আশায় অভিনয়ের দল লইয়া সিংহলে চলিলেন। ইতিপূর্বে কবি দুইবার (১৯২২, অক্টোবর ১১ - নভেম্বর ৮ ও ১৯২৮, মে ৩১ - জুলাই ১০) সিংহলে গিয়াছিলেন বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে। এবার চলিলেন ভারতীয় কলার নিদর্শন দেখাইয়া সিংহলীদের মনকে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল করিবার অভিপ্রায়ে। তজ্জন্য স্থির হইয়াছিল সিংহলে 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্যের অভিনয় ও ভারতীয় চিত্রকলার প্রদর্শনী হইবে।

কবির যাত্রার পূর্বে সুরেন্দ্রনাথ কর ও অনিলকুমার চন্দ কলম্বো রওনা হইয়া গিয়াছিলেন। কবি অভিনয়ের দল লইয়া ৫ মে (১৯৩৪) কলিকাতা হইতে 'ইনচাংগা' জাহাজে যাত্রা করিলেন— নূতন জাহাজের এই প্রথম অভিযান — ডিজেল ইঞ্জিনে চলে বলিয়া খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; কবির মন বেশ প্রসন্ন। জন্মদিন (২৫ বৈশাখ ১৩৪১) কাটিল সমুদ্রের উপর।

৯ মে জাহাজ কলম্বো বন্দরে পৌঁছিল; জাহাজ-ঘাট লোকে লোকারণ্য; সিংহলের প্রথমমন্ত্রী সার্ ব্যারন জয়তিলক প্রমুখ বহু বিশিষ্ট লোক কবিকে স্বাগত করিলেন। কবির জন্য সমুদ্রতীরে একটি সুন্দর বাড়ি নির্দিষ্ট ছিল; শান্তি-নিকেতনের মেয়েদের জন্য স্থানীয় বালিকা-বিদ্যালয় ও অন্যদের জন্য ধনী ডাক্তারের বাড়িতে ব্যবস্থা হয়।

১০ মে স্থানীয় রোটারি ক্লাবে ভারতীয় 'বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বরূপ' সম্বন্ধে কবির বক্তৃতা হইল। তার পর পাঁচ দিন শাপমোচনের অভিনয় চলে; এই শ্রেণীর নৃত্যগীত সাজসজ্জা পরিবেশ সিংহলীদের নিকট সম্পূর্ণ নূতন; ভারতীয় শিল্পকলা বিশেষভাবে সংগীত ও নৃত্যের সহিত সিংহলের শিক্ষিত জনতার যোগসূত্র বহু শতাব্দী ছিন্ন। গত পাঁচ শত

বৎসর পোর্তুগীজ ওলন্দাজ ও ইংরেজ একের পর এক তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিয়াছে ; ফলে, উৎকৃষ্ট য়ুরোপীয়তা সিংহলীদের জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছিল ; ভারতীয় সংগীতের রসবোধ তাহাদের অত্যন্ত ক্ষীণ ; পাশ্চাত্য নৃত্য দেখিতে ও সংগীত শুনিতে তাহারা অভ্যস্ত। তৎসত্ত্বেও শান্তিনিকেতনের নাট্য-অভিনয় তাহাদের মুগ্ধ করিল।

অভিনয়ের সঙ্গে যুগপৎ চলিতেছে শান্তিনিকেতনের চিত্রপ্রদর্শনী ; রবীন্দ্রনাথের চিত্রাবলী, নন্দলাল বসু ও কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের অঙ্কিত চিত্রসমূহ এবং অন্যান্য ভারতীয় শিল্পের নিদর্শন। সিংহলের শিল্পীদের মধ্যে একদল প্রাচীন পটুয়া ধরণের, আর-একদল য়ুরোপীয়দের অনুকারক ; সিংহলের আত্মপ্রকাশের সুযোগ কোথাও নাই। তাই এই চিত্রপ্রদর্শনীও তাহাদের কাছে নূতন ধরণের লাগিল।

১১ হইতে ১৮ মে কলম্বোর উৎসব-পালা শেষ করিয়া কবি ও তাঁহার সঙ্গীরা সমুদ্রতীরস্থ পানাদুরা[১] নামক স্থানে (১৯ মে) উপস্থিত হইলেন। এখানকার মি. উইলমট পেরারা নামে এক ধনী সিংহলী যুবক কিছুকাল পূর্বে শান্তিনিকেতনে ছিলেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া পানাদুরা হইতে মাইল দশ দূরে শ্রীনিকেতনের আদর্শে 'শ্রীপল্লী' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ২০ মে উহার উদ্বোধন উপলক্ষ্যে কবির এখানে আগমন।

এই হোরানা বা শ্রীপল্লীতে কবিকে সিংহলের বিখ্যাত ক্যাণ্ডি নৃত্য দেখানো হয়। শান্তিদেব লিখিয়াছেন, 'এ নাচের ভিতর একটা পৌরুষ ছিল, যা দেখে নির্জীব লোকের মনেও তেজের সঞ্চার করতে পারে।' পানাদুরাতে একদিন থাকিয়া কবি সদলে গ্যালে (Galle)[২] যাত্রা করেন। এখন হইতে অধিকাংশ চলাফেরা চলে মোটরে ; সিংহলের রাস্তাঘাট খুব ভালো এবং দৃশ্যও মনোরম। গ্যালেতে 'শাপমোচন' অভিনীত হইয়াছিল।

গ্যালে হইতে আরও দক্ষিণে সমুদ্রতীরস্থ মাতারু[৩] নামক স্থানে বিখ্যাত মুখোশ-নাচ দেখিবার সুযোগ পাইলেন ; পথে ছোটো একটি স্থানে অধিবাসীরা কবি-সংবর্ধনা করিয়া স্থানীয় বহু প্রকার লোকনৃত্য ও মুখোশ-নৃত্য দেখাইল। কলম্বোতে ফিরিয়া ১৬ মে শান্তিনিকেতনের দলকে আরও তিন দিন 'শাপমোচন' অভিনয় করিতে হয়, এমনই চাহিদা।

অতঃপর ৩ জুন কবি ক্যাণ্ডি[৪] শহরে আসিলেন, কলম্বো হইতে ৬০ মাইল মোটর-পথ। ক্যাণ্ডি এককালে প্রাচীন সিংহলের রাজধানী ছিল, এখন এখানে গবর্মেণ্টের গ্রীষ্মাবাস ও ধনীদের বিশ্রামস্থান। এইখানে কবি সাত দিন থাকেন। ছাত্রছাত্রীরা সিংহলের দর্শনীয় স্থানসমূহ দেখিতে গেল।

এইখানে বাসকালে সিংহলের আদিম নৃত্যকলা বা ক্যাণ্ডিনাচ ভালো রূপে দখিবার সুযোগ পান। কয়েক বৎসর পরে আলমোড়া বাসকালে লিখিয়াছিলেন— 'সিংহলে সেই দেখেছিলেম ক্যাণ্ডিদলের নাচ' (নবজাতক)।

বাহিরের কোনো সভাসমিতির কোনো উদ্বেগ ও উত্তেজনা এখানে ছিল না ; কবি নিবিষ্ট চিত্তে তাঁহার নূতন উপন্যাস 'চার অধ্যায়' এইখানে সমাপ্ত করিলেন (৫ জুন ১৯৩৪)। এই উপন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা আমরা পরে করিব, কেবলই আশ্চর্য হইয়া ভাবি, এই নিরন্তর চলাফেরা অভিনয় বক্তৃতার উত্তেজনার মধ্যে কবির অন্তরে অন্ত এলার প্রেমকাহিনী ফল্গুর ন্যায় বহিয়া চলিতেছিল ; মনের কতখানি নির্লিপ্ততা থাকিলে এই ভাবের লেখা লেখনী হইতে নিঃসৃত হয়। 'শেষের কবিতা'ও লেখেন এই ভাবে 'দক্ষিণ-ভারতের পথে চলতে চলতে'।

১ Panadura, কলম্বোর ১৬ মাইল দক্ষিণের বন্দর-শহর।

২ Galle, সমুদ্রতীরস্থ শহর ; কলম্বোর ৬৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত।

৩ Mataru, ভারত-মহাসাগর তীরস্থ বন্দর ; গ্যালে হইতে ২৪ মাইল পূর্বে।

৪ Kandy, মহাবলী নদীতীরে শহর ; কলম্বো হইতে ৬০ মাইল পূর্ব-উত্তরে।

ক্যাণ্ডি হইতে কবি সদলে অনুরাধাপুর[১] আসিলেন— সিংহলের প্রাচীন ইতিহাসের ধ্বংসস্তূপ বহন করিয়া এই মহানগরীর শ্মশান পড়িয়া আছে। এইখানে একদিন থাকিয়া ট্রেনযোগে সকলে মিলিয়া তামিলপ্রধান উত্তর-সিংহলে আসিলেন (৯ জুন)। বহু শত বৎসর তামিল ও সিংহলীরা একই দ্বীপে বাস করিয়া পরস্পর পরস্পরকে আপনার করিতে পারে নাই। সংখ্যালঘিষ্ঠদের অন্যায় আব্দার ও সংখ্যাগরিষ্ঠদের অবিচার ঔদ্ধত্য মিলনের বাধা হইয়াছে। জাফ্‌না[২] সিংহলে তামিলদের প্রধান শহর, এইখানে তিন রাত্রি 'শাপমোচন' অভিনয় হইল, একদিন কবির বক্তৃতাও হয়। অবশেষে (১৫ জুন ১৯৩৩) জাফ্‌না হইতে ধনুষ্কোটি হইয়া মাদ্রাজের পথে কবি দেশে ফিরিলেন।[৩]

সিংহলযাত্রা ধনাগমের পক্ষে অনুকূল হয় নাই সত্য, কিন্তু সংস্কৃতিপ্রচারের দিক হইতে শান্তিনিকেতনের এই ক্ষুদ্র দল যে-কাজ করিয়া আসিয়াছিল, তাহার কথা একদিন সিংহলবাসীদের স্মরণ করিতেই হইবে; এই ক্ষুদ্র দল ভারতের শিল্পমানসে কী ঐশ্বর্য আছে তাহার কণিকামাত্র পরিবেশন করিয়া সিংহলে নবচেতনা আনিয়া দিয়াছিল। সমসাময়িক একখানি সিংহলী পত্রিকা লিখিয়াছেন, 'Here in Ceylon he has kindled a new enthusiasm, he has awakened a great yearning, he has held aloft a great idealism. It is not generation that will think him for his inspiration to Ceylon. Generation cannot measure the value of his services. It is not history that will record his achievements. Even history cannot give a niche to an impetus that has opened our eyes to a vision of the joy and grandeur of our song and our music, of our art and our culture'।

সিংহলভ্রমণ সম্বন্ধে প্রবাসী লিখিয়াছিলেন, 'ধর্মে সভ্যতায় সংস্কৃতিতে ভারতবর্ষের সহিত সিংহলের যোগ বহু প্রাচীন। রবীন্দ্রনাথের সিংহলভ্রমণ সেই যোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিল। এই কাজটি তাঁহার দ্বারা যে প্রকারে হওয়া সম্ভব অন্য কোনো এক ব্যক্তি দ্বারা তাহা হইতে পারে না।. . নানা গুণের সমাবেশ একই ব্যক্তিতে থাকায় রবীন্দ্রনাথ সিংহলবাসীদিগকে যেমন আনন্দ দিতে পারিয়াছেন ও তাঁহাদের মধ্যে যে নবজাগরণ আনিয়াছেন, তাহা পূর্বে তথায় সংসাধিত হয় নাই।' (১৩৪১ আষাঢ়, পৃ ৪৪৭)।

১ Anuradhapur, কলম্বো হইতে ১০৬ মাইল উত্তর-পূর্বে।

২ Jafna, সিংহলের উত্তরাংশে অবস্থিত শহর।

৩ এই পরিচ্ছেদের অধিকাংশ উপকরণ শ্রীশান্তিদেব ঘোষ লিখিত 'সিংহলে রবীন্দ্রনাথ' (সচিত্র) প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত। বিচিত্রা ১৩৪১, পৃ. ৬৫৫-৬৯।

সিংহল হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে

রবীন্দ্রনাথ সিংহল হইতে শান্তিনিকেতন ফিরিলেন ২৮ জুন ১৯৩৪। গ্রীষ্মাবকাশের পর বিদ্যালয় খুলিল ১৬ আষাঢ় বা ১ জুলাই ১৯৩৪। বিদ্যালয়ের মধ্যে পরিবর্তন কিছু-না-কিছু সর্বদাই চলিতেছে। এবার 'শ্রীভবন' (বর্তমানে শ্রীসদন)-এর পরিদর্শিকা শ্রীহেমবালা সেন দীর্ঘ দশ বৎসর কাজ করিবার পর বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। শ্রীভবনের বিরাট অট্টালিকা নির্মিত হইবার পর 'দ্বারিক' ও 'নূতন বাড়ি'তে বালিকাদের হস্টেল ছিল। শ্রীস্নেহলতা সেন ছিলেন প্রথম পরিদর্শিকা। তিনি চলিয়া গেলে ১৯২৩এর শেষভাগে হেমবালা দেবী ছাত্রীদের পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন; তখন হস্টেলে মাত্র ১২টি ছাত্রী— সমগ্র বিদ্যালয়ে সকল বিভাগে ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩০টি মাত্র। গত দশ বৎসরের মধ্যে শ্রীভবনের নূতন বাড়ি[১] তৈয়ারি হইয়াছে ও ছাত্রীসংখ্যা বাড়িয়াছে। হেমবালা দেবী যোগ্যতার সহিত এই কার্য করিয়া আসিতেছিলেন; সম্প্রতি কতকগুলি ছোটোখাটো ঘটনায় এমন-একটি আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় যে, হেমবালা দেবী ছুটি লইয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়াই স্থির করিলেন। হেমবালা দেবী ছুটি চাহিলে কবি তাঁহাকে সিংহল যাত্রার দিন লিখিয়া পাঠাইলেন, "আমার মনে হয় কিছু দিন দূরে থাকতে পারলে তোমার শরীর মনের পক্ষে সে ভালোই হবে।"[২] মাসাধিক কাল পূর্বেই হেমবালা দেবীর স্থানে 'ছাত্রীবিভাগের অধিনায়িকা' কাহাকে করিবেন সে-বিষয়ে কবি ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কবি ইন্দিরা দেবীকে লিখিয়াছিলেন, "আপাতত স্থির করেছি, সুধা— প্রভাতকুমারের স্ত্রী— সীতানাথ তত্ত্বভূষণের কন্যা— তাঁকেই ঐ পদে অধিষ্ঠিত করব— · · কোনো · · মেয়েকে সুধার সহকারিণীরূপে রাখব।"[৩] সুধাময়ী দেবী তখন পাঠভবনের অন্যতম অধ্যাপিকারূপে কাজ করিতেছিলেন।

সিংহল হইতে ফিরিয়া আসিবার পর দিন (১৪ আষাঢ় ১৩৪১) হেমবালা দেবীকে লিখিতেছেন, "এখনো নানা প্রয়োজনবশত নূতন ব্যবস্থার কারণ ঘটেছে। সেই কথা জেনেই তোমার ছুটি নেবার কথার অনুমোদন করতে হয়েছে। এই ব্যবস্থান্তরে আমার হৃদয় ব্যথিত। তোমাদের সঙ্গে আশ্রমের বাহ্য বিচ্ছেদও শোচনীয়। কর্মের নিয়ম নির্মম · · তার উপর আমিও হস্তক্ষেপ করি নে— দায়িত্ব আমার নয়। তোমার 'পরে আমার স্নেহের কোনো ব্যত্যয় হয়নি নিশ্চয় জানবে। আশ্রমের সঙ্গে তোমার অন্তরের যোগ বিচ্ছিন্ন হবে না একান্ত মনে এই কামনাই করি" (পাণ্ডুলিপি পত্র)।

এখানে হেমবালা দেবী সম্বন্ধে একটি কথা বলিয়া রাখা উচিত। তিনি যে কেবলমাত্র শ্রীভবনের প্রবীণা পরিদর্শিকা ছিলেন তাহা নহে; শান্তিনিকেতনের বিরাট রন্ধনশালা তাঁহার তত্ত্বাবধানে ছিল। আশ্রম-সংলগ্ন গোশালা, ধান হইতে টাটকা চাউল করাইবার জন্য ঢেঁকিশাল তাঁহারই পরিচালনাধীন ছিল। তিনি চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্তই উঠিয়া যায়, কারণ এত দায় ও দায়িত্ব গ্রহণ করিবার মতো লোক দুর্লভ। হেমবালা দেবী চলিয়া গেলেও কবির স্নেহ হইতে তিনি কোনো দিন বঞ্চিত হন নাই। কবি পৌষ-উৎসবের সময় হেমবালাকে লিখিতেছেন, "উৎসবে তুমি আমাদের কাছে আসবে শুনে মনে অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছিলুম। তোমার সম্বন্ধে আমার মনে গভীর একটা বেদনা আছে, তুমি যদি আসতে পারতে তাহলে অনেকটা উপশম হোতো। তোমাকে আমি যথার্থ

১ শ্রীভবন গৃহ-নির্মাণের জন্য প্রথম টাকা পাওয়া যায় বিড়লাদের নিকট হইতে।

২ পাণ্ডুলিপি পত্র, হেমবালা সেনের কাছে আছে। লিখিত ৬ বৈশাখ ১৩৪১।

৩. চিঠিপত্র ৫, পত্র ৫১। এপ্রিল ১৯৩৪ ॥ ১৮ চৈত্র ১৩৪০। দ্র. পত্র, শিক্ষাব্রতী, রবীন্দ্রসংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫৯।

স্নেহ করি, তুমি আমাদের অত্যন্ত আপন এ কথা নিঃসংশয়ে জেনো। আমাদের আশ্রমিক জীবনের বহুদিনের সুখ দুঃখের সঙ্গে তুমি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত সে কথা কখনোই ভোলবার নয়।"[১]

সিংহল হইতে শান্তিনিকেতনে আসিয়া বিচিত্র আবর্তনের মধ্যে পড়িলেন। বিশ্বভারতীর দৈনন্দিন কাজ, অর্থোপার্জনের চিন্তা, ফরমাইশের লেখা, অনুরোধের উপদ্রবে পড়িয়া এখানে-সেখানে আসা-যাওয়া যথাপূর্ব চলিতে লাগিল। এখন শ্রীভবন হইতে হেমবালা সেন চলিয়া যাওয়াতে যে পরিস্থিতি হইয়াছিল, তাহার জন্য তাঁহাকে সময় দিতে হইতেছে। প্রতিমা দেবী প্রনেত্রী ও হৈমন্তী দেবী (অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীর পত্নী) পরিদর্শিকার কাজে নিযুক্ত হন। কবি মাঝে মাঝে বালিকাদের হস্টেলে গিয়া আশ্রমের আদর্শ ও কর্তব্য সম্বন্ধে কথাবার্তা বলেন, তা নিয়ে পুস্তিকাও লেখেন।

বিচিত্র কাজের ও উদ্বেগের মধ্যে মধ্যে লেখেন অভ্যাসমতো কবিতা। সিংহলভ্রমণ-পর্বে কবিতা লেখায় ছেদ পড়িয়াছিল, এখন দুই-একটি কবিতা লিখিতেছেন।[২] প্রয়োজনের তাগিদে লেখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা। এবারকার বিষয়— 'সাহিত্যের তাৎপর্য'।[৩] সেজন্য ২৯ আষাঢ় (১৩৪১) কবি কলিকাতায় গেলেন; উঠিলেন বরাহনগরে প্রশান্তচন্দ্রের বাসায়। সেখানে তাঁহার নূতন গল্প [চার অধ্যায়] পড়িয়া শুনাইলেন।[৪] পরদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা (১৬ জুলাই) দিলেন। কলিকাতায় এই সময়ে গান্ধীজি আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত দেখা করিয়া কবি ১৯ জুলাই শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন (৩ শ্রাবণ ১৩৪১)।

শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া 'বর্ষামঙ্গল' উৎসবের আয়োজন শুরু হইল। নূতন গান মনে আসিতেছে না, তাই পুরাতন গান সংগ্রহ করিয়া রচিলেন 'শ্রাবণগাথা'। এই গানগুলিকে কথোপকথনের দ্বারা একটি নাটকীয় রূপ দিলেন; সেখানে আছে রাজা সভাকবি ও নটরাজ। এই সংলাপের উদ্দেশ্য defence of poesy অর্থাৎ গানের সম্ভোগ তাহার রসাস্বাদনে— এই তত্ত্বের সমর্থন। তাছাড়া আধুনিক সাহিত্যের ভাষায় যে কর্কশতা দেখা দিতেছে তাহারও সমালোচনা আছে কথোপকথনের মধ্যে।[৫]

এই উৎসব উপলক্ষ্যে কলিকাতা হইতে বহু লোক সমাগম হয়।[৬] বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অতিথি হইতেছেন, সংবাদপত্রসেবীর দল। এই দিন প্রাতে বৃক্ষরোপণ-উৎসব হয় মৃত্তিকা-মঞ্চের নিকট। নন্দলালের প্রেরণায় কলাভবনের ছাত্ররা মাটির একটি মণ্ডপ নির্মাণ করেন; সেটি পিয়ার্সন-বীথির কোণে ভোজনালয়ের সম্মুখে

১ পাণ্ডুলিপি পত্র। পত্রখানিতে তারিখ ভুল আছে, ৮ পৌষ ১৩৩৪; হইবে ১৯৩৪ (১৩৪১)।

২ রাতের দান (১৯ আষাঢ় ১৩৪১)। কাঠবিড়ালী (২২ আষাঢ়, বীথিকা)। দুঃখ যেন জাল পেতেছে (২৮ আষাঢ় ১৩৪১ পরে গদ্যছন্দে লেখেন, দ্র. শেষ সপ্তক ১০)। জীবন-বাণী— কোন বাণী মোর জাগল (৭ শ্রাবণ, প্রবাসী ১৩৪১ ভাদ্র)। উদাসীন (৯ শ্রাবণ, বীথিকা)। যাত্রা শেষে— বিজন রাতে যদি রে তোর সাহস থাকে (২৪ শ্রাবণ, বিচিত্রা ১৩৪১ ভাদ্র)। শ্রাবণগাথা অভিনয় (২৬ ও ২৭ শ্রাবণ ১৩৪১)।

৩ ইতিপূর্বে ১৯৩৪ ফেব্রুয়ারি 'সাহিত্যতত্ত্ব' সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।

৪ প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত। চিঠিপত্র ৫, পত্র ১১৫; ১২ জুলাই ১৯৩৪; [আষাঢ় ১৩৪১ শান্তিনিকেতন]।

৫ শ্রাবণগাথা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৫, পৃ. ১০৫-২৪। শ্রাবণগাথা প্রথম অভিনয় ২৬ ও ২৭ শ্রাবণ ১৩৪১ শান্তিনিকেতন। ২২ পৃষ্ঠা। তু. শেষ-বর্ষণ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮। ইহাতে যে ২২টি গান আছে তাহার মধ্যে 'হৃদয়ে মন্দ্রিল' ও 'মম মন-উপবনে' গান দুইটি এই সময়ের রচনা বলিয়া মনে হয়।

৬ ইন্দিরা দেবীকে লিখিত। চিঠিপত্র ৫, পত্র ৫৩; ৭ অগস্ট ১৯৩৪ ॥ ২২ শ্রাবণ ১৩৪১। "বর্ষামঙ্গলে হুড়মুড় করে বৃহৎ একদল লোক এসে পড়েচে,…তাঁদের আবাসের ব্যবস্থা দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছে।…বারোই অগস্ট পর্যন্ত এখানে গোলমাল।"

এখনো আছে; এখানে প্রায় প্রতিদিন শিল্পের কোনো বিশিষ্ট নিদর্শন পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই দিন অপরাহ্নে শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ-উৎসব ও সন্ধ্যার পর 'শ্রাবণগাথা'র অভিনয় হয়। রবীন্দ্রনাথ নটরাজের ভূমিকা গ্রহণ করেন।[১]

এই সময়ে কবির বহুদিনের ঈপ্সিত একটি ভাবনা রূপ লইল। পাঠকের স্মরণ আছে, ১৯২১ সালের শেষভাগে অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি আসিয়া বিশ্বভারতীতে চীনাভাষা অধ্যয়ন-অধ্যাপনার প্রবর্তন করিয়া যান। ইহার দুই বৎসর পর কবি স্বয়ং চীনদেশে যান এবং সেই বৎসর রেঙ্গুন হইতে অধ্যাপক ভো-লিম্ আসিয়া চীনাভাষা বৈজ্ঞানিকভাবে শিখাইবার ব্যবস্থা করেন (১৯২৪-২৫)। ১৯২৫ সালে ইতালীয় অধ্যাপক তুচ্চি (G. Tucci) আসেন; তিনি চীনা ক্লাসিকস্ ও চীনা বৌদ্ধ গ্রন্থ অধ্যাপনা করেন। লিম্ ও তুচ্চি চলিয়া গেলে সাময়িকভাবে চীনা অধ্যাপনা বন্ধ হইয়া যায়। অতঃপর ১৯২৮ সালে তান্-য়ুন্-সান্ (জ. ১৯০০) নামে এক যুবক চীনা আশ্রমে আসেন; ইনি তখন ইংরেজি জানিতেন না; কয়েক বৎসর কঠিন পরিশ্রম করিয়া ইংরেজি আয়ত্ত করিয়া ও ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তরের বাণীটি হৃদয়ঙ্গম করিয়া, ১৯৩১ সালে দেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। আমাদের আলোচ্যপর্বে তান্-য়ুন্-সান্ চীন হইতে আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া এখানে ভারত-চীন সংস্কৃতির কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করিলেন। তাঁহার চেষ্টায় চীনদেশের সংগৃহীত অর্থ হইতে 'চীনা-ভবন' অট্টালিকা নির্মাণের ব্যবস্থা হয়। এইবার ভারত-চীন সংস্কৃতি সংযোগ কী ভাবে হইতে পারে সে-সম্বন্ধে আলোচনার জন্য শান্তিনিকেতনে যে দুইটি সভা হয়, তাহাতে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন (১৯ ও ২৬ অগস্ট ১৯৩৪)। বিশ্বভারতী স্থাপনের সময়ে শান্তিনিকেতনকে বিশ্বসংস্কৃতির মিলন-কেন্দ্র করিবার যে স্বপ্ন কবি দেখিয়াছিলেন, তাহা আজ চীনদেশের এই নীরব কর্মীর চেষ্টায় রূপ পাইল।

ঘটনা হিসাবে শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে আরেকটি দিন স্মরণীয়। ৩১ অগস্ট ১৯৩৪ উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নেতা গান্ধীজির একান্ত ভক্ত আবদুল গফুর খাঁ আশ্রমে আসিলেন; তাঁহার পুত্র আবদুল গনি খাঁ তখন কলাভবনের ছাত্র। খাঁ সাহেব দীর্ঘকাল হাজারিবাগ জেলে আটক ছিলেন; সেখান হইতে মুক্তি পাইয়া এখানে আসেন। রবীন্দ্রনাথ অতিথির যথোচিত সংবর্ধনা করিলেন; দুঃখের বিষয়, খাঁ সাহেবকে পরদিনই পাটনা হইয়া ওয়ার্দা যাইতে হয়। কবির সংবর্ধনা-ভাষণ ইংরেজিতে লিখিত ছিল; কিন্তু তাহার উর্দু তর্জমা তিনি সংবর্ধনা-সভায় পাঠ করিলেন।[২]

এই অগস্ট মাসের গোড়ার দিকে কবি ইংলন্ডের অধ্যাপক গিলবার্ট মারে'র[৩] নিকট হইতে একখানি দীর্ঘ পত্র পান; মারে গ্রীকভাষা-সাহিত্য ও দর্শনের পণ্ডিত, তাঁহার নাম য়ুরোমেরিকার সুধীসমাজে সুপরিচিত। বহুকাল হইতে তিনি রবীন্দ্রনাথের আদর্শবাদের পোষক এবং ভারতের স্বায়ত্তশাসন লাভের সমর্থক। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর পর্বে জাতিতে জাতিতে হিংসা বিদ্বেষ দেখিয়া যে মুষ্টিমেয় মনীষী ব্যথিত ও উদ্বিগ্ন হন, তাঁহাদের অন্যতম অধ্যাপক মারে। রবীন্দ্রনাথ মারে'র পত্রের দীর্ঘ উত্তর দান করেন। মারে'র ও কবির দুইটি পত্র একত্র করিয়া লীগ্ অব্ নেশনসের অন্তর্গত International Institiute of Intellectual Co-operation উপসমিতি কর্তৃক একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হয় (১৯৩৫ জানুয়ারি)। মারে'কে লিখিত পত্রমধ্যে কবি বলেন, "When I read some of the outstanding

১ ১১ ও ১২ অগস্ট ১৯৩৪ ॥ ২৬ ও ২৭ শ্রাবণ ১৩৪১ দুই দিন অভিনয় হয়।

২ Visva-Bharati News III. 1934, September.

৩ Gilbert Murray (1866 - 1957), British classical scholar; Professor of Greek, Glasgow & Oxford Universities; Professor of Poetry, Harvard University: interested in protection of minorities; author of many books.

modern books published after the war [World War I] I realize how the brighter spirits of young Europe are now alive to the challenge of the times"। ভবিষ্যতের প্রতি কবির অসীম বিশ্বাস; সেই বিশ্বাসবলে লিখিলেন, "I feel proud that I have been born in this great age"। এই নূতন ভাবুকদল কাহারা? পুরাতন রাজনীতি সমাজনীতি অর্থনীতির সমর্থক নিশ্চয় ইঁহারা নহেন। আর, যাঁহারা য়ুরোপের রাজনীতিতে 'যুদ্ধং দেহি' রব তুলিতেছেন তাঁহারাই বা কাহারা?

সিংহল হইতে প্রত্যাবর্তন ও পুনরায় মাদ্রাজ যাত্রার মাঝে যে তিন মাস কবি শান্তিনিকেতনে বাস করেন, সে সময়ে সন্ধ্যাকালে প্রায়ই আশ্রমবাসীদের কাছে কিছু-না-কিছু পড়িয়া শোনান। টেনিসন ব্রাউনিং প্রভৃতির কাব্য আবৃত্তি করেন এবং তার পর সেইসব অংশের বাংলা অনুবাদ করিয়া যান। ব্রাউনিং-এর ন্যায় দুর্বোধ কাব্যকে কী সহজভাবে ভাষান্তরিত করিয়া যাইতেন— ভাবিলে আশ্চর্য বোধ হয়। এই সান্ধ্যসভার স্মৃতি সমসাময়িকদের জীবনে অমূল্য সম্পদ।

আশ্বিনের (১৩৪১) গোড়ায় কবিকে কলিকাতায় আসিতে হইল— বাসন্তী কটন মিল্‌সের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে। সার্ নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের বাড়ির ছেলেরা এই কাপড়ের কলটির স্থাপয়িতা। কবির ভরসা, ধনীদের অনুরোধ রক্ষা করিলে তাঁহারাও বিশ্বভারতীর প্রতি নেক্‌নজর দিতে পারেন। সেই আশায় তিনি এইসব কার্য করিতে স্বীকৃত হইতেন। কিছুকাল পূর্বে এই ভরসাতেই বিড়লাদের বেঙ্গল স্টোর্স উন্মোচন ও কেশোরাম কটন মিলস্ পরিদর্শন করেন। দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের প্রসারের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি বরাবরই ছিল।

ইতিমধ্যে কথা হইয়াছে পূজাবকাশে 'শাপমোচন'-অভিনয়কারীদের লইয়া কবি মাদ্রাজ যাইবেন। ক্ষুদ্র গীতনাট্য-খানি নাড়াচাড়া করিতে করিতে কবিচিত্ত কখন সাড়া দিয়া উঠিল। শাপমোচনে নূতন গান নাই, উহার ভাবটিও পুরাতন। কিন্তু কবির মনে এই আলোচনার ফলে কবিতা ও গান যুগপৎ আবির্ভূত হইল।

বহুকাল পূর্বে বাউলের এক গানে শুনিয়াছিলাম "ভিতরে রস না জমিলে, বাইরে কি গো রূপ ধরে"। 'রাজা' ও 'শাপমোচনে'র মর্মকথা আছে এই পংক্তি দুটির মধ্যে। রানীর অন্তরে যথার্থ রসের সঞ্চার হইলে রাজার স্বরূপটি তাহার হৃদ্‌গত হইয়াছিল। কবির মনে সেই ভাবনাই নানারূপে আসা-যাওয়া করিতেছে আজ বর্ষাশেষে, শরতের প্রতীক্ষায়। 'শরৎ'-এর আবির্ভাবের পূর্বে 'অবরুদ্ধ ছিল বায়ু'; বাহির ও অন্তর-প্রকৃতির সংগ্রামের পর আলোকের মাঝে আপনাকে পাওয়া ও আপনাকে জানা একার্থক হইয়া যায়। কবি (২৭ ভাদ্র ১৩৪১) 'শরৎ' নামে একটি যে কবিতা লেখেন[১] তাহার একাংশে আছে—

যেন আমি তীর্থযাত্রী অতিদূর ভাবীকাল হতে
মন্ত্রবলে এসেছি ভাসিয়া। উজান স্বপ্নের স্রোতে
অকস্মাৎ উত্তরিনু বর্তমান শতাব্দীর ঘাটে
যেন এই মুহূর্তেই। চেয়ে চেয়ে বেলা মোর কাটে।

১ শরৎ, ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪; বিচিত্রা ১৩৪১ ভাদ্র। পরে এই কবিতাটি 'প্রান্তিক'এর অন্তর্গত হয় (১৫ সংখ্যক)।

আপনারে দেখি আমি আপন বাহিরে, · ·
অক্লান্ত বিস্ময়
যার পানে চক্ষু মেলি তারে·যেন আঁকড়িয়া রয়
পুষ্পলগ্ন ভ্রমরের মতো। এই তো ছুটির কাল—
সর্ব দেহমন হতে ছিন্ন হল অভ্যাসের জাল,
নগ্ন চিত্ত মগ্ন হল সমস্তের মাঝে।

পরদিন লিখিত 'প্রলয়' (২৮ ভাদ্র ১৩৪১, বীথিকা) কবিতায় সেই অন্ধকার-আলোকের সংগ্রাম—

আঁধারের দূরত্বই কাছে থেকে রচে ব্যবধান,
চেতনা আবিল করে, তার হাতে নেই পরিত্রাণ
শুধু এই মাত্র নয়—
সে-যে সৃষ্টি করে নিত্য ভয়।
ছায়া দিয়ে রচি তুলে আঁকাবাঁকা দীর্ঘ উপছায়া,
জানাবে অজানা করে, ঘেরে তারে অর্থহীনা মায়া।

'শাপমোচনে' রানীর এই সংগ্রাম, এই ভ্রান্তি হইতেছে— যখন সে রাজাকে চোখে দেখিতে চাহিতেছে।

মন কাব্যরসে যথার্থ মগ্ন হইলে যে কয়টি গান ও কবিতা উৎসারিত হইল, তাহা ভাবে ভাষায় রবীন্দ্র-সংগীতের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান পাইয়াছে।[১] এই গানগুলি শাপমোচনের সমস্যা-পরিপূরক— নূতন অনুভূতি— অবচেতনের সুরতরঙ্গ।

মাদ্রাজ ও কাশী

পূজাবকাশের জন্য শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় বন্ধ হইল (১০ অক্টোবর ১৯৩৪ ॥ ২৩ আশ্বিন ১৩৪১)। কবির নিমন্ত্রণ আসিয়াছে মাদ্রাজ হইতে, সেখানে শান্তিনিকেতনের শিল্পপ্রদর্শনী ও গীতোৎসব হইবে।

২১ অক্টোবর কবি মাদ্রাজ পৌঁছিলেন, আদেরে থিয়োজফিক্যাল সোসাইটিতে কবির থাকিবার ব্যবস্থা হয়। এইখানে তখন আশা দেবী ও আরিয়াম আর্যনায়কম্ আছেন। পরদিন অপরাহ্ণে মাদ্রাজ কর্পোরেশন হইতে কবিকে মানপত্র দান করা হইল ; কবি প্রত্যুত্তরে বিশ্বভারতীর আদর্শ ও উহা প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়োজনীয়তা কী, তৎসম্বন্ধে বলিলেন, তৎপর দিবস (২৩ অক্টোবর) মিড্ল্যানড থিয়েটর হলে ছাত্রসমাজের সম্মুখে কবির বক্তৃতা, সভাপতি এস.

১ হে সখা, বারতা পেয়েছি মনে মনে (১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ ॥ ৩১ ভাদ্র ১৩৪১। শাপমোচন সংযোজন—রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২, পৃ. ১০৬)। বঁধু, কোন্ মায়া লাগল চোখে (২০ সেপ্টেম্বর, পৃ. ১০৬)। সুদূরের বন্ধু সুরের দূতারে (২১ সেপ্টেম্বর, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২, পৃ. ১০৭-০৮)। ক্ষণিক—চৈত্রের রাতে যে মাধবী-মঞ্জরী (২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ ॥ ৯ আশ্বিন ১৩৪১। দ্র. বীথিকা পৃ. ৬৫-৬৬)। ওরে চিত্ররেখা-ডোরে বাঁধিল (২৭ সেপ্টেম্বর)। শাপমোচন সংযোজন, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২, পৃ. ১০৮)। মায়াবন-বিহারিণী হরিণী (২৯ সেপ্টেম্বর, পৃ. ১০৯)। কাছে থেকে দূর রচিল কেন (৩০ সেপ্টেম্বর, পৃ. ১০৯)। কোন্ গহন অরণ্যে তারে এলেম হারায়ে (৩০ সেপ্টেম্বর, পৃ. ১১০)।

সত্যমূর্তি। ছাত্ররা বিশ্বভারতীর জন্য এক সহস্র মুদ্রা দান করিল। ইহার পর ভারতীয় নারীসমাজ ও 'কুইন মেরি' কলেজের ছাত্রীদের দ্বারা কবি-সংবর্ধনা হইল।

এদিকে গীতোৎসবের জন্য শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা আসিয়া পৌঁছিল (২৫শে); নন্দলাল বসু ও তাঁহার ছাত্ররাও কলাভবনের শিল্পনিদর্শন লইয়া উপস্থিত। শ্রীকুমারমঙ্গলের সভাপতিত্বে (২৬ অক্টোবর) চিত্র ও শিল্পপ্রদর্শনী উন্মোচিত হইল।

অপর দিকে অন্যত্র শাপমোচন গীতিনাট্যের অভিনয় শুরু হইয়াছে; চারি দিন এই অভিনয় হয় (২৭, ২৮, ৩০ ও ৩১ অক্টোবর ১৯৩৪)। শেষ দিনে গভর্নরের পত্নী দর্শকদের মধ্যে ছিলেন।

মাদ্রাজের অভিনয়াদি সম্বন্ধে প্রতিমা দেবীকে কবি লিখিতেছেন, "আমাদের এখানকার পালা আজ শেষ হবে। জিনিসটা এবার সবশুদ্ধ অন্যবারের চেয়ে অনেক বেশি সম্পূর্ণতর হয়েচে। কিন্তু এখানকার লোকের মন অসাড়। যথেষ্ট উৎসাহ পেয়েচি বল্‌লে অত্যুক্তি হবে।"[১]

মাদ্রাজে দিন বারো থাকিয়া (২১ অক্টোবর - ২ নভেম্বর) কবি সদলে ওয়ালটার চলিলেন। এবার মাদ্রাজ-অভিযানে বিশ্বভারতীর বিশেষ কিছুই লাভ হয় নাই।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় খুলিবার (১১ নভেম্বর ১৯৩৪) পূর্বে কবি আশ্রমে ফিরিয়াছেন (৭ নভেম্বর)। সাহিত্য-সৃষ্টির নূতন প্রেরণা নাই; একটি মাত্র কবিতা চোখে পড়ে 'প্রশ্ন'।[২]

ইতিমধ্যে কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় হইতে কবির আহ্বান আসিয়াছে, সেখানে কন্‌ভোকেশন বা সমাবর্তন -উৎসবে তাঁহাকে পৌরোহিত্য করিতে হইবে। সেইসঙ্গে কাশীতে থিয়োজফিক্যাল সমাজের নবপ্রতিষ্ঠিত মন্টেসরি (Montessori) স্কুল উন্মোচন করিবার জন্যও অনুরোধ আসিয়াছে[৩], যাত্রার-আয়োজন হইয়াছে; এমন সময় সংবাদ আসিল হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চান্‌সেলর মদনমোহন মালব্য অসুস্থ হওয়ায় সমাবর্তন-উৎসব স্থগিত হইয়াছে। কিন্তু কবির মন যখন একবার চলিতে শুরু করে, তখন তাহাকে ফিরানো কঠিন। তিনি তাঁহার সেক্রেটারি অনিলকুমারকে লইয়া কাশী রওনা হইয়া গেলেন (২৯ নভেম্বর ১৯৩৪)। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইদিন ও রাজঘাট বিদ্যালয়ে দুইদিন কাটাইয়া ৪ ডিসেম্বর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

১ চিঠিপত্র ৩, পত্র ৪৩।

২ ১৫ নভেম্বর ১৯৩৪। শেষ সপ্তক সংযোজন, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ. ১১৬-১৭)। দ্র. শেষ সপ্তকের ৩৫ সংখ্যক কবিতা।

৩ Speech at the Opening of the Montessori School, Rajghat, Benares on the 2nd December 1934—Visva Bharati News. III. 1934, December, pp. 42-44। কিছুদিন পূর্বে কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস্‌চান্‌সেলর শ্রীযুক্ত ধ্রুব আশ্রমে আসিয়া কবিকে নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছিলেন।

রাজঘাট বিদ্যাভবনের কর্তৃপক্ষ (থিয়োজফিক্যাল সোসাইটি) এই প্রতিষ্ঠানের গৃহাদির সন্নিবেশ ও স্থাপত্যাদি পরিকল্পনা রচনার ভার দিয়াছিলেন বিশ্বভারতীর অন্যতম শিল্পী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ করের উপর। সুরেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে তাঁহার প্রতিভা বিকাশের অনুকূল ক্ষেত্র পাইয়াছিলেন; রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সৌন্দর্যরসজ্ঞ ও পৃষ্ঠপোষক পাইয়া তিনি নীরবে এই সাধনা এতদিন করিয়াছেন। বাহির হইতে তাঁহার সমাদর আসিতেছে, বিশ্বভারতী যেমন সংগীতে নৃত্যে চিত্রকলায় ভারতের আর্টএর নবজন্মে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে তেমনি সুরেন্দ্রনাথের স্থাপত্যরুচি বিশ্বভারতীর একটি বিশেষ দান বলিয়া একদিন স্বীকৃত হইবে। ইতিপূর্বে চিত্তরঞ্জনের কলিকাতায় স্মৃতিস্তম্ভের পরিকল্পনার জন্য সুরেন্দ্রনাথের আহ্বান আসে। এই স্তম্ভ নির্মিত হইয়া গেলে লোকে জানিতে পারে ইহার পরিকল্পক (designer) সুরেন্দ্রনাথ। কাশী রাজঘাটের পর মাদ্রাজে থিয়োজফিস্টরা তাঁহাদের একটি বাড়ি সুরেন্দ্রনাথের পরিকল্পনা-মতো নির্মাণ করিয়াছেন। আহমদাবাদ ওয়ার্ধা ও ডি. ভি. সি. হইতেও তাঁহার আহ্বান আসিয়াছে। বিশ্বভারতীর এই একটি সৃষ্টির দিক বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

ইতিমধ্যে বিশ্বভারতীর ব্যবহারিক জীবনে কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পাঠকের স্মরণ আছে, বিশ্বভারতীর উত্তর বিভাগ বা বিদ্যাভবনের ব্যয়ের অনেকটা নির্বাহ হইত বরোদারাজ সাহজীরাও গায়কবাড়ের বার্ষিক দান হইতে। ১৯২৪ সাল হইতে ১৯৩৪ মার্চ পর্যন্ত বিশ্বভারতী ছয় হাজার টাকা করিয়া প্রতি বৎসর পাইয়া আসিয়াছিল। এপ্রিল মাস হইতে ঐ দান বন্ধ হইয়া গেলে কবি অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করিলেন। কোথা হইতে কেমন ভাবে এই ঘাটতি পূরণ হইবে ভাবিয়া আকুল। বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ বিধুশেখর ভট্টাচার্য মনে করিলেন, তাঁহার পক্ষে আশ্রমে থাকার অর্থই হইতেছে কবির উদ্বেগ বৃদ্ধি করা। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-বিভাগের একটি অধ্যাপকের পদ খালি হয় ও তথাকার কর্তৃপক্ষ বিধুশেখরকে ঐ পদ গ্রহণের জন্য আহ্বান করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তাঁহার জ্ঞান-সাধনার এই স্বীকৃতি গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। তবে কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের আর্থিক উদ্বেগ শমিত করিবার জন্যই বিধুশেখর আশ্রম ত্যাগ করিলেন এ কথা বলিলে বোধ হয় একটুকু বেশি বলা হইবে। আসলে, আদর্শের বিরোধই এই বিচ্ছেদের অন্যতম কারণ। কিছুকাল হইতে বিধুশেখর অন্তরে অনুভব করিতেছিলেন যে, মহর্ষির এমন-কি রবীন্দ্রনাথের পুরাতন আশ্রম-আদর্শ ও বিশ্বভারতীর মূল আদর্শ হইতে ক্রমশই সকলে সরিয়া আসিতেছেন। ইহা অবশ্য দৃষ্টিভঙ্গির কথা। চিরদিন এক পৌরাণিক আদর্শে সীমাবদ্ধ থাকিতে না পারা অস্বাভাবিক নহে। আদর্শের যেমন উদ্‌ভব হয় তেমনই তাহার বিকাশ পরিণতি, এমন-কি মৃত্যুও ঘটে। আবার, আদর্শও ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়, এবং কালে এমন রূপ গ্রহণ করে যে, তাহাকে চেনা যায় না, যেমন হরিদ্বারের গঙ্গোত্রী ও সাগর-সংগমের গঙ্গা একও বটে, ভিন্নও বটে; বহুধারায় মিলিত মূল স্রোতোধারা হঠাৎ antithesisও মনে হইতে পারে। বিধুশেখর খুঁজিতেছিলেন তাঁহার পুরাতনকে; কিন্তু জগতে চলমান প্রতিষ্ঠানে সেই অচল মূর্তি আশা করিলে দুঃখ পাইতে হয়। বিধুশেখর সেই complex হইতে কষ্ট পাইতেছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি চাকুরী লইয়া গেলেন। আদর্শের সহিত বিরোধের প্রশ্ন সেখানে গৌণ।

শান্তিনিকেতনের সহিত তাঁহার দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের যোগ ছিন্ন করিতে তাঁহার যেমন ব্যথা লাগিয়াছিল, কবিরও কিছু কম লাগে নাই, কারণ শাস্ত্রী মহাশয়কে দিয়া তাঁহার 'বিদ্যাসমবায়'এর সূত্রপাত। পূজাবকাশের পর ১৯ নভেম্বর ১৯৩৪ বিধুশেখর আশ্রম ত্যাগ করিয়া গেলেন।

বিধুশেখর আশ্রম ত্যাগ করিয়া গেলে বিদ্যাভবনের গবেষণাদি যেমন দীর্ঘকালের জন্য স্তব্ধ হইয়া যায়, চারি মাস পূর্বে (১৩৪১ শ্রাবণ) দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন ছাড়িয়া যাওয়াতে সংগীতবিভাগও তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দিনেন্দ্রনাথের সহিত আশ্রমের সম্বন্ধ দীর্ঘ কালের, মাঝে মাঝে তাহার ছেদ পড়িয়াছিল সত্য; কিন্তু কবির সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ তাহা কেবলমাত্র আত্মীয়তার সম্বন্ধ নহে, সংগীতে ভাষার সহিত সুরের সম্বন্ধের ন্যায় এই যোগ ছিল নিবিড়। লোকের এইসব আসা-যাওয়া রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সহজ হইয়া গিয়াছে; কত প্রিয়জন তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছে; কিন্তু সে-বিষয়ে কোনো দিন অভিযোগ করিতে শুনি নাই। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, আশ্রমের মধ্যে যদি কোনো সত্য নিহিত থাকে, তবে তাহা শত আঘাতেও অক্ষুণ্ণ রহিবে; নৈর্ব্যক্তিক মনে তিনি তাঁহার সৃষ্টিকে দেখিতে পারিতেন। 'যা হারিয়ে যায়, তা আগলে বসে' থাকা ও তাহার জন্য আক্ষেপ করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। বিদ্যাভবনের ভার দিলেন ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের উপর, সংগীত-পরিচালনার জন্য আহ্বান করিলেন রসায়নের অধ্যাপক শৈলজারঞ্জন মজুমদারকে; শান্তিদেব ঘোষ পূর্ব হইতেই এই বিভাগের সহিত যুক্ত ছিলেন। তাঁহার উপরও অনেকখানি ভার পড়িল। ইনি দিনেন্দ্রনাথের হাতে-গড়া, বহুকাল শিক্ষানবিশী করিয়া এখন সুদক্ষ হইয়াছেন।

শান্তিনিকেতনে পৌষ-উৎসব যথাবিধি নিষ্পন্ন হইল। বিশ্বভারতীর বার্ষিক পরিষদের পরিচালনার কার্য তিনিই করিলেন (১৯৩৪)। প্রাক্তন ছাত্রদের বার্ষিক সভায় কবি তাঁহার ভাষণে বলেন, "আমার আজ বিপদের দিন। বিচিত্র আঘাতে ও বিরুদ্ধতায় আজ আমার মন ক্লান্ত, ক্লিষ্ট।" এই মনোবিকারের কারণ আশ্রমের দুইজন পুরাতন সঙ্গী তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন— দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিধুশেখর ভট্টাচার্য। এই ভাষণে কবি আরও বলেন, "ভাবীকালের জন্য এই আশ্রমে আমি প্রচুর স্বাধীনক্ষেত্র প্রসারিত রেখেছি— এখানে কোনো বিশেষ ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিনি। কালে কালে মানুষের পরিবর্তন ঘটে থাকে— যারা একই কালকে জীবনে স্থায়ী করতে চায়, তারা মৃত্যুর সঙ্গে রফা করে। তাই এটা আমি কখনো আশা করিনি যে এখানে যারা বয়স্ক ছাত্র ও অধ্যাপক আছেন তাঁদের মনকে আমি একটা ছাঁচে ফেলা রীতিতে চালনা করব। ভাবীকালের বিকাশের জন্য প্রশস্ত পথ আমি রেখেছি। • • আমি সবাইকে স্থান দিয়েছি।"— প্রাক্তনী, পৃ. ১-৯।

বহুকাল পরে এন্‌ড্রুস শান্তিনিকেতনে ফিরিয়াছেন, খ্রীষ্টোৎসবের দিন তিনি মন্দিরের উপাসনা করিলেন। কবি খ্রীষ্ট সম্বন্ধে লিখিলেন *The Son of Man*, 'মানবপুত্রে'র অনুবাদ।[১]

উৎসবান্তে কবি কলিকাতায় গেলেন; ২৭ ডিসেম্বর প্রথমে প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের এবং পরে সিনেট হাউসে নিখিল-বঙ্গ সংগীত-সম্মেলনের উদ্বোধন করিলেন; বলা বাহুল্য, উভয় স্থলেই বক্তৃতা করিতে হয়। সংগীত-সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের অন্যতম ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি সে সময় কলিকাতায় রবীন্দ্রসংগীতপ্রচার-কার্যেই লিপ্ত আছেন। নিখিল-বঙ্গ সংগীত-সম্মেলন সম্বন্ধে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখিতেছেন, 'আমি তাঁকে [রবীন্দ্রনাথকে] একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করবার অনুরোধ জানাই। তিনি সে-অনুরোধ রক্ষা করেন।' অধ্যাপক মহাশয় 'সুর ও সঙ্গতি' গ্রন্থে এই বক্তৃতার সারমর্ম দিয়াছেন (পৃ. ৯৬), সমগ্র ভাষণটি কোথায়ও লিপিবদ্ধ হয় নাই। কবির এই বক্তৃতা অধ্যাপক মহাশয় ও তাঁহার সমভাবের ভাবুকদের খুবই ভালো লাগে; কিন্তু সাধারণ লোক যাহারা ওস্তাদদের গান শুনিবার জন্য জমায়েত হইয়াছিল, তাহারা কবির বক্তৃতা ধৈর্যের সহিত শুনিতে পারে নাই।

কয়েক দিন পরে ধূর্জটিপ্রসাদকে এক পত্রে (৭ জানুয়ারি ১৯৩৫) কবি এই বক্তৃতার কথা তুলিয়া সংগীত সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করেন (সুর ও সঙ্গতি, পৃ. ৫-৮)। কিন্তু সংগীত সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা চলে উত্তর-ভারত ভ্রমণের পর, সে কথা যথাস্থানে আসিবে।

১ Visva-Bharati News II, December 1934।

চার অধ্যায়

মাদ্রাজ হইতে ফিরিয়া কবি তাঁহার উপন্যাস 'চার অধ্যায়' প্রকাশের ব্যবস্থা করিলেন ; খ্রীষ্টমাস্-সপ্তাহে উহা বাহির হইল ; পাঠকের স্মরণ আছে ১৯৩৪ সালের জুন মাসে দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণ কালে 'চার অধ্যায়' লেখেন ; তার পর দেশে ফিরিয়া তাহার উপর অনেকবার কলম চালান ; মাঝে কয় ফরমা ছাপাও হয় ; সেগুলি পছন্দ হয় না বলিয়া বাদ যায়। তার পর লিখিয়া কাটিয়া বই ছাপাইলেন। গল্পের বিষয়বস্তু বাঙলার বিপ্লব-সংক্রান্ত ; লোকে বলিল, বই গবর্মেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিবেন। ছাপা বই পড়িয়া থাকিল কয়েকমাস। তারপর বন্ধুবান্ধব হিতাকাঙ্ক্ষীদের কথা অগ্রাহ্য করিয়া কবি বই প্রকাশ করিলেন। বই বাহির হওয়ামাত্র দেশের মধ্যে ভীষণ একটা আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। এই বই সম্বন্ধে যে পরিমাণ সমালোচনা হইয়াছে, তাহা 'ঘরে-বাইরে'র পর কবির অন্য কোনো বই সম্বন্ধে হয় নাই। এক বৎসরের মধ্যে সকল কপি বিক্রীত হইয়া যায়। লোকে বলিতে আরম্ভ করিল গবর্মেণ্ট এই বই কিনিয়া অন্তরীণাবদ্ধদের দিতেছেন, বিপ্লবদমনের জন্য এই বই সরকারের উপযুক্ত অস্ত্র হইয়াছে। ইহা 'নিষিদ্ধ' পুস্তক হইতে পারে আশঙ্কায় প্রকাশ বন্ধ রাখা হইয়াছিল ; পরে প্রকাশিত হইলে শোনা গেল যে, ইহা সরকারের বিপ্লবদমনের প্রচার-পুস্তকরূপে ব্যবহৃত হইতেছে! আসলে রচনাটি একটি গল্পমাত্র। গল্প ও সাহিত্য হিসাবেই ইহা বিচার্য।[১]

এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে কোনো কোনো পত্রিকায় বলা হইয়াছিল যে, স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দের একখানি বইএর ছায়াবলম্বনে ইহা লিখিত! অদ্ভুত কথা ; কবি কস্মিন্‌কালে এ বই চোখেও দেখেন নাই ; খুব নামজাদা বাংলা লেখকের লেখা ছাড়া, বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ না হইলে তিনি প্রায় সাধারণ বই পড়িবার সময় পান না। ভূমিকায় ব্রহ্মবান্ধবের নাম দেওয়া সমীচীন হয় নাই— এই ছিল সমসাময়িক মত ; দ্বিতীয় সংস্করণে ভূমিকাটি বাদ দেওয়া হয়।

গল্পটি প্রকাশিত হইলে ইহার ইংরেজি তর্জমা করা হয়। অমিয় চক্রবর্তী তখন বিলাতে, কবি তাঁহাকে লিখিতেছেন, "তোমার সাহিত্যিক বন্ধুরা নিশ্চয় তর্জমাটা দেখেচেন, বিশুদ্ধ সাহিত্যের তরফ থেকে তাঁরা কী বিচার করেন জানতে ইচ্ছা করে।... ওখানকার সমঝদারদের মত নিয়ে যদি বোঝো এটা কেবলমাত্র চলনসইয়ের চেয়ে বেশি নয়, অথবা তার চেয়েও কম তাহ'লে ছাপতে দিয়ো না।"[২]

'চার অধ্যায়' রবীন্দ্রনাথের শেষ উপন্যাস ; 'দুই বোন' 'মালঞ্চ' ও নাটক 'বাঁশরী'র অনতিপরে ইহা রচিত। দুই বোন ও মালঞ্চ নাটক না হইলেও নাটকীয় উপাদানে গড়া, নাটক 'বাঁশরী' ক্ষুদ্র উপন্যাসধর্মী। 'চার অধ্যায়ে' উপন্যাস ও নাটকের দুই ধর্মই রক্ষিত হইয়াছে। এটিকে একখানি ভালো নাটক, এমনকি ভালো ফিল্‌ম করা যায়— তাহার অনেক উপাদান ইহাতে বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত উপন্যাসের ন্যায় ইহাতেও পাত্রপাত্রীর সংখ্যা খুব কম— ইন্দ্রনাথ কানাই গুপ্ত এলা ও অতীন্দ্র বা অন্তু ; অখিল ও বটু আনুষঙ্গিক।

বাংলাদেশের অগ্নিযুগের বিপ্লবকাহিনীর পটভূমিতে কাহিনীর পত্তন। ইন্দ্রনাথ তাহার কেন্দ্রে ; কবি ইন্দ্রনাথকে করিয়াছেন খানিকটা সবজান্তা, সববিষয়ে পণ্ডিত, সর্বকর্মা— যেমন 'পথের দাবী'র সব্যসাচী। ইন্দ্রনাথ দিগ্‌গজ বিজ্ঞানী, সমস্ত য়ুরোপ ভ্রমণ করিয়াছেন ; উদ্ভিদ-বিজ্ঞান ও ভূতত্ত্ব দুই-ই সমান জানেন, ফরাসী জারমান ভাষায় সুপণ্ডিত। আবার ডাক্তারি পাস, জুজুৎসু-বীর। গীতাও আওড়ান। 'বাঁশরী'র পুরন্দরও এই শ্রেণীর মানুষ,

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'চার অধ্যায় সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ', ৮ চৈত্র ১৩৪১। পরিবর্তিত ভূমিকা ও কৈফিয়ৎ দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ. ৫৪১-৪৫।

২ পত্রগুচ্ছ. ২৯ চৈত্র ১৩৪১। দ্র. কবিতা ১৩৫০ কার্তিক, পৃ. ৪৫-৪৬।

"কেউ দেখেছে তাকে কুম্ভমেলায়, কেউ দেখেছে গারো পাহাড়ে ভালুক শিকারে। কেউ বলে ও য়ুরোপে অনেক কাল ছিল।"

ইন্দ্রনাথ বিপ্লবের নেতা; স্বভাব দুর্দমনীয়, নির্মম হইতে তাহাকে বাধে না; বিপ্লবসৃষ্টির জন্য উৎসুক কিশোর ও যুবকের দল তাহার পাশে জমা হয়, আটকা পড়ে তাহার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে। তাহাদের দিয়া 'রাজনৈতিক' ডাকাতি হত্যা প্রভৃতি চালনা করেন; এসবের উদ্দেশ্য অর্থসংগ্রহ— দলের কাজের জন্য। ইন্দ্রনাথ বলেন, তাঁহার সমস্ত কাজ ইম্‌পার্সোনাল অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিক— ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ ইহার সহিত জড়িত নাই। তিনি বলেন, "হারজিতের কথা ভাবা একেবারে ছেড়ে দিয়েছি··আমার ডাক শুনে কত মানুষের মতো মানুষ মৃত্যুকে অবজ্ঞা করে চারিদিকে এসে জুটল।··গোলামি-চাপা এই খর্ব মনুষ্যত্বের দেশে মরার মতো মরতে পারাও যে একটা সুযোগ।··যা অনিবার্য তাকে আমি অক্ষুব্ধ মনে স্বীকার করে নিতে পারি।··ডুবো জাহাজে ঝড়ের মুখে যে-কয়জনকে পাই ডুবতে ডুবতে তাদের নিয়েই আমাদের জিত।" তারপরে গীতার কথা বলেন, "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" অর্থাৎ কাহার শাক-ভুট্টার ক্ষেত জলে ডুবিল, সে-চিন্তা 'বিভূতির' (মুক্তধারা) নয়। উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য ভালো-মন্দের বিচার, লৌকিক ধর্মাধর্মবোধের খুঁৎখুঁতানি এই শ্রেণীর নেতার মতে দুর্বলতার চিহ্ন, অভীষ্টসিদ্ধির অন্তরায়; অতএব রাজনীতির নামে unscrupulous বা বিবেকহীন হওয়ায় অধর্ম হয় না।

ইন্দ্রনাথ 'দলে'র জন্য এলাকে সংগ্রহ করিয়াছে; যেমন সন্ন্যাসী পুরন্দর সুষমাকে লইয়া 'বাঁশরী'তে করিয়াছেন ইন্দ্রনাথ এখানে বলিতেছেন, "কেমন করে তুমি নিজে বুঝবে তোমার হাতের রক্তচন্দনের ফোঁটা ছেলেদের মনে কী আগুন জালিয়ে দেয়।" তাহার রূপে, তাহার গুণে আকৃষ্ট হয় ছেলের দল; অন্তুও আসে এলার টানে। ইন্দ্রনাথ ভালো করিয়া জানেন অন্তু "বাঁধা পড়েছে নিজেরই সংকল্পের বন্ধনে। ওর মন থেকে দ্বিধা কোনো কালেই মিটবে না, রুচিতে ঘা লাগবে প্রতি মুহূর্তে, তবু ওর আত্মসম্মান ওকে নিয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত।"

অন্তু চায় এলাকে একেবারে আপনার করিয়া পাইতে। এলা বলে সে দেশের কাছে বাগ্‌দত্তা, সংসারধর্মে সে আবদ্ধ হইবে না এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল ইন্দ্রনাথের কাছে। সেই হইতে অন্তু দলের কাজে উৎসর্গ-জীবন এলার আকর্ষণে। কিন্তু দলের মধ্যেও ভাঙন দেখা দিল; বটু পুলিশের কাছে যায়, দলের মধ্যেও ঘোরে। কানাই গুপ্তর পরামর্শে দলের ছেলেদের ছড়াইয়া দেওয়া হইল। অবশেষে এমন একদিন আসিল যখন স্পষ্ট জানা গেল বটুর প্ররোচনায় এলাকে পুলিসে ধরিবে; সে দলের কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যুক্ত না থাকলেও, ছেলেদের সকলকে জানে। দলপতির সন্দেহ হইল যে, পুলিসের অত্যাচারে এলা সমস্তই ব্যক্ত করিয়া দিতে পারে। সেইজন্য অন্তুর প্রতি আদেশ হইল এলাকে হত্যা করিবার। নিষ্ঠুর ইঙ্গিতে গল্পের শেষ হইল।

ঘটনার দিক হইতে 'চার অধ্যায়ে'র বিষয়বস্তু এই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গল্প সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন— বিপ্লব-কাহিনী বর্ণনা তাঁহার উদ্দেশ্য নয়। বাংলার সন্ত্রাসবাদের রক্তবর্ণ পটভূমিকায় দুটি তরুণ-তরুণীর প্রেমের উন্মেষ, উন্মীলন ও আত্মঘাতী পরিণতি— এই হল 'চার অধ্যায়'। অন্তু-এলার কাহিনী ইতিহাস নহে, লিরিকধর্মী কাব্যের অনুরূপ। বুদ্ধদেব বসু লিখিতেছেন, "এমন সুতীব্র লিরিক 'শেষের কবিতা' 'দুই বোন' 'মালঞ্চ' কোনোটিই নয়;··· এলা-অন্তুর প্রণয়োপাখ্যানেই 'চার অধ্যায়ে'র মহিমা।" তিনি আর-একটি কথা বলিয়াছেন, সেটি রবীন্দ্রনাথের একটি কথাকে আশ্রয় করিয়া।[১] "এ-কথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথের অন্য কোনো রচনায় স্ত্রী-পুরুষের প্রণয়-বাসনার

১ শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র, ২৯ চৈত্র ১৩৪১। দ্র. কবিতা ১৩৫০, পৃ. ৪৫।

এমন তীব্রতা এমন স্বচ্ছ হয়ে প্রকাশ পায়নি, যেমন পেয়েছে 'চার অধ্যায়ে'। তাঁর গল্পবইয়ের মধ্যে একমাত্র এখানেই তিনি স্বীকার করেছেন যে ভালোবাসা বর্বর।"

রবীন্দ্রনাথ একখানি পত্রে বলিয়াছেন, "চার অধ্যায়ের যে দিকটা আমাদের পাঠককে ভোলায় সে ওর কবিতা অংশ। ওর ভাষায় লাগিয়েছি জাদু, সেইটের ভিতর দিয়ে তারা যে জিনিসটা পায় সেটা ঠিক গল্পের বাহন নয় অন্তু আর এলার ভালোবাসার বৃত্তান্তটা লিরিকের তোড়া রচনা— নবেলের নির্জলা আবহাওয়ায় শুকিয়ে যেতে হয়তো দেরী হবে।" 'চার অধ্যায়ে'র কৈফিয়তে কবি লিখিয়াছেন, এই উপন্যাস "রচনার কোনো বিশেষ মত বা উপদেশ আছে কিনা সে-তর্ক সাহিত্য-বিচারে অনাবশ্যক। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এর মূল অবলম্বন কোনো আধুনিক বাঙালি নায়ক-নায়িকার প্রেমের ইতিহাস। সেই প্রেমের নাট্যরসাত্মক বিশেষত্ব ঘটিয়াছে বাংলাদেশের বিপ্লবপ্রচেষ্টার ভূমিকায়। এখানে সেই বিপ্লবের ঝোড়ো হাওয়া দুজনের প্রেমের মধ্যে যে তীব্রতা যে বেদনা এনেছে সেইটেতেই সাহিত্যের পরিচয়। তর্ক ও উপদেশের বিষয় সাময়িক পত্রের প্রবন্ধের বিষয়।"

এই উপন্যাসের কতকগুলি চরিত্র পুরাতন কয়েকটি চরিত্রকে স্মরণ করাইয়া দেয়। ইন্দ্রনাথের মধ্যে যেমন আছে সন্দীপের আড়ম্বর তেমনি আছে বাঁশরীর পুরন্দরের গুরুগিরির ভাব। পূর্বেই বলিয়াছি 'পথের দাবী'র সব্যসাচীকে মনে করাইয়া দেয়। অখিলের কথা পড়িতে পড়িতে ঘরে-বাইরের অমূল্যকে মনে পড়ে। এলা কবির একটি অদ্ভুত সৃষ্টি।[১]

১ বুদ্ধদেব বসু 'চার অধ্যায়'এর অতি বিস্তারিত সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাতে যেমন ইহার বৈশিষ্ট্য দেখানো হইয়াছে, তেমনি ইহার ত্রুটি কী তাহাও আলোচনা করিয়াছেন। দ্র. কবিতা, ১৩৫০ কার্তিক, পৃ. ১১৮-২৬।

আপন মনে গোপন কোণে
লেখাজোখার কারখানাতে
তুয়ার রুধে বচন কুঁদে
খেলনা আমার হয় বানাতে।
এই জগতে সকাল-সাঁজে
ছুটি আমার অন্য কাজে,
মিলে মিলে মিলিয়ে কথা
রঙে রঙে হয় মানাতে॥
কে গো আছে ভুবন-মাঝে
নিত্যশিশু আনন্দেতে,
ডাকে আমায় বিশ্বখেলায়
খেলাঘরের জোগান দিতে।
বনের হাওয়া সকাল বেলা
ভাসায় সে যে দানের ভেলা,
সেই তো কাঁপায় সুরের কাঁপন
মৌমাছিদের নীল ডানাতে॥

এই পর্বে প্রকাশিত গ্রন্থপঞ্জী

১. অরূপ রতন। নাটক। [১৯২০]। রাজা নাটকের [১৯১০] অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

২. পয়লা নম্বর। গল্প। বৈশাখ ১৩২৭ [১৯২০]।

৩. ঋণশোধ। নাটিকা। [১৯২১]। শারদোৎসবের [১৯০৮] অভিনয়যোগ্য সংস্করণ।

৪. মুক্তধারা। নাটক। বৈশাখ ১৩২৯ [১৯২২]।

৫. লিপিকা। কথিকা। [১৯২২]।

৬. শিশু ভোলানাথ। কবিতা। ১৯২২।

৭. বসন্ত। গীতিনাট্য। ফাল্গুন ১৩২৯ [১৯২৩]। পরে ঋতু-উৎসবে [১৯২৬] সংকলিত হয়।

৮. পূরবী। কবিতা। শ্রাবণ ১৩৩২ [১৯২৫]। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো বা 'বিজয়ার করকমলে'।

৯. গৃহপ্রবেশ। নাটক। আশ্বিন ১৩৩২ [১৯২৫]। 'শেষের রাত্রি' গল্পের নাট্যরূপ।

১০. প্রবাহিণী। গান। অগ্রহায়ণ ১৩৩২ [১৯২৫]।

১১. সংকলন। প্রবন্ধ, পত্র, ডায়ারি ও কথিকা। ৯ অগস্ট [১৯২৫]।

১২. গীতিচর্চা। গান। পৌষ ১৩৩২ [১৯২৫]। 'শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর-সম্পাদিত'।

১৩. ঋতু-উৎসব। নাট্য-সংগ্রহ। ১৩৩৩ [১৯২৬]। বিভিন্ন ঋতুতে অভিনয়ের উপযোগী নাট্য এবং গীত-সংকলন। সূচী: শেষ বর্ষণ, শারদোৎসব, বসন্ত, সুন্দর, ফাল্গুনী।

১৪. চিরকুমার সভা। নাটক। ফাল্গুন ১৩৩২ [১৯২৬]। 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' [১৯০৮] উপন্যাসের নাট্যরূপ।

১৫ শোধ-বোধ। নাটক। [১৯ জুন ১৯২৬]। 'কর্মফল' গল্পের নাট্যরূপ।

১৬. নটীর পূজা। নাটক। ১৩৩৩ [১৯২৬]।

১৭. রক্তকরবী। নাটক। ১৩৩৩ [১৯২৬]। রবীন্দ্র-শতবর্ষপূর্তি সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৬৭ [১৯৬০]।

১৮. লেখন। বাংলা ও ইংরেজি কবিতা। কার্তিক ১৩৩৪ [১৯২৭]। গ্রন্থে ১৩৩৩ মুদ্রিত হইলেও, বস্তুত ১৩৩৪ সালে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি। অধিকাংশ বাংলা কবিতা কবিকৃত ইংরেজি অনুবাদ-যুক্ত। রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংস্করণ, ১৩৬৮ [১৯৬১]।

১৯. ঋতুরঙ্গ। গীতিনাট্য। ২২ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ [১৯২৭]।

২০. শেষরক্ষা। প্রহসন। শ্রাবণ ১৩৩৫ [১৯২৮]। 'গোড়ায় গলদ' [১৮৯২] নাটকের অভিনয়যোগ্য সংস্করণ।

২১. যাত্রী। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬ [১৯২৯]। ইহাতে 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি' ও 'জাভা-যাত্রীর পত্র' মুদ্রিত। রবীন্দ্র-শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালার 'বিশ্বযাত্রী রবীন্দ্রনাথ' পর্যায়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে প্রকাশ:
পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি, শ্রাবণ ১৩৬৮ [১৯৬১]।
জাভা-যাত্রীর পত্র, শ্রাবণ ১৩৬৮ [১৯৬১]।

২২. পরিত্রাণ। নাটক। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬ [১৯২৯]। 'প্রায়শ্চিত্ত' [১৯০৯] নাটকের পরিবর্তিত রূপ।

২৩. যোগাযোগ। উপন্যাস। আষাঢ় ১৩৩৬ [১৯২৯]।

২৪. শেষের কবিতা। উপন্যাস। ভাদ্র ১৩৩৬ [১৯২৯]।

২৫. তপতী। নাটক। ভাদ্র ১৩৩৬ [১৯২৯]। রাজা ও রানীর [১৮৮৯] আখ্যানভাগ অবলম্বনে রচিত গদ্যনাট্য।

২৬. মহুয়া। কবিতা। আশ্বিন ১৩৩৬ [১৯২৯]

২৭. ভানুসিংহের পত্রাবলী। চৈত্র ১৩৩৬ [১৯৩০]। 'রানুর প্রতি ভানুদাদার আশীর্বাদ'। অধ্যাপক ফণীভূষণ অধিকারীর কন্যা রানু অধিকারীকে লিখিত পত্রালি।

২৮. নবীন। গীতিনাট্য। ৩০ ফাল্গুন ১৩৩৭ [১৯৩১]। ইহা পরে 'বনবাণী'র [১৯৩১] অন্তর্গত হয়।

২৯. রাশিয়ার চিঠি। বৈশাখ ১৩৩৮ [১৯৩১]। 'কল্যাণীয় শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ করকে'।

৩০. বন-বাণী। কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩৮ [১৯৩১]।

৩১. শাপমোচন। কথিকা ও গান। ১৫ পৌষ ১৩৩৮ [১৯৩১]।

৩২. গীতবিতান। ১-২ খণ্ড। গান। আশ্বিন ১৩৩৮ [১৯৩১]। তৃতীয় খণ্ড, শ্রাবণ ১৩৩৯ [১৯৩২]। কবি-কর্তৃক বিষয়ানুক্রমে-সজ্জিত পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, দুই খণ্ডে প্রচারিত, মাঘ ১৩৪৮ [১৯৪২]। নূতন সংস্করণ, তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ—প্রথম খণ্ড পৌষ ১৩৫২, দ্বিতীয় খণ্ড আশ্বিন ১৩৫৪, তৃতীয় খণ্ড আশ্বিন ১৩৫৭। এই সংস্করণের ১-২ খণ্ড বস্তুতঃ পূর্ববর্তী সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ। ১-২ খণ্ডে নানা কারণে সংকলিত হইতে পারে নাই এরূপ সমুদয় গান ১৩৫৭ [১৯৫০] আশ্বিনে মুদ্রিত তৃতীয় খণ্ডে সংকলনের যত্ন করা হইয়াছে, অপিচ, সমুদয় গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য অচ্ছিন্ন আকারে সন্নিবিষ্ট।

৩৩. সঞ্চয়িতা। কবিতা-সংগ্রহ। পৌষ ১৩৩৮ [১৯৩১]। কবি-কর্তৃক সংকলিত ও কবির সপ্ততিবর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত। পরবর্তী দুইটি সংস্করণে কবি-কর্তৃক বহু পূর্বসংকলন সংস্কৃত বা বর্জিত ও বহুতর নূতন কবিতা সংযোজিত হইয়াছিল। আরো পরবর্তীকালের কাব্য হইতে কবিতা চয়ন করিয়া প্রচলিত সংস্করণে (১৩৪৮, ২২ শ্রাবণের পর) সংযোজনরূপে দেওয়া হয়।

৩৪. পরিশেষ। কবিতা। ভাদ্র ১৩৩৯ [১৯৩২]। 'শ্রীমান অতুলপ্রসাদ সেন করকমলে'।

৩৫. কালের যাত্রা। নাট্য-সংলাপ। ৩১ ভাদ্র ১৩৩৯ [১৯৩২]। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের' উদ্দেশে 'কবির সস্নেহ উপহার'। ইহার অন্তর্গত—রথের রশি, কবির দীক্ষা।

৩৬. পুনশ্চ। গদ্যকাব্য। আশ্বিন ১৩৩৯ [১৯৩২]। উৎসর্গ : 'নীতু' [দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়]।

৩৭. Mahatmaji and the Depressed Humanity। ভাষণ। ডিসেম্বর ১৯৩২। 'To Acharyya Praphulla Chandra Ray'। ইহাতে তিনটি বাংলা ভাষণও মুদ্রিত আছে—৪ঠা আশ্বিন, মহাত্মাজির শেষ ব্রত, পুণা ভ্রমণ। এগুলি পরে 'মহাত্মা গান্ধী' (১৯৪৮) গ্রন্থে সংকলিত।

৩৮. দুই বোন। ফাল্গুন ১৩৩৯ [১৯৩৩]। 'শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু করকমলে'।

৩৯. মানুষের ধর্ম। ১৯৩৩। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত 'কমলা লেকচার্স্‌'।

৪০. বিচিত্রিতা। কবিতা। শ্রাবণ ১৩৪০ [১৯৩৩]। 'পঞ্চাশ বছরের কিশোর গুণী নন্দলাল বসুর প্রতি সত্তর বছরের প্রবীণ যুবা রবীন্দ্রনাথের আশীর্ভাষণ'।

৪১. চণ্ডালিকা। নাটিকা। ভাদ্র ১৩৪০ [১৯৩৩]।

৪২. তাসের দেশ। নাটিকা। ভাদ্র ১৩৪০ [১৯৩৩]। দ্বিতীয় সংস্করণ. মাঘ ১৩৪৫, 'কল্যাণীয় শ্রীমান সুভাষচন্দ্র'কে উৎসর্গিত। 'একটা আষাঢ়ে গল্প' [প্রথম প্রকাশ ১৮৯২] রূপক গল্পের নাট্যরূপ।

৪৩. বাঁশরী। নাটক। অগ্রহায়ণ ১৩৪০ [১৯৩৩]।

৪৪. ভারতপথিক রামমোহন রায়। প্রবন্ধ। ১৪ পৌষ ১৩৪০ [১৯৩৩]। রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালার অন্তর্গত পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১১মাঘ ১৩৬৬ [১৯৬০]।

৪৫. মালঞ্চ। উপন্যাস। চৈত্র ১৩৪০ [১৯৩৪]।

৪৬. শ্রাবণ-গাথা। গীতিনাট্য। শ্রাবণ ১৩৪১ [১৯৩৪]।

৪৭. চার অধ্যায়। উপন্যাস। অগ্রহায়ণ ১৩৪১ [১৯৩৪]।

প্রত্যেক গ্রন্থের উল্লেখের সঙ্গে উহার প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে বা অন্যত্র মুদ্রিত তারিখ প্রদত্ত হইয়াছে। ভিন্ন. গ্রন্থে ভিন্ন প্রথায়, কখনো শকাব্দে কখনো বঙ্গাব্দে, তারিখ মুদ্রিত থাকায় কালক্রম বুঝিবার সুবিধার জন্য সমসাময়িক খৃস্টাব্দ তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে।

কতকগুলি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ তারিখ— দিন, মাস, বর্ষ— খৃস্টাব্দ অনুযায়ী তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে প্রদত্ত হইল। সেগুলি বস্তুতঃ বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকাভুক্তির তারিখ— গ্রন্থমধ্যে কোনো তারিখ মুদ্রিত না থাকায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয় গ্রন্থ হইতে ঐ তারিখগুলি গৃহীত।

বর্তমান লেখকের রবীন্দ্রজীবনকথা (১৯৫৯) গ্রন্থে প্রকাশিত শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক কৃত রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী হইতে পুনর্মুদ্রিত।

নির্দেশিকা

ঝ

ট

প

ৎ

সংশোধন ও সংযোজন

পৃ. ১১। '৫৭তম জন্মোৎসব' স্থলে '৫৮তম' হইবে।

পৃ. ৩৩। শেষ প্যারা। পরদিন (২ ডিসেম্বর) স্থলে ২ নভেম্বর হইবে।

পৃ. ১৩১ ও ১৬৯ পা-টী। মি. কাদুরি। Sir Elly Kadoorie of Shanghai. বোম্বাই মাজগাঁও পল্লীতে যে ইসরেইলি বিদ্যালয় আছে তাহাতে তিনি ১০,০০০ পাউণ্ড দান করায় বিদ্যালয়টি Sir Kadoorie-র নামে হইয়াছে। ইনি বিশ্বভারতীতে জলকষ্ট নিবারণের জন্য ১২,০০০ টাকা দান করেন।

পৃ. ১৭৩। ছত্রমঞ্জিন নহে—মোতিমহল পড়িতে হইবে।

পৃ. ২৪৩। সংগীত অধ্যাপক ভীমরাও হস্থরকার হইবে।

পৃ. ২৬২। জোকাই। দ্র. সাহিত্যের গৌরব (প্র)। সাধনা ১৩০১ শ্রাবণ (১৮৯৪ অগস্ট)। দ্র. সাহিত্য (বি. ভা. সং) পৃ. ২৪২-২৪৭। রবীন্দ্রনাথ Jokai লিখিত *Eyes like sea* (অনূদিত ১৮৯৩) পড়িয়া সমালোচনা করিতেছেন।

পৃ ২৬৩। গান রচনা—

বুখরেস্ট (২১ নভেম্বর ১৯২৬)

তব অমূর্ত বাণী / অঙ্গে আমার চিত্তে আমার / মূর্তি পেয়েছি জানি।··

(অরূপ·তোমার বাণী-র পূর্বরূপ। গীতবিতান পৃ. ৯)

দার্দানেলিস (২৩ নভেম্বর ১৯২৬)

বাঁশি আমি বাজাইনি কি / পথের ধারে ধারে, (গীতবিতান পৃ. ২৭৯)

এথেন্স (২৫ নভেম্বর ১৯২৬)

যা পেয়েছি প্রথম দিনে / সেই যেন পাই শেষে, (গীতবিতান পৃ. ২২৯)

পিরিউস বন্দর (২৫ নভেম্বর ১৯২৬)

ক্ষত যত ক্ষতি যত মিছে হ'তে মিছে, (গীতবিতান, পৃ. ১৩৮)

দ্র, উত্তরা, রবীন্দ্রশতবার্ষিকী ১৩৬৮ বৈশাখ।

পৃ. ৩০১। বৃহত্তর ভারত—সিয়ামে।

Shakti Das Gupta, *Togore's Asian Outlook*, Calcutta 1961.

Tagore was well over 66 when he visited Thailand, during the reign of King Prajadhipok (Rama VII) : He arrived in Bangkok from Penang by train in the evening of 8th October. 1927, on a week's visit. During the short period, the poet gave five lectures on entirely different subjects :—

1. India's role in the world (Oct. 11)
2. Child Education (Oct. 12)
3. Chinese Birth (Oct. 13)
4. Asia's Continental Culture (Oct. 13)
5. Ideals of National Education (Oct. 14)

The lecture on 'Asia's Continental Culture' was given before king Prajadhipok and Queen Rambai Barni...The Poem 'To Siam' in the original as well as its English translation was read before Their Majesties. Printed on blue satin in the Poet's own hand and encased in Banaras brocade, these were handed over by the poet for His Majesty's acceptance.

এই গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা, সমসাময়িক ইংরেজি, সিয়ামী সংবাদ পত্রের উদ্‌ধৃতি আছে। দ্র. p 90-129.

পৃ. ৩০৬। বোকাচ্চিও পড়িতে হইবে।

পৃ. ৩০৭। শেষ প্যারা—২য় পংক্তি। 'পার-পিউরিটান যুগের' হইবে।

পৃ. ৩৬৬। ১৯৩০ জানুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথ বরোদা যাত্রা করেন। প্রথমে তিনি লখনৌ যান; সেখান হইতে কানপুরে। এ সম্বন্ধে কৌতূহলী পাঠক শ্রীঅসিতকুমার হালদারের 'রবিতীর্থে' গ্রন্থ দেখিতে পারেন। বিশ্বভারতীর অর্থসংগ্রহের জন্য কী প্রাণপণ করিতেছেন তাহার আভাস পাওয়া যাইবে।

(বরোদার ১৯৩০ পরিচ্ছেদ) প্রথম প্যারাগ্রাফ এইরূপ পড়িতে হইবে।

বরোদায় বক্তৃতার দিবার দেরি আছে দেখিয়া কবি অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লইয়া লখনৌ চলিলেন। (১১ জানুয়ারি) সেখানে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক কয়জন বাঙালি অধ্যাপক আছেন— নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, বিনয়েন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ, রাধাকুমুদ ও রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। সকলে অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টায় ব্রতী হলেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ছাতারীর নবাবের নিকট গেলে তিনি মোটা চেক্‌ দিলেন বিশ্বভারতীর জন্য।

দিন-তিন লখনৌ থাকিয়া তিনি কানপুর গেলেন। অমিয়চন্দ্র ১৬ই জানুয়ারি এক পত্রে লিখিতেছেন। "এখানে বেশ টাকা উঠেছে। শ্রীবাস্তব মহাশয় প্রায় দশ হাজার টাকা তুলেছেন—চা'য়ে কবিকে নিমন্ত্রণ করে সেই সঙ্গে ধনী বণিকদের ডেকেছিলেন। কবি ছোট একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ফেরবার পথে ইংরেজ বণিকদের কাছে কবি আরও কিছু টাকা পাবেন— সবশুদ্ধ বিশ হাজার উঠবার সম্ভাবনা।" "কবির শরীর মোটেই ভালো নেই।"[১]

অতঃপর ১৭ই আগরা গিয়া তথা হইতে আহমদাবাদ যাত্রা করেন।

পৃ. ৪১৮। গান্ধীজি কারাগারে যাইবার পূর্বে এই পত্রখানি রবীন্দ্রনাথকে লেখেন :

Laburnum Road,
Bombay
3rd January, 1932.

Dear Gurudev,

I am just stretching my tired limbs on the mattress and as I try to steal a wink of sleep I think of you. I want you to give your best to the sacrificial fire that is being lighted.

With love
M. K. Gandhi

পৃ. ৪৪৪। "রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।" পড়িতে হইবে—'রবীন্দ্রজয়ন্তীর অন্তর্গত মেলা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল; সাতদিনব্যাপী রবীন্দ্র উৎসব পূর্বেই বন্ধ হইয়াছিল। মেলা কমিটির প্রধানকর্মী জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী অন্তরীণাবদ্ধ হইলে মেলার পরিচালনা আর সম্ভব হইল না।

১ অসিতকুমার হালদার, রবিতীর্থে, ১৩৬৫। পৃ. ১৬৯-১৭২